এনসিয়েণ্ট সোসাইটি

লুইস হেনরী মর্গ্যান

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম প্রকাশ ॥ শ্রাবণ ১৩৭২

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

এনসিয়েণ্ট সোসাইটি

(প্রাচীন সমাজ)

বন্য অবস্থা থেকে বর্বর অবস্থার মধ্য দিয়ে সভ্যতায় উত্তরণের ধারায় মানব প্রগতির উপর গবেষণাকর্ম

লুইস হেনরি মর্গ্যান

দীপায়ন

২০ কেশব সেন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশিত অন্যান্য বই

পল লাফর্গ
সম্পত্তির বিবর্তন

চার্লস ডারউইন
ডিসেণ্ট অব ম্যান

রমেশচন্দ্র দত্ত
পিজ্যান্ট্রি অব বেঙ্গল

সুশোভন সরকার
বাংলার রেনেসাঁস

নির্মলা নাগ
শিল্প চেতনা

এন. এম গোরচাকভ
স্তানিস্লাভস্কীর নাট্য পরিচালনা (রোমাণ্টিক নাটক)

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে
হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (বারো খণ্ডে সম্পূর্ণ)

ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি
গত দেড়শ বছরের রাজনৈতিক ছবির ইতিহাস, ইস্তাহার, দলিল-নথিপত্র ও ছবির সংকলন

সন্তোষকুমার বসু
ভারতশিল্পে দেহজশ্রম ও অন্যান্য প্রবন্ধ

অমিয় রায়চৌধুরী
চার্লি চ্যাপলিন - সিনেমা ও জীবন

গোলাম কুদ্দুস
একসঙ্গে
সম্বোধন

গেব্রিয়েল পেরী
রাতপ্রভাতের গান

প্রকাশনা প্রসঙ্গে

প্রথম পর্ব প্রকাশিত হবার বেশ কিছুদিন পর দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হলো। প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদ থেকে। অনুবাদ ও প্রকাশনাকে সাধ্যমতো উন্নত করার চেষ্টা ও মুদ্রণকর্মীদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও নানা কারণে ছাপা হতে দেরী হয়ে গেলো। সহৃদয় পাঠক ও সাথীবন্ধুদের কাছে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া ছাড়া আমরা অনন্যোপায়। অগণিত বিদগ্ধ পাঠক এবং সাথী বন্ধুদের উৎসাহ ও পরামর্শ ও দ্রুত প্রকাশের তাগিদ আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাদের। কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ও অন্যান্য ত্রুটি রয়ে গেল, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত করবার নিশ্চিত চেষ্টা করা যাবে।

এনসিয়েণ্ট সোসাইটি

দ্বিতীয় পর্ব

একাদশ পরিচ্ছেদ
রোমান গোত্র

ল্যাটিনরা যখন তাদের স্বগোত্রীয় স্যাবেলিয়ান্, ওস্কান্ আর আম্‌ব্রিয়ান্‌দের সঙ্গে সম্ভবত একটা একান্বিত গোষ্ঠী হিসাবে ইতালিয় উপদ্বীপ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল, তখন তারা পশুদের পোষ মানাতে এবং সম্ভবত বিভিন্ন খাদ্যশস্য ফলমূল শাকসব্জীর চাষ করতেও শিখেছিল।[১] তখন তারা অন্ততপক্ষে বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায়

১। ইন্দো-জার্মান যে জাতিগুলো বর্তমানে পৃথক পৃথক হয়ে গেছে, তারা যখন একই ভাষাভাষী একটা ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী ছিল, তখন তারা সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়েছিল আর তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা শব্দভাণ্ডারও গড়ে তুলতে পেরেছিল। এই শব্দভাণ্ডারকে তার প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ীই নিজেদের সঙ্গে নানান দেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল তারা। এই ভাণ্ডার তাদের কাছে একটা সার্বজনীন সম্পদ বিশেষ ছিল, আর এর বনিয়াদটা এমনই ছিল যাতে করে প্রত্যেকটা জাতি ভবিষ্যতে তার নিজের নিজের মতো করে এটাকে সাজিয়ে নিতে পারে······। সেই সুপ্রাচীন যুগে তাদের মধ্যে পশুপালননির্ভর জীবনযাত্রা বিকাশের প্রমান আমরা খুঁজে পাই গৃহপালিত পশুদের অপরিবর্তনশীল নামগুলোর মধ্যে—সংস্কৃতের "গো", লাতিন ভাষার "বোঃ" গ্রীক্-এ "বওঁ"; সংস্কৃত "অবিঃ", লাতিনে "ওভিঃ", গ্রীক-এ "ওহিঃ"; সংস্কৃত "অশ্বঃ", লাতিনে "ইকুয়া", গ্রীক্-এ "হিপ্পো"; সংস্কৃত "হংস," লাতিনে "অন্সর", গ্রীক্-এ "সোন" ;······"অন্যদিকে, এই সময়ে কৃষির চলন ছিল কি না, সে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট প্রমান এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে আসে নি। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বরং মনে হয় যে কৃষির অস্তিত্ব তখন ছিল না।"—মম্‌সেন্-এর "হিস্ট্রি অফ রোম" ডিকসন-এর অনুবাদ, ক্রাইব্‌নার সংস্করণ, ১৮৭১, i ৩৭ একটা টীকায় তিনি মন্তব্য করেছেন যে, আনহ্ (Anah) থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে, ইউফ্রেটিস নদীর দক্ষিণ তীরে আপনা থেকেই কিছু যব, গম ও স্পেল্‌ট্ উৎপন্ন হত। মেসোপটেমিয়ায় এইরকম আপনা থেকে বন্য যব ও গম ফলনের কথা উল্লেখ করেছেন ব্যাবিলনীয় ইতিহাসবিদ্ বেরোসাস্। এই একই বিষয়ে ফিক্ বলেছেন : পশুচারণই গড়ে তুলেছিল আদিমকালের সামাজিক জীবনের বনিয়াদ, কিন্তু সেই সামাজিক জীবনের মধ্যে কৃষিকাজের কোন চিহ্নই প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কয়েক ধরনের খাদ্যশস্যের ব্যবহার তারা নিশ্চয়ই জানত, কিন্তু এইসব শস্যের চাষ তারা কালে-ভদ্রেই করত, কেন না সারাক্ষণেই তাদের চেষ্টা ছিল কিভাবে বেশি দুধ আর মাংস পাওয়া যায়। এদের জীবন যাত্রা আদৌ কৃষি নির্ভর ছিল না। আদিম কালে কৃষিসংক্রান্ত শব্দের সংখ্যা ছিল খুবই কম—এ থেকেই পূর্বোক্ত ব্যাপারটার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো হচ্ছে 'যব' অর্থাৎ বুনো ফল, 'ভার্কা' অর্থাৎ কোদাল বা লাঙল, 'রাত্রা', অর্থাৎ কাস্তে, আর তাছাড়া 'পারো

এগিয়ে গিয়েছিল। যখন তারা প্রথম ইতিহাসের অঙ্গনে এসে পৌঁছোয় তখন ছিল বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় এবং প্রায় সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে।

রোমুলাসের সময়ের আগে ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলোর যে মৌখিক ইতিহাস পাওয়া যায়, তা গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মৌখিক ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশি অপ্রতুল ও ত্রুটিপূর্ণ। প্রাচীনকালে অপেক্ষাকৃত উন্নত সাহিত্যগত সংস্কৃতি এবং লিপিবদ্ধ করার গভীর প্রবণতা থাকার ফলে গ্রীকরা তাদের মৌখিক বিবরণের একটা বড় অংশকেই রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলোর মৌখিক ইতিহাসে তাদের আল্‌বাজ পর্বতাঞ্চলে এবং রোম থেকে পূর্বদিকে অ্যাপেনাইন পর্বতাঞ্চলে বসবাস-কালীন জীবন যাত্রা ও অভিজ্ঞতা এবং তার পূর্বেকার অভিজ্ঞতার কোন কথাই পাওয়া যায় না। জীবনধারনের উপকরনের ব্যাপারে যে গোষ্ঠীগুলো এত উন্নত, তারা তাদের আদিদেশটার সব কথা ভুলে গেল কী করে। সেক্ষেত্রে ধরেই নিতে হয় যে তারা ইটালিতে সুদীর্ঘকালধরে বসবাস করেছিল। রোমুলাসের[১] সময়কালেই তারা তিরিশটা স্বাধীন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্য একটা শিথিল মিত্রসংঘের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ছিল। আশপাশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল তারা। স্যাবেলিয়ান, ওস্কান আর আম্‌ব্রিয়ানরাও এই একইরকম অবস্থায় ছিল, আর এদের নিজ নিজ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও একইধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এদের আঞ্চলিক একতার ভিত্তি ছিল এক একটা উপ-ভাষা। উত্তরাঞ্চলের প্রতিবেশী এট্রুস্কানরা সহ এদের সকলের মধ্যেই গোত্রের অস্তিত্ব ছিল, আর ঠিক গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মত নানান সামাজিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। তারা যখন প্রথম অজানার আঁধারী পর্দার ওপার থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং ইতিহাসের আলোক-রশ্মিতে ফুটে ওঠে তাদের অস্তিত্ব, তখন তাদের সাধারণ অবস্থা একইরকম ছিল।

রোমনগরী প্রতিষ্ঠার (মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩) আগে রোমানদের যে বিপুল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল, তার কোন বিশদ বিবরণ রোমান ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। ইতালীয় গোষ্ঠীগুলো তখন সংখ্যায় প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল, এবং তাদের লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল যথেষ্ট। তাদের রীতি-নীতি হয়ে উঠেছিল একান্তই কৃষিজীবি সুলভ এবং বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর পাল ছিল তাদের। জীবনধারনের উপকরণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিল তারা। পেঁছে গিয়েছিল একপতি-পত্নীভিত্তিক

'পিনসিয়ার' (রুটি সেঁকা), এবং 'ম্যাক্' বা গ্রীক্ ভাষায় 'ম্যাসো', যা আভাস দেয় শস্য মাড়াই অথবা পেষাই করা সম্বন্ধে।"—ফিক্-এর প্রিমিটিভ ইউনিটি অফ ইন্দো-ইওরোপীয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস্, গটিনজেস্, ১৮৭৩, পৃ : ২৮০। এছাড়াও দ্রষ্টব্য "চিপ্স্ ফ্রম এ জার্মান ওয়ার্কশপ"; ii, ৪২ গ্রীস ও ইটালির জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃষির চলনের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য—মম্‌সেন, i, পৃঃ ৪৭, এবং তার পরবর্তী লেখাগুলো।

১। রোমুলাস্ শব্দটা এবং তাঁর উত্তরসূরীদের নাম ব্যবহার করার অর্থ কিন্তু রোমানদের প্রাচীন উপকথাকে মেনে নেওয়া নয়। এই নামগুলো সেই আমলের বিভিন্ন বড় বড় ঘটনাকেই চিহ্নিত করে, আর সেগুলোই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

পরিবারের স্তরে। আমরা যখন এদের কথা প্রথম জানতে পারি, তখন অবস্থাটা ঠিক একইরকম ছিল। কিন্তু নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় এদের অগ্রগতির বিশদ বিবরণ জানা যায় না বললেই চলে। সরকার সংক্রান্ত ধারনার বিকাশের ব্যাপারে এরা খ্বেই পিছিয়ে ছিল, কারণ তখনও পর্যন্ত তারা শুধু গোষ্ঠীগ্লোর মিত্রসংঘ পর্যন্তই এগোতে পেরেছিল। তিরিশটা গোষ্ঠী একটা মিত্রসংঘের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হলেও এর চরিত্রটা ছিল পারস্পরিক প্রতিরক্ষার একটা সংঘের মতো। তখনও একটা জাতিসত্তা গড়ে ওঠার মত একাত্মতায় বা অন্তরঙ্গতায় পেঁছিতে পারে নি গোষ্ঠীগ্লো।

এট্রুস্কান গোষ্ঠীগ্লো একটা মিত্রসংঘ গড়ে তুলেছিল। স্যাবেলিয়ান, ওস্কান এবং আমব্রিয়ানদের মধ্যেও সম্ভবত মিত্রসংঘ গড়ে উঠেছিল। ল্যাটিন গোষ্ঠীগ্লো স্ষ্টি করেছিল, অসংখ্য প্রাচীর-বেষ্ঠিত শহর ও স্রক্ষিত গ্রাম, আবার কৃষিগত কারণে ও নিজেদের গৃহপালিত পশ্দের খাদ্যের সন্ধানে তারা দেশের নানান জায়গায় ছড়িয়েও পড়েছিল। যে ঘটনার সঙ্গে রোম্লাসের নাম জড়িত, যার পরিণতিতে গড়ে ওঠে রোম শহর, সেই ঘটনার আগে পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীভবন ও একাঙ্গীভবন ঘটে নি। শিথিলভাবে ঐক্যবদ্ধ এই ল্যাটিন গোষ্ঠীগ্লোই ছিল নতুন শহরের শক্তির মূল উৎস। আল্বার প্রধানদের হাতে যখন এইসব গোষ্ঠীর সব ক্ষমতা ছিল, তখন থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের সময় পর্যন্ত এই গোষ্ঠীগ্লোর যে ইতিহাস, তার বেশ খানিকটা পাওয়া যায় এদের লোককথা আর উপকথার মধ্যে। কিন্তু এদের যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতি-প্রথা ঐতিহাসিক য্গেও টিকে ছিল, সেগ্লোর মধ্যে ল্কিয়ে আছে আরও কিছ্ তথ্য। যেগ্লো তাদের প্র্বতন অবস্থাকে যথেষ্ট ভালোভাবেই চিত্রিত করে। প্রকৃত ঘটনার একটা মনগড়া খসড়া ইতিহাসের থেকে এগ্লো অনেক বেশি গ্র্ত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক য্গের স্চনায় ল্যাটিনগোষ্ঠীগ্লোর মধ্যে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান ছিল গোত্র (genes), কিউরিয়া (curiae) আর গোষ্ঠী (tribes)। এগ্লোর ওপর ভিত্তি করেই রোম্লাস ও তাঁর উত্তরস্রীরা গড়ে তুলেছিলেন রোমান শক্তিকে। এই নতুন সরকার কিন্তু সব দিক থেকে একটা স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরে গড়ে ওঠেনি। সাংগঠনিক ক্রমের উচ্চতর স্তর-গ্লোতে (অর্থাৎ গোষ্ঠী ও মিত্রসংঘে) আইনগত পন্থার সাহায্যে এই সরকার গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে, এই সংগঠনের ম্ল ভিত্তি ছিল গোত্র, এবং তা স্ষ্টি হয়েছিল স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরেই। গোত্রের মধ্যে ম্লত একই বংশের অথবা বিভিন্ন রক্তসম্বন্ধয্ক্ত বংশের লোকেরাই থাকত। আসলে, ল্যাটিন গোত্রগ্লোর মধ্যে থাকত শ্ধ্ একই বংশোদ্ভূত লোকেরা, আর স্যাবাইন ও অন্যান্য গোত্রগ্লোর মধ্যে (এট্রুস্কান গোত্রগ্লো বাদে) থাকত বিভিন্ন রক্তসম্বন্ধয্ক্ত বংশের লোকেরা। রোম্লাসের পরবর্তী চতুর্থ প্র্ষে টারকুইনিয়াস প্রিস্কাস্-এর আমলে গোটা সংগঠনটা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যাগত বিন্যাসে পেঁছায়: একটা কিউরিয়ায় দশটা গোত্র, একটা গোষ্ঠীতে দশটা কিউরিয়া, এবং রোমানদের মধ্যে মোট তিনটে গোষ্ঠী, অর্থাৎ একটা গোত্র-ভিত্তিক সমাজ ছিল মোট তিনশটা গোত্র নিয়ে।

যা বিভিন্ন গোত্র নিয়ে গঠিত ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী কিছ্ গোষ্ঠী গঠিত

হয়েছিল, তাদের একটা মিত্রসঙ্ঘের মধ্যে যে উদ্দেশ্যের একতাও থাকে না অথবা একটা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার থেকে বেশি ক্ষমতাও থাকে না, এটা উপলব্ধি করার মত বিচক্ষণতা রোমুলাসের ছিল। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ব্যর্থ করে দিত মৈত্রী-বন্ধতার নীতিকে। রোমুলাস এবং তাঁর সমকালীন প্রাজ্ঞজনেরা এর প্রতিকার হিসাবে কেন্দ্রীভবন ও একাঙ্গীভবনের কথা বলেছিলেন। ঐ যুগে এটা ছিল একটা বিশিষ্ট ঘটনা, আর রোমুলাসের যুগ থেকে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের সময়কার রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠানে উত্তরণের পথে এটা আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এথেনীয় গোষ্ঠীগুলোর পথ অনুসরণ করে এবং একটা শহরে কেন্দ্রীভূত হয়ে, এরা নিজেদের পাঁচটা প্রজন্মের সময়কালের মধ্যেই সরকার-ব্যবস্থার ব্যাপারে এথেনীয়দের মতই পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়। এদের সরকার-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়, গোত্রভিত্তিক সংগঠনের বদলে গড়ে ওঠে একটা রাজনৈতিক সংগঠন।

পাঠককে শুধু কয়েকটা সাধারণ তথ্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—প্যালাটাইন পর্বতমালা অঞ্চলে আর তার চারপাশে একশত ল্যাটিন গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন রোমুলাস এবং এই গোত্রগুলো র‍্যাম্‌নেস্ নামে একটা গোষ্ঠীতে একত্রিত হয়েছিল ; পরিস্থিতিগত কারণে বেশ কিছু স্যাবাইন গোত্রও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই গোত্রগুলোর সংখ্যা পরে বেড়ে প্রায় একশয় পৌঁছলে, এরা টিটি নামক আরেকটা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে ছিল। টার্কিনিয়ান প্রিস্কাস্-এর আমলে, এট্রুস্কানরা সহ আশপাশের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে নেওয়া একশটা গোত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল লুকেরেস্ নামক তৃতীয় আরেকটা গোষ্ঠী। অর্থাৎ, মোটামুটি একশ বছরের মধ্যে তিনশটা গোত্র রোমের বুকে একজোট হয়েছিল। এরা পুরোপুরিভাবে সংগঠিত হয়েছিল প্রধানদের একটা পরিষদের অধীনে, যাকে বর্তমানে রোমান ব্যবস্থাপক-সভা (Roman Senate) বলা হয়, এবং একটা গণপরিষদের অধীনে যাকে এখন 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা' বলা হয়, এবং একজন সেনাপতির অধীনে, 'রেক্স' নামে যাকে অভিহিত করা হোতো। এ সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য ছিল একই—ইতালিতে সামরিক কর্তৃত্ব অর্জন করা।

রোমুলাসের সংবিধান এবং সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের পরবর্তী আইন-কানুন অনুযায়ী, এদের সরকার ব্যবস্থাটা ছিল আসলে একটা সামরিক গণতন্ত্র, কারণ সামরিক কার্যকলাপ ও মনোভাব সরকারের মধ্যে সবথেকে প্রভাবশালী ছিল। তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে একটা নতুন ও বৈর (Antagonistic) উপাদান, অর্থাৎ রোমান ব্যবস্থাপক-সভা, ঐ সময় শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এবং এই ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা আর তাদের বংশধররা সমাজের অভিজাত অংশ হয়ে উঠেছিল। ফলে, এই একটা পদক্ষেপ থেকেই গড়ে উঠেছিল এক সুবিধাভোগী শ্রেণী। এই শ্রেণীটিকে প্রথমে রক্ষা করত গোত্রীয় ব্যবস্থা এবং পরে রাজনৈতিক ব্যবস্থা। গোত্রীয় ব্যবস্থার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাই একসময় বাতিল করে দিয়েছিল। রোমান ব্যবস্থাপক-সভা আর তার দ্বারা সৃষ্ট ঐ অভিজাত শ্রেণীই রোমান জনগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এবং তাদের ভবিতব্যকে পাল্টে দিয়েছিল, আর তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত নীতিগুলো স্বাভাবিকভাবে ও যুক্তিসম্মতভাবে যে পরিণতিতে পৌঁছোতে পারত (ঠিক এথেনীয়দের

মতো), সেখান থেকেও তাদের জীবনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল।
এই নতুন সংগঠনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, সামরিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে এটা ছিল এক সুগভীর প্রজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ। এই সংগঠনের দৌলতে তারা কিছুদিনের মধ্যেই অন্যান্য ইতালিয় গোষ্ঠীগুলোর থেকে বহুগুণ উন্নত হয়ে ওঠে, এবং একসময় সমগ্র উপদ্বীপ অঞ্চলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।
ল্যাটিন ও অন্যান্য ইতালিয় গোষ্ঠীগুলো যে গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন নিয়েবুর, হেরমান, মমুসেন, লঙ্ এবং অন্যান্য আরও অনেকেই। কিন্তু তাঁদের বিবরণ থেকে ইতালিয় গোত্রগুলোর কাঠামো আর নীতি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এর মূল কারণ হচ্ছে দুটো। একদিকে, এ বিষয়ের অনেক কিছুই আজ ঢাকা পড়ে গেছে অজানার অন্ধকারে ; অন্যদিকে, লাতিন লেখকদের রচনায় তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়ার অভাব। আর একটা কারণও অবশ্য আছে। কারণটা হল এই যে গোত্রের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্কটা কী সে ব্যাপারে উপরোক্ত লেখকদের মধ্যে প্রথম কয়েকজনের একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল। এঁরা মনে করেন, গোত্রগুলো গড়ে উঠত কিছু পরিবারের সমন্বয়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোত্র গড়ে উঠত পরিবারের অংশগুলি নিয়ে, তাই সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক পরিবার নয়, প্রাথমিক একক ছিল গোত্র। যে জায়গায় এসে তাঁরা তাঁদের অনুসন্ধান শেষ করেছেন, তার পর আরও অনুসন্ধান চালানোটা বেশ দুরূহ। তবে, গোত্রের প্রাচীন গঠন পদ্ধতি থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলোর সাহায্যে গোত্রের বর্তমানে অপ্রচলিত কিছু বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।
ইতালিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে গোত্রভিত্তিক সমাজ সংগঠন চালু থাকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিয়েবুর লিখেছেন : "এখনও যদি কেউ এই মন্তব্য করেন যে এথেনীয় গোত্রের সঙ্গে রোমান গোত্রের চরিত্রের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাহলে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে প্রাচীনকালে সমস্ত পৃথিবী জুড়েই যে প্রতিষ্ঠানটা চালু ছিল, ইতালি ও গ্রীসে তা থেকে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল কিভাবে——। নাগরিকদের প্রতিটি দল একইভাবে বিভক্ত ছিল : জেফাইরিয়ানরা, স্যালামিনিয়ানরা এথেনীয়দের মতো এবং টুস্কুলানরা ঠিক রোমানদের মতো।"[১]
রোমানদের মধ্যে যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল, এটা জানার সঙ্গে সঙ্গেই জানা দরকার ঐ সংগঠনের প্রকৃতিটা কেমন ছিল : কী কী অধিকার, সুযোগ-সুবিধা আর দায়-দায়িত্ব ছিল তার সদস্যদের, এবং একই সমাজব্যবস্থার সদস্য হিসাবে বিভিন্ন গোত্রগুলোর পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কই বা কেমন ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ করে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাবে কিউরিয়া, গোষ্ঠী এবং সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে (গোত্রের সদস্যরাও যার অংশীদার) তাদের সম্পর্ক নিয়ে।
এ বিষয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে সম্ভাব্য যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার পরও বহু

১। "হিস্ট্রি অফ রোম", খণ্ড ১, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৪১, ২৪৫

ব্যাপারেই সেই তথ্যরাজি অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে, এমন গোত্রের কিছু কিছু বিষয় আর কাজ সম্বন্ধে অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। রোমানদের মধ্যে ঐতিহাসিক যুগ ভালোভাবে শুরু হওয়ার আগেই গোত্রের সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল নতুন রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর হাতে। তাই, প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া একটা ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো টিকিয়ে রাখার কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা রোমানদের ছিল না। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে গেইয়ুস তাঁর 'ইনস্টিটিউস্' গ্রন্থে লিখেছিলেন যে গোটা 'জাস জেণ্টিলিসিয়াম' (Jus gentilicium) ব্যবস্থাটাই তখন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল, আর এ বিষয়ে আলোচনা করাটা তাই তখন নেহাতই অনাবশ্যক একটা ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল।[১] কিন্তু রোম নগরীর প্রতিষ্ঠার সময়, এবং তার পরেও বেশ কিছু শতাব্দী ধরে গোত্রীয় সংগঠন পুরোদমে সক্রিয় ছিল।

গোত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করার আগে বলে নেওয়া দরকার গোত্র এবং গোত্রের সদস্যদের সম্বন্ধে রোমানদের সংজ্ঞাটা কী ছিল, এবং কোন ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয় করা হত। সিসেরো তাঁর 'টপিক্স্' গ্রন্থে গোত্রের সদস্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন: কোন নির্দিষ্ট গোত্রের সদস্য তাদেরকেই বলা হবে, যারা প্রত্যেকে একই নামের অধিকারী। সংজ্ঞাটা মোটেই যথাযথ নয়। যারা স্বাধীন পিতা-মাতার সন্তান, তারাই হচ্ছে গোত্রের সদস্য। না, এটাও অপ্রতুল সংজ্ঞা। যাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনও দাস ছিল না। এখনও কিন্তু ঠিক পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না সংজ্ঞাটা। যাদের লোকসংখ্যা কখনও পুরোপুরি হ্রাস পায় নি। হ্যাঁ, এবার সবটা মিলে একটা কাজ-চলা গোত্রের সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে, কেননা যাজক স্ক্যাভোলা, এর সঙ্গে আর কিছু যোগ করেছেন বলে আমার জানা নেই।[২] ফেস্টাস বলেছেন: একই গোত্রের সদস্য তাদেরকেই বলা হত, যারা একই মূল বংশ থেকে উদ্ভূত এবং যারা একই নামে অভিহিত হত।[৩] ভ্যারো বলেছেন: যেমন, এমিলিয়াসদের সন্তান-সন্ততির এমিলি হিসাবেই পরিচিত হয়, এবং তারা গোত্রের সদস্যপদ লাভ করে; এই এমিলিয়াস নামটা থেকেই গোত্রের নাম নির্ধারিত হয়।[৪]

গোত্রের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা সিসেরো করেন নি। তিনি কতকগুলো মানদণ্ড নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন, যার সাহায্যে গোত্রের সঙ্গে কারুর যুক্ত থাকার অধিকার বা সেই অধিকার খর্ব করার কারণ নির্ণয় করা যায়। এইসব সংজ্ঞার কোনটির সাহায্যেই গোত্রের গঠনকাঠামোর ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থাৎ, কোন একজন কল্পিত গোত্র-প্রতিষ্ঠাতার বংশধরদের সকলেই সেই গোত্রীয় নামটা ধারণ করত, নাকি তার বংশধরদের মধ্যে শুধু একটা অংশই ধারণ করত ঐ গোত্রীয় নামটা; আর, যদি শুধু একটা অংশই

১। "ইনস্টিটিউট্স্', iii, ১৭

২। "সিসেরো, টপিকা ৬."

৩। স্মিথ-এর "ডিকশনারী অফ গ্রীক অ্যাণ্ড রোমান অ্যান্টিক্যুইটিস, প্রবন্ধ, গোত্র" এ তে উদ্ধৃত।

৪। ভ্যারো, "দ্য লিঙ্গুয়া লাতিনা," খণ্ড ৮, পরিচ্ছেদ ৪.

তার ধারক হয়ে থাকে' তাহলে সেটা তার বংশধরদের কোন অংশ। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি পুরুষ-ধারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত শুধু তার পুরুষ সদস্যদের বংশধররাই ; আর স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী হয়ে থাকলে শুধু স্ত্রী সদস্যদের বংশধররা। যদি এরকম কোন কঠোর সীমারেখা না থেকে থাকে, তাহলে সমস্ত বংশধররাই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। এইসব সংজ্ঞা রচনার সময় ধরে নেওয়া হয়েছে যে বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারাই প্রযোজ্য হত। অন্যান্য সূত্র থেকেও মনে হয় যে কেবলমাত্র গোত্রের পুরুষ সদস্যদের বংশধররাই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। রোমানদের বংশবৃত্তান্ত থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বাস্তব তথ্যটা সিসেরোর চোখ এড়িয়ে গেছে যে, গোত্রের সদস্য হত তারাই, যারা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত কোন স্বীকৃত পূর্বপুরুষ থেকে কেবলমাত্র পুরুষ-ধারা অনুযায়ী উদ্ভূত হত। এ ব্যাপারটা ফেস্টাস আর ভ্যারো কিছুটা উল্লেখ করেছেন। ভ্যারো বলেছেন, কোন এমিলিয়াসের থেকে যে-সব পুরুষরা জন্ম নিত, তারা এমিলি নামে পরিচিত হত এবং গোত্রের সদস্যপদ লাভ করত। অর্থাৎ, গোত্রের সদস্য হওয়ার জন্য গোত্রীয় নাম ধারণকারী কোন পুরুষের সন্তান হিসাবে জন্মানোটা ছিল অপরিহার্য। তবে, গোত্রের সদস্যরা যে গোত্রীয় নাম ধারণ করতই—সে কথাটা সিসেরোও বলেছেন।

অভিজাত শ্রেণী আর সাধারণ জনগনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত একটা চালু আইন বাতিল করা সম্বন্ধে রোমান শাসক ক্যানুলিয়ুস (৪৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে তখন বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী। তিনি বলেছিলেন—কোন অভিজাত পুরুষ যদি কোন সাধারণ নারীকে বিবাহ করে, কিম্বা কোন সাধারণ পুরুষ যদি বিবাহ করে কোন অভিজাত নারীকে, তাতে ক্ষতিটা কী? কোন অধিকার তো পাল্টাবে না এর ফলে। সন্তানরা পিতার দিকেই যাবে।[১]

গোত্রীয় নামের হস্তান্তর থেকে নেওয়া একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে যে বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুসারে। কেইয়াস জুলিয়াস সিজারের বোন জুলিয়া বিবাহ করেছিল মার্কস অ্যাটিয়াস বলবাসকে। জুলিয়ার নাম থেকেই বোঝা যায় যে সে ছিল জুলিয়ান গোত্রের সদস্যা।[২] প্রথা অনুযায়ী তার কন্যা

১। লিভি, খণ্ড ৪, পরিচ্ছেদ ৪.

২। "কোন পরিবারে একটিমাত্র কন্যা থাকলে তাকে গোত্রের নাম অনুসারেই অভিহিত করা হত। যেমন সিসেরোর কন্যা টিউলিয়া, সিজারের কন্যা জুলিয়া, আগাস্টাসের কোন অক্টোভিয়া ইত্যাদি। বিবাহের পরও তাদের এই নামের কোন পরিবর্তন ঘটতো না। পরিবারে দুটি কন্যা থাকলে একজনকে বলা হত বড়, আর একজনকে ছোট। দুয়ের অধিক কন্যা থাকলে তাদেরকে চিহ্নিত করা হত জন্মের ক্রম অনুসারে। যেমন, প্রথমা (Prima), দ্বিতীয়া (Secunda), তৃতীয়া (Tertia), চতুর্থী (Quarta), পঞ্চমী (Quinta), ইত্যাদি। কখনও কখনও আদর করে টার্টুলা (Tertulla), কোয়ার্টিলা (Quartilla), কুইন্টিলা (Quintila) ইত্যাদি নামেও ডাকা হত তাদের

অ্যাটিয়া পিতার গোত্রীয় নামই গ্রহণ করে এবং অ্যাটিয়ান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। অ্যাটিয়ার সঙ্গে কেইয়াস অক্টোভিয়াসের বিবাহ হয়। তাদের পুত্রের নামও কেইয়াস অক্টোভিয়াস, প্রথম রোমান সম্রাট। প্রথা অনুযায়ী এই পুত্রও তার পিতার গোত্রীয় নামই গ্রহণ করে এবং অক্টোভিয়ান গোত্রের সদস্য হিসাবে পরিচিত হয়।[১] সম্রাট হওয়ার পর সে নিজের নামের সঙ্গে আরো দুটো শব্দ যোগ করে নেয়—সিজার অগাস্টাস।
রোমুলাসের আমল এবং তারও বহু আগের অজানা যুগ থেকে শুরু করে অগাস্টাসের আমল পর্যন্ত রোমান গোত্রগুলোর মধ্যে বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী। গোত্রের মধ্যেকার কোন স্বীকৃত পূর্বপুরুষের থেকে কেবলমাত্র পুরুষ-ধারা অনুযায়ী যারা জন্মগ্রহণ করত, তারাই গোত্রের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হত। কিন্তু কোন একজন আদি পূর্বপুরুষের বিশেষত যে পূর্বপুরুষের নাম অনুযায়ী পরবর্তী কালে সকলকার নামকরণ হয়, তাঁর বংশধারা অনুযায়ী প্রত্যেকের উদ্ভূত হওয়াটা অপ্রয়োজনীয়ই ছিল, কারণ সেটা অসম্ভব।
লক্ষ্য করা দরকার যে উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং আরও অসংখ্য ঘটনায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের বিবাহ হয়েছে গোত্রের বাইরের কারোর সঙ্গে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এটাই ছিল সাধারণ প্রথা।
রোমান গোত্রগুলোর সদস্যদের নিম্নলিখিত অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব থাকত :

১। গোত্রের মৃত সদস্যদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক অধিকার।
২। সার্বজনীন কবরস্থান।
৩। সার্বজনীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ; স্যাক্রা জেন্টিলিসিয়া (sacra gentilicia)
৪। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার বাধ্যবাধকতা।
৫। জমির ওপর যৌথ অধিকার।
৬। সহায়তা, প্রতিরক্ষা এবং আঘাতের পরিচর্যার ব্যাপারে পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব।
৭। গোত্রীয় নাম ধারণের অধিকার।
৮। গোত্রের মধ্যে বহিরাগতদের গ্রহণ করার অধিকার।
৯। গোত্রের প্রধানদের নির্বাচন ও বরখাস্ত করার অধিকার।

এবার এইসব বিষয়গুলো নিয়ে ক্রমানুসারে আলোচনা করা যাক।

......। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে গোত্রগুলোর নাম আর তার পরিবারগুলোর পদবী কখনও পরিবর্তিত হত না। পরিবারের সমস্ত শিশুই এ-সব নামের অধিকারী হত, এবং তাদের বংশধরদের ওপরেও এগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাতো। কিন্তু স্বাধীনতা হারানোর পর তাদের এইসব নামের অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং নামগুলো এলোমেলো হয়ে যায়।" অ্যাডাম্-এর "রোমান অ্যান্টিকুইটিস্", গ্লাসগো সংস্করণ, ১৮২৫, পৃঃ ২৭.

১। সিউটোনিয়াস, "ভিট, অক্টেভিয়ানাস" ৩-য় এবং ৪-র্থ পরিচ্ছেদ।

১। গোত্রের মৃত সদস্যদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক অধিকার

টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌স্‌-এর (Twelve Tables) আইন প্রবর্তিত হওয়ার (৪৫১ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ) পর, যে প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী কোন ব্যক্তির সম্পত্তিকে প্রমাণ ব্যতিরেকেই বণ্টন করে দেওয়া হত গোত্রের সদস্যদের মধ্যে, তা বাতিল হয়ে গেল এবং তার জায়গায় কার্যকরী হল উন্নততর নিয়মাবিধি। ঐ সময় থেকে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রথম দাবীদার হয়ে উঠল তাঁর সন্তানরা, আর মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে তার বংশের পুরুষ ধারা অনুযায়ী নিকটতম বংশধররা।[১] তার সন্তানদের মধ্যে যারা জীবিত থাকত, তারা সম্পত্তির সমান সমান ভাগ পেত, আর তার কোন পুত্র আগেই মারা গিয়ে থাকলে সেই পুত্রের সন্তানরা পিতার অংশটা ভাগ করে নিত সমান অংশে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সীমাবদ্ধ থাকত গোত্রের মধ্যেই। মৃত ব্যক্তির কন্যাদের এবং তার অন্যান্য নারী-বংশধরদের সন্তানরা ভিন্নগোত্রের সদস্য হত, ফলে ঐ সম্পত্তির ওপর তাদের কোন অধিকার থাকত না। দ্বিতীয়ত, মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে, একই নিয়ম অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা।[২] সগোত্রীয় জ্ঞাতি বলতে বোঝাতো সেইসব লোকদের, যারা মৃত ব্যক্তির আদি পূর্বপুরুষের থেকে বংশানুক্রমে পুরুষ-ধারায় জন্মেছে। এই রকম বংশধারা চালু থাকার ফলে তারা প্রত্যেকেই, নারী ও পুরুষ উভয়েই, একই গোত্রীয় নাম ধারণ করত এবং এইসব বংশ-ধরদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের চেয়ে নিকটতর হত। নিকটতম জ্ঞাতিরাই পেত অগ্রাধিকার। সবচেয়ে বেশি দাবী থাকত মৃত ব্যক্তির ভাই আর অবিবাহিতা বোনেদের ; তারপর বিবেচিত হত তার কাকা-জ্যাঠা আর অবিবাহিতা পিসীদের দাবী ; এইভাবে ক্রমানুসারে তার সমগ্র সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের দাবীই বিবেচনা করে দেখা হত। তৃতীয়ত, মৃতব্যক্তির কোন সগোত্রীয় জ্ঞাতি না থাকলে তার গোত্রের অন্যান্য সদস্যরাই উত্তরাধিকারী হত ঐ সম্পত্তির।[৩] এটা একটা লক্ষ্যনীয় ব্যাপার কেননা মৃত ব্যক্তির বোনদের সন্তানরা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত না, আর তার সগোত্রীয় এমন সব দূরে সম্পর্কের জ্ঞাতিরা অগ্রাধিকার পেত যাদের সঙ্গে ঐ মৃতব্যক্তির সম্পর্কের কোন হদিশ পাওয়াই অসম্ভব ছিল—তাদের সম্পর্কের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত গোত্রীয় নাম, অর্থাৎ তারা একই গোত্রীয় নাম ব্যবহার করত বলে বোঝা যেত যে তারা হচ্ছে একই বংশের লোক। তবে, এর কারণটাই একান্তই স্পষ্ট : মৃত ব্যক্তির বোনেদের সন্তানরা অন্য গোত্রের সদস্য হত, আর রক্তসম্বন্ধের থেকে গোত্রগত অধিকারের জোরও বেশি ছিল, কারণ গোত্রের সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখাটা ছিল একটা মৌলিক নীতি। টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌স্‌-এর

১। গেইয়াস, "ইনষ্টিটিউটস" খণ্ড ৩, পৃঃ ১ এবং ২। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীও তার সন্তান-দের সঙ্গে সম্পত্তির যুগ্ম-উত্তরাধিকারিণী হত।

২। ঐ, খণ্ড ৩, পৃঃ ৯.

৩। ঐ, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৭.

আইন থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা শুরু হত উল্টো দিক থেকে, এবং তিন ধরনের উত্তরাধিকারীরা ছিল উত্তরাধিকারের তিনটি ধারাবাহিক নিয়মেরই প্রতিনিধি ঃ প্রথমত, মৃত ব্যক্তির গোত্রের সদস্যরা ; দ্বিতীয়ত, তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা, যার মধ্যে তার বংশের সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী, বংশ-ধারা নির্ণয় করা শুরু হওয়ার পর থেকে ; আর তৃতীয়ত তার সন্তানরা এবং এই সময় থেকে শুধু মৃত ব্যক্তির সন্তানরা বাদে বাকি জ্ঞাতিদের কোন অধিকার থাকত না ঐ সম্পত্তির ওপর।

বিবাহের পর নারীরা তাদের ভোটাধিকার হারাত, বা বলা যায় সে অধিকারের পালা শেষ হত তাদের (Capital diminution)। এর ফলে তারা তাদের গোত্রগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। এক্ষেত্রেও কারণটা সহজবোধ্য। বিবাহের পরেও যদি সে জ্ঞাতিত্ব সূত্রে আগের গোত্রের কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হত, তাহলে সেই সম্পত্তি ঐ গোত্রের হাত থেকে চলে যেত তার স্বামীর গোত্রের দখলে। অবিবাহিতা বোনেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারত কিন্তু বিবাহিতা বোনেদের সে অধিকার ছিল না।

গোত্রের সুপ্রাচীন নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে আমরা যে-টুকু জানি, তার সাহায্যে সেই পুরনো দিনের দিকে চোখ ফেরালে বোঝা যায় যে সে সময় ল্যাটিন গোত্রগুলোতে বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী, সম্পত্তি ছিল একটা নগন্য ব্যাপার, আর তা গোত্রের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। এ অবস্থাটা ল্যাটিন গোত্রের আয়ুষ্কালের মধ্যেকার ঘটনা না-ও হয়ে থাকতে পারে, কেননা যখন তারা ইটালিতে থাকত, তখন থেকেই তাদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। রোমান গোত্রগুলো যে একটা প্রাচীন যুগ থেকে বিবর্তিত হয়েই ঐতিহাসিক রূপে উপনীত হয়েছিল, তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার গোত্রের সদস্যদের হাতে বর্তানোর ঘটনা থেকে।[১]

১। ক্লাডিয়ান গোত্রের দুটি পরিবার মার্সেলি আর ক্লডিদের মধ্যে মার্সেলি পরিবারের জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের পুত্রের সম্পত্তি নিয়ে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। মার্সেলি পরিবার ঐ সম্পত্তিটা দাবী করছিল পারিবারিক অধিকারের সূত্রে, আর ক্লাড পরিবার দাবী করছিল গোত্রগত অধিকারের সূত্রে। টুয়েল্‌ভ্‌ টেবল্‌স্‌-এর আইন অনুযায়ী মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাসটি কোন ইচ্ছাপত্র না করে এবং নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার ভূতপূর্ব প্রভুটি, কারণ তার দাসত্বমোচন করে দেওয়ার পর ঐ প্রভুটিই তার অভিভাবক হিসাবে কাজ করত। কিন্তু কোন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের পুত্রের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। ক্লডিরা ছিল অভিজাত পরিবার আর মার্সেলিয়া ছিল সাধারণ জনগণের অন্তর্গত, কিন্তু তার প্রভুর গোত্রের কোন গোত্রগত অধিকার অর্জন করত না। তবে, নিজের অভিভাবকের গোত্রীয় নামটা যে গ্রহণ করতে পারত। যেমন, সিসেরো-বর্ণিত মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসটির নাম ছিল টাইরো, তাকে ডাকা হত এম. টিউলিয়াস টাইরো নামে! সিসেরো যে ঘটনাটির কথা বলেছেন ("ডি ওরেটোর", I, ৩৯) এবং লঙ

নিয়েবুর লিখছেন : গোত্রের যে-সব সদস্য কোন জ্ঞাতিহীন ভাবে অথবা ইচ্ছাপত্র না করে মারা যেত, তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারটাই সব থেকে দীর্ঘদিন ধরে বজায় ছিল। কথাটা একান্তই সত্য, কেননা বিভিন্ন ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষিত হয়েছিল এবং এমনকি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল গেইয়াসেরও (অবশ্য এটাকে তিনি কোন ইতিহাস-বিষয়ক প্রশ্নের থেকে বেশি গুরুত্ব দেন নি)। গেইয়াসের পাণ্ডুলিপির এই অংশটা একেবারেই অস্পষ্ট ও দুষ্পাঠ্য হয়ে গেছে—এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।[১]

২। সার্বজনীন কবরস্থান।

বর্বর যুগের উচ্চপর্যায়ে গোত্রকেন্দ্রিক মনোভাব আগের যুগগুলোর থেকে অনেক জোরদার হয়ে উঠেছিল, আর তা ঘটেছিল সমাজের উন্নততর সংগঠন এবং মানসিক ও নৈতিক অগ্রগতির দরুনই? প্রতিটি গোত্রের একটা নিজস্ব কবরস্থান থাকত, যেখানে শুধুমাত্র ঐ গোত্রের মৃত সদস্যদেরই কবর দেওয়া হত। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে কবর দেওয়ার ব্যাপারে রোমানদের রীতি প্রথাগুলো বুঝতে সুবিধে হবে।

ক্লডিয়ান গোত্রের প্রধান আপ্পিয়াস ক্লডিয়াস, স্যাবাইনের রেগিলি শহর থেকে রোমে চলে আসেন রোমুলাসের আমলে। যথা সময়ে তাঁকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য করা হয়, এবং তিনি অভিজাত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হন। ক্লডিয়ান গোত্রের অন্যান্য সদস্যরাও তাঁর সঙ্গেই রোমে এসেছিল। এইসব সহচরের সংখ্যা ছিল খুবই বেশি, ফলে তাঁর রোমে আগমনটা হয়ে উঠেছিল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিউটোনিয়াস বলেছেন ক্লডিয়ান গোত্রের সদস্যদের জন্য রাষ্ট্র তাদেরকে জমি দিয়েছিল আনিও অঞ্চলে, আর দিয়েছিল দেবরাজ জুপিটারের মন্দিরের কাছে একটা কবরস্থান।[২] এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে সেই যুগে একটা সার্বজনীন কবরস্থানকে গোত্রের পক্ষে অপরিহার্য বলেই মনে করা হত। স্যাবাইন অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে এসে রোমানদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তোলার পর ক্লডিয়া তাদের গোত্রের জন্য পেয়েছিল অনেকটা জমি আর একটা কবরস্থান। রোমান গোত্রগুলোর সঙ্গে তাদেরকে সমমর্যাদার

(স্মিথ-এণ্ড "ডিকশনারী অফ গ্রীক অ্যাণ্ড রোমান অ্যান্টিকুইটিস, প্রবন্ধ-গোত্র")এবং নিয়েবুর-ও যে ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার সমাধান কিভাবে করা হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। তবে নিয়েবুর বলেছেন, সিদ্ধান্তটা সম্ভবত ক্লডিদের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল (হিস্ট্রি অফ রোম, I, ২৪৫, 'টীকা')। ক্লডিরা কিভাবে ঐ দাবী তুলতে পারে, তা নির্ধারণ করা খুবই মুস্কিল। মার্সেলিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, তবে আইনগত ব্যাখ্যার সাহায্যে অভিভাবকত্বগত অধিকারকে বিস্তৃত করা হয়ে থাকলে তারা ঐ দাবী তুলতে পারত বটে। এই ঘটনাটা খুবই লক্ষ্যনীয়, কেননা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক অধিকারকে গোত্রের মধ্যে কত সযত্নে রক্ষা করা হত, তা এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

১। হিস্ট্রি অফ রোম, i, ২৪২.

২। মিউটোনিয়াস, "ভিট. টাইবেরিয়াস", ১ম পরিচ্ছেদ।

অধিকারী করে তোলার জন্যই এগুলো দেওয়া হয়েছিল। এই লেনদেনের মধ্যে তৎকালীন একটা প্রথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের সামনে।'

জুলিয়াস সিজারের আমলেও গোত্রগত স্মৃতিস্তম্ভের বদলে পারিবারিক স্মৃতিস্তম্ভ বসানোর রীতিটা পুরোপুরিভাবে চালু হয়নি। কুইন্টিলাস ভারুম-এর ঘটনা থেকে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। জার্মানীর যুদ্ধে ভারুমের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। আত্মহত্যা করেন ভারুম। তাঁর মৃতদেহ শত্রুদের হাতে পড়ে। প্যাটারকিউলাস বলেছেন—বর্বর শত্রুরা ভারুমের অর্ধদগ্ধ শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে, মাথাটা কেটে ফেলে এবং সেটা নিয়ে যায় ম্যারোবোডুম-এর কাছে। তিনি আবার ঐ কাটা-মাথাটা পাঠিয়ে দেন সিজারের কাছে। অবশেষে তাঁর গোত্রের কবরস্থানে সমাধিস্থ হয় ভারুমের ছিন্ন শির।[১]

সিসেরো তাঁর আইন বিষয়ক গ্রন্থে কবর দেওয়ার ব্যাপারে সে আমলের প্রথার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে: কবরস্থান এতই পবিত্র যে গোত্রের পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কাউকে কবর দেওয়া হলে তা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের আমলে এ. টর্কোয়াটাস পপিলিয়ান গোত্রের মৃত সদস্যদের কবর দেওয়ার সময় ঐ-সব পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান পালন করার ব্যাপারটাকে একটা বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত করেছিলেন।[২] এ থেকে বোঝা যায় যে পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান পালন করে মৃতদেহে কবর দেওয়াটা ছিল একটা ধর্মীয় কর্তব্য, এবং সম্ভব হলে মৃত ব্যক্তির নিজস্ব গোত্রের জমিতে তাকে সমাধিস্থ করাটাই ছিল প্রচলিত বিধি। তাছাড়া মনে হয় যে, টুয়েল্‌ভ্ টেব্‌ল্‌স্-এর আইন বলবৎ হওয়ার আগে মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে দাহ করা ও কবর দেওয়া—উভয় পদ্ধতিই চালু ছিল। টুয়েল্‌ভ্ টেব্‌ল্‌স্-এর আইনে শহরের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করা বা কবর দেওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।[৩] বেশ কয়েকশো শবাধার ধারণক্ষম কবরস্থান বানানো হত গোত্রের ব্যবহারের জন্য। সিসেরোর আমলেই গোত্রের ক্ষমতা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবে তার একান্ত নিজস্ব কিছু কিছু প্রথা তখনও টিকে ছিল—যেমন এই সার্বজনীন কবর-স্থানের প্রথাটা। গোত্রগত স্মৃতিস্তম্ভের বদলে তখন স্থাপিত হচ্ছিল পারিবারিক স্মৃতি-স্তম্ভ, কারণ প্রাচীন গোত্রের মধ্যেকার পরিবারগুলো ক্রমশই পুরোপুরি স্বশাসিত হয়েছিল। তাসত্ত্বেও, কবর দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাচীন গোত্রীয় প্রথা তখনও নানা-ভাবেই টিকে ছিল, ক্রিয়াশীল ছিল।

৩। সার্বজনীন পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান; স্যাক্র্যা জেন্টিলিসিয়া

রোমানদের 'স্যাক্রা' হচ্ছে আমাদের পবিত্র উপাসনার সমতুল। এই উপাসনা যৌথভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে করত রোমানরা। কোন গোত্র কর্তৃক আয়োজিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে বলা হত 'স্যাক্রা প্রাইভেটা' কিম্বা 'স্যাক্রা জেন্টিলিসিয়া।' নির্দিষ্ট সময়ে

১। "ভেলেইয়ান প্যাটারকিউলাস", ii, ১১৯.

২। "ডি লেগ", ii, ২২.

৩। সিসেরো, "ডি লেগ", ii, ২৩.

গোত্রগুলো নিয়মিত এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করত।[১] এমন অনেক ঘটনার কথা জানা গেছে, যেখানে গোত্রের লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে এইসব আচার-অনুষ্ঠানের ব্যয় বহন করাটা দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। নানান ঘটনা মারফৎ লোকে এগুলো পালন করার অধিকার অর্জন করত কিম্বা তা হারাত, যেমন বিবাহ বা কোন গোত্রের মধ্যে গৃহীত হওয়া মারফৎ।[২] নিয়েবুর লিখেছেন, "রোমান গোত্রগুলোর সদস্যদের যে নানান সার্বজনীন পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান থাকত, তা সর্বজনবিদিত। নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন বলিদানের ব্যবস্থাও ছিল।"[৩] যৌথ এবং ব্যক্তিগত, উভয় ধরনের আচার-অনুষ্ঠানেরই নিয়ন্ত্রণভার পুরোপুরিভাবে ন্যস্ত ছিল যাজকদের হাতে, কোনরকম অ-যাজকীয় হস্তক্ষেপ চলত না সেখানে।[৪]

রোমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো মূলত গোত্রের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, পরিবারের সঙ্গে নয়। যাজকদের, কিউরিয়নদের (curiones) এবং শাকুনতত্ত্ববিদদের (augurs) একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আর এদের সবার পরিচালনার একটা পূজাপদ্ধতি—এগুলো যথা সময়ে গড়ে উঠেছিল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে, এই গোটা ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট সহিষ্ণু এবং অবাধ। যাজকত্ব ব্যাপারটা ছিল মূলতঃ নির্বাচনভিত্তিক।[৫] প্রত্যেক পরিবারের প্রধানরাও নিজ নিজ পরিবারের যাজক বা পুরোহিত হিসাবে কাজ করত। গ্রীক আর রোমানদের গোত্রগুলো[৬] হচ্ছে এমন এক ঝর্ণাধারা, যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে ধ্রুপদী দুনিয়ার আশ্চর্য পুরাণ-সম্ভার।

পুরনো আমলের রোমে বহু গোত্র তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য নিজেদের আলাদা আলাদা নিয়মাবলী (sacellum) রচনা করত। অনেক গোত্রে আবার বিশেষ বিশেষ বলি দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। এই প্রথা প্রজন্ম-পরম্পরায় চালু থাকত, আর তা পালন করাকে বাধ্যতামূলক বলেই মনে করত তারা। যেমন, দেবী মিনার্ভার উদ্দেশে বলির আয়োজন করত নাউটি গোত্রের লোকেরা, হারকিউলিসের উদ্দেশে বলি দিত ফ্যাবি-রা, এবং হোরেশিয়াস তার নিজের বোনকে হত্যা করেছিল বলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি দিত হোরেশি-রা।[৭] আমাদের আলোচনার পক্ষে এটুকু

১। গোত্রগুলোর কিছু কিছু নিজস্ব পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান ('স্যাক্রা জেন্টিলিনিরা') থাকত, যেগুলো পালন করার ব্যাপারে প্রত্যেকটি সদস্যই বাধ্য থাকত। গোত্রের যারা জন্মসূত্রে সদস্য, গৃহীত হওয়ার সূত্রে সদস্য—তারা কেউই এ নিয়মের বাইরে ছিল না। কোন ব্যক্তি তার গোত্র থেকে রেহাই দেওয়া হত এবং গোত্রীয় অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা হারাত সে।—স্মিথ-এর "ডিকশনারী অফ গ্রীক ·····অ্যানটিকুইটি, জেনস্।"

২। সিসেরো, "প্রো ডোমো", পৃঃ ৩.

৩। "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৪১.

৪। সিসেরো, "ডি লেগ", ii, ২৩.

৫। "ডায়োনিসিয়াস", ii, ২২.

৬। ঐ, ii, ২১.

৭। নিয়েবুর, "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৪১.

জানাই যথেষ্ট যে, নিজেদের সংগঠনের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে প্রতিটা গোত্রের নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছিল।

৪। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার বাধ্যবাধকতা

গোত্রীয় বিধি-নিষেধগুলো প্রথা হলেও, সেগুলো ছিল আইনের মতোই শক্তিশালী। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার বাধ্যবাধকতাটা ছিল এ-রকমই একটা বিধি। এটা যে পরবর্তীকালে একটা আইনগত বিধিতে পরিণত হয়েছে—এমন কোন নজির পাওয়া যায় না। কিন্তু এটাই যে ছিল গোত্রের নিয়ম, তার প্রমাণ নানাভাবেই পাওয়া যায়। রোমানদের বংশবৃত্তান্ত থেকেই জানা যায় যে তারা নিজ গোত্রের বাইরের কারুকে বিবাহ করত (এর দৃষ্টান্ত তো আমরা আগেই দিয়েছি)। আমরা আগেই দেখেছি যে, রক্তসম্বন্ধযুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ এড়ানোর জন্যই প্রাচীনকালে এই রীতিটা চালু করা হয়েছিল। বিবাহের পর মেয়েরা তাদের নিজেদের গোত্রের যাবতীয় অধিকার হারাত, কোন ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম ঘটত না। আসলে এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে, অর্থাৎ তার পিতার গোত্র থেকে স্বামীর গোত্রে সম্পত্তির হস্তান্তর ঠেকানোর জন্যই এ নিয়ম চালু করা হয়েছিল। এই একই কারণে কোন নারীর সন্তানরা তাদের মামা বা মাতামহের সম্পত্তির ওপর কোনরকম উত্তরাধিকার পেত না। যেহেতু মেয়েদের বিবাহ হত নিজেদের গোত্রের বাইরে, তাই তাদের সন্তানরা নিজেদের পিতার গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হত এবং ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে কোনরকম উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত করা চলত না।

৫। জমির ওপর যৌথ অধিকার

বর্বর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জমির ওপর যৌথ অধিকার ব্যাপারটা এতই চালু ছিল যে ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই নিয়মের খোঁজ পেয়ে আমরা আদৌ বিস্মিত হই না। মোট জমির কিছুটা অংশ বহু প্রাচীন কাল থেকে লোকদের ব্যক্তিগত অধিকারে থাকত। এ ব্যাপারটা তাদের মধ্যে বরাবরই চালু ছিল। তবে সম্ভবত জমি ভোগদখলের অধিকার থেকেই এর সূত্রপাত হয়েছিল। এ-রকম অধিকারের কথা আমরা আগে অনেক বারই বলেছি। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায় থেকেই চালু ছিল এ ব্যাপারটা।

অ-মার্জিত ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিটা গোষ্ঠীর কিছু যৌথ বা এজমালি জমি থাকত, কিছু জমি থাকত একেকটা গোত্রের যৌথ অধিকারে, আবার কিছু জমি থাকত পরিবারগুলোর হাতে।

রোমুলাসের আমলেই রোমে ব্যক্তিগতভাবে জমি বরাদ্দ করা চালু হয়, পরে সেটাই সাধারণ নিয়ম হয়ে ওঠে। ভ্যারো এবং ডায়োনিসায়াস উভয়েই বলেছেন যে, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য রোমুলাস দুই 'জুগেরা' (প্রায় সোয়া দুই একর) করে জমি বরাদ্দ করেছিলেন।[১] পরবর্তীকালে নুমা এবং সার্ভিয়াস টিউলিয়াসও এইভাবে জমি বণ্টন করতেন বলে জানা গেছে। এইভাবে জমি বণ্টন করা থেকেই জমির ওপর পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিকানা শুরু হয়েছিল। সহজেই বোঝা যায় যে এ-রকম বণ্টন চালু করার

১। ভ্যারো, "ডি রে রাস্টিকা", খণ্ড ১, ১০-ম পরিচ্ছেদ।

জন্য দরকার ছিল একটা সুস্থিত জীবনযাত্রা আর যথেষ্ট উন্নত বুদ্ধিমত্তা। সরকার শুধু ঐ জমির পরিমাপই নির্দিষ্ট করত না, সেইসঙ্গে তা বণ্টন করার কাজটাও করত। নিজের নিজের কাজের ফল হিসাবে লোকেরা জমি ভোগদখলের যে অধিকার লাভ করত, তার থেকে এটা ছিল একেবারেই আলাদা। জমির ওপর পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিকানা ধারণাটা অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিল, আর জমির ওপর এ-রকম পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয়েছিল সভ্যতার যুগে এসে। তবে, রোমান জনগণের হাতে আগে যে সব এজমালি জমি ছিল, সেগুলোকেই ভাগ ভাগ করে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি করা হয়। সভ্যতার যুগ শুরু হওয়ার পর, লোকের হাতে ব্যক্তিগত মালিকানায় যে-সব জমি ছিল, সেগুলো ছাড়া কিছু কিছু জমি তখনও পর্যন্ত গোত্র, কিউরিয়া আর গোষ্ঠীগুলোর যৌথ অধিকারে রয়ে গিয়েছিল।

মমসেন বলেছেন, "সুপ্রাচীন কালে রোমের গোটা অঞ্চলটা কতকগুলো গোত্র বা বংশভিত্তিক জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রথম গ্রামীণ বিভাগগুলো (tribus rusticae) সৃষ্টি করার সময় এইসব জেলার ভিত্তিতেই তা গড়া হয়েছিল…। পরবর্তীকালে যে সব জেলা সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলোর নাম নির্ধারিত হয়েছিল আঞ্চলিক ভিত্তিতে। কিন্তু ঐ পুরনো জেলাগুলোর নাম সেভাবে নির্ধারিত হয় নি, নির্ধারিত হয়েছিল গোত্র বা বংশের নাম অনুযায়ী।[১]

প্রতিটি গোত্রের এক একটা নিজস্ব জেলা থাকত, এবং প্রয়োজনের খাতিরে তারা সেখানেই বসবাস করত। এই ব্যাপারটা ছিল একটা আগাম পদক্ষেপ, যদিও গোত্রগুলোর এভাবে পৃথক পৃথক অঞ্চলে বসবাস করাটা শুধু গ্রামীন জেলাগুলোতেই চালু ছিল না, সারা রোমেই চালু ছিল এই রেওয়াজ। মমসেন আরও বলেছেন: "যেহেতু প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব কিছুটা জমি থাকত, তাই পরিবার-সমষ্টি বা গ্রামের এক্তিয়ারেও থাকত নিজস্ব কিছুটা জমি। পরে আমরা দেখতে পাবো যে যথেষ্ঠ সম্প্রতিকাল পর্যন্ত এই জমির বিলি-বন্দোবস্ত করা হত ঠিক পারিবারিক জমিগুলোর বিলিবন্দোবস্তের পদ্ধতিতেই, অর্থাৎ, যৌথ অধিকারের নীতির ভিত্তিতে……। তবে, এই পরিবার বা বংশসমষ্টিকে কিন্তু প্রথম থেকে কোন স্বাধীন বা পৃথক সামাজিক সংগঠন বলে মনে করা হত না, বরং গোটা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর (cavitas populi) অখণ্ড অংশ বলেই ধরা হত এগুলোকে। পরিবার বা বংশসমষ্টি বলতে বোঝাতো একই মূল বংশ থেকে উদ্ভূত মানুষদের কয়েকটি গ্রামের মোট জনগোষ্ঠীকে, যাদের ভাষা ও আদব কায়দা একই, যারা সকলে একই আইন মেনে চলতে এবং প্রয়োজনের সময় একই-রকম আইনগত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে, আর আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সময় যৌথ-ভাবে কাজ করতে বাধ্য।"[২]

১। "হিষ্ট্রি অফ রোম", i, ৬২. তিনি এইসব জেলার নাম উল্লেখ করেছেন—ক্যামিল্লি, গ্যালেরী, লেমোন্নি, পোল্লি, পুপিন্নি ভলতিন্নি, এমিল্লি, কর্ণেলী, ফ্যাবী, হোরেশি, মেনেন্নি, প্যাপিরী, রোমিলী, সেগী, ভেচুরী।—ঐ, পৃঃ ৬৩.

২। "হিষ্ট্রি অফ রোম", i, ৬৩.

মমসেন অথবা তাঁর রচনার অনুবাদক এখানে গোত্রের (gens) জায়গায় পরিবার বা বংশসমষ্টি (clan) শব্দটা ব্যবহার করেছেন, আবার অন্যত্র গোষ্ঠীর (tribe) জায়গায় ব্যবহার করেছেন প্রদেশ বা অঞ্চল (canton) শব্দটা। এই ব্যাপারটা কিছুটা অদ্ভুত কেননা এইসব সুপরিচিত সংগঠনের জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ লাতিন ভাষায় আছে। মমসেনের মতে, রোম নগরী স্থাপিত হওয়ার পূর্ববর্তী লাতিন গোষ্ঠী বলতে সেগুলোকেই বোঝাত, যেখানে পরিবার, গোত্র এবং গোষ্ঠীর হাতে কিছুটা করে জমি থাকত। ঐ সব গোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন। দেখা যায়, ইরোকোয়াদের সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ট সাদৃশ্য ছিল কেননা লাতিন গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক সংগঠনের এই বিভাগগুলো হচ্ছে গোত্র, গোষ্ঠী আর মিত্রসংঘ।[১] ভ্রাতৃত্বের নাম মমসেনের লেখায় নেই, তবে এটারও অস্তিত্ব ছিল বলেই মনে হয়। উল্লিখিত পরিবারগুলো ছিল খুব সম্ভবত একাধিক পরিবারের সমন্বয়। এমনটা হতেই পারে যে ওগুলো ছিল জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ যুক্ত কিছু পরিবারের সমন্বয়, যাদের একটা বাসগৃহ থাকত এবং পারিবারিক জীবনে যারা সাম্যবাদ মেনে চলত।

১। "কোন বংশসমষ্টির জন্য যেমন একটা স্থায়ী স্থানীয় এলাকা দরকার হত, তেমনই এইসব প্রদেশ বা অঞ্চলের জন্যও দরকার হত একটা স্থায়ী স্থানীয় এলাকা। কিন্তু ঐ-সব বংশসমষ্টির সদস্যরা, বা অন্যভাবে বললে, ঐ-সব প্রদেশ বা অঞ্চলের বাসিন্দারা যেহেতু গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত, তাই প্রদেশ বা অঞ্চলের নিজস্ব এলাকা বা যৌথভাবে বসবাসের এলাকা কোন শহরে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। শহরগুলো ছিল সার্বজনীন সমাবেশের জায়গা, সেখানে থাকত বিচারালয়, সমগ্র অঞ্চলের সার্বজনীন আশ্রয়স্থল। প্রতি আটদিন অন্তর তারা এখানে মিলিত হত পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও আমোদ-প্রমোদ করার জন্য। আবার যুদ্ধের সময় অধিক নিরাপত্তার জন্য নিজেদের গোরু-ছাগল সহ তারা আশ্রয় নিত এখানেই। এমনি সময়ে কিন্তু এই জায়গাটাতে কেউ বসবাস করত না, বা বড়জোর মুষ্টিমেয় জনা কয়েক থাকত...। কোন সুরক্ষিত জায়গায় নিজেদের একটা মিলনস্থল এবং কিছু বংশসমষ্টির সমন্বয়ে এই প্রদেশ বা অঞ্চলগুলোই গড়ে তুলেছিল একটা প্রাথমিক রাজনৈতিক ঐক্য, আর তা থেকেই শুরু হয়েছে ইতালিয় ইতিহাসের পথচলা...। প্রাচীনকালে এই সবকটা প্রদেশই ছিল রাজনৈতিক ভাবে সার্বভৌম। প্রতিটা প্রদেশের শাসক হিসাবে কাজ করত সেই প্রদেশের রাজা তাকে সাহায্য করত বয়স্কদের পরিষদ আর সৈনিক-পরিষদ। তা সত্ত্বেও, জন্মসূত্র এবং ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাথিত্বের অনুভূতিটা তাদের সকলকার মধ্যে শুধু ছড়িয়েই ছিল না, সেইসঙ্গেই এই অনুভূতিটা মূর্ত হয়ে উঠেছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও। এই প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে সমস্ত লাতিন প্রদেশগুলোর স্থায়ী মিত্রসঙ্ঘ।"—হিস্ট্রি অফ রোম", i, ৬৪-৬৬, পরিষদ ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে রাজারাই শাসন করত প্রদেশগুলো—এই বক্তব্যটা আদৌ সত্য নয়, ফলে এ থেকে একটা ভ্রান্ত ধারণাই সৃষ্টি হয়। ধরেই নেওয়া যায় যে সমর-নায়ক

৬। সাহায্য, প্রতিরক্ষা এবং আঘাতের পরিচর্যার ব্যাপারে পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব

বর্বরতার যুগে, ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের ওপরেই নির্ভর করতে হত। কিন্তু রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পর গোত্রের সদস্যরা পরিণত হল নাগরিকে, এবং তখন থেকে তাদের যে কোন ব্যক্তিগত অধিকারের ব্যাপারে গোত্র কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই তারা আইন ও রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হতে পারত। নতুন ব্যবস্থার আমলে এসে প্রাচীন ব্যবস্থার যে-সব বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এটা তার অন্যতম। তাই পুরনো দিনের লেখকদের রচনায় এই পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে তার অর্থ এই নয় যে প্রাচীন আমলে গোত্রের সদস্যরা পরস্পরের প্রতি এইসব দায়-দায়িত্ব পালন করত না। বরং গোত্রীয় সংগঠনের নীতিগুলোকে বিচার-বিবেচনা করে দেখলে এই সিদ্ধান্তই মানতে হয় যে এগুলো ছিল তাদের অবশ্য পালনীয় দায়-দায়িত্ব। ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার পরও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এইসব রীতি পালিত হতে দেখা গেছে। আপিয়াস ক্লডিয়াস যখন কারারুদ্ধ হন (৪৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ), তখন তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কেইয়াস ক্লডিয়াস সহ ক্লডিয়ান গোত্রের সমস্ত সদস্যদের বিলাপ করতে শোনা গিয়েছিল।[১] গোত্রের কোন সদস্য দুর্দশাগ্রস্ত বা অপমানিত হলে, অন্যান্য প্রত্যেকেই তা অনুভব করত এবং সেই দুর্দশা বা অপমান তাদের সকলের বুকেই বাজতো। নিয়েবুর বলেছেন কার্থেজের দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় "শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া সাথীদের মুক্ত করার জন্য গোত্রের সদস্যরা সকলে মিলে মুক্তিপণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের নির্দেশে তারা তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। এই পারস্পরিক দায়িত্ববোধটা ছিল গোত্রের একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।"[২] ভেইয়েনশিয়ায় ধ্বংসকার্য চালানোর কারণে ক্যামিলাসের বিচারের জন্য আহূত হয়েছিল গণ-আদালত। বিচারের আগের দিন সে নিজের বাড়িতে তার গোষ্ঠীর লোকদের আর নিজের পোষ্যদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের পরামর্শ চায়। তারা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে যে, তার জন্য যে জরিমানা ধার্য করবে গণ-আদালত, তা তারা সকলে মিলে যোগাড় করে দেবে, কিন্তু তাকে নির্দোষ প্রমাণ

একটা নির্বাচনভিত্তিক পদের অধিকারী হত, এবং নির্বাচকমণ্ডলী ইচ্ছে করলে তাকে বরখাস্তও করতে পারত। এছাড়া তার আর কোন অসামরিক কার্যকলাপের অধিকার থাকত বলে মনে করার মতো সঙ্গত কারণ নেই। অতএব, এ থেকে আবশ্যিকভাবে না হলেও যুক্তিসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, গোষ্ঠীগুলোকে শাসন করত বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটা পরিষদ এবং একটা সৈনিক-পরিষদ, আর তাদেরকে সাহায্য করত একজন সামরিক সর্বাধিনায়ক, যে শুধু সামরিক কর্তব্য পালন করা ছাড়া অন্য কোন কাজের অধিকারী ছিল না। অর্থাৎ এটা ছিল তিন-শক্তির সরকার যা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে সর্বত্রই দেখা গেছে, এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের চরিত্র আবশ্যিকভাবেই গণতান্ত্রিক ধরণেরই হয়ে থাকে।

১। লিভি, vi, ২০.

২। হিস্ট্রি অফ রোম, i, ২৪২.

করা সম্ভবপর নয়।[১] এইসব ঘটনার মধ্যে গোত্রের সদস্যদের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব-বোধের ছবি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। নিয়েবুর আরও বলেছেন যে, গোত্রের দুঃস্থ সদস্যদের সাহায্য করার দায়িত্ব রোমান গোত্রের সদস্যদের থাকত।[২]

৭। গোত্রীয় নাম ব্যবহারের অধিকার।

গোত্রের চরিত্রই এই অধিকারের জন্ম দিয়েছিল। গোত্রের পুরুষ সদস্যদের ছেলে-মেয়েরা জন্মসূত্রেই গোত্রের সদস্যপদ লাভ করত এবং অধিকার করত গোত্রীয় নাম ব্যবহারের অধিকার। দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর গোত্রের সদস্যদের পক্ষে তাদের আদি পূর্বপুরুষকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং পরবর্তীকালে এইভাবেই গোত্রের মধ্যেকার বিভিন্ন পরিবারগুলির পক্ষেও পরবর্তীকোন সাধারণ পূর্বপুরুষের সূত্র ধরে নিজেদের সম্পর্ক নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অক্ষমতা তাদের বংশধারার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে, তবে এ থেকে এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে ঐ পরিবারগুলো কোন এক আদি পূর্বপুরুষের থেকে সৃষ্ট নয়। প্রতিটা মানুষ গোত্রের মধ্যেই জন্ম নিতো এবং তারা প্রত্যেকেই গোত্রের স্বীকৃত সদস্যদের সূত্র ধরে নিজের নিজের বংশধারা চিহ্নিত করতে পারত—এটুকুই ছিল তাদের গোত্রীয় বংশধারার সদস্য হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ, আর এটাই গোত্রের সমস্ত সদস্যের মধ্যেকার রক্তের সম্পর্ককে প্রমাণিত করত। কিন্তু নিয়েবুর সহ[৩] কয়েকজন পর্যবেক্ষক গোত্রের মধ্যেকার পরিবার গুলোর মধ্যে কোনরকম রক্তের সম্পর্ক থাকত বলে স্বীকার করেন নি, কারণ তারা কোন এক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে নিজেদের সকলকার উদ্ভূত হওয়ার প্রমাণ দাখিল করতে পারত না। এর অর্থ হচ্ছে গোত্র ছিল একটা পুরোপুরি জোড়াতাড়া দেওয়া সংগঠন, আর তাই তা টিকে থাকতে পারে নি। সিসেরোর সংজ্ঞা থেকে নিয়েবুর গোত্রের সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকার বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত খাড়া করেছেন, তা মোটেই টেকসই নয়। কারুর গোত্রীয় নাম ব্যবহার করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললে এ কথাই বলতে হয় যে কোন এক আদিপুরুষ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ওপর এ অধিকার নির্ভর করত না, নির্ভর করত ঐ গোত্রের মধ্যেকার কিছু সংখ্যক সর্বজনস্বীকৃত পূর্ব-পুরুষ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ওপর। বিভিন্ন প্রজন্মের যে সদস্যদের মারফৎ বংশ-তালিকা তৈরী করা হয়ে থাকে, তাদের ব্যাপারে কোন লিখিত নথি না থাকলে অনেক সদস্যর নামই মানুষ কাল ক্রমে ভুলে যায়। একই গোত্রের মধ্যেকার কয়েকটা পরিবারে হয়ত তাদের কোন একজন সাধারণ পূর্বপুরুষের নাম ভুলে যেতেও পারে, কিন্তু তার

১। লিভি, v, ৩২.
২। "হিস্ট্রি অফ রোম," i, ২৪২ : ডায়োনিসায়াসের রচনা থেকে উদ্ধৃতি, ii, ১০
৩। "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৪২.

অর্থ এই নয় যে তারা ঐ গোত্রের কোন সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয় নি।[১] পুরুষ ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয় শুরু হওয়ার পর গোত্রগুলোর প্রাচীন নাম বদলে যেতে থাকে। আগে স্বাভাবিকভাবেই এইসব গোত্রের নামকরণ করা হত কোন পশু[২] বা জড় পদার্থের নামে।
তার বদলে শুরু হল বিভিন্ন ব্যক্তির নামে গোত্রের নামকরণ করার প্রথা। গোত্রের ইতিহাসে অত্যন্ত বিশিষ্ট কিছু কিছু ব্যক্তি গোত্রগুলোর আদিপুরুষ হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে এবং তাদের নামেই নামকরণ করা হয় গোত্রগুলোর। আমি অন্যত্র বলেছি যে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে গোত্রগুলো এদের বদলে অন্য কিছু লোকের নামে নিজেদের নামকরণ করত। এলাকাগত বিভাজনের ফলস্বরূপ যখন গোত্রগুলোও বিভক্ত হয়ে পড়ত, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার একটা অংশ গ্রহণ করত নতুন কোন নাম। কিন্তু যে জ্ঞাতিত্ব ছিল গোত্রের ভিত্তিস্বরূপ, এই নামের পরিবর্তনের ফলে তা আদৌ বিঘ্নিত হত না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রোমান গোত্রগুলোর বংশধারা (বিভিন্ন সময়ে নামের পরিসহ) এমন একটা যুগ থেকে শুরু হয়েছিল, যখন লাতিন, গ্রীক এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষী মানুষরা ছিল একই গোষ্ঠীভুক্ত (যার আদি উৎস আমাদের জানা নেই)—তাহলে রোমান গোত্রগুলোর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। যে কোন যুগেই, কোন ব্যক্তির গোত্রীয় নাম ব্যবহার করার অধিকার হারানোটা ছিল একটা প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার। আর সে কারণেই সে যে তার গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের মতো একই বংশের সন্তান—তার সবথেকে বড় প্রমাণ ছিল এই গোত্রীয় নাম ব্যবহার করার অধিকারটাই। গোত্রীয় বংশধারা ভঙ্গ করার একটাই মাত্র উপায় ছিল—ভিন্ন বংশের কোন ব্যক্তিকে গোত্রের মধ্যে গ্রহণ করা। নিয়েবুর যদি এ কথা বলতেন যে, গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে যে রক্তের সম্বন্ধ থাকত, সেই সম্বন্ধ তাদের কারো কারো মধ্যে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ত—তাহলে আপত্তির কিছু

১। "তাসত্ত্বেও, রোমানদের কাছে রক্তের সম্পর্কই ছিল কোন বংশের সদস্যদের মধ্যেকার এবং আরও বেশি করে কোন পরিবারের সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তিস্বরূপ। আর, তাদের মধ্যেকার জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ককে বজায় রাখার সম্বন্ধযুক্ত বিষয় ছাড়া ঐ সব বংশ বা পরিবারের আর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রোমান জনগোষ্ঠীর ছিল না।"—মমসেন-এর "হিস্ট্রি অফ রোম," i, ১০৩.

২। একটা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য এখানে উল্লেখ করা যায়। আর্গস-এর ক্লাইস্থেনিস সিসিওন-এর তিনটি ডোরিয়ান গোষ্ঠীর নাম বদলে দিয়েছিলেন। একটা গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন হায়াত, অর্থাৎ একবচনে "একটি শুয়োর; আরেকটার নাম দেন ওনিতা, অর্থাৎ "গাধা", আর তৃতীয়টার নাম দেন কোরিতা, অর্থাৎ "শূকরছানা।" সিসিওনিয়ানদের অপমানিত করার জন্যই এইসব নাম দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এবং তার পরে আরও ষাট বছর এইসব নামই বহাল ছিল। এইভাবে জীবজন্তুদের নামে গোষ্ঠীর নামকরণ করার ধারণাটা কি ঐতিহ্যগতভাবেই পাওয়া?—দ্রষ্টব্য, গ্রোটে-র "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", iii; ৩৩, ৩৬.

ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যেকার যাবতীয় সম্বন্ধকে অস্বীকার করলে গোত্র শুধুমাত্র কিছু লোকের একটা সমষ্টিতে পরিণত হয়, তার মধ্যে কোনরকম ঐক্যবন্ধন থাকে না, এবং এর ফলে সেই মৌলিক নীতিরই বিরোধিতা করা হয় যার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল গোত্র আর যে নীতির সাহায্যে পুরো তিনটে ঐতিহাসিক যুগ ধরে সেটা টিকে থাকতে পেরেছিল।

অন্যত্র আমি বলেছি যে, গোত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল রক্তসম্বন্ধের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার রক্তসম্বন্ধযুক্ত সমস্ত মানুষকে অল্প কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা যেত এবং বহু যুগ ধরে তারা ঐ সব ভাগগুলোর মধ্যেই নিজেদের বংশধারা বজায় রাখতে পারত। দুজন ব্যক্তির প্রকৃত পূর্বপুরুষ যতই প্রাচীন সময়ের হোক না কেন, তাদের দুজনকার মধ্যেকার সম্বন্ধসূত্র খুঁজে বার করা মোটেই কঠিন ছিল না। পাঁচশ সদস্য বিশিষ্ট কোন ইরোকোয়া গোত্রের প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের সম্পর্ক থাকে, এবং প্রত্যেকেই অন্যদের সঙ্গে নিজের কী সম্পর্ক, তা জানে বা খুঁজে বের করতে পারে। অর্থাৎ, প্রাচীন কালে গোত্রগুলোর মধ্যে জ্ঞাতিত্বের সম্বন্ধটা বরাবরই বজায় থাকত। একপতিপত্নীক পরিবার প্রথা চালু হওয়ার পর জ্ঞাতিত্বের এক নতুন ও একেবারে ভিন্ন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। এই ব্যবস্থায় একই বংশের ভিন্ন ভিন্ন পরিবার জাত সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক কিছুদিনের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যায়। লাতিন আর গ্রীক গোষ্ঠীগুলো যখন ঐতিহাসিক যুগে পদার্পণ করে, তখন তাদের মধ্যে এই ব্যবস্থাই চালু ছিল। খুব সম্ভবত তার আগে পর্যন্ত তাদের মধ্যে চালু ছিল তুরানিয় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ক সহজেই জানা যেত।

গোত্রীয় সংগঠনের ভাঙন শুরু হওয়ার পর সেই পুরনো বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে নতুন গোত্র গড়ে ওঠা বন্ধ হয়ে যায় এবং বিদ্যমান কিছু গোত্রও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে একটা নির্দিষ্ট বংশ হিসেবে গোত্রীয় বংশধারার গুরুত্ব বেড়ে যায় অনেকটাই। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে অন্যান্য অঞ্চল থেকে নতুন নতুন প্রচুর পরিবার এসে রোমে বসবাস করতে শুরু করত, এবং নানান সামাজিক সুযোগ-সুবিধে আদায় করার জন্য এক একটা গোত্রীয় নাম ধারণ করে বসতো। এই ব্যাপারটা যে আসলে অন্যায়ভাবে সুবিধে আদায়ের উপায়, তা স্বীকৃত হওয়ার পর সম্রাট ক্লডিয়াস (৪০-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) বিদেশীদের রোমান নাম গ্রহণের ওপর, বিশেষত প্রাচীন গোত্রগুলোর নাম গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[১] ঐতিহাসিক যুগের রোমান গোত্রগুলো প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্য, উভয় আমলেই নিজেদের বংশধারার ওপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করত।

গোত্রের সমস্ত সদস্যই ছিল স্বাধীন, তারা প্রত্যেকেই সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে ভোগ করত। এ ব্যাপারে সবথেকে ধনীর সঙ্গে সবথেকে দরিদ্রের, অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে অখ্যাত ব্যক্তির কোন প্রভেদ ছিল না। জন্মগত অধিকারের সূত্রে তারা যে গোত্রীয় নামের অধিকারী হত, সেই নাম তাদেরকে যে মর্যাদা প্রদান করত, তা তারা সকলেই উপভোগ করত সমানভাবে। রোমান গোত্রগুলোর মৌলিক নীতি ছিল

১। সুটন, "ভিট ক্লডিয়াস", পরিচ্ছেদ ২৫.

স্বাধীনতা, সমতা আর ভ্রাতৃত্ব, এবং যাদের মধ্যে এগুলো গ্রীক বা আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে মোটেই কম প্রভাবশালী নয়।

৮। গোত্রের মধ্যে আত্মীয়দের গ্রহণ করার অধিকার।

প্রজাতন্ত্রের আমলে, এবং সাম্রাজ্যের আমলেও, পরিবারের মধ্যে বাইরের লোকদের গ্রহণ করার প্রথা চালু ছিল। এর ফলে ঐ সব বহিরাগতরা নির্দিষ্ট পরিবারটি যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, সেই গোত্রের সদস্য হিসাবে পরিগণিত হত। কিন্তু এভাবে কাউকে গোত্রের মধ্যে গ্রহণ করার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত এমন সব আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি, যেগুলোর দরুন এভাবে কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠত। সন্তানহীন কোন ব্যক্তির সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতো বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, যাজকদের এবং 'কমিনিয়া কিউরিযাটা'-র অনুমতি সাপেক্ষে সে কোন ছেলেকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে বা দত্তক নিতে পারত। যে পরিবার থেকে ছেলেটিকে দত্তক নেওয়া হল, তাদের পবিত্র আচার অনুষ্ঠান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তাদের পরিষদের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, তার জন্য যাজকদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে।[১] কেননা, দত্তক নেওয়া ছেলেটি তার দত্তক পিতার গোত্রীয় নামই গ্রহণ করত, আর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হয়ে উঠতে পারত। সিসেরোর আমলে যে সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চালু ছিল, সেগুলো থেকে স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পূর্বতন সমাজব্যবস্থায় (যেটা ছিল পুরোপুরিই গোত্রভিত্তিক) এইসব বিধি-নিষেধের সংখ্যা আরও বেশিই ছিল এবং এভাবে দত্তক নেওয়ার ঘটনাও খুব কমই ঘটত। প্রাচীন যুগে গোত্রের এবং গোত্র যে কিউরিয়ার অন্তর্গত তার মতামত না নিয়ে কাউকে দত্তক নেওয়াটা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে এভাবে গৃহীত ব্যক্তিদের সংখ্যাও সীমিত থাকতে বাধ্য। দত্তক নেওয়ার প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু স্মারক আজও টিকে আছে।

৯। গোত্রের প্রধানদের নির্বাচন ও বরখাস্ত করার অধিকার।

প্রধান পদের শর্ত বা কার্যকাল সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ তথ্য আমদের হাতে নেই। এ থেকেই বোঝা যায় রোমান গোত্রগুলোর ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান কত সীমিত, কত অসম্পূর্ণ। রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত প্রত্যেক গোত্রেরই সম্ভবত একাধিক প্রধান থাকত। পদটা শূন্য হলে হয় গোত্রের সদস্যদের মধ্যে থেকেই কাউকে প্রধান হিসেবে নির্বাচন করা হত (ইরোকোয়াদের মতো), অথবা বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে কাউকে বসানো হত ঐ পদে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের আমলে বা তার আগে রাজাদের আমলেও এদের মধ্যে বংশগত উত্তরাধিকার চালু থাকার কোন নজির পাওয়া যায় না, বরং সমস্ত পদের ব্যাপারেই নির্বাচনমূলক নীতিরই অগ্রগতিই চোখে পড়ে। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে লাতিন গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বংশগত উত্তরাধিকার চালু ছিল না। সর্বোচ্চ পদ, অর্থাৎ রেক্স বা শাসক পদটা ছিল নির্বাচন ভিত্তিক, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা নির্বাচিত হত অথবা ঐ পদে নিয়োজিত হত, এবং রাষ্ট্রদূত বা ছোটখাট বিচারপতিদের ক্ষেত্রেও একই রীতি প্রযোজ্য

১। সিসেরো, "প্রো ডোমো", পরিচ্ছেদ ১৩.

ছিল। নুমা যে যাজকদের বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন, সেখানে একটু অন্যরকম রীতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে ঐ বিদ্যালয়ের কোন পদ শূন্য হলে যাজকেরা নিজেরাই নির্বাচনের সাহায্যে কাউকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করত। ২১২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ নাগাদ কমিশিয়া কর্তৃক জনৈক সর্বোচ্চ যাজক (pontifex maximve) নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেছেন লিভি।[১] লেক্স ডমিটিয়া (lex Domitia) আইনে যাজক ও পুরোহিতদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সদস্যদের নির্বাচিত করার অধিকার জন-সাধারণের ওপর অর্পিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে সুলা এই আইনের পরিবর্তন ঘটান।[২] লাতিন গোত্রগুলো যখন প্রথম ইতিহাসের আওতায় আসে তখন এবং তারপরে প্রজা-তন্ত্রের সমগ্র পর্যায় জুড়ে তাদের মধ্যে নির্বাচনমূলক নীতির সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে একটাই সিদ্ধান্তে আসা যায়—প্রধান পদটা ছিল নির্বাচনমূলক। তাদের সমাজব্যবস্থায় বহু ক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক লক্ষণগুলো দেখা যায়, সেগুলো তারা গোত্রের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছিল। প্রধান পদটা বংশগত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেত বলতে হলে, তার বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করার মতো ইতিবাচক প্রমাণ হাজির করতে হবে। কোন পদের কার্যকাল যদি পদাধিকারীর জীবন-ব্যাপী হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে নির্বাচিত করার অধিকারের সঙ্গে তাকে বরখাস্ত করার অধিকারটাও সাধারণত থাকেই।

রোম নগরী প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত, এইসব প্রধানদের নিয়ে বা এদের মধ্যে থেকে জনা-কয়েক প্রধানকে নিয়েই গড়ে উঠত বেশ কিছু লাতিন গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিষদ। এই পরিষদই ছিল তাদের শাসন পরিচালনার মুখ্য উপকরণ। ঠিক গ্রীকদের মতোই লাতিন গোষ্ঠীগুলোর শাসনব্যবস্থাতেও তিনটে শক্তির সমন্বয় দেখা যায়।—প্রধানদের পরিষদ, গণ-পরিষদ (অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলো গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা এদের হাতেই থাকত বলে ধরে নেওয়া যায়) এবং সমর নায়ক। মমসেন বলেছেন, "এই সমস্ত এলাকাগুলোই (গোষ্ঠীগুলো) প্রাচীন যুগে সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিল। প্রতিটা এলাকাকে শাসন করত তাদের নিজ নিজ রাজারা, তাকে সহ-যোগিতা করত বয়স্কদের পরিষদ আর সৈনিক-পরিষদ।"[৩] মমসেন যেভাবে ব্যাপারটাকে সাজিয়েছেন, তাকে ঠিক উল্টো করে দেখতে হবে—তবেই পৌঁছানো যাবে সত্যের কাছাকাছি। যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছিল এই পরিষদ, সেই ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান আর নিজের কার্যকলাপের দরুন এই পরিষদ আবশ্যিকভাবেই তাদের অসামরিক বিষয়সমূহের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। পরিষদই শাসনকার্য চালাত, সমর-নায়ক নয়। নিয়েবুর লিখেছেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী সুসভ্য দেশগুলোর প্রত্যেকটা শহরে গণ-পরিষদগুলো রাষ্ট্রের পক্ষে যতটা অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ব্যবস্থাপক-সভাও। এই সভা ছিল বর্ষীয়ান নাগরিকদের একটা নির্বাচিত সংস্থা। আরিস্ততল বলেছেন

১। লিভি, xxv, ৫.

২। স্মিথ-এর "ডিকশনারী অফ আর্ট. পন্টিফেক্স।

৩। "হিষ্ট্রি অফ রোম", i, ৬৬.

—এই পরিষদ তাদের মধ্যে সবসময়ই ছিল, তা তার চরিত্র অভিজাততান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক, যা-ই হোক না কেন। এমনকি যেখানে অল্প কয়েকজনের শাসন চালু আছে, (রাষ্ট্রের অংশীদারদের সংখ্যা যতই কম হোক না কেন), সেখানেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের পরিকল্পনা রচনার জন্য কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়ে থাকে।"[১] গোত্রভিত্তিক সমাজের প্রধানদের পরিষদের জায়গায় রাজনৈতিক সমাজে গড়ে উঠেছিল ব্যবস্থাপক-সভা। একশজন বর্ষীয়ান মানুষকে নিয়ে, রোমানদের প্রথম ব্যবস্থাপক-সভাটি গড়ে তুলেছিলেন রোমুলাস। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, সে সময় রোমে ঠিক একশটাই গোত্র ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে ঐ সব গোত্রের প্রধানদের নিয়েই ব্যবস্থাপক-সভাটি গড়ে তুলেছিলেন রোমুলাস। সভার সদস্যরা সারা জীবনের জন্যই ঐ পদের অধিকারী হত, কিন্তু বংশগত উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ পদের অধিকারী হওয়া যেত না। এ থেকে আমরা পেঁছতে পারি আমাদের শেষ সিদ্ধান্তে—সে সময় প্রধানের পদটাও ছিল নির্বাচনভিত্তিক। তা যদি না হত, তাহলে রোমান ব্যবস্থাপক-সভাকে একটা বংশগত উত্তরাধিকারমূলক সংস্থা হিসেবেই গড়ে উঠতে দেখা যেত। তাদের জীবনের বহু বিষয়ের মধ্যেই আমরা প্রাচীন সমাজের গণতান্ত্রিক গঠন-কাঠামোর নজির খুঁজে পাই। গ্রীস ও রোমের গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে-সব বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে এ-সব তথ্য অনুপস্থিত।

রোমান গোত্রগুলোতে কতজন করে সদস্য থাকত, সে ব্যাপারে সৌভাগ্যক্রমে কিছু তথ্য আমাদের হাতে আছে। ৪৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ফ্যাবিয়ান গোত্রের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপক-সভার কাছে প্রস্তাব রাখা হয়, ভিয়েন্‌শিয়ানের যুদ্ধকে একটামাত্র গোত্রের যুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করা হোক। তারা আরও বলে যে, ঐ যুদ্ধের জন্য বৃহৎ কোন সৈন্যবাহিনীর দরকার নেই, দরকার হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট, স্থায়ী বাহিনী।[২] তাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশবাসীর প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে তারা তিনশ ছয় জন সৈনিক (সকলেই অভিজাত) যাত্রা শুরু করে।[৩] প্রথমদিকে তারা বেশ কিছু জয়লাভ করে, কিন্তু শেষপর্যন্ত শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমনে তাদের পুরো বাহিনীটা ধ্বংস হয়ে যায়। তবে, রোম ত্যাগ করে যাওয়ার সময় তারা একটি অল্পবয়সী বালককে রোমে রেখে গিয়েছিল। ফ্যাবিয়ান গোত্রের বংশধারা বজায় রাখার জন্য বেঁচে ছিল শুধু ঐ একজনই।[৪] একজন মাত্র বালককে রেখে তিনশ জনেরও বেশি লোক নিজেদের পরিবার ত্যাগ করে যুদ্ধযাত্রা করল—ব্যাপারটা খুব বিশ্বাস্য হয়। কিন্তু সে রকম বিবরণই

১। ঐ, i, ২৫৮.

২। লিভি, ii, ৪৮.

৩। ঐ, ii, ৪৯.

৪। Trecentos sex perisse satis convenit : unum prope pubescem actate relictum stripem gente Fabiae, dubisque rebus populi Romani sepe domi bellique vel maximum futurum auxilium.—লিভি, ii, ৫০; এছাড়াও দ্রষ্টব্য ওভিদ্-এর "Fasti", ii, ১৯৩.

পাওয়া যাচ্ছে। ধরে নেওয়া যায়, যতজন পুরুষ ছিল তাদের মধ্যে, স্ত্রীলোকও ছিল ততজন। তাহলে ঐসব পুরুষদের সন্তান-সন্ততি সহ ফ্যাবিয়ান গোত্রের লোকসংখ্যা অন্তত সাতশ জন হয়ই।

রোমান গোত্রগুলোর অধিকার, দায়-দায়িত্ব ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ হলেও, যেটুকু আমরা জেনেছি তা থেকে নিশ্চিন্তভাবেই বোঝা যায় যে, গোত্রই ছিল তাদের সামাজিক, শাসনতান্ত্রিক এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের উৎসস্থল। সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক এককস্বরূপ এই গোত্রের বৈশিষ্টগুলো সমাজের উচ্চতর সংগঠনগুলোর মধ্যেও প্রতিফলিত হত, কেননা ঐ-সব সংগঠনের মধ্যে গোত্রের প্রতিনিধিরা আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবেই উপস্থিত থাকত। রোমানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশকে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে হলে রোমান গোত্রগুলো সম্বন্ধে আরও গভীর জ্ঞান অর্জন করা একান্তই প্রয়োজন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রোমিয় কিউরিয়া, গোষ্ঠী এবং জনসম্প্রদায় (populus)

রোমিয় গোত্র নিয়ে আলোচনা করার পর চোখ ফেরানো যাক কয়েকটি গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা কিউরিয়াগুলোর দিকে, কয়েকটি কিউরিয়া নিয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীগুলোর দিকে, এবং শেষত, বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে ওঠা রোমিয় জন-সম্প্রদায়ের (populus) দিকে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের অনুসন্ধানকে আমরা সীমিত রাখব রোমুলাসের আমল থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমল পর্যন্ত রোমান সমাজের কাঠামোর মধ্যেই, আর কিছুটা ছুঁয়ে যাব প্রজাতন্ত্রের যুগের গোড়ার দিকে সংঘটিত পরিবর্তনগুলোকে, যখন ভেঙে পড়ছিল গোত্রভিত্তিক কাঠামো আর তার জায়গায় মাথা তুলছিল এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে দুটো শাসনতান্ত্রিক সংগঠন কিছুদিন পাশাপাশি টিকে থেকেছিল (যেমনটি হয়েছিল এথেনীয়দের মধ্যে)—একটার চলছিল ক্ষয়, অপরটার ঘটছিল উদয়। প্রথমটা হচ্ছে গোত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটা সমাজ (societa), দ্বিতীয়টা ভূখণ্ড ও সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটা রাষ্ট্র (civitas)। প্রথমটাকে সরিয়ে ধীরে ধীরে দৃঢ়মূল হয়ে উঠছিল দ্বিতীয়টি। রূপান্তরকালীন যুগের যে-কোন শাসন ব্যবস্থার চরিত্রটা অবশ্যম্ভাবীরূপেই জটিল ধরনের হয়ে থাকে, ফলে তার স্বরূপটা বোঝাও হয়ে ওঠে দুষ্কর। এই পরিবর্তনগুলো মোটেই খুব চট্‌জলদি প্রকৃতির ছিল না। এগুলো ঘটেছে ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে। পরিবর্তনের এই ধারা শুরু হয়েছিল রোমুলাসের আমল থেকে, আর (একেবারে নিখুঁত হয়ে না উঠলেও) সমাপ্ত হয়েছিল সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলে এসে। অর্থাৎ প্রায় দুশো বছরের একটা প্রক্রিয়া, যার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে সদ্যোজাত প্রজাতন্ত্রের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি। রাষ্ট্রের আওতায় আসার পর গোত্রগুলোর প্রভাব কিভাবে নিঃশেষিত হয়ে গেল, তার ইতিবৃত্ত খুঁজতে হলে প্রথমে আমাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে তাদের কিউরিয়া, গোষ্ঠী আর জাতিকে, তারপর সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করতে হবে ঐ নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার। এই শেষ-বিষয়টা নিয়ে আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

রোমানদের গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংগঠনের চারটে স্তর দেখা যায়: প্রথম হচ্ছে গোত্র, যা ছিল রক্তসম্বন্ধযুক্ত কিছু মানুষের একটা সংগঠন আর সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক একক; দ্বিতীয়টা হচ্ছে কিউরিয়া, অর্থাৎ গ্রীক ভ্রাতৃত্বের সমতুল, যা গড়ে উঠত একটা উচ্চতর সংস্থায় ঐক্যবদ্ধ দশটা গোত্রকে নিয়ে; তৃতীয়টা হচ্ছে গোষ্ঠী, যা গড়ে উঠত দশটা কিউরিয়া নিয়ে এবং যা গোত্রীয় সংগঠনের আওতায় থাকার সময়

একটা জাতির সমতুল কিছু লক্ষণের অধিকারী ছিল ; এবং চতুর্থটা হচ্ছে রোমান জন-সম্প্রদায় (Populus Romanus), টুলাস হস্টিলিয়াস-এর আমলে যা গড়ে উঠেছিল একটা গোত্রভিত্তিক সমাজের মধ্যে একাঙ্গীভূত হওয়া এ-রকম তিনটে গোষ্ঠীকে নিয়ে, যার মধ্যে ছিল মোট তিনশটা গোত্র। বিভিন্ন তথ্য থেকে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার সময় সমস্ত ইতালিয়ান গোষ্ঠীগুলোর সমাজ-কাঠামো এ-রকমই ছিল। তফাৎ অবশ্য দু'একটা ছিলই। যেমন, গ্রীক ভ্রাতৃত্বগুলোর তুলনায় কিম্বা অন্যান্য ইতালিয়ান গোষ্ঠীর ভ্রাতৃত্বগুলোর তুলনায় রোমান কিউরিয়া-গুলো সম্ভবত কিছুটা উন্নত মানের সংগঠন ছিল ; তাছাড়া, বারবার অস্বাভাবিকভাবে বিস্তার ঘটার ফলে রোমান গোষ্ঠীগুলো অন্যান্য ইতালিয়ান গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক সুসংহত হয়ে উঠতে পেরেছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কিছু প্রমাণ আমরা যথাসময়ে উপস্থাপিত করব।

রোমুলাসের আমলের আগেই ইতালিয়রা তাদের বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে এক জনবহুল সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। তারা যে-সব ছোটখাট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, সেগুলোর সংখ্যা মোটেই কম ছিল না। এই ঘটনা থেকেই তাদের অনিবার্য বিভাজনের পরিস্থিতিটা বুঝতে পারা যায়, যে পরিস্থিতি গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই মাথা তুলেছিল। তবে অন্যান্য ইতালিয়ান গোষ্ঠী এবং লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল, যদিও তা থেকে কোন তাৎপর্যময় মিত্রসঙ্ঘ গড়ে ওঠেনি। এইরকম পরিস্থিতিতেই সংঘটিত হয়েছিল রোমুলাসের নামের সঙ্গে যুক্ত সেই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন : টাইবার নদীর তীরে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল একশটা লাতিন গোত্র, আর তার পরে একইভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল স্যাবাইন, লাতিন, এট্রুস্কান এবং অন্যান্য গোত্রগুলো, অর্থাৎ যোগ হয়েছিল আরও দুশোটা গোত্র, আর এই সবকটা গোত্র একাঙ্গীভূত হয়েছিল একটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এভাবেই স্থাপিত হয়েছিল রোম নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর, আর তারই পায়ে পায়ে গড়ে উঠেছিল রোমান শক্তি ও রোমান সভ্যতা। বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীকে একটি একক সরকারের পতাকাতলে সমবেত করার এই যে কাজ শুরু করেছিলেন রোমুলাস এবং যে কাজকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন তাঁর উত্তরসূরীরা, সেই কাজই গড়ে তুলেছিল নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণের পথ—ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শাসন ব্যবস্থা থেকে ভূখণ্ড এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরের পথ।

রোমের তথাকথিত সেই সাতজন রাজা বাস্তব মানুষ নাকি শুধুই পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্র মাত্র, কিম্বা যে-সব বিধি-বিধান প্রবর্তনের সঙ্গে তাঁদের এক একজনকে আলাদা আলাদাভাবে সংযুক্ত করা হয় সেগুলো কাল্পনিক ব্যাপার নাকি প্রকৃত ঘটনা —তার সঙ্গে আমাদের অনুসন্ধানের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা লাতিন সমাজের প্রাচীন বিধি-বিধান সংক্রান্ত তথ্যগুলো রোমান প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আর সেভাবেই সেগুলো পা রেখেছিল ঐতিহাসিক যুগের আঙিনায়। সৌভাগ্য-বশত মানব সমাজের ঘটনাগুলো একটা বস্তুগত নথির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে যার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই এবং এই বস্তুগত নথি পরিস্ফুট হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও প্রথার মধ্যে আর রক্ষিত হয় নানান উদ্ভাবন এবং

আবিষ্কারের মধ্যে। প্রয়োজনের খাতিরে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ঘটনা ঘটানোর ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এইভাবে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী নীতির জায়গায় স্থাপন করেন ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিদের। সমাজের সামগ্রিক কার্যকলাপ থেকেই সৃষ্টি হয় যাবতীয় প্রগতি। এই প্রগতির অধিকাংশ কৃতিত্বটাই তাঁরা আরোপ করেন বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর, ছোট করে দেখেন সমগ্র জনসাধারণের বুদ্ধিমত্তাকে। মানব ইতিহাসের মর্মবস্তুটা যে বিভিন্ন আইডিয়া বা ধারণার অগ্রগতির সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এইসব আইডিয়া বা ধারণা গড়ে ওঠে ব্যাপক মানুষের মধ্যে থেকেই এবং তা হয়ে ওঠে তাদের নানান প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি, উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের মধ্যে।

আগেই বলা হয়েছে যে রোমানদের প্রতিটা কিউরিয়ার থাকত দশটা করে গোত্র, প্রতিটা গোষ্ঠীতে থাকত দশটা করে কিউরিয়া আর সমগ্র রোমান জন-সম্প্রদায়ের ছিল মোট তিনটে গোষ্ঠী। এই সংখ্যাগত বিন্যাসটা সৃষ্টি করা হয়েছিল আইনগত ব্যবস্থার সাহায্যে, এবং প্রথম দুটো গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা রোমুলাসের আমলের আগে ঘটেনি। এ-রকম বিন্যাস ঘটানো সম্ভব হয়েছিল সন্নিহিত কিছু গোষ্ঠী থেকে অনেককে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারার ফলে—অনেককে আমন্ত্রণ জানানোর সাহায্যে কিম্বা কোন কোন গোষ্ঠীকে পরাজিত করে। এর ফসল মূলতঃ মূর্ত হয়ে ওঠে পরবর্তীকালে গঠিত টিটিস (Tities) ও লুকেরেস-এর (Luceres) মধ্যে। কিন্তু এ-রকম একটা সংখ্যাসাম্যকে শত শত বছর ধরে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, বিশেষত প্রতিটা কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রগুলোর ব্যাপারে তো নয়ই।

আমরা দেখেছি যে গ্রীক ভ্রাতৃত্বগুলো শাসনতান্ত্রিক ভূমিকা যত না পালন করত, তার চেয়ে অনেক বেশি করে পালন করত ধর্মীয় ও সামাজিক ভূমিকা। এর অবস্থানটা হচ্ছে গোত্র আর গোষ্ঠীর মাঝামাঝি জায়গায় ফলে তার ওপর শাসনগত কিছু দায়-দায়িত্ব দেওয়া না হলে গোত্র আর গোষ্ঠী উভয়ের থেকেই তার গুরুত্ব কম হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। ইরোকোয়াদের মধ্যে এই সংগঠনটা ছিল একেবারেই প্রাথমিক চরিত্রের। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তার শাসনগত চরিত্রের থেকেও বিশিষ্ট ছিল সামাজিক চরিত্রটাই এবং সেটা তার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠত। কিন্তু রোমান কিউরিয়া পূর্ববর্তীকালে তা গ্রীক ভ্রাতৃত্বের তুলনায় অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ ও শাসনতান্ত্রিক কাজে অনেক বেশি করে সংশ্লিষ্ট একটা সংগঠনে পরিণত হয়। তবে এটাও সত্যি যে গ্রীক ভ্রাতৃত্বের তুলনায় রোমান কিউরিয়া সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশি তথ্য হাতে পেয়েছি। সম্ভবত প্রতিটা কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রগুলো ছিল পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধযুক্ত গোত্র, আর একটা উচ্চতর সংগঠনের মধ্যে তাদের পুনর্মিলনটা আরও মজবুত হয়ে উঠত বিবাহসূত্রে, কেননা একই কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রগুলো পরস্পর পরস্পরকে স্ত্রী সরবরাহ করত অর্থাৎ এক গোত্রের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হত অপর কোন গোত্রের ছেলের।

পুরনো আমলের লেখকরা কিউরিয়া সম্বন্ধে কিছু লিখে যান নি। কিন্তু তা থেকে মোটেই প্রমাণিত হয় না যে এই সংগঠনটা রোমুলাসই গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর আইন-সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই আমরা প্রথম একটা রোমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে কিউরিয়ার

উল্লেখ দেখতে পাই, জানতে পারি তাঁর আমলে গড়ে ওঠা দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে ক'টা করে কিউরিয়া ছিল। গ্রীক ভ্রাতৃত্বের মতো রোমান কিউরিয়াও সম্ভবত লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল।

স্যাবাইন গোষ্ঠীর নারীদের মধ্যস্থতায় স্যাবাইন ও লাতিনদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর ঐ-সব নারীদের নানা ব্যাপারে কতটা সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিভি লিখেছেন, সমস্ত মানুষকে মোট তিরিশটা কিউরিয়ায় ভাগ করার সময় এই কারণেই রোমুলাস প্রতিটি কিউরিয়ার নামকরণ করেছিলেন স্যাবাইন নারীদের নাম অনুসারে।[১] ডায়োনিসায়াস কিউরিয়ার সমতুল্য হিসাবে ভ্রাতৃত্ব শব্দটাই ব্যবহার করলেও, কিউরিয়া শব্দটাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি,[২] আর সেই সঙ্গেই বলেছেন যে রোমুলাস প্রতিটা কিউরিয়াকে দশ ভাগে ভাগ করেছিলেন ; এই দশটা ভাগ যে আসলে দশটা গোত্র, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।[৩] একইভাবে প্লুটার্ক'ও জানিয়েছেন যে, প্রতিটা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকত দশটা করে কিউরিয়া, আর অনেকে নাকি বলে এইসব কিউরিয়ার নামকরণ করা হয়েছিল স্যাবাইন নারীদের নাম অনুসারে।[৪] লিভি কিংবা ডায়োনিয়াসের থেকে ভাষার ব্যবহারের ব্যাপারে প্লুটার্ক অনেক যথাযথ হতে পেরেছেন। কারণ তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে থাকত দশটা করে কিউরিয়া, অন্যদের মতো এগুলোকে দশটা ভাগ বলে উল্লেখ করেননি। তাঁর মতটাই সঠিক, কেননা কিউরিয়া প্রাথমিক একক ছিল গোত্রগুলোই আর গোত্রগুলো মোটেই কিউরিয়ার বাইরেকার কোন উপ-বিভাগ ছিল না। রোমুলাস শুধু প্রতিটা কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রের সংখ্যা আর প্রতিটা গোষ্ঠীর মধ্যেকার কিউরিয়ার সংখ্যাকে একটা সুসমঞ্জস বিন্যাসে এনেছিলেন, আর তা করা সম্ভব হয়েছিল সন্নিহিত গোষ্ঠীগুলোর থেকে অনেককে নিজেদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারার ফলেই। তত্ত্বগতভাবে বললে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এ-রকম—প্রতিটি কিউরিয়া গঠিত হত এক বা একাধিক গোত্র থেকে ভেঙে আসা কয়েকটা গোত্রকে নিয়ে, এবং একাধিক কিউরিয়া গঠিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠত গোষ্ঠী। প্রতিটা কিউরিয়া গড়ে উঠত এমন সব গোত্রের সমন্বয়ে, যারা একই উপ-ভাষার কথা বলত। র‍্যামানেসদের একশটা গোত্রই ছিল লাতিন গোত্র। এক একটা কিউরিয়ায় দশটা করে নিয়ে মোট দশটা কিউরিয়ায় তাদেরকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধের ওপরে যথেষ্টই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন রোমুলাস। কেননা দেখা যায় প্রতিটা কিউরিয়ায় তিনি জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্তগোত্রগুলোকেই যথাসম্ভব রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, তারপর সংখ্যাসাম্যটা ঠিকঠাক রাখার জন্য কোন কোন কিউরিয়ার বাড়তি গোত্রগুলোকে ইচ্ছামতো আলাদা করে নিয়ে সেগুলোকে জুড়ে দিয়েছিলেন অন্য কোন কিউরিয়ার সঙ্গে, তাদের সংখ্যাগত ঘাটতি পূরণের জন্য। টিটিস গোষ্ঠীর একশটা

১। লিভি, i, ১৩.

২। ডায়োনিসায়াস, "অ্যান্টিকুইটিজ অফ রোম," ii, ৭.

৩। ডায়োনিসায়াস, ii, ৭.

৪। প্লুটার্ক, "ভিট রোমুলাস," ২০-শ পরিচ্ছেদ।

গোত্র ছিল মূলত স্যাবাইন গোত্র। এগুলোকেও দশটা কিউরিয়ায় বিন্যস্ত করা হয়েছিল, এবং তা করতে গিয়ে সম্ভবত অনুসরণ করা হয়েছিল একই নীতি। তৃতীয় অর্থাৎ লুকেরেস গোষ্ঠীটা গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে অন্যান্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করা এবং সন্নিহিত গোষ্ঠীগুলো থেকে অনেককে গ্রহণ করার মারফত। এই গোষ্ঠীর গঠনটা ছিল পাঁচমিশেলী ধরনের। যেমন, এই গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে কয়েকটা এট্রুস্কান গোত্রও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এদের দশটা কিউরিয়ায় বিন্যস্ত করা হয়েছিল প্রতিটা কিউরিয়ায় ছিল দশটা করে গোত্র। পুর্নগঠনের এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক এককস্বরূপ গোত্র অপরিবর্তিত থাকলেও, কিউরিয়াগুলো তাদের স্বাভাবিক স্তরকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের লোকদেরকেও নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে হয়েছিল তাদের—এ ঘটনা কোন যথার্থ ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের ক্ষেত্রে কখনোই দেখা যায় নি। এইসঙ্গেই গোষ্ঠীগুলোও নিজেদের স্বাভাবিক স্তর ছাপিয়ে গিয়েছিল, বাইরের লোকদের গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল তারা। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা অন্য কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়নি। এই আইনগত বাধ্যবাধকতার সাহায্যে কিউরিয়া ও গোত্রসমেত গোষ্ঠীগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে পরস্পরের সমান ও সমকক্ষ করে তোলা হয়েছিল, আর তৃতীয় গোষ্ঠীটা ছিল মূলত পরিস্থিতির চাপে গড়ে ওঠা একটা কৃত্রিম সংগঠন। এট্রুস্কানদের সঙ্গে লাতিনদের ভাষাগত সাদৃশ্যটাও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। অনেকেই মনে করেন যে এট্রুস্কান-দের উপ-ভাষাটা লাতিনদের কাছে পুরোপুরি দুর্বোধ্য ছিল না, কারণ তাহলে তারা সে সময়ে পুরোপুরি গোত্রভিত্তিক রোমান সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না। গোষ্ঠীগুলোর এই সংখ্যাসাম্যটা এইভাবে গোটা সমাজের শাসনগত কার্যকলাপকে সুনিশ্চিত করেছিল, সহজতর করেছিল।

নিয়েবুর, যিনিই প্রথম ঐ যুগের রোমান প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তিনি স্বীকার করেছেন যে তখন মানুষ ছিল স্বাধীন, তথা-কথিত রাজারা ছিলেন অনেকটা প্রতিনিধি স্থানীয় শাসক, ব্যবস্থাপক সভাটা চালানো হতো প্রতিনিধিত্বমূলক নীতির সাহায্যে,প্রতিটা গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি সদস্য নেওয়া হতো ঐ সভায়। আবার তাদের সাংগঠনিক ক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটা বিসদৃশ মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, "এই সংখ্যাসাম্য থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে রোমান বংশগুলো [গোত্রগুলো] [১] তাদের সংবিধান রচনার আমলের আগে গড়ে নি। নিজের পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোন আইনপ্রণেতা যৌথ সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন এগুলো"।[২] দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গোষ্ঠীর বিশেষত তৃতীয় গোষ্ঠীটার কিউরিয়াগুলোর মধ্যে যে বাইরের লোকদের জোর করে অন্তর্ভুক্ত

১। নিয়েবুর নিজেই গোত্রের বদলে "বংশ" শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন, নাকি এটা অনুবাদকদেরই কীর্তি—তা আমার জানা নেই। তাঁর রচনার অন্যতম অনুবাদক থার্লওয়াল প্রায়শঃই এই বংশ শব্দটা ব্যবহার করেছেন গ্রীক গোত্রগুলোর ক্ষেত্রে। বংশ শব্দটা এখানে প্রযোজ্য হতে পারে না।

২। হিষ্ট্রি অফ রোম", i, ২৪৪.

কারিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু কোন গোত্রের গঠন পরিবর্তিত হয়েছিল বা তাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল কিম্বা নতুন কোন গোত্র গঠন করা হয়েছিল— এটা মেনে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আইন-প্রণেতাদের পক্ষে কোন গোত্র গঠন করা সম্ভব ছিল না। সাধারণ ভাবে কোন কিউরিয়া গঠন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবে জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্ত গোত্রগুলোর একটা কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে তাদেরকে জমায়েত করে কোন কিউরিয়া গঠন করতে পারার একটা সম্ভাবনা অবশ্য ছিল। কিন্তু আইন-প্রণেতারা চাপ দিয়ে কোন কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রের সংখ্যা অথবা গোষ্ঠীর মধ্যেকার কিউরিয়ার সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারত। নিয়েবুর আরও দেখিয়েছেন যে গ্রীক ও রোমানদের ইতিহাসে গোত্র ছিল একটা সুপ্রাচীন ও সর্বত্র বিদ্যমান সংগঠন। এই বক্তব্যটা তার পূর্ববর্তী বক্তব্যকে আরও দুর্বোধ্য করে তোলে। তাছাড়াও নানান নজির থেকে মনে হয় যে অন্তত আইওনিয় গ্রীকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংগঠনটার অস্তিত্ব ছিলই। আর এ থেকেই ধারণা করা যায় যে লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই কিউরিয়া সংগঠনটা হয়ত অন্য কোন নামে একইরকম প্রাচীনকাল থেকেই চালু ছিল। যে সংখ্যাসাম্যের কথাটা আমরা উল্লেখ করেছি, তা রোমুলাসের আমলের আইনগত ব্যবস্থার ফলস্বরূপই সৃষ্টি হয়েছিল। এই সংখ্যাসাম্য সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন গোত্রগুলোকে কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আমাদের হাতে আছে।

কিউরিয়ার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ দশটা গোত্রের সদস্যারা পরস্পরকে কিউরিয়েল (curiales) বলে সম্বোধন করত। তারা একজন যাজক বা কিউরিওকে (curio) নির্বাচিত করত, এই যাজকই ছিল তাদের ভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তা। প্রতিটা কিউরিয়ার নিজস্ব কিছু পবিত্র আচার-অনুষ্টান থাকত, যেগুলোতে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করত। স্যাকেলাম (sacellum) ছিল কিউরিয়ার উপাসনা-স্থল, আর এই জমায়েত-স্থলে তারা ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য সমবেত হত। তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপের মুখ্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে কাজ করত ঐ যাজকটিই। সেইসঙ্গে কিউরিয়ার সদস্যারা একজন সহকারী যাজক বা ফ্ল্যামেন কিউরিয়ালিসকেও (flamen curialis) নির্বাচিত করত। এই সহকারী যাজকদের হাতে থাকত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের প্রধান দায়িত্বভার। গোত্র সমূহের পরিষদ অর্থাৎ কামিশিয়া কিউরিয়াটার (comitia curiata) নামকরণ হত কিউরিয়ার নামানুসারেই। রোমে গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থা চালু থাকাকালীন ব্যবস্থাপকসভার চেয়েও বেশি সার্বভৌম ক্ষমতা থাকত এই পরিষদের হাতে। রোমান কিউরিয়া বা ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের চেহারাটা মোটামুটি এ-রকমই ছিল।[১]

১। যে সংগঠন গড়ার কৃতিত্বটা রোমুলাসের ওপর আরোপ করা হয়, তার একটা সুনির্দিষ্ট ও পারিপার্শ্বগত বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন ডায়োনিসায়াস, যদিও এই সংগঠনের একটা অংশ পরবর্তী কোন যুগে গড়ে উঠেছিল বলেই মনে হয়। গ্রীকদের গোত্রীয় সংগঠন (যার সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল) এবং রোমানদের গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে তিনি যে তুলনা করেছেন, তা খুবই চিত্তাকর্ষক। তিনি বলেছেন, প্রথমত আমি তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিন্যাসের কথা উল্লেখ করতে চাই, যা আমার মতে শান্তির সময় ও যুদ্ধের সময়—উভয় পরিস্থিতিতেই যাবতীয় রাজনৈতিক বিন্যাসের

সাংগঠনিক ক্রম অনুসারে পরবর্তী স্তরটা হচ্ছে রোমান গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর মধ্যে থাকত দশটা কিউরিয়া আর মোট একশটা গোত্র। বাইরের কোন প্রভাব ছাড়া যখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই গড়ে উঠত কোন গোষ্ঠী, তখন তার মধ্যে শুধু সেইসব গোত্রগুলোই থাকত যেগুলো গড়ে উঠেছিল একটা বা একজোড়া আদি গোত্র থেকে বিভাজনের ফলে এবং যার প্রত্যেক সদস্য একই উপ-ভাষাই কথা বলত। আগে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীটা নিজে থেকেই বিভক্ত হয়ে না পড়লে কিন্তু রোমান গোষ্ঠীগুলোকে (এখানে আমরা শুধু এদের নিয়েই আলোচনা করতে চাইছি) বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য এবং বিশেষ উপায়ের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে প্রসারিত করা হয়েছিল, তবে গোষ্ঠীর মূল বনিয়াদ এবং কাঠামোটা গড়ে উঠেছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই।

রোমুলাসের আমলের আগে পর্যন্ত প্রতিটা গোষ্ঠী একজন করে মুখ্য কর্মকর্তা নির্বাচন করত, যার হাতে থাকত বিচারগত, সামরিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ভার।[১] শহরে সে গোষ্ঠীর বিচার সংক্রান্ত কাজগুলো দেখাশোনা করত, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের তদারক করত আর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করত।[২]

মধ্যে সবথেকে যথাযথ। বিন্যাসটা ছিল এ-রকম: সমগ্র জনসংখ্যাকে তিন ভাগে ভাগ করার পর তিনি প্রতিটা বিভাগের জন্য এক একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে নেতা হিসেবে নিয়োগ করেন; অতঃপর এই তিনটে বিভাগের প্রত্যেকটাকে তিনি ভাগ করেন দশটা করে ভাগে, এক একটা ভাগের নেতা হিসেবে নিয়োগ করেন এক একজন সাহসী ব্যক্তিকে, এই দশজন সমান মর্যাদার অধিকারী হত। বড় তিনটে বিভাগকে তিনি গোষ্ঠী নামে চিহ্নিত করেন, আর ছোট ছোট ভাগগুলোর নাম দেন কিউরিয়া—প্রথা অনুযায়ী এগুলোকে আজও এই নামেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। গ্রীক ভাষা অনুসারে এই নামগুলোর অর্থ এ-রকম দাঁড়ায়: গোষ্ঠী বা ট্রাইব শব্দটা আসছে "ট্রাইবাস" (tribus) থেকে, যার অর্থ হল তৃতীয় ভাগ, বা ফাইল (phyle); "কিউরিয়া" অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব, এবং এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে দল; গোষ্ঠীর নেতারা ছিল একই সঙ্গে ফাইলার্ক (phylarchs) বা বিভাগীয় নেতা এবং ট্রিটিয়ার্ক (trittyarchs)। রোমানরা এদেরকে বলত জননেতা (tribunes)। কিউরিয়ার নেতারা ছিল একই সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের নেতা (phratriarchs) এবং লচাগই (lochagoi), যাদেরকে রোমানরা কিউরিয়া-সর্দার (curiones) নামে অভিহিত করত। ভ্রাতৃত্বগুলোকে আবার দশটা করে ভাগে বিভক্ত করা হত, প্রতিটা ভাগের একজন করে নেতা থাকত, যাদেরকে সাধারণ নামে গোষ্ঠী এবং ভ্রাতৃত্বগুলোর বিন্যাস সম্পূর্ণ হওয়ার পর তিনি সমগ্র এলাকাটাকে তিরিশটা সমান ভাগে ভাগ করেন, প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের জন্য বরাদ্দ হয় একটা করে ভাগ, যার মধ্যে একটা পর্যাপ্ত অংশ নির্দিষ্ট করে রাখা হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মন্দিরগুলোর জন্য, এবং সকলকার যৌথ ব্যবহারের জন্যও কিছুটা জমি আলাদা করে রাখা হয়।" "অ্যান্টিকুইটিস অফ রোম," ii, ৭.

১। ডায়োনিসায়াস, ii, ৭.

২। স্মিথ-এর ডিকশনারি, ১ম পরিচ্ছেদ, 'শাসক' অধ্যায়।

সম্ভবত কোন সার্ব্বজনীন জমায়েতে একজোট হয়ে কিউরিয়ার পক্ষ থেকেই তাকে নির্বাচিত করা হত। কিন্তু এ ব্যাপারেও আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য আছে, তা অপ্রতুল। প্রাচীনকালে প্রতিটা লাতিন গোষ্ঠীর মধ্যে এই পদটার অস্তিত্ব ছিলই, এর চরিত্রটা ছিল একটু বিচিত্র ধরণের এবং পদাধিকারীর কার্যকাল ছিল নির্বাচনভিত্তিক। এই পদটাই ছিল পরবর্তীকালের 'রেক্স' বা প্রধান সমর-নায়ক পদের বীজস্বরূপ, কেননা দেখা যায় এই দুটো পদের কার্যকলাপ ছিল একইরকম। গোষ্ঠী-প্রধানদের ডায়োনিসায়াস চিহ্নিত করেছেন গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে।[১] রোমানদের তিনটে গোষ্ঠী যখন একটা ব্যবস্থাপক সভা, একটা গণ-পরিষদ এবং একজন সমর-নায়কের অধীনে একটা জন-সম্প্রদায় হিসাবে একাঙ্গীভূত হয়, তখন গোষ্ঠী-প্রধানের পদটা ম্লান হয়ে যায় এবং তার গুরুত্বও অনেক কমে যায়। তবে বরাবরই এই পদে কোন একজনকে নির্বাচন করার প্রথাটা চালু ছিল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় এই পদটা একসময় কতটা জনপ্রিয় ছিল।

রোমানদের মধ্যে বহু প্রাচীন কাল থেকে একটা গোষ্ঠী-পরিষদের অস্তিত্বও অবশ্যই ছিল। রোম নগরী প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত প্রতিটা ইতালিয় গোষ্ঠী কার্যত স্বাধীনই ছিল, যদিও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কম-বেশি মৈত্রীবন্ধ সম্পর্কও দেখা যেত। স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে এই প্রতিটা প্রাচীন গোষ্ঠীরই নিজস্ব প্রধানদের পরিষদ (যারা নিঃসন্দেহেই গোত্র-প্রধান ছিল), গণ-পরিষদ এবং সমর-নায়ক থাকত। গোষ্ঠী সংগঠনের এই তিনটে উপাদান, অর্থাৎ, পরিষদ, গোষ্ঠী-প্রধান এবং গোষ্ঠীর গণ-পরিষদ—এগুলোর আদলেই পরবর্তীকালে গঠিত হয়েছিল রোমান ব্যবস্থাপক-সভা, রোমান রেক্স এবং কমিশিয়া কিউরিয়াটা। রোম নগরী প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত গোষ্ঠী-প্রধানকে খুব সম্ভবত 'রেক্স' নামেই অভিহিত করা হত। ব্যবস্হাপকসভার সদস্য (senex) এবং কমিশিয়াদের (con-ire) নাম সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এই গোষ্ঠীগুলোর অবস্হা ও গঠন সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু জানা আছে, তা থেকে অনুমান করা চলে যে এগুলো গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্নই ছিল। রোমানদের তিনটে গোষ্ঠী একাঙ্গীভূত হওয়ার পর গোষ্ঠীগুলোর জাতীয় অর্থাৎ নিজস্ব চরিত্রটা মিশে গিয়েছিল ঐ উচ্চতর সংগঠনের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সাংগঠনিক ক্রমের মধ্যে গোষ্ঠী একটা অপরিহার্য স্তর হিসেবেই রয়ে গিয়েছিল।

সমগ্র সংগঠনের চতুর্থ স্তরটা হচ্ছে রোমান জাতি বা জন-সম্প্রদায় যা তিনটে গোষ্ঠীর একাঙ্গীভবনের ফলেই গড়ে উঠেছিল বলে জানা যাচ্ছে। এই সর্বোচ্চ সংগঠনটা মূর্ত্ত উঠত তিনটে বিষয়ের মধ্যে—ব্যবস্হাপক সভা (senatus), গণ-পরিষদ (Comtia curiata) আর সামরিক সর্বাধিনায়ক (rex)। এগুলোর পাশাপাশি থাকত শহুরে শাসক বা বিচারকবর্গ, একটা সেনাবাহিনী এবং নানান পদমর্যাদাবিশিষ্ঠ একদল সার্বজনীন যাজক।[২]

১। ডায়োনিসায়াস, ii, ৭.

২। তিরিশজন কিউরিয়া-সর্দার (curiones) পুরোহিতদের একটা বিদ্যালয়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হত। তাদের মধ্যে একজন লাভ করত "সর্বোচ্চ সর্দার"-এর (curio maximus) পদ। গোত্রগুলোর পরিষদই তাকে নির্বাচন করত। এর পাশাপাশি

একটা শক্তিশালী শহরকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে তোলাটা ছিল একেবারে প্রথম থেকেই তাদের শাসনগত ও সামরিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ধারণা। রোম নগরীর বাইরের সমস্ত এলাকাকে শুধুমাত্র কয়েকটা প্রদেশ হিসেবেই গণ্য করা হত। রোমুলাসের সামরিক গণতন্ত্রের আমলে, প্রজাতন্ত্রের গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মিশ্র সংগঠনের আমলে এবং পরবর্তীকালের সাম্রাজ্যবাদের আমলে, শাসন ব্যবস্থার একটা স্থায়ী কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মাথা তুলেছিল দাঁড়িয়েছিল একটা বিরাট শহর। বিজিত যে-কোন এলাকাকে জুড়ে নেওয়া হত এই শহরের সঙ্গে, তাদেরকে কখনোই শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে ঐ শহরের সমমর্যাদাসম্পন্ন অংশে পরিণত করা হত না। মানবজাতির ইতিহাসে ঠিক এই রোমান সংগঠনের মতো, রোমান রাষ্ট্রশক্তির মতো এবং রোমান জাতির কর্মজীবনের মতো কোন ঘটনা দেখা যায় নি। রোমানদের এই ইতিহাস পৃথিবীর এক শাশ্বত বিস্ময়।

রোমুলাস কর্তৃক সংগঠিত হওয়ার পর নিজেদেরকে তারা রোমান জনসম্প্রদায় (পপুলাস রোমানাস) নামে অভিহিত করত, এবং এই অভিধাটা ছিল অত্যন্ত যথাযথ। আসলে তারা একটা গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থাই গড়ে তুলেছিল। কিন্তু রোমুলাসের আমলে এবং তাঁর আমল আর সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলের মধ্যে তার থেকেও দ্রুততর হারে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে শাসনব্যবস্থার একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো জরুরী হয়ে উঠেছিল। রোমুলাস স্বয়ং আর তার সময়কার প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। গোত্রগুলোর ওপর একটা জাতীয় ও সামরিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ছিল তাঁর সংবিধানে, এজন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। তিনি উদ্যোগ না নিলে যে সব প্রতিষ্ঠান হয়ত লুপ্তই হয়ে যেত মানুষের স্মৃতি থেকে, সেগুলোর চরিত্র ও কাঠামো সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, সে জন্যও তাঁরই কাছে ঋণ স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তিতে রোমান শক্তির অভ্যুদয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলো যে নানান রোমাঞ্চকর উপাখ্যানে, অতিকথায় অতিরঞ্জিত হয়েছে—তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রোম নগরী গড়ে উঠেছিল একটা সরকারের অধীনে যত বেশি সম্ভব গোত্রকে একটা শহরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা এবং একজন সামরিক সর্বাধিনায়কের নেতৃত্বে তাদের সকলকার সামরিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার এক চমৎকার পরিকল্পনার ফল হিসাবেই, এর মূল কৃতিত্বের দাবীদার রোমুলাস স্বয়ং এবং তাঁর উত্তরসূরীরাও ঐ পরিকল্পনার রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামরিক, অর্থাৎ ইতালির বুকে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করা। আর তার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই সংগঠনটা একটা সামরিক গণতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল।

থাকত শাকুনতত্ত্ববিদদের বিদ্যালয়। অগুলনিয়ান আইন (৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অনুসারে গড়ে উঠেছিল এই বিদ্যালয়। এতে থাকত মোট নয়জন সদস্য। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচিত করা হত মুখ্য কর্মকর্তা ("magister collegii") হিসেবে। এছাড়া থাকত যাজকদের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছিল একই আইন অনুসারে এবং নয়জন সদস্য নিয়েই। তাদের মধ্যে একজন লাভ করত "সর্বোচ্চ যাজক"-এর (pontifex maximus) পদ।

টাইবার নদী যেখানে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণদিকের সমতল অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, সেই এলাকার একটা চমৎকার জায়গা বাছাই করেন রোমুলাস এবং লাতিনদের একটা গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে (যে গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন তিনিই) অধিকার করেন প্যালাটাইন পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চল। এই অঞ্চলে একটা অতি প্রাচীন নগরদুর্গ ছিল। লোককথা বলে—আলবা-র প্রধানরাই ছিলেন রোমুলাসের পূর্বপুরুষ। তবে এটা খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার মতো বিষয় নয়। একটা বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে—রোমুলাসের জীবনের শেষ দিকে তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৪৬ হাজার পদাতিক আর ১ হাজার অশ্বারোহী সেনা, অর্থাৎ রোমনগরী এবং তার আশেপাশে তাঁর অধীনস্থ এলাকার মোট লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ। এই তথ্য সত্য হলে ধরে নিতে হয়, নতুন বসতিটি বেড়ে চলেছিল প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে।

লিভি বলেছেন, বিভিন্ন নগরীর প্রতিষ্ঠাতাদের একটা কার্যকরী সাবেক পন্থা (Vetus consilum) ছিল ঐ-সব নগরীর মধ্যে বিভিন্ন জায়গার মানুষদের জড়ো করা এবং তারপর নিজের নিজের বংশধরদের ঐ নগরীর আদিম অধিবাসী হিসেবে দেখিয়ে তাদের নাগরিকত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করা।[১] শোনা যায়, ঐ একই পন্থা অনুসরণ করে প্যালাটাইন পাহাড়ের কাছে একটা আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছিলেন রোমুলাস এবং চরিত্র বা অবস্থা নির্বিশেষে আশপাশের গোষ্ঠীগুলোর সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে নতুন নগরীর সুযোগসুবিধে ও ভবিতব্যের অংশীদার হতে। লিভি আরও বলেছেন, আশপাশের এলাকা থেকে প্রচুর লোক ঐ জায়গায় এসে জড়ো হয়েছিল, এদের মধ্যে যেমন ক্রীতদাসরাও ছিল আবার স্বাধীন মানুষরাও ছিল, আর এটাই ছিল ঐ নতুন এলাকায় বাইরের লোকদের প্রথম আগমন।[২] প্লুটার্ক[৩] এবং ডায়োনিসায়াসও[৪] এই আশ্রয়স্থল বা কুঞ্জবনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য এবং উল্লিখিত সাফল্যের কথা বিবেচনা করলে মনে হয়—এরকম একটা কিছু সত্য সত্যিই তখন চালু করা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় সে সময় ইতালিতে বর্বরদের সংখ্যাধিক্য, এবং ব্যক্তিগত অধিকারকে ঠিক মতো রক্ষা না করা, ঘরোয়া দাসত্বের অস্তিত্ব আর হিংসার প্রাবল্যের দরুণ তাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে যদি যথেষ্ট সামরিক প্রতিভা থাকে তাহলে এ-রকম অবস্থায় তিনি সমবেত মানুষদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই সেই প্রতিভাকে কাজে লাগাবেন। পাঠককে মনে করিয়ে দিই, রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল স্যাবাইন কুমারীদের ফাঁদে ফেলে ধরে নিয়ে আসার (যে কুমারীরা তখন তাদের বন্দী-কর্তাদের সম্মানীতা স্ত্রী) কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য স্যাবাইনদের

১। লিভি i ৮.

২। Eo ex finitimis populis turba omnis sine discrimine, liber an servus esset, avida novarum rerum perfugit ; idque primum ad cocptum magnitudinem roboris fuit.—লিভি, i, ৮.

৩। ভিট রোমুলাস, ২০ পরিচ্ছেদ।

৪। অ্যান্টিকুইটিস অফ রোম, ii, ১৫.

আকস্মিক আক্রমণ। এর মীমাংসা করা হয়েছিল একটা সুচিন্তিত ব্যবস্থার সাহায্যে—লাতিন ও স্যাবাইনরা একটা সমাজের মধ্যে একাঙ্গীভূত হয়েছিল, কিন্তু উভয়েরই নিজ নিজ আলাদা সেনাপতি ছিল। স্যাবাইনরা বসবাস করতে শুরু করেছিল কুইরিনাল ও ক্যাপিটোলাইন পর্বতাঞ্চলে। একইভাবে এদের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়েছিল দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির, অর্থাৎ টিটি গোষ্ঠীর মূল অংশটাও। এদের সেনাপতি ছিল টিটিয়াস ট্যাটিয়াস। তার মৃত্যুর পর রোমুলাসই ঐ গোষ্ঠীর সেনাপত্য গ্রহণ করেন।

রোমুলাসের উত্তরসূরি নুমা পম্পিলিয়াস রোমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেকটা উন্নত করে তোলেন। তাঁর উত্তরসূরি টিউলাস হস্টিলিয়াস লাতিন শহর আলবা অধিকার করেন এবং সেখানকার সমস্ত লোককে স্থানান্তরিত করেন রোম নগরীতে। তারা রোমান নাগরিকদের মতো যাবতীয় সুযোগ-সুবিধে পায় এবং কোলিয়ান পার্বত্যাঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। লিভি বলেছেন, এই সময় নাগরিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল,[১] তবে তা শুধু ঐ আলবা শহরের লোকদের আগমনের ফলে হতে পারে না। টিউলাসের উত্তরসূরি আংকাস মার্তিয়াস লাতিন শহর পলিটোরিয়াস অধিকার করেন, এবং চলতি পদ্ধতি অনুযায়ী সেখানকার সমগ্র লোকদের রোমে স্থানান্তরিত করেন।[২] এরা বসবাস করতে শুরু করে আভেন্তাইন পার্বত্যাঞ্চলে এবং একইরকম সুযোগ-সুবিধের অধিকারী হয়। কিছুদিন পর তেলিনি ও ফিকানা-র অধিবাসীরাও পরাজিত হয় এবং রোমে চলে এসে ঐ আভেন্তাইন পর্বতাঞ্চলেরই বাসিন্দা হয়ে ওঠে। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে-সব গোত্রগুলো রোমে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তারা এবং সেই-সঙ্গেই লাতিন ও স্যাবাইন গোত্রগুলোও স্থানীয়ভাবে পরস্পরের থেকে পৃথকই ছিল। বর্বর যুগের মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো যখন নানান নগরদুর্গ ও প্রাচীরবেষ্ঠিত শহরে জমায়েত হচ্ছিল, তখন সর্বত্রই গোত্র ভিত্তিক সমাজের সাধারণ রীতি অনুযায়ী গোত্রগুলো এক একটা এলাকায় নিজের নিজের গোত্র আর আর ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেই জমায়েত হত।[৪] এইভাবেই গোত্রগুলো বসবাস করত রোমে। বাইরে থেকে এসে যারা সংযোজিত হয়েছিল, তাদের বৃহত্তর অংশটা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল লুকেরেস নামক একটা তৃতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে, যেটা লাতিন গোত্রগুলোর একটা প্রশস্ততর বনিয়াদ রচনা করেছিল। রোমুলাসের পরবর্তী চতুর্থ সামরিক নেতা টার্কুইনিয়াস প্রিস্কাস-এর আমলে এই গোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়। এর অন্তর্গত নতুন গোত্রগুলোর মধ্যে কয়েকটা

১। লিভি, i, ৩০.

২। লিভি, i, ৩৮.

৩। ঐ, i, ৩৩

৪। নিউ মেক্সিকোর যৌথ গৃহগুলোর প্রতিটি বাড়ির বাসিন্দারা একই গোষ্ঠীর সদস্য, আর কোন কোন ক্ষেত্রে একটা যৌথ বাসগৃহেপুরো একটা গোষ্ঠীই বসবাস করে। আগেই বলা হয়েছে, মেক্সিকোর যৌথ গৃহগুলোতে চারটে প্রধান ভাগ থাকত, এক একটায় বাস করত এক একটা বংশ বা সম্ভবত এক একটা ভ্রাতৃত্ব। আবার ট্লাস্কেলুকাসরা বসবাস করত একটা পাঁচভাগের গৃহে। ট্লাস্কালাতেও অবশ্য চারটে ভাগে বাস করত চারটে বংশ বা সম্ভবত চারটে ভ্রাতৃত্ব।

এট্রুস্কান গোত্র।

এইভাবে এবং অন্যান্য কিছু উপায়ে তিনশটা গোত্র রোমে একত্রিত হয়েছিল এবং সেখানে তারা সংগঠিত হয়েছিল বিভিন্ন কিউরিয়া ও গোষ্ঠীতে। এদের পরস্পরের গোষ্ঠীগত বংশধারায় অল্পস্বল্প পার্থক্য ছিল। যেমন র‍্যামনেসরা ছিল লাতিন গোষ্ঠীভুক্ত, টিটিরা ছিল মূলত স্যাবাইন গোষ্ঠীর লোক আর লুকেরেসরা খুব সম্ভবত লাতিন গোষ্ঠীভুক্ত হলেও অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রচুর লোকজন এদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, গোত্রগুলো একটা কিউরিয়ার অন্তর্গত, কিউরিয়াগুলো একটা গোষ্ঠীর অন্তর্গত আর গোষ্ঠীগুলো একটা গোত্রীয় সমাজের অন্তর্গত—এইরকম একটা কমবেশি জোর করে গড়ে তোলা ব্যবস্থার মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল রোমান জনগন ও তাদের সংগঠন। তবে, একমাত্র শেষ সংগঠনটা বাদে বাকি প্রতিটা সংগঠনেরই একটা নমুনা বা প্রাথমিক রূপ তাদের মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল, যেখানে প্রতিটা কিউরিয়ার অন্তর্গত জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্ত গোত্রগুলোই ছিল তার স্বাভাবিক বনিয়াদ, আর একই বংশভুক্ত প্রতিটা গোষ্ঠীরও স্বাভাবিক বনিয়াদ হিসেবে কাজ করত তার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ গোত্রগুলো। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নতুন ভাবে, কিউরিয়ার মধ্যে গোত্রের এবং গোষ্ঠীর মধ্যে কিউরিয়ার একটা সংখ্যাগত অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছিল, আর গোষ্ঠীগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল একটা একক জন-সম্প্রদায় হিসেবে। এটাকে বলা চলে আইনগত বাধ্যবাধকতার সাহায্যে সংগঠিত বিকাশ, কেননা এভাবে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বাইরের লোকেদের মিশ্রণ পুরোপুরিভাবে ঠেকানো যায় নি, আর তাই সৃষ্টি হয়েছিল একটা নতুন নাম—ট্রাইবাস। এই শব্দটার অর্থ হল জনসাধারণের তৃতীয় অংশ। এই শব্দটার সাহায্যেই ঐ নতুন সংগঠনকে চিহ্নিত করা হত। গ্রীক ভাষায়, 'ফাইলন' মানে গোষ্ঠী। কেননা তাদের মধ্যেও একই সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এরকম কোন শব্দ লাতিন ভাষায় থেকে থাকলেও আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঐ নতুন শব্দের উদ্ভাবন থেকে বোঝা যায় রোমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নানা ধরনের লোক থাকত, কিন্তু গ্রীকদের গোষ্ঠীগুলো ছিল একেবারে নিখাদ, নির্দিষ্ট গোত্রের বংশধারার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত লোকেরাই শুধুমাত্র ঠাঁই পেত গোষ্ঠীতে।

লাতিন সমাজের পূর্বতন গঠনকাঠামো সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি মূলত রোমুলাসের নামে চিহ্নিত আইন থেকেই, কারণ ঐ আইনের মধ্যে লাতিন গোষ্ঠীগুলোর পুরনো গঠনপদ্ধতির কথা বিবৃত হয়েছে, এবং সেই পদ্ধতিকে যতদূর বিচক্ষণতার সঙ্গে উন্নত ও পরিবর্তিত করারও চেষ্টা হয়েছে। পুরনো প্রধানদের পরিষদ হয়ে উঠেছে ব্যবস্থাপক সভা, কিউরিয়াভিত্তিক গণ-পরিষদের বদলে এসেছে কমিশিয়াকিউরিয়াটা। বিচক্ষণতা চোখে পড়ে সার্বজনীন সেনাপতি পদের ক্ষেত্রে এবং নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সাংগঠনিক ক্রমমালার ক্ষেত্রে। এই বিচক্ষণতা আরও বেশি করে দেখা যায় স্বীকৃত সমস্ত অধিকার, সুযোগ সুবিধে ও দায়-দায়িত্ব সহ গোত্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মধ্যে। তাছাড়াও, রোমুলাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর অব্যবহিত উত্তরসূরিদের দ্বারা পরিমার্জিত সরকার গোত্রীয় সমাজকে তাঁর সর্বোচ্চ কাঠামোগত রূপে পোঁছে দিতে পেরেছিল। সারা পৃথিবীর আর কোথাও কোন গোত্রীয় সমাজ কাঠামোগতভাবে অতটা উন্নত হতে পারে নি কোনদিন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে সার্ভিয়াস

টিউলিয়াস কর্তৃক রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক আগের যুগ।

আইনপ্রণেতা হিসাবে রোমুলাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে রোমান ব্যবস্থাপক সভা গড়ে তোলা। ঐ সভায় ছিল মোট একশজন সদস্য। প্রতিটি গোত্র থেকে একজন, অর্থাৎ প্রতিটি কিউরিয়া থেকে দশ জন করে সদস্যকে নেওয়া হয়েছিল। সরকারের মুখ্য উপাদান হিসাবে প্রধানদের পরিষদকে প্রতিষ্ঠিত করাটা লাতিন গোষ্ঠীগুলোর কাছে নতুন কিছু ছিল না। স্মরণাতীত কাল থেকেই এই পরিষদের অস্তিত্ব এবং তার কর্তৃত্বে তারা অভ্যস্ত। তবে, সম্ভবত রোমুলাসের আমলের আগে গ্রীকদের প্রধানদের পরিষদের মতো এদের পরিষদেরও পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তা পরিনত হয়েছিল একটা বিচার-বিবেচনাকারী সংস্থায়, এর কাজ ছিল সবথেকেগুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলো নির্ধারণ করে সেগুলো গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যানের জন্য গণ-পরিষদের কাছে পেশ করা। প্রধানদের পরিষদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার আগে জনসাধারণ যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল কার্যত এটা ছিল সেই ক্ষমতারই পূর্ণগ্রহণ। কোন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলো গণ-পরিষদের সম্মতি ছাড়া কার্যকরী করা যেত না। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রধানদের পরিষদ বা সমর-নায়ক নয়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল জনসাধারণই। গণতান্ত্রিক নীতি তাদের সমাজব্যবস্থার কতখানি গভীরে প্রবেশ করেছিল সেটাও বোঝা যায় এ থেকে। রোমুলাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক-সভার কার্যকলাপ বহুলাংশে সেই পূর্বতন প্রধানদের পরিষদের মতো হলেও, বেশ কিছু বিষয়ে এই সভা ঐ পরিষদের থেকে উন্নত ছিল। এটা গড়ে উঠতে গোত্রের প্রধানদের অথবা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে। নিয়েবুর বলেছেন, "ব্যবস্থাপক-সভায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিটি গোত্র তাদের নিজ নিজ ডেকুরিয়নকে (decurion) পাঠাত, যারা ছিল তাদের পৌরমুখ্য।"[১] ফলে, একেবারে সূচনার সময় থেকেই এটা ছিল একটা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনভিত্তিক সংস্থা, এবং রোমান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার সময় পর্যন্ত নির্বাচনভিত্তিক বা মনোনয়নভিত্তিকই ছিল। সভার সদস্যরা সারা জীবনের জন্য ঐ পদের অধিকারী হত, কেননা কোন পদের অন্য কোনরকম কার্যকাল তখন তাদের জানা ছিল না। ফলে আজীবন সদস্যপদ প্রাপ্তিটা ছিল নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। লিভির মতে, প্রথম ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের রোমুলাসই মনোনীত করেছিলেন। কথাটা সম্ভবত ঠিক নয় কেননা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো যে তত্ত্ব অনুযায়ী পরিচালিত হত, তার সঙ্গে এইভাবে মনোনয়ন করাটা ঠিক খাপ খায় না। লিভি বলেছেন, ব্যবস্থাপক সভার জন্য একশ জন সদস্যকে মনোনীত করেছিলেন রোমুলাস; ঠিক একশজনকে বাছাই করার পিছনে দুটো কারণ থাকতে পারে: হয় একশজনই যথেষ্ট ছিল, অথবা ফাদার হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি একশ জনের বেশি ছিল না। সরকারী পদমর্যাদার জন্যই এদেরকে ফাদার বলা হত, আর এদের বংশধররা পরিচিত হয়েছিল প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত নামে।[২] ব্যবস্থাপক-সভার প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার চরিত্রবিশিষ্ট হওয়া, এর সদস্যদের

১। "হিস্ট্রি অফ রোম" i, ২৫৮.

২। Centum creat senators : siva quia is numerus satis erat, sive soli centum erant, qui creari patres possent patres certd abhonore, patriciique progenies corum appellati—লিভি, i, ৮ এবং সিসেরো : Principes, qui appellati sunt prepter caritatem, patres.—"De Rep,"ii, ৪.

জনগনের ফাদার বা অভিভাবক আখ্যা পাওয়া, আজীবন কাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকার ব্যবস্থা, আর সবার ওপরে তাদের সন্তানদের এবং বংশের সমস্ত উত্তরসূরিদের প্যাট্রিসিয়ানের মর্যাদা লাভ করা—এই সবকিছু থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তাদের সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে পদাধিকারের একটা অভিজাতসুলভ ব্যবস্থা শক্তপোক্ত হয়ে চেপে বসেছিল। নিজের সম্মানজনক কাজ, গঠনকাঠামো এবং তার সদস্যদের ও তাদের বংশধরদের অভিজাত হিসাবে চিহ্নিত হওয়া—এগুলোর দরুণ রোমান ব্যবস্থাপক-সভা পরবর্তী কালের রাষ্ট্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করতে পেরেছিল। গোত্রভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে এই প্রথম রোপিত হল অভিজাততন্ত্রের বীজ। এই অভিজাততান্ত্রিক উপাদানই রোমান প্রজাতন্ত্রকে মিশ্র প্রকৃতির করে তুলেছিল আর তারই অনিবার্য ফল হিসাবে মাথা তুলেছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং পতন ঘটেছিল রোমান জাতির। এই উপাদান রোমের সামরিক গৌরব এবং বিজয় অভিযানকে আরও বাড়িয়েও তুলতে পারত, কেননা একেবারে প্রথম থেকেই রোমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো একটা সামরিক উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তা না করে সে এই মহান ও অতুলনীয় জাতিটির গৌরবের যুগকে সংক্ষিপ্ত করে দিল এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিল—সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবেই যে-কোন সুসভ্যজাতিকে ধ্বংস করে দিতে বাধ্য। আধা-অভিজাততান্ত্রিক আধা-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আমলে রোমানরা বিপুল কীর্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু, বিভিন্ন শ্রেণীর অসম সুযোগ-সুবিধে ও নির্মম দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়ে সকলকে সমান স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হলে এই কীর্তি আরও মহত্তর হতে পারত আর তার ফসলগুলোও টিকে থাকত আরও দীর্ঘদিন। ব্যবস্থাপক-সভার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠা অভিজাততান্ত্রিক উপাদানকে নির্মূল করা এবং গণতন্ত্রের পুরনো নীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রোমের সাধারণ মানুষ যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়েছিল, মানবজাতির ইতিহাসে তা এক বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়।

স্যাবাইনদের সঙ্গে সংযুক্তির পর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে দুশো জন করা হয়। এই অতিরিক্ত একশ জন সদস্য[১] নেওয়া হয় টিটিস্ গোষ্ঠী থেকে। টার্কিনিয়াস প্রিস্কাস এর আমলে যখন লুকেরেসদের গোত্রের সংখ্যা বেড়ে একশয় দাঁড়ায়, তখন এই গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে আরও একশ জন সদস্যকে ব্যবস্থাপক সভায় নেওয়া হয়।[২] লিভির এই বক্তব্যের সঙ্গে কিন্তু সিসেরোর বক্তব্যের মিল নেই। সিসেরো বলেছেন, ব্যবস্থাপক সভার আদি সদস্য সংখ্যাকে দ্বিগুন করে তুলেছিলেন টার্কিনিয়াস প্রিস্কাস।[৩] দুজনের বক্তব্যের এই অমিলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্মিৎজ্ চমৎকারভাবে বলেছেন, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা শেষ বার বাড়ানোর আগে সদস্যসংখ্যা হয়ত দেড়শয় নেমে এসেছিল, তখন প্রথম দুটো গোষ্ঠী থেকে আরও মোট পঞ্চাশজন সদস্যকে যুক্ত করে সংখ্যাটা দুশোয় নিয়ে যাওয়া হয়, আর তৃতীয় গোষ্ঠীটার থেকে নেওয়া হয় বাকি একশ জনকে। র‍্যাম্‌নেস এবং টিটিস গোষ্ঠী থেকে নেওয়া সদস্যদের এর পর

১। ডায়োনিসায়াস, ii, ৪৭

২। লিভি, i, ৩৫.

৩। সিসেরো, De Rep, ii, ২০.

থেকে বলা হত 'বড় গোত্রগুলোর অভিভাবক' (Patres maiorum gentium), আর লুকেরেস গোষ্ঠী থেকে নেওয়া সদস্যদের বলা হত 'ছোট গোত্রগুলোর অভিভাবক (Patres minorum gentium) ।[১] এ থেকে মনে হয়, ব্যবস্থাপক সভার তিনশ জন সদস্য আসলে ছিলেন তিনশটা গোত্রের প্রতিনিধি, অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যেকে এক একটা গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাছাড়া, প্রতিটা গোত্রের যেহেতু একজন করে নিজস্ব মুখ্য-প্রধান (Princeps) থাকত, তাই এটা খুবই সম্ভব যে হয় তাকে তার গোত্রই ঐ পদের জন্য নির্বাচিত করত, অথবা দশটা গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা কিউরিয়ার তরফ থেকেই ঐ দশটা গোত্রের মুখ্য-প্রধানদের নির্বাচিত করত, অথবা দশটা গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা কিউরিয়ার তরফ থেকেই ঐ দশটা গোত্রের মুখ্য প্রধানদের নির্বাচিত করা হত। রোমানদের সম্বন্ধে এবং গোত্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের যা জানা আছে, তার সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচনের এই ব্যবস্থাটা অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ।[২] প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যবস্থাপক-সভার শূন্যস্থানগুলোর অধ্যক্ষরা নিজেদের পছন্দমতো ব্যক্তিদের দিয়ে পূরণ করে নিতেন, এবং একসময় এই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় প্রধান শাসকদ্বয়ের হাতে। সাধারণত উচ্চপদস্থ প্রাক্তন বিচারপতিদের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করা হত এইসব সদস্যদের।

ব্যবস্থাপক সভার হাতে থাকত যথেষ্ঠ পরিমান প্রকৃত ক্ষমতা। যাবতীয় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের সূচনা হত এই সভা থেকেই। তার মধ্যে কিছু কিছু বিষয় এই সভা নিজেই

১। সিসেরো, "De Rep", ২০.

২। নিবুহর ঠিক এই মতই ব্যক্ত করেছিলেন। "আরও এগিয়ে গিয়ে নিদ্বিধায় বলা যায়, বংশের (গোত্রের) সংখ্যা সম্পূর্ণ হওয়ার পরই তারা ব্যবস্থাপক-সভার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়। ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যসংখ্যা ছিল ঠিক বংশগুলোর সংখ্যার সমান। ঐসভায় তিনশ জন সদস্য ছিল তিনশটি বংশের প্রতিনিধি। এই দুটো সংখ্যা যে সমান সমান ছিল, তা আমরা আগেই যুক্তি সহকারে দেখিয়াছি। প্রতিটা গোত্র তাদের ডেকুরিয়ানদের প্রেরণ করত ব্যবস্থাপক-সভায়। এই ডেকুরিয়নরা ছিল তাদের পৌর-মুখ্য এবং ব্যবস্থাপক-সভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের যে সভাগুলো হত, সেগুলোর সভাপতির ভূমিকাও পালন করত এরাই......। রাজারা নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের নিয়োগ করতেন—এমনটা কখনোই আদি প্রথা হতে পারে না। এমনকি ডায়োনিয়াসও অনুমান করেছেন যে, সভার সদস্যদের নির্বাচন করা হত। তবে এই নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর ধারনাটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, এবং অন্তত প্রথম দিকে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হত তাদের বংশের দ্বারাই, কিউরিয়ার দ্বারা নয়।" —"হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৫৮, প্রধান যদি "পদাধিকার বলে" ঐ পদের অধিকারী না হত, তাহলে কিউরিয়ার দ্বারা নির্বাচনটা নীতিগতভাবে খুবই সম্ভব ছিল, কারণ কোন কিউরিয়ার মধ্যেকার প্রতিটি গোত্রের প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকত। একই কারণে কোন ইরোকোয়া গোত্রের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সাচেমের মনোনয়ন একমাত্র তখনই সম্পূর্ণ হত যখন সেই গোষ্ঠীর অন্যান্য গোত্রগুলোও তার নির্বাচনকে অনুমোদন করত।

কার্যকরী করতে পারত, আবার কিছু কিছু বিষয় কার্যকরী করার আগে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হত গণ-পরিষদের কাছে। জনকল্যানমূলক কাজের তত্ত্বাবধান, অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থাপনা, কর আদায় এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য অর্থ সংগ্রহ, রাজস্ব ও খরচখরচা নিয়ন্ত্রণ—এইসব কাজের দায়িত্ব থাকত ব্যবস্থাপক সভার হাতেই। ধর্মীয় বিষয়গুলোর পরিচালনভার যাজকদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের হাতে থাকলেও, ধর্মের ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতাও ব্যবস্থাপক সভার হাতেই থাকত। নিজের কার্যকলাপ আর দক্ষতার দরুণ এই সভা গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে সবথেকে প্রভাবশালী সংস্থা হয়ে উঠতে পেরেছিল।

গণ-পরিষদ, যার স্বীকৃত অধিকার ছিল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার এবং সেগুলোকে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার, তার অস্তিত্ব বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে ছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু, বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে এর অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা খুঁজে পেয়েছি। এর অস্তিত্ব ছিল গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর গণ-সমাবেশের মধ্যে এবং সর্বোচ্চ রূপে উন্নীত হয়েছিল এথেনীয়দের লোকসভার মধ্যে। লাতিন গোষ্ঠীগুলোর সৈনিক পরিষদের মধ্যেও দেখি এর ছায়া, যার সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে রোমানদের 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা।' সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গোত্রীয় সমাজের তৃতীয় শক্তি হিসেবে মাথা তোলে গণ-পরিষদ, যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করা এবং মানুষের সম্পত্তি বা অধিকারের ওপর প্রধানদের পরিষদ ও সেনাপতির অবৈধ হস্তক্ষেপ প্রতিহত করা। বন্যতার যুগে গোত্র প্রতিষ্ঠার পর, সোলোন ও রোমুলাসের আমলে—প্রাচীন গোত্রীয় সমাজে সর্বদাই সক্রিয় ছিল জনগণের অধিকারের এই ধারণাটা। প্রথম দিকে প্রধানদের পরিষদের সামনে কথা বলার সুযোগ পেত জনসাধারণের মুখপাত্ররা। জনমত প্রভাবিত করত ঘটনাবলীকে। কিন্তু, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা যখন থেকে গ্রীক ও লাতিন গোত্রগুলোর কথা জানতে পারছি, তখন গণপরিষদ (রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা-সম্পন্ন) ঠিক প্রধানদের পরিষদের মতোই একটা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছে। সোলোনের আমলে এথেন্সে এই পরিষদ যতটা সুব্যবস্থিত হতে পেরেছিল, তার থেকে অনেক বেশি সুব্যবস্থিত হয়ে উঠেছিল রোমে, রোমুলাসের সংবিধান মারফৎ। এই প্রতিষ্ঠানটির অভ্যুদয় ও অগ্রগতির মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতির বিকাশের ধারাও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

রোমানরা এই পরিষদের নাম দিয়েছিল 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা,' কারণ গোত্রের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যারা কিউরিয়ার ভিত্তিতে একটা পরিষদে মিলিত হত এবং সেইভাবেই ভোট দিত। প্রতিটা কিউরিয়া একটা করে যৌথ ভোট দিতে পারত, প্রতিটা কিউরিয়ার সংখ্যাগুরুর মতামত নির্ধারিত হত পৃথক পৃথক-ভাবে এবং এইভাবে তারা আগে-থেকেই ঠিক করে নিত কোন প্রস্তাবের পক্ষে না বিপক্ষে ভোট দেওয়া হবে।[১] কেবল মাত্র গোত্র-পরিষদের সদস্যরাই সরকারের সদস্য হতে পারত। প্লিবিয়ান বা সাধারণ মানুষরা আর অভিজাতদের অনুচরেরা, যারা ততদিনে সংখ্যায় বেশ

১। লিভি, i, ৪৩, ডায়োনিসায়াস, ii, ১৪ ; iv, ২০, ৮৪.

ভারিই হয়ে উঠেছিল, তাদেরকে এর মধ্যে নেওয়া হত না, কেন-না গোত্র ও গোষ্ঠীর মারফত ছাড়া 'পপ্‌লাস রোমানাস'-এর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকত না। আগেই বলা হয়েছে যে, এই পরিষদ নিজে থেকে কোন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া কিম্বা তার কাছে পেশ করা কোন প্রস্তাবকে সংশোধন করার অধিকারী ছিল না। কিন্তু, একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেকার কোন প্রস্তাবই 'কমিশিয়া'-র সম্মতি ছাড়া কার্যকরী করা যেত না। যাবতীয় আইনই এই পরিষদ কর্তৃক চালু হত অথবা প্রত্যাহৃত হত। 'রেক্স' সমেত সমস্ত বিচারক ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম-কর্তাদের এই পরিষদ নির্বাচন করত ব্যবস্থাপক-সভার মনোনয়নের ভিত্তিতে।[১] পরিষদের একটা আইনের সাহায্যে (lex curiata de imperio) এই সব ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হত। কাউকে কোন পদে অধিষ্ঠিত করানোর ব্যাপারে এটাই ছিল রোমানদের পদ্ধতি। নির্বাচন হওয়ার পরেও, এইভাবে ক্ষমতা অর্পিত না হওয়া পর্যন্ত কেউই তার পদের অধিকারী হতে পারত না। কোন রোমান নাগরিকের জীবন-মরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে, আবেদন করা হলে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার অর্পিত হত 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা'-র হাতে। জনগণের একটা সার্বিক আন্দোলনের ফলে 'রেক্স' পদটা অবলুপ্ত হয়। গণপরিষদের হাতে নিজে থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষমতা কখনোই ছিল না সত্যি, কিন্তু তার ক্ষমতাটা ছিল একান্তই বাস্তব এবং যথেষ্ট প্রভাবসম্পন্ন। এই সময়ে রোমান জনগণই সার্বভৌম ছিল।

নিজের অধিবেশন ডাকার কোন অধিকার এই পরিষদের ছিল না। অধিবেশন বসত রেক্স-এর আহ্বানে, তাঁর অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষের (praefectus urbi) আহ্বানে। প্রজাতন্ত্রের আমলে এই অধিবেশন আহ্বানের অধিকারী ছিলেন প্রধান শাসকদ্বয়, তাঁদের অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতিরা। সমস্ত ক্ষেত্রেই এই অধিবেশন যাঁরা আহ্বান করতেন, তাঁরাই হতেন সভার সভাপতি।

রেক্স পদটা সম্বন্ধে আরও কিছু বলার আছে। রেক্স ছিলেন একজন সেনাপতি এবং পুরোহিত কিন্তু কোন কোন লেখক বলেছেন, কোনরকম অসামরিক ক্ষমতা থাকত না

১ নুমা পম্পিলিয়াস (সিসেরো, "De Rep .." ii, ১২, লিভি, i, ১৭), টিউলাস হষ্টিলিয়াস (সিসেরো, "De Rep.," ii, ১৭,) এবং আঙ্কাস মার্তিয়াস (সিসেরো, "DeRep," ii, ১৮, লিভি, i, ৩২)—এই তিনজনকে নির্বাচিত করেছিল "কমিশিয়া কিউরিয়াটা।" লিভি বলেছেন, ব্যাপক সংখ্যক মানুষের যৌথ সম্মতিই টার্কিনিয়াস প্রিস্কাসকে "রেক্স" পদে নির্বাচিত করেছিল (i, ৩৫)। অর্থাৎ, 'কমিশিয়া কিউরিয়াট."-র দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রিস্কাস। সার্ভিয়াস টিউলিয়াস যে পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই পদটা অনুমোদিত হত "কমিশিয়া"-র দ্বারাই (সিসেরো, "De Rep., ii, ২১)। এইভাবে, জনগনের হাতেই কাউকে নির্বাচন করা-না-করার অধিকার অর্পিত হওয়া থেকে বোঝা যায় "রেক্স" পদটা তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল, এবং যে ক্ষমতার সে অধিকারী হত, সেটা জনসাধারণই তার হাতে অর্পণ করত।

রেক্স-এর হাতে। [১] সেনাপতি হিসেবে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং নগরে সেনাবাহিনীর ওপর তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকত বলে ধরে নেওয়া যায় (ঠিক কতটা ক্ষমতা থাকত তাঁর হাতে, জানা যায় নি)। বিশেষ বিশেষ কিছু ঘটনায় কিছু অসামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তাঁর থাকত বলে ধরে নিলে এটাও মেনে নিতে হয় যে ঐ অধিকার শুধু এক একটা নির্দিষ্ট ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। রেক্স বলতে অনেকে রাজাই বোঝেন। কিন্তু তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করার অর্থ হল, যে জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের তিনি অংশীদার ছিলেন এবং যে-সব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ঐ সরকার—তাকে খাটো করা ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হাজির করা। যে ধরণের সরকারের মধ্যে রেক্স এবং ব্যাসিলিয়ুস পদের উদ্ভব ঘটেছিল, তা গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, এবং গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর ঐ ধরণের সরকারও আর টিকে থাকতে পারে নি। এ এক বিচিত্র সংগঠন, যার সমতুল কোন সংগঠন আধুনিক সমাজে নেই। রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্ভাবিত কোন অভিধার সাহায্যে এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যবস্থাপক-সভার নিয়ন্ত্রণাধীন একটা সামরিক গণতন্ত্র, একটা গণ-পরিষদ, আর তাদের দ্বারা মনোনীত ও নির্বাচিত একজন সেনাপতি—এটাই হচ্ছে ঐ বিচিত্র সরকারের মোটামুটি রূপরেখা। এ সরকার পুরোপুরিভাবেই প্রাচীন সমাজের নিজস্ব জিনিস, এবং মূলত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদের ওপরেই গড়ে উঠতে পেরেছিল এ সরকার। খুব সম্ভবত নিজের বিরাট সাফল্যের বলে বলীয়ান হয়েই ক্ষমতা দখল করেছিলেন রোমুলাস। ব্যবস্থাপক-সভা এবং জনসাধারণ কিন্তু এই ঘটনায় বিপদের ছায়া দেখেছিল। শোনা যায়, রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন রোমুলাস, কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি তাঁর। আমাদের অনুমান, রোমান প্রধানরা তাঁকে হত্যা করেছিলেন। নৃশংস কাজ, সন্দেহ নেই। তবে, এর মধ্যে কিন্তু গোত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেই স্বাধীনতার আকাঙ্খাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। কোন ব্যক্তিবিশেষের যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগ বরদাস্ত করতে অভ্যস্ত ছিল না তারা। ঐ পদটা যখন বিলুপ্ত হয় এবং তার বদলে সৃষ্টি করা হয় শাসকের পদ, তখন কিন্তু একজনকে নয়, দুজনকে শাসক পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় তারা। ব্যাপারটা মোটেই বিস্ময়কয়কর কিছু নয়। শাসকের ক্ষমতা হাতে পেয়ে একজন মানুষ যথেচ্ছাচারী

১। গ্রীক এবং রোমানদের রাজতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম দৃঢ় সমর্থক মিস্টার লিওনার্দ স্মিৎজ অকপটে বলেছেন: রাজারা ঠিক কতটা ক্ষমতায় অধিকারী ছিলেন, তা বলা মুস্কিল। কেননা, প্রাচীন কালের লেখকরা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের নিজেদের যুগের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের আলোয় বিচার করেছেন রাজতন্ত্রের আমলকে। ফলে, যে-সব ক্ষমতা ও কার্যকলাপ কেবলমাত্র তাঁদের যুগের প্রধান শাসকদ্বয়, ব্যবস্থাপক-সভা আর 'কমিশিয়া' সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, সেগুলোকেই তাঁরা প্রায়শই আরোপ করেছেন রাজতন্ত্রের আমলের রাজা, ব্যবস্থাপক-সভা আর 'কিউরিয়ার কমিশিয়া'-র ওপর।—স্মিথ-এর ডিকশনারী অব গ্রীক অ্যাণ্ড রোমান অ্যান্টিকুইটি। প্রবন্ধ—রেক্স থেকে উদ্ধৃত।

হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু দুজন হলে সে বিপদটা কম থাকে। এ ধরণের কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও, মিত্রসঙ্গের জন্য দুজন সমর-নায়কের পদ সৃষ্টি করে ইরোকোয়ারাও একই রকম বিবেচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছিল। কেন না, সর্বাধিনায়কের পদটা কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের ওপর অর্পিত হলে সে অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারত। প্রধান পুরোহিত হিসেবে যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রারম্ভে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করার অধিকারী ছিলেন রেক্সই। রোমানদের ধর্মীয় ব্যবস্থায় এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। নগরে তো বটেই, এমনকি যে-কোন যুদ্ধের আগে যুদ্ধক্ষেত্রে বসে গণনা করতেন রেক্স। এই গণনাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করত তারা। অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও পৌরহিত্য করতেন রেক্স। এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে গ্রীকদের মতো রোমানদের মধ্যেও সর্বোচ্চ সামরিক পদের অধিকারীরাই পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করত। রেক্সের পদ বিলুপ্ত হওয়ার পর তাঁর ধর্মীয় কাজগুলো অন্য কারুর হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সৃষ্টি করা হয় 'রেক্স স্যাক্রিফিকুলাস, বা 'রেক্স স্যাক্রোরাম'-এর পদ। এই পদের অধিকারীই পালন করতেন উদ্দিষ্ট ধর্মীয় কাজগুলো। এথেনীয়দের নয়জন আর্কনের মধ্যে দ্বিতীয় জনও (যাঁকে বলা হত 'আর্কন ব্যাসিলিয়ুস') এই একই দায়িত্ব পালন করতেন, ধর্মীয় বিষয়গুলোর তদারকির ভার থাকত তাঁরই হাতে। রোমান ও গ্রীকদের ক্ষেত্রে রেক্স আর ব্যাসিলিয়ুস পদের সঙ্গে এবং আজটেকদের ক্ষেত্রে 'টিউক্টলি পদের সঙ্গে ধর্মীয় কাজ-গুলো কেন সংযুক্ত থাকত, আর রোমান ও গ্রীকদের ক্ষেত্রে ঐ পদদুটো বিলুপ্ত হওয়ার পর সাধারণ পুরোহিতরা কেন তাদের কাজগুলো করে উঠতে পারত না— তা অবশ্য জানা যায় নি।

রোমুলাসের আমল থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমল পর্যন্ত দুশ বছরেরও বেশি সময়ে রোমের গোত্রভিত্তিক সমাজের ছবিটা এ-রকমই ছিল। এই সময়-টুকুর মধ্যেই গড়ে উঠেছিল রোমান শক্তির বনিয়াদ। আগেই বলা হয়েছে, সরকারের মধ্যে থাকত তিনটে শক্তি-ব্যবস্থাপক সভা, গণ-পরিষদ আর সেনাপতি। বিভিন্ন রীতি আর প্রথার বদলে নিজেরাই একটা সুনির্দিষ্ট লিখিত নিয়ম কানুন চালু করার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেছিল। রেক্স-এর পদটার মধ্যেই সুপ্ত ছিল মুখ্য কার্যনির্বাহী বিচারক পদের ভ্রূণ। তীব্র প্রয়োজন থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই পদটা সৃষ্টি করার তাগিদ। রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর এই পদটা আরও পূর্ণাঙ্গ চেহারা নিয়েছিল। কিন্তু সেই যুগে সরকার সংক্রান্ত উন্নততর ধারণার সঙ্গে তারা খুব একটা পরিচিত ছিল না। ফলে এই পদটা তাদের চোখে একটা বিপজ্জনক পদ হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছিল, কেননা রেক্স-এর ক্ষমতায় ঠিক কোন সীমা নির্দিষ্ট করা ছিল না, আর তা করা মুস্কিলও ছিল। এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে জনসাধারণের সঙ্গে টার্কিনিয়াস সুপারবাস্-এর তীব্র বিরোধ বাধার পর জনসাধারণ তাকে বরখাস্ত করে এবং পদটা বিলুপ্ত করে দেয়। কোন রাজার দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের মতো যে-কোন ঘটনাই তাদের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করত, বাধত সংঘাত, এবং জয়ী হত স্বাধীনতাই। তবে, সরকারী কাঠামোর মধ্যে অল্প কয়েকজন কার্য নির্বাহক নিয়োগ করতে তাদের আপত্তি ছিল না, তাই সৃষ্টি করা দুজন শাসকের পদ। এ ঘটনা ঘটেছিল

রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর।
ভূখণ্ড এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সার্ভিয়াস টিউ-লিয়সের আমলের আগে পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। কিন্তু তার আগেকার ঐ-সব ঘটনাগুলো ছিল এ-রকম একটা রাষ্ট্র গড়ারই প্রস্তুতি। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও তারা সৃষ্টি করেছিল নগর শাসকের পদ এবং অশ্বারোহী বাহিনী সমেত একটা পূর্ণাঙ্গ সামরিক ব্যবস্থা। সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলে পুরোপুরি গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক রোম পরিণত হয়েছিল ইতালির শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে।
নতুন যে-সব শাসকপদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নগর শাসকের (custos urbis) পদটা ডায়োনিসায়াস বলেছেন, প্রথম নগর শাসককে নিযুক্ত করেছিলেন রোমুলাস স্বয়ং।[১] ব্যবস্থাপক সভার প্রধানকেই (p:inceps senatus) নিযুক্ত করা হত এই পদে। নিজের সভা ডাকার অধিকার ব্যবস্থাপক-সভার ছিল না। সভার অধিবেশন আহ্বান করতেন ঐ প্রধান বা নগর শাসক। আরও জানা যায় যে ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশন ডাকার অধিকার রেক্স-এরও ছিল। ধরে নেওয়া যায়, রেক্স-এর অনুরোধে এবং সভার নিজস্ব প্রধানদের আহ্বানে অধিবেশন বসত ব্যবস্থাপক-সভার। কিন্তু ঐ সভার কার্যকলাপের স্বাধীনতা, তার নিজস্ব মর্যাদা এবং প্রতি-নিধিত্বমূলক চরিত্রের দিক থেকে বিচার করলে স্পষ্টই বোঝা যায়—নিজের হুকুমে সভার অধিবেশন ডাকার অধিকার রেক্স-এর ছিল না। দশজন সভ্যবিশিষ্ট আইনসভার (Decemvirs) আমলের পর পদটার নামকরণ করা হয় নগরাধ্যক্ষ (proefectus-urbi)। পদাধিকারীর ক্ষমতাও বাড়ানো হয় এবং তাকে নির্বাচন করার দায়িত্ব অর্পিত হয় নতুন 'কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটা'-র ওপর। প্রজাতন্ত্রের আমলে ব্যবস্থাপক সভার এবং কমিশিয়ার অধিবেশন ডাকার ক্ষমতা ছিল শাসকদ্বয়ের হাতে, এবং তাঁদের অনুপস্থিতিতে, বিচারপতির হাতে। পরবর্তীকালে এই গ্রামীন পদটির কার্যকলাপ বিচারপতিদের হাতেই বর্তায় এবং তারাই এর উত্তরসূরী হয়ে ওঠে। রোমানদের এই বিচারপতিরা (praetor) আইনসংক্রান্ত বিচারকের ভূমিকা পালন করত। এই পদটাই হচ্ছে আজকের দিনের বিচারক পদের আদিরূপ। এইভাবে সরকার বা সামাজিক প্রশাসনের প্রতিটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানেরই একটা সাদামাটা ভ্রূণরূপ খুঁজে পাওয়া যায় অতীতের কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, যেগুলো গড়ে উঠেছিল মানুষের প্রয়োজনের খাতিরেই, গড়ে উঠেছিল নিতান্তই অমার্জিত রূপে। এদের মধ্যে যেগুলো সময় ও অভিজ্ঞতার ঝড়-ঝাপটা সামলে টিকে থাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, সেগুলো এক একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজের বুকে।
রোমুলাসের আমলের আগে প্রধানপদের স্থায়িত্বকাল কেমন ছিল আর প্রধানদের পরি-ষদের কার্যকলাপই বা কী কী ছিল জানা গেলে রোমুলাসের সমকার রোমান গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা যেত। তাছাড়া, বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবেই অনুসন্ধান চালানো দরকার, কেননা বুদ্ধিমত্তার

১। ডায়োনিসায়াস, ii, ১২

উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছিলো তাদের সামাজিক অবস্থাও। রোমুলাসের আমলের আগেকার ইতালি, সাতজন নৃপতির (reges) আমলের ইতালি, এবং পরবর্তীকালের প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের আমলের ইতালি—এই সব যুগের সরকারের চরিত্র ও ধারণার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। কিন্তু প্রথম যুগের প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বিতীয় যুগেও টিকে ছিল, সেখান থেকে এসেছিল তৃতীয় যুগে, এবং কিছু পরিবর্তন সমেত বিদ্যমান ছিল চতুর্থ যুগেও। এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিকাশ আর পতনের মধ্যেই বিবৃত আছে রোমান জনগণের আমল ইতিহাস। মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে এইসব প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে বিকাশের প্রতিটি স্তরে এগুলোর অস্তিত্ব খুঁজতে খুঁজতে এগোলে আমরা মানুষের চিন্তাশক্তির বিবর্তনের একটা স্পষ্ট ছবি হাতে পাব। দেখতে পাব কিভাবে মানুষের চিন্তাশক্তি তার বন্যদশার শৈশবকাল থেকে বিকাশিত হতে হতে এসে পেঁাছেছে আজকের এই অত্যুন্নত অবস্থায়। সমাজ-সংগঠনের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয়তা থেকেই গড়ে উঠেছিল গোত্র। গোত্র থেকে সৃষ্টি হল তার প্রধান, এবং প্রধানদের পরিষদবিশিষ্ট গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর বিভাজন থেকে গড়ে উঠল বিভিন্ন গোষ্ঠী, তারা আবার একত্রিত হল মিত্রসঙ্ঘে, এবং শেষপর্যন্ত সকলে একটা জাতি হিসেবে একাঙ্গীভূত হল। প্রধানদের পরিষদের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিল গণ-পরিষদ। শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে দুটো পরিষদের মধ্যে একটা ক্ষমতা-বিভাজন করা হল। অবশেষে, সম্মিলিত গোষ্ঠীগুলোর সামরিক প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হল একজন সামরিক সর্বাধিনায়কের পদ। কালক্রমে এই সর্বাধিনায়ক সরকারের তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয়, তবে তাকে প্রথম দুটো শক্তির অধীনেই কাজ করতে হত। এটা ছিল পরবর্তীকালের প্রধান বিচারক, রাজা ও রাষ্ট্রপতি পদেরই ভ্রূণরূপ। যে-সব প্রতিষ্ঠানের অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল বন্যতার যুগে এবং যেগুলো বিস্তৃত হয়েছিল বর্বর দশায়, সেগুলোর ধারাবাহিকতা হচ্ছে আজকের বিভিন্ন সুসভ্য জাতির প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ।

রোমুলাসের মৃত্যুর পরবর্তী রোমান সরকারের চরিত্রটা ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক নয়। সরকারটা ছিল ব্যক্তিভিত্তিক, এলাকাভিত্তিক নয়। তিনটে গোষ্ঠী যে রোম নগরীর চতুঃসীমার মধ্যেই পৃথক পৃথক অঞ্চলে বসবাস করত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের আমলে এটাই ছিল বসবাসের চালু পদ্ধতি। গোত্র, কিউরিয়া এবং গোষ্ঠী হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে আর গোটা সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা ছিল একেবারেই ব্যক্তিভিত্তিক। সরকার তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত এক এক দল ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের মতো করে এবং এই সমগ্র সমাজটাকে সরকার দেখত রোমান জনগণ হিসেবে। এইভাবে তারা স্থিতু হয়েছিল এক একটা ঘেরা অঞ্চলে। ফলে, নানান বিষয়ের জটিলতা বৃদ্ধির দরুন যখন শাসন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটানোটা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল. তখন একটা শহর বা নগর গড়ে তোলার ধারণাটা আপনা থেকেই উদয় হয়েছিল তাদের চিন্তায়। এ এক বিরাট পরিবর্তন, যা গড়ে তুলতে হয়েছিল পরীক্ষামূলক আইন প্রণয়নের সাহায্যে। সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলের অল্প কিছুদিন আগে এথেনীয়রা পা বাড়িয়েছিল এই পথে। প্রতিষ্ঠিত হল রোম, আর তার প্রথম সাফল্যগুলো অর্জিত হল পুরোপুরি গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের

আওতাতেই। কিন্তু, এইসব সাফল্যের মাত্রাই বুঝিয়ে দিয়েছিল—একটা ভূখন্ড ও সম্পত্তির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার দ্বিতীয় রূপের প্রতিষ্ঠানসমূহের পথ প্রশস্ত করার জন্য দরকার হয়েছিল দুশ বছরের নিবিড় সম্মিলিত প্রচেষ্টা। গোত্র, কিউরিয়া আর গোষ্ঠীর হাত থেকে শাসনক্ষমতা নতুন নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে তুলে দেওয়াটাই ছিল আশু কর্তব্য। এ পরিবর্তন ঘটানোর জন্য দরকার ছিল এক দৃঢ় প্রত্যয়—বিকশিত পরিস্থিতির উপযোগী কোন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতা গোত্রের নেই। সঠিক অর্থে প্রশ্নটা ছিল এ-রকম—বর্বরতার যুগেই থেকে যাব আমরা, নাকি এগিয়ে চলব সভ্যতার পথে? পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই নতুন ব্যবস্থার সূত্রপাত নিয়েই আলোচনা করব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রোমান রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠা

রোমের সামরিক গণতন্ত্রের ষষ্ঠ প্রধান সার্ভিয়াস টিউলিয়াস খুব সম্ভবত রোমুলাসের মৃত্যুর একশ তেত্রিশ বছর পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[১] অর্থাৎ তিনি ক্ষমতায় আসেন ৫৭৬—খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ। রোমের বুকে রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মূল কৃতিত্বের দাবীদার এই সার্ভিয়াস টিউলিয়াসই। এখানে আমরা ঐ সমাজব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এবং ঐ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কয়েকটা কারণ উল্লেখ করবার চেষ্টা করব।

রোমুলাসের আমল থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমল পর্যন্ত রোমানদের মধ্যে দুটো শ্রেণী দেখা যেত—'পপুলাস' আর 'প্লিবিয়াস'। দুটো শ্রেণীই সাধারণ-ভাবে স্বাধীন ছিল এবং দুজনরাই ফৌজে যোগ দিতে পারত। কিন্তু প্রথমোক্তরা ছিল গোত্র, কিউরিয়া ও গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সংগঠিত এবং শাসনক্ষমতাও থাকত এদেরই হাতে। অন্যদিকে, প্লিবিয়ানরা কোন গোত্র, কিউরিয়া বা গোষ্ঠীর সদস্য ছিল না, ফলে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করার অধিকারও থাকত না তাদের।[২] তারা কোন পদের অধিকারী হতে পারত না, কর্মিশিয়া কিউরিয়াটায় নেওয়া হত না তাদের ; এবং গোত্রের কোন পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকারও তাদের ছিল না। সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলে এরা সংখ্যায় 'আদি পপুলাস' শ্রেণীর প্রায় সমানই হয়ে উঠেছিল। একটা বিচিত্র অবস্থায় বসবাস করত এরা। সামরিক কাজকর্মে থাকতে হত এদের, নিজেদের পরিবার থাকত, সম্পত্তির অধিকারও ছিল ; এগুলোর সুবাদে রোমের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে এরা ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত হয়ে পড়েছিল। অথচ, শাসনব্যবস্থা বা সরকারের সঙ্গে এরা কোনভাবেই যুক্ত ছিল না আমরা আগেই দেখেছি, গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতায় কোন স্বীকৃত গোত্রের মধ্যস্থতা ছাড়া সরকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা অসম্ভব ছিল, এবং এই প্লিবিয়ানদের কোন গোত্র ছিল না। জনসংখ্যার একটা বড় অংশের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এই অবস্থাটা সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্ট বিপদজনক ছিল। গোত্রীয় সমাজে এ সমস্যার কোন সমাধান

১। ডায়োনিসায়াস, iv, ১

২। নিয়েবুর বলেছেন "সমগ্র জাতির একটা স্বাধীন এবং সংখ্যায় বেশ ভারী অংশ হিসেবে প্লিবিয়ানদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় সেই আঙ্কাস-এর আমল থেকেই। কিন্তু সার্ভিয়াসের আমলের আগে পর্যন্ত এরা কোন ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী হয়ে উঠতে পারে নি, নেহাতই কিছু বিচ্ছিন্ন অংশের সমষ্টি হয়েই ছিল।—"হিষ্ট্রি অফ রোম", পরিচ্ছেদ ১, ২, ৩১৫

ছিল না। তাই বলা যায়, যে-সব কারণের জন্য গোত্রীয় সমাজের বদলে রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল—এটা তার অন্যতম। এ সমস্যার সমাধান করা না গেলে রোমানদের গোটা সামাজিক কাঠামোটাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারত। নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন রোমুলাস, তা পুনরারম্ভ করেছিলেন নুমা পম্পিলিয়াস এবং সম্পূর্ণ করেছিলেন সার্ভিয়াস টিউলিয়াস।

প্লিবিয়ান ও প্যাট্রিসিয়ানদের উদ্ভব এবং পরবর্তীকালে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে, এইসব প্রশ্ন নিয়ে কয়েকটা কথা এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে একটা কিউরিয়া ও একটা গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কোন-না-কোন গোত্রের সদস্য যারা ছিল না, তারাই ছিল প্লিবিয়ান। রোম নগরী প্রতিষ্ঠার আগে ও এক অস্থির যুগের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল রোমানদের। সেই অস্থির যুগে বহু সংখ্যক মানুষ কেন তাদের নিজ নিজ গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, বোঝা খুব একটা কঠিন নয়। আশপাশের গোষ্ঠীগুলো থেকে যে-সব লোক রোমে চলে এসেছিল, যে-সব যুদ্ধবন্দী পরে মুক্তি পেয়েছিল আর রোমে চলে আশা গোত্রগুলোর সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত না হয়েও সেগুলোর সঙ্গে মিশে ছিল যারা—এদের সকলের মিলনের ফলে অতি দ্রুত প্লিবিয়ান শ্রেণীর গড়ে ওঠা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। প্রতিটা গোষ্ঠীর মধ্যে একদশটা করে গোত্র রাখার জন্য কিছু গোত্রের ছোট-খাট অংশকে, আর যে-সব গোত্রের জনসংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার থেকে কম ছিল—যেগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে। এর ফলে কোন গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু লোক আর কোন কিউরিয়ার মধ্যে থাকার অধিকারহীন কিছু গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল। এরা এবং এদের সন্তানসন্ততি ও বংশধররা দ্রুতই পরিণত হয়েছিল একটা জনবহুল শ্রেণীতে। এর শ্রেণীটাই হচ্ছে রোমান প্লিবিয়ান শ্রেণী যারা রোমের গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার সদস্য ছিল না। রোমানদের তৃতীয় স্বীকৃত গোষ্ঠী লকেরেশদের মধ্যে যারা ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য ছিল, তাদেরকে বলাহত "ছোট গোত্রগলোর অভিভাবক।" এ থেকে অনুমান করা যায় যে আদি গোত্রগুলো এদেরকে নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ বলে মেনে নিতে ঠিক রাজি ছিল না! আরও গুরুতর কারণে তারা শাসনকার্যে প্লিবিয়ানদের কোনভাবেই অংশগ্রহণ করতে দিত না।

তৃতীয় গোষ্ঠীটাতেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোত্র সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এদের মধ্যে কারুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, আর প্লিবিয়ান শ্রেণীর লোকসংখ্যা আরও দ্রুত হারে বেড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নিয়েবুর বলেছেন, আংকাস-এর আমলেও এই প্লিবিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে ঐ সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল এই শ্রেণীটি।[১] বিভিন্ন ধরনের অনুচররাও যে প্লিবিয়ান শ্রেণীর

১। "হিস্ট্রী অফ রোম", i, ৩১৫.

অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা তিনি অস্বীকার করেছেন।[১] এই দুটি বিষয়েই তাঁর বক্তব্য ডায়োনিসায়াস[২] এবং প্লুটার্কের[৩] বক্তব্যের থেকে আলাদা। পৃষ্ঠপোষক এবং অনুচরদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বটা ডায়োনিসায়াস ও প্লুটার্ক অর্পণ করেছেন রোমুলাসের ওপর, এবং সিউটোনিয়াসও স্বীকার করেছেন যে রোমুলাসের সময় এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল।[৪] তখন তাদের মধ্যে এমন একটা শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল, যাদের কোন গোত্রীয় মর্যাদা ছিল না, কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের অধিকারও ছিল না। এই শ্রেণীটির জন্য এ-রকম একটা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ছিলই। নিজেদের রক্ষা করা আর নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এবং ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার জন্য এই শ্রেণীর সদস্যরা ঐ সম্পর্ককে কাজে লাগাত। এই ধরণের রক্ষাব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধে ছাড়া গোত্রের সদস্যরা টিকতে পারত না। গোত্রের কোন সদস্য অন্য গোত্রের কাউকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করলে সেটা ঐ প্রথমোক্ত গোত্রের পক্ষে সম্মানজনকও হত না আর গোত্রের দায়দায়িত্বের সঙ্গে সেটা সঙ্গতিপূর্ণও হত না। একমাত্র ঐ গোত্রহীন শ্রেণী বা প্লিবিয়ান শ্রেণীটির সদস্যরাই নিজেদের জন্য অভিভাবক খুঁজে বেড়াত এবং তাদের অনুচর বা পোষ্যে পরিণত হত। আগেই উল্লিখিত বিভিন্ন কারণের দরুণ এইসব অনুচররা পপুলাস বা জনসম্প্রদায়ের কোন অংশ হিসাবে বিবেচিত হত না। রোমানদের সম্পর্কে নিয়েবুরের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটা মেনে নিতেই হবে যে ঐ-সব অনুচররা ছিল প্লিবিয়ান শ্রেণীরই অংশ।

পরের প্রশ্নটা অত্যন্ত দুরূহ। প্রশ্নটা প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিস্তৃতি সংক্রান্ত। এই শ্রেণীটি কি রোমান ব্যবস্থাপক-সভার প্রতিষ্ঠার সময়ই সৃষ্টি হয়েছিল এবং শুধু ঐ ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য, তাদের সন্তানসন্ততি আর বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি প্লিবিয়ানরা বাদে সমগ্র জনসম্প্রদায়ই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল? অধিকাংশ আধুনিক লেখকই বলে থাকেন যে সমগ্র জনসম্প্রদায়ই ছিল প্যাট্রিসিয়ান। রোমানদের ব্যাপারে সবথেকে গভীর বক্তব্য রাখতে পেরেছেন নিয়েবুরই। সমগ্র জনসম্প্রদায়ই যে প্যাট্রিসিয়ান ছিল, এই কথাটা তিনিই বলেন,[৫] এবং লং, শমিৎজ্ ও অন্যান্যরা তা সমর্থন করেন।[৬] প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্ব রোমুলাসের

১। "বিভিন্ন ধরনের অনুচররা যে প্লিবিয়ান জনসাধারণের অংশ ছিল না, অনেক পরবর্তীকালে, যখন ক্রীতদাসত্বের বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল অংশত তাদের প্রভুদের ক্ষয়িষ্ণুতার দরুণ আর অংশত স্বাধীনতার দিকে সমগ্র জাতির অগ্রগতির দরুণ, একমাত্র তখনই যে তারা প্লিবিয়ান শ্রেণীর সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়েছিল—তা এই ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই প্রমাণিত হবে।"—"হিস্ট্রি অফ রোম, i, ৩১৫.

২। ডায়োনিসায়াস, ii, ৮.

৩। প্লুটার্ক, "ভিট্. রোম", xiii, ১৬.

৪। "ভিট্ টাইবেরিয়াস", ১ম পরিচ্ছেদ।

৫। "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৫৬, ৪৫০.

৬। স্মিথ-এর ডিকশনারী…, প্রবন্ধ : গোত্র, প্যাট্রিসি এবং প্লেব্স্।"

আমলেও ছিল।[১] পপ্‌লাস অর্থাৎ সমগ্র জনসম্প্রদায় যদি গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে থাকে, সেই প্রাচীন আমলে যদি সকলেই প্যাট্রিসিয়ান হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হয় যে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রায় কোন পার্থক্যই ছিল না, কেননা প্লিবিয়ান শ্রেণীটি তখন নিতান্তই গুরুত্বহীন ছিল। তাছাড়া, সিসেরো এবং লিভির বক্তব্য এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ডায়োনিসায়াস বলেছেন, ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠার আগেই সৃষ্টি হয়েছিল প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীটা, এবং জন্মসূত্রে, গুণের বিচারে বা সম্পদের দিক থেকে বিশিষ্ট অল্প কিছু ব্যক্তিই ছিল এই শ্রেণীর সদস্য ; দরিদ্র এবং জন্মসূত্রে হীন ব্যক্তিরা এর সদস্য হতে পারত না, যদিও তারা বিভিন্ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] ব্যবস্থাপক-সভার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটা প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা মেনে নিলে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা আর একটা বিশাল শ্রেণীর কথাও মেনে নিতে হয়, যারা প্যাট্রিসিয়ান ছিল না। সিসেরো বলেছেন, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা আর তাদের সন্তানসন্ততিরাই ছিল প্যাট্রিসিয়ান। এদের বাইরে আর কেউ ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেছেন, রোমুলাসের সেই ব্যবস্থাপক-সভা, যাতে শুধু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই ছিল এবং যাদেরকে রোমুলাস এতটাই সম্মান করতেন যে তাদেরকে পিতা বা অভিভাবক বলে অভিহিত করতে চাইতেন, সেই সভা যখন চেষ্টা করেছিল[৩] ইত্যাদি। এখানে ব্যবহৃত পিতা (Patres) শব্দটার যা অর্থ দাঁড়ায়, তা নিয়ে রোমানদের নিজেদের মধ্যেই মতানৈক্য ছিল। কিন্তু 'প্যাট্রিসি' (patricii) শব্দটা (কেননা শ্রেণীটা গড়ে উঠেছিল ঐ-সব পিতা বা অভিভাবকদের নিয়েই) থেকে ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যদের সঙ্গে প্যাট্রিসিয়ানদের সম্পর্কের কথাটা স্পষ্টতই বোঝা যায়। ব্যবস্থাপক-সভা গড়ে ওঠার সময় তার প্রতিটি সদস্যই যেহেতু খুব সম্ভবত কোন-না-কোন গোত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করত এবং যেহেতু তার তিনশ জন সদস্য ছিল তিনশটা গোত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ, অতএব ধরেই নেওয়া যায় যে গোত্রের সমস্ত সদস্য কখনোই প্যাট্রিসিয়ান ছিল না, কারণ এই সম্মান অর্জন করত শুধু ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা, তাদের সন্তানসন্ততিরা আর বংশধররা। লিভিও খুব স্পষ্টভাবে এ-কথাই বলেছেন। তাঁর মতে, পদমর্যাদার দরুণ তাদেরকে পিতা বা অভিভাবক হিসাবেই চিহ্নিত করা হত, আর তাদের বংশধরদের বলা হত প্যাট্রিসিয়ান।[৪] সাতজন শাসকের আমলে এবং প্রজাতন্ত্রের আমলে সরকারই বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্যাট্রিসিয়ানের মর্যাদায় উন্নীত করত। কিন্তু ব্যবস্থাপক-সভার পদাধিকার বলে অথবা সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে এ মর্যাদা পাওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে প্যাট্রিসিয়ান হওয়া যেত না। ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠার সময় যারা তার সদস্য হতে পারে নি, এমন কয়েকজনকে পরবর্তীকালে ঐ সভার সদস্যের সমান মর্যাদা দিয়ে প্যাট্রিসিয়ানে পরিণত করাটা হয়ত খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়। তবে তা ঘটে থাকলেও মেনে

১। ডায়োনিসায়াস, ii , ৮ ; প্লুটার্ক "ভিট্ রোম," xiii .

২। ঐ, ii, ৮.

৩। "ডি রিপ." ii, ১২.

৪। লিভি, i,৮.

নিতেই হবে যে সমগ্র রোমান জনসম্প্রদায়ের মোট তিনশটা গোত্রের মধ্যে থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনই এইভাবে প্যাট্রিসিয়ানের মর্যাদা লাভ করে থাকতে পারে।

এটাও হয়ত অসম্ভব নয় যে রোমুলাসের আমলের আগে থেকেই গোত্রের প্রধানদের পিতা বলে চিহ্নিত করা হত (ঐ পদের পিতৃত্বমূলক চরিত্রটা বোঝানোর জন্যই হয়ত এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল) আর ঐ-সব প্রধানদের বংশধররা হয়ত বিশেষ একটা মর্যাদার অধিকারী হত। কিন্তু এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে এটাই যদি ঘটনা হয়ে থাকে, আর সেই সঙ্গেই যদি ধরে নেওয়া যায় যে ব্যবস্থাপক-সভা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সমস্ত মুখ্য প্রধানরা তার অন্তর্ভুক্ত হত না, এবং পরবর্তীকালে ব্যবস্থাপক-সভার কোন পদ খালি হলে তা পূরণ করা হত ব্যক্তিদের গুণ বিচার করে, স্রেফ গোত্রের সূত্রে নয়—তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে সে-সময় একটা প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিলই, আর তা ব্যবস্থাপক-সভার ওপর নির্ভরশীল ছিল না। সিসেরোর নিজস্ব বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে এই অনুমানকে কাজে লাগানো যায়। সিসেরো বলেছিলেন: ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের পিতা নামে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন রোমুলাস, কারণ সম্ভবত তার আগে থেকেই গোত্রের প্রধানদের এই মর্যাদা-ব্যঞ্জক নামেই অভিহিত করা হত। এইভাবে বিচার করলে ব্যবস্থাপক-সভার ওপর নির্ভরশীল নয় এমন একটা প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্বের মোটামুটি একটা ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভিত্তিটা এত বড় নয় যে স্বীকৃত সবকটা গোত্রই তার মধ্যে স্থান পেতে পারে। ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের প্রসঙ্গেই প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যে তাদের সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরও প্যাট্রিসিয়ান হিসেবেই চিহ্নিত করা হোক। প্যাটারকুলাসও এই একই কথা বলেছেন।[১]

অর্থাৎ, প্যাট্রিসিয়ান গোত্র বা প্লিবিয়ান গোত্র বলে নির্দিষ্ট কিছু ছিল না। তবে, কোন গোত্রের কোন বিশেষ পরিবার প্যাট্রিসিয়ান এবং অন্যরা প্লিবিয়ান হতে পারত। অবশ্য এ ব্যাপারেও কিছুটা বিভ্রান্তি থেকেই যায়। ফ্যাবিয়ান গোত্রের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই (সংখ্যায় মোট তিনশ ছয় জন) ছিল প্যাট্রিসিয়ান।[২] ঐ ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে যে, ঐ গোত্রের সবকটা পরিবারই ছিল ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের বংশধর, অথবা কোন বিশেষ সরকারি ব্যবস্থায় তাদের সকলকার পূর্ব-পুরুষদের দেওয়া হয়েছিল প্যাট্রিসিয়ানের মর্যাদা। অনেক গোত্রের মধ্যেই কিছু প্যাট্রিসিয়ান পরিবারের অস্তিত্ব ছিল, এবং পরবর্তীকালে একই গোত্রের মধ্যে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান পরিবারের অস্তিত্বও চোখে পড়ে। যেমন, পূর্বোল্লিখিত ('রোমান গোত্র' শীর্ষক একাদশতম পরিচ্ছেদের একটি পাদটীকায়) ক্লডি আর মার্সেলি পরিবার দুটো ছিল একই ক্লডিয়ান গোত্রের অন্তর্গত। কিন্তু এদের মধ্যে শুধু ক্লডিরাই ছিল প্যাট্রিসিয়ান। মনে রাখা দরকার, সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলের আগে রোমানরা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—পপুলাস আর প্লিবিয়ান। কিন্তু তাঁর আমলের পর, বিশেষত লিসিনিয়ান আইন-প্রণয়নের (৩৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

১। ভেলেউস প্যাটারকুলাস, ১, ৮.
২। লিভি, ii, ৪৯.

পর (যে আইন বলে রাষ্ট্রের যে-কোন সম্মানিত পদ অর্জন করার অধিকার লাভ করে প্রতিটি নাগরিক), স্বাধীন রোমানদের মধ্যে দুটো রাজনৈতিক শ্রেণী সৃষ্টি হয়—অভিজাততন্ত্র আর সাধারণ জনগণ। প্রথমোক্ত শ্রেণীটার মধ্যে থাকত ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা, তাদের বংশধররা, তিনটি বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা (প্রধান শাসকদ্বয়, প্রধান বিচারক এবং বাসগৃহগুলোর দায়িত্বশীল বিচারক) আর তাদের বংশধররা। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সাধারণ জনগণ বলতে রোমের ব্যাপক নাগরিকদেরই বোঝাতো। গোত্রীয় সংগঠন তখন ভেঙে পড়েছে, কাজেই পুরনো বিভাজনটাকে ধরে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। আগেকার আমলে যে-সব লোক পপুলাস শ্রেণীর সদস্য ছিল, তাদেরকে প্লিবিয়ানদের সঙ্গে একত্রিত করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে এরা প্যাট্রিসিয়ান না হয়েও অভিজাত শ্রেণীর সদস্য হয়ে উঠেছিল। ক্লডিরা ছিল অ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস-এর বংশধর। রোমুলাসের আমলে এই অ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হয়েছিলেন। মার্সেলিরা কিন্তু তাঁর বা ব্যবস্থাপক-সভার অন্য কোন সদস্যদের বংশধর ছিল না, যদিও, নিয়েবুর বলেছেন, "অর্জিত মর্যাদার বিচারে এরা আপ্পিদের থেকে কোন অংশে কম ছিল না, এবং রাষ্ট্রের পক্ষে এরা অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ছিল।"[১] নিয়েবুরের কাল্পনিক প্রকল্পকে বাদ দিয়েও বলা যায় যে, আসলে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে কোনরকম বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার দরুণই মার্সেলিরা প্যাট্রিসিয়ানের মর্যাদা হারিয়েছিল।[২]

প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা নেহাত কম ছিল না, কারণ ব্যবস্থাপক-সভায় থাকত তিনশ জন সদস্য, কোন সদস্যপদ শূন্য হলে তৎক্ষণাৎ অন্য কাউকে সেই পদে নিয়োগ করা হত, সারাক্ষণই নতুন নতুন পরিবার প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পেত। তাছাড়া, তাদের বংশধররাও গণ্য হত প্যাট্রিসিয়ান হিসেবে, আর মাঝে-মাঝে কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় আইনবলে অনেককে এই শ্রেণীর সদস্য করে নেওয়া হত।[৩] প্রথমদিকে এই বিশেষ শ্রেণীটির তেমন কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু সম্পদে, সংখ্যায় আর শক্তিতে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং রোমান সমাজব্যবস্থার গোটা চেহারাটাকেই বদলে দেয়। গোত্রভিত্তিক সমাজের মধ্যে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে—সেটা বোধহয় তখন কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। আর রোমান জনগণের পরবর্তী ইতিহাসে এটা যতটা উপকারী ভূমিকা নিয়েছিল, তার থেকে যে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেনি—এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সরকারি কার্যকলাপে সংগঠন হিসেবে গোত্রের আর কোন প্রয়োজনীয়তা রইল না। আর তখন থেকে প্লিবিয়ানদের সঙ্গে পপুলাস বা জন-

---

১। "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৪৬.

২। লিভি, iv, ৪

৩। লিভি, iv, ৫১.

সম্প্রদায়ের পার্থক্যটাও মুছে গেল। তবুও, প্রজাতন্ত্রের আমলের বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ঐ পুরনো সংগঠন আর ঐ পুরনো পার্থক্যের ছায়াটা পুরোপুরি সরে যায়নি।[১] নতুন ব্যবস্থায় প্লিবিয়ানরা রোমান নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হল এবং বিবেচিত হল মূল জনসাধারণ হিসেবে। গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা বা না-থাকার প্রশ্নটা গুরুত্বহীন হয়ে গেল।

আগেই বলা হয়েছে যে রোমুলাসের আমল থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমল পর্যন্ত রোমান সমাজব্যবস্থা ছিল নিছকই একটা গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, ভূখণ্ড বা সম্পত্তির সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না। তখন ছিল শুধু গোত্র, কিউরিয়া আর গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সংগঠিত কিছু মানুষ, এবং এইসব সংগঠনের সাহায্যেই ঐ মানুষদের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ থাকত। সোলোনের আমলের আগে পর্যন্ত এথেনীয়দের অবস্থাটা যেমন ছিল, অনেকটা সেইরকমই ছিল ঐ সময়কার রোমানদের অবস্থা। তবে তারা পুরনো আমলের প্রধানদের পরিষদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল একটা ব্যবস্থাপক-সভা, গণ-পরিষদের জায়গায় কমিশিয়া কিউরিয়াটা এবং এমন একজন সামরিক সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করেছিল যিনি পুরোহিত ও বিচারকের দায়িত্বও পালন করতেন। তারা গড়ে তুলেছিল এক তিনশক্তিবিশিষ্ট সরকার, এই তিন শক্তির সমন্বয়সাধন করা হয়েছিল তাদের প্রধান প্রধান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর সমান সংখ্যক গোত্র ও কিউরিয়াবিশিষ্ট তিনটি গোষ্ঠী তাদের মধ্যে একাঙ্গীভূত হয়েছিল। এই সবকিছুর সমন্বয়ে তারা যে শাসনব্যবস্থাটা গড়ে তুলতে পেরেছিল, সেটা ছিল পূর্ববর্তী কালের লাতিন গোষ্ঠীগুলোর শাসনব্যবস্থার থেকে আরও উন্নত ও আরও পূর্ণাঙ্গ। তবে এরই মধ্যে গড়ে উঠেছিল এমন একটা বিশাল শ্রেণী যারা ছিল সরকারি চৌহদ্দির বাইরে, যাদের কোনরকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ ছিল না (একমাত্র যারা কারুর-না-কারুর অনুচরে পরিণত হয়েছিল, তারা বাদে)। শ্রেণী হিসেবে এরা হয়ত খুব একটা বিপজ্জনক ছিল না, কিন্তু এদের নাগরিকত্ব না পাওয়া এবং সরকারি কার্যকলাপে কোনরকম অংশ গ্রহণের সুযোগ না পাওয়াটা প্রজাতন্ত্রের পক্ষে রীতিমত ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। বিরাট মাত্রায়গড়ে উঠছিল একটা পৌর-প্রতিষ্ঠান। এত বড় মাত্রায় কোন কিছু গড়ার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করার জন্য দরকার হচ্ছিল একটা বিশেষ সংগঠনের। শাসনব্যবস্থার ধাঁচ পাল্টানোর প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই ছাপ ফেলেছিল চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনের ওপর। লোকসংখ্যা বাড়ছিল, সম্পদ বাড়ছিল, বাড়ছিল বিভিন্ন বিষয়কে ঠিকভাবে পরিচালনা করার সমস্যাও (লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন ধরণের স্বার্থের উদ্ভবের ফলে এইসব বিষয়গুলো জটিলতর হয়ে উঠেছিল)। এ-সবের ফলে তারা ক্রমশ বুঝতে পারছিল যে গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের একত্রিত রাখাটা আর সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তীকালের বেশকিছু

১। লিভি, iv, ৫১.

প্রচেষ্টাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসাটা একান্তই জরুরী।

প্রথম বড় মাপের প্রচেষ্টাটা করেছিলেন রোমুলাসের উত্তরাধিকারী নুমা। এত বড় একটা শক্তি যে গোত্রের ভিত্তিতে টিকে থাকতে পারে না, সেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। থেসেউসের মত নুমাও চেষ্টা করেছিলেন কাজ এবং বৃত্তির ভিত্তিতে সমগ্র জনসাধারণকে মোট আটটা শ্রেণীতে বিভক্ত করে গোত্রকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে।[১] এই কথাটা প্রধানত প্লুটার্কের লেখাতেই পাওয়া যায়। এই সঙ্গেই প্লুটার্ক বলেছেন যে, বৃত্তি অনুযায়ী জনসাধারণকে এইভাবে বিভক্ত করাই ছিল নুমার সবথেকে বড় কৃতিত্ব। তিনি আরও বলেছেন—লাতিন এবং স্যাবাইনদের একটা নতুন ব্যবস্থার মধ্যে সংমিশ্রিত করে তাদের নাম ও সম্পত্তির মধ্যেকার পার্থক্য দূর করাটাই ছিল এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু গোত্রগুলোর হাতে যে ক্ষমতা ছিল, সে ক্ষমতা নতুন এই শ্রেণীগুলোর হাতে তুলে দেননি নুমা। ফলে, ব্যর্থ হয় তাঁর প্রচেষ্টা। একই কারণে ব্যর্থ হয়েছিল থেসেউসের প্রচেষ্টাও। প্লুটার্ক জানিয়েছেন—প্রতিটি পৌরসভার নিজস্ব অধিবেশন-গৃহ, আদালত এবং নিজস্ব কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থাকত। এথেন্স এবং রোমে একই উদ্দেশ্যে, একই কারণে ও একই উপাদানের সাহায্যে এইসব পরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে যে-সব বিবরণ পাওয়া যায় (সেগুলোর অনেকটা মৌখিক বিবরণ হলেও,) তা থেকে যুক্তিসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষাটা চালানো হয়েছিল।

নতুন ব্যবস্থাটা গড়ে তোলেন সার্ভিয়াস টিউলিয়াস। এই ব্যবস্থায় এমন এক সুদৃঢ় বুনিয়াদ তিনি রচনা করেন, যার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থাটা প্রজাতন্ত্রের যুগের প্রায় শেষ অবধি টিকে থাকতে পেরেছিল—অবশ্য এর বিকাশ ঘটানোর জন্য পরের দিকে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলটা (মোটামুটিভাবে ৫৭৬-৫৩৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ) হচ্ছে সোলোনের আমলের (৫৯৬ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ) পরে আর ক্লাইসথেনিসের আমলের (৫০৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) আগে। সোলোনের আইনের ধাঁচে তিনি যে আইনটি প্রণয়ন করেছিলেন বলে শোনা যায়, সেটিকে ঐ সময়কালেই রচিত বলে মেনে নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। কারণ, ৫০৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যখন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ঐ ব্যবস্থাটি রীতিমত ক্রিয়াশীলই ছিল। তাছাড়া, রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার কৃতিত্ব তিনি অনেকটাই দাবি করতে পারেন, যেমন অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন আরও কেউ কেউ। তবে, আইনপ্রণেতারা আসলে সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকেই সূত্রবদ্ধ করেছিলেন মাত্র। যে তিনটি মূল পরিবর্তন গোত্রকে সরিয়ে ভূখণ্ড ও সম্পত্তি-ভিত্তিক রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার সূচনা করেছিল, সেগুলো হচ্ছে, (১) গোত্রের জায়গায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, (২) গোত্র-পরিষদ অর্থাৎ কমিশিয়া কিউরিয়াটার বদলে নতুন গণ-পরিষদ হিসেবে কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটা স্থাপন করা এবং

১ প্লুটার্ক. "ভিট্ নুমা" xvii,২০.

প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাগুলো শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া, এবং (৩) সীমারেখাবেষ্টিত চারটি নগর-বিভাগ গড়ে তোলা, যেগুলোর চরিত্রটা ছিল অনেকটা শহরের মত এবং প্রতিটা বিভাগের এক একটা নামও দেওয়া হয়েছিল ; প্রতিটি বিভাগের বাসিন্দাদের নিজেদের নাম এবং সম্পত্তি নথিভুক্ত করাতে হত।

সোলোনের শাসনব্যবস্থার ধরনটার সঙ্গে যথেষ্টই পরিচিত ছিলেন সার্ভিয়াস। সোলোনের অনুকরণে তিনিও সমগ্র জনসাধারণকে পাঁচটা শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই শ্রেণী-বিভাজনটা করা হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী। এর ফলে বিভিন্ন গোত্রের সবথেকে সম্পদশালী লোকেরা একটা শ্রেণীতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।[১] অতঃপর প্রতিটা শ্রেণীকে আবার কয়েকটা সেঞ্চুরিতে বিভক্ত করা হত। এক একটা শ্রেণীতে ক'টা করে সেঞ্চুরি থাকবে, সে ব্যাপারে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। যথেচ্ছভাবে এটা নির্ধারণ করা হত। কমিশিয়ার প্রতিটা সেঞ্চুরির একটা করে ভোট থাকত। ফলে, এক একটা শ্রেণীর হাতে কতটা রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে, সেটা নির্ধারিত হত তার মধ্যে কতগুলো সেঞ্চুরি আছে, তার দ্বারাই। প্রথম শ্রেণীটার মধ্যে ছিল আশিটা সেঞ্চুরি, অর্থাৎ কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটায় তাদের ছিল মোট আশিটা ভোট। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল কুড়িটা সেঞ্চুরি আর সেইসঙ্গে কারিগরদের দুটো সেঞ্চুরি, অর্থাৎ মোট বাইশটা ভোট। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল কুড়িটা সেঞ্চুরি, কুড়িটা ভোট। চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল কুড়িটা সেঞ্চুরি আর সেইসঙ্গে শিঙাবাদক ও ভেরীবাদকদের দুটো সেঞ্চুরি, অর্থাৎ মোট বাইশটা ভোট। পঞ্চম শ্রেণীতে ছিল ত্রিশটা সেঞ্চুরি, ত্রিশটা ভোট। এছাড়া অশ্বারোহী যোদ্ধাদের ছিল আঠারটা সেঞ্চুরি অর্থাৎ আঠারটা ভোট। এই পাঁচটা শ্রেণীর সঙ্গে আর একটা শ্রেণী যোগ করেছেন ডায়োনিসায়াস, যে শ্রেণীটির মধ্যে ছিল একটা সেঞ্চুরি, অর্থাৎ একটা ভোট। যাদের কোন সম্পত্তিই ছিল না, অথবা পঞ্চম শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে যতটা সম্পদ লাগত তার চেয়ে কম ছিল—তাদেরকে নিয়েই গঠিত হয়েছেল এই ষষ্ঠ শ্রেণীটা। এরা কোনরকম কর দিত না বা যুদ্ধেও যেত না।[২] ডায়োনিসায়াসের বক্তব্য অনুযায়ী, ঐ অশ্বারোহীদের সেঞ্চুরিগুলো সমেত এই ছটা শ্রেণীতে মোট একশ তিরানব্বইটা সেঞ্চুরি ছিল।[৩] পাঁচটা শ্রেণীর মধ্যেকার সেঞ্চুরির সংখ্যার ব্যাপারে লিভিও ডায়োনিসায়াসের সঙ্গে মোটামুটি একমত। তবে ঐ ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যাপারটা তিনি মেনে নেননি। তার মতে, একটা সেঞ্চুরিতে ঐক্যবদ্ধ এবং একটা ভোটবিশিষ্ট ঐ-সব লোকেরা পঞ্চম শ্রেণীটারই অন্তর্ভুক্ত ছিল অথবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাছাড়াও তিনি

১। যার ১ লক্ষ গাধা থাকত, সে স্থান পেত প্রথম শ্রেণীটিতে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পেত ৭৫ হাজার গাধার মালিকরা। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে রাখা হত যথাক্রমে ৫০ হাজার, ২৫ হাজার এবং ১১ হাজার গাধার মালিকদের।—লিভি, i, ৪৩.
২। ডায়োনিসায়াস, iv, ২০.
৩। ঐ, iv, ১৬, ১৭, ১৮.

বলেছেন যে শিঙাবাদক ও ভেরীবাদকদের সেঞ্চুরি দুটো নয়, তিনটে ছিল। অর্থাৎ, মোট সেঞ্চুরি ছিল একশ চুরানব্বইটা।[১] সিসেরো বলেছেন—ছিয়ানব্বইটা সেঞ্চুরি একদিকে থাকলে সেটা সংখ্যালঘু অংশ হত, এবং এটা উভয় বক্তব্যর ক্ষেত্রেই সত্য হতে পারে।[২] প্রতিটা শ্রেণীর সেঞ্চুরিগুলো ছিল দু'ভাগে বিভক্ত: বর্ষীয়ান আর অল্পবয়সী। বর্ষীয়ানদের সেঞ্চুরিতে থাকত পঞ্চান্ন বছরের বেশি বয়সের লোকেরা। সৈনিক হিসেবে এরা নগর রক্ষার দায়িত্ব পালন করত। অল্পবয়সীদের সেঞ্চুরিতে থাকত পঞ্চান্ন বছরের থেকে কম আর সতের বছরের থেকে অধিক বয়স্ক লোকেরা। নগরের বাইরে যাবতীয় সামরিক কার্যকলাপের দায়িত্ব থাকত এদের ওপর।[৩] প্রতিটা শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা বর্ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।[৪]

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, গণ-পরিষদের পক্ষে সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার যতটুকু সুযোগ ছিল, তার সবটাই তুলে দেওয়া হয়েছিল ঐ প্রথম শ্রেণীটি এবং অশ্বারোহী সৈন্যদের সেঞ্চুরির হাতে। এরা উভয়ে মিলিয়ে মোট আটানব্বইটা ভোটের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল এরাই। কমিশিয়া কিউরিয়াটায় সমবেত হয়ে কিউরিয়াগুলো যেমন আলাদা আলাদাভাবে ঠিক করে নিত যে তারা কোন্ পক্ষে ভোট দেবে, ঠিক সেইভাবেই সেঞ্চুরিগুলোও কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটায় সমবেত হয়ে আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের ভোট সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিত। কোন রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে ভোট দেওয়ার সময় প্রথমে ডাকা হত অশ্বারোহীদের, তারপর প্রথম শ্রেণীটিকে।[৫] এই দুজনরা কোন প্রশ্নে একমত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটির মীমাংসা হয়ে যেত, বাকিদের আর ভোট দেওয়ার জন্য ডাকাই হত না। কিন্তু এদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে ডাকা হত দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে, তারপর তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি শ্রেণীগুলোকে। যতক্ষণ না কোন এক পক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করত, ততক্ষণ সকলেই সুযোগ পেত ভোট দেওয়ার।

কমিশিয়া কিউরিয়াটার হাতে যে ক্ষমতা ছিল, তা হস্তান্তরিত হয়েছিল কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটার হাতে, এবং পরবর্তীকালে এই ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানোও হয়েছিল। ব্যবস্থাপক-সভার মনোনয়নের ভিত্তিতে তারা সমস্ত কর্মকর্তা ও বিচারকদের নির্বাচন করত। ব্যবস্থাপক-সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত যে-কোন আইনকে বলবৎ করতে অথবা বাতিল করতে পারত এই সেঞ্চুরিয়াটা। এর অনুমোদন ছাড়া কোন পদক্ষেপই আইনে

১। "লিভি" i, ৪৩.

২। "ডি রিপ", ii, ১০.

৩। ডায়োনিসায়াস, iv, ১৬.

৪। লিভি, i, ৪৩.

৫। লিভি, i, ৪৩. কিন্তু ডায়োনিসায়াস এই অশ্বারোহীদের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেই মন্তব্য করেছেন, এবং বলেছেন যে এই শ্রেণীটিকেই ভোট দেওয়ার জন্য প্রথমে ডাকা হত।—ডায়োনিসায়াস, iv, ২০.

পরিণত হতে পারত না। ইচ্ছে করলে ব্যবস্থাপক-সভার প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোন চালু আইনকেও বাতিল করে দিতে পারত সেঞ্চুরিয়াটা। ঐ সভার প্রস্তাবের ভিত্তিতে যুদ্ধ ঘোষণা করার অধিকারও ছিল তার হাতে। তবে, এই পরিষদের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করেই যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার ব্যবস্থাপক-সভার ছিল। যে-কোন মামলা, এমনকি প্রাণদণ্ড সংক্রান্ত মামলাকেও এই পরিষদের সামনে উপস্থাপিত করা যেত, কেননা এটাই ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচার-বিভাগীয় সালিশ-সভা। এই ক্ষমতাগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও একটা জায়গায়, অর্থাৎ আর্থিক ব্যাপারে, এর কোন ভূমিকা ছিল না। অধিকাংশ ভোটই ছিল প্রথম শ্রেণীটি এবং অশ্বারোহীদের হাতে। ধরেই নেওয়া যায় যে প্রথম শ্রেণীটির মধ্যে ছিল প্যাট্রিসিয়ানরা আর সম্পদশালী নাগরিকরা। শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত সম্পত্তির দ্বারা, সংখ্যার দ্বারা নয়। তবে পরবর্তীকালে তারা এমন কিছু আইন চালু করেছিল, যেগুলো সকলের জন্য সমান নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল এবং সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসাম্যের সবথেকে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াকে কিছুটা প্রশমিত করতে পেরেছিল।

বিচারপতি ও আধিকারিকদের নির্বাচন করার জন্য প্রতি বছর কমিশিয়ার অধিবেশন বসত ক্যাম্পাস মার্তিয়াসে। প্রয়োজনে অন্য সময়েও ডাকা হত এই অধিবেশন। নিজেদেরকে সেনাবাহিনীর (exercitus) কায়দায় সংগঠিত করে মানুষরা ওখানে সমবেত হত সেঞ্চুরি ও শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ ভাগ হয়ে। তাদের পরিচালনা করত আধিকারিকরা। সেনাবাহিনীর কায়দায় সংগঠিত হয়ে আসার কারণ হল, সেঞ্চুরি ও শ্রেণীগুলোর কাছ থেকে বেসামরিক ও সামরিক উভয় ধরনের কাজই আশা করা হত। সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলে যে প্রথম জমায়েতটা হয়েছিল, তাতে ঐ ক্যাম্পাস মার্তিয়াসে সমবেত হয়েছিল আশি হাজার সশস্ত্র নাগরিক যোদ্ধা। প্রত্যেকেই এসেছিল নিজের নিজের সেঞ্চুরির সদস্য হিসাবে, প্রতিটা সেঞ্চুরি এসেছিল নিজের নিজের শ্রেণীর সদস্য হিসাবে, আর প্রতিটা শ্রেণী ছিল স্বনির্ভর।[১] প্রতিটি সেঞ্চুরির প্রতিটি সদস্যই তখন রোমের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, আর এইটাই ছিল নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। প্রজাতন্ত্রের আমলে কমিশিয়ার সভা ডাকার অধিকার ছিল প্রধান শাসকদ্বয়ের, অথবা তাঁদের অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতির। যিনি সভা ডাকতেন, তিনিই পালন করতেন সভার সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব।

আজকের উন্নত অভিজ্ঞতার আলোকে এই ধরনের সরকার আমাদের কাছে অত্যন্ত আদিম ও অমার্জিত হিসাবেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু যতই ত্রুটিপূর্ণ এবং অনুদার বলে মনে হোক না কেন, পূর্বতন গোত্রভিত্তিক সরকারের থেকে যে এটা বেশ কিছুটা অগ্রগতিকেই সূচিত করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই শাসনব্যবস্থার আমলের রোম

১। লিভি, i, ৪৪ : ডায়োনিসায়াসের মতে ঐ জমায়েতে উপস্থিত হয়েছিল ৮৪,৭০০ জন মানুষ।—iv, ২২.

হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী। এর চরিত্র কেমন হবে, তা নির্ধারিত হয়েছিল সম্পত্তির মাপকাঠির সাহায্যে (সম্পত্তি ব্যাপারটা তখন ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে)। অভিজাততন্ত্র আর তাদের সুযোগ-সুবিধেগুলোকে একটা বিশিষ্ট আসন দিয়েছিল এই সরকার, আর তারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা জনগণের হাত থেকে অনেকটাই কেড়ে নিয়ে তুলে দিয়েছিল সম্পত্তিবান লোকদের হাতে। গোত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গণতান্ত্রিক নীতিগুলো স্বাভাবিক গতিপথে যেদিকে যেতে পারত, এই ঘটনাটা তার মুখটাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চেপে বসা এই অভিজাততন্ত্র আর তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধের বিরুদ্ধে রোমান প্লিবিয়ানরা প্রজাতন্ত্রের গোটা যুগটা জুড়েই সংগ্রাম করেছে এবং মাঝে-মধ্যে সফলও হয়েছে। কিন্তু প্লিবিয়ানরা সকলকার সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধের যে মহান নীতির কথা বলত, তা দমিয়ে রাখার মত যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল প্যাট্রিসিয়ান এবং সম্পত্তিবান উচ্চ শ্রেণীর হাতে। একটা সুবিধেভোগী শ্রেণীর বোঝা বয়ে বেড়ানোটা সেই সময়কার রোমান সমাজের পক্ষেও যথেষ্টই ভারি ছিল।

দেশপ্রেমিক এবং মহৎপ্রাণ সিসেরো জনগণের এই শ্রেণীবিন্যাসটা অনুমোদন করেন এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলে সংখ্যালঘু নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে রায় দেন। তিনি বলেছেন, সার্ভিয়াস টিউলিয়াস "সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু জনকে অশ্বারোহী সেনায় পরিণত করার পর বাকিদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তাদের মধ্যে আবার বর্ষীয়ান ও অল্পবয়স্ক এই দুটি ভাগ সৃষ্টি করেন, এবং গোটা কাজটা এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে করে মূল ভোটাধিকারটা থাকে সম্পত্তিবান লোকেদের হাতে, ব্যাপক মানুষের হাতে নয়। সর্বাধিক সংখ্যক লোকের হাতে সর্বাধিক ক্ষমতা থাকা উচিত নয়—এটাকেই তিনি নিয়মে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, এবং প্রতিটি সরকারের এই নিয়ম অনুযায়ীই চলা উচিত।"[১] এ ঘটনার পর আজ দু'হাজার বছর অতিক্রান্ত। এই দু'হাজার বছরের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করলে বোঝা যায়, সেই সময় থেকে বিভিন্ন মানুষের সুযোগ-সুবিধের অসাম্য এবং স্বশাসনের অধিকার অস্বীকার করার যে অঙ্কুর মাথা তুলেছিল, তা থেকেই ধীরে ধীরে জমে উঠেছিল অজ্ঞতা আর দুর্নীতির পাহাড়, ধ্বংস হয়েছিল শাসনব্যবস্থা এবং রোমান জনগণ। সমগ্র মানবজাতি ক্রমশই এই সরল সত্যটা উপলব্ধি করছে যে সামগ্রিক কল্যাণ ও সামগ্রিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে যে-কোন যুগের যে-কোন পরিশীলিত বা সুশিক্ষিত সুবিধেভোগী শ্রেণীর তুলনায় সাধারণ মানুষ অনেক বেশি দক্ষ, বিচক্ষণ। সবথেকে অগ্রসর সমাজের সরকারগুলোও এখনও পর্যন্ত একটা সংক্রমণের স্তরেই রয়েছে। নিজের শেষ উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি গ্রান্ট সঠিকভাবেই বলেছেন যে এই সরকারগুলো অপরিহার্যভাবে এবং যুক্তিসম্মতভাবে এগিয়ে চলেছে গণতন্ত্রের দিকেই। আর স্বশাসনের এই ধরণটাই কোন স্বাধীন ও সুশিক্ষিত জনসম্প্রদায়ের গড়পড়তা বুদ্ধিমত্তা এবং গুণাবলীকে ফুটিয়ে তুলতে ও প্রকাশ করতে পারে।

১। সিসেরো, "ডি রিপ," ii ২২.

আগে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল যে গোত্র, তার সমস্ত ক্ষমতা অন্য একটা সংস্থার হাতে হস্তান্তরিত করে দেয় সম্পত্তিবান শ্রেণী, এবং এইভাবে সে গোত্রকে ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজনীয় কাজটা সম্পন্ন করে। নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গোত্রের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া এবং একমাত্র ক্রীতদাসরা ছাড়া রোমের বাকি সমস্ত বাসিন্দাদের যাতে শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন একটা বনিয়াদ রচনা করা। এই কাজ সম্পন্ন করার পর শ্রেণীগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত, যেমনটা ঘটেছিল এথেন্সে। আর বিভিন্ন নগর-বিভাগ ও গ্রামীণ এলাকাগুলো (যেখানকার বাসিন্দারা রাজনৈতিক সঙ্ঘ হিসাবে সংগঠিত ছিল) যুক্তিসম্মতভাবেই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু রোমের পৌর সংগঠন তা ঘটতে দেয়নি। প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই পৌর সংগঠনই ছিল তাদের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ। বাইরের সমস্ত এলাকাকেও এরই কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রথমে ইতালিতে এবং অবশেষে তিনটি মহাদেশের বিজিত অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়া এক কেন্দ্রীয় পৌর শাসনব্যবস্থার ব্যতিক্রমী চরিত্রটাই ফুটে উঠেছে এর মধ্যে। পাঁচটা শ্রেণীই টিকে থেকেছিল প্রজাতন্ত্রের আমলের শেষ পর্যন্ত (শুধু তাদের ভোট দেওয়ার পদ্ধতিতে কিছু রদবদল ঘটেছিল)। পুরনো গণ-পরিষদের জায়গায় এক নতুন গণ-পরিষদ সৃষ্টি করার মধ্যে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের সংবিধানের বৈপ্লবিক চরিত্রটাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা পরিষদ আর তার কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া ছাড়া এইসব শ্রেণীগুলো টিকে থাকতে পারত না। সম্পদ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষদের কাজ ও দায়িত্বও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। স্পষ্টতই সার্ভিয়াস টিউলিয়াস চেয়েছিলেন যে এই পরিষদ কমিশিয়া কিউরিয়াটাকে বিলুপ্ত করে দিক এবং সেইসঙ্গেই ধ্বংস হোক গোত্রের ক্ষমতাও।

শোনা যায়, সার্ভিয়াস টিউলিয়াসই নাকি স্থাপন করেছিলেন কমিশিয়া ট্রিবিউটা। এটা ছিল প্রতিটা স্থানীয় গোষ্ঠী বা অঞ্চলের একটা আলাদা পরিষদ। এর প্রধান কাজ ছিল কর নির্ধারণ করা ও তা আদায় করা, এবং সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের বন্দোবস্ত করা। পরবর্তীকালে এই পরিষদই নির্বাচিত করত জনগণের শাসকদের। তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক একক ছিল ওয়ার্ড বা বিভাগ। আর রোমান জনগণ যদি একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইত, তাহলে স্থানীয় স্বশাসনের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত এই বিভাগগুলোই। কিন্তু ব্যবস্থাপক-সভা এবং সম্পত্তিবান শ্রেণীরা তাদেরকে সে কাজ করতে দেয় নি।

সার্ভিয়াস টিউলিয়াস প্রথম যে কাজগুলো করেছিলেন, লোকগণনা তার অন্যতম। লিভি বলেছেন, ভবিষ্যতে যে সাম্রাজ্য প্রভূত শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তার পক্ষে লোক-গণনাটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ। কারণ এই লোকগণনা অনুযায়ীই শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন কর্তব্য নির্ধারিত হত আর তা আগের মত ব্যক্তিগত ভিত্তিতে নির্ধারিত হত না, নির্ধারিত হত ব্যক্তিগত সম্পদের ভিত্তিতে।[১] প্রতিটি

১। লিভি, i, ৪২.

ব্যক্তিকে তার বাসস্থানের বিভাগে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করতে হত এবং নিজের সম্পত্তির পরিমাণটাও জানাতে হত। এ কাজ সম্পন্ন হত রাজস্ব ও শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে। তালিকা সম্পূর্ণ হওয়ার পর তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল শ্রেণীগুলো।[১] এই সঙ্গেই সম্পন্ন হয়েছিল সে যুগের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গড়ে উঠেছিল প্রাচীরবেষ্টিত চারটি নগর-বিভাগ। প্রতিটা বিভাগের এক একটা যথাযথ নামও দেওয়া হয়েছিল। সময়ের বিচারে এটা হচ্ছে ক্লাইসথেনিস কর্তৃক এথেন্সে নগর-বিভাগ প্রতিষ্ঠার আগেকার ঘটনা। কিন্তু সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এথেন্স আর রোমের নগর-বিভাগগুলোর মধ্যে মোটেই মিল ছিল না। আগেই দেখানো হয়েছে যে এথেন্সের নগর-বিভাগগুলো একটা রাজনৈতিক সঙ্ঘ হিসেবে সংগঠিত হয়েছিল, নাগরিকদের নাম আর তাদের সম্পত্তির পরিমাণ সেখানেও নথিভুক্ত করা হত, এবং সেইসঙ্গেই তাদের থাকত পরিপূর্ণ স্থানীয় স্বশাসনের ক্ষমতা আর থাকত নির্বাচিত শাসকবর্গ, বিচারকবর্গ ও পুরোহিত। অন্যদিকে, রোমানদের নগর-বিভাগগুলো ছিল এক একটা ভৌগোলিক এলাকা। সেখানে নাগরিক-দের নাম ও সম্পত্তির পরিমাণ নথিভুক্ত করা হত, একটা স্থানীয় সংগঠন থাকত, নির্বাচিত শাসক ও অন্যতম নির্বাচনমূলক পদ এবং একটা পরিষদও থাকত। কতকগুলো বিশেষ কারণে এইসব নগর-বিভাগের বাসিন্দাদের সঙ্গে সরকার যোগাযোগ রাখত তাদের আঞ্চলিক সম্পর্ক মারফৎ। কিন্তু এথেন্সের নগর-বিভাগগুলোর সরকারের হাতে যে-সব ক্ষমতা থাকত, রোমান নগর-বিভাগগুলোর হাতে তা ছিল না। রোমানদের এই নগর-বিভাগগুলো ছিল অনেকটা এথেনীয়দের প্রাচীন নউক্র্যারির মত। নউক্র্যারির কাছ থেকেই এই ধাঁচটা শিখেছিল রোমানরা, যেমন সার্ভিয়াস টিউলিয়াস তাঁর কাজের ধাঁচটা নিয়েছিলেন সোলোনের থেকে। ডায়োনিসায়াস বলেছেন, সাতটা পাহাড়কে একটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরার পর সার্ভিয়াস টিউলিয়াস শহরটাকে চার ভাগে বিভক্ত করেন, এবং পাহাড়গুলোর নামে এই বিভাগগুলোর নামকরণ করেন। প্রথম বিভাগটার নাম দেন প্যালাটিনা, দ্বিতীয়টার সুবুরা, তৃতীয়টার কলিনা আর চতুর্থটার এস্‌কুইলিনা। আগে যে শহরে ছিল তিনটি বিভাগ, সে শহরকে তিনি চারটি বিভাগে বিভক্ত করলেন। গ্রামবাসীদের মত এই চারটি অঞ্চলের বাসিন্দাদেরও তিনি নির্দেশ দেন অন্য কোন জায়গায় গিয়ে বসবাস না করার, অন্য কোথাও কর না দেওয়ার, অন্য কোন অঞ্চলে সৈনিক হিসেবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত না করানোর কিম্বা সামরিক ও অন্য কোন কাজের জন্য কর না দেওয়ার। অথচ সার্বজনীন কল্যাণের জন্য এ কাজগুলো ছিল অত্যাবশ্যক। আসলে, এ কাজগুলো তখন আর রক্তসম্বন্ধযুক্ত তিনটি গোষ্ঠী অনুযায়ী করা হচ্ছিল না, করা হচ্ছিল চারটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী অনুযায়ী। এই শেষ গোষ্ঠীটা তিনি নিজেই গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিটা গোষ্ঠীর জন্য তিনি একজন করে সৈন্যধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলোন। এদেরকে বলা হত ফাইলার্ক বা কমার্ক। এদের প্রত্যেককে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন

১। ডায়োনিসায়াস, iv, ১৫.

নিজেদের বসতবাড়ির কথা নথিভুক্ত করাতে।[১] মম্‌সেন বলেছেন, "এই চারটি করদ জেলার প্রত্যেকটিকে মূল সৈন্যবাহিনীর এক-চতুর্থাংশ সৈন্য যোগাতে হত তো বটেই, সেই সঙ্গেই প্রতিটা সামরিক উপ-বিভাগের এক-চতুর্থাংশও যোগাতে হত তাদের প্রত্যেককে। প্রতিটা অঞ্চল এবং প্রতিটা সেঞ্চুরি থেকে সমান অনুপাতে সৈন্য নেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থাটা চালু করা হয়েছিল। গোত্রীয় এবং এলাকাগত যাবতীয় পার্থক্য দূর করে সকলকে একটা জন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা, এবং বিশেষত সামরিক মনোভাবের মধ্যে যে শক্তিশালী সমতামূলক প্রভাবটা থাকে, তার সাহায্যে 'মিটিওকি' ও স্বশাসিত নগরের নাগরিকদের একই জনসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করাটাই ছিল এর উদ্দেশ্য।"[২]

রোমান সরকারের অধীন চারপাশের অঞ্চলগুলোকেও একইভাবে বিভিন্ন নগর হিসেবে (tribus rusticae) সংগঠিত করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন এ-রকম নগর ছিল ছাব্বিশটা, আবার কেউ বলেছেন একত্রিশটা। কারুর মতে চারটি নগর-বিভাগসহ মোট নগরের সংখ্যা ছিল একত্রিশ, আবার কারুর মতে পঁয়ত্রিশ।[৩] মোট সংখ্যাটাকে কেউই পঁয়ত্রিশের বেশি বলে উল্লেখ করেন নি। সরকারের কার্য-পরিচালনায় অংশ-গ্রহণের ব্যাপারে এই নগরগুলো কিন্তু কোন একাত্ম রূপ নিতে পারে নি।

সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের সংবিধানের আওতায় শাসনব্যবস্থাটা যে রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছিল, প্রজাতন্ত্রের আমলেও তা ঠিক সেই রূপেই বিদ্যমান ছিল। পূর্বতন সেনাপতিদের জায়গায় অভিষিক্ত হয়েছিল প্রধান শাসকদ্বয়। এথেনীয় শাসনব্যবস্থা কিম্বা আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সরকার গড়ে ওঠে ভূখণ্ড বা অঞ্চলের ভিত্তিতে। কিন্তু রোমানদের ক্ষেত্রে ঠিক তা ঘটে নি। রোমানদের সংগঠনের প্রাথমিক একক ছিল শহর বা নগর-বিভাগ, তার ওপরে অঞ্চল বা মহকুমা, আর সবার ওপরে রাষ্ট্র। সমগ্র ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই প্রত্যেকটা ধাপই শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সবার ওপরে থাকত কেন্দ্রীয় সরকার। ভূখণ্ড বা অঞ্চল নয়, এর প্রধান ভিত্তি ছিল সম্পত্তি। সম্পত্তিই ছিল তাদের শাসনব্যবস্থার নির্ধারক উপাদান। সবথেকে বেশি সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীগুলোর হাতে পরিচালনা-ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ঘটনা থেকেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। তা সত্ত্বেও এর একটা অঞ্চলগত বনিয়াদও ছিল, কেননা নাগরিকত্বের ব্যাপারে এবং আর্থিক ও সামরিক ব্যাপারে এই ব্যবস্থা আঞ্চলিক বিভাগগুলোকে স্বীকৃতি দিত এবং সেগুলোকে কাজে লাগাত। এ-সব ব্যাপারে নাগরিকদের আঞ্চলিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ

১। ডায়োনিসায়াস, iv, ১৪.

২। "হিস্ট্রি অফ রোম", ১ম পরিচ্ছেদ, স্ক্রিবনারের সংস্করণ, i, ১৩৬.

৩। ডায়োনিসায়াস, iv, ১৫ ; নিয়েবুর নিম্নলিখিত ষোলটা নগরের নাম উল্লেখ করেছেন : এমিলিয়ান, ক্যামিলিয়ান, ক্লুয়েনতিয়ান, কর্নেলিয়ান, ফ্যাবিয়ান, গ্যালেরিয়ান, হোরেশিয়ান, লেমোনিয়ান, মেনেনিয়ান, প্যাপেরিয়ান, রোমুলিয়ান, সার্জিয়ান, ভেচুরিয়ান, ক্লডিয়ান।—"হিস্ট্রি অফ রোম", i, ৩২০, টীকা।

রাখত রাষ্ট্র।

গোত্রভিত্তিক সমাজ থেকে রোমানরা এসে পৌঁছল দ্বিতীয় ধরনের শাসনব্যবস্থায়, যার ভিত্তি ছিল ভূখণ্ড এবং সম্পত্তি। গোত্রীয় সংগঠন ও বর্বরতার যুগ পেরিয়ে তারা পা রাখল সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে। ঐ সময় সরকারের প্রধান কাজ হয়ে উঠল সম্পত্তি রক্ষা করা আর নতুন নতুন সম্পত্তি সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গেই দেখা দিল দূর-দূরান্তের গোষ্ঠী ও জাতিগুলোকে পদানত করার তাগিদও। প্রতিষ্ঠানের এই পরিবর্তন গোত্রীয় সমাজের বদলে সৃষ্টি করল রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা। এই পরিবর্তন আসলে ছিল ভূখণ্ড ও সম্পত্তি নামক নতুন উপাদান দুটোর সূত্রপাতেরই দ্যোতক। তার আগে পর্যন্ত শাসনব্যবস্থার কাজে সম্পত্তি বড়জোর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারত, কিন্তু এখন তা শাসনব্যবস্থার একটা শক্তিতে পরিণত হল। নগর-বিভাগ আর গ্রামীণ অঞ্চলগুলো যদি আঞ্চলিক স্বশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে গড়ে উঠত এবং যদি শ্রেণী নির্বিশেষে এইসব অঞ্চলের লোকেরা মিলে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের নির্বাচিত করার অধিকার পেত, তাহলে এথেন্সের মত রোমের এই শাসনব্যবস্থাটাও গণতান্ত্রিক সরকার হয়ে উঠতে পারত। কারণ সেক্ষেত্রে ঐ-সব আঞ্চলিক সরকারগুলো তাদের পছন্দমত গড়ে তুলতে পারত রাষ্ট্রকে। একদিকে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের বংশধররা উত্তরাধিকার সূত্রে উচ্চমর্যাদা পেত, আর অন্যদিকে গণ-পরিষদে ভোটাধিকারের ভিত্তি ছিল সম্পত্তির পরিমাণ—এ দুয়ে মিলে ব্যবস্থাটাকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কিছুটা বিরোধী ব্যবস্থায় পরিণত করেছিল। তৈরি হয়েছিল একটা মিশ্র সরকার—আধা-অভিজাততান্ত্রিক আধা-গণতান্ত্রিক। আইনের সাহায্যে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে এবং বিনা প্রয়োজনে নাগরিকদের যে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল, সেই দুটো শ্রেণীর মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতা জিইয়ে রাখার জন্য এই সুপরিকল্পিত পদক্ষেপটা নেওয়া হয়েছিল। আমার মতে, সার্ভিয়াসের সংবিধান মানুষকে প্রতারিত করেছিল এবং তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল এমন একটা শাসনব্যবস্থা, যার সম্ভাব্য পরিণতির কথা পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারলে মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করতই। আগের যুগে গোত্রের গণতান্ত্রিক নীতিগুলো (বাইরের লোককে কোন অধিকার না দিলেও) যে তাদের মধ্যে পুরোপুরিই পালিত হত—তার সুনিশ্চিত প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। এই স্বাধীন মনোভাব এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রমাণগুলো খুব জোরদার। আমরা অন্যত্র বলে এসেছি যে রাজতন্ত্রের সঙ্গে গোত্রীয় প্রতিষ্ঠান খাপ খায় না। সদ্য উল্লিখিত প্রমাণগুলো এই সিদ্ধান্তকে একেবারে অকাট্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সামগ্রিক বিচারে রোমানদের শাসনব্যবস্থাটা ছিল একটু ব্যতিক্রমী ধরনের। রোমান শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল পৌরসঙ্ঘ, আর এটাই ছিল ঐ ব্যবস্থার অভিনব চরিত্রসম্পন্ন হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ। জনগণ প্রাথমিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল একটা সৈন্যবাহিনীতে, আর তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা সামরিক মেজাজ। এর থেকে যে আসঞ্জনীশক্তিটা জন্ম নিয়েছিল, সেটাই প্রজাতন্ত্রকে এবং পরবর্তীকালে রোমান সাম্রাজ্যকে একত্রিত করে রেখেছিল। কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল রোমান শাসনব্যবস্থার? একটা নির্বাচিত ব্যবস্থাপক-সভা যার সদস্যরা আজীবন

ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকত এবং যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল; তাদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তাদের ব্যক্তিগত পদমর্যাদার অধিকারী হত; রাজধানীর প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা ক্রমবিভক্ত নির্বাচিত বিচারকমন্ডলী; সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণীগুলোর একটা গণ-পরিষদ, যার ভোটাধিকার ছিল অসম কিন্তু যে-কোন আইনকে অনুমোদন বা বাতিল করার ক্ষমতা যার হাতে ছিল; আর ছিল একটা বড়সড় সামরিক সংগঠন। মানবজাতির ইতিহাসে ঠিক এ-রকম আর কোন শাসন-ব্যবস্থার কথা জানা যায় না। এই ব্যবস্থাটা ছিল কৃত্রিম, অযৌক্তিক, এবং তা এগিয়ে চলেছিল এক অস্বাভাবিকতার দিকে। কিন্তু তার নিজস্ব সামরিক দক্ষতা এবং বিভিন্ন ব্যাপারকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার কাজে রোমানদের আশ্চর্য ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে সে বিপুল সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে যে জোড়াতালিটা ছিল, সেটা সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোই সৃষ্টি করেছিল সুকৌশলে। এদের উদ্দেশ্য ছিল মূল ক্ষমতাটাই হস্তগত করা। আপাতভাবে অবশ্য এরা সকলকার অধিকার ও স্বার্থকে সমান মর্যাদা দেওয়ার ভান করে চলত।

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্রই কিন্তু পুরনো ব্যবস্থাটা অন্তর্হিত হয়ে যায় নি। ব্যবস্থাপক-সভা আর সেনাপতির কার্যকলাপ আগের মতই রয়ে গিয়েছিল। তবে, গোত্রের স্থান অধিকার করেছিল সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলো আর গোত্র-পরিষদের স্থান অধিকার করেছিল শ্রেণীগুলোর পরিষদ। এই পরিবর্তনগুলো বৈপ্লবিক চরিত্রসম্পন্ন হলেও এগুলো মূলত ঐ-সব বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এগুলো ঘটানোর জন্য কোনরকম সংঘাত বা বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় নি। পুরনো যে পরিষদ (কমিশিয়া কিউরিয়াটা) দীর্ঘকাল ধরে গোত্র, কিউরিয়া এবং রক্তসম্বন্ধযুক্ত গোষ্ঠীগুলোর সংগঠনকে সজীব করে রেখেছিল, সেই পরিষদের হাতে কিছু ক্ষমতা তখনও রয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উচ্চতর পদাধিকারসম্পন্ন বিচারপতিদের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর এই পরিষদই তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করত। পরবর্তীকালে অবশ্য এটা নিছকই একটা মামুলী প্রথায় পরিণত হয়েছিল। কিছু পুরোহিতকে তাদের পদে অভিষিক্ত করত এই পরিষদ এবং কিউরিয়ার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোও পরিচালনা করত। এই অবস্থাটা টিকে ছিল কার্থেজের প্রথম যুদ্ধের সময় পর্যন্ত। তারপর থেকেই কমিশিয়া কিউরিয়াটার গুরুত্ব কমে যেতে থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল আঁধারে। পরিষদ আর কিউরিয়া, দুটো সংগঠনই ঠিক বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং অন্য সংগঠন এসে এদের স্থান দখল করে দিয়েছিল এবং পরিষদ আর কিউরিয়া শুকিয়ে মারা গিয়েছিল। কিন্তু গোত্র টিকে থাকতে পেরেছিল একেবারে রোমান সাম্রাজ্যের আমল পর্যন্ত। অবশ্য গোত্রও কোন সংগঠন হিসেবে টিকে থাকতে পারে নি, কারণ সংগঠন হিসেবে তার অস্তিত্বও কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আসলে গোত্র টিকে ছিল একটা বংশপরিচয় আর বংশধারা হিসেবে। এইভাবে, গোত্রীয় সমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণটা সাধিত হয়েছিল ধাপে ধাপে অথচ কার্যকরীভাবে। স্মরণাতীত-কাল থেকে শাসন-ব্যবস্থায় যে ধাঁচটা চালু ছিল, তার জায়গায় রোমানরা স্থাপন করতে পেরেছিল

মানব-ইতিহাসের দ্বিতীয় ধাঁচের শাসনব্যবস্থাটা।

আর্য গোষ্ঠীগুলো যখন পৃথক পৃথক ভাবে ছড়িয়ে ছিল, তখন থেকেই গোত্রের অস্তিত্ব ছিল সমাজে। সেই আদি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এই গোত্র এসে পৌঁছেছিল লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও। অবশেষে, রোমানদের মধ্যে সভ্য যুগের আগমনের পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য সরে দাঁড়াতে হল গোত্রকে। ঐ সবকটা ঐতিহাসিক যুগে সমাজের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল গোত্রের। অতঃপর এল সভ্যতা। প্রমাণিত হল—সভ্যতার বিভিন্ন দিককে পরিচালনা করতে গোত্র অক্ষম। মানবজাতির অগ্রসর অংশকে বন্যতার দশা থেকে বর্বরতায় এবং বর্বরতার পর্যায়গুলো পার করে সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার মত একটা সাংগঠনিক রূপ গড়ে তোলার জন্য মানাবজাতি তার সেই বন্য পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণী। ঐ সংগঠন অর্থাৎ গোত্র বিদ্যমান থাকা-কালীনই একটা রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান অর্জন করেছিল মানুষ। মানুষের প্রগতির ইতিহাসে গোত্র একটা অদ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। প্রভাব, সাফল্য এবং ইতিহাসের বিচারে গোত্রের থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন সংগঠনের খবর মানুষের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। সভ্য মানুষের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে শাসনব্যবস্থার ধাঁচ হিসেবে গোত্র ছিল বেমানান। তবে সেই-সঙ্গেই বলা দরকার যে এই গোত্রের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্রগুলোর প্রধান প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভ্রূণ। যেমন, প্রাচীন আমলের সেই প্রধানদের পরিষদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল আধুনিক ব্যবস্থাপক-সভা, আর প্রাচীন আমলের গণ-পরিষদের মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছিল আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ। এই দুয়ের সম্মিলনেই গড়ে উঠেছিল আধুনিক বিধানমণ্ডলী। প্রাচীন আমলের সামরিক সর্বাধিনায়ক পদেরই উন্নত রূপ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিক কালের প্রধান বিচারপতির পদ। সামন্ততান্ত্রিক রাজাই হোন বা সাংবিধানিক রাজাই হোন, সম্রাটই হোন অথবা রাষ্ট্রপতিই হোন—শেষোক্ত পদগুলো আসলে প্রথমোক্ত পদ-গুলোরই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি মাত্র। আর প্রাচীন 'কাস্টস্ উর্বিস্' পদটাই চক্রাকার বিকাশের পথ বেয়ে এসে পরিণত হয়েছিল রোমানদের বিচারক পদে এবং আধুনিক বিচারপতির পদে। সকলকার সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিসমূহ—এগুলোও গোত্রের কাছ থেকেই পাওয়া। যখন প্রচুর পরিমাণ সম্পত্তি সৃষ্টি হল এবং সমাজে তার প্রভাব ও ছাপ পড়তে শুরু করল, তখনই দেখা দিল দাসপ্রথা। এই প্রথাটা যে ঐ সমস্ত নীতিকে লঙ্ঘন করেই মাথা তুলতে পেরেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা টিকে থাকতে পেরেছিল একটা স্বার্থপর ও প্রতারণামূলক যুক্তির ওপর ভর করে। যে ব্যক্তিকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হচ্ছে, তার সঙ্গে আমাদের কোনরকম রক্তের সম্পর্ক নেই এবং সে একজন বন্দী শত্রু—এটাই ছিল তাদের যুক্তি। সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে মাথা-চাড়া দিল অভিজাততন্ত্র। বিশেষ কতকগুলো সুবিধেভোগী শ্রেণী গড়ে তোলার চেষ্টা করল এরা। সভ্যতার এই তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে সমাজ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সম্পত্তির দ্বারাই। সম্পত্তি মানবজাতিকে দিয়েছে স্বৈরতন্ত্র, সাম্রাজ্য-বাদ, রাজতন্ত্র, সুবিধেভোগী শ্রেণী, এবং অবশেষে নিয়ে এসেছে প্রতিনিধিত্বমূলক

গণতন্ত্র। সুসভ্য জাতিগুলোর যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে সে পরিণত করেছে মূলত সম্পত্তি বাড়ানোর কর্মপ্রচেষ্টায়। কিন্তু মানুষ যখন সম্পত্তির মূল অধিকার সম্বন্ধে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পত্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে একটা উন্নত উপলব্ধিতে পেঁছবে, তখন এই অবস্থার একটা পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা যায়। সেই ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের চরিত্রটা ঠিক কেমন হবে, তা এখনই বলা যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে গণতন্ত্র, যা একসময় সারা পৃথিবীতেই প্রাথমিক রূপে দেখা দিয়েছিল এবং বহু সুসভ্য দেশে যা পদদলিত হয়েছে, তা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবী জুড়ে এবং পরিণত হবে সর্বোচ্চ শক্তিতে।
একজন আমেরিকাবাসী, গণতন্ত্রের নীতিগুলো যিনি আয়ত্ত করেছেন এবং মানবজাতির স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে স্বীকৃতিদানকারী মহান ধারণাগুলোর উৎকর্ষতা এবং মহনীয়তা যাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তাঁরপক্ষে স্বশাসন ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠা-নের স্বপক্ষে মুক্তকণ্ঠে কথা বলাটা একান্তই স্বাভাবিক। সেইসঙ্গেই, সাম্রাজ্যবাদী, রাজতান্ত্রিক বা অন্য যে কোন ধরনের (যা তাঁর চাহিদা পূরণ করতে পারে) সরকারকে মেনে নেওয়া ও অনুমোদন করার আগে অন্যান্য প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার, অধিকার পাওয়ার স্বাধীনতাকেও স্বীকৃতি দিতে হবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা থেকে পুরুষ-ধারায় পরিবর্তন

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে এবার আলোচনা শুরু করা যাক। প্রশ্নটা হল—গ্রীক এবং লাতিন গোত্রগুলোতে প্রাচীনকালে যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় করা হত, তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে কি না? তত্ত্বগতভাবে বললে বলা যায়, সুপ্রাচীনকালে এদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এই প্রথা চালু থাকতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্নটাকে শুধুমাত্র তত্ত্বের ওপর দাঁড় করাতে আমরা বাধ্য নই। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারা চালু করতে হলে গোত্রের সদস্যপদের একটা প্রায় সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটানো দরকার ছিল। কাজেই, কোন্ পদ্ধতিতে সে পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকতে পারে, সেটা অবশ্যই খুঁজে দেখা দরকার। তাছাড়াও, সমাজের ক্রম অগ্রগতির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল (অর্থাৎ যে অবস্থায় বংশধারা নির্ণয়ের এই ধারাটি গড়ে উঠেছিল), সেই অবস্থার মধ্যে এ-রকম একটা পরিবর্তন ঘটানোর মত পর্যাপ্ত কার্যকারণ যে নিশ্চিত মাথা তুলেছিল—সম্ভবপর হলে সেটাও দেখানোর চেষ্টা করা উচিত। আর শেষত, প্রাচীনকালে বংশধারা যে স্ত্রীর-ধারা অনুসারেই নির্ধারিত হত, তার ব্যাপারে প্রাপ্ত প্রমাণগুলোও উপস্থাপিত করতে হবে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে প্রাচীনকালে গোত্র গঠিত হত একজন কল্পিত আদি-নারীর সন্তানসন্ততি আর তার মেয়েদের সন্তান এবং বংশপরম্পরায় তার বংশের মেয়েদের সন্তানদের নিয়ে। সেই আদি-নারীর ছেলেদের সন্তানরা এবং তার বংশের পুরুষদের সন্তানরা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত না। অন্যদিকে, পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গোত্র গড়ে উঠত কোন এক কল্পিত আদি-পুরুষের সন্তানসন্ততি আর তার ছেলেদের সন্তান এবং বংশপরম্পরায় তার বংশের ছেলেদের সন্তানদের নিয়ে। তার মেয়েদের সন্তানরা এবং তার বংশের নারীদের সন্তানরা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত না। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে যারা গোত্রের সদস্য হতে পারত না, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তারাই হত গোত্রের সদস্য। আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যারা গোত্রের সদস্য হতে পারত না, প্রথম ক্ষেত্রে তারাই হত গোত্রের সদস্য। তাই প্রশ্ন ওঠে—গোত্রকে ভেঙে না দিয়ে স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

পরিবর্তনের কারণটা যদি সার্বজনীন, জরুরী এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে, তাহলে তার পদ্ধতিটা সরল ও স্বাভাবিক হতে বাধ্য। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই পরিবর্তনটা ঘটানো হয়ে থাকলে ধরেই নেওয়া যায় যে সেই সময় যারা গোত্রের সদস্য ছিল তারা সদস্য হিসেবেই থাকতে পেরেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ গোত্রের পুরুষ-সদস্যদের সন্তানরাই শুধু গোত্রের সদস্য হওয়ার ও গোত্রীয় নাম ধারণ করার অধিকার পেয়েছিল। গোত্রের নারী-

সদস্যাদের সন্তানরা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। সেই সময় গোত্রের সদস্যদের মধ্যে যে জ্ঞাতিত্ব বা সম্পর্ক ছিল, এই পরিবর্তনের ফলে তা ভেঙে যায়নি বা কোন অদলবদলও ঘটেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে একটা জিনিস ঘটেছিল—আগে যারা গোত্র থেকে বাদ পড়ত, এখন তারাই হল গোত্রের সদস্য ; আর আগে যারা গোত্রের সদস্য হত, এখন তারা পড়ল বাদ। এমনিতে ব্যাপারটাকে খুবই জটিল বলে মনে হয়, কিন্তু উপযুক্ত কারণ থাকার ফলে কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল এবং কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণও হয়েছিল। আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বংশধারা নির্ণয়ের স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হতে দেখা গেছে। যেমন, ওজিবোয়ারা এখন পুরুষ-ধারা অনুসারেই বংশধারা নির্ণয় করে থাকে। তাদের সগোত্রীয় দেলাওয়ার আর মোহেগানরা কিন্তু এখনও স্ত্রী-ধারাই অনুসরণ করে। সমগ্র অ্যালগনকিন কুলের মধ্যে আদতে যে স্ত্রী-ধারানুসারেই বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু ছিল—তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

যেহেতু স্ত্রী-ধারা অনুসরণ করাটাই প্রাচীন রীতি ছিল, এবং যেহেতু প্রাচীনকালের অবস্থার পক্ষে পুরুষ-ধারার থেকে স্ত্রীধারাই ছিল বেশি সঙ্গীতপূর্ণ, সেহেতু অনুমান করা হয় যে গ্রীক ও লাতিন গোত্রগুলোর মধ্যেও চালু ছিল এই রীতিটা। তাছাড়া, কোন সংগঠনের প্রাচীন রূপটা আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হওয়ার পর ঐ সংগঠনের পরবর্তীকালের উন্নততর রূপের মধ্যে তার ভ্রূণরূপ খোঁজাটা অর্থহীন।

স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হওয়ার ঘটনাটা নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার বহু আগে ঘটেছিল। এদের বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না, যদিও এদের শিল্প, প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন আর ভাষার উন্নতির মধ্যে তার কিছু ছাপ রয়ে গেছে। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে এসে আমরা সন্ধান পাই কিছু প্রথা আর হোমারের রচনার। এগুলো থেকে তাদের অভিজ্ঞতা আর অগ্রগতির একটা ছবি ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। তাদের বিভিন্ন রীতি-প্রথাকে বিচার করে দেখলে মনে হয়, বর্বর যুগের উচ্চ প্রর্যায়ের শুরুতেও স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের ব্যাপারটা তাদের মধ্যে থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি, অন্তত পেলাসজিয়ান আর গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তো নয়ই।

গ্রীক আর লাতিন গোত্রগুলো যখন স্ত্রী-ধারা অনুসারে নিজেদের বংশধারা নির্ণয় করত, তখন তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় ছিল : (১) গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল ; অর্থৎ সন্তানরা বাবার গোত্রের সদস্য না হয়ে অন্য গোত্রের সদস্য হত। (২) গোত্রের মধ্যে সম্পত্তি এবং প্রধানের পদটা ছিল উত্তরাধিকার-মূলক ; ফলে, সন্তানরা তাদের বাবার সম্পত্তি বা বাবার পদ পেতে পারত না। এইভাবেই চলছিল। এক সময় দেখা দিল পরিবর্তনের সার্বজনীন ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়তা। বাবার গোত্র থেকে সন্তানদের বাদ পড়া বন্ধ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল তারা।

এ ব্যাপারে স্বাভাবিক পথটাই ছিল বংশধারা নির্ণয়ের স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারার প্রবর্তন করা। এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য দরকার ছিল শুধু পর্যাপ্ত কারণ। তারও অভাব ছিল না। পশুদের পোষ মানানো শুরু হওয়ার পর তা জীবনধারণের

একটা উপায় হয়ে উঠল, সেইসঙ্গেই এইসব গৃহপালিত পশুরা পরিণত হল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। কৃষিকার্যের ফল হিসেবে জমি আর বাড়ির ওপরেও সৃষ্টি হল ব্যক্তিগত মালিকানা। আবার এ-সবের ফলে গোত্রীয় উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ জন্ম নেওয়াটা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। কারণ গোত্রীয় উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী কোন সম্পত্তির মালিকের সন্তানরা তার সম্পত্তি পেত না (অথচ পিতৃত্ব ক্রমশই নিশ্চিত হয়ে উঠছিল), পেত তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা। বাবার সম্পত্তি যাতে সন্তানরা পেতে পারে, তারজন্য এক নতুন নিয়ম চালু করার তাগিদটাকেই এই পরিবর্তন ঘটানোর পর্যাপ্ত কারণ বলে ধরে নেওয়া যায়। সম্পত্তির পরিমাণ যতই বেড়ে উঠছিল, যতই তা স্থায়ী রূপ নিচ্ছিল এবং যতই তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হচ্ছিল, ততই বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হওয়াটা নিশ্চিত হয়ে উঠছিল। এই পরিবর্তনের ফলে গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারের ব্যাপারটার কোন রদবদল হল না, শুধু সন্তানরা বাবার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হল এবং বাবার সম্পত্তিতে সগোত্রীয় অন্যান্য জ্ঞাতিদের থেকে তাদের অধিকার বেশি রইল। খুব সম্ভবত প্রথম দিকে কিছুদিন সন্তানরা নিজেদের বাবার সম্পত্তি অন্যান্য জ্ঞাতিদের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ভোগ করত। কিন্তু যে নিয়ম অনুযায়ী গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের বাতিল করে শুধু জ্ঞাতিরাই পেত সম্পত্তির ভাগ, সেই নিয়মেরই সম্প্রসারণ ঘটিয়ে একদিন বাকি জ্ঞাতিদেরও হঠিয়ে দিল সন্তানরা, এবং বাবার সম্পত্তির ওপর কায়েম হল তাদের একচ্ছত্র উত্তরাধিকার। তাছাড়া, বাবা যে পদে আসীন ছিলেন, সেই পদের উত্তরাধিকারী হিসেবেও বিবেচিত হতে লাগল ছেলেদের নাম।

সোলোনের আমলে বা তার অল্প কিছুদিন পরে এথেনীয় গোত্রগুলোর উত্তরাধিকারের নীতি এরকম চেহারাই নিয়েছিল। বাবার সম্পত্তি সমানভাগে পেত ছেলেরা। শুধু শর্ত থাকত—বোনেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে আর তাদের বিবাহের সময় তাদেরকে দিতে হবে সম্পত্তির ভাগ। কোন ব্যক্তির ছেলে না থাকলে তার মেয়েদের মধ্যেই সম্পত্তিটা সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হত। নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা, আর সেরকম কোন জ্ঞাতি না থাকলে তার গোত্রের সদস্যরা। রোমানদের টুয়েল্ভ্ টেব্ল্-এর নিয়মটাও ঠিক এরকমই ছিল।

খুব সম্ভবত বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যখন পুরুষ-ধারা চালু হয়, তখন থেকে অথবা তার আগে থেকেই গোত্রের ক্ষেত্রে পশুদের নাম বাতিল করে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা নিজস্বতাও সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, আর সম্পত্তি বেড়ে চলা ও তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হওয়ার ফলে কোন প্রাচীন বীরের নামে গোত্রের নামকরণ করার রীতি চালু হচ্ছিল। বিভাজন প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে মাঝে-মাঝেই নতুন নতুন গোত্র সৃষ্টি হত এবং পুরনো কিছু গোত্র বিলুপ্ত হয়ে যেত, তা সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-কোন গোত্রের বংশধারার কয়েক হাজার বছর না হলেও অন্তত কয়েকশ বছরের ইতিহাস থাকতই। পশু-নামের বদলে গোত্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম ব্যবহার

পুরুষ হওয়ার পর থেকে সেই কল্পিত আদিপুরুষের নামও দীর্ঘকাল অন্তর অন্তর পরিবর্তিত হত। গোত্রের ইতিহাসে খুব বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম ব্যবহৃত হত প্রথম জনের বদলে। আসলে ঐ প্রথম জনের কথা যখন মানুষ প্রায় ভুলে যেত, যখন তার নাম হারিয়ে যেত অতীতের ধূসরিমায়—তখনই তার বদলে ব্যবহার করা হত অন্য আর একজনের নাম। অধিকতর বিখ্যাত গ্রীক গোত্রগুলো যে চমৎকারভাবে নামের এ-রকম পরিবর্তন ঘটাত, তা একটা বিশেষ ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়ঃ গোত্রপিতার মায়ের নামটা তারা বজায় রাখত এবং বলত যে বিশেষ কোন দেবতার সঙ্গে তাঁর মিলনের ফলেই জন্ম হয়েছিল ঐ গোত্রপিতার। যেমন, এথেন্সের ইউমলপিডাদের গোত্রপিতার সম্বন্ধে বলা হত যে তিনি ছিলেন নেপচুন আর চিওনের সন্তান। কিন্তু নেপচুনের নাম যখন থেকে শোনা যায়, তার অনেক আগেই এমনকি গ্রীক গোত্রগুলোরও অস্তিত্ব ছিল।

মূল প্রশ্নে ফেরা যাক। গ্রীক ও লাতিন গোত্রগুলোতে প্রাচীনকালে যে স্ত্রী-ধারা অনুসারেই বংশধারা নির্ণয় করা হত, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও সিদ্ধান্তটা কিন্তু বাতিল হয়ে যায় না। তবে, গ্রীকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কোন কোন গোষ্ঠীতে স্ত্রী-ধারার চলন ছিল এবং গ্রীকদের কয়েকটা গোষ্ঠীতেও এর ছাপ দেখা গেছে।

অনুসন্ধিৎসু এবং পর্যবেক্ষণপটু হেরোডোটাস একটা বিশেষ জাতির সন্ধান পেয়েছিলেন, যাদের মধ্যে তাঁর আমলে (৪৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দ) স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের রীতি চালু ছিল। এই জাতিটার নাম লাইসিয়ান, যারা বংশগত বিচারে পেলাসজিয়ান কিন্তু সম্বন্ধের বিচারে ছিল গ্রীক। হেরোডোটাস প্রথমে বলেছেন যে এই লাইসিয়ানদের উদ্ভব ঘটেছিল ক্রীট থেকে, অতঃপর সার্পেডনের নেতৃত্বে তাদের লাইসিয়ায় চলে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু খুঁটিনাটি তথ্য জানিয়ে তিনি লিখেছেনঃ "এদের প্রথাগুলো অংশত ক্রীটিয় এবং অংশত ক্যারিয়ান। তবে এদের মধ্যে এমন একটা প্রথা চালু আছে, যা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। কোন লাইসিয়ানকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে নিজের নাম বলে, নিজের মায়ের নাম বলে এবং এইভাবে স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী দিদিমার নাম, তাঁর মায়ের নাম ইত্যাদি বলে যায়। তাছাড়া, কোন স্বাধীন নারী কোন ক্রীতদাসকে বিবাহ করলে তাদের সন্তানরা স্বাধীন নাগরিক হিসেবেই গণ্য হয়। কিন্তু কোন স্বাধীন পুরুষ কোন বিদেশী নারীকে বিবাহ করলে বা কোন রক্ষিতার সঙ্গে সহবাস করলে (এমনকি সেই পুরুষটি জাতির সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও) তাদের সন্তানরা নাগরিকের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।"[১] এ থেকে অনুমান করা যায় যে লাইসিয়ানরা গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল, গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ এবং সন্তানরা তাদের মায়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। গোত্রের প্রাচীন রূপটা কেমন ছিল, তার একটা পরিষ্কার চিত্র পাচ্ছি আমরা, আর সেই সঙ্গেই জানতে পারছি কোন লাইসিয়ান পুরুষের সঙ্গে কোন বিদেশী নারীর এবং কোন লাইসিয়ান নারীর সঙ্গে কোন ক্রীত-

১। রলিনসন-এর "হেরোডোটাস", i, ১৭৩.

দাসের বিবাহের ফল কী হত।[১] ক্রীটের আদিবাসীরা ছিল পেলাসজিয়ান, গ্রীক এবং সেমিটিক গোষ্ঠীর মানুষ। এক এক গোষ্ঠীর মানুষ এক একটা আলাদা আলাদা এলাকায় বসবাস করত। সার্পেডনের ভাই মিনোসকেই সাধারণত ক্রীটের পেলাসজিয়ানদের আদি পুরুষ বলে মনে করা হয়। কিন্তু লাইসিয়ানরা হেরোডোটাসের আমলের আগেই পুরোপুরি গ্রীক হয়ে উঠেছিল। এশিয়াটিক গ্রীকদের মধ্যে অগ্রগতির বিচারে এদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। পৌরাণিক যুগে তারা লাইসিয়ায় চলে যাওয়ার আগে তাদের পূর্বপুরুষরা ক্রীট দ্বীপে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করত। এই ঘটনাটা থেকে হয়ত অত দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের রীতি চালু থাকার কারণটা বোঝা যেতে পারে।

এট্রুস্কানদের মধ্যেও বংশধারা নির্ণয়ের এই রীতি চালু ছিল। ক্র্যামার লিখেছেন, "এট্রুস্কানদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো থেকে আমরা তাদের যে দুটো নিজস্ব প্রথার কথা জানতে পারি, সেই প্রথা দুটো এশিয়া মাইনরের লাইসিয়ান আর কনিয়ানদের মধ্যেও লক্ষ্য করেছিলেন হেরোডোটাস। এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। প্রথম প্রথাটা হল—নিজেদের পরিচয় এবং পরিবার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এট্রুস্কানরা মায়ের নামই করে থাকে, বাবার নাম নয়। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে—বিভিন্ন ভোজসভা ও উৎসবে তাদের স্ত্রীরাও যোগ দিতে পারে।"[২]

লাইসিয়ান, এট্রুস্কান ও ক্রীটানদের মধ্যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় প্রসঙ্গে কুর্টিয়াস লিখেছেন: "এই রীতিটাকে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর নিদর্শন হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। আসলে সমাজের আদিম অবস্থাই জন্ম দিয়েছিল এই রীতির। তখনও সমাজে একবিবাহপ্রথা ঠিকমত চালু হয়নি। সন্তানের পিতৃত্ব সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যেত না। তাই দেখা যায়, লাইসিয়ানরা যতটুকু এলাকায় বসবাস করত, তার বাইরেও এই রীতির চলন ছিল। আজও ভারতবর্ষে এর অস্তিত্ব আছে। প্রাচীনকালের ঈজিপ্সিয়ানদের মধ্যেও এটা চালু ছিল। সাঙ্কোনিয়াথন এই রীতির কথা উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৬, ওরেল), চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এর টিকে থাকার কারণগুলো। প্রাচ্যজগতের বাইরে এর দেখা মেলে এট্রুস্কানদের মধ্যে, ক্রীটানদের মধ্যে। লাইসিয়ানদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং পিতৃভূমিকে এরা মাতৃভূমি বলে উল্লেখ করত। এথেনীয়দের মধ্যেও এই রীতি চালু ছিল। এ ব্যাপারে

১। সেনেকা-ইরোকোয়াদের কোন পুরুষ কোন বিদেশী নারীকে বিবাহ করলে তাদের সন্তানরাও বিদেশী হিসেবেই বিবেচিত হয়। কিন্তু সেনেকা-ইরোকোয়াদের কোন নারী কোন বিদেশী বা ওনোনডাগা পুরুষকে বিবাহ করলে তাদের সন্তানরা সেনেকা-ইরোকোয়া হিসেবেই বিবেচিত হয়, এবং সেই সন্তানরা তাদের মায়ের গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। সন্তানদের বাবা যে-ই হোক না কেন, তারা মায়ের জাতি ও গোত্রেরই সদস্য হয়ে থাকে।

২। "ডেসক্রিপশন অফ এনসিয়েন্ট ইতালি", i, ১৫৩ "ন্যাস্তি"-কে উদ্ধৃত করে, ii, ৩১৪.

বাখোফেন প্রমুখের রচনা থেকে অনেক কথা জানা যায়। কাজেই, হেরোডোটাস যদি মনে করে থাকেন যে এই রীতিটা শুধুমাত্র লাইসিয়ানদের মধ্যে চালু ছিল, তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে এই রীতিটা আসলে গ্রীসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য সমস্ত জাতির তুলনায় তাদের মধ্যেই সবথেকে বেশিদিন ধরে টিকে থাকতে পেরেছিল। লাইসিয়ানদের বিভিন্ন শিলালিপি ইত্যাদি থেকেও তার প্রমাণ মেলে। তাই এ-কথাটা সাধারণভাবে স্বীকার করেই নেওয়া যায় যে, মায়ের নাম ব্যবহার করাটা ছিল সমাজ-ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবনের একটা ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার স্মারকস্বরূপ বংশপরিচয় দেওয়ার একটা রীতি। মানুষের জীবনযাত্রা আরও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠার পর এ-রীতি সারা গ্রীসেই পরিত্যক্ত হয়। শুরু হয় বাবার সূত্রে সন্তানদের পরিচয় দেওয়ার রীতি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন ধরনের রীতিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাখোফেনের যে বক্তৃতার কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে তিনি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।"[১]

বাখোফেন তাঁর এক বিপুল গবেষণায় লাইসিয়ান, ক্রীটান, এথেনিয়ান, লেমনিয়ান, ঈজিপ্সিয়ান, অর্কোমেনিয়ান, লোক্রিয়ান, লেসবিয়ান, মান্তিনিয়ান এবং এশিয়ার পূর্বপ্রান্তীয় জাতিগুলোর মধ্যেকার নারী-কর্তৃত্ব (মাতৃ-অধিকার) ও নারী-শাসনের (gyneocracy) নিদর্শনগুলো সংগ্রহ করেছেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২] প্রাচীন সমাজের অবস্থাটা এইভাবে পর্যালোচনা করা হলে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য প্রাচীন ধরনের গোত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়াটা একান্তই জরুরী। ঐ ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার মূল সূত্র নিহিত আছে প্রাচীন গোত্রের মধ্যেই। সেই সময় মা আর সন্তানরা একই গোত্রের মধ্যে থাকত। আর গোত্রের ভিত্তিতে যে যৌথ বাসস্থান-গুলো গড়ে উঠত, তাতে কর্তৃত্ব থাকত মায়ের গোত্রেরই। তখন সম্ভবত জোড়বাঁধা বিয়ে দেখা দিলেও পরিবারগুলোর মধ্যে পুরনো আমলের দাম্পত্যজীবনের ছাপ

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", স্মিবনার অ্যাণ্ড আর্মস্ট্রং সম্পাদিত, ওয়ার্ডের অনুবাদ, i, ৯৪, টীকা। যে এটিওক্রীট্সদের নেতা ছিলেন মিনোস, তারা নিঃসন্দেহেই পেলাস-জিয়ান ছিল। এরা ক্রীট দ্বীপপুঞ্জের পূর্বপ্রান্তে বসবাস শুরু করে। মিনোসের ভাই সার্পেডনের নেতৃত্বে দেশান্তরীরা লাইসিয়ায় গিয়ে পৌঁছোয়। এখানে তারা সোলিমি নামক একটা গোষ্ঠীকে হটিয়ে এলাকাটা অধিকার করে। এই সোলিমিরা খুব সম্ভব সেমিটিক গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। কিন্তু অন্যান্য অনেক পেলাসজিয়ান গোষ্ঠীর মতো লাইসিয়ানরাও হেরোডোটাসের আমলের আগেই গ্রীকদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। গ্রীক আর পেলাসজিয়ান গোষ্ঠীগুলো যে একই আদিগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত—এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এই ঘটনাটা বড় যুক্তি হিসেবে কাজ করে। হেরোডোটাসের আমলে জীবন-যাপনের কলাকৌশলের ব্যাপারে এরা ইউরোপীয় গ্রীকদের মতোই উন্নত হয়ে উঠেছিল (কুর্টিয়াস, i, ৯৩; গ্রোটে, i, ২২৪)। সম্ভবত তাদের পেলাসজিয়ান পূর্বপুরুষের কাছ থেকেই স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের রীতিটা গ্রহণ করেছিল তারা।

২। "Das Mutterrecht", স্টুটগার্ট, ১৮৬১.

তখনও রয়ে গিয়েছিল। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী আর তাদের সন্তানসন্ততি-বিশিষ্ট এই পরিবার স্বভাবতই তাদের জ্ঞাতি পরিবারগুলোর সঙ্গে একটা যৌথ বাসগৃহে বসবাস করতে চাইত। ঐসব বাসগৃহের মায়েরা আর তাদের সন্তানরা একই গোত্রের সদস্য ছিল, আর ঐ-সব সন্তানদের বাবারা ছিল অন্য গোত্রের লোক। সার্বজনীন জমি আর যৌথ কৃষিকাজের ফল হিসেবেই গড়ে উঠেছিল যৌথ বাসগৃহ এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ। আসলে, মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য স্ত্রী-ধারা অনুসারেই বংশধারা নির্ণয় করা দরকার ছিল। বড় বড় পরিবারে বাস করতে শুরু করল নারীরা। তাদের খাদ্য আসত যৌথ ভাণ্ডার থেকে। ঐ-সব যৌথ ভাণ্ডারে সংখ্যার বিচারে তাদের নিজেদের গোত্রের প্রচুর সদস্য থাকত। এইসবের ফল হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছিল মাতৃ-অধিকার আর মাতৃতন্ত্রের। ইতিহাস আর লোককথার খণ্ড খণ্ড অংশের সাহায্যে এই ব্যাপারের ইতিবৃত্ত খোঁজার চেষ্টা করেছেন বাখোফেন। স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারায় বংশধারা নির্ণয় শুরু হওয়া এবং একপতিপত্নীক পরিবারের সূত্রপাত ঘটার ফলে মেয়েদের অবস্থাটা যে কিছুটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল, তা আমি আগেই বলেছি। একপতিপত্নীক পরিবার সৃষ্টি হওয়ার ফলে যৌথ বাসগৃহ-গুলো অকেজো হয়ে গিয়েছিল, আর পুরোপুরি গোত্রভিত্তিক একটা সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী এবং মায়েদের হতে হয়েছিল পৃথক পৃথক গৃহের বাসিন্দা। নিজের গোত্রীয় জ্ঞাতি-দের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তারা।[১]

বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায় শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এক-বিবাহপ্রথা সম্ভবত চালু হয় নি। ঐ সময়ের আগে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে, বিশেষত এথেনীয়দের মধ্যে, একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা চলছিল। এথেনীয়দের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাখোফেন লিখেছেন: "আমরা দেখেছি যে সেক্রপ্‌স্‌-এর আমলের আগে পর্যন্ত শিশুদের একজন মা থাকত বটে, কিন্তু তাদের বাবা হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করা যেত না। শুধু মায়ের পরিচয়টাই পেত তারা। কোন একজন পুরুষের সঙ্গে আবদ্ধ থাকত না নারীরা, ফলে তারা জন্ম দিত পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের। এই অবস্থার অবসান ঘটান সেক্রপ্‌স্‌ নারী-পুরুষের অবাধ মিলনের বদলে

১। ক্রীট দ্বীপপুঞ্জের লিক্‌টোস নগরী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাখোফেন লিখেছেন, "এই নগরীটাকে একটা ল্যাসিডামোনিয়ান উপনিবেশ হিসেবেই দেখা হত এবং এথেনীয়দের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত বলেও মনে করা হত। উভয় ক্ষেত্রেই এই সম্পর্কটা নির্ধারিত হত মায়েদের দিক থেকে, কারণ এখানকার মায়েরাই শুধু স্পার্টান ছিল। তবে, এথেনীয়দের সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল সেইসব এথেনীয় নারীদের সূত্রে, যাদেরকে ব্রউরন শৈলান্তরীপ থেকে প্রলোভিত করে নিয়ে এসেছিলেন পেলাসজিয়ান টাইরেজিয়ানরা।"---"Das Mutterrecht", পরিচ্ছেদ ১৩, পৃ: ৩১.

পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণীত হলে নারীদের দিকটা অলক্ষিতই থেকে যেত। কিন্তু স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণীত হলে ঔপনিবেশিকরা নিজেদের বংশপরিচয় দিত কেবলমাত্র নারীদের কথা উল্লেখ করেই।

তিনি চালু করেন একমাত্র বৈবাহিক মিলনের রীতি। এর ফলে সন্তানরা তাদের বাবা ও মা, উভয়ের পরিচয়ই জানতে পারে, এবং একপক্ষীয় (unilateres) পরিচয়ের বদলে লাভ করে দ্বিপক্ষীয় (bilateres) পরিচয়।"[১] নারীপুরুষের অবাধ মিলন বলতে এখানে যা বোঝানো হয়েছে, তাকে একটু শুধরে নেওয়া দরকার। কিছুটা পরবর্তী-কালের ঐ সময়ে জোড়বাঁধা পরিবারের উদ্ভব ঘটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, তবে পুরনো আমলের দলগত বিবাহের কিছু ছাপও তার মধ্যে থেকে যেতে বাধ্য। বাখোফেনের কথা থেকে বোঝা যায় যে, এথেনীয়রা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছনোর আগেই দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অবসান ঘটেছিল। পরবর্তী-কালে পরিবারের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমরা এই বিষয়টিকে খুঁটিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করব।

ইতালির একশটা লোক্রিয়ান পরিবার সম্বন্ধে একটা চিত্তাকর্ষক মন্তব্য করেছেন পলিবায়াস। তিনি বলেছেন, "লোক্রিয়ানরা নিজেরাই আমাকে বলেছে যে তাদের বিভিন্ন প্রথার সঙ্গে আরিস্তুতলের বিবরণের যতটা মিল আছে, তাইমেউসের বিবরণের সঙ্গে ততটা মিল নেই। এ-ব্যাপারে তারা নিম্নোক্ত প্রমাণগুলোর কথা উল্লেখ করেছিল। প্রথমত, প্রাচীনকালে তাদের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই ছিল কোন-না-কোন নারীর বংশধর, পুরুষের নয়। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলতে শুধু তাদেরকেই বোঝানো হত, যারা ছিল ঐ একশটা পরিবারের কোন-না-কোনটার বংশধর। লোক্রিয়ানরা দেশান্তরী হওয়ার আগে এই পরিবারগুলোই ছিল তাদের মধ্যে অভিজাত। দৈববাণীর নির্দেশমত এদের মধ্যে থেকেই একশজন কুমারীকে পাঠানো হয়েছিল ট্রয়ে।"[২] যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে এখানে যে সম্ভ্রান্ত পদটার কথা বলা হয়েছে, সেটা গোত্র-প্রধানের পদের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত ছিল। গোত্রের যে পরিবারের কোন একজন সদস্য এই পদটা লাভ করত, সেই গোটা পরিবারটাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মর্যাদার অধিকারী হত। এই অনুমানটা সঠিক হলে ধরে নেওয়া যায় যে ব্যক্তির পরিচয় এবং পদ—উভয় ক্ষেত্রেই বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে। প্রাচীনকালে প্রধান পদটা ছিল গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক এবং তার পুরুষ সদস্যদের মধ্যে মনোনয়নভিত্তিক। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা চালু থাকার ফলে পদটা বর্তাতো এক ভাইয়ের থেকে আর এক ভাইয়ের ওপর, মামার থেকে ভাগ্নের ওপর। প্রতিটা ক্ষেত্রে পদটা হস্তান্তরিত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে। নির্দিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ভর করত তার মায়ের গোত্রের ওপর। গোত্রের সঙ্গে সন্তানের যোগসূত্র গড়ে উঠত মায়ের সাহায্যেই। যে মৃত প্রধানের পদ সে লাভ করত, তার সঙ্গেও ঐ ব্যক্তির সম্পর্ক মায়ের মারফতই গড়ে উঠত। যেখানেই দেখা যায় যে পদ ও মর্যাদা হস্তান্তরিত হয় স্ত্রী-ধারা অনুসারে, সেখানেই স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু আছে বলে মেনে নেওয়া যায়।

গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রাচীনকালে যে স্ত্রী-ধারা অনুসারেই বংশধারা নির্ণীত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীনকালের কয়েকটা বিবাহের মধ্যে। যেমন, সালমনি-

---

১। "Das Matterrecht", পরিচ্ছেদ ৩৮, পৃঃ ৭৩.

২। "পলিবায়াস", xii, দ্বিতীয়টি থেকে নেওয়া, হ্যাম্পটনের অনুবাদ, iii, ২৪২.

টস ও ক্রেথেউস ছিল দুই আপন ভাই। এরা ছিল ইওলাসের সন্তান। এই সালমনিউস তার মেয়ে তাইরোর বিবাহ দেয় তার কাকা অর্থাৎ ক্রেথেউসের সঙ্গে। পুরুষ-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণীত হলে ক্রেথেউস আর তাইরো একই গোত্রের সদস্য হত, ফলে তাদের মধ্যে বিবাহ হওয়া সম্ভব হত না। কিন্তু স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণীত হলে তারা দুজন আলদা আলাদা গোত্রের সদস্য হত, ফলে তাদের মধ্যে কোনরকম গোত্রগত আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকত না। আর সেক্ষেত্রে তাদের বিবাহের জন্য গোত্রের কঠোর বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করারও কোন প্রয়োজন হত না। উল্লিখিত দুজন ব্যক্তিকে কাল্পনিক বা পৌরাণিক চরিত্র বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা ঐ ঘটনার মধ্যে গোত্রীয় রীতিনীতিটা ফুটে উঠেছে অত্যন্ত যথাযথভাবে। এই বিবাহটাকে ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের প্রকল্পের সাহায্যেই। আর তা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়—সে-সময় তাদের মধ্যে এইভাবেই বংশধারা নির্ণীত হত, কিম্বা তখনও পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত না হয়ে যাওয়া প্রাচীন রীতিনীতিগুলো এরকম বিবাহকে সমর্থনই করত।
ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন বিবাহের মধ্যেও এরই চিত্র ফুটে ওঠে। পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু হলেও পুরনো রীতিটা তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। বিবাহের পাত্রপাত্রীদের গোত্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেও এ-রকম বিবাহ ঘটত। সোলোনের আমলের পর কোন পুরুষ তার সৎ-বোনকে বিবাহ করতে পারত। অবশ্য এরা দুজন আলাদা আলাদা মায়ের সন্তান হলে তবেই বিবাহ করা সম্ভব হত, আলাদা আলাদা পিতার সন্তান অথচ একই মায়ের গর্ভজাত হলে বিবাহ করা যেত না। আলাদা আলাদা মায়ের সন্তান হলে ঘটনাটা কী ঘটত? যেহেতু বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে, তাই তারা দুজন ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হত এবং কোনরকম গোত্রগত আত্মীয়তা থাকত না তাদের মধ্যে। এ-রকম বিবাহের জন্য গোত্রের কোন বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করারও প্রয়োজন হত না। কিন্তু পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণীত হলে (নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো ঘটার সময় সেটাই ছিল চালু নীতি) তারা একই গোত্রের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হত, ফলে গোত্রীয় বিধিনিষেধের আওতায় পড়তে হত তাদের। সিমন বিবাহ করেছিলেন তাঁর সৎ-বোন এল্‌পিনিস্‌কে। তাঁরা দুজনে একই বাবার সন্তান হলেও ভিন্ন ভিন্ন মায়ের গর্ভজাত ছিলেন। ডিমস্থিনিসের লেখা 'ইউবুলাইড্‌স্‌'-এ এ-রকম একটা ঘটনার কথা পাওয়া যায়। সেখান ইউক্সিথিউস বলেছেন, "আমার ঠাকুরদা তাঁর বোনকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু সেই বোন তাঁর মায়ের গর্ভজাতা ছিলেন না।"[১] এই ধরনের বিবাহকে (সোলোনের আমলেই যার বিরুদ্ধে একটা দারুণ কুসংস্কার গড়ে উঠেছিল এথেনীয়দের মধ্যে) ব্যাখ্যা করা যায় বিবাহ সংক্রান্ত একটা প্রাচীন প্রথার স্মারক হিসেবে। যখন বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে, তখন এ-রকম বিবাহপ্রথা চালু ছিল, আর ডিমস্থিনিসের আমলেও তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।
স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের জন্য গোত্রের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয়,

১। Demosthenes contra Eudulides", ২০.

কারণ সন্তানের বংশপরিচয় নির্ধারিত হত গোত্রের ভিত্তিতেই। অস্ট্রেলিয়া সহ পাঁচটা মহাদেশে প্রাচীনকালে ও আধুনিককালে গোষ্ঠীর সংগঠনের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে এবং গোত্রের গঠনকাঠামো সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানি, তা থেকে মনে হয় স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের ঘটনা ঐতিহাসিক যুগে না ঘটলেও, বিভিন্ন প্রথার মধ্যে তার ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে সর্বত্রই। তাই এটা মোটেই ধরে নেওয়া যায় না যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় করার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ রীতি লাইসিয়ান, ক্রীটান, এথেনিয়ান আর লোক্রিয়ানরা নিজেরা উদ্ভাবন করে নিয়েছিল (শেষোক্ত গোষ্ঠী দুটোকে এর অন্তর্ভুক্ত করাটা অবশ্য প্রমাণসাপেক্ষ)। লাতিন, গ্রীক এবং গ্রেকো-ইতালিয়ান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রাচীনকালে এটাই ছিল চালু রীতি—এই প্রকল্পটাকে মেনে নিলে তৎকালীন ঘটনাবলীর একটা যুক্তিগ্রাহ্য ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সম্পত্তির প্রভাব আর সন্তানদের হাতে নিজের সম্পত্তি অর্পণ করার আকাঙ্খা—বংশধারা নির্ণয়ের পুরুষ-ধারা চালু করার পিছনে এই দুটো ব্যাপার যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে।

বিবাহের সময় স্বামীর ভ্রাতৃত্বের তালিকায় স্ত্রীর নাম নথিভুক্ত করানো এবং ছেলে-মেয়েদের নাম বাবার গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের তালিকায় নথিভুক্ত করানোর প্রথা থেকে অনুমান করা চলে যে, সোলোনের আমলের আগে ও পরে এথেনীয়দের মধ্যে গোত্রের বাইরে বিবাহ করার রীতিই প্রচলিত ছিল।[১] পরস্পর রক্তসম্বন্ধযুক্ত বলে গোত্রের সদস্যারা নিজেদের মধ্যে বিবাহ করতে পারে না—এই মৌলিক নীতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল গোত্র। কোন গোত্রেরই সদস্যসংখ্যা খুব বেশি হত না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সোলোনের আমলে নথিভুক্ত এথেনীয় ছিল ষাট হাজার জন, তাহলে তাদের তিনশ ষাটটা গোত্রের গড় লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র একশ ষাট জন করে। গোত্র ছিল জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্ত কিছু লোকের একটা বৃহৎ পরিবার। এদের একটা সার্বজনীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সার্বজনীন কবরস্থান এবং সাধারণ কিছু সার্বজনীন জমি থাকত। গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় চালু হওয়া, একবিবাহপ্রথা চালু হওয়া, বাবার সম্পত্তির ওপর শুধুমাত্র সন্তানদেরই উত্তরাধিকার শুরু হওয়া এবং মেয়েদেরও বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া—এইসব ঘটনার ফলে গোত্র নির্বিশেষে অবাধ বিবাহের জমিটা আস্তে আস্তে তৈরী হচ্ছিল (শুধুমাত্র অত্যন্ত নিকট কয়েকজন আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞাটা ছিলই)। মানুষের ইতিহাসে প্রথম দেখা দিয়েছিল দলগত বিবাহ। এই বিবাহে কোন দলের শুধু শিশুরা বাদে বাকি সমস্ত নারী-পুরুষই ছিল সকলকার যৌথ স্ত্রী ও স্বামী। কিন্তু স্বামী ও

১। ডিমস্থিনিস, "ইউবুলাইডস্", ২৪, তাঁর আমলে নাম নথিভুক্ত করানো হত শহরের তালিকায়। তবে তা থেকে বোঝা যেত যে নথিভুক্ত করানো ব্যক্তিটির স্বভ্রাতৃত্বের লোক, রক্তসম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়, এক শহরবাসী এবং সগোত্রীয় কারা; ইউস্থিথিউস এ-রকমই বলেছেন। এছাড়াও দ্রষ্টব্য, হার্মান-এর "পলিটিক্যাল অফ গ্রীস", পৃ. ১০০.

স্বামীরা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য ছিল। অগ্রগতির পথে ধীরে ধীরে সামনে এল এক-স্বামী এক-স্ত্রী প্রথা। এরা দুজনে শুধুমাত্র পরস্পরের সঙ্গেই মিলিত হয়। বিবাহের নানান রূপ এবং প্রথম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরিবারের যে যে রূপগুলো দেখা গেছে, সেগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা।

গোত্রের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধের একটা ব্যবস্থাও সৃষ্টি হয়েছিল। এই ব্যবস্থার খুব উল্লেখযোগ্য নজির দেখা গেছে এশিয়ার তুরানিয়ানদের মধ্যে, আমেরিকার গ্যানোয়ানিয়ানদের মধ্যে। এদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ তো নিষিদ্ধ ছিলই, সেইসঙ্গেই দূরসম্পর্কের জ্ঞাতিভাই আর জ্ঞাতিবোনদের মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল। আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে, এশিয়া ও আফ্রিকার কোন কোন জায়গায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় আজও চালু আছে এই ব্যবস্থা। প্রাচীনকালে গ্রীক ও লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চালু ছিল, এবং সেই যুগেও তার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। তুরানিয়ান ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য এ-রকম: বিভিন্ন ভাইয়ের সন্তানরা পরস্পরের ভাইবোন, কাজেই তারা পরস্পরকে বিবাহ করতে পারত না; বিভিন্ন বোনের সন্তনরাও পরস্পরের ভাইবোন, কাজেই একই নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। দানায়ুসের কন্যাদের সুবিখ্যাত উপাখ্যানটিকে এই ব্যবস্থার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (যে উপাখ্যান অবলম্বনে এস্কাইলাস লিখেছিলেন তাঁর 'সাপ্লিঅ্যান্টস' নামক ট্রাজেডিটি)। আর্গাইভ ইও-র বংশধর দানায়ুস আর ঈজিপ্টাস ছিল দুই ভাই। প্রথমজন বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে জন্ম দেয় পঞ্চাশটি কন্যার, দ্বিতীয়জন বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে জন্ম দেয় পঞ্চাশটি পুত্রের। যথাসময়ে ঈজিপ্টাসের পুত্ররা দানাউসের কন্যাদের বিবাহ করতে চায়। তখনও পর্যন্ত গোত্রের মধ্যে রক্তসম্বন্ধের যে ব্যবস্থা চালু ছিল এবং এক-বিবাহ প্রথা কর্তৃক সূচিত নতুন ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত যে ব্যবস্থা টিকে ছিল, সেই ব্যবস্থা অনুসারে তারা ছিল পরস্পরের ভাইবোন, ফলে তাদের মধ্যে বিবাহ হওয়া সম্ভব ছিল না। তখন যদি পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু থাকত, তাহলে দানায়ুস আর ঈজিপ্টাসের সন্তানরা একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন হত। আর সেটা তাদের বিবাহের পথে আর একটা বাড়তি অন্তরাল সৃষ্টি করত। তাসত্ত্বেও ঈজিপ্টাসের পুত্ররা এইসব প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করে জোর করে বিবাহ করতে চায় দানায়ুসের কন্যাদের। দানায়ুস-দুহিতারা তখন ঈজিপ্ট থেকে সাগর পার হয়ে পালিয়ে যায় আর্গস-এ। তাদের মতে ঐ বিবাহ ছিল একটা অবৈধ ও অজাচারী মিলন। এস্কাইলাসেরই 'প্রমিথিয়ুস' নাটকে দেখা যায় এই ঘটনাটার কথা প্রমিথিয়ুস পূর্বাহ্ণেই জানাচ্ছেন ইও-কে। তিনি বলছেন—ইও-র ভবিষ্যৎ-পুত্র ইপ্যাফাসের সময় থেকে শুরু করে পঞ্চম প্রজন্মের সময় পঞ্চাশজন কুমারী-কন্যা চলে আসবে আর্গসে; না, স্বেচ্ছায় আসবে না তারা, ঈজিপ্টাসের পুত্রদের সঙ্গে অজাচারমূলক দাম্পত্যকে এড়ানোর জন্য পালিয়ে আসবে।[১] প্রস্তাবিত ঐ বিবাহকে ঘৃণা করে তাদের এই পলায়নের ব্যাখ্যা করার জন্য গোত্রীয় নিয়মকানুন জানার প্রয়োজন হয় না, রক্তসম্বন্ধের প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যেই এর ব্যাখ্যা মেলে। এই

১। "প্রমিথিয়ুস", ৮৫৩.

ব্যাখ্যাটুকু ছাড়া ঐ ঘটনার অন্য কোন তাৎপর্য নেই। তাদের এই বিবাহ-বিমুখতাটা নিছক শালীনতার ভানও হয়ে থাকতে পারে।

'সাপ্লিঅ্যান্টস' নাটকটা রচিত হয়েছে তাদের সাগর পেরিয়ে আর্গসে পালানোকে উপজীব্য করেই। ঈজিপ্টাসের পুত্রদের (যারা তাদের অনুসরণ করেছিল) বল-প্রয়োগের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য তারা আর্গাইভ থেকে জাত তাদের জ্ঞাতিদের কাছে দাবি জানিয়েছে। আর্গসে গিয়ে দানায়ুস-দুহিতারা ঘোষণা করেছে—ঈজিপ্ট থেকে তারা নির্বাসিত হয়ে চলে আসেনি, তারা পালিয়ে এসেছে তাদেরই বংশের পুরুষদের সঙ্গে, অর্থাৎ ঈজিপ্টাসের পুত্রদের সঙ্গে অপবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে।[১] তাদের এই অনিচ্ছার পিছনে জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধই একমাত্র কারণ হিসেবে কাজ করেছে। অর্থাৎ, এ-ধরনের বিবাহের বিরুদ্ধে একটা নিষেধাজ্ঞা চালু ছিল এবং তারা সেটাকে মান্য করতে শিখেছিল। এই সাপ্লিঅ্যান্ট বা আবেদনকারিনীদের বক্তব্য শোনার পর আর্গসবাসীদের পরিষদ তাদের রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ থেকেও বোঝা যায় যে ঐ ধরনের বিবাহ সম্বন্ধে এ টা নিষেধাজ্ঞা ছিলই, এবং দানায়ুস-দুহিতাদের আপত্তিটাও ছিল যুক্তিসঙ্গত। এই নাটক যখন রচিত হয়, তখন এথেনীয়রা উত্তরাধিকারিনীর প্রশ্নে এবং অনাথা নারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাইয়ের পুত্রকন্যাদের মধ্যে বিবাহকে অনুমোদন করত তো বটেই, এমনকি এই ধরনের বিবাহ তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়ও ছিল (তবে এ নিয়ম সম্ভবত শুধু ঐ-সব ব্যতিক্রমী ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল)। কাজেই এ-রকম বিবাহকে অজাচারমূলক বা অবৈধ বলে মনে করার কোন কারণ এথেনীয়দের ছিল না। কিন্তু দানায়ুস-দুহিতাদের এই উপাখ্যানটা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। সেই সময় এ-রকম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, আর এটুকুই এই উপাখ্যানের একমাত্র তাৎপর্য। প্রস্তাবিত বিবাহটাকে নিয়ম ও প্রথা অনুযায়ী নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে তাদের যে একগুঁয়ে বিরোধিতা, সেটাই এই উপাখ্যানের মূল জায়গা। অন্য কোন কারণ দেখানোও হয় নি, আর তার কোন দরকারও নেই। দানাউস-দুহিতাদের আচরণকে আর একটা দৃষ্টিকোণ থেকেও বোঝা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে—আজকের দিনে কোন আপন ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ যেমন অনুমোদনযোগ্য নয়, তখনকার দিনে ঐ ধরনের ভাইবোনের মধ্যে বিবাহও তেমনি অনুমোদনযোগ্য ছিল না। তুরানিয়ান জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিবন্ধক ভেঙে ফেলার জন্য ঈজিপ্টাসের পুত্রদের প্রচেষ্টা হয়ত সেই সময়টাকেই সূচিত করছে, যে সময় থেকে ঐ ব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়েছিল এবং মাথা তুলছিল একবিবাহবিশিষ্ট বর্তমান ব্যবস্থা। এই নতুন ব্যবস্থা গোত্রীয় রীতিনীতি ও তুরানিয়ান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছিল এবং শুধু বিশেষ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ককে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল।

এতক্ষণ আমরা যা যা প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি, তা থেকে মনে হয় যে পেলাসজিয়ান, গ্রীক এবং ইতালিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রাচীনকালে বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারেই। পরবর্তীকালে সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের প্রশ্ন সামনে আসার পর পুরুষ-

---

১। এস্কাইলাস, "সাপ্লিঅ্যান্টস", ৯.

ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের রীতি চালু হয়। এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে তুরানিয়ান জাতিস্বব্যবস্থা চালু থেকে থাক বা না-ই থাক, প্রাচীন সমাজে যে তা ব্যাপক ভাবেই চালু ছিল—সেটা বুঝতে পাঠকের নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।

এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ ঠিক কতদিন ছিল, তা জানা যায় না। তবে বেশ কয়েক হাজার বছর তো হবেই। সম্ভবত আকরিক লোহা গলানোর প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের সময় থেকে ঐ যুগটা শুরু হয়েছিল। তারপর বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায় পেরিয়ে তারা পা রেখেছিল বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে। এই মধ্য পর্যায়ে এদের অগ্রগতি নিশ্চয়ই আজটেক, মায়া আর পেরুভিয়ানদের (বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়েই এদের খোঁজে প্রথম পাওয়া যায়) সমান ছিল। আর বর্বরযুগের নিম্ন পর্যায়ে এদের অগ্রগতি নিশ্চয়ই উল্লিখিত ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর থেকে বেশি ছিল। উপরোক্ত দুটো বিরাট বিরাট ঐতিহাসিক যুগে (যখন তারা সভ্যতার প্রাথমিক উপাদানগুলো অর্জন করেছিল) এইসব ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলো যে ব্যাপক ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তা একেবারেই হারিয়ে গেছে। শুধু তার কিছু ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় তাদের লোককথার মধ্যে, আরও বেশি করে তাদের জীবনযাপন প্রণালী, বিভিন্ন প্রথা, ভাষা আর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে—যেগুলোর কথা আমরা জানতে পারি হোমারের রচনা থেকে। ঐ-সব যুগে সাম্রাজ্য বা রাজত্ব বলে কিছু ছিল না। তাদের তৎকালীন চিত্রের মধ্যে ছিল কিছু গোষ্ঠী আর নগণ্য কিছু জাতি, শহুরে ও গ্রামীণ সমাজজীবন, জীবনযাপন-প্রণালীর বিকাশ, এবং শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি। মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ঐ যুগগুলোর অভিজ্ঞতা হারিয়ে যাওয়াটা একটা অপূরণীয় ক্ষতি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মানবজাতির অন্যান্য শাখার মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব

গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠীর প্রাচীন ও পরবর্তীকালীন রূপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা। এবার দেখা দরকার মানবজাতির অন্যান্য শাখার মধ্যে এগুলোর, বিশেষত এই ভিত্তিস্বরূপ গোত্রের অস্তিত্ব ছিল কি না।

আর্য জনগোষ্ঠীর কেল্টিক্ শাখার লোকেরা তাদের স্কটল্যাণ্ডের ক্ল্যান আর আয়ারল্যাণ্ডের সেপ্ট-এর মধ্যে গোত্রভিত্তিক সংগঠনকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশিদিন টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিল। এরা ছাড়া একমাত্র ভারতবর্ষের আর্যরাই বোধহয় অতদিন টিঁকিয়ে রাখতে পেরেছিল ঐ সংগঠনকে। বিগত শতাব্দীর মধ্য-ভাগেও স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চল জোরদারভাবে টিকে ছিল স্কটিশ ক্ল্যানগুলো। সংগঠনগতভাবে এবং চরিত্রের দিক থেকে এই ক্ল্যান হচ্ছে গোত্রেরই একটা রূপ। নিজের সদস্যদের ওপর গোত্রীয় জীবনাচরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারেও এই ক্ল্যানগুলো অত্যন্ত সফল হয়েছিল। 'ওয়েভারলী'-র সুবিখ্যাত লেখক তাঁর রচনায় ক্ল্যানের মধ্যে বেড়ে ওঠা কিছু বিশিষ্ট চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, যাদের সমস্ত কার্যকলাপে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ক্ল্যানের বৈশিষ্ট্যগুলো। ব্যক্তির চরিত্র পরিবর্তনের ওপর গোত্রটা কতটা প্রভাব বিস্তার করত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, টাঁকল, রব রয় প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে। কাহিনীর প্রয়োজনে স্যার ওয়াল্টার স্কট চরিত্রগুলোকে কিছুটা অতিরঞ্জিতও করে থাকতে পারেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও এর বাস্তব ভিত্তিটা অস্বীকার করা যায় না। কয়েকশ বছর আগে যখন ক্ল্যানের নিজস্ব জীবনযাত্রা অনেক জোরদার ছিল এবং বাইরের প্রভাব খুব একটা ছাপ ফেলতে পারে নি, তখন-কার ক্ল্যানগুলোর দিকে তাকালে এ-কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়। তাদের বংশানু-ক্রমিক সংঘাত, খুনের জবাবে খুন, এক একটা গোত্রের এক এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হওয়া, জমিকে যৌথভাবে ব্যবহার করা, ক্ল্যান-প্রধানের প্রতি বাকি সদস্যদের আনুগত্য, ক্ল্যানের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি আনুগত্য—এই সবকিছুর মধ্যে গোত্রীয় সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোই ফুটে ওঠে। স্কটের লেখা থেকে মনে হয়, গ্রীক ও রোমানদের অথবা আমেরিকার আদিবাসীদের গোত্রীয় জীবনের থেকে এদের গোত্রীয় জীবনটা ছিল অনেক গতিময়, অনেক বেশি বীরত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংগঠনটা ছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু কোন এক সুদূর অতীতে যে ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। মানুষকে আইনের আওতায় আর রাজনৈতিক সমাজের রীতিনীতির গণ্ডীতে নিয়ে আসার জন্য স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের ক্ল্যানগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোটা ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। এরা বংশধারা

নির্ণয় করত পুরুষ-ধারা অনুসারে, কোন ক্ল্যানের পুরুষদের সন্তানরা সেই ক্ল্যানেরই সদস্য হিসেবে বিবেচিত হত, আর ক্ল্যানের নারীদের সন্তানরা তাদের নিজ নিজ পিতার ক্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত হত।

আইরিশদের 'সেপ্ট', আলবানিয়ানদের 'ফিস্' বা 'ফ্লারা' (যেগুলোর মধ্যে পূর্বতন গোত্রীয় সংগঠনের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়) নিয়ে, অথবা ডালমাটিয়া এবং ক্রোটিয়ায় এই একই ধরনের সংগঠনের নিদর্শনগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না। বাদ দিয়ে যাচ্ছি সংস্কৃত 'গণ'-এর প্রসঙ্গটাও (সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটার উপস্থিতি থেকেই বোঝা যায় যে আর্যদের ঐ শাখার মধ্যেও এই সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল)। আগেকার দিনে ফরাসী জমিদারীগুলোতে যে ভূমিদাস সম্প্রদায়গুলো বসবাস করত, যাদের কথা স্যর হেনরি মেইন তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় উল্লেখ করেছেন, তারা হয়ত প্রাচীন কেল্টিক্ গোত্রগুলোরই বংশধর ছিল। স্যর হেনরি লিখেছেন, "এই ব্যাখ্যার পর এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে এই সম্প্রদায়গুলো কোন স্বেচ্ছাকৃত অংশীদারী ছিল না, এগুলো ছিল সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের সংগঠন। তবে এগুলো মূলত গৃহভিত্তিক জনসম্প্রদায় হিসেবেই সংগঠিত ছিল, গ্রামীণ জনসম্প্রদায় হিসেবে নয়। সম্প্রতি ডালমাটিয়া আর ক্রোটিয়ায় যে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল, তা থেকেই এটা জানা গেছে। হিন্দুরা যাকে যৌথ পরিবার বলে থাকে, এরা ছিল তা-ই। অর্থাৎ, একজন পূর্ব-পুরুষের কিছু বংশধর একসঙ্গে বসবাস করত এবং তাদের রান্না আর খাওয়াও হত একসঙ্গে। বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে চলত এই যৌথ জীবনযাত্রা।"[১]

জার্মান গোষ্ঠীগুলো যখন প্রথম ঐতিহাসিকদের নজরে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে গোত্রীয় সংগঠনের কোনরকম অবশেষ ছিল কি-না—সে প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। আর্য জাতির সাধারণ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তারাও অন্যান্য আর্য গোষ্ঠীদের মতই উত্তরাধিকারসূত্রে এই সংগঠনটা লাভ করে থাকতে পারে। রোমানরা যখন তাদের কথা প্রথম জানতে পারে, তখন তারা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে ছিল। গ্রীক আর লাতিন গোষ্ঠীগুলোর কথা প্রথম জানা যাওয়ার সময় তাদের মধ্যে সরকার সম্বন্ধে যেটুকু ধ্যানধারণা ছিল, তার থেকে উন্নত ধারণা জার্মান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে থাকা সম্ভব ছিল না। ভূখণ্ড এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সম্বন্ধে জার্মানদের কোন অপূর্ণাঙ্গ ধারণা থেকে থাকলেও দ্বিতীয় ধরনের সরকারব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা থাকাও সম্ভব ছিল না (যে ব্যবস্থাটা আর্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এথেনীয়রাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল)। সিজার এবং ট্যাসিটাসের বিবরণে জার্মান গোষ্ঠীগুলোর অবস্থা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল, এলাকার ভিত্তিতে নয়। তাদের শাসনব্যবস্থাও পরিচালিত হত এইসব সম্পর্ক মারফতই। পৌরপ্রধান আর সামরিক নেতারা তাদের পদে অধিষ্ঠিত হত নির্বাচন মারফত, এবং সরকার পরিচালনার প্রধান উপাদানস্বরূপ পরিষদটা গঠিত হত তাদের নিয়েই। ট্যাসিটাস বলেছেন—ছোট খাট ব্যাপারে প্রধানরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-

১। "আর্লি হিস্ট্রি অফ ইন্‌স্টিটিউশনস", হোল্ট কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ৭.

আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিত, কিন্তু অধিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়গুলোর নিষ্পত্তির জন্য গোষ্ঠীর সকলেরই মতামত নিতে হত। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত জনসাধারণই, তবে সেগুলো নিয়ে প্রধানরা প্রথমে ভালোভাবে আলোচনা করে নিত।[১] এই রীতির সঙ্গে গ্রীক আর লাতিনদের রীতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যটা ভেবে দেখার মত। সরকার গঠিত হত তিনটি শক্তির সমন্বয়ে—প্রধানদের পরিষদ, গণ-পরিষদ আর সামরিক সর্বাধিনায়ক।

সিজার বলেছেন, কৃষিকাজের ব্যাপারে জার্মানরা খুব একটা দড় ছিল না। তাদের মূল খাদ্য ছিল দুধ, পনির আর মাংস। কারুরই কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বা জমিতে নিজস্ব সীমানা বলে কিছু ছিল না। বিভিন্ন গোত্র আর সেই সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের জন্য প্রতিবছর কিছুটা করে জমি বরাদ্দ করে দিত বিচারক আর প্রধানরা, এবং উচিত মনে করলে পরের বছর তাদের জন্য অন্য জমি বরাদ্দ করত।[২] তাঁর বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে এদের মধ্যে তিনি দলবদ্ধ মানুষদের দেখা পেয়েছিলেন। এই দলগুলো আয়তনে পরিবারের থেকে বড় ছিল। দলগুলো গড়ে উঠত জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে। এ-রকম এক একটা দলের জন্য বরাদ্দ করা হত কিছুটা করে জমি। তাঁর বিবরণে ব্যক্তি বা পরিবারের কথা নেই। আসলে কৃষিকাজ চালানো এবং জীবনধারণের জন্য যে দলগুলো গড়ে উঠত, তার মধ্যেই মিশে যেত ব্যক্তি ও পরিবার। তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় যে সে-সময় জার্মানীতে জোড়বাঁধা বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই চালু ছিল, এবং জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কযুক্ত কিছু পরিবার একটা বাসস্থানে বসবাস করত এবং জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করত সাম্যবাদী নীতি।

যুদ্ধের সময় জার্মান গোষ্ঠীগুলো যে ভাবে তাদের সৈন্যদের বিন্যাস করত, সেকথার উল্লেখ করেছেন ট্যাসিটাস। তারা বিভিন্ন জ্ঞাতিদের পরস্পরের পাশাপাশি বিন্যস্ত করত। জ্ঞাতিত্ব যদি শুধু রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়দের মধ্যেই সীমিত থাকত, তাহলে এ ব্যাপারটা বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়ার দরকার হত না। তাদের শৌর্যের ব্যাপারে আর একটা কথাও বলছেন তিনি। অশ্বারোহী বা পদাতিক বাহিনীকে তারা মোটেই যথেচ্ছ বা এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত করত না। এদেরকে বিন্যস্ত করা হত পরিবার এবং জ্ঞাতিত্ব অনুযায়ী (Familiae propinquitates)।[৩] এই বক্তব্য এবং সিজারের পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে মনে হয় যে তখনও তাদের মধ্যে একটা প্রাক্‌-গোত্রীয়

১। "জার্মানীয়া", ২য় পরিচ্ছেদ।

২। "ডি বেল্‌ গল্‌.," vi, ২২।

৩। "জার্মানীয়া", ৭ম পরিচ্ছেদ। লেখক বলেছেন, সৈন্যসারিকে পাশাপাশি সাজানো হত। "Acies per cuneou componitur."—"জার্মানীয়া", ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। কোল্‌রাউশ লিখেছেন, "একটা বা একশটা জেলার এবং একটা জাতি বা সেপ্ট-এর সম্মিলিত বাহিনী ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করত।"—"হিষ্ট্রি অফ জার্মানী", অ্যাপ্‌ল্‌টন কর্তৃক সম্পাদিত, অনুবাদ জি. ডি হ্যাস-এর, পৃঃ ২৮।

সংগঠনের অন্তিম অস্তিত্বটুকু রয়ে গিয়েছিল, এবং সেই সময় থেকেই সেই সংগঠনের বদলে গড়ে উঠেছিল মার্ক বা আঞ্চলিক জেলাগুলো। এই জেলাগুলোই ছিল তাদের অপূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বনিয়াদ।

সামরিক কর সংগ্রহের জন্য জার্মান গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন আঞ্চলিক জেলা বা মার্ক (markgenossenschaft) গড়ে তুলেছিল। ইংল্যাণ্ডের স্যাক্সনদের মধ্যেও এ-রকম জেলার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এছাড়ও জার্মানদের মধ্যে 'গউ' (gau) বলে আর একটা বড় বিভাগ ছিল, যাকে সিজার এবং ট্যাসিটাস চিহ্নিত করেছেন 'প্যাগাস' (pagus) নামে।[১] এই মার্ক এবং গউগুলো ঠিক ভৌগোলিক জেলা ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এদের মধ্যেকার সম্পর্কটা ছিল শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সম্পর্কের মত। প্রতিটা গউ আর মার্ক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত, বাসিন্দারা সংগঠিত থাকত রাজনৈতিকভাবে। খুব সম্ভবত গউগুলো ছিলো সামরিক কর সংগ্রহের জন্য সংগঠিত কিছু বসতির সমষ্টি। এই মার্ক আর গউগুলোই ছিল ভবিষ্যতের শহর আর গ্রামেরই ভ্রূণরূপ, ঠিক যেমন এথেনীয় নউক্রারি আর ট্রিট্রিগুলো ছিল ক্লাইসথেনিসের আমলে গড়ে ওঠা ডেমি আর আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলোর অবশেষ। এই সংগঠনগুলো ছিল গোত্রীয় ব্যবস্থা আর রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেকার একটা পরিবর্তনশীল স্তর। এগুলোর মধ্যে লোকেরা সংগঠিত হত জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে।[২]

১। "ডি বেল. গল.," iv, ১. "জার্মানীয়া", ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২। ডঃ ফ্রিম্যান এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন, "রাজনৈতিক ব্যবস্থার একেবারে প্রাথমিক এককটা আজও বিভিন্ন নামে টিকে আছে। যেমন—মার্ক, জেমেইণ্ড, কমিউন, প্যারিশ। আমরা আগেই দেখেছি যে এগুলো হচ্ছে 'গোত্র' বা বংশেরই এক একটা রূপ। এগুলোর মধ্যে সংগঠিত মানুষ আর যাযাবর বা লুণ্ঠনজীবী দল হিসেবে থাকত না। তবে তখনও পর্যন্ত তারা কোন বিভিন্ন দলের সম্মিলিত নগর গড়ে তোলার জন্য অন্যদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়নি। এই পর্যায়ে গোত্রগুলো এক একটা কৃষিজীবী সংগঠন রূপে ছিল, তাদের নিজেদের যৌথ জমি থাকত—রোমের 'এজার পাবলিকাস' বা ইংল্যাণ্ডের 'ফোকল্যাণ্ড'-এর মত সংগঠন গড়ে ওঠার অঙ্কুর বলা যেতে পারে এগুলোকে। একেই বলা হত 'markgenossenschaft', অর্থাৎ পাশ্চাত্যের গ্রামীণ জনসম্প্রদায়। এই প্রাথমিক রাজনৈতিক এককটা, প্রকৃত কিম্বা পাতানো জ্ঞাতিদের এই সমন্বয়টা গড়ে উঠত বিভিন্ন পরিবারকে নিয়ে, কিন্তু প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ পিতার কর্তৃত্ব (mund) মেনে চলত। এটা হচ্ছে অনেকটা রোমের 'প্যাট্রিয়া পোতেস্তাস'-এর মত ব্যাপার, যার ভিত্তিতে রোমান আইনের একটা বিশিষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠত 'গোত্র', আর কিছু 'গোত্রের' সমন্বয়ে গড়ে উঠত 'মার্কজেনোসেনশ্যাফ্ট্'। এ-রকম কিছু গ্রামীণ জনসম্প্রদায় এবং তাদের 'মার্ক' বা যৌথ জমির সমন্বয়ে গড়ে উঠত পরবর্তী উচ্চতর রাজনৈতিক এককটা। এর নাম ছিল হাণ্ড্রেড বা শতক, টিউটনিক

গোত্রীয় সংগঠনের প্রাচীনতম নিদর্শন খোঁজার জন্য এবার আমরা তাকাব এশিয়া মহাদেশের দিকে। এই এশিয়া মহাদেশেই সবথেকে বেশি ধরনের মানুষ দেখা যায়, আর এখানেই মানুষের বসবাস সবথেকে দীর্ঘ দিনের। কিন্তু এশিয়ার সমাজের রূপান্তর ঘটেছে বহুভাবে, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতিগুলো পরস্পরের ওপর সবথেকে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সুপ্রাচীন কালে চৈনিক এবং ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ আর আধুনিক সভ্যতার বিপুল প্রভাব এশিয়ার জাতিগুলোর মধ্যে এমন সব পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে যার ফলে তাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা করা মুস্কিল। তাসত্ত্বেও, এশিয়া মহাদেশে মানব-জাতির বন্যতা থেকে সভ্যতা পর্যন্ত সমগ্র অভিজ্ঞতার একটা রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যায়, এবং সেখানকার বিভিন্ন ছড়ানো-ছিটানো গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় কি না—তার চেষ্টা এখন করা দরকার।

এশিয়ার পিছিয়ে-থাকা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় করার রীতি এখনও যথেষ্টই চালু আছে। আবার অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে এ-ব্যাপারে পুরুষ-ধারাই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যে-কোন একটা ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণীত হয়, সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের সংগঠন সেই নিয়ম অনুযায়ীই গড়ে ওঠে। এইভাবে সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা এক একটা নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত হয়। এগুলোই হচ্ছে গোত্র।

লাথাম লিখেছেন যে নেপালের মাগার গোষ্ঠীর মধ্যে "বারোটা ঠাম (thum) আছে। একই ঠামের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মানুষকে একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলে মনে করা হয়। একই মায়ের গর্ভজাত কি না, সে ব্যাপারে তারা আদৌ মাথা ঘামায় না। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন ঠামের সদস্য হয়ে থাকে। নিজের ঠামের মধ্যেকার কারুকে বিবাহ করা চলে না। স্ত্রী খুঁজছ? তাহলে পাশের ঠামের কোন মেয়েকে বাছো। নিজের ঠামের মধ্যে বিবাহ করা সম্ভব নয়। এ-রকম রীতির কথা আমি এই প্রথম উল্লেখ করলাম। কিন্তু এটাই শেষ নয়। এ রীতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চালু আছে। অস্ট্রেলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ—সর্বত্রই এর দেখা মেলে। এমনকি যে-সব জায়গায় এর স্বপক্ষে পূর্ণাঙ্গ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেখানেও রীতিটা চালু আছে বলে ধরে নেওয়া যায়।"[১] এখানে এই 'ঠাম'-এর মধ্যে আমরা গোত্রের অস্তিত্বেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি, যেখানে বংশধারা নির্ণীত হয় পুরুষ

জাতির লোকেরা যে যে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইসব অঞ্চলের অধিকাংশ জমিতেই এই নামটা কোন-না-কোন রূপে দেখা যায়···। এই হাণ্ড্রেড-এর ওপরে থাকত 'প্যাগাস', 'গউ', ড্যানিশদের ক্ষেত্রে 'সিসেল', ইংল্যাণ্ডে 'শায়ার।' অর্থাৎ, গোষ্ঠীগুলো এক একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল অধিকার করে বসবাস করতে শুরু করত। ছোটবড় এই সমস্ত বিভাগেরই নিজস্ব প্রধান থাকত··· । হাণ্ড্রেড গড়ে উঠত গ্রাম, মার্ক, জেমেইণ্ড ইত্যাদির সমন্বয়ে অর্থাৎ প্রাথমিক এককগুলোর ভিত্তিতে। 'শায়ার', 'গউ', 'প্যাগাস' প্রভৃতি গড়ে উঠত হাণ্ড্রেডগুলোর সমন্বয়ে।"—"কম্প্যারেটিভ পলিটিকস", ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং-এর সংস্করণ, পৃঃ ১১৬.

১। "ডেসক্রিপটিভ এথ্নোলজি", i, ৮০।

ধারা অনুসারে।

"মণিপুরীরা এবং মণিপুরের পাহাড়ে বসবাসকারী কুপু, মাউ, মুরাম এবং মুরিংদের প্রত্যেকের মধ্যে চারটি করে পরিবার রয়েছে—কুমুল, লুআং, আংগোম, এবং মিংথাজা। এক পরিবারের সদস্যরা অন্য যে-কোন পরিবারের কাউকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।"[১] সম্ভবত এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার চারটি করে গোত্রকেই পরিবার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সারকাসিয়ানদের 'তেলুশ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বেল্ লিখেছেন, "এদের লোককথায় বলা হয়েছে এরা সকলে একই মূল বংশ বা পূর্বপুরুষ থেকে জাত। কাজেই এদেরকে কতকগুলো সেপ্ট বা বংশ হিসেবে মনে করা যেতে পারে··· । এই-সব জ্ঞাতিভ্রাতা ও জ্ঞাতিভগ্নীদের মধ্যে বা একই ভ্রাতৃত্বের কোন সদস্যের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তো বটেই, এমনকি তাদের ভূমিদাসদেরকেও অন্য কোন ভ্রাতৃত্বের কোন ভূমিদাসীকে বিবাহ করতে হত।"[২] সম্ভবত তেলুশ বলতে এখানে গোত্রকেই বোঝান হয়েছে।

বাঙালিদের মধ্যে "চারটি বর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত, এগুলি আবার বিভিন্নভাগে বিভক্ত। যেমন, আমি হচ্ছি নন্দী গোষ্ঠীর (গোত্রের ?) লোক। আমি যদি নিচু বর্ণের লোক হতাম, তাহলে আমার গোষ্ঠীর কোন নারীকে আমি বিবাহ করতে পারতাম না। তবে একই বর্ণের নারীকে বিবাহ করাটা অবশ্য কর্তব্য। সন্তানরা তাদের বাবার গোষ্ঠীর সদস্য হয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় পুত্ররা। কোন ব্যক্তির পুত্র না থাকলে কন্যারাই উত্তরাধিকারিণী হয়। পুত্র-কন্যা কিছুই না থাকলে তার সম্পত্তি নিকটতম জ্ঞাতিরাই পেয়ে থাকে। বর্ণের মধ্যেও ভাগ আছে। যেমন, শূদ্র বর্ণের মধ্যে রয়েছে তিলি, তামলী, তাঁতি, চামার ইত্যাদি ভাগ। এইসব ভাগের কোন পুরুষ এই ভাগের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না।"[৩] এই ছোট-ছোট ভাগগুলোতে সাধারণত শতখানেক সদস্য থাকে, তা-সত্ত্বেও এদের মধ্যে গোত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

মিঃ টাইলার বলেছেন যে "ভারতবর্ষের কোন ব্রাহ্মণ একই পদবী বা গোত্রের (যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে গোয়াল) কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না। এই নিষেধাজ্ঞার সাহায্যে কোন বংশের পুরুষ-ধারা অনুসারে যাবতীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ রদ করা হয়েছে। এই আইনটা নির্দিষ্ট হয়েছিল মনুসংহিতায়। প্রথম তিনটি বর্ণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল এই বিধি। স্ত্রী-ধারা অনুসারে যারা পরস্পরের আত্মীয়, তাদেরও বেশ কয়েকটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।"[৪] অন্যত্র তিনি লিখেছেন: "ছোটনাগ-

১। ম্যাক্লেনান, "প্রিমিটিভ ম্যারেজ", পৃঃ ১০৯.

২। "প্রিমিটিভ ম্যারেজ"-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ১০১

৩। ভারতবর্ষের জনৈক বাঙালী রেভারেণ্ড গোপীনাথ নন্দী লেখককে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন।

৪। "আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড", পৃঃ ২৮২.

পুরের কোলদের মধ্যে অনেক ওরাও এবং মুণ্ডা গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়েছে পশু-পাখির নামে। যেমন—বানমাছ, বাজপাখি, কাক, সারস ইত্যাদি। যে পশু বা পাখির নামে কোন গেষ্ঠীর নামকরণ করা হয়, সেই গোষ্ঠীর লোকেরা সেই পশু বা পাখি হত্যা করতে বা আহার করতে পারে না।"[১]

মঙ্গোলীয়দের শারীরিক আকৃতি অনেকটা আমেরিকার আদিবাসীদের মতই। এদের মধ্যে অসংখ্য গোষ্ঠী আছে। লাথাম লিখেছেন,"কোন গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে রক্ত বা বংশধারার সম্পর্ক থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয় কোন বাস্তব অথবা কল্পিত গোষ্ঠীপতির নামে। গোষ্ঠী (তাদের ভাষায় আইমক বা আইম্যাক) হচ্ছে একটা বিরাট বিভাগ। তার মধ্যে কয়েকটা করে কোথুম বা দল থাকে।"[২] এই বক্তব্য থেকে গোত্রের অস্তিত্বের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। এদের প্রতিবেশী তুঙ্গাসিয়ানদের মধ্যেও পশুর নাম অনুযায়ী কিছু বিভাগ দেখা যায়, যেমন, কুকুর, বলগাহরিণ ইত্যাদি। এগুলোকে গোত্রীয় সংগঠন বলেই মনে হয়, বিস্তৃত তথ্য ছাড়া জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

কালমাকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্যার জন লুবক্ বলেছেন যে ডি হেল-এর মতে এরা "বিভিন্ন দলে বিভক্ত, এবং কোন পুরুষ তার নিজ দলের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না।" ওস্টিয়াক্দের ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে এরা "একই পরিবারে, এমনকি পদবীবিশিষ্ট কোন নারীকে বিবাহ করাকে রীতিমত অপরাধ বলে মনে করে থাকে।" তিনি আরও বলেছেন, "কোন জাকুত্ (সাইবেরিয়ার) বিবাহ করতে চাইলে তাকে অন্য বংশের কোন মেয়েকে বাছাই করতে হয়।"[৩] সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা গোত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্ছি। একই গোত্রের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। যুরাক্ সামোয়েড্রা গোত্রের ভিত্তিতেই সংগঠিত। ক্ল্যাপ্রথ্ (লাথম কর্তৃক উদ্ধৃত) বলেছেন. "জ্ঞাতিত্বের এই বিভাজনটাকে এত কঠোরভাবে মেনে চলা হয় যে কোন সামোয়েডই তার নিজের জ্ঞাতিদের মধ্যেকার কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না। অন্য দুটো বিভাগের কোন একটা থেকে তাকে স্ত্রী নির্বাচন করতে হয়।"[৪]

চীনাদের মধ্যে একটা বিচিত্র পরিবার ব্যবস্থা চালু আছে। এটা সম্ভবত একটা প্রাচীন গোত্রীয় সংগঠনেরই স্মারক। আমার কাছে লেখা একটা চিঠিতে ক্যান্টনের অধিবাসী মিঃ রবার্ট হার্ট জানিয়েছেন, "চীনা ভাষায় জনগণকে বলা হয় 'পিহ্-সিং' (Pih-sing), অর্থাৎ; একশটা পদবী।" কিন্তু এটা কিছুতেই কোন শব্দের খেলা, নাকি যখন ও চৈনিক জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল একশটা উপশাখা বা গোষ্ঠী (গোত্র ?) তখনকার অবস্থার মধ্যেই এর উৎস নিহিত রয়েছে—তা আমি বলতে পারছি না। বর্তমানে এ-দেশে প্রায় চারটা পদবী রয়েছে; যার মধ্যে কিছু নাম পশু-পাখি, ফলমূল, ধাতু, প্রাকৃতিক বস্তু ইত্যাদির নাম অনুসারী। যেমন—ঘোড়া, ভেড়া, ষাঁড়, মাছ, পাখি, ফিনিক্স,

৩। "প্রিমিটিভ কালচার", হোল্ট অ্যাণ্ড কোং সংস্করণ, ii, পৃঃ ২৩৫.

৪। "ডেসক্রিপটিভ এথ্নোলজি", i, পৃঃ ২৯০.

১। "অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন", পৃঃ ৯৬.

২। "ডেসক্রিপটিভ এথ্নোলজি", i, পৃঃ ৪৭৫.

খেজুর, ফুল, পাতা, ধান, অরণ্য, নদী, পাহাড়, জল, মেঘ, সোনা, পশুচর্ম, শূকরের লোম ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-দেশে এমন অনেক বড় বড় গ্রাম আছে, যেখানে গ্রামের সকলের একই পদবী। যেমন, কোন জেলায় হয়ত তিনটি গ্রাম আছে, প্রতি গ্রামে হয়ত দু' তিন হাজার করে লোক বাস করে; দেখা যাবে একটা গ্রামে হয়ত শুধু ঘোড়া পদবীর লোকেরাই থাকে, দ্বিতীয়টাতে থাকে ভেড়া পদবীধারীরা, আর তৃতীয়টার লোকেদের পদবী হচ্ছে ষাঁড়…। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে যেমন স্বামী এবং স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর (গোত্রের) সদস্য হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি চৈনিক স্বামী এবং স্ত্রীকে হতে হয় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদবীর মানুষ। একই পদবীধারী নারী ও পুরুষের বিবাহ, প্রথা এবং আইন—উভয় চোখেই নিষিদ্ধ। সন্তানরা তাদের বাবার পরিবারের সদস্য হয়, অর্থাৎ বাবার পদবীই ধারণ করে…। বাবা কোন উইল না করে মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি সাধারণত ভাগাভাগি করা হয় না। তাঁর বিধবা স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকেন, ততদিন তাঁদের বড় ছেলেই ঐ সম্পত্তি দেখাশোনা করে। ঐ স্ত্রী মারা যাওয়ার পর, বড় ছেলে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা করে। ভাগ পায় সে আর তার ভাইরা। তবে, ছোট ভাইরা কতটা করে ভাগ পাবে তা পুরোপুরি নির্ভর করে বড় ভাইয়ের মর্জির ওপর।"

এখানে যে পরিবারের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে গোত্রের ছবিই দেখছি আমরা। রোমুলাসের আমলে রোমানদের মধ্যে যে-রকম গোত্র ছিল, এটা তার সমতুল। তবে একই বংশধারার অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে এরা কোন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পুনর্মিলিত হয়েছিল কি না—তা আমরা জানতে পারছি না। তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকালে রোমান গোত্রগুলো যেমন এক একটা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত, এরাও তেমনি সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের এক একটা স্বাধীন সংগঠন হিসেবে কেন্দ্রীভূত হয় এক একটা অঞ্চলে। এদের গোত্রের নামগুলো এখনও প্রাচীনকালের মতই রয়ে গেছে। চারশটা গোত্রে বিভাজিত হওয়াটা হয়ত খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সেগুলো যে আজ পর্যন্ত টিকে আছে, বর্বর যুগ অতিক্রান্ত হওয়ায় এতদিন পরেও—এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর এই ঘটনা থেকে একটা জনসম্প্রদায় হিসেবে চৈনিকদের অনড়-অচলতারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুমান করা যেতে পারে যে ঐ-সব গ্রামে আজও হয়ত এক-বিবাহপ্রথা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, তাদের জীবনযাত্রা এবং যৌন-জীবনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ বোধহয় আজও চালু আছে। চীনের পার্বত্য অঞ্চলে যে বন্য আদিবাসীরা আজও বসবাস করে, যারা কথা বলে মান্দারিন (সার্বজনীন কথ্য চীনা-ভাষা) ভাষার থেকে আলাদা একটা উপভাষায়, তাদের মধ্যে আজও প্রাচীন রূপের গোত্রের দেখা মিলতে পারে। এইসব ছড়ানো-ছিটোনো গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে চৈনিকদের প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন।

শোনা যায় আফগানিস্তানের গোষ্ঠীগুলোও বিভিন্ন বংশে বিভক্ত। তবে সেই বংশগুলো প্রকৃত অর্থে গোত্র কি না, তা জানা যায় নি।

একই ধরনের আরও তথ্যের ভার চাপিয়ে পাঠককে আর বিব্রত করব না। আজকের এশিয় গোষ্ঠী ও জাতিগুলোর প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মধ্যে গোত্রীয় সংগঠন যে রীতিমত

বিদ্যমান ছিল, তার স্বপক্ষে বেশ কিছু নজির ইতিমধ্যেই দাখিল করেছি আমরা।
বাইবেলের চতুর্থ পুস্তক থেকে জানা যায় হিব্রুদের বারোটা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল আইনগত ব্যবস্থা অনুসারে হিব্রু সমাজের পুনর্গঠনের ফলে। বর্বর যুগ তখন অতিক্রান্ত শুরু হয়েছে সভ্য যুগ। সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের জোট হিসেবে যে নীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছিল গোষ্ঠীগুলোকে, তা থেকে বোঝা যায় যে তার আগে একটা গোত্রীয় ব্যবস্থা চালু ছিল তাদের মধ্যে এবং সেটাকেই একটা সুসম্বন্ধ চেহারা দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পর্ক মারফৎ ঐক্যবদ্ধ সগোত্রীয় জ্ঞাতি-দের কিছু দলকে নিয়ে গড়ে ওঠা গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা ছাড়া অন্য ধাঁচের শাসনব্যবস্থা কথা তখন তাদের জানা ছিল না। পরবর্তীকালে তারা সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের আলাদা আলাদা দল হিসেবে সমবেত হয়েছিল পালেস্তাইনে; এক একটা জেলার নামকরণ করে-ছিল জ্যাকবের বারো জন পুত্রের এক একজনের নামে (একমাত্র লেভি গোষ্ঠী বাদে)। এ থেকে প্রমাণ হয় যে তারা একটা সামগ্রিক জনসম্প্রদায় হিসেবে সংগঠিত হয় নি, সংগঠিত হয়েছিল এক একটা বংশধারা অনুযায়ী। সেমিটিক বর্গের সবথেকে বিশিষ্টতম এই জাতিটির ইতিহাস কেন্দ্রীভূত হয়েছে আব্রাহাম, ইসাক, জ্যাকব এবং এই জ্যাকবের বারোজন পুত্রের নামের চারপাশে।
হিব্রুদের ইতিহাস শুরু হয়েছে মূলত আব্রাহামের থেকে। আব্রাহামের পূর্বপুরুষদের একটা বংশতালিকা পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তার থেকে বেশি আর কিছু জানা যায়নি। কয়েকটা উদ্ধৃতির সাহায্যে সে সময়ের প্রগতির স্তর এবং আব্রাহামের আমলের অগ্র-গতির অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। আব্রাহাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাঁর "প্রচুর গবাদি পশু, রুপো এবং সোনা ছিল।"[১] ম্যাকপেলার গুহার জন্য "হেথ্-এর পুত্রদের সামনে আব্রাহাম চারশ শেকেল রুপো ওজন করে দিয়েছিলেন এফ্রনকে। বণিকদের কাছে মুদ্রা হিসেবে রুপোই চালু ছিল।"[২] গার্হস্থ্যজীবন এবং জীবনধারণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে এই কথাগুলো উদ্ধৃত করা যায়: "আব্রাহাম দ্রুত সারার তাঁবুতে হাজির হয়ে বললেন, এক্ষুনি তিনটি চমৎকার খাদ্য প্রস্তুত করো ; সবটা মেখে নিয়ে উনুনে চাপিয়ে পিঠে বানাও।"[৩] "এবং তিনি মাখন ও দুধ নিলেন, যে বাছুরটির শুশ্রূষা করেছিলেন সেটিকে নিলেন, আর বাছুরটিকে তাদের সামনে রাখলেন।"[৪] যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার প্রসঙ্গে: "আব্রাহাম নিজের হাতে আগুন এবং ছুরি নিলেন।"[৫] ভৃত্যটি রুপো ও সোনার অলঙ্কার নিয়ে এল এবং সেগুলি রেবেকাকে প্রদান করল: তাঁর ভ্রাতা ও মাতাকেও সে মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়েছিল।"[৬] ইশাকের সঙ্গে যখন রেবেকার দেখা হয়, তখন রেবেকা "একটা ওড়নায় মুখ ঢাকে।"[৭]

১। "জেনেসিস", xiii, ২.
২। "জেনেসিস", xxiii, ১৬.
৩। ঐ, xviii, ৬.
৪। ঐ, xviii, ৮.
৫। ঐ, xxii, ৬.
৬। ঐ, xxiv, ৫৩.
৭। ঐ, xxiv, ৬৫

এই একই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে উট, গাধা, ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল এবং গরুর কথা। এছাড়াও পাওয়া যায় শস্য পেষাইয়ের জাঁতাকল, জলের কলসী, কানের দুল, ব্রেসলেট, তাঁবু, বাড়ি এবং নগরের উল্লেখ। তীর-ধনুক, তরোয়াল, শস্য, মদ এবং শস্য চাষের জমির উল্লেখও চোখে পড়ে। অর্থাৎ, আব্রাহাম, ইশাক এবং জ্যাকব ছিলেন বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের মানুষ। সেমিটিক বর্গের এই শাখাটির মধ্যে লিখনপদ্ধতি সম্ভবত তখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ঐ যুগে তারা অগ্রগতির যে স্তরে পৌঁছেছিল, তার সঙ্গে হোমারের যুগের গ্রীকদের যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

হিব্রুদের প্রাচীন বিবাহপ্রথা থেকে বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে প্রাচীন ধরনের গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। আব্রাহাম তাঁর ভৃত্যের মারফৎ রেবেকাকে কিনে এনেছিলেন ইশাকের স্ত্রী হিসেবে। "মূল্যবান জিনিসপত্র" দেওয়া হয়েছিল পাত্রীর ভাই এবং মাকে, বাবাকে নয়। স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের প্রথাবিশিষ্ট কোন গোত্র বিদ্যমান থাকলে বাবাকে দেওয়া যে-কোন জিনিস তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরাই পেয়ে যেত। আবার, আব্রাহাম তাঁর সৎ-বোন সারাকে বিবাহ করেন। তিনি বলেছেন, "ও আমার ভগ্নী; ও আমার পিতার কন্যা বটে, কিন্তু আমার মাতার কন্যা নয়। কাজেই ও আমার স্ত্রী হতেই পারে।"[১]

স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথাবিশিষ্ট গোত্র বিদ্যমান ছিল বলেই আব্রাহাম আর সারা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য হতে পেরেছিলেন। 'রক্তসূত্রে জ্ঞাতি' হলেও তাঁরা 'সগোত্রীয় জ্ঞাতি' ছিলেন না। কাজেই, গোত্রীয়প্রথা অনুযায়ী তাঁরা বিবাহ করতেই পারতেন। পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু থাকলে চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত হত। নাহর তাঁর ভাই হারানের কন্যাকে বিবাহ করেন,[২] এবং মোজেসের পিতা আম্‌রাম তাঁর পিতার ভগ্নি অর্থাৎ পিসিকে বিবাহ করেন। আম্‌রামের এই পিসি অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছেন হিব্রু আইনপ্রণেতার জননী।[৩] এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে বংশধারা নির্ণয়ের ব্যাপারে স্ত্রী-ধারা চালু থেকে থাকলে তবেই এ-সব বিবাহ সম্ভব ছিল, কারণ সেক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট নারী-পুরুষরা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হত। পুরুষ-ধারা অনুসরণ করা হলে এরা একই গোত্রের সদস্য হত, বিবাহও সম্ভব হত না। এ-সব ঘটনা থেকে গোত্রের অস্তিত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও অনুমান করা যায় যে তাদের মধ্যে প্রাচীন ধাঁচের গোত্রের অস্তিত্ব ছিল।

মোজেসের আইন প্রণয়নের সময় হিব্রুরা সভ্যতার যুগে পৌঁছে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মত অভিজ্ঞতা তখনও সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। বাইবেলের বিবরণ থেকে জানা যায়, রক্তসম্বন্ধযুক্ত দলের ভিত্তিতে তারা একটা ক্রমান্বয়ী সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত ছিল। এই সাংগঠনিক ক্রমটা ছিল গ্রীকদের গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠীরই সমতুল। সিনাই উপদ্বীপ অঞ্চলে যখন তারা বসবাস করত, তখন একটা সমাজ হিসেবে ও ফৌজ হিসেবে তাদের সমাবেশ ও সংগঠন প্রসঙ্গে

১। "জেনেসিস", xx, ১২.

২। ঐ, xi, ২৯

৩। "এক্সোডাস", vi, ২০.

গোত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠীর সমতুল এই রক্তসম্বন্ধযুক্ত দলগুলোর উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়। যেমন, লেভি গোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি ভ্রাতৃত্বে সংগঠিত আটটা গোত্র ছিল।

লেভি গোষ্ঠী

লেভির পুত্ররা:
১। গেরশন—৭৫০০ জন পুরুষ
২। কোহাথ—৮৬০০ জন পুরুষ
৩। মেরারি—৬২০০ জন পুরুষ

ক। গেরশনীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১) লিবনি ২) শিমেই।

খ। কোহাথীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১) আমাম ২) ইস্থার ৩) হেব্রন ৪) উজিয়েল।

গ। মেরারীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১) মাহলি ২) মুশি।

"পিতার গোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী লেভির সন্তানদের গোষ্ঠীগুলির জনসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়…। লেভির পুত্রদের নাম ছিল গেরশন, কোহাথ এবং মেরারি। গেরশনের পুত্রদের নাম ছিল লিবনি এবং শিমেই। কোহাথের পুত্ররা হচ্ছে আমরাম, ইস্থার, হেব্রন এবং উজিয়েল। মেরারির পুত্রদের নাম মাহলি এবং মুশি। পিতার গোষ্ঠী অনুযায়ী এইগুলিই হচ্ছে লেভাইটদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা।"[১]

এই দলগুলোর বিবরণ কখনও সাংগঠনিক ক্রমের ওপরদিক থেকে শুরু হয়েছে, আবার কখনও শুরু হয়েছে নিচের দিক অর্থাৎ প্রাথমিক একক থেকে। যেমন; "সিমিওনের সন্তানরা, তাদের বংশধররা, তাদের পিতার বংশের পরিবারবর্গ।"[২] এখানে সিমিওনের সন্তানরা আর তাদের বংশধররা হচ্ছে গোষ্ঠী, পরিবারবর্গ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব আর পিতার বংশ হচ্ছে গোত্র। আবার, "উজিয়েলের পুত্র এলিজাফান হবে পরিবারের প্রধান, যে পরিবার তার পিতার বংশের, অর্থাৎ কোহাথীয়দের।"[৩] এখানে প্রথমে এসেছে গোত্রের কথা, তারপর ভ্রাতৃত্বের, সবশেষে গোষ্ঠীর। যে ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয়েছে, সে ছিল ভ্রাতৃত্বের প্রধান। পিতার প্রতিটি বংশেরও আলাদা আলাদা প্রতীক-চিহ্ন বা নিশানা থাকত, যাতে করে একের থেকে অপরকে পৃথক করা যায়। "ইজরায়েলের প্রতিটি সন্তান তার পিতার বংশের প্রতীক-চিহ্নে ভূষিত হবে।"[৪] এই সব অভিধাগুলি থেকে তাদের সংগঠনের প্রকৃত চেহারাটা বোঝা যায়, আর জানা যায় যে তাদের সামরিক সংগঠনটা গড়ে উঠেছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠী অনুযায়ী।

১। "নাম্বারস্", iii, ১৫-২০
২। ঐ, i, ২২.
৩। ঐ, iii, ৩০.
৪। ঐ, ii, ২.

প্রথম ও ক্ষুদ্রতম বিভাগ হচ্ছে, "পিতার বংশ।" প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের লোকসংখ্যার কথা মনে রাখলে বোঝা যায় এগুলোতে কয়েকশ করে লোক থাকত। হিব্রু ভাষায় 'বেথ অ্যাব' (beth' ab) শব্দের অর্থ হচ্ছে পৈত্রিক বাড়ি, বাবার বংশ এবং পারিবারিক আবাস। হিব্রুদের মধ্যে যদি গোত্র থেকে থাকে, তাহলে এই অংশটাই হচ্ছে সেই গোত্র। এটিকে চিহ্নিত করার জন্য দুটো অভিধা প্রয়োগ করার দরুণ একটা সন্দেহ অবশ্য দানা বাঁধে। তবে সে সময় এক-বিবাহপ্রথা চালু হয়ে যাওয়ার ফলে যদি প্রচুর সংখ্যক পৃথক পৃথক পরিবার গড়ে ওঠে থাকে এবং সেগুলো যদি খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত জ্ঞাতিদের বোঝানের জন্য বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগের একটা প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায়। আমরামের বংশ, ইঝারের বংশ, হেব্রোনের বংশ, উজ্জিয়েলের বংশ এরকম কথা আমরা প্রায়শই খুঁজে পাই। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পদবীধারী পরিবারকে আজ আমরা যে অর্থে বংশ বলে থাকি, সে ধারণা হিব্রুদের মধ্যে তখনও পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। তাই মনে হয় কথাটার অর্থ ছিল খুব সম্ভবত জ্ঞাতিত্ব বা বংশধারা।[১] যেহেতু প্রতিটি শাখা-প্রশাখার প্রধান হিসেবে কোন-না-কোন পুরুষেরই নাম পাওয়া যায় এবং যেহেতু শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্য দিয়েই বংশধারার পরিচয় দেয়, সেহেতু জোর দিয়েই বলা যায় যে ঐ-সময় হিব্রুদের বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারাই অনুসৃত হত। সাংগঠনিক ক্রমের পরবর্তী স্তর হচ্ছে পরিবার, অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব। হিব্রু ভাষায় এই সংগঠনকে বলা হয় মিশপাকাহ (mishpacah), যার অর্থ হল একতা বা একদলীয়তা। এটা গড়ে উঠত দু'তিনটি বংশকে নিয়ে। একই আদি পরিবার থেকে ভেঙে সৃষ্টি হত এই বংশগুলো। এদের এক একটা আলাদা আলাদা ভ্রাতৃত্বগত নাম থাকত। গ্রীকদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের সঙ্গে এর মিলটা চোখে পড়ার মত। প্রতি বছর এই পরিবার বা ভ্রাতৃত্বের তরফ থেকে একটা ভোজসভার আয়োজন করা হত, সেখানে বিভিন্ন পশুকে বলি দেওয়া হত।[২] আর সবশেষে ছিল গোষ্ঠী। হিব্রুভাষায় একে বলা হত মাঠেই (matteh), যার অর্থ হল শাখা, কাণ্ড বা অঙ্কুর। এটা ছিল গ্রীক গোষ্ঠীর সমতুল সংগঠন।

জ্ঞাতিদের এইসব সংগঠনের সদস্যদের অধিকার, সুযোগসুবিধে বাধ্যবাধকতা কী কী ছিল, সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। 'পিতার বংশ' থেকে শুরু করে 'গোষ্ঠী' পর্যন্ত এদের প্রতিটা সামাজিক সংগঠন যে জ্ঞাতিত্বের ধারণার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকত, দেখা যাচ্ছে সেটা গ্রীক, লাতিন বা আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর ঐ-সব ধরণের সংগঠনের জ্ঞাতিত্ব সংক্রান্ত ধারণার থেকে অনেক সুস্পষ্ট এবং যথাযথ ছিল। এথেনীয় লোককথায় বলা হয়েছে যে তাদের চারটি গোষ্ঠী উদ্ভূত হয়েছিল ইওনের চারজন পুত্রের থেকে। কিন্তু গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের উদ্ভব সম্বন্ধে কোন কথা সেখানে পাওয়া যায় না। বিপরীতে, হিব্রুদের বিবরণে জ্যাকবের বারোজন পুত্রের

১। এক্সোডাস, vi, ১৪ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কিয়েল এবং দেলিৎশ্ বলেছেন, "পিতার বংশ বলতে বোঝানো হত কোন এক সাধারণ পূর্বপুরুষের নামে চিহ্নিত কিছু পরিবারের সমষ্টিকে।" এই উক্তির মধ্যে আমরা গোত্রের সংজ্ঞাই খুঁজে পাই।

২। "আই স্যামুয়েল", xx, ৬, ২৯.

থেকে তাদের বারোটা গোষ্ঠীর উদ্ভবের কথা বলার পাশাপাশিই তাদের প্রত্যেকের সন্তান ও বংশধরদের থেকে গোত্র এবং ভ্রাতৃত্বগুলোর উদ্ভবের বিবরণও দেওয়া হয়েছে। ঠিক এইভাবে গোত্র এবং ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠার বিবরণ পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বিবরণটাকে দেখতে হবে লোককথা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সাহায্যে বিদ্যমান রক্তসম্বন্ধযুক্ত দলগুলোকে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করার একটা প্রক্রিয়া হিসেবে। এবং দেখা যাচ্ছে এ কাজ করতে গিয়ে ছোটখাট প্রতিবন্ধকগুলি দূর করা হয়েছিল আইনগত পদক্ষেপের সাহায্য নিয়ে।

হিব্রুরা নিজেদের বলে "ইজরায়েলের মানুষ" এবং বলে যে তারা হচ্ছে একটা "জনমণ্ডলী।"[১] এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তাদের সংগঠনটা ছিল সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন নয়।

এবার আফ্রিকার কথায় আসা যাক। আফ্রিকায় বন্যতা আর বর্বরতার এক নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখতে পাই আমরা। বাইরে থেকে আসা নানান কারিগরী ও যন্ত্রপাতির ধাক্কায় তাদের নিজস্ব কারিগরী ও উদ্ভাবনগুলো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মহাদেশের ব্যাপক অংশ আজও রয়েছে বন্য যুগের নিম্ন পর্যায়ে। (নরখাদকবৃত্তিসহ) এবং কিছু অংশ বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে। আফ্রিকার ভেতর দিকের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্বদেশীয় সংস্কৃতি এবং স্বাভাবিক অবস্থার দিকে এগোনোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিতাত্ত্বিক দিক থেকে আফ্রিকা একটা উষর মহাদেশ।

আফ্রিকা মহাদেশ নিগ্রো জাতির আদি বাসস্থান হলেও, এ-কথা সুবিদিত যে সেখানে নিগ্রোদের সংখ্যা মোটেই বেশি নয় এবং তাদের বসবাসের এলাকাও তেমন বড় নয়। লাথাম চমৎকারভাবে বলেছেন, "নিগ্রোরা হচ্ছে ব্যতিক্রমী আফ্রিকান।"[২] দু শাইলু কঙ্গো এবং নাইজার নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলে যেসব মানব গোষ্ঠীদের যেমন আশির, আপোনো, ইশোগো এবং আশাঙ্গোদের দেখেছিলেন, তারা হচ্ছে খাঁটি নিগ্রো। তিনি লিখেছেন, "প্রতিটা গ্রামে একজন করে প্রধান থাকত। তাছাড়া, অভ্যন্তরভাগের গ্রামগুলো পরিচালনা করত বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা। গ্রামের এক একটা অংশ এক একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তির অধীনে থাকত। সেখানে তার সঙ্গে থাকত তার নিজের লোকেরা। প্রতিটা বংশের একজন ইফোউমৌ (ifoumou), ফুমৌ (fumou) বা স্বীকৃত বংশপ্রধান থাকত (ইফোউমৌ শব্দের অর্থ হল উৎস, জনক)। কেন তাদের গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন বংশে বিভক্ত হয়ে গেল, সে সম্বন্ধে ওখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে কোন খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। ব্যাপারটা যে কেন ঘটেছিল, তা বোধহয় তাদের জানা নেই। তবে এখন আর তাদের মধ্যে নতুন নতুন বংশ সৃষ্টি হচ্ছে না··· । প্রতিবেশীদের বাড়ির থেকে প্রবীণ বা বর্ষীয়ান ব্যক্তির বাড়ি মোটেই ভাল হয় না। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার কথা তারা জানে না··· । কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেন··· । একটি গোষ্ঠী ও বংশের নারী-পুরুষের সঙ্গে অন্য

১। "নাম্বারস্", 1, ২.

২। "ডেসক্রিপটিভ এথ্নোলজি", ii, ১৮৪.

গোষ্ঠীর পুরুষ-নারীদের বিবাহ হয়। এর ফলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের একটা অনুভূতি গড়ে ওঠে। একই বংশের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কোন নারী ও পুরুষের মধ্যে অত্যন্ত দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক থাকলেও তারা বিবাহ করতে পারে না। তবে ভাইপো তার কাকার স্ত্রী অর্থাৎ কাকীমাদের অনায়াসেই বিবাহ করতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, যেমন বালাকাইদের মধ্যে, একমাত্র নিজের মা ছাড়া পিতার অন্যান্য স্ত্রীদের, অর্থাৎ সৎমাদের, বিবাহ করতে পারে··· । আমি যে-সব গোষ্ঠীকে দেখেছি, তাদের সকলকার মধ্যেই বহুবিবাহ ও দাসপ্রথা চালু আছে··· । পশ্চিম আফ্রিকার গোষ্ঠীগুলোর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মটা এ-রকম—বড় ভাইয়ের সম্পদের (নারী, দাস ইত্যাদি) উত্তরাধিকারী হয় তার পরের ভাই, কিন্তু সবথেকে ছোট ভাই আগে মারা গেলে তার যাবতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় সবথেকে বড় ভাই ; মৃতের কোন ভাই না থাকলে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় তার ভাগ্নে। বংশ বা পরিবারের প্রধানও মনোনীত হয় উত্তরাধিকারসূত্রে, ঠিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মতই। কোন পরিবারের সব ভাই মারা গেলে পরিবারের প্রধান হিসেবে মনোনীত হয় তাদের বড় বোনের বড় ছেলে। যতদিন না বংশের ঐ শাখাটা বিলুপ্ত হয়ে যায়, ততদিন এই নিয়মই চালু থাকে, কেননা সমস্ত বংশই নারী-ধারায় উদ্ভূত বলে মনে করা হয়।”[১]

ওপরের বিবরণে একটা সাচ্চা গোত্রের যাবতীয় লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা চালু থাকা। অর্থাৎ, গোত্রের প্রাচীন রূপটাই টিকে আছে সেখানে। তাছাড়া, পদ, সম্পত্তি এবং গোত্রীয় নাম বা পদবীও বর্তায় স্ত্রী-ধারা অনুসারেই। প্রধানের পদ, এক ভাইয়ের কাছ থেকে অপর ভাইদের ওপর বর্তায়, অথবা বর্তায় মামার কাছ থেকে ভাগ্নের ওপর, অর্থাৎ বোনের ছেলের ওপর—ঠিক আমেরিকার আদিবাসীদের মতই। মৃত প্রধানের ছেলেরা কিন্তু তার পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কেননা তারা অন্য গোত্রের সদস্য। গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহও নিষিদ্ধ। এই চমৎকার বিবরণে একটা জিনিসই শুধু অনুপস্থিত—কয়েকটা গোত্রের নাম। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটা আরও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

জাম্বেসি নদী অঞ্চলের বানযাইরারা নিগ্রোদের চেয়ে উন্নত স্তরের গোষ্ঠী। এদের সম্বন্ধে ডাঃ লিভিংস্টোন বলেছেন : “বানযাইরা শাসনব্যবস্থাটা বেশ বিচিত্র ধরনের। এদের মধ্যে এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চালু আছে। মৃত প্রধানের নিজের ছেলেকে এরা পরবর্তী প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করে না, পদটা পায় মৃত প্রধানের বোনের ছেলে। কোন প্রধানের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হলে তাকে বরখাস্ত করে অন্য আরেকজনকে ঐ পদে বসানো হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রয়োজন হলে তারা মৃত দূরের কোন গোষ্ঠী থেকে ঐ প্রধানের কোন ভাইকে কিম্বা বোনের ছেলেকে নিয়ে আসে নিজেদের প্রধান হিসেবে, কিন্তু কখনোই তার নিজের ছেলে বা মেয়েকে নির্বাচিত করে না··· । পূর্ববর্তী প্রধানের সমস্ত স্ত্রীদের যাবতীয় সম্পত্তি পরবর্তী প্রধান পায় এবং পূর্ববর্তী প্রধানের

১। “আশাঙ্গো ল্যাণ্ড”, অ্যাপলটন সংস্করণ, পৃঃ ৪২৫ এবং তৎপরবর্তী।

সন্তানরাও গণ্য হয় তার সন্তান হিসেবেই।"[১] এদের সামাজিক সংগঠনের কোন বিশদ বিবরণ ডাঃ লিভিংস্টোন লিখে যাননি। কিন্তু এক ভাইয়ের কাছ থেকে অপর ভাইয়ের ওপর অথবা মামার কাছ থেকে ভাগ্নের ওপর প্রধান পদটা বর্তানো থেকে বোঝা যায়—গোত্রের অস্তিত্ব ছিলই, এবং বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে।

ডাঃ লিভিংস্টোনের মতে, জাম্বেসি নদীবিধৌত অঞ্চলের অসংখ্য গোষ্ঠীর জনসমষ্টিরা এবং সেখান থেকে টানা দক্ষিণ দিকে কেপ্ কলোনি পর্যন্ত অঞ্চলের জনসমষ্টি মনে করে তারা সকলে একই আদি বংশের তিনটি মূল শাখা থেকে উদ্ভূত—বেচুয়ানা, বাসুতো আর কাফির।[২] প্রথমোক্তদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "বেচুয়ানা গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু জীবজন্তুর নাম অনুযায়ী কয়েকটা বিভাগ রয়েছে। সম্ভবত পুরনো অঞ্চলের ঈজিপ্সীয়-দের মত এরাও প্রাচীনকালে পশু-উপাসনা করত। যেমন, বাকাত্‌লা মানে হচ্ছে 'বানরের বংশধর', বাকুওনা মানে 'বড় কুমীরের বংশধর', বাত্‌লাপি মানে 'মাছের বংশধর'। যে পশুর নামে যে গোষ্ঠীর নাম, সেই পশুটা সম্বন্ধে সেই গোষ্ঠীর মানুষদের একটা অহেতুক আতঙ্ক থাকে···। সেই পশুর মাংস সেই গোষ্ঠীর লোকেরা কখনও খায় না···। অনেক বিলুপ্ত গোষ্ঠীর অবশিষ্ট দু' একজন সদস্যের নামের মধ্যে সেই প্রাচীন গোষ্ঠীর পরিচয় লুকিয়ে থাকে। যেমন বাতাউ, অর্থাৎ 'সিংহের বংশধর', বাশোগা অর্থাৎ "সাপের বংশধর। এইসব নামের কোন গোষ্ঠী আজ আর বর্ত্তমান নেই।'[৩] এইসব জীবজন্তুর নাম খুব সম্ভবত গোত্রেরই সাক্ষ্যবাহী, গোষ্ঠীর নয়। তাছাড়া, ঐ-সব গোষ্ঠীর সর্বশেষ জীবিত সদস্য হিসেবে মাত্র'একজন করেই ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারটাও গোত্রের ক্ষেত্রে ঘটা যতটা সহজ, কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঘটা ঠিক ততটা সহজ নয়। অ্যাঙ্গোলার কামাঙ্গে উপত্যকার বাঙ্গালাদের সম্বন্ধে লিভিংস্টোন বলেছেন, "কোন প্রধান মারা গেলে তার পদের উত্তরাধিকারী হয় তার ভাই, কিন্তু পুত্ররা নয়। ভাগ্নেরা তাদের মামার কর্তৃত্বাধীনে থাকে। নিজের ঋণ শোধের জন্য মামা অনেক সময় ভাগ্নেকে বিক্রি করে দেয়।"[৪] এখানেও আমরা স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি। তবে এখানে এবং অন্য

১। "ট্র্যাভ্‌ল্‌স্ ইন সাউথ আফ্রিকা", অ্যাপ্‌ল্‌টন সংস্করণ, পরিচ্ছেদ ৩০, পৃঃ ৬৬০.—"কোন যুবক যদি অন্য গ্রামের কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে আর তাদের বিবাহে যদি দু' পক্ষের মা-বাবার কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে যুবকটিকে ঐ মেয়েটির গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে হয়। তার শাশুড়ীর জন্য তাকে বিশেষ কিছু কাজও করে দিতে হয়···। এ-রকম ক্রীতদাসসুলভ জীবন সহ্য করতে না পেরে সে যদি তার মা-বাবার কাছে ফিরে আসতে চায়, তাহলে আসতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার সব সন্তানদের ছেড়ে আসতে হবে, কেননা ঐ সন্তানরা তার স্ত্রীর সন্তান হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে।" —ঐ, পৃঃ ৬৬৭.

২। "ট্র্যাভ্‌ল্‌স্ ইন সাউথ আফ্রিকা", পৃঃ ২১৯.

৩। ঐ, পৃঃ ৪৭১.

৪। ঐ, পৃঃ ৪৭১.

সর্বত্রই ডাঃ লিভিংস্টোনের বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। ফলে তাঁর বক্তব্যের সাহায্যে গোত্রের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পেঁছনো খুবই মুস্কিল।

অস্ট্রেলিয়ায় কামিলারইদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। নৈতিকতার বিচারে এই বিরাট দ্বীপের আদিবাসীরা খুবই নীচের স্তরে রয়েছে। এদের অস্তিত্ব যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন এরা বন্যতার বেশ নিম্ন স্তরে ছিল। কয়েকটা গোষ্ঠীর লোকেরা নরখাদক ছিল। এই শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে মিঃ ফিসন (যাঁর নাম আগেই উল্লিখিত হয়েছে) আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন "এদের অন্তত কয়েকটা গোষ্ঠী নরখাদক। এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। ওয়াইড উপসাগর অঞ্চলের গোষ্ঠীর লোকেরা যুদ্ধে নিহত শত্রুর মাংস তো খায়ই, এমনকি যুদ্ধে নিহত বা স্বাভাবিক কারণে মৃত (যদি তারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়) বন্ধুদের মাংস খেতেও কসুর করে না। খাওয়ার আগে মৃতের শরীরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, তারপর চর্বি আর কাঠকয়লার মিশ্রণ দিয়ে সেটাকে ভালো করে ঘষে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। এই চামড়াগুলো এদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এদের ধারণা, ঐ চামড়ার মধ্যে দারুণ ভেষজগুণ থাকে।"

মানবজীবনের এ-রকম চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি বন্যতা ঠিক কোন্ পর্যায়ে রয়েছে, তার বিভিন্ন রীতিনীতি কোন্ স্তরে রয়েছে, বস্তুগত বিকাশ কতটা হয়েছে আর মানুষের মানসিক ও নৈতিক জীবন কতটা নিম্ন স্তরে আটকে আছে। আজও অস্ট্রেলিয়ানরা মানুষ খায়। এ থেকেই বোঝা যায় তারা কতটা পিছিয়ে রয়েছে। অথচ, তারা বসবাস করে একটা মহাদেশের মত বিশাল অঞ্চলে, প্রচুর খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় সেখানে, জলবায়ু মোটেই প্রতিকূল নয় এবং জীবনধারণের উপকরণও যথেষ্টই সুলভ। তা সত্ত্বেও, এ-রকম একটা জায়গায় কয়েক হাজার বছর ধরে বসবাস করার পরও তারা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের বন্যই রয়ে গেছে। বাইরে থেকে কোন আলোকরশ্মি গিয়ে না পেঁছলে তারা হয়ত আরও হাজার বছর বন্যতার এই আঁধারঘেরা পরিমণ্ডলেই রয়ে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাভাবিক চরিত্রের এবং একই ধরনের। ওখানে শুধু কামিলারইদের মধ্যেই যে গোত্রীয় সংগঠন আছে, তা নয়। সম্ভবত ওখানকার সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই গোত্রের অস্তিত্ব আছে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার লেসপেড উপসাগরের কাছাকাছি বসবাস করে নারিন্ইয়েরিরা। এদের মধ্যে পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের নামে অভিহিত নানান গোত্র আছে। আমার বন্ধু মিঃ ফিসনকে লেখা চিঠিতে রেভারেণ্ড জর্জ টাপ্লিন জানিয়েছেন—নারিন্ইয়েরিরা নিজেদের গোত্রের কাউকে বিবাহ করে না, এবং সন্তানরা তাদের বাবার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর তিনি লিখেছেন: "নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর কামিলারই ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর মত এদের মধ্যেও কোন বর্ণ বা জাতপাত নেই, কোন শ্রেণীও নেই। তবে প্রত্যেক গোষ্ঠী বা বংশের (আর গোষ্ঠী হচ্ছে আসলে বংশই) নিজস্ব একটা কুলপ্রতীক (totem) বা

ন্‌গাইতিয়ে (ngaitye) থাকে। কোন কোন ব্যক্তিরও নিজস্ব ন্‌গাইতিয়ে থাকে। এই প্রতীকটা হচ্ছে রক্ষাকর্তা হিসেবে ঐ-সব ব্যক্তিদের ক্ষমতার পরিচায়ক। কোন জীব-জন্তু, পাখি বা কীটপতঙ্গকেই কুলপ্রতীক করা হয়।...এদের বিবাহরীতি অত্যন্ত কঠোর। গোষ্ঠীকে (গোত্রকে) এরা বংশ বলেই মনে করে, তাই কেউ তার নিজের গোষ্ঠীর কাউকে বিবাহ করতে পারে না।"

মিঃ ফিসনও লিখেছেন, "মিঃ এ. এস. পি. ক্যামেরন আমাকে যে সব তথ্য জানিয়েছেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কুইন্সল্যাণ্ডের মারানোআ জেলার গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও (যাদের উপভাষা হচ্ছে উর্ঘি) শ্রেণী-নাম (পদবী) এবং কুলপ্রতীকের ব্যাপারে ঠিক কামিলারয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর মত একই নিয়ম চালু আছে।" মিঃ চার্লস জি. এন. লকউড-এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডার্লিং নদী অঞ্চলের অস্ট্রেলিয়ানদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "এরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে (গোত্র) বিভক্ত। এদের মধ্যে নাম পাচ্ছি এমুপাখি, বুনোহাঁস আর ক্যাঙ্গারু গোষ্ঠীর। অন্য আরও গোষ্ঠী আছে কি-না, তা জানতে পারিনি। সন্তানরা তাদের মায়ের শ্রেণী-নাম (পদবী) এবং কুল-প্রতীকই গ্রহণ করে যাচ্ছে।"[১]

উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোত্রীয় সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানার পর স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যেই গোত্রের অস্তিত্ব আছে। তবে এটাও সত্য যে সেগুলে মোটেই কোন উন্নত মানের সংগঠন হয়ে উঠতে পারেনি আজও। পলিনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও পাপুয়া দ্বীপের অধিবাসীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান একান্তই সীমিত এবং অপূর্ণাঙ্গ। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, সামোয়া, মার্কেসাস দ্বীপ অথবা নিউজিল্যাণ্ড—এ-সব জায়গায় গোত্রীয় সংগঠনের কোন নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এদের জ্ঞাতিত্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাটাও নিতান্তই আদিম ধরনের। এ থেকে বোঝা যায় যে গোত্রের অস্তিত্বের জন্য যে অবস্থাটার দরকার হয়, সে অবস্থায় এখনও পৌঁছতে পারেনি তারা।[২] মাইক্রোনেশিয়ার কোন কোন দ্বীপে প্রধানের পদটা হস্তান্তরিত হয় নারীদের মারফৎ,[৩] তবে এ রীতিটা গোত্র ছাড়াও চালু থাকতে পারে। ফিজির অধিবাসীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত, এরা একই মূল ভাষার বিভিন্ন উপ-ভাষায় কথা বলে থাকে। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে রেওয়া গোষ্ঠী। এদের মধ্যে পৃথক পৃথক নামবিশিষ্ট চারটি উপবিভাগ আছে, আবার এই চারটি উপবিভাগের প্রত্যেকটার মধ্যেও আছে কয়েকটা করে ভাগ। এই শেষোক্ত ভাগগুলোকে গোত্র হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না। তার অন্যতম কারণ হল—এই ভাগগুলোর সদস্যরা নিজেদের ভাগেরই কাউকে বিবাহ করতে পারে। অর্থাৎ অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুসারে। টোঙ্গানদের মধ্যে কিছু উপ-বিভাগ আছে, আবার সেই উপবিভাগগুলোর মধ্যেও রেওয়াদের মত কয়েকটা করে ভাগ আছে।

১। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য, টেলর-এর "আর্লি হিষ্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড", পৃঃ ২৮৪.

২। "সিস্টেম্‌স্ অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি" ইত্যাদি, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৫১, ৪৮২.

৩। "মিশনারি হেরাল্ড", ১৮৫৩, পৃ. ৯০.

বিবাহ, পরিবার, জীবনযাপন এবং শাসনব্যবস্থা—এইসব সাদামাটা ধারণাগুলোকে কেন্দ্র করেই প্রথম সামাজিক সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল। তাই প্রাচীন সমাজের কাঠামো আর নীতির ব্যাখ্যাও শুরু হয় এগুলো থেকেই। বিভিন্ন যুগের অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে মানবজাতি এগিয়ে চলে প্রগতির পথে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিচার করলে বোঝা যায়—ওসিনিয়ার অধিবাসীদের এই আলাদা আলাদা থাকা, তাদের প্রত্যেকের বসবাসের সীমিত এলাকা এবং জীবনধারণের অপ্রতুল উপাদনের দরুণ তাদের অগ্রগতি ঘটেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। সুদূর অতীতে এশিয়ার বাসিন্দারা যে অবস্থায় ছিল, এরা আজ সেই অবস্থার রয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে থাকার দরুণ এদের মধ্যে কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছে। তবু, এইসব দ্বীপ আজও অগ্রগতির একটা প্রাথমিক দশাতেই আটকে আছে। এদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন, আবিষ্কার এবং মানসিক ও নৈতিক প্রলক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য নৃতাত্ত্বিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

গোত্রভিত্তিক সংগঠন এবং কোথায় কোথায় তা আছে, সে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এ সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা গেছে অস্ট্রেলিয়ায়, দেখা গেছে আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে। আফ্রিকার অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও এর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। আমেরিকার আদিবাসীদের সেই অংশটার অস্তিত্ব, প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ার সময় যারা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে ছিল, তাদের সমাজে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। সে সময় যে ভিলেজ ইন্ডিয়ানরা ছিল বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে, তাদের একটা অংশের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া গেছে গোত্রের অস্তিত্ব। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের গ্রীক ও লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় ছিল গোত্র, এবং আর্য জাতির বাকি শাখাগুলোর বেশ কয়েকটার মধ্যেও এর অস্তিত্ব ছিল। তুরানিয়, উরালিয় ও মঙ্গোলিয়দের মধ্যে, তুঙ্গুসিয় ও চৈনিকদের মধ্যে এবং সেমিটিক জাতিগুলোর ক্ষেত্রে হিব্রুদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব দেখা গেছে বা তার অস্তিত্বের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট তথ্য হাজির করতে পেরেছি। বন্য-যুগের উচ্চ পর্যায়ে এবং বর্বরতার সমগ্র পর্যায় জুড়েই পৃথিবীর বুকে টিকে থেকেছে গোত্র।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকেও আরও প্রমাণিত হয়েছে যে এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানটাই ছিল প্রাচীন মানব সমাজের উৎস এবং বনিয়াদ। এটাই ছিল অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে গড়ে ওঠা প্রথম সুসম্বন্ধ নীতি, যা মানুষকে একটা নির্দিষ্ট ধাঁচ অনুযায়ী সংগঠিত করতে পেরেছিল এবং সমাজব্যবস্থা রাজনৈতিক সমাজে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত তার ঐক্যকে টিকিয়ে রাখতেও সক্ষম হয়েছিল। আজও পর্যন্ত সবকটা মহাদেশে গোত্রের কিছু-না-কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। এ থেকে এই সংগঠনটার প্রাচীনত্ব, সারা পৃথিবীতে বিদ্যমানতা আর প্রবল জীবনীশক্তিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীতে গোত্রের ছড়িয়ে থাকা আর আজও টিকে থাকা থেকে বোঝা যায়, মানবজাতির প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে গোত্রীয় সংগঠন কত সুন্দরভাবে খাপখেয়ে গিয়েছিল। মানব-জাতির ইতিহাসের সবথেকে ঘটনাবহুল পর্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে এই সংগঠন।

সমাজের কোন এক নির্দিষ্ট অবস্থায় গোত্র কি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল, সে কারণেই কি নানান বিচ্ছিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদাভাবে গোত্র গড়ে উঠেছিল? নাকি এটা একটা জায়গা থেকেই সৃষ্টি হওয়ার পর সেই আদি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া লোকদের মারফৎ ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য অনুমানের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে, একটু-আধটু পরিবর্তন করে নিলে দ্বিতীয় বক্তব্যটাকেই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। কারণ গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের আগে পৃথিবীতে দু-ধরনের বিবাহ ও পরিবার দেখা গেছে; এর মধ্যে দ্বিতীয় ধরনের বিবাহ ও পরিবার প্রথা চালু করার জন্য দরকার হয়েছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা, আবার এই অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের ফলেই মানুষ গোত্রের উদ্ভাবন করতে পেরেছিল। এক বিস্ময়কর ধরনের দাম্পত্য ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফৎ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়ার চূড়ান্ত ফল স্বরূপ গড়ে উঠেছিল ঐ দ্বিতীয় ধরনের পরিবার। প্রথমোক্ত ধরনের দাম্পত্য ব্যবস্থা বন্য মানুষদের ওপর চেপে বসেছিল শক্ত হয়ে। তার হাত থেকে মানুষের চরম মুক্তিটা যে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন জায়গায় ঘটেছিল—সেটা বিশ্বাস করা শক্ত। মানব ইতিহাসের প্রথম থেকেই নিরাপত্তা আর জীবন ধারণের জন্য রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতিরা যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করত, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গোত্র হচ্ছে জ্ঞাতিদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা সংগঠন। জ্ঞাতিদের শুধুমাত্র একটা অংশকেই নিজের অন্তর্ভুক্ত করে, বাকিদের বাদ দেয় সে। নিজের মধ্যেকার ঐ অংশটাকে সে সংগঠিত করে রক্তসম্বন্ধের ভিত্তিতে, তারা প্রত্যেকে একই পদবী ধারণ করে এবং সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধে পায়। সম্বন্ধহীন ব্যক্তিদের সাথে বিবাহ সুবিধেজনক দিকটা সুনিশ্চিত করার জন্য গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সাংগঠনিক বিচারে এটা ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি, কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ ঘটানো খুবই দুরূহ ছিল। গোত্র সংক্রান্ত ধারণাটা মোটেই খুব সহজ-স্বাভাবিক নয়, বরং যথেষ্টই দুর্বোধ্য, নিগূঢ়। তাই বলা যায়, গোত্রের সূচনা যথেষ্ট উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়েছিল। ধারণার প্রথম অংকুরটা মাথা তোলার পর তাকে পরিণত করে তুলতে (যাবতীয় রীতি-প্রথা সহ) প্রয়োজন হয়েছিল সুদীর্ঘ সময়। পলিনেশিয়দের মধ্যে দলগত বিবাহ ভিত্তিক পরিবার চালু ছিল, কিন্তু তারা কোন গোত্র গড়ে তুলতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যেও ঐ একই ধরনের পরিবার চালু থাকলেও তারা গোত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এই দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকেই উদ্ভব ঘটেছিল গোত্রের। যে-সব গোষ্ঠী গোত্র গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই গোত্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল। গোত্র গড়ে ওঠা সম্বন্ধে একটু আগে যে মত উল্লিখিত হয়েছে, এটা হচ্ছে তারই একটা পরিবর্তিত রূপ। গোত্র পূর্ব সমাজে গোত্রের ভ্রূণটা লুকিয়ে ছিল নারী-পুরুষ বিভাজনের মধ্যেই। এক সময় গড়ে উঠল গোত্রের প্রাচীন কাঠামোটা, সৃষ্টি হল একদল উন্নত মানুষ। স্বাভাবিক-

ভাবেই তখন গোত্র সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। গোত্রের সংগঠনটার ব্যাখ্যা করার চেয়ে তার ছড়িয়ে পড়ার ব্যাখ্যা করা অনেক সহজ। এইসব দিকগুলোর কথা বিচার করে দেখলে বোঝা যায়—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে আলাদা আলাদাভাবে গোত্র গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, যে-সব বন্য মানুষদের মধ্যে গোত্র গড়ে উঠেছিল, তারা স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্যদের তুলনায় অনেক উন্নত হয়ে উঠতে পেরেছিল। সে সময় মানুষ দেশান্তরী হত বন্য-জীবজন্তুদের থেকে পালানোর কারণে অথবা বসবাসের কোন উৎকৃষ্ট অঞ্চল খুঁজে বার করার জন্য। এই অবস্থায় একটা উন্নত সংগঠন অর্থাৎ গোত্রবিশিষ্ট কোন জাতি যে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে তা আর আশ্চর্য কি। অতএব, যাবতীয় প্রধান প্রধান তথ্যগুলো মিলিয়ে দেখলে মনে হয়—গোত্রীয় সংগঠন কোন একটি মাত্র জায়গায় সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণীগুলোকে (যাদের দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকে গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল) প্রাচীন সমাজের মূল বনিয়াদ বলে ধরে নিই, তাহলে আলাদা কথা। সে-ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয় যে যেখানেই এই শ্রেণীসমূহে অস্তিত্ব ছিল, সেখানেই গোত্র গড়ে উঠেছিল ।

কোন একটা বিশেষ অঞ্চলেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল ধরে নিলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়, যে একটা মূল বা আদি কেন্দ্র থেকে দেশান্তরের মধ্য দিয়েই তারা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। সেক্ষেত্রে এশিয়া মহাদেশকেই মানবজাতির জন্মভূমি বলে মেনে নিতে হয়, কেননা ইউরোপ, আফ্রিকা আর আমেরিকার তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক আদি ধরনের মানবগোষ্ঠী বসবাস করে এশিয়ায়। এইসঙ্গেই মনে হয় যে সেই মূল গোষ্ঠী থেকে নিগ্রোরা এবং অস্ট্রেলিয়ানরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তখন সমাজ ছিল লিঙ্গের ভিত্তিতে সংগঠিত, এবং পরিবার ছিল দলগত বিবাহ ভিত্তিক। পলিনেশিয়রা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল আরও পরে, তবে তখনও সমাজের কাঠামোটা একইরকম ছিল। আর গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের আমেরিকায় চলে যাওয়াটা ঘটেছিল আরও পরবর্তীকালে এবং গোত্র গড়ে ওঠার পর। অবশ্য ওপরের এই কথাগুলো নিতান্তই অনুমান মাত্র।

প্রাচীন সমাজকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য গোত্র আর তার কার্যকলাপ, এবং কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এই সংগঠন—তা জানা একান্তই জরুরী। সভ্য জাতিগুলোর পূর্বপুরুষদের মধ্যে এই সংগঠন সব থেকে উন্নত হয়ে উঠেছিল বর্বর যুগের একেবারে শেষ দিকে। কিন্তু তার অনেক আগেও গোত্র ছিল। সেই অবস্থায় থাকা বন্য ও বর্বরদের মধ্যেই আজ তার অস্তিত্ব খুঁজে দেখতে হবে। সুসংগঠিত সমাজ গড়ার ধারণাটা মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসের পথ বেয়ে ধীরে-ধীরে বিকশিত হয়েছে। এই সংগঠিত সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলো পরস্পর সংযুক্ত, একটা স্তর জন্ম দিয়েছে আর একটা স্তরের। এই সমাজের যে রূপটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা

করলাম, তার সূচনা হয়েছিল গোত্রের মধ্যেই। মানবজাতির পথচলার ইতিহাসে এমন আর কোন প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া যায় না, মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে যার সম্পর্ক গোত্রের মত এত প্রাচীন এবং এত অঙ্গাঙ্গী। মানবজাতির প্রকৃত ইতিহাস ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব আর বিকাশের ইতিহাসের মধ্যেই, আর এইসব প্রতিষ্ঠানেরই অন্যতম হচ্ছে গোত্র। অন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান মানুষের ইতিহাসে সবথেকে বেশি বস্তুগত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, সেইসব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করেছে গোত্রই।

তৃতীয় খণ্ড

পরিবার সম্পর্কিত ধারণার উন্মেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন পরিবার

পৃথিবীতে বরাবর এক বিবাহভিত্তিক পরিবারই চালু ছিল, তবে তারই মধ্যে কোথাও কোথাও দেখা যেত পিতৃপ্রধান পরিবার—এ-রকম একটা ধারণা আমাদের মধ্যে চালু আছে। কিন্তু ধারণাটা আদৌ সত্য নয়। পরিবার সংক্রান্ত ধারণার ক্রমবিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক স্তরের মধ্যে দিয়ে, আর এই স্তরগুলোর চূড়ান্ত স্তর হিসেবেই গড়ে উঠেছে এক বিবাহভিত্তিক পরিবার। এখানে আমি দেখাতে চেষ্টা করব যে এর আগে পৃথিবীর সর্বত্রই আরও প্রাচীন ধরনের বিভিন্ন পরিবারব্যবস্থা চালু ছিল, বন্যতার সমগ্র যুগটা ধরে এবং বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে সেইসব পরিবার বিদ্যমান ছিল, আর এই এক বিবাহভিত্তিক বা পিতৃপ্রধান পরিবারের কোন অস্তিত্ব বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের আগে পর্যন্ত ছিল না। এগুলো হচ্ছে অনেক উন্নত স্তরের ফসল। তাছাড়া, মানবসমাজের প্রতিটি জাতির মধ্যে পরিবারের প্রাচীন রূপ সংক্রান্ত কোন-না-কোন পূর্বতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ-ধরনের পরিবার গড়ে ওঠার বুনিয়াদ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত প্রাচীন সমাজে এগুলোর অস্তিত্ব থাকা সম্ভবও ছিল না।

ভিন্ন ভিন্ন ও পর্যায়ক্রমিক পাঁচ ধরনের পরিবারের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এগুলোর প্রতিটারই একটা নিজস্ব বিবাহপদ্ধতি ছিল।

১। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার।

এই পরিবার গড়ে উঠত একদল আপন ও জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্ত (মামাতো-পিসতুতো-খুড়তুতো-মাসতুতো ইত্যাদি) ভাইবোনের অন্তর্বিবাহের ভিত্তিতে।

২। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার।

এক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক আপন ও জ্ঞাতিবোনের বিবাহ হত দলগতভাবে, এক বোনের স্বামী অপর প্রত্যেক বোনেরই স্বামী হিসেবে গণ্য হত। এই যৌথ স্বামীদের একই গোত্রভুক্ত হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আবার, একদল আপন ও জ্ঞাতি-ভাইয়ের বিবাহ হত একদল নারীর সঙ্গে, একজনের স্ত্রী অপর প্রত্যেকেরই স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হত, এবং এক্ষেত্রেও ঐ স্ত্রীদের একই গোত্রভুক্ত হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা থাকত না। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই এইসব স্বামী বা স্ত্রীরা সাধারণত একই গোত্রের সদস্য বা সদস্যা হত। উভয় ক্ষেত্রেই একদল পুরুষের দলগতভাবে বিবাহ হত একদল নারীর সঙ্গে।

৩। জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার।

এক্ষেত্রে বিবাহটা হত একজন নারীর সঙ্গে একজন পুরুষের, কিন্তু যৌনমিলনের ব্যাপারটা শুধু পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। উভয় পক্ষ ইচ্ছামত সম্পর্ক বজায় রাখতে বা সম্পর্ক ভেঙে দিতে পারত।

৪। পিতৃপ্রধান পরিবার।

এই পরিবারের ভিত্তি ছিল একজন পুরুষের সঙ্গে বেশ কিছু নারীর বিবাহ। প্রত্যেক স্ত্রীকে আলাদা আলাদা করে রাখা হত।

৫। এক বিবাহভিত্তিক পরিবার।

একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিবাহের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে এই পরিবার, এবং তাদের যৌন সহবাসও কেবলমাত্র পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

এই পাঁচ ধরনের পরিবারের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয়, আর পঞ্চম ধরনের পরিবার, কেননা তিনটি সুনির্দিষ্ট জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল এই পরিবারগুলো। ঐ তিন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা আজও বিদ্যমান। আবার, এই ব্যবস্থাগুলো থেকেই পূর্ববর্তী যুগের পরিবার ও বিবাহের রূপগুলোর কথা জানা যায়, যে রূপগুলোর সঙ্গে এইসব জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বাকি দু-ধরনের পরিবার, অর্থাৎ জোড়বাঁধা পরিবার ও পিতৃপ্রধান পরিবার ছিল একটা অন্তর্বর্তী স্তরের ব্যাপার, এবং এগুলো কোন নতুন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সৃষ্টি করতে অথবা তৎকালীন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। তাই মানুষের ইতিহাসে এগুলোর গুরুত্ব কিছুটা কমই। পরিবারের এইসব রূপগুলো কিন্তু পরস্পরের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রথম রূপটা থেকেই গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় রূপটা, তা থেকে আবার তৃতীয়টা, সেখান থেকে চতুর্থ, চতুর্থের মধ্যে থেকে পঞ্চম রূপটা— এইভাবেই এসেছে একের পর এক পরিবার। তবে, একটা রূপ থেকে আরেকটা রূপে যাওয়ার পথে অসংখ্য ছোটখাট স্তর অবশ্যই পেরিয়ে আসতে হয়েছে। আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে, পর্যায়ক্রমে পরিবারের একটা রূপের মধ্যে থেকেই আরেকটা রূপ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই সবকটি রূপের সম্মিলিত কাঠামোর মধ্যেই পরিবার সংক্রান্ত ধ্যানধারণার ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিহিত রয়েছে।

পরিবার এবং বিবাহের বিভিন্ন রূপের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে হলে রক্তসম্বন্ধ ও ও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার (যে দুটি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) মর্মবস্তুটা বুঝে নেওয়া দরকার। এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যেই আলোচ্য বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ও সুনিশ্চিত প্রমাণ নিহিত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে থেকে যে সুনিশ্চিত ধারণাটা পাওয়া যায়, তা থেকে আমরা কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। কিন্তু কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকলে ব্যবস্থাটাকে অত্যন্ত জটিল ও বিভ্রান্তিকর বলেই মনে হয়। ঐ ব্যবস্থার মধ্যে যে-সব প্রমাণ নিহিত আছে, তার গুরুত্ব ও মূল্য যাচাই করে দেখার মত পাণ্ডিত্য অর্জন করতে বলা হয় যদি পাঠককে, তাহলে তা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমি "সিস্টেম্‌স্‌ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি"[১] শীর্ষক একটি রচনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে আমি শুধু মূল তথ্যগুলোর কথাই উল্লেখ করব, উল্লেখ করব পাঠকের পক্ষে বোধগম্য যথাসম্ভব কম দৃষ্টান্ত, এবং বিস্তারিত বিবরণ ও স্মরণীর জন্য দেখতে বলব ঐ 'সিস্টেম্‌স্‌ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি' রচনাটি। পরিবার যে বেশ কিছু ধারাবাহিক রূপের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আধুনিক

১। "স্মিথ্‌সনিয়ান কনট্রিবিউশন্‌স্‌ টু নলেজ", খণ্ড ১৭.

চেহারায় এসে পৌঁছেছে—আমাদের এই মুখ্য প্রতিপাদ্যটি মানুষের ইতিহাসের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রকৃত ইতিহাস খোঁজার জন্য এই ব্যবস্থাগুলোকে জানাটা তাই একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পরিচ্ছেদে এবং পরবর্তী চারটি পরিচ্ছেদে আমরা এগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সবথেকে আদিম ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গেছে পলিনেশিয়দের মধ্যে। এদের মধ্যে হাওয়াইয়ানদেরকেই আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করব। এই ব্যবস্থাকে আমি 'মালয় ব্যবস্থা' নামে চিহ্নিত করেছি। এই ব্যবস্থায় নিকট ও দূর সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতিরাই পরস্পরের সঙ্গে নিম্নলিখিত এই কয়েকটি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়—পিতামাতা, সন্তান, মাতামহ-মাতামহী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, ভাই এবং বোন। অন্য কোনরকম রক্ত সম্পর্ককে এরা স্বীকার করে না। এগুলো ছাড়া একমাত্র স্বীকৃত সম্পর্ক হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক। জ্ঞাতিত্বের এই ব্যবস্থাটা প্রথম ধরনের পরিবার, অর্থাৎ ভাই বোন বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে যে এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ এদের এই ব্যবস্থার মধ্যেই পাওয়া যায়। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে এই প্রমাণটুকু যথেষ্ট কিনা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। কিন্তু স্বীকৃত প্রতিটা সম্পর্ক সত্য সত্যই বিদ্যমান ছিল ধরে নিলে মেনে নিতেই হয় যে আমাদের সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি বাস্তব-সম্মত। পলিনেশিয়ার প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা দেখা যেত, যদিও তাদের পরিবারগুলো ভাই বোন বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের স্তর অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিল দলগত বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের স্তরে। জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থাটা অপরিবর্তিত থাকার পিছনে দুটো বিষয় কাজ করেছিল। পরিবর্তন ঘটানোর মত জোরদার কোন প্রেরণা দেখা দেয়নি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেনি। বছর পঞ্চাশ আগে আমেরিকান মিশনারিরা যখন স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে যান, তখনও ঐ দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। এশিয়াতেও যে এই ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা চালু ছিল, সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কারণ এশিয়ায় আজও পর্যন্ত বিদ্যমান তুরানিয় ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছে এই ধরনের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার ভিত্তিতেই। চৈনিক জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থারও ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এই ব্যবস্থাই।

সময়ের গতিপথে জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় ব্যবস্থাটা, অর্থাৎ তুরানিয় ব্যবস্থাটা প্রথম ব্যবস্থাটার থেকে জোরদার হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীর বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর আমেরিকার সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক জায়গাতেও এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয়, দক্ষিণ আমেরিকাতেও এই ব্যবস্থাটা সর্বত্রই চালু ছিল। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে এই ব্যবস্থা চালু থাকার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে আফ্রিকান গোষ্ঠীগুলোর জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার সঙ্গে মালয়ের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থারই বেশি সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী হিন্দুদের মধ্যে, এবং কিছুটা পরিবর্তিত রূপে উত্তর ভারতের গৌড় ভাষাভাষী হিন্দুদের মধ্যে এই ব্যবস্থা আজও টিকে আছে। কিছুটা উন্নত রূপে এইব্যবস্থার দেখা মেলে অস্ট্রেলিয়াতেও। অস্ট্রেলিয়ায় এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে হয়

শ্রেণীভিত্তিক সমাজ-সংগঠনের মধ্যে থেকে, অথবা উদ্ভবমান গোত্রভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে থেকে। যা থেকেই গড়ে উঠে থাকুক না কেন, ফলাফলটা হয়েছে একই। তুরানিয় এবং গ্যানোনিয় বর্গের প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহ এবং গোত্রীয় সংগঠন মারফৎ। এই গোত্রীয় সংগঠন আবার ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিল। গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কিভাবে এই পদক্ষেপটা সম্পন্ন করা হয়েছিল, তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। এর ফলে আপন ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের মত। তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পরিবারগুলো ছিল দলগত বিবাহ ভিত্তিক পরিবার। এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় সহজেই। ঐ ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রধান প্রধান সম্পর্ক-গুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় একমাত্র দলগত বিবাহের মধ্যেই। একমাত্র দলগত বিবাহ চালু থাকলেই ঐ ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভবপর ছিল। বিভিন্ন তথ্যকে যুক্তিসম্মতভাবে সাজালে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মত দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারও একসময় পৃথিবীর বহু অংশে প্রচলিত ছিল। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল গোত্রীয় সংগঠন আর দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকেই। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাব যে মালয় ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই ব্যবস্থাটা। তফাৎ ছিল শুধু একটা বিষয়ে—আপন এবং জ্ঞাতি ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহের ফলে আগেকার যুগে যে-সব সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলোর পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। এই পরিবর্তন ঘটানোর পিছনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল গোত্রই। অতএব, তুরানিয় ও মালয়ের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রমাণ আমরা পেয়েই যাচ্ছি। ব্যবস্থার এই পরিবর্তন থেকেই বোঝা যায় সমাজের ওপর, বিশেষত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ দলগুলোর ওপর গোত্রীয় সংগঠন কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আর্যদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার যাবতীয় সম্পর্ককে তো এই ব্যবস্থা স্বীকার করেই, এমনকি স্বীকার করে আর্যদের অলক্ষিত কিছু সম্পর্ককেও। নিকট এবং দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। জ্ঞাতিত্বসম্পর্ক খোঁজার ব্যাপারে এই ব্যবস্থার একান্ত নিজস্ব পদ্ধতি আছে। আর্যরা যতজনকে নিজেদের জ্ঞাতি বলে স্বীকার করে, তার থেকে অনে বেশি জনকে জ্ঞাতি বলে স্বীকার করা হয় এই ব্যবস্থায়। পারিবারিক এবং সাধারণ সম্ভাষণের সময় লোকেরা পরস্পরের সম্পর্ক ধরে ডাকে, কখনোই কাউকে নাম ধরে ডাকে না। এর ফলে, দূরতম জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কটাও বজায় থাকে, অর্থাৎ সম্পর্কটা সারাক্ষণই স্বীকৃতি পায়। তাছাড়া এ থেকে গোটা ব্যবস্থাটা সম্বন্ধেও একটা ধারণা পাওয়া যায়। পরস্পরের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন ব্যক্তিরা একে অপরকে সম্ভাষণ করে "বন্ধু" বলে। মানুষের ইতিহাসে আর কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় এত বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক ও এত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নি।

আমেরিকার আদিবাসীদের অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন তারা দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের স্তর থেকে এসে পৌঁছেছিল জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তখনও পর্যন্ত আগেকার জ্ঞাতিত্বসম্পর্কই চালু ছিল, নতুন

ধরনের পরিবারের ভিত্তিতে কোন নতুন জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা চালু হয় নি। মালয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানেও পরিবার পৌঁছে গিয়েছিল ভাই-বোন বিবাহের স্তর থেকে দলগত বিবাহের স্তরে, কিন্তু জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে তাদের জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কগুলোও ছিল ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থার সম্পর্ক, দলগত বিবাহের সম্পর্ক নয়। একইভাবে, তুরানিয় ব্যবস্থার সম্পর্কগুলোও হচ্ছে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার-ব্যবস্থার সম্পর্ক, জোড়-বাঁধা বিবাহ থেকে সৃষ্ট সম্পর্ক-গুলোর সঙ্গে এগুলো খুব একটা মানানসই নয়। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা যে গতিতে অগ্রসর হয়, তার থেকে অনেক দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয় পরিবার। প্রয়োজনের তাগিদেই অগ্রসর হতে হয় পরিবারকে। আর পারিবারিক সম্পর্ককে ধরে রাখার জন্য পিছু পিছু আসে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা যেমন মালয় ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের পর্যাপ্ত কারণ হয়ে উঠতে পারেনি, ঠিক তেমনি জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাও তুরানিয় ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে পর্যাপ্ত কারণ হয়ে উঠতে পারেনি। মালয় ব্যবস্থাকে তুরানিয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল গোত্রীয় সংগঠনের মত একটা প্রতিষ্ঠানের। আবার, এই তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সূত্রপাত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সম্পত্তির মত একটা প্রতিষ্ঠানের, যার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছিল সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি কর্তৃক সৃষ্ট এক বিবাহভিত্তিক পরিবার।

সময়ের গতিপথে তৃতীয় আর একটি জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অভ্যুদয় ঘটেছিল। এই ব্যবস্থাকে স্বচ্ছন্দে আর্য, সেমিটিক অথবা উরালিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা বলা যেতে পারে। যে-সব প্রধান প্রধান জাতিগুলো পরবর্তীকালে সভ্যতার যুগে পৌঁছেছিল, তাদের মধ্যে প্রচলিত তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েই সম্ভবত এই তৃতীয় ব্যবস্থাটা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগে জ্ঞাতিত্বসম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল এই ব্যবস্থা মারফতই। তুরানিয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মালয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে। কিন্তু তুরানিয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই তৃতীয় ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠেনি। সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে প্রচলিত তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ব্যবস্থাটা। নানান ঘটনা থেকেই একথার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

পরিবারের শেষ চারটি রূপ দেখা গেছে ঐতিহাসিক যুগের সময়সীমার মধ্যেই। কিন্তু প্রথম রূপটা, অর্থাৎ ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবার পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে প্রাচীনকালে এ-রকম পরিবার যে বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মালয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে। তাহলে আমরা পরিবারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি রূপের হদিশ পাচ্ছি। এই তিনটি রূপ আসলে সমাজজীবনের তিনটি পৃথক পৃথক অবস্থারই প্রতিভূ। এই তিন ধরনের পরিবারের যুগে দেখা গেছে পৃথক পৃথক ও সুনির্দিষ্ট তিন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। শুধু এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাগুলো দিয়ে বিচার করলেও ঐ তিন ধরনের পরিবারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাগুলোর সুদীর্ঘ স্থায়ীত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং বোঝা যায় যে প্রাচীন সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে এগুলোর মধ্যে যে প্রমাণগুলো ছড়িয়ে আছে—সেগুলো কতটা মূল্যবান।

এইসব পরিবারগুলো বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে টিকে থেকেছে দীর্ঘদিন ধরে। প্রত্যেক ধরনের পরিবারের জীবনে তিনটি স্তর দেখা গেছে—গড়ে ওঠার স্তর, পূর্ণ বিকশিত হওয়ার স্তর। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের উৎস নিহিত রয়েছে সম্পত্তির মধ্যে। আবার, যে জোড়বাঁধা পরিবারের মধ্যেই একবিবাহভিত্তিক পরিবারের ভ্রূণ রয়ে গিয়েছিল, সেই জোড়বাঁধা পরিবারের উৎস নিহিত ছিল গোত্রের মধ্যে। গ্রীক গোষ্ঠীগুলো যখন প্রথম ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আসে, তখন তাদের মধ্যে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। তবে সুনির্দিষ্ট আইনের সাহায্যে এর মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এই পরিবার চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

মানুষের মনে সম্পত্তি সংক্রান্ত ধ্যানধারণার উদয়টা সম্পত্তি সৃষ্টি ও তা ভোগদখল করা এবং তার উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আইনী বন্দোবস্ত চালু করা—এগুলোর সাহায্যে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল এই ধরনের পরিবার গড়ে ওঠার সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে সম্পত্তির প্রভাব। সমাজের কাঠামোর ওপর ছাপ ফেলতে শুরু করে সম্পত্তি। সন্তানের পিতা কে, তা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তার আগের যুগগুলোতে এ সুযোগ ছিল না। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিবাহের প্রথা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায় থেকেই চালু ছিল। তবে তখন ঐ দুজন যতদিন পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে চাইত, শুধু ততদিনই তারা স্বামী-স্ত্রী থাকত। প্রাচীন সমাজ যত এগিয়েছে, প্রতিষ্ঠানগুলো যতই উন্নত হয়ে উঠেছে এবং মানুষ যতই নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেছে, ততই সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে এই বিবাহবন্ধন। কিন্তু একবিবাহভিত্তিক পরিবারের যা মর্মবস্তু, অর্থাৎ যৌনসহবাস শুধুমাত্র একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা, তা তখনও পর্যন্ত চালু হয় নি। সেই বর্বরযুগেও স্ত্রীদের কাছে আনুগত্য দাবি করত পুরুষরা, আনুগত্যের অভাব ঘটলে কঠোর দণ্ডও দেওয়া হত নারীদের। কিন্তু নিজেদেরকে এই আনুগত্যের আওতার বাইরে রাখত পুরুষরা। অথচ এই বাধ্যবাধকতাটা দ্বিপাক্ষিক হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয়। আনুগত্যের ব্যাপারটাও তো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হোমারের আমলে গ্রীকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়—পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে নারীদের অবস্থাটা ছিল একটা বিচ্ছিন্নতা ও দাম্পত্যসূত্রে অধীনতার অবস্থা। তাদের অধিকারগুলোও ঠিক যথাযথ ছিল না। পুরুষদের অধিকার আর নারীদের অধিকারের মধ্যে ছিল বিপুল অসাম্য। হোমারের আমল থেকে শুরু করে পেরিক্লিসে-এর আমল পর্যন্ত গ্রীক পরিবারের ধারাবাহিক বিবর্তনের দিকে তাকালে একটা সুস্পষ্ট অগ্রগতি চোখে পড়ে। দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিবার। গ্রীক ও রোমানদের ঐ পরিবারের থেকে অনেকটাই অগ্রসর হয়ে এসেছে আধুনিক পরিবার, কেননা আধুনিক পরিবারের নারীদের সামাজিক অবস্থান যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছে। গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কটা ছিল অনেকটা বাবার সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্কের মত। আধুনিক পরিবারের স্ত্রীর মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত অধিকার প্রায় তার স্বামীর সমান হয়ে উঠেছে। একবিবাহভিত্তিক পরিবার প্রায় তিন হাজার বছর ধরে চালু আছে। এই তিন হাজার বছর ধরে এই

পরিবার অবিরাম উন্নত হয়ে উঠেছে ধাপে ধাপে। যতদিন পর্যন্ত নারী-পুরুষ সমানাধিকার না পায় এবং যতদিন পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের সমতা পুরোপুরি স্বীকৃতি না পায়, ততদিন পর্যন্ত এই পরিবার আরও উন্নত হয়ে চলতে বাধ্য। ঠিক এতটা পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও, জোড়বাঁধা পরিবারের অগ্রগতি সম্বন্ধেও একইরকম প্রমাণ আমাদের চোখে পড়ে। এই জোড়বাঁধা পরিবার শুরু হয়েছিল একটা অনুন্নত জায়গা থেকে আর শেষ হয়েছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারে এসে। এই বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার, কারণ আমাদের আলোচনার পক্ষে এগুলো অত্যন্ত জরুরী।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি সেই বিস্ময়কর দাম্পত্য ব্যবস্থার দিকে, যা মানব জাতির অস্তিত্বের সূচনা থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে এবং মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এসে পেঁছেছে এই সভ্যতার যুগেও। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঐ দাম্পত্য ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সমাজের নৈতিক উপাদানগুলো এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠার ফলে ব্যবস্থাটা কিভাবে একটু একটু করে বিলুপ্ত হয়েছে—তার সাহায্যে মানবসভ্যতার অগ্রগতির হার কিছুটা বুঝতে পারা যায়। পরিবার ও বিবাহের প্রতিটি ধারাবাহিক রূপ এই ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করার এক একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করেছে। এই ব্যবস্থাটা পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হওয়ার পরই গড়ে উঠতে পেরেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবার। ঐ প্রথম ধরনের পরিবার বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়েও দেখা গেছে। ঐ সময়ে এসে এই পরিবারের কাঠামো ভেঙে গড়ে ওঠে জোড়বাঁধা পরিবার।

এই দু'ধরনের পরিবার যখন গড়ে উঠছিল আর উন্নত হয়ে উঠছিল, তখনকার অবস্থা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা পেয়ে যাই এ থেকে। পরস্পরের থেকে পৃথক ধরনের এবং সমাজের একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল পরিবারের পাঁচটি ধারাবাহিক রূপ। ফলে, সেই ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন অন্তর্বর্তী রূপের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হতে হতে আজকের একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে এসে পেঁছনোর পথে এক একটা যুগ কতটা দীর্ঘ ছিল—সে সম্বন্ধেও আমাদের ধারণাটা অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানবজাতির জীবনে আর কোন প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এত উল্লেখযোগ্য ও ঘটনাবহুল নয়। এত সুদীর্ঘ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলাফলও এমনভাবে মূর্ত হয়ে ওঠেনি আর কোন প্রতিষ্ঠনের মধ্যে। এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং বিভিন্ন যুগের মধ্যে দিয়ে একে বর্তমান রূপে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরের মানসিক ও নৈতিক প্রচেষ্টার।

দলগত বিবাহ থেকে জোড়বাঁধা বিবাহের মধ্যে দিয়ে এক বিবাহের স্তরে এসে পেঁছনোর পথে তুরানির জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কোন বস্তুগত পরিবর্তন ঘটেনি। এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটি (যার মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্কগুলোই মূর্ত হয়ে উঠেছিল) একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছিল। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা মানুষের বংশধারার পক্ষে একেবারেই বেমানান হয়ে পড়ল, এমনকি একবিবাহের পক্ষে অমর্যাদাকরও হয়ে উঠল। যেমন মালয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অনুযায়ী লোকেরা তাদের ভাইয়ের পুত্রকে নিজের পুত্রই বলত, কারণ তার ভাইয়ের স্ত্রী ছিল তারও স্ত্রী ; বোনের পুত্রকেও তারা নিজের পুত্র-

বলত, কারণ বোনেরাও তাদের স্ত্রীই ছিল। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় তাদের ভাইয়ের পুত্ররা ঐ একই কারণে তাদেরও পুত্র হিসেবেই বিবেচিত হত, কিন্তু বোনেদের পুত্ররা বিবেচিত হত তাদের ভাগ্নে হিসেবে—কারণ গোত্রীয় সংগঠনে বোনেরা আর ভাইদের স্ত্রী হতে পারত না। ইরোকোয়াদের মধ্যে (যেখানে জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার চালু আছে) দেখা যায় যে লোকেরা এখনও তাদের ভাইয়ের ছেলেদেরকে নিজেদের ছেলেই বলে, যদিও ভাইয়ের স্ত্রী এখন আর তাদের স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হয় না। এইভাবে অনেক সম্পর্কই বিবাহের চালু রূপের সঙ্গে বেমানান হয়ে উঠেছে। যে-সব প্রথার মধ্যে থেকে এর উদ্ভব হয়েছে, সেইসব প্রথাকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে এই ব্যবস্থা। চালু বংশধারার সঙ্গে অবশ্য প্রথাগুলো অনেকটাই বেমানান হয়ে উঠেছে। সুপ্রাচীন জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার অবসান ঘাটানোর মত জোরদার কোন কারণ তখনও পর্যন্ত দেখা দেয় নি। তারপর সামনে এল একবিবাহপ্রথা। সভ্যতার কাছাকাছি পেঁছে যাওয়া আর্যদের কাছে এই প্রথাই ঐ সুপ্রাচীন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রেরণা হিসেবে কাজ করল। নিশ্চিত হয়ে উঠল সন্তানের পিতৃত্ব এবং উত্তরাধিকারের বৈধতা। একবিবাহ থেকে সৃষ্ট বংশধারার উপযোগী করে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সংস্কার ঘটানো আদৌ সম্ভব ছিল না। একবিবাহের সঙ্গে ঐ ব্যবস্থাটা ছিল পুরোপুরি বেমানান। তবে, হাতের কাছেই একটা সরল ও পরিপূর্ণ সমাধান ছিলই। তুরানিয় ব্যবস্থা বাতিল করা হল এবং কোন বিশেষ সম্পর্ককে সুনির্দিষ্ট করে তোলার জন্য তুরানিয় গোষ্ঠীগুলো যে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করত, সেই পদ্ধতি চালু করা হল। জ্ঞাতিত্বের সাধারণ দিকটার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ককে কতকগুলো নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত করা হল। যেমন তারা বলতে শুরু করল—ভাইপো, ভাইয়ের নাতি, কাকা, কাকার ছেলে ইত্যাদি। প্রতিটা নামই কোন-না-কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করত, আর তার সঙ্গে সম্পর্কটা বোঝা যেত ঐ নাম থেকেই। গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত ভাষী, জার্মান এবং কেল্টিক প্রভৃতি আর্য জাতিগুলোর মধ্যে এই ব্যবস্থারই প্রাচীন রূপটা চালু ছিল। হিব্রু ধর্মগ্রন্থের বংশলতিকা থেকে জানা যায় যে সেমিটিকদের মধ্যেও চালু ছিল এই ব্যবস্থাই। আর্য এবং সেমিটিক জাতিগুলোর মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কিছু কিছু অবশেষ (যেগুলোর কয়েকটার কথা আগেই বলা হয়েছে) ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তবে মোটের ওপর ঐ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছিল, আর তার বদলে চালু হয়েছিল বর্ণনাত্মক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা।

এই প্রতিপাদ্যগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া আর এগুলোকে সপ্রমাণ করার জন্য ক্রমানুসারে এই তিনটি ব্যবস্থা নিয়ে এবং যথাক্রমে এই তিনটি ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত তিন ধরনের পরিবার নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এগুলোর একটা থেকে আরেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সবকিছুর থেকে আলাদা করে নিয়ে বিচার করলে তার তেমন কিছু গুরুত্ব থাকে না। কারণ, যে-কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই গড়ে ওঠে অল্প কয়েকটা ধারণার ভিত্তিতে। ফলে, মানবসমাজের প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে বা সে ব্যাপারে কোনরকম আলোকপাত করতে পারে না সে। একদল

জ্ঞাতির পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ককে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা হলে স্বাভাবিকভাবেই উপনীত হতে হয় এই সিদ্ধান্তে। কিন্তু অনেকগুলো গোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার তুলনা করা হলে (এবং তা যদি একটা ঘরোয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে থাকে আর, সুদীর্ঘ-কাল ধরে চালু থেকে থাকে) তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার থেকে শুরু করে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর পর্যন্ত একের পর এক এ ধরনের মোট তিনটি জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা দেখা গেছে। ধরে নেওয়া যায় যে প্রতিটা ব্যবস্থাই নিজের নিজের আমলের পরিবারগুলোর মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্ককে অভিব্যক্ত করে। আর এই সম্পর্কগুলো থেকে আবার তৎকালীন বিবাহ ও পরিবারের রূপগুলোর কথা জানা যায়। অবশ্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অপরিবর্তিত থেকে গেলেও বিবাহ ও পরি-বারের রূপ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়ে থাকতেই পারে।

তাছাড়া, এইসব ব্যবস্থাগুলো আসলে সমাজের নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। সমাজের কাঠামোর ওপর গভীরভাবে প্রভাববিস্তারকারী কোন-না-কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবের মধ্যেই প্রতিটা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মূল নিহিত থেকেছে। মা এবং সন্তান, ভাই আর বোন, দিদিমা আর নাতি- নাতনী—এই সম্পর্কগুলো যে-কোন যুগেই সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যেত। কিন্তু বাবা আর সন্তান, ঠাকুর্দা আর নাতি-নাতনী—এই সম্পর্ক-গুলো একবিবাহ চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যেত না। দলগত বিবাহের যুগে বেশ কয়েকজন এইসব সম্পর্কের (অর্থাৎ বাবা আর সন্তান, ঠাকুর্দা আর নাতি-নাতনী) সমান দাবিদার হত। প্রাচীন সমাজের আদিমতম অবস্থায়ও এইসব প্রকৃত ও সম্ভাব্য সম্পর্কগুলোকে মানুষ বুঝতে পারত এবং এগুলোকে অভিব্যক্ত করার উপযোগী বিভিন্ন অভিধাও তারা নিশ্চয়ই উদ্ভাবন করেছিল। একদল জ্ঞাতির ক্ষেত্রে কিছু নাম এইভাবে অনেকদিন ধরে প্রয়োগ করে চলার ফলে একটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠা একান্তই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার রূপটা কেমন হবে, তা নির্ভর করত বিবাহের রূপের ওপর। যেখানে দলগতভাবে বিবাহ হত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইবোনদের মধ্যে, সেখানে পরিবারটা হত ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা হত মালয় ধরনের ব্যবস্থা। যেখানে বেশ কিছু বোনের দল-বদ্ধভাবে বিবাহ হত পরস্পরের স্বামীদের সঙ্গে এবং বেশ কিছু ভাইয়ের বিবাহ হত পর-স্পরের স্ত্রীদের সঙ্গে, সেখানে পরিবারটা হত দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর জ্ঞাতি-ত্বব্যবস্থাটা হত তুরানিয় ধাঁচের। যেখানে বিবাহ হয় কেবলমাত্র একজন নারীর সঙ্গে একজন পুরুষের এবং তাদের যৌন সহবাসও শুধুমাত্র পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেখানে পরিবারটা হয় একবিবাহভিত্তিক পরিবার আর জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা হয় আর্য ধাঁচের। অর্থাৎ, তিন ধরনের বিবাহের ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে এই তিন ধরনের জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা। একেক ধরনের বিবাহের আমলে বিভিন্ন লোকের মধ্যে সম্পর্কগুলো কেমন হয় বা হত, সেটাই ফুটে ওঠে এইসব ব্যবস্থার মধ্যে অর্থাৎ, এগুলো আপনা-আপনি গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে বিবাহের ভিত্তিতে; কাল্পনিক কোন ধ্যানধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে। প্রতিটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই এক একটা যুক্তিসম্মত এবং বাস্তবোচিত ব্যবস্থা। এগুলোর মধ্যে বিধৃত বিভিন্ন নিদর্শন অত্যন্ত মূল্য-

যান। এইসব নিদর্শন থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। প্রাচীন সমাজের অবস্থাটা ঠিক কেমন ছিল, তা একান্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে এগুলোর মধ্যে।

এই সব ব্যবস্থাগুলো মূলত দুটো পৃথক পৃথক রূপে বিভক্ত। একটা হচ্ছে 'শ্রেণীবিন্যাসকারী' ধারা, আর অপরটা হচ্ছে 'বর্ণনাত্মক' ধারা। প্রথম ধারার ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের কখনও নাম ধরে চিহ্নিত করা হয় না, তাদেরকে ভাগ করা হয় বিভিন্ন বর্গে। এই বিভাজন করার ব্যাপারে জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক খুব নিকট নাকি দূরসম্পর্কিত—তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। একই বর্গের সমস্ত ব্যক্তিকে সম্পর্কের একই অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। ফলে, কোন ব্যক্তির নিজের ভাইরা এবং তার বাবার ভাইয়ের ছেলেরা—সকলেই তার ভাই হিসেবে পরিগণিত হয়। তার নিজের বোনেরা এবং তার মায়ের বোনের মেয়েরা—সকলেই পরিগণিত হয় তার বোন হিসেবে। মালয় এবং তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় সম্পর্কের বিভাজনটা এ-রকমই ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের চিহ্নিত করা হয় সম্পর্কের প্রাথমিক সম্বোধন অনুসারে অথবা এ-রকম কিছু সম্বোধনের মিশ্রণ ঘটিয়ে। ফলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক একটা সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। যেমন, ভাইপো, কাকা, খুড়তুতো ভাই ইত্যাদি। একবিবাহ চালু হওয়ার দরুন যে-সব আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় পরিবারগুলো গড়ে উঠেছিল, তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা এ-রকমই ছিল। পরবর্তীকালে সম্বোধনের জন্য সাধারণ কিছু নাম উদ্ভাবনের দরুন সম্পর্কের কিছুটা শ্রেণীবিভাজন এদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপটা (যা আর্য এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়দের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট চেহারা নিয়েছিল) ছিল পুরোপুরিই বর্ণনাত্মক। এই দুটো ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কারণ হল—একটা ব্যবস্থা গড়েছিল দলগত বিবাহের ফল হিসেবে, আর অপর ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছে এক বিবাহের ফল হিসেবে।

আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় জাতিগুলোর মধ্যে বর্ণনাত্মক ব্যবস্থাটা একইরকম। কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসকারী ব্যবস্থার দুটো পৃথক পৃথক রূপ ছিল। প্রথমটা হচ্ছে মালয় ধরনের ব্যবস্থা, সময়ের বিচারে যা প্রাচীনতম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় ব্যবস্থা, যে দুটো মূলগতভাবে ছিল একই ধরনের। পূর্বতন মালয় ধরনের ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েই গড়ে উঠেছিল এই ব্যবস্থাগুলো।

যাবতীয় ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে যে নীতিগুলো, সেগুলোকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

সম্পর্ক দু'ধরনের হয়। প্রথমত, জ্ঞাতিত্ব বা রক্তসূত্রের সম্পর্ক; দ্বিতীয়ত, বিবাহসূত্রের সম্পর্ক। জ্ঞাতিত্বও দু'ধরনের হয়ে থাকে—একই পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব আর ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব। একই বংশের মধ্যে যারা পরস্পরের সঙ্গে জন্মসূত্রে সম্পর্কযুক্ত, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে বলা হয় একই পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব। যে-সব লোক একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট, কিন্তু যাদের মধ্যে জন্মসূত্রের কোন সম্বন্ধ নেই, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে বলা হয় ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব। বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় বিভিন্ন প্রথা অনুযায়ী।

বিষয়ের খুব গভীরে প্রবেশ না করেও সাধারণভাবে বলা চলে যে, যেখানে একবিবাহ চালু আছে সে-রকম প্রতিটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে একটা একই পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব এবং

বেশ কিছু ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব থাকতে বাধ্য। প্রথম সম্পর্কটা থেকেই সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় সম্পর্কটা। প্রতিটি ব্যক্তিই হচ্ছে একসারি জ্ঞাতিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। তার সঙ্গে সম্পর্কিত করে কিছু লোকের সম্পর্কগত অবস্থান নির্বাচিত হয়, আবার সে-ও কিছু জনের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত হয়। অবস্থানটা একই পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের ধারায়, এবং সেই ধারাটা গড়ে ওঠে উপর থেকে নিচের দিকে। তার আগে এবং পরে, অর্থাৎ ওপরে ও নিচে থাকে তার কিছু পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষ—বাবা, তার ছেলে, তার ছেলে এইসব লোকেদের সম্মিলনেই গড়ে ওঠে তার নিজস্ব পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের পুরুষ ধারা। এই প্রধান ধারা থেকে সৃষ্টি হয় কিছু সংখ্যক ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের পুরুষ ও স্ত্রী-ধারা। গোটা ব্যবস্থাটা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার জন্য মূল পরিবার-গত ধারণাটিকে এবং তার প্রথম পাঁচটি ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী-ধারাকে (বাবার দিকের এবং মায়ের দিকের) ধরে নিয়ে পর্যালোচনা করলেই চলে। সবক্ষেত্রেই পর্যালোচনা শুরু হবে মা-বাবার থেকে, তারপর ধরে নিতে হবে তাদের যে-কোন একজন সন্তানকে। এ-রকম পর্যালোচনায় অবশ্য পূর্বপুরুষ, ও উত্তরপুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই আলোচ্য ব্যক্তির জ্ঞাতিদের একটা ক্ষুদ্র অংশই মাত্র অন্তর্ভুক্ত হবে। ভিন্ন পরিবারভুক্ত জ্ঞাতিদের সমস্ত শাখাগুলোকে (ওপরের দিকে যেগুলোর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলে) খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু গোটা ব্যবস্থাকে বোঝার ব্যাপারে তা খুব একটা সাহায্য করবে না।

পুরুষ-ধারায় ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারিটা গড়ে ওঠে নিজের ভাই আর তার বংশধরদের নিয়ে। স্ত্রী-ধারায় এই সারিটা গড়ে ওঠে নিজের বোন আর তার বংশধরদের নিয়ে। বাবার দিকে পুরুষ-ধারায় ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারিতে থাকে বাবার ভাই আর তার বংশধররা। বাবার দিকে স্ত্রী-ধারায় এই সারিতে থাকে বাবার বোন আর তার বংশধররা। মায়ের দিকে পুরুষ-ধারায় এই দ্বিতীয় সারিটা গড়ে ওঠে মায়ের ভাই আর তার বংশধরদের নিয়ে। মায়ের দিকে স্ত্রী-ধারায় এই সারিতে থাকে মায়ের বোন আর তার বংশধররা। বাবার দিকে পুরুষ-ধারায় ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারিটা গড়ে ওঠে ঠাকুর্দার ভাই আর তার বংশধরদের নিয়ে, বাবার দিকে স্ত্রী-ধারায় এই সারিতে থাকে ঠাকুর্দার বোন আর তার বংশধররা। মায়ের দিকে এই দুটো সারিতে থাকে যথাক্রমে দিদিমার ভাই ও বোন এবং তাদের বংশধররা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ধারাটা ঘুরে গেছে মায়ের দিকে—এটা লক্ষ্য করা দরকার। ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের পুরুষ ও স্ত্রী-ধারার চতুর্থ সারিটা শুরু হয় যথাক্রমে প্রপিতামহের ভাই ও বোনের থেকে, এবং অন্যদিকে প্রমাতামহীর ভাই ও বোনের থেকে। পঞ্চম সারিটা শুরু হয় একদিকে প্রপিতামহের বাবার ভাই ও বোনের থেকে, অপরদিকে প্রমাতামহীর বাবার ভাই ও বোনের থেকে। শেষের এই দুটো ধারার প্রতিটা শাখার সঙ্গে জ্ঞাতিত্বটা তৃতীয় ধারাটির নিয়ম অনুযায়ীই গড়ে ওঠে। এই পাঁচটা ধারার সদস্যারা এবং নিজের পরিবার—এদেরকে নিয়েই গড়ে ওঠে আমাদের মূল জ্ঞাতিবর্গ। অর্থাৎ, জ্ঞাতিদেরকে আমরা যতদূর পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারি, তার সীমার মধ্যে এরাই পড়ে।

জ্ঞাতিত্বের এই বিভিন্ন ধারাগুলো সম্বন্ধে আরও কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

আমার যদি বেশ কয়েকজন ভাই ও বোন থাকে, তাহলে তারা আর তাদের বংশধররা মিলে এক একটা পৃথক পৃথক ধারা গড়ে তোলে। আর সেইসঙ্গেই পুরুষ ও স্ত্রী-ধারা অনুসারে আমার প্রথম জ্ঞাতিত্ব ধারাগুলোও গড়ে ওঠে। একইভাবে আমার বাবা আর মায়ের ভাই ও বোনেরা আর তাদের বংশধররা মিলে গড়ে তোলে এক একটা পৃথক পৃথক ধারা। আর এদের সকলকে নিয়েই গড়ে ওঠে আমার দ্বিতীয় জ্ঞাতিত্ব ধারার দুটো ভাগ—বাবার দিকের আর মায়ের দিকের। এইসব সম্পর্কের মধ্যে আবার চারটি প্রধান শাখা থাকে—দুটো পুরুষ-শাখা ও দুটো স্ত্রী-শাখা। জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় ধারার বিভিন্ন শাখাগুলো যদি পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারে, তাহলে তার মধ্যে থেকে সৃষ্টি হয় পূর্বপুরুষদের চারটি সাধারণ বিভাগ এবং আটটি প্রধান শাখা। এই প্রতিটা শাখার সদস্যসংখ্যা জ্ঞাতিত্বের প্রতিটা ধারায় একই অনুপাতে বেড়ে চলে।

এক কথায়, জ্ঞাতিত্বের অজস্র ভাগ, অজস্র শাখা, এবং এ-সবের মধ্যে থাকে বিপুল সংখ্যক জ্ঞাতি। এই সমস্ত জ্ঞাতিদের ঠিকঠাকভাবে বিন্যস্ত করা ও তাদের যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার যে পদ্ধতিটা প্রত্যেককে পৃথক পৃথক রাখতে পেরেছে আর গোটা ব্যাপারটাকে সম্ভবপর করে তুলেছে, সেই পদ্ধতির উদ্ভাবনটা কিন্তু আদৌ কোন সাদামাটা সাফল্য নয়। রোমান আইনপ্রণেতারা এ কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছিলেন এবং ইউরোপের প্রধান জাতিগুলো তাঁদের সৃষ্ট পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিল। এই পদ্ধতির আশ্চর্য সরলতাটা আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।[১] বিভিন্ন জ্ঞাতিদের নামের বিন্যাসটা যথাযথ করে তোলা খুবই দুরূহ কাজ ছিল। একটা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া এ কাজটা করে ওঠা বোধহয় কখনোই সম্ভব হত না। ঐ জরুরী প্রয়োজনটা ছিল সম্পত্তির উত্তরাধিকার সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য বংশ-ধারার একটা যথাযথ প্রণালী গড়ে তোলা।

নতুন পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথমেই দরকার ছিল বাবার ভাই-বোন আর মায়ের ভাই-বোনদের নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত করে তাদের পার্থক্যটা সুনিশ্চিত করা। পৃথিবীর অল্প কয়েকটা ভাষাতেই মাত্র এই পৃথকীকরণটা সম্ভবপর হয়েছিল। রোমানরা বাবার ভাই আর বোনকে যথাক্রমে প্যাট্রুস (patruus) ও অ্যামিতা (amita) বলতে শুরু করে, এবং মায়ের ভাই আর বোনের নামকরণ করে যথাক্রমে আভাঙ্কুলাস (ovunculus) ও ম্যাটার্টেররা (motertera)। এই নামগুলো উদ্ভাবিত হওয়ার পর জ্ঞাতিদের চিহ্নিত করা সংক্রান্ত রোমানদের উন্নত পদ্ধতিটা

১। "Pandects", tib. xxxviii, title x. De gradibus et ad finibus et nominibus eorum : and "Institutes of Justinian", lib. title vi. De gradibus cognationem.

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে।[১] আর্স, স্ক্যান্ডিনেভিয় এবং স্লাভরা বাদে আর্যদের অন্যান্য শাখার লোকেরা এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করেছিল।

তুরানিয় পদ্ধতি পরিত্যক্ত হওয়ার পর আর্যরা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বর্ণনাত্মক রূপটাই গ্রহণ করে (যেমন আর্সরা)। স্ববংশগত এবং প্রথম পাঁচটা জ্ঞাতি ধারার অন্তর্গত প্রত্যেকটা সম্পর্ক (যাদের মোট সদস্যসংখ্যা একশ বা ততোধিক হত) পরস্পরের থেকে পৃথক পৃথক হত। এই প্রত্যেকটা সম্পর্ককে চিহ্নিত করার জন্য সমসংখ্যক নাম বা সাধারণ কিছু অভিধা উদ্ভাবন করে নিতে হত।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, শ্রেণীবিভাজনমূলক এবং বর্ণনাত্মক এই দুটো পদ্ধতি আসলে বর্বর ও সভ্য জাতিগুলোর মধ্যেকার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা হিসেবেই সামনে আসে। বিবাহ এবং পরিবারের এই রূপগুলো অগ্রগতির যে নিয়মের অনুসরণ করেছে, সেই অনুযায়ী এই পরিণতিটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

বিভিন্ন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে মোটেই যথেচ্ছভাবে গ্রহণ করা, পরিবর্তিত করা বা পরিত্যাগ করা হয় নি। যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমাজের অবস্থাকে ব্যাপকভাবে পাল্টে দিয়ে গেছে, সেইসব ঘটনার সঙ্গে এগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কোন একটা বিশেষ ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা যদি বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে, সেই ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন সম্পর্কের নাম এবং তা ব্যবহারের পদ্ধতি যদি সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে স্বাভাবিক কারণেই সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে খুব ধীরে ধীরে। প্রতিটি ব্যক্তিই কিছু জ্ঞাতিত্বসম্পর্কের কেন্দ্রস্বরূপ, কাজেই বিদ্যমান ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে ও উপলব্ধি করতে প্রত্যেকেই বাধ্য। এইসব সম্পর্কের যে-কোন একটার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানোও একান্ত দুঃসাধ্য। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার স্থায়িত্বমুখী এই প্রবণতা আরও জোরদার হয়ে ওঠে একটা বিশেষ কারণে। এই ব্যবস্থাগুলো টিকে থাকে বিভিন্ন রীতির সাহায্যে, কোন আইনী হস্তক্ষেপের সাহায্যে নয়; এগুলো কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলা হয় না, এগুলো গড়ে ওঠে স্বাভাবিক বিকাশের ফল হিসেবেই। কাজেই এইসব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য এমন কোন কারণ বা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয় যা ঐ-সব রীতির মতই সার্বজনীন। এখানে প্রতিটি ব্যক্তিই ঐ ব্যবস্থার অংশীদার এবং বংশধররা সঞ্চারিত হয় রক্তসূত্রে। অর্থাৎ সমাজের যে-সব অবস্থার মধ্যে ঐ ব্যবস্থাগুলোর জন্ম হয়েছিল, সেই অবস্থাগুলো পরিবর্তিত বা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেও সুদীর্ঘকাল ধরে ব্যবস্থাগুলোকে টিকিয়ে রাখার মত জোরদার কিছু প্রভাব সমাজের মধ্যে থাকতই। স্থায়ীত্বের এই উপাদানগুলোই আমাদের সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। তাছাড়া, এই উপাদানগুলোর মধ্যেই রয়ে গেছে প্রাচীন

১। ইংরিজির আর্ট শব্দটা এসেছে 'আমিতা' থেকে আর আঙ্কল শব্দটা এসেছে 'আভাঙ্কুলাস' থেকে। 'আভাস' (avus) মানে হচ্ছে ঠাকুর্দা। তার সঙ্গে ছোটবাচক শব্দটা যোগ করে দাঁড়িয়েছে আভাঙ্কুলাস। অর্থাৎ শব্দটার অর্থ হচ্ছে 'ছোট ঠাকুর্দা।' ম্যাটার্টেরা শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে সম্ভবত 'ম্যাটার' (mater) আর 'অলটেরা' (altera) থেকে। অর্থাৎ শব্দটা 'আরেকজন মা'-এর সমার্থক।

সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এগুলো না থাকলে ঐ চিত্রটা মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যেত।

তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মত জটিল একটা ব্যবস্থার কাঠামোটা বিভিন্ন জাতি ও মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একেবারে একই চেহারা নিয়ে গড়ে উঠেছিল—এমনটা ধরে নেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার ছোটখাট নানান বিষয়ে ফারাক ছিল। তবে এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো মূলত সর্বত্র একই। দক্ষিণ ভারতের তামিলদের আর নিউইয়র্কের সেনেকা-ইরোকোয়াদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা (উভয়ের মধ্যেই প্রায় দুশোটা করে সম্পর্ক দেখা যায়) আজও একই রকম। এই সাদৃশ্যটা আসলে সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যুক্তি বিদ্যা প্রয়োগেরই ফল, যার সমতুল কোন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ব্যবস্থার একটা পরিবর্তিত রূপেরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যা গড়ে উঠেছে একটা স্বতন্ত্র চেহারা নিয়ে। এই ব্যবস্থাটা দেখা যায় উত্তর ভারতের হিন্দি, বাংলা, মারাঠী ও অন্যান্য ভাষাভাষীদের মধ্যে। আর্য আর তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই ব্যবস্থাটা। সুসভ্য ব্রাহ্মণরা একটা বর্বর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়েছিল এবং নিজেদের আদি ভাষার বদলে গ্রহণ করেছিল হিন্দি, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি চলিত ভাষা। এইসব ভাষার মধ্যে আদিবাসীদের কথ্য ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামোটা মূর্ত হয়ে উঠেছিল আর এ গুলোর শব্দ ভাণ্ডারের নব্বই শতাংশই এসেছিল সংস্কৃত ভাষা থেকে। এর ফলে তাদের দুটো জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল একবিবাহ বা জোড়বাঁধা বিবাহের ভিত্তিতে, আর অপর ব্যবস্থাটার ভিত্তি ছিল দলগত বিবাহ। ফলস্বরূপ গড়ে ওঠে একটা মিশ্র ব্যবস্থা। সংখ্যায় বেশি ছিল আদিবাসীরাই। তারা ঐ মিশ্র ব্যবস্থার মধ্যে তুরানিয় ব্যবস্থার একটা আদল এনে দেয়। আর সংস্কৃত ভাষাভাষীরা নিয়ে আসে এমন কিছু পরিবর্তন যার ফলে একবিবাহ প্রথা টিকে থাকার সুযোগ পায়। স্লাভ গোষ্ঠীর উদ্ভবও সম্ভবত বিভিন্ন জাতির এই ধরনের মিশ্রণের ফলেই ঘটেছিল। বন্যতা আর বর্বরতার যুগে যে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার দুটো রূপ দেখা গেছে এবং বহু পরবর্তী সভ্যতার যুগে এসেও যে ব্যবস্থা টিকে থাকতে পেরেছে একটা তৃতীয় ও পরিবর্তিত রূপে, তার মধ্যে স্থায়িত্বের উপাদানটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। এই ব্যাপারটা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

বহুবিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পিতৃপ্রধান পরিবার নিয়ে আলোচনা তেমন কোন প্রয়োজন নেই। এই পরিবার খুবই অল্পকাল টিকে ছিল এবং মানুষের ইতিহাসে তেমন কোন প্রভাব রেখে যেতে পারে নি।

বন্য ও বর্বরদের পারিবারিক জীবন যতটা মনোযোগ দাবি করে, বিষয়টার প্রতি ততটা মনোযোগ কখনোই দেওয়া হয় নি। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জোড়াবাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার চালু ছিল। কিন্তু তারা বসবাস করত যৌথ-বাসগৃহে এবং সেখানে জীবনধারণের ক্ষেত্রে সাম্যবাদীপ্রথানুসরণ করত। দলগত ও ভাইবোন বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবারগুলোর সদস্যসংখ্যা আরও বেশি হত এবং অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ বসবাস করত একই বাসগৃহে। ভেনিজুয়েলা উপকূল অঞ্চলের

গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্ভবত দলগত বিবাহই চালু ছিল। এরা গম্বুজাকার বাড়িতে বাস করত। প্রতিটা বাড়িতে থাকত একশ ষাটজন করে মানুষ।[১] স্বামী-স্ত্রীরা দলবদ্ধ-ভাবে বসবাস করত একই বাড়িতে এবং সাধারণত একই কামরায়। এ থেকে যুক্তিসম্মত ভাবেই অনুমান করা চলে যে বন্যতার পর্যায়ে পারিবারিক জীবনযাপনের এই ধরনের পদ্ধতি প্রায় সর্বত্রই চালু ছিল।

জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার এসব ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হবে। বিবাহ ও পরিবারের যে-সব রূপের মধ্যে থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এই ব্যবস্থাগুলো, সেইসব রূপের ভিত্তিতেই আলোচনা করব আমরা। প্রতিটা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে ঐ ব্যবস্থাগুলোর জন্মদাতাস্বরূপ বিবাহ ও পরিবারের রূপগুলোর পূর্ববর্তী অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যাবে। যে-সব প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ধারাবাহিক রূপের মধ্যে দিয়ে পরিবারের বিকাশে সাহায্য করেছে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা ধারাবাহিক ক্রমবিন্যাস উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব এই আলোচনার শেষ পরিচ্ছেদে। মানবজাতির প্রথম দিককার অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও অত্যন্ত সীমিত। কাজেই আমরা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বা লক্ষণগুলোর ভিত্তিতেই আলোচনা করার চেষ্ট করব। যে ক্রমবিন্যাসটা উপস্থাপিত করা হবে, সেটা কিছুটা কল্পনামূলক। কিন্তু এর পিছনে যথেষ্ট প্রমাণও আমাদের হাতে আছে। ভবিষ্যৎ জাতিতাত্ত্বিক গবেষণাই এ কাজকে সম্পূর্ণ করে তুলবে।

১। হেরেরা, "হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", i, ২১৬, ২১৮, ৩৪৮.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার

ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারেরর অস্তিত্বের ব্যাপারে ঐ পরিবার সৃষ্টি হওয়াটাকেই প্রমাণ হিসেবে দাখিল করলে চলবে না। তারজন্য আরও কিছু প্রমাণ দরকার। এটাই হচ্ছে পরিবারের প্রথম এবং প্রাচীনতম রূপ। আজকের দিনে সবথেকে নিম্নস্তরের বন্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই পরিবার আর দেখা যায় না। সমাজের যে অবস্থার মধ্যে থেকে মানবজাতির সবথেকে অনুন্নত অংশের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অবস্থার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল এই পরিবার। ঐতিহাসিক যুগেও বর্বরদের মধ্যে এবং এমনকি সভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও কখনো কখনো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের কথা জানা গেছে। কিন্তু দলগতভাবে কিছু ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ হওয়া আর সেই বিবাহেরই সমাজ-ব্যবস্থার বনিয়াদস্বরূপ হয়ে ওঠার থেকে এইসব বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো একেবারে আলাদা ধরনের। পলিনেশিয়া, পাপুয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ায় আজও প্রায় আদিম অবস্থায় থাকা কিছু বন্য গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ভাইবোনের বিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগের সমাজের অবস্থা যেমনটা হওয়া উচিত, তার থেকে এরা অগ্রসর হয়ে এসেছে। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে মানুষের মধ্যে এ ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব যে কখনো সত্যিই ছিল, তার কী প্রমাণ আছে? এ ব্যাপারে যে-কোন প্রমাণকেই চূড়ান্ত প্রমাণ হতে হবে, নাহলে প্রতিপাদ্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এই প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় একটা জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা-ব্যবস্থার মধ্যে, যা তার জন্মদাতা ঐ বিবাহপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেও শত শত বছর ধরে টিকে থেকেছে। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় যে ঐ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় এধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছিলই।

এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা হচ্ছে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার যে-সব সম্পর্ক দেখা যায়, তা একমাত্র ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেই গড়ে ওঠা সম্ভব। আর এধরনের সম্পর্ক থাকলে ঐ পরিবারের অস্তিত্বও থাকতে বাধ্য। তাছাড়া, এইসব সম্পর্ক থেকে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় যে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবারই চালু ছিল।

আমাদের মূল বক্তব্যগুলোই ব্যাখ্যা করার জন্য এবার আমরা আজপর্যন্ত আবিষ্কৃত এই প্রাচীনতম জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটির অন্তর্গত বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। আর আমরা আজপর্যন্ত যত ধরনের পরিবারের কথা জানতে পেরেছি, তার মধ্যে এই ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারই সবথেকে প্রাচীন।

জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকতে পেয়েছে বলেই প্রাচীন সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ বিবরণটা আজপর্যন্ত বিদ্যমান আছে। যেমন, আর্যদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা প্রায় তিনহাজার বছর ধরে টিকে আছে কোনরকম মৌলিক পরিবর্তন

ছাড়াই। একবিবাহভিত্তিক পরিবার (এই পরিবারের সম্পর্কগুলোই নির্ধারণ করেছে আর্যদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা) যদি আরও এক লক্ষ বছর টিকে থাকে, তাহলে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাও ততদিন টিকে থাকবে তার সঙ্গে। এই ব্যবস্থা একবিবাহের আওতাভুক্ত সম্পর্কগুলোকেই নির্ধারণ করেছে, কাজেই একবিবাহভিত্তিক পরিবার যতদিন তার বর্তমান রূপে টিকে থাকবে, ততদিন ঐ ব্যবস্থারও কোন পরিবর্তন ঘটবে না। আর্য জাতিগুলোর মধ্যে কোন নতুন ধাঁচের পরিবার সৃষ্টি হলেও যতদিন পর্যন্ত না সেই পরিবার সর্বত্র চালু হয়, ততদিন পর্যন্ত জ্ঞাতিত্বের বর্তমান ব্যবস্থাটির কোন অদল-বদল ঘটতে পারে না। আর ঐ নতুন ধরনের পরিবার যদি একবিবাহের থেকে মূলগতভাবে আলাদা ধরনের না হয়, তাহলে সেটি বর্তমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটালেও একে পুরোপুরি বাতিল করে দিতে পারবে না। এই ব্যবস্থার পূর্ববর্তী তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং তার আগেকার মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের সঙ্গেই জন্ম নিয়েছিল মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে টিকে ছিল এই ব্যবস্থা। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের উদ্ভব ঘটার পরেও এ ব্যবস্থা টিকে ছিল বহুদিন। তারপর সমাজে গোত্রীয় সংগঠনের অভ্যুদয় ঘটে, তার সঙ্গেই মাথা তোলে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। এই তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে মালয়ী জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার অবসান ঘটায়।

পলিনেশিয়ার অধিবাসীরা মালয়ী বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত। এদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা বলা হলেও মূল মালয়ের অধিবাসীরা কিন্তু নিজেদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছে। হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে এবং পলিনেশিয়ার অন্য কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে এমন এক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা আজও চালু আছে (যার বিবরণ সারণীতে পাওয়া যাবে), যাকে আমাদের জানা প্রাচীনতম জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই ব্যবস্থার বিশিষ্টতম প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় হাওয়াইয়ান আর রোতুমানদের[১]। এটাই হচ্ছে শ্রেণীবিভাজন-মূলক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সরলতম এবং প্রাচীনতম রূপ। পরবর্তীকালে যে আদিম রূপটির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা, তার প্রকৃত চেহারাটাও বোঝা যায় এ থেকে।

এটা স্পষ্ট যে মালয়ী ব্যবস্থাটা অন্য কোন বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট হয় নি, কেননা এই ব্যবস্থার পূর্ববর্তী কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কথা আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাথমিক সম্পর্কগুলোকেই স্বীকার করা হয়। এ-রকম সম্পর্ক সংখ্যায় মোট পাঁচটা। এ ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করা হয় না। নিকট ও দূরসম্পর্কীয় সমস্ত জ্ঞাতিদের পাঁচটা

১। রোতুমানদের কথা এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। রোতুমায় বসবাসকারী মেথডিস্ট মিশনারি রেভারেণ্ড জন অস্বোর্ন এদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে এই বিবরণ আমায় কাছে পাঠিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি অঞ্চলের বাসিন্দা রেভারেণ্ড লোরিমার ফিসন।

বর্গে ভাগ করা হয়। ব্যক্তি নিজে, তার ভাইবোনেরা এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির ও আরও দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি ভাইবোনদের নিয়ে গড়ে ওঠে প্রথম বর্গটা। এরা সকলেই ঐ ব্যক্তির ভাই বা বোন হিসেবে স্বীকৃত হয়। এখানে 'জ্ঞাতি ভাইবোন' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের অর্থে, কারণ পলিনেশিয়ায় এই সম্পর্কটাই অজানা। সম্পর্কের দ্বিতীয় বর্গটা গড়ে ওঠে ঐ ব্যক্তির মা-বাবা, তাঁদের ভাইবোন এবং তাঁদের প্রথম, দ্বিতীয় ও আরও দূরে সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভাইবোনদের নিয়ে। এরা সকলেই ঐ ব্যক্তির মা অথবা বাবা হিসেবে বিবেচিত হয়। তৃতীয় বর্গে থাকে ঐ ব্যক্তির বাবার দিকের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আর মায়ের দিকের দাদু-দিদিমা এবং এঁদের সমস্ত ভাইবোন ও জ্ঞাতি ভাইবোনেরা। এরা সকলেই ঐ ব্যক্তির ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বা দাদু-দিদিমা হিসেবে গণ্য হয়। চতুর্থ বর্গে থাকে ঐ ব্যক্তির ছেলেমেয়েরা আর তাদের সমস্ত জ্ঞাতি ভাইবোনেরা। এরা সকলেই তার ছেলেমেয়ে হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐ ব্যক্তির নাতি-নাতনী আর তাদের সমস্ত জ্ঞাতি ভাইবোনদের নিয়ে গড়ে ওঠে পঞ্চম বর্গটা। এরা সকলেই তার নাতি-নাতনী হিসেবে গণ্য হয়। তাছাড়া, একই বর্গের সমস্ত ব্যক্তি বিবেচিত হয় পরস্পরের ভাই বোন হিসেবে। এইভাবে যে-কোন ব্যক্তির সমস্ত জ্ঞাতিরা পাঁচটা বর্গে বিন্যস্ত থাকে। একই বর্গের প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে একই সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ থাকে। মালয়ী ব্যবস্থার সম্পর্কের এই পাঁচটা বর্গের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কেননা চীনাদের "নয় বর্গের সম্পর্ক"-এর মধ্যেও এই একই বিন্যাস দেখা যায়। চীনারা শুধু পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে দুটি আর উত্তর-পুরুষদের দুটি বর্গ বাড়িয়ে নিয়েছে (এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে)। দুটো ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা মৌলিক সম্পর্ক আছে, তা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না।

হাওয়াইয়ান ভাষায় বাবার বাবা-মাকে বা মায়ের বাবা-মাকে বলা হয় 'কুপুনা', মা-বাবাকে বলা হয় 'মাকুয়া', সন্তানদের বলা হয় 'কাইকি' আর নাতি-নাতনীদের বলা হয় 'মুপুনা'। এ গুলোর মধ্যে পুরুষবাচক নামগুলোর সঙ্গে যোগ করা হয় 'কানা', শব্দটা, আর স্ত্রীবাচক নামগুলোর সঙ্গে 'ওয়াহিনা' শব্দটা। যেমন, 'কুপুনা কানা' বলতে বোঝায় ঠাকুর্দা বা দাদুকে, আর 'কুপুনা ওয়াহিনা' মানে হচ্ছে ঠাকুমা বা দিদিমা। এই সম্বোধনগুলো আমাদের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বা দাদু-দিদিমার সমতুল। এই সম্পর্কগুলোই ঐ-সব সম্বোধনের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। পূর্বপুরুষ এবং উত্তর পুরুষদের সঙ্গে যে সম্পর্কগুলোর কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলোর আরও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সম্পর্কগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হলে সংখ্যাবাচক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন, প্রথম কুপুনা কানা, দ্বিতীয় কুপুনা ওয়াহিনা ইত্যাদি। তবে সাধারণত ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বা দাদু-দিদিমার পূর্ববর্তী সকলকেই বলা হয় কুপুনা আর নাতি-নাতনীর পরবর্তী সকলকেই বলা হয় নুপুনা।

ভাইবোনের সম্পর্কের দুটো রূপ—বড় আর ছোট। এ দুটো বোঝানোর জন্য আলাদা আলাদা অভিধাও আছে। তবে এগুলো খুব পূর্ণাঙ্গ আকার নিতে পারে নি। হাওয়াইয়ান ভাষায় ব্যাপারটা এ-রকম :

ছোট ভাইরা বড় ভাইকে বলে 'কাইকুয়ানা', ছোট বোনরা বড় ভাইকে বলে

'কাইকুনানা'।

ছোট ভাইকে বড় ভাইরা বলে 'কাইকাইনা', ছোট ভাইকে বড় বোনেরা বলে 'কাইকুনানা'।

বড় বোনকে ছোট ভাইরা বলে 'কাইকুওয়াহিনা', বড় বোনকে ছোট বোনেরা বলে 'কাইকুয়ানা'।

ছোট বোনকে বড় ভাইরা বলে 'কাইকুওয়াহিনা', ছোট বোনকে বড় বোনেরা বলে 'কাইকাইনা'।

দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষ তার বড় ভাইকে বলে কাইকুয়ানা, আবার একজন নারীও তার বড় বোনকে ঐ নামেই ডাকে। একজন পুরুষ তার ছোট ভাইকে বলে কাইকাইনা, আবার একজন নারীও তার ছোট বোনকে ঐ নামেই ডাকে। অর্থাৎ এই সম্বোধনগুলো হচ্ছে উভয়লিঙ্গবাচক। কারেনদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পিছনে যে ভাবনা কাজ করেছে, এর পিছনেও সেই একই ভাবনার অস্তিত্ব চোখে পড়ে। অর্থাৎ জন্ম-সূত্রে কে বড় কে ছোট, তা চিহ্নিত করার ভাবনা।[১] বড় আর ছোট বোনদের সম্বোধন করার জন্য পুরুষরা একই শব্দ ব্যবহার করে, আবার বড় আর ছোট ভাইদের সম্বোধন করার জন্য নারীরাও একই শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষদের ক্ষেত্রে তাদের বড় ভাই আর ছোট ভাইদের আলাদা করা হয়, কিন্তু তাদের বোনেদের ব্যাপারে এ-রকম কোন ভাগাভাগি করা হয় না। আবার নারীদের ক্ষেত্রে তাদের বড় বোন আর ছোট বোনদের আলাদা করা হয়, কিন্তু তাদের ভাইদের ব্যাপারে এ-রকম কোন ভাগাভাগি করা হয় না। এইভাবে দু প্রস্থ সম্বোধন সৃষ্টি হয়েছে, যার এক প্রস্থ ব্যবহার করে পুরুষরা, আর এক প্রস্থ ব্যবহার করে নারীরা। পলিনেশিয়ার কয়েকটা গোষ্ঠীর মধ্যেও এই রীতি চালু আছে।[২] বন্য এবং বর্বর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ককে প্রায় কখনোই বিমূর্তভাবে দেখা হয় না।

পাঁচ ধরমের জ্ঞাতিত্বই এই ব্যবস্থার মর্মবস্তু। তবে এর মধ্যেও এমন কিছু উল্লেখ-যোগ্য বিষয় আছে যার জন্য জ্ঞাতিত্বের প্রথম তিনটি সারি সম্বন্ধে বিস্তৃত চিত্রটা উপস্থাপিত করা দরকার। এগুলো উপস্থাপিত করা গেলে আপন ও জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভাইবোনদের দলবদ্ধ অন্তর্বিবাহের সঙ্গে এ ব্যবস্থার সংযোগটা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারি: কোন হাওয়াইয়ান পুরুষের ভাইয়ের সন্তানরা তারও সন্তান। এরা প্রত্যেকেই তাকে বাবা বলে ডাকে। এদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী। এরা তাকে ঠাকুর্দা বা দাদু বলেই ডাকে।

এ পুরুষটির বোনের সন্তানরাও তার সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়। এরাও তাকে বাবা বলে ডাকে। এদের সন্তানরা তার নাতি-নাতনী। এরাও তাকে ঠাকুর্দা বা দাদু বলেই ডাকে। কোন নারীর ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সম্পর্কগুলো উভয় শাখায় একইরকম থাকে, শুধু তাকে ডাকা হয় মা বলে অথবা ঠাকুমা বা দিদিমা বলে।

১। সিস্টেমস্ অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি", পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৪৫.

২। ঐ, পৃঃ ৫২৫, ৫৭৩.

এইসব ছেলে-মেয়ের স্ত্রী ও স্বামীরা ঐ ব্যক্তিটির পুত্রবধূ বা জামাই হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সম্বোধনগুলো উভয়লিঙ্গবাচক, শুধু তার সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে পুরুষ বা স্ত্রী-বাচক পদ জুড়ে দেওয়া হয়।

জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারি : কোন ব্যক্তির বাবার ভাইরাও তার বাবা এবং তারাও তাকে নিজেদের ছেলে বা মেয়ে বলেই ডাকে। তাদের সন্তানরা ঐ ব্যক্তির বড় বা ছোট ভাইবোন হিসেবেই পচিত হয়। এই ভাইবোনদের সন্তানরা ঐ ব্যক্তিরও সন্তান। এদের সন্তানরা আবার তার নাতি-নাতনী। এরা প্রত্যেকেই তাকে যথাযথ নামে ডেকে থাকে। ঐ ব্যক্তির বাবার বোন তার মা হিবেই গণ্য হয়। তার সন্তানরা পরিচিত হয় ঐ ব্যক্তির বড় বা ছোট ভাইবোন হিসেবে। তাদের সন্তানরা হচ্ছে তারও সন্তান। এদের সন্তানরা বিবেচিত হয় তার নাতি-নাতনী হিসেবে।

একইভাবে ঐ ব্যক্তির মায়ের ভাইরা হচ্ছে তার বাবা, তাদের ছেলেমেয়েরা তার ভাইবোন, তাদের সন্তানরা তারও সন্তান এবং এই শেষোক্তদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি নাতিনী। আবার তার মায়ের বোনেরাও হচ্ছে তার মা, তাদের ছেলেমেয়েরা তার ভাই বোন, তাদের সন্তানরা তারও সন্তান এবং এই শেষোক্তদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী। কোন নারীর ক্ষেত্রেও এই সমস্ত শাখার সকলের সঙ্গে সম্পর্কটা একইরকম থাকে।

এইসব আপন ও জ্ঞাতিভাইদের স্ত্রীরা ঐ ব্যক্তিরও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। এইসব স্ত্রীদের মধ্যে কাউকে ডাকার সময় সে নিজের স্ত্রীকে ডাকার সম্বোধনই ব্যবহার করে থাকে। এইসব স্ত্রীদের স্বামীরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ভগ্নীপতি। কোন নারীর ক্ষেত্রে তার সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিবোনদের স্বামীরা বিবেচিত হয় তারও স্বামী হিসেবে। ঐ-সব স্বামীদের মধ্যে কাউকে ডাকার সময় সে নিজের স্বামীকে ডাকার সম্বোধনই ব্যবহার করে থাকে। এই সব স্বামীদের স্ত্রীরা হচ্ছে ঐ নারীটির বৌদি।

জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারি : এই সারির পুরুষ-ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির ঠাকুর্দার ভাইও তার ঠাকুর্দা, তার সন্তানরা ঐ ব্যক্তির বাবা ও মা, তাদের সন্তানরা তার বড় বা ছোট ভাইবোন, এদের সন্তানরা তারও সন্তান এবং ঐ শেষোক্তদের সন্তানরা তার নাতি-নাতনী। আবার, ঠাকুর্দার বোন হচ্ছে তার ঠাকুমা এবং তার সন্তান ও বংশধরদের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কটা বরাবর একইভাবে নির্ধারিত হয়।

ঐ ব্যক্তির দিদিমার ভাই হচ্ছে তার দাদু, দাদুর বোন হচ্ছে তার দিদিমা, এবং তাদের উভয়ের সন্তান ও বংশধরদের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও বরাবর পূর্বোল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়।

এই তৃতীয় সারির বৈবাহিক সম্পর্কে নিয়মটাও ঠিক দ্বিতীয় সারির মতই। এর ফলে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ মানুষের সংখ্যাটা বেশ বড় একটা চেহারা নিয়ে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের সম্পর্কটা যত দূরেই হোক না কেন, ব্যবস্থাটা একইরকম থাকে। তাই জ্ঞাতিত্বের চতুর্থ সারিতে কোন ব্যক্তির প্রপিতামহও তার ঠাকুর্দা হিসেবেই পরিচিত হয়, তার ছেলে হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ঠাকুর্দা, তার ছেলে গণ্য হয় ঐ ব্যক্তির বাবা হিসেবে, বাবার ছেলেরা তার বড় বা ছোট ভাই এবং ভাইদের ছেলে ও নাতিরা তারও ছেলে ও নাতি।

অর্থাৎ জ্ঞাতিত্বের এই ধারাগুলো ওপরদিকে ও নিচের দিকে উত্তরতাই একটা রৈখিক চেহারা নেয়, আর তার ফলে কোন ব্যক্তির জ্ঞাতি ভাইবোনদের পূর্বপুরুষ ও উত্তমপুরুষ হিসেবে পরিগণিত হয়। শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার এটা হচ্ছে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞাতিদের কারুর সঙ্গেই কারুর সম্পর্ক অজ্ঞাত থাকে না।
এই ব্যবস্থার সরলতা থেকে বোঝা যায় তাদের মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞাতিদের মধ্যেকার সম্পর্ক কত দ্রুত চিহ্নিত করা যায় এবং এইসব সম্পর্কের ধারণাটা কিভাবে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। উদাহরণ হিসেবে একটা নিয়মের কথা বলা যায়ঃ বিভিন্ন ভাইয়ের সন্তানরা হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন; আবার এই শেষোক্তদের সন্তানরাও হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন, এবং পরবর্তী সমস্ত প্রজন্ম ধরে এই নিয়মই চলতে থাকে। বিভিন্ন বোনের সন্তান ও বংশধরদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য।
প্রত্যেক সারির সদস্যদের জ্ঞাতিত্বের বিচারে একই স্তরে নিয়ে আসা হয়। এ ব্যাপারে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বা দূরত্বকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তির বিভিন্ন সারির একই পর্যায়ভুক্ত জ্ঞাতিদের সঙ্গে তার একই সম্পর্ক থাকে। জ্ঞাতিত্বের এই সারিভিত্তিক ব্যাপারটা হাওয়াইয়ান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এটা ছাড়া জ্ঞাতিত্বতালিকায় প্রতিটি ব্যক্তির সার্বিক অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব। এই ব্যবস্থার সরল ও বৈশিষ্ট্যসূচক চরিত্রটা সৃষ্টি হয়েছে আপন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে দলগত অন্তর্বিবাহের ফল হিসেবেই।
পরে আমরা দেখতে পাব যে এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পিছনে ভাষার দৈন্য বা সম্পর্কের প্রতি উদাসীনতা কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।
হাওয়াইয়ান এবং রোতুমানরা ছাড়া অন্যান্য পলিনেশিয় গোষ্ঠীর মধ্যেও এই ব্যবস্থাই চালু আছে। যেমন, মার্কেসাস দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে, নিউজিল্যান্ডের মারোয়াদের মধ্যে। তাছাড়া, সামোয়ানদের মধ্যে, কুসেইয়েনদের মধ্যে এবং মাইক্রোনেশিয়ার কিংসমিল দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যেও এই ব্যবস্থার দেখা পাওয়া যায়।[১] প্রশান্ত মহাসাগরের প্রতিটি জনবসতিপূর্ণ দ্বীপেও এই প্রথা চালু আছে, তবে কোথাও কোথাও তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে ঐ-সব জায়গায় এসময় ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার প্রথা চালু ছিল। এটা একটা স্বাভাবিক ও বাস্তব ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় সম্পর্কের যে-সব সম্পর্কগুলো চালু ছিল, সেগুলোই ফুটে উঠেছে এই ব্যবস্থার মধ্যে। বিবাহের ব্যাপারে যে-সব প্রথা তখন চালু ছিল, সেগুলো হয়ত এখন আর চালু নেই। তবে ঐ-সব প্রথা আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকলেও তার দরুণ আমাদের সিদ্ধান্তের কোন হেরফের ঘটে না। যে-সব বিবাহপ্রথার মধ্যে থেকে কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সেইসব বিবাহপ্রথা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বহুদিন পরেও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা যে প্রায় অপরিবর্তিত রূপেই টিকে থাকে, তা আমরা আগেই বলেছি। মানবসমাজের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে খুবই অল্প-সংখ্যক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এ-থেকেই প্রমাণ হয় যে ঐ

১। "সিস্টেম্‌স্ অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি", পরিচ্ছেদ ১, সারণী ৩, পৃঃ ৫৪২, ৫৭৩.

ব্যবস্থাগুলো সুদীর্ঘকাল ধরে টিকে ছিল। সমাজব্যবস্থার কোন যুগান্তর-অগ্রগতির সময় ছাড়া এই ব্যবস্থাগুলো আর কখনোই পরিবর্তিত হয়। মালয়ী জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার উৎস খুঁজতে গিয়ে তার বংশধারার প্রকৃতিটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে এক-সময় এদের মধ্যে আপন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে দলগত অন্তর্বিবাহ চালু ছিল। আর যদি দেখা যায় যে এদের মধ্যেকার স্বীকৃত প্রধান প্রধান সম্পর্কগুলো ঐ ধরনের বিবাহের ফলেই গড়ে ওঠা সম্ভব, তাহলে ঐ ব্যবস্থা থেকেই অতীতে এই ধরনের বিবাহ চালু থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি যে এই ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল জ্ঞাতিদের মধ্যে (আপন ভাইবোন সহ) বহুবিবাহের ফলেই। বস্তুতপক্ষে এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল আপন ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ থেকেই, পরবর্তীকালে দাম্পত্যব্যবস্থা সীমারেখা প্রসারিত হওয়ার ফলে জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহও শুরু হয়। সময়ের গতিপথে আপন ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো তারা উপলব্ধি করে, আর তখন থেকে তারা নিজের বোনকে বিবাহ না করে অন্য অন্য সূত্র থেকে স্ত্রী সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করে। অস্ট্রেলিয়দের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার পর আপন ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ বরাবরের মত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তুরানিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোত্রভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার পর আরও ব্যাপকভাবে এই একই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। একমাত্র ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের ফল হিসেবেই এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে, অন্য কোন যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারে স্বামীদের বহু স্ত্রী থাকত এবং স্ত্রীদের থাকত বহু স্বামী। এই বহুস্ত্রী ও বহুস্বামী প্রথাটা একেবারে সুপ্রাচীন কাল থেকেই চালু আছে। এই ধরনের পরিবার মোটেই অস্বাভাবিক নয়, আবার খুব উল্লেখযোগ্য কিছুও নয়। আদিম যুগে এই পথ ছাড়া পরিবার গড়ে ওঠার অন্য কোন সম্ভাব্য উপায়ও ছিল না। কিছু কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে আংশিকভাবে টিকে থাকাটা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। যেমন, হাওয়াইয়ান-দের অস্তিত্ব যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখনও তাদের মধ্যে ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের নানান নিদর্শন বিদ্যমান ছিল।

মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদে এবং তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থের লেখক মিস্টার জন এফ. ম্যাক্লেনান সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু আমি আমার মতামত ("সিস্টেম্স অফ কন্স্যাঙ্গু-ইনিটি"—তেও আমি এই মতই উপস্থাপিত করেছি) পরিবর্তিত করার মত কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাইনি। তবে এখানে পুনঃপ্রদত্ত ব্যাখ্যাটির দিকে এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত টীকাটির (যে এখানে মিস্টার ম্যাক্লেনানের বিরোধিতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে) দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার স্বীকৃত সম্পর্কগুলোকে এই ধরনের বিবাহের সাহায্যে যাচাই করলেই বোঝা যাবে যে আপন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের দলগত অন্তর্বিবাহের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল ঐ ব্যবস্থাটা।

মনে রাখা দরকার যে পরিবারের মধ্যে থেকে দু' ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়: রক্তসূত্রে

জ্ঞাতির আর বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়তা। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারে থাকে দু-দল মানুষ—বাবার দল আর মায়ের দল। দু দলের সঙ্গেই সন্তানদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ফলে এই ব্যবস্থায় রক্তসূত্রে সম্বন্ধ আর বৈবাহিকসূত্রে সম্বন্ধকে সবসময় আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না।

১) কোন পুরুষের সমস্ত ভাইদের সন্তানরা হচ্ছে তারও সন্তান।
হেতু ; কোন হাওয়াইয়ান পুরুষের সমস্ত ভাইদের স্ত্রীরা তারও স্ত্রী। ফলে তার পক্ষে নিজের সন্তান আর ভাইদের সন্তানদের পৃথক করা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই কোন একজনকে নিজের সন্তান বললে বাকিদেরও নিজের সন্তানই বলতে হয়। ঐ সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেকেরই তার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
২) কোন পুরুষের সমস্ত ভাইদের নাতি-নাতনীরা হচ্ছে তারও নাতি-নাতনী।
হেতু ঃ তারা হচ্ছে ঐ ব্যক্তি ছেলে ও মেয়েদের সন্তান।
৩) কোন নারীর ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সম্পর্কগুলো একই থাকে।
এটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবেই বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্কের প্রশ্ন। যেহেতু কোন নারীর ভাইরা হচ্ছে তার স্বামী, কাজেই তাদের ঔরসে অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তানরা হচ্ছে তার সৎ-সন্তান। কিন্তু এই সম্পর্কটা ঐ ব্যবস্থায় স্বীকৃত না। ফলে তারা ঐ নারীটির সন্তান হিসেবেই গণ্য হয়। অন্যথায় তারা ঐ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আমাদের মধ্যেও সৎ-মাকে মা এবং সৎ-ছেলেকে ছেলে বলাই চালু রীতি।
৪) কোন পুরুষের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতি বোনদের সন্তানরা তারও সন্তান।
হেতু ঃ যে কোন পুরুষের সমস্ত বোনেরাই হচ্ছে তার স্ত্রী এবং তার ভাইদেরও স্ত্রী।
৫) কোন পুরুষের সমস্ত বোনেদের নাতি-নাতনীরা হচ্ছে তারও নাতি-নাতনী।
হেতু ঃ তারা হচ্ছে ঐ পুরুষটির সন্তানদের ছেলেমেয়ে।
৬) কোন নারীর সমস্ত বোনেদের সন্তানরা হচ্ছে তারও সন্তান।
হেতু ঃ কোন নারীর বোনেদের স্বামীরা হচ্ছে তারও স্বামী। তবে, এক্ষেত্রে একটা পার্থক্য থাকেই ঃ বোনেদের সন্তানদের থেকে নিজের সন্তানদের সে পৃথক করতে পারে। হিসেব মত সে হচ্ছে তার বোনেদের সন্তানদের সৎ-মা। কিন্তু যেহেতু এ-রকম কোন সম্পর্ক ঐ ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়, তাই বোনেদের সন্তানরাও তার নিজের সন্তান হিসেবেই গণ্য নয়। অন্যথায় তারা ঐ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।
৭) আপন ভাইদের সন্তানরা হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন।
হেতু ঃ এই ভাইরা হচ্ছে ঐ সন্তানদের সব কজন মায়ের স্বামী। ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের মাকে চিনতে পারে, কিন্তু বাবার পরিচয়টা অনির্দিষ্টই থাকে। কাজেই মায়ের দিক থেকে তাদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছে পরস্পরের সহোদর ভাইবোন এবং অন্যদের সৎ-ভাই বা সৎ-বোন। কিন্তু বাবার দিক থেকে তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্ভাব্য ভাই বা বোন। তাই স্বাভাবিকভাবেই এরা পরস্পরের ভাইবোন হিসেবেই স্বীকৃত হয়।
৮) এইসব ভাইবোন সন্তানরাও হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন। আবার এই শেষোক্তদের সন্তানরাও হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন। এদের বংশধরদের মধ্যেও অনির্দিষ্টকাল ধরে সম্পর্কের এই ধারাই চলতে থাকে। আপন বোনেদের সন্তান ও বংশধরদের ক্ষেত্রে এবং

বিভিন্ন ভাই ও বোনেদের সন্তান ও বংশধরদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এই-ভাবে সৃষ্টি হয় একটা অন্তহীন ধারা, যা এই ব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ধারাটা গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে বলা যায় যে, যেখানেই ভাইবোনদের সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেই বেড়ে গেছে বৈবাহিক সম্পর্কের সীমানা। অর্থাৎ একজন পুরুষের আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্ক মিলিয়ে যতজন বোন থাকে, তার স্ত্রীর সংখ্যাও হয় ততজন ; আবার একজন নারীর আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্ক মিলিয়ে যতজন ভাই থাকে, তার স্বামীর সংখ্যাও হয় ততজন। বিবাহ এবং পরিবার গড়ে ওঠে বর্গ অনুযায়ী এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই অগ্রসর হয়। যে বিস্ময়কর দাম্পত্য ব্যবস্থার কথা আমরা আগে কয়েকবার উল্লেখ করেছি, তার সূত্রপাত এইভাবেই হয়েছিল।

৯) কোন ব্যক্তির বাবার সমস্ত ভাইরাই হচ্ছে তার বাবা ; তার মায়ের সমস্ত বোনেরাই তার মা।

হেতু : ১, ৩, এবং ৬নং-এর মত।

১০) কোন ব্যক্তির মায়ের সমস্ত ভাইরাই তার বাবা।

হেতু : তারা হচ্ছে তার মায়ের স্বামী।

১১) মায়ের সমস্ত বোনেরাই হচ্ছে তার মা।

হেতু : ৬নং-এর মত।

১২) তার সমস্ত জ্ঞাতি ভাইবোনদের প্রত্যেকটি সন্তানই হচ্ছে তারও সন্তান।

হেতু : ১, ৩, ৪ এবং ৬ নং-এর মত।

১৩) শেষোক্তদের সমস্ত সন্তানরাই হচ্ছে তার নাতি-নাতনী।

হেতু : ২ নং-এর মত।

১৪) বাবার দিকে ঠাকুর্দা ও ঠাকুমার সমস্ত ভাইবোনই হচ্ছে তার ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা, আর মায়ের দিকে দাদু ও দিদিমার সমস্ত ভাইবোনই হচ্ছে তার দাদু ও দিদিমা।

হেতু : তারা হচ্ছে তার বাবা-মার বাবা-মা।

এইভাবে, আপন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের দলগত অন্তর্বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের নিজস্ব প্রকৃতির সাহায্যেই এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সন্তানদের পিতৃত্ব সম্বন্ধে যতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায়, সেই অনুযায়ীই গড়ে ওঠে বাবার দিকের সম্পর্কগুলো। কোন সন্তানের সম্ভাব্য পিতা হিসেবে যে ক'জন পুরুষকে চিহ্নিত করা যায়, তারা প্রত্যেকেই তার প্রকৃত পিতা হিসেবে গণ্য হয়। মায়ের দিকের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় আত্মীয়তার সূত্রে। সৎ-সন্তানরা গণ্য হয় আপন সন্তান হিসেবেই।

বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কিছু সুনিশ্চিত তথ্য আমাদের হাতে আছে। নিচের সারণীটা দেখুন :

পুরুষের ক্ষেত্রে	টোঙ্গান	হাওয়াইয়ান
আমার ভাইয়ের স্ত্রী	উনোহো, আমার স্ত্রী	ওয়াহিনা, আমার স্ত্রী
আমার স্ত্রীর বোন	উনোহো, আমার স্ত্রী	ওয়াহিনা, আমার স্ত্রী
নারীর ক্ষেত্রে		

পুরুষের ক্ষেত্রে	টোঙ্গান	হাওয়াইয়ান
আমার স্বামীর ভাই	উনোহো, আমার স্বামী	কেন্, আমার স্বামী।
পুরুষের ক্ষেত্রে		
আমার বাবার ভাইয়ের ছেলের স্ত্রী	উনোহো, আমার স্ত্রী	ওয়াহিনা, আমার স্ত্রী।
আমার মায়ের বোনের ছেলের স্ত্রী	উনোহো, আমার স্ত্রী	ওয়াহিনা, আমার স্ত্রী।
নারীর ক্ষেত্রে		
আমার বাবার ভাইয়ের মেয়ের স্বামী	উনোহো, আমার স্বামী	কাইকোয়েকা, আমার ভগ্নীপতি।
আমার মায়ের বোনের মেয়ের স্বামী	উনোহো, আমার স্বামী	কাইকোয়েকা, আমার ভগ্নীপতি।

যেখানে স্ত্রীর সম্পর্কটা জ্ঞাতিত্বের ধারায় গড়ে ওঠে, সেখানে স্বামীর সম্পর্কটা থাকে বংশগত ধারায়। আবার যেখানে স্ত্রীর সম্পর্কটা ওড়ে ওঠে বংশগত ধারায়, সেখানে স্বামীর সম্পর্কটা থাকে জ্ঞাতিত্বের ধারায়।[১] জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার এই ব্যবস্থাটা যখন প্রথম কার্যকরী হয়েছিল (এবং আজও তা কার্যকরী আছে), তখন যে সম্পর্কগুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলো বাস্তবে বিদ্যমান সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। বৈবাহিক রীতির ক্ষেত্রে অবশ্য পরবর্তীকালে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে যে-সব প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এই ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠার সময় পলিনেশিয় গোষ্ঠীগুলোর পূর্বপুরুষদের মধ্যে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। কারণ এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছাড়া ঐ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তাছাড়া এ থেকে তাদের মধ্যেকার প্রতিটা সম্পর্কের একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়।

মিস্টার অস্কার পেশেল-এর নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "একই মায়ের গর্ভজাত সন্তানরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মধ্যে যৌনমিলন মারফৎ বংশবৃদ্ধি করেছে—এ কথাটা যে-কোন জায়গাতে এবং যে-কোন সময়েই অবিশ্বাস্য। কেননা এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে এমনকি রক্তবিহীন প্রাণীদের (যেমন, উদ্ভিদের) ক্ষেত্রেও একই পিতা-মাতার সন্তানদের পরস্পরের সঙ্গে যৌনমিলন মারফৎ বংশবিস্তার করা প্রায় অসম্ভব।"[২]

মনে রাখা দরকার যে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ভাইবোন বিবাহভিত্তিক দলগুলো শুধুমাত্র আপন ভাইবোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জ্ঞাতি ভাইবোনরাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দলের পরিধি অর্থাৎ বিবাহ করার মত নারী-পুরুষের সংখ্যা যত বেশি হয়,

১। দক্ষিণ আফ্রিকার কাফিরদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির বাবার ভাইয়ের ছেলের স্ত্রী, বাবার বোনের ছেলের স্ত্রী, মায়ের ভাইয়ের ছেলের স্ত্রী এবং মায়ের বোনের ছেলের স্ত্রী এরা প্রত্যেকেই ঐ ব্যক্তিরও স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়।

২। "রেসেস অফ ম্যান", অ্যাপ্‌ল্‌টন সম্পাদিত, ১৮৭৬, পৃঃ ২৩২.

ঘনিষ্ঠ জনদের যৌনমিলনের বিপদটাও ততই কমে যায়।
সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাচীনকালে এ ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব সম্ভবপর ছিল। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের সঙ্গে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের সঙ্গে জোড়বাঁধা পরিবারের এবং জোড়বাঁধা পরিবারের সঙ্গে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী সম্পর্কগুলোর কথা বিবেচনা করলে (একটার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পরেরটা) এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার একটা যুক্তিসম্মত সম্পর্ক আছে এবং এই ধারাবাহিক ক্রমটা তার চলার পথে বন্যতার যুগ থেকে শুরু করে নানান ঐতিহাসিক পর্যায় অতিক্রম করে এসে পেঁছেছে সভ্যতার যুগে।
একইভাবে, পরিবারের তিনটি প্রধান প্রধান রূপের সঙ্গে সংযুক্ত জ্ঞাতিত্বের তিনটি প্রধান প্রধান ব্যবস্থাও পরস্পরের সঙ্গে একইরকম সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ থেকেছে। একটার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে পরের ব্যবস্থাটা। এই ধারাবাহিক ক্রমটাও তার চলার পথে বন্যতার যুগ থেকে উজিয়ে এসে পেঁছেছে সভ্যতার যুগে। এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় পরিবারগুলো যখন বন্যতার দশায় ছিল, তখন তাদের মধ্যেও চালু ছিল মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অনুরূপ কোন ব্যবস্থা। গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার পর এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সূচিত হয় তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। অবশেষে, একবিবাহভিত্তিক পরিবার সৃষ্টি হওয়ার পর অবসান ঘটে সেই ব্যবস্থারও। গড়ে ওঠে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা।
প্রাচীনকালে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করেছি। কিন্তু প্রাচীনকালে হাওয়াই দ্বীপবাসীদের মধ্যে এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে, যেগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়।
স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে যখন প্রথম বিস্তারিতভাবে জানা যায়, তখন সেখানকার সমাজ যে অবস্থায় ছিল তা থেকে অনুমান করা যায় যে আগে সেখানে এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। আমেরিকান মিশনগুলো যখন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮২০), তখন ওখানকার সমাজের অবস্থা দেখে মিশনারিরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সবথেকে বিস্মিত হয়েছিলেন ওখানকার নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক আর তাদের বিবাহপ্রথা দেখে। তাঁরা হঠাৎই গিয়ে পড়েছিলেন প্রাচীন সমাজের এমন এক অবস্থায়, যেখানে একবিবাহভিত্তিক পরিবার অথবা জোড়াবাঁধা পরিবার একেবারেই অজানা বস্তু। তারা দেখতে পেয়েছিলেন দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। যার মূল কাঠামোটা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি, যেখানে আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ তখনও পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায় নি। পুরুষ এবং নারী, উভয়েই বহুবিবাহে অভ্যস্ত ছিল। তাঁদের মনে হয়েছিল এটাই মানুষের অধঃপতনের নিম্নতম স্তর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরল হাওয়াই দ্বীপবাসীরা তখনও পর্যন্ত বন্যদশা থেকে উন্নত হয়ে উঠতে না পারলেও বন্যদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক জীবনই যাপন করত। বিভিন্ন সামাজিক রীতি ও প্রথাই তাদের কাছে আইনস্বরূপ ছিল। ঐ-সব মিশনারিরা যেমন নিষ্ঠা-ভরে নিজেদের রীতিনীতি মেনে চলতেন, তেমন নিষ্ঠাভাবেই নিজেদের রীতিনীতি

তাদের অবস্থা দেখে মিশনারিরা প্রচণ্ড বিস্মিত হয়েছিলেন। এ থেকেই বন্য মানুষদের সঙ্গে সভ্য মানুষদের দূরত্বের পরিধিটা বোঝা যায়। বহু বছর ধরে বিকাশের গতিপথে উন্নত হয়ে ওঠা সভ্য মানুষের নৈতিক বোধ ও পরিশীলিত দায়িত্ব সচেতনতা মুখোমুখী হয়েছিল বহু যুগ পিছিয়ে থাকা বন্য মানুষদের দুর্বল নৈতিক বোধ ও অমার্জিত দায়িত্বসচেতনতার। এক পরিপূর্ণ বৈষম্য। ঐ-সব মিশনারীদের অন্যতম বর্ষীয়ান রেভারেণ্ড হিরান বিংঘাম তাঁর মৌলিক অনুসন্ধানকে অবলম্বন করে স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ-পুঞ্জের একটা চমৎকার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে ওখানকার লোকেরা মানুষের পক্ষে সব থেকে ঘৃণ্য কাজগুলোই করে থাকে। রেভারণ্ড বিংঘাম লিখেছেন, "বহুস্ত্রী ও বহুস্বামী প্রথা, অবিবাহিত অবস্থায় যৌনমিলন, ব্যভিচার, স্বজনমেহন, শিশুহত্যা, স্বামী বা স্ত্রীকে ফেলে পালানো, মা-বাবা বা সন্তানদের পরিত্যাগ করা, ডাকিনীবিদ্যা, লালসা এবং অত্যাচার—এ-সবই ওখানে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে, এমনকি তাদের প্রচলিত ধর্মও এগুলোকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি।"[১] দলগত বিবাহ প্রথা এবং ঐ বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারসমূহই এই অবস্থাটার সৃষ্টি করেছিল. এই বিবাহ ও পরিবারই হাওয়াইদ্বীপবাসীদের নৈতিক চরিত্রের ঐ ধাঁচটা গড়ে তুলেছিল। বন্যদের মধ্যেও নৈতিকতা থাকে, অবশ্য তার মানটা হয় নিচু। সমগ্র ইতিহাসে পুরোপুরি নৈতিকতাহীন কোন যুগের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। মিস্টার বিংঘাম লিখেছেন—হাওয়াইবাসীদের আদিপুরুষ ওয়াকিয়া নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ভাইবোনদের নির্দ্বিধায় পরস্পরকে বিবাহ করে—এ ঘটনা ঐ-সব মিশনারিরা দেখে-ছিলেন। বিংঘাম লিখেছেন, "ভাইবোনের যৌনমিলন ব্যাপকভাবেই চালু ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা তাদের কাছে পেঁছনোর আগে পর্যন্ত এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।[২] স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে ভাইবোন-বিবাহভিত্তিক-পরিবার-এর কাল থেকে এই ভাইবোনেদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের ব্যাপারটা কয়েকটি ক্ষেত্রে দলগত-বিবাহভিত্তিক-পরিবার-এর সময়েও টিকে থেকেছিল এবং সেটা মোটেই কোন একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। আসলে তাদের মধ্যে তখনও গোত্রভিত্তিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি বলে এবং ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর পেরিয়ে দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি বলেই এটা ঘটতে পেরেছিল। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে উঠলেও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের ধাঁচেরই রয়ে গিয়েছিল, শুধু বিশেষ কয়েকটি সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল।

যে-সব দলগুলো বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হত, তাদের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে একটা পরিবার গড়ে তোলাটা হাওয়াইয়ানদের পক্ষে সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। জীবনধারণের রসদ সংগ্রহ করা এবং পরস্পরকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তাদেরকে বাধ্য করত ঐ দলগুলোকে কয়েকটা ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে রাখতে। তবে, প্রতিটা ক্ষুদ্রতর পরিবারই হত গোটা দলটার একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের এবং দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে ব্যক্তিরা বোধহয় নিজেদের ইচ্ছেমত

১। বিংঘাম, "স্যাণ্ডউইচ আইল্যাণ্ডস", হার্টফোর্ড সংস্করণ, ১৮৪৭, পৃঃ ২১.

২। ঐ, পৃঃ ২৩.

একটা উপ-পরিবার থেকে আরেকটা উপ-পরিবারে চলে যেতে পারত। মিস্টার বিংহাম সম্ভবত এই ঘটনাকেই উল্লেখ করেছেন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে পরিত্যাগ করা এবং মা-বাবা কর্তৃক সন্তানদের পরিত্যাগ করা হিসেবে। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক ও দলগত বিবাহভিত্তিক—উভয় ধরনের পরিবারেই জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাম্যবাদ চালু ছিল। সেই পরিস্থিতিতে এছাড়া অন্য উপায়ও অবশ্য ছিল না। বন্য এবং বর্বর গোষ্ঠী-গুলোর মধ্যে এখনও এই সাম্যবাদ অনেকাংশে চালু রয়েছে।

"চৈনিকদের সম্পর্কের নয়টি স্তর" সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার। প্রাচীন আমলের জনৈক চৈনিক লেখক লিখেছেন: "পৃথিবীতে জাত যাবতীয় মানুষের সম্পর্কের নয়টি স্তর থাকে। আমার নিজের প্রজন্ম হচ্ছে একটি স্তর, আমার পিতার প্রজন্ম একটি, পিতামহের প্রজন্ম একটি, প্রপিতামহের প্রজন্ম একটি এবং প্রপিতামহের পিতার প্রজন্ম একটি স্তর। অর্থাৎ, আমার উর্ধ্বতন স্তর হচ্ছে চারটি। আবার, আমার পুত্রের প্রজন্ম একটি স্তর, পৌত্রের প্রজন্ম একটি, প্রপৌত্রের প্রজন্ম একটি এবং প্রপৌত্রের পুত্রের প্রজন্ম একটি স্তর। অর্থাৎ, আমার অধস্তন স্তর হচ্ছে চারটি। তাহলে আমাকে নিয়ে মোট স্তর দাঁড়াচ্ছে নয়টি। প্রতিটা স্তরের জ্ঞাতিরা পরস্পরের ভাইবোন। প্রত্যেকটা স্তর পৃথক পৃথক গৃহ বা পরিবারভুক্ত হলেও এরা প্রত্যেকেই আমার আত্মীয়, এবং এগুলোই হচ্ছে সম্পর্কের নয়টি স্তর।

"পরিবারের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের ধারাগুলো হচ্ছে কোন ঝর্ণা থেকে সৃষ্ট ছোট ছোট সোঁতা কিংবা কোন গাছের বিভিন্ন শাখার মতো। সোঁতাগুলো পরস্পরের থেকে কম-বেশি দূরে দূরে থাকতে পারে, গাছের শাখাগুলোও থাকতে পারে কম-বেশি কাছাকাছি, কিন্তু মূল ঝর্ণা বা মূল কান্ড থাকে একটাই।"[1]

আজকের দিনের চৈনিকদের থেকে অনেক যথাযথভাবে সম্পর্কের এই নয়টি স্তরকে বাস্তবায়িত করেছে হাওয়াইয়ানরা (উপরের দিকের দুটি এবং নিচের দিকের দুটি স্তর বাদ দিয়ে এটাকে তারা পাঁচটি স্তরে পরিণত করেছে)[2]। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উপাদানগুলো সূচিত হওয়ার ফলে এবং জ্ঞাতিত্বের বিভিন্ন ধারাকে পৃথকীকৃত করার জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে চৈনিকদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অনেকটাই পরি-বর্তিত হয়েছে। কিন্তু হাওয়াইয়ানদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে সেই প্রাথমিক স্তরগুলো (যেগুলোতে আদতে চৈনিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থারই বিশেষত্ব ছিল) আজও বজায় আছে। এটা একান্তই সুস্পষ্ট যে চৈনিক এবং হাওয়াইয়ান, উভয় ব্যবস্থাতেই জ্ঞাতিদের প্রজন্ম অনুসারে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা হয়। একই স্তরের সমস্ত জ্ঞাতিরা বিবেচিত হয় পরস্পরের ভাইবোন হিসেবে। তাছাড়া, বিবাহ এবং পরিবারগঠন সম্পন্ন হয় এই এক একটা স্তরের মধ্যেই, অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকে শুধুমাত্র একই স্তরের পুরুষ ও নারীদের মধ্যেই। হাওয়াইয়ানদের বিভিন্ন বর্গগুলোর সাহায্যে ব্যাখ্যা করলে এই ব্যাপারটা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। সেই সঙ্গেই এ থেকে চৈনিকদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের অবস্থা সম্বন্ধেও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই

১। "সিস্টেম্স্ অফ কন্স্যাঙ্গুইনিটি", পৃঃ ৪১৫.

২। পৃঃ ৪৩২, এখানে চৈনিকদের জ্ঞাতিব্যবস্থা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন অবস্থার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই টিকে আছে এই ব্যাপারটা, আর এর সঙ্গে হাওয়াই-য়ানদের অবস্থার সাদৃশ্যটাও একান্তই সুস্পষ্ট। অন্য কথায়, এথেকে বোঝা যায় যে ঐ-সব স্তরগুলো গড়ে ওঠার সময় সেখানে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল (আর ঐ পরিবারের আগে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান ছিল ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার)।

প্লেটোর "টাইমেয়ুস"-এও সম্পর্কের এই পাঁচটা প্রাথমিক স্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'আদর্শ প্রজাতন্ত্র'-এ যাবতীয় জ্ঞাতিদের পাঁচটি বর্গে বিভক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে নারীরা হবে সার্বজনীন স্ত্রী আর সন্তানরা হবে সমস্ত পিতামাতার সন্তান। "কিন্তু সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে কী করা হবে?" সক্রেটিস বলছেন টাইমেয়ুসকে, "প্রস্তাবটির অভিনবত্বের দরুণ এ ব্যাপারটা স্মরণ করতে তোমার নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না। কারণ আমরা আদেশ দিয়েছিলাম যে বৈবাহিক সম্পর্কটা হবে সার্বজনীন, সমস্ত পুরুষ ও নারীই তার অন্তর্ভুক্ত হবে, আর সন্তানরাও হবে সার্বজনীন সন্তান। আমরা আরও আদেশ দিয়েছিলাম যে, কেউ যাতে তার নিজের সন্তানদের আলাদা করে চিনে নিতে না পারে সে ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সমবয়স্ক প্রত্যেকেই যেন পরস্পরকে জ্ঞাতি বলে মনে করতে শেখে, জীবনের যৌবনলগ্নে যেন পরস্পরকে মনে করে ভাইবোন হিসেবে, পূর্ববর্তীদের যেন মনে করে পিতামাতা ও পিতামহ-পিতামহী বা মাতামহ-মাতামহী হিসেবে আর পরবর্তীদের মনে করে নিজেদের সন্তান এবং নাতি-নাতনী হিসেবে।"[১] গ্রীক ও পেলাসজিয়ান রীতিনীতিগুলোর সঙ্গে প্লেটো অবশ্যই পরিচিত ছিলেন (যেগুলোর কথা আমরা জানতে পারিনি)। এইসব রীতিনীতি চালু ছিল সেই বর্বর যুগ থেকেই এবং এগুলো থেকে গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর আরও প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মনে হয়, প্লেটোর আদর্শ পরিবারের ধারণাটা কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ঐ-সব প্রাচীন রীতিনীতিগুলোর কথা মাথায় রেখেই তিনি এই পরিবারের কথা বলেছিলেন। হাওয়াইয়ানদের মধ্যে প্রচলিত সম্পর্কের পাঁচটি স্তরের সঙ্গে প্লেটোপ্রদত্ত সম্পর্কের পাঁচটি স্তরের সাদৃশ্যটা লক্ষনীয়। তিনি বলেছেন, প্রতিটা স্তরের সদস্যরা হবে পরস্পরের ভাইবোন এবং তাদেরকে নিয়েই গড়ে উঠবে একেকটা স্তরের পরিবার; আর, এক একটা দলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে।

শেষত, ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগে সমাজের যে অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা থেকে অত্যন্ত যুক্তিসম্মতভাবেই বোঝা যায় যে তার আগে সমাজে অবাধ, বাছবিচারহীন যৌনমিলনের রীতিই প্রচলিত ছিল। এ সিদ্ধান্তটা একেবারেই অপরিহার্য, যদিও মিস্টার ডারউইনের মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[২] আদিম যুগে ছোট ছোট দলগুলোর মধ্যেও দীর্ঘকাল ধরে অবাধ যৌনমিলন চালু থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের তাগিদে এই দলগুলো ভেঙে গড়ে উঠত আরও ছোট ছোট কিছু দল এবং সেগুলোর মধ্যে

১। "টাইমেয়ুস", পরিচ্ছেদ ২, ডেভিস এর অনুবাদ।

২। "ডিসেণ্ট অফ ম্যান", ২, ৩৬০.

গড়ে উঠত ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার। এই জটিল বিষয়টা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারই ছিল সমাজের প্রথম সংগঠিত রূপ ; এবং তার আগে যে অবস্থাই থেকে থাক না কেন, সেই অসংগঠিত অবস্থার মধ্যে থেকেই গড়ে উঠতে পেরেছিল এই উন্নততর রূপটা। সে সময় মানবজাতি তার বিকাশের একেবারে নিম্নতম অবস্থায় ছিল। এটাকেই আমরা মানবজাতির প্রগতির সূচনাবিন্দু হিসেবে ধরে নিতে পারি, তারপর একে খুঁজে দেখতে পারি বন্যযুগ থেকে সভ্যযুগে এসে পেঁাছোনোর পথে তার বিভিন্ন গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের ধারাকে। এই অগ্রগতির গতিপথকে সবথেকে ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় বিভিন্ন ধারাবাহিক রূপের মধ্য দিয়ে পরিবার সংক্রান্ত ধারণার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হওয়ার পর (যে ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করেছি) পরিবারের অন্যান্য রূপগুলোকে বুঝতে পারা অনেক সহজ হয়ে যায়।

হাওয়াইয়ান ও রোতুমানদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা

(কা-না = পুরুষ ; ওয়া-হী-না = নারী)

	ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক (মাননীয় থমাস মিলার কৃত)	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক (রেভারেণ্ড জন অস্‌বোর্ন কৃত)	ভাষান্তর
১.	আমার প্রপিতামহ	কু-পু-না	আমার পিতামহ	মা-পি-গা-ফা	আমার পিতামহ
২.	,, প্রপিতামহের ভাই	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
৩.	,, ,, বোন	,, ,,	,, ,,	,, ,, হোন্‌-ই	,, পিতামহী
৪.	,, প্রপিতামহী	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,
৫.	,, প্রপিতামহীর বোন	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,
৬.	,, পিতামহ	,, ,,	,, ,,	,, ,, ফা	,, পিতামহ
৭.	,, পিতামহী	,, ,,	,, ,,	,, ,, হোন্‌-ই	,, পিতামহী
৮.	,, পিতা	মা-কু-আ কা-না	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
৯.	,, মাতা	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	,, মাতা	ওই-হোন্‌-ই	,, মাতা
১০.	,, পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
১১.	,, কন্যা	কাই-কী ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন্‌-ই	,, কন্যা
১২.	,, পৌত্র	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্র
১৩.	,, পৌত্রী	মু-পু-না ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, ,, হোন্‌-ই	,, পৌত্রী
১৪.	,, প্রপৌত্র	,, ,, কা-না	,, পৌত্র	,, ,, ,, ফা	,, পৌত্র
১৫.	,, প্রপৌত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, ,, হোন্‌-ই	,, পৌত্রী

	ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৬.	আমার প্রপৌত্রের পুত্র	মু-পু-না কা-না	আমার পৌত্র	মা-পি-গা ফা	আমার পৌত্র
১৭.	,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, ,, হোন্-ই	,, পৌত্রী
১৮.	,, বড় ভাই (পুরুষের ক্ষেত্রে)	কাই-কু-আ-না	,, ভাই (বড়)	সা-সি-গি	,, ভাই (বড়)
১৯.	,, ,, ,, (নারীর ,,)	কাই-কু-না-না	,, ,, (,,)	সাগ-ভে-ভেন্-ই	,, ,, (,,)
২০.	,, ,, বোন (পুরুষের ,,)	কাই-কু-ওয়া-হী-না	,, বোন (,,)	সাগ-হোন্-ই	,, বোন (,,)
২১.	,, ,, ,, (নারীর ,,)	কাই-কু-আ-না	,, ,, (,,)	সা-সি-গি	,, ,, (,,)
২২.	,, ছোট ভাই (পুরুষের ,,)	কাই-কা-ই-না	,, ভাই (ছোট)	সা-সি-গি	,, ভাই (ছোট)
২৩.	,, ,, ,, (নারীর ,,)	কাই-কু-না-না	,, ,, (,,)	সাগ-ভে-ভেন-ই	,, ,, (,,)
২৪.	,, ,, বোন (পুরুষের ,,)	কাই-কু-ওয়া-হী-না	,, বোন (,,)	সাগ-হোন ই	,, বোন (,,)
২৫.	,, ,, ,, (নারীর ,,)	কাই-কা-ই-না	,, ,, (,,)	সা-সি-গি	,, ,, (,,)
২৬.	,, ভাইয়ের পুত্র (পুরুষের ,,)	কাই-কী-কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
২৭.	,, ,, পুত্রের স্ত্রী (,, ,,)	হু-নো-না	,, পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
২৮.	,, ,, কন্যা (,, ,,)	কাই-কী ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
২৯.	,, ,, কন্যার স্বামী (,, ,,)	হু-নো-না	,, জামাতা	লি-ই ফা	,, জামাতা
৩০.	,, ,, পৌত্র (,, ,,)	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্র
৩১.	,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৩২.	,, ,, প্রপৌত্র (,, ,,)	,, ,, কা-না	,, পৌত্র	,, ,, ফা	,, পৌত্র
৩৩.	,, ,, প্রপৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৩৪.	,, বোনের পুত্র (,, ,,)	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
৩৫. আমার বোনের পুত্রের স্ত্রী („ „)	হু-নো-না	আমার পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	আমার কন্যা
৩৬. „ „ কন্যা („ „)	কাই-কী ওয়া-হী-না	„ কন্যা	লি-ই হোন-ই	„ কন্যা
৩৭. „ „ কন্যার স্বামী („ „)	হু-নো-না	„ জামাতা	লি-ই ফা	„ পুত্র
৩৮. „ „ পৌত্র („ „)	মু-পু-না কা-না	„ পৌত্র	মা-পি-গা ফা	„ পৌত্র
৩৯. „ „ পৌত্রী („ „)	„ „ ওয়া-হী-না	„ পৌত্রী	„ „ হোন-ই	„ পৌত্রী
৪০. „ „ প্রপৌত্র („ „)	„ „ কা-না	„ পৌত্র	„ „ ফা	„ পৌত্র
৪১ „ „ প্রপৌত্রী („ „)	„ „ ওয়া-হী-না	„ পৌত্রী	„ „ হোন-ই	„ পৌত্রী
৪২ „ ভাইয়ের পুত্র (নারীর ক্ষেত্রে)	কাই-কী কা-না	„ পুত্র	লি-ই ফা	„ পুত্র
৪৩. „ „ পুত্রের স্ত্রী („ „)	হু-নো-না	„ পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	„ কন্যা
৪৪ „ „ কন্যা („ „)	কাই-কী ওয়া-হী-না	„ কন্যা	লি-ই হোন-ই	„ কন্যা
৪৫. „ „ কন্যার স্বামী („ „)	হু-নো-না	„ জামাতা	লি-ই ফা	„ পুত্র
৪৬. „ „ পৌত্র („ „)	মু-পু-না কা-না	„ পৌত্র	মা-পি-গা ফা	„ পৌত্র
৪৭. „ „ পৌত্রী („ „)	„ „ ওয়া-হী-না	„ পৌত্রী	„ „ হোন-ই	„ পৌত্রী
৪৮. „ „ প্রপৌত্র („ „)	„ „ কা-না	„ পৌত্র	„ „ ফা	„ পৌত্র
৪৯. „ „ প্রপৌত্রী („ „)	„ „ ওয়া-হী-না	„ পৌত্রী	„ „ হোন-ই	„ পৌত্রী
৫০. „ বোনের পুত্র („ „)	কাই-কী কা-না	„ পুত্র	লি-ই-ফা	„ পুত্র
৫১. „ „ পুত্রের স্ত্রী („ „)	হু-নো-না	„ পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	„ কন্যা
৫২. „ „ কন্যা („ „)	কাই-কী ওয়া-হীনা	„ কন্যা	লি-ই হোন-ই	„ কন্যা
৫৩. „ „ কন্যার স্বামী („ „)	হু-নো-না	„ জামাতা	লি-ই ফা	„ পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইনানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
৫৪. আমার বোনের পৌত্র (নারীর ক্ষেত্রে)	মু-পু-না কা-না	আমার পৌত্র	মা-পি-গা ফা	আমার পৌত্র
৫৫. " " পৌত্রী (" ")	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
৫৬. " " প্রপৌত্র (" ")	" " কা-না	" পৌত্র	" " ফা	" পৌত্র
৫৭. " " প্রপৌত্রী (" ")	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
৫৮. " পিতার ভাই	মা-কু-আ কা-না	" পিতা	ওই-ফা	" পিতা
৫৯. " " ভাইয়ের স্ত্রী	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	" মাতা	ওই-হোন-ই	" মাতা
৬০. " " " পুত্র (বড়, পুং ক্ষেত্রে)	কাই-কু-আ-না	" ভাই (বড়)	সা-সি-গি	" ভাই
৬১ " " " " (ছোট, " ")	কাই-কা-ই-না	" " (ছোট)	" "	" "
৬২. " " " পুত্রের স্ত্রী	ওয়া-হী-না	" স্ত্রী	সাগ-হোন-ই	" বোন
৬৩. " " " কন্যা (বড়, পুং ক্ষেত্রে)	কাই-কু-ওয়া-হী-না	" বোন	" "	" "
৬৪. " " " " (ছোট, " ")	" " " "	" "	" "	" "
৬৫. " " " কন্যার স্বামী	কাই-কো-ঈ-কা	" ভগ্নীপতি	সা-সি-গি	" ভাই
৬৬. " " " পুত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	" পুত্র	লি-ই ফা	" পুত্র
৬৭. " " " " কন্যা	কাই-কী ওয়া-হী-না	" কন্যা	লি-ই হোন-ই	" কন্যা
৬৮. " " " কন্যার পুত্র	কাই-কী কা-না	" পুত্র	লি-ই ফা	" পুত্র
৬৯. " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" কন্যা	লি-ই হোন-ই	" কন্যা
৭০. " " " পৌত্রের পুত্র	মু-পু-না কা-না	" পৌত্র	মা-পি-গা ফা	" পৌত্র
৭১. " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
৭২. " " " পৌত্রের পৌত্র	" " কা-না	" পৌত্র	" " ফা	" পৌত্র

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
৭৩. আমার পিতার ভাইয়ের পৌত্রের পৌত্রী	মু-পু-না ওয়া-হী-না	আমার পৌত্রী	মা-পি-গা হোন-ই	আমার পৌত্রী
৭৪. ,, ,, বোন	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	,, মাতা	ওই-হোন-ই	,, মাতা
৭৫. ,, ,, বোনের স্বামী	,, ,, কা-না	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
৭ . ,, ,, ,, পুত্র (বড়, পুং ক্ষেত্রে)	কাই-কু-আ-না	,, ভাই (বড়)	সা-সি-গি	,, ভাই
৭৭. ,, ,, ,, ,, (ছোট, ,, ,,)	কাই-কা-ই-না	,, ,, (ছোট)	,, ,,	,, ,,
৭৮. ,, ,, ,, পুত্রের স্ত্রী	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	সাগ-হোন-ই	,, বোন
৭৯. ,, ,, ,, কন্যা	কাই-কু ওয়া-হী-না	,, বোন	,, ,,	,, ,,
৮০. ,, ,, ,, কন্যার স্বামী	কাই-কো-ঈ-কা	,, ভগ্নীপতি	সা-সি-গি	,, ভাই
৮১. ,, ,, ,, পুত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
৮২. ,, ,, ,, ,, কন্যা	কাই-কী ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
৮৩. ,, ,, ,, কন্যার পুত্র	,, ,, কা-না	,, পুত্র	,, ,, ফা	,, পুত্র
৮৪. ,, ,, ,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, কন্যা	,, ,, হোন-ই	,, কন্যা
৮৫. ,, ,, ,, পৌত্রের পুত্র	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্রী
৮৬. ,, ,, ,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৮৭. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	,, ,, কা-না	,, পৌত্র	,, ,, ফা	,, পৌত্র
৮৮. ,, ,, ,, ,, পৌত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৮৯. ,, মাতার ভাই	মা-কু-আ কা-না	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
৯০. ,, ,, ভাইয়ের স্ত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, মাতা	,, হোন-ই	,, মাতা
৯১. ,, ,, ,, পুত্র (বড়, পুং ক্ষেত্রে)	কাই-কু-আ-না	,, ভাই (বড়)	সা-সি-গি	,, ভাই

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
৯২ আমার মাতার ভাইয়ের পুত্র (ছোট, পুং)	কাই-কা-ই-না	আমার ভাই (ছোট)	সা-সি-গি	আমার ভাই
৯৩. ” ” ” পুত্রের স্ত্রী	ওয়া-হী না	” স্ত্রী	সাগ-হোন-ই	” বোন
৯৪. ” ” ” কন্যা	কাই-কু-ওয়া-হী-না	” বোন	” ”	” ”
৯৫. ” ” ” কন্যার স্বামী	কাই-কো-ঈ-কা	” ভগ্নীপতি	সা-সি-গি	” ভাই
৯৬. ” ” ” পুত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	” পুত্র	লি-ই ফা	” পুত্র
৯৭. ” ” ” ” কন্যা	” ” ওয়া-হী-না	” কন্যা	” ” হোন-ই	” কন্যা
৯৮. ” ” ” কন্যার পুত্র	” ” কা-না	” পুত্র	” ” ফা	” পুত্র
৯৯. ” ” ” ” কন্যা	” ” ওয়া-হী-না	” কন্যা	” ” হোন-ই	” কন্যা
১০০. ” ” ” পৌত্রের পুত্র	মু-পু-না কা-না	” পৌত্র	মা-পি-গা ফা	” পৌত্র
১০১. ” ” ” ” কন্যা	” ” ওয়া-হী-না	” পৌত্রী	” ” হোন-ই	” পৌত্রী
১০২. ” ” ” ” পৌত্র	” ” কা-না	” পৌত্র	” ” ফা	” পৌত্র
১০৩. ” ” ” ” পৌত্রী	” ” ওয়া-হী-না	” পৌত্রী	” ” হোন-ই	” পৌত্রী
১০৪. ” মাতার বোন	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	” মাতা	ওই-হোন-ই	” মাতা
১০৫. ” ” বোনের স্বামী	” ” কা-না	” পিতা	” ফা	” পিতা
১০৬. ” ” ” পুত্র (বড়, পুং ক্ষেত্রে	কাই-কু-আ-না	” ভাই (বড়)	সা-সি-গি	” ভাই
১০৭. ” ” ” ” (ছোট, ” ”	কাই-কা-ই-না	” ” (ছোট)	” ”	” ”
১০৮. ” ” ” পুত্রের স্ত্রী	ওয়া-হী-না	” স্ত্রী	সাগ-হোন-ই	” বোন
১০৯. ” ” ” কন্যা	কাই-কু ওয়া-হী-না	” বোন	” ”	” ”
১১০. ” ” ” কন্যার স্বামী	কাই-কো-ঈ-কা	” ভগ্নীপতি	সা-সি-গি	” ভাই

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১১১. আমার মাতার বোনের পুত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	আমার পুত্র	লি-ই ফা	আমার পুত্র
১১২. " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" কন্যা	" " হোন-ই	" কন্যা
১১৩. " " " কন্যার পুত্র	" " কা-না	" পুত্র	" " ফা	" পুত্র
১১৪. " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" কন্যা	" " হোন-ই	" কন্যা
১১৫. " " " পৌত্রের পুত্র	মু-পু-না কা-না	" পৌত্র	মা-পি-গা ফা	" পৌত্র
১১৬. " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
১১৭. " " " " পৌত্র	" " কা-না	" পৌত্র	" " ফা	" পৌত্র
১১৮. " " " " পৌত্রী	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
১১৯. " পিতার পিতার ভাই	কু-পু-না কা-না	" পিতামহ	" " ফা	" পিতামহ
১২০. " " " ভাইয়ের পুত্র	মা-কু-আ কা-না	" পিতা	ওই-ফা	" পিতা
১২১. " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" মাতা	ওই-হোন ই	" মাতা
১২২. " " " " পৌত্র (বড়)	কাই-কু-আ-না	" ভাই (বড়)	সা-সি-গি	" ভাই
১২৩. " " " " পৌত্রী (বড়)	" " ওয়া-হী-না	" বোন (বড়)	সাগ-হোন-ই	" বোন
১২৪. " " " " পৌত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	" পুত্র	লি-ই ফা	" পুত্র
১২৫. " " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" কন্যা	লি-ই হোন-ই	" কন্যা
১২৬. " " " " পৌত্রের পৌত্র	মু-পু-না কা-না	" পৌত্র	কা-পি-গা ফা	" পৌত্র
১২৭. " " " " " পৌত্রী	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
১২৮. " " " বোন	কু-পু-না ওয়া-হী-না	" পিতামহী	" " " "	" পিতামহী
১২৯. " " " বোনের পুত্র	মা-কু-আ কা-না	" পিতা	ওই-ফা	" পিতা

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৩০. আমার ঠাকুরদার বোনের কন্যা	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	আমার মাতা	ওই-হোন-ই	আমার মাতা
১৩১. „ „ „ পৌত্র (বড়)	কাই-কু-আ-না	„ ভাই (বড়)	সা-সি-গি	„ ভাই
১৩২. „ „ „ পৌত্রী („)	„ „ ওয়া-হী-না	„ বোন („)	সাগ-হোন-ই	„ বোন
১৩৩. „ „ „ পৌত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	„ পুত্র	লি-ই ফা	„ পুত্র
১৩৪. „ „ „ পৌত্রের কন্যা	কাই-কী ওয়া-হী-না	„ কন্যা	লি-ই হোন-ই	„ কন্যা
১৩৫. „ „ „ „ পৌত্র	মু-পু-না কা-না	„ পৌত্র	মা-পি-গা ফা	„ পৌত্র
১৩৬. „ „ „ „ পৌত্রী	„ „ ওয়া-হী-না	„ পৌত্রী	„ „ হোন-ই	„ পৌত্রী
১৩৭. „ মাতার মাতার ভাই	কু-পু-না কা-না	„ মাতামহ	„ „ ফা	„ মাতামহ
১৩৮. „ „ „ ভাইয়ের পুত্র	মা-কু-আ „	„ পিতা	ওই-ফা	„ পিতা
১৩৯. „ „ „ „ কন্যা	„ „ „ ওয়া-হী-না	„ মাতা	ওই-হোন-ই	„ মাতা
১৪০. „ „ „ „ পৌত্র (বড়)	কাই-কু-আ-না	„ ভাই (বড়)	সা-সি-গি	„ ভাই
১৪১. „ „ „ „ পৌত্রী („)	„ „ ওয়া-হী-না	„ বোন („)	সাগ-হোন-ই	„ বোন
১৪২. „ „ „ „ পৌত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	„ পুত্র	লি-ই ফা	„ পুত্র
১৪৩. „ „ „ „ „ কন্যা	„ „ ওয়া-হী-না	„ কন্যা	„ „ হোন-ই	„ কন্যা
১৪৪. „ „ „ „ „ পৌত্র	মু-পু-না কা-না	„ পৌত্র	মা-পি-গা ফা	„ পৌত্র
১৪৫. „ „ „ „ „ পৌত্রী	„ „ ওয়া-হী-না	„ পৌত্রী	„ „ হোন-ই	„ পৌত্রী
১৪৬. „ মাতার মাতার বোন	কু-পু-না ওয়া-হী-না	„ মাতামহী	„ „ „ „	„ মাতামহী
১৪৭. „ „ „ বোনের পুত্র	মা-কু-আ কা-না	„ পিতা	ওই-ফা	„ পিতা
১৪৮. „ „ „ „ কন্যা	„ „ ওয়া-হী-না	„ মাতা	ওই-হোন-ই	„ মাতা

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৪৯. আমার দিদিমার বোনের পৌত্র (বড় পুং)	কাই-কু-আ-না	আমার ভাই (বড়)	সা-সি-গি	আমার ভাই
১৫০. ,, ,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, বোন (,,)	সাগ-হোন-ই	,, বোন
১৫১. ,, ,, ,, পৌত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
১৫২. ,, ,, ,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, কন্যা	,, ,, হোন-ই	,, কন্যা
১৫৩. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি গা ফা	,, পৌত্র
১৫৪. ,, ,, ,, ,, পৌত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
১৫৫. ,, স্বামী	কা-না	,, স্বামী	ভে-ভেন-ই	,, স্বামী
১৫৬. ,, স্ত্রী	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	হোই-এ-না, এবং হেন্	,, স্ত্রী
১৫৭. ,, স্বামীর পিতা	মা-কু-আ-হু-না-আই	,, শ্বশুর	ওই-ফা	,, পিতা
১৫৮. ,, ,, মাতা	,, ,, ,,	,, শাশুড়ী	ওই-হোন-ই	,, মাতা
১৫৯. ,, স্ত্রী পিতা	,, ,, ,,	,, শ্বশুর	ওই-ফা	,, পিতা
১৬০. ,, ,, মাতা	,, ,, ,,	,, শাশুড়ী	ওই-হোন-ই	,, মাতা
১৬১. ,, জামাতা	হু-নো-না কা-না	,, জামাতা	লি-ই ফা	,, পুত্র
১৬২. ,, পুত্রবধূ	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
১৬৩. ,, স্বামীর ভাই (দেবর বা ভাশুর	কা-না	,, স্বামী	হোম্-ফু-এ	,, দেবর বা ভাশুর
১৬৪. ,, ভগ্নীপতি (নারীর ক্ষেত্রে)	,,	,, ,,	মে-ই	,, ভগ্নীপতি
১৬৫. ,, ভায়রাভাই (স্ত্রীর বোনের স্বামী)	পু-না-লু-আ	,, ঘনিষ্ঠ সাথী	—	—
১৬৬. ,, শ্যালক	কাই-কো-আ-কা	,, শ্যালক	মে-ই	,, শ্যালক
১৬৭. ,, শ্যালিকা	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	হোম্-ফু-এ	,, শ্যালিকা

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৬৮. আমার ননদ (স্বামীর বোন)	কাই-কো-আ-কা	আমার ননদ	মে-ই	আমার ননদ
১৬৯. ,, ভাদ্রবধূ (ভাইয়ের স্ত্রী)	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	হোম্-ফু-এ	,, ভাদ্রবধূ
১৭০. ,, ভাজ (ভাইয়ের স্ত্রী, নারীর ক্ষেত্রে)	কাই-কো-আ-কা	,, ভাজ	,, ,,	,, ভাজ
১৭১. ,, জা (দেবর বা ভাশুরের স্ত্রী)	পু-না-লু-আ	,, ঘনিষ্ঠ সাথী	—	—
১৭২. ,, শালাজ (শ্যালকের স্ত্রী)	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	—	—
১৭৩. ,, বিপিতা	মা-কু-আ কা-না	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
১৭৪. ,, বিমাতা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, মাতা	ওই-হোন-ই	,, মাতা
১৭৫. ,, সৎ-পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
১৭৬. ,, সৎ-কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার

ঐতিহাসিক যুগে ইওরোপ, এশিয়া ও আমেরিকায় এবং বর্তমান শতাব্দীতে পলিনেশিয়ায় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। বন্যতার যুগে মানবজাতির প্রায় সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পরও কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে এই পরিবার টিকে থেকেছে। আর ব্রিটনরা বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে পেঁছিনোর পরও তাদের মধ্যে এই দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার প্রথা টিকেছিল।

মানব ইতিহাসের গতিপথে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের পর দেখা দিয়েছিল এই পরিবার। আসলে এটা ছিল ঐ ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারেরই একটা পরিবর্তিত রূপ। প্রথম ধরনের পরিবার থেকে দ্বিতীয় ধরনের পরিবারটা গড়ে উঠেছিল আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফল হিসেবেই। এই ধরনের বিবাহের অশুভ দিকটা আস্তে আস্তে উপলব্ধি করেছিল মানুষ। ঠিক কী কী ঘটনার ফলে এই পরিবর্তন ঘটেছিল, তা জানা আজ আর সম্ভব নয়। তবে বিষয়টার একটা রূপরেখা দেওয়ার মত প্রমাণাদি আমাদের হাতে এসেছে। যে-সব তথ্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছি, সেগুলো মোটেই খুব আকর্ষণীয় ধরনের নয়। কিন্তু এগুলো থেকে মূল সত্যটা খুঁজে নেওয়ার জন্য দরকার ধৈর্যশীল ও সযত্ন পর্যালোচনা।

ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারে আপন ভাইবোনদের মধ্যেও বিবাহ হত, আবার জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যেও বিবাহ হত। এই পরিবারকে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে পরিবর্তিত করার জন্য দরকার ছিল জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহের রীতিটা চালু রেখে আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহটা বন্ধ করা। এইভাবে একটা দলের মধ্যে বিবাহ চালু রাখা আর অন্য একদল নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করে দেওয়াটা ছিল খুবই দুরূহ একটা প্রক্রিয়া। কেননা এর সঙ্গে পরিবারের কাঠামোর একটা আমূল পরিবর্তনের ব্যাপার জড়িয়ে ছিল (গার্হস্থ্য জীবনের প্রাচীন ধাঁচটার পরিবর্তনের কথা তো না বললেও চলে)। একটা বিশেষ সুবিধা পরিত্যাগের ব্যাপারও জড়িয়ে ছিল এর সঙ্গে, যা করতে বন্য মানুষরা খুব একটা রাজি ছিল না। প্রক্রিয়াটা প্রথমে শুরু হয়েছিল দু'একটা গোষ্ঠীর মধ্যে—এটা ধরেই নেওয়া যায়। তারপর ধীরে ধীরে স্বীকৃতি পেয়েছে এই পদক্ষেপটা। দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এ নিয়ে। বন্যদশায় থাকা অগ্রসর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই প্রথমে শুরু হয়েছিল প্রক্রিয়াটা। প্রথমে এই পদক্ষেপটা আংশিকভাবে গৃহীত হয়, ক্রমে ক্রমে তা একটা সাধারণ চেহারা নেয়, আর সবশেষে ঐ-সব গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পুরোপুরিভাবে এই পদক্ষেপটা গৃহীত

ও স্বীকৃত হয়। এ ঘটনাকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মের কার্যকলাপের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণীগত ব্যবস্থার তাৎপর্যটা নতুন করে সামনে এসে দাঁড়ায়। শ্রেণীগুলো গড়ে তোলার পদ্ধতি থেকে এবং বিবাহ ও বংশধারা নির্ণয়ের রীতিনীতি থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহের অবসান ঘটানো আর জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহটা চালু রাখা। শ্রেণীগুলোর ওপরে প্রথম এই উদ্দেশ্যটা আইনের সাহায্যে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা আপাতভাবে স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও, তাদের বংশধারার পর্যালোচনা করলেই ঐ উদ্দেশ্যটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।[১] দেখা যায় যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং আরও দূরবর্তী সারির জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠাটা চলতেই থাকে, শুধু আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহটা বন্ধ হয়ে যায়। হাওয়াইয়ানদের তুলনায় দলগত বিবাহের দলগুলোর সদস্য সংখ্যা অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে কিছুটা বেশিই হয়, আর এদের দলগুলোর কাঠামোটাও কিছুটা অন্যরকম। কিন্তু একদা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হাওয়াইয়ান আর অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই: উভয় ক্ষেত্রেই স্বামীদের দলটা গড়ে ওঠে কয়েকজন ভাইকে নিয়ে আর স্ত্রীদের দলটা গড়ে ওঠে কয়েকজন বোনকে নিয়ে। তবে হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য ছিল। তাদের মধ্যে এমন কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, যাদের মধ্যে বিবাহ হওয়াটা বাধ্যতামূলক হিসেবে দেখা যেত। অস্ট্রেলিয়ানদের শ্রেণীগুলোর মধ্যে থেকেই গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহের দলগুলো (যার মধ্যেই নিহিত ছিল গোত্রের বীজ)। এ থেকে মনে হয় যে-সব মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পরবর্তীকালে গোত্রীয় সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তাদের সকলকার মধ্যেই একসময় এই লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। সুপ্রাচীনকালে হাওয়াইয়ানদের মধ্যেও এ-রকম শ্রেণীর অস্তিত্ব থেকে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

মানবজাতির তিনটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সবথেকে বহুল বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানের উৎস হিসেবে কাজ করেছে দলগত বিবাহের দলগুলোর মত একটা প্রাচীন সংগঠন। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার, গোত্রীয় সংগঠন আর তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার নিয়ে আলোচনা করলে এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কিছু প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

দলগত বিবাহ থেকে যেমন গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার, ঠিক তেমনি এই পরিবারই জন্ম দিয়েছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার। আসলে, এই পরিবারের আওতায় থাকা সম্পর্কগুলোর প্রকৃত রূপটা ব্যক্ত করার জন্যই পূর্বতন জ্ঞাতিত্ব-

---

১। ইপ্পাই আর কাপোটাদের বিবাহ হয় একটা দলের মধ্যে। ইপ্পাইদের সন্তানরা হয় মুরি, আবার মুরিদের সন্তানরা হয় ইপ্পাই। একইভাবে, কাপোটাদের সন্তানরা হয় মাটা, আবার মাটাদের সন্তানরা হয় কাপোটা। অর্থাৎ ইপ্পাই আর কাপোটাদের নাতি-নাতনিরাও ইপ্পাই আর কাপোটাই হয় এবং তাদের সম্পর্কটা হয় জ্ঞাতি ভাইবোনের সম্পর্ক। ফলে, জন্মসূত্রেই তারা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরিচিত হয়।

ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হয়েছিল। কিন্তু এ-কাজ করার জন্য দলগত বিবাহের ঐ দলগুলোর থেকেও উন্নত একটা-কিছুর দরকার ছিল। সেই উন্নত কাঠামোর কাজটা করেছিল গোত্রীয় সংগঠন। এই সংগঠন একটা সাংগঠনিক বিধান জারি করে ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল (তার আগে পর্যন্ত ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ প্রায়শই ঘটত বলে ধরে নেওয়া যায়)। ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই ধরনের বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যাবতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। সম্পর্কের এই নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য দরকার হল নতুন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। তারই ফলস্বরূপ মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বদলে গড়ে উঠল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। হাওয়াইয়ানদের মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু গোত্রীয় সংগঠন বা তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অন্তর্গত জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকেই তারা টিকিয়ে রেখেছিল। এ থেকে একটা সন্দেহ দানা বাঁধে, যার সমর্থন পাওয়া যায় বিংঘামের বক্তব্যের মধ্যেও। সন্দেহটা হল—এদের দলগত বিবাহের দলগুলোয় আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহও হামেশাই ঘটত, ফলে পুরোনো জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সংস্কার করা আদৌ সম্ভব ছিল না। হাওয়াইয়ান ধাঁচের দলগত বিবাহভিত্তিক দলগুলো অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণীগুলোর মত সুপ্রাচীন যুগে গড়ে উঠেছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। কেননা আজ পর্যন্ত যত ধরনের সমাজকাঠামোর কথা জানা গেছে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ানদের এই শ্রেণীগুলোই সবথেকে প্রাচীন। কিন্তু, গোত্র গড়ে ওঠার জন্য কোন-না-কোন ধরনের দলগত বিবাহভিত্তিক দলের অস্তিত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, ঠিক যেমন তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল গোত্রের উপস্থিতি। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমরা এখন আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব।

১। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার

কয়েকটি বিরল ক্ষেত্রে এমন দু'একটি নির্দিষ্ট রূপবিশিষ্ট প্রথার খোঁজ পাওয়া গেছে, যেগুলোকে প্রাচীন সমাজের কয়েকটি রহস্যের জট ছাড়ানোর চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যে-সব বিষয়কে আগে ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যেত না, সেগুলোর ব্যাখ্যা করা যায় এইসব প্রথার সাহায্যে। হাওয়াইয়ানদের 'পুনালুয়া' হচ্ছে এ-রকমই একটা প্রথা। হনলুলুর বিচারপতি লরিন অ্যান্ড্রুজ ১৮৬০ সালে লেখা একটি চিঠিতে (যার মধ্যে হাওয়াইয়ান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার একটা তালিকাও দিয়েছিলেন তিনি) হাওয়াইয়ানদের জ্ঞাতিত্বসূচক একটি সম্বোধন সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: "এদের 'পুনালুয়া' সম্বন্ধটা দ্ব্যর্থবোধক। আদতে এর অর্থ ছিল যে দুই বা ততোধিক ভাই আর তাদের স্ত্রীরা এবং দুই বা ততোধিক বোন আর তাদের স্বামীরা প্রত্যেকেই পরস্পরের স্বামী বা স্ত্রী। বর্তমানে এর অর্থ হল 'প্রিয় বন্ধু' বা 'ঘনিষ্ঠ সাথী'।" বিচারপতি অ্যান্ড্রুজ-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যে তাদের মধ্যে একসময় দলগত বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং এখন তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গেই বোঝা যায় যে তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা একসময় ওখানকার সকলের মধ্যেই চালু ছিল। ঐ দ্বীপপুঞ্জের সবথেকে বিশিষ্ট

মিশনারীদের অন্যতম রেভারেন্ড আর্টেমান বিশপ (সম্প্রতি প্রয়াত) ঐ ১৮৬০ সালেই আমার কাছে পাঠানো একটি চিঠিতে (জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার তালিকা তিনিও দিয়েছিলেন) এ বিষয়ে লিখেছিলেন : "সম্পর্কের ব্যাপারে এই বিভ্রান্তিটা আসলে প্রাচীন আমলের দলগত স্বামী-স্ত্রী প্রথারই ফল।" মিস্টার বিংঘামের মন্তব্য তো আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে এদের বহুবিবাহের অর্থ হচ্ছে "বহু স্বামী ও বহু স্ত্রী থাকা।" ডাঃ বার্টলেটও একই কথা বলেছেন : "এখানকার আদিবাসীদের শালীনতা বা লজ্জাবোধ জন্তু-জানোয়ারদের থেকে মোটেই উন্নত নয়। স্বামীদের বহু স্ত্রী থাকে, স্ত্রীদের থাকে বহু স্বামী, এবং যথেচ্ছভাবে একে অপরের সঙ্গে স্বামী বা স্ত্রী বিনিময় করে।"[১] এঁরা সকলে যে ধরণের বিবাহপ্রথা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা হচ্ছে দলগত বিবাহ। অর্থাৎ, একদল পুরুষ ও একদল নারী পরস্পরের সঙ্গে দলগতভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এদের সন্তানসন্ততি সমেত এই ধরনের প্রতিটা দলই ছিল একেকটা দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। একটা পরিবারে থাকত কিছু সংখ্যক ভাই আর তাদের স্ত্রীরা, আর একটা পরিবারে থাকত কয়েকজন বোন আর তাদের স্বামীরা।
হাওয়াইয়ানদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে পুরুষরা তাদের স্ত্রীর বোনকেও নিজের স্ত্রী বলেই সম্বোধন করে। কোন পুরুষের স্ত্রীর সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিবোনেরাই তার স্ত্রী। কিন্তু নিজের স্ত্রীর বোনের স্বামীকে সে বলে 'পুনালুয়া', অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সাথী। তার স্ত্রীর সমস্ত বোনেদের স্বামীরাই তার ঘনিষ্ঠ সাথী। এদের বিবাহ হত দলগতভাবে। খুব সম্ভবত এইসব স্বামীরা পরস্পরের ভাই ছিল না। তারা পরস্পরের ভাই হলে জ্ঞাতিত্বের ক্ষেত্রে রক্তের সম্বন্ধটা বজায় থাকত। তবে, তাদের স্ত্রীরা ছিল পরস্পরের বোন—আপন এবং জ্ঞাতিসম্পর্কিত, এক্ষেত্রে স্ত্রীদের এই ভগ্নীত্বের ভিত্তিতেই দলগুলো গড়ে উঠত, তাদের স্বামীরা বিবেচিত হত পরস্পরের 'পুনালুয়া' বা ঘনিষ্ঠ সাথী হিসেবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দলগুলো গড়ে উঠত স্বামীদের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে, এবং স্ত্রীরা তাদের স্বামীর ভাইকেও নিজের স্বামী বলেই সম্বোধন করত। কোন নারীর স্বামীর সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিভাইরাই তার স্বামী হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রীকে সে ডাকত 'পুনালুয়া' বলে। স্বামীর সমস্ত ভাইদের যতজন স্ত্রী থাকত, সকলেই ছিল তার 'পুনালুয়া'। আগের ক্ষেত্রে যে-কারণে স্বামীরা পরস্পরের ভাই হত না বলে ধরা হয়েছে, সেই একই কারণে এক্ষেত্রেও এই স্ত্রীরা সম্ভবত পরস্পরের বোন হত না—অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই কিছু-না-কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই থাকত। এই সমস্ত স্ত্রীরাই ছিল পরস্পরের 'পুনালুয়া।'
ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকেই যে গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাইদের সঙ্গে আপন বোনেদের বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমাজের বুকে গোত্রীয় সংগঠন পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনেদের সঙ্গে বিবাহও। কিন্তু এই অন্তর্বর্তী

১। "হিস্টোরিক্যাল স্কেচ অফ দ্য মিশনস্, এট্‌সেট্রা, ইন দ্য স্যাণ্ডউইচ আইল্যাণ্ডস," পৃঃ ৫।

স্বগোষ্ঠীর দলের একজন সদস্যের বাকি স্ত্রীরা অন্য সকলেরও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হত। একইভাবে, বোনেদের সঙ্গে আপন ভাইদের বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার দীর্ঘকাল পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইদের সঙ্গে বিবাহও। কিন্তু তাদের বাকি স্বামীরা গণ্য হত অন্য সমস্ত নারীর স্বামী হিসেবেও। ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারে এই অগ্রগতিটা ছিল একটা মহান প্রগতির সূচনাবিন্দু। এই পদক্ষেপ-টাই গড়ে তুলেছিল গোত্রীয় সংগঠনের ভিত্তিভূমি। আর গোত্রীয় সংগঠনই সমাজকে জোড়-বাঁধা বিবাহের স্তর অতিক্রম করিয়ে পেঁছে দিয়েছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে।

দলগত বিবাহের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। আসলে, তুরানীয় ও গ্যানোয়া-নিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা যখন প্রথম গড়ে উঠেছিল, তখন তাদের পক্ষে এই প্রথাটা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণটা নিতান্তই সহজবোধ্য। দলগত বিবাহের সাহায্যেই তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বিভিন্ন সম্পর্কগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় যে-সব সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, সবগুলোই সম্ভবত টিকে থেকেছে পরবর্তীকালেও। কাজেই, এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত ছিল দলগত বিবাহ এবং দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। আজকের সুসভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও অতীতে দলগত বিবাহ চালু ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। গ্রীক, রোমান, জার্মান, কেল্ট, হিব্রু প্রভৃতি যে-সব জাতির মধ্যে গোত্রীয় সংগঠনের দেখা পাওয়া গেছে, তাদের সকলেরই সুপ্রাচীন পূর্ব-পুরুষরা একসময় অভ্যস্ত ছিল দলগত বিবাহে। কারণ যে-সব জাতি গোত্রীয় সংগঠনের ছত্রছায়া থেকে একবিবাহের স্তরে এসে পেঁছেছে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একসময় চালু ছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা আর এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহের ফল হিসেবেই। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এইসব দলগুলোর গড়ে ওঠা থেকে যে অগ্রগতির সূচনা ঘটেছিল, তা মূলত সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল গোত্র গঠনের স্তরে এসে, আর একবিবাহের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত গোত্রের মধ্যে চালু ছিল তুরানীয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা।

ইওরোপীয়, এশিয় এবং আমেরিকান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দু'একটা ক্ষেত্রে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায় পর্যন্ত দলগত বিবাহের নিদর্শন দেখা গেছে। প্রাচীন আমলের ব্রিটনদের বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে সিজার যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটাই এ ব্যাপারে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছেন, "দশজন বা বারোজন স্বামী যৌথভাবে পরস্পরের স্ত্রীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখত। বিশেষত বিভিন্ন ভাইরা যৌথভাবে পরস্পরের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত এবং এরা প্রত্যেকেই তাদের প্রতিটি সন্তানের পিতা-মাতা হিসেবে গণ্য হত।"[১]

এই কথাগুলোর মধ্যে দলগত অন্তর্বিবাহের একটা ছবিই ফুটে উঠেছে। বর্বর পর্যায়ে নারীদের দশ বা বারোটা পুত্র সন্তান হওয়া খুব একটা স্বাভাবিক নয়, বা বড়জোর দু'একটা ক্ষেত্রে তা ঘটতে পারে। কিন্তু তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় (ব্রিটনদের মধ্যে এই ব্যবস্থাই চালু ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়) সর্বদাই ভাইদের বড় বড় দলের কথা জানা

১। "দ্য বেল. গল," V, ১৪.

যায়। আসলে যে-কোন পুরুষের নিকট ও দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিভাইরাও তার ভাই হিসেবেই গণ্য হতো। সিজারের মতে, ব্রিটনদের মধ্যে একদল ভাইয়ের একদল বৌথ স্ত্রী থাকত। এখানে আমরা এক ধরনের দলগত বিবাহেরই ছবি খুঁজে পাই। এর পাশাপাশি কিছু সংখ্যক বোনেরও যে একদল যৌথ স্বামী থাকত, তার কথা সিজার সরাসরিভাবে উল্লেখ করেন নি। তাসত্ত্বেও, প্রথম দলটার পরিপূরক হিসেবে এই এই দ্বিতীয় দলটারও অস্তিত্ব ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়। প্রথম দলটার অস্তিত্ব ছাড়া আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন সিজার। তিনি দেখেছিলেন, কিছু সংখ্যক পুরুষের কয়েকজন যৌথ স্ত্রী থাকে এবং সন্তানরাও বিবেচিত হয় তাদের সকলের সন্তান হিসেবে। এই যৌথ স্ত্রীরা ছিল পরস্পরের বোন—এমনটা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে সিজারের এই মন্তব্য ঐ দ্বিতীয় দলটার ইঙ্গিত দিক আর না-ই দিক, তাঁর কথা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ব্রিটনদের সমাজে দলগত বহুবিবাহ কত ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত ছিল। আসলে এই ব্যাপারটার জন্যই তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল ব্রিটনদের দিকে। কিছুসংখ্যক ভাইয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিল পরস্পরের স্ত্রীদের স্বামী, আর তাদের স্ত্রীরা প্রত্যেকেই ছিল পরস্পরের স্বামীর স্ত্রী।

বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে থাকা ম্যাসাগেটেদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হেরোডোটাস লিখেছেন—প্রতিটি পুরুষের একজন করে স্ত্রী থাকত, কিন্তু সমস্ত স্ত্রীরাই ছিল সকলের যৌথ স্ত্রী।[১] এই বক্তব্যের মধ্যে দলগত বিবাহের জায়গায় জোড়-বাঁধা পরিবারের অভ্যুদয়ের একটা আভাস ফুটে উঠেছে। প্রতিটি পুরুষ একজন স্ত্রীর সঙ্গে জোড় বাঁধত এবং ঐ স্ত্রী গণ্য হতে তার প্রধান স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু তাসত্ত্বেও দলের মধ্যে যৌথ স্বামী ও যৌথ স্ত্রী প্রথার কোন ব্যত্যয় ঘটে নি। এখানে হেরোডোটাস যদি অবাধ যৌন-সম্পর্কের কথা বলতে চেয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হয় যে ঐ অবস্থাটা তখন চালু ছিল না। লোহার ব্যবহার না জানলেও ম্যাসাগেটেরা গবাদি পশুর পাল পুষতে শিখেছিল, তামার তৈরি কুঠার আর তামার ফলা লাগানো বর্শা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত এবং চাকালাগানো শকট (amaxa) তৈরি ও ব্যবহার শুরু করেছিল। অবাধ যৌনসংসর্গের অবস্থায় থাকা কোন গোষ্ঠীর পক্ষে এতটা উন্নত হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। অ্যাগাথাইর্সিদের (যারাও সম্ভবত একই অবস্থায় ছিল) সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন যে এদের মধ্যে যৌথ স্ত্রী প্রথা চালু ছিল, স্বামীরা ছিল সম্ভবত পরস্পরের ভাই এবং একটা যৌথ পরিবারের সদস্য হওয়ার দরুণ কেউ কাউকে ঈর্ষা বা ঘৃণা করত না।[২] ম্যাসাগেটেদের সম্বন্ধে এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেকার এই একই প্রথা চালু থাকা সম্বন্ধে হেরোডোটাস যা বলেছেন, তার যুক্তিসম্মত ও সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা বহুবিবাহ বা অবাধ যৌনাচারের মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় দলগত বিবাহের মধ্যেই। তাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল, তা বোঝার পক্ষে হেরোডোটাসের বক্তব্য নিতান্তই অপ্রতুল।

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের সবথেকে অনুন্নত কয়েকটা গোষ্ঠীর মধ্যে দলগত

১। লিব., i, পৃঃ ২১৬.

২। লিব., iv, পৃঃ ১০৪.

বিবাহের কিছু কিছু নিদর্শন দেখা গেছে। তবে এ ব্যাপারে কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নি। যে-সব নাবিকরা ভেনিজুয়েলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের গোষ্ঠী-গুলোর সন্ধান প্রথম পেয়েছিল, তারা এমন একটা সমাজের ছবি দেখেছিল যা দলগত বিবাহের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। "তারা বিবাহের কোনরকম রীতিনীতিই মেনে চলে না। যতখুশি স্ত্রী রাখে, মেয়েরা যথেচ্ছাভাবে স্বামী বদলায়। নারী বা পুরুষ কেউই এর মধ্যে কোন অন্যায় দেখে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের মর্জিমাফিক চলে, কেউ কাউকে ঈর্ষা করে না, কেউ কারুর ক্ষতি করে না……। বাড়িগুলো সার্বজনীন। তালপাতায় ছাওয়া ঘণ্টাকৃতি এই বিশাল বাড়িগুলো বেশ মজবুত। এক একটা বাড়িতে একশ ষাটজন করে লোক বাস করে।"[১] এইসব গোষ্ঠীর লোকেরা মাটির তৈরি পাত্র ব্যবহার করত, অর্থাৎ এরা তখন বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে ছিল। কিন্তু বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায় বন্য দশাতেই রয়ে গিয়েছিল তারা। এই বিবৃতিটা এবং হেরোডোটাস-প্রদত্ত বিবৃতিগুলোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে নিতান্তই কিছু ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণ। তবে এ-থেকে পরিবার এবং বৈবাহিক সম্পর্কের একটা অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থার ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের মধ্যে দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দলগত বিবাহপ্রথার কোন নিদর্শন তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল বলে আমার জানা নেই। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর থেকে তারা তখন পৌঁছে গিয়েছিল জোড়-বাঁধা পরিবারের স্তরে। কিন্তু প্রাচীনযুগের দলগত বিবাহের দাম্পত্য ব্যবস্থার কিছু কিছু ছাপ তাদের মধ্যে রয়েই গিয়েছিল। উত্তর আমেরিকার অন্তত চল্লিশটা ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও এমন একটা প্রথা চালু আছে, যার আদি উৎস নিঃসন্দেহেই দলগত বিবাহের মধ্যে নিহিত ছিল। একজন পুরুষ কোন পরিবারের বড় মেয়েকে বিবাহ করলে, প্রথা অনুসারে সে তার স্ত্রীর বাকি সমস্ত বোনেরা বিবাহযোগ্য হলে তাদেরও স্বামী হিসাবে পরিগণিত হয়। এই অধিকারটা অবশ্য কখনোই কারুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হত না, কারণ অনেকগুলো সংসার প্রতিপালন করতে স্বামীটিকে সমস্যায় পড়তে হত—অবশ্য বহু-বিবাহের সুযোগটা পুরুষরা সর্বত্রই ভোগ করত। এই প্রথাটা তাদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে দলগত বিবাহ চালু থাকারই প্রমাণ দেয়। একসময় নিশ্চয়ই ভগ্নীদের সুবাদে আপন বোনেরাও তাদের স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হত। একজনের স্বামী ছিল

১। হেরেরার-র "হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২১৬। ব্রাজিলের উপকূলবর্তী অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোর সম্বন্ধে বলতে গিয়েও হেরেরা লিখেছেন, "এরা বোহিও অর্থাৎ তালপাতায় ছাওয়া কুটিরে বাস করে। প্রতিটি গ্রামে এ-রকম আটটার মত কুটির থাকে। প্রতিটি কুটিরে প্রচুর লোক বাস করে। শোবার জন্য থাকে দোলনা-জাতীয় বিছানা…। এদের জীবনযাত্রা অনেকটা জন্তু-জানোয়ারের মত। ন্যায় কিংবা শালীনতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই।" ঐ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯৪। পেরুর কয়েকটি সবথেকে অনুন্নত গোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গার্সিলাসো দ্য লা ভেগা-ও প্রায় একই কথা বলেছেন।—"রয়্যাল কম্. অফ পেরু," ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১০ এবং ১০৬।

অন্য সকলেরও স্বামী, কিন্তু একমাত্র স্বামী নয়। কারণ দলের মধ্যেকার অন্য পুরুষরাও ছিল ঐ-সব নারীদের যৌথ স্বামী। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অবসান ঘটার পর একমাত্র বড়বোনের স্বামীই ইচ্ছে করলে বাকি সব বোনেদেরও স্বামী হিসেবে পরিগণিত হতে পারত। সঙ্গত কারণেই এটাকে প্রাচীন দলগত বিবাহপ্রথার অবশেষ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব থাকার নজির তুলে ধরা যায়, যা থেকে বোঝা যাবে প্রাচীন-কালে প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের পরিবার চালু ছিল। তবে তা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়, কেননা যে-সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিব্যবস্থা চালু আছে বা একসময় চালু ছিল, তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব থাকার সব-চেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে কাজ করে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটাই।

২। গোত্রীয় সংগঠনের সূচনা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল বন্য যুগে। কারণ, প্রথমত, গোত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে; আর দ্বিতীয়ত, বন্য যুগে গোত্র কেবলমাত্র আংশিকভাবে বিকশিত হতে পেরেছিল। তাছাড়া, গোত্রের বীজ যেমন নিহিত ছিল অস্ট্রেলিয়ানদের শ্রেণীগুলোর মধ্যে, তেমনই নিহিত ছিল হাওয়াইয়ানদের দলগত বিবাহের দলগুলোর মধ্যেও। অস্ট্রেলিয়ানদের ঐ শ্রেণীগুলোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গোত্রের মধ্যে শ্রেণীগুলোর আপাত গঠন-কাঠামোটার কোন অস্তিত্ব থাকে না। গোত্রের মত এত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান যে একেবারে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েই গড়ে উঠবে কিংবা একেবারে শূন্য থেকে (অর্থাৎ স্বাভাবিক বিকাশের পথে আগে থেকেই গড়ে ওঠা কোন বনিয়াদ ছাড়াই) গড়ে উঠবে—এমনটা হতেই পারে না। আগে থেকেই বিদ্যমান সামাজিক উপাদানগুলোর মধ্যেই খুঁজতে হবে এর সৃষ্টির সূত্র আর ধরে নিতে হবে যে সৃষ্টি হওয়ার পর একটা পরিণত রূপে পৌঁছোতে দীর্ঘদিন সময় লেগেছে গোত্রের।

অস্ট্রেলিয়ানদের শ্রেণীগুলোর মধ্যে প্রাচীন রূপের গোত্রের দুটি মৌলিক নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এক—ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ; এবং দুই—বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা অনুসরণ করা। গোত্র গঠনের সময় এই শেষোক্ত ব্যাপারটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেননা সন্তানদের তখন মায়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। শ্রেণী-গুলোর মধ্যে থেকে একান্ত স্বাভাবিকভাবে গোত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনাটা স্পষ্টতঃই গ্রহণযোগ্য। এই সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করে তোলে আরেকটি বিষয়। সেটা হচ্ছে—এক্ষেত্রে গোত্রের সঙ্গে আরও প্রাচীন একটা সংগঠনের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়, যে সংগঠন তখনও পর্যন্ত সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক ছিল। পরে গোত্রই হয়ে উঠেছিল সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক।

গোত্রের অঙ্কুরবাহী এই উপাদানগুলো হাওয়াইয়ানদের দলগত বিবাহের দলগুলোর মধ্যেও দেখা যায়। তবে সেখানে প্রথাটা শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত কিছু বোনের যৌথ স্বামী থাকে। এইসব বোন এবং তাদের সন্তানাদি ও

স্ত্রী-ধারার বংশধরদের নিয়েই গড়ে ওঠে প্রাচীন ধাঁচের গোত্র। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কারণ সুনিশ্চিতভাবে সন্তানদের পিতৃত্ব নির্ধারণ করা ছিল একান্তই অসম্ভব। দলের মধ্যে এই বিশেষ ধরণের বিবাহ একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছিল গোত্রের বনিয়াদ। এই স্বাভাবিক দলগত বিবাহভিত্তিক দলগুলোকে এইসব মা, তাদের সন্তান আর স্ত্রীধারার বংশধরদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটা সংগঠনে পরিণত করার জন্য দরকার ছিল কিছুটা বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন। হাওয়াইয়ানদের মধ্যে এই দলের অস্তিত্ব থাকলেও, গোত্রের ধারণা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। কিন্তু তাসত্ত্বেও বলতে হয় গোত্রের প্রাথমিক উৎস নিহিত ছিল মায়েদের ভগ্নীত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই ধরণের দলগুলোর মধ্যেই অথবা প্রায় একই নিয়মে গড়ে ওঠা অস্ট্রেলিয় দলগুলোর মধ্যে। এইসব দলগুলোর কিছু সদস্য আর তাদের কিছু বংশধরকে নিয়ে জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল গোত্র।
ঠিক কিভাবে গোত্র গড়ে উঠেছিল, তা বলা আজ আর সম্ভব নয়। সেইসব ঘটনা, সেই পরিস্থিতি আজ থেকে বহু বহু যুগ আগের কথা। কিন্তু প্রাচীন সমাজের কোন্ অবস্থায় গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল, তা নির্ণয় করা অসম্ভব কিছু নয়। আর ঠিক এই কাজটাই করার চেষ্টা করেছি আমি। গোত্রের সূচনা হয়েছিল মানুষের বিকাশের খুব নিচু একটা পর্যায়ে এবং সমাজের অত্যন্ত প্রাচীন অবস্থায়। অবশ্য দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার পরে সৃষ্টি হয়েছিল গোত্র। এটা একান্তই স্পষ্ট যে এই পরিবারের মধ্যেই মাথা তুলেছিল গোত্র। এই পরিবারের সদস্যারাই বিবেচিত হত গোত্রের সদস্য হিসেবে।
প্রাচীন সমাজের ওপর গোত্রের প্রভাবটা ছিল উন্নতির পক্ষে সহায়ক। একসময় গোত্র পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠল, ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ওপর পুরোপুরিভাবে বিস্তৃত হল তার প্রভাব। আগে সমাজে স্ত্রী পাওয়া যেত প্রচুর সংখ্যায়, কিন্তু এইসময় থেকে স্ত্রী হয়ে উঠল এক দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কারণ গোত্র ঐ দলগত বিবাহের দলগুলোকে সংকুচিত করে দিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত সেগুলোকে বিলুপ্তও করে দিয়েছিল। প্রাচীন সমাজের ওপর গোত্রীয় সংগঠনের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল জোড়-বাঁধা পরিবার। এই অগ্রগতির অন্তর্বর্তী স্তরগুলো সম্বন্ধে খুব জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার যে বন্য যুগের ব্যাপার আর জোড়-বাঁধা পরিবার যে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের, এবং প্রথমটা থেকেই যে গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় ধরনটা—তা যথেষ্ট নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। শেষোক্ত ধরনের পরিবার যখন গড়ে উঠতে শুরু করল আর দলগত বিবাহের অবসান সূচিত হল, তখন থেকেই দেখা দিল স্ত্রী ক্রয় করা বা গায়ের জোরে নারীদের বন্দী করে এনে বিবাহ করার রেওয়াজ। হাতের কাছে থাকা প্রমাণগুলোর দ্বারস্থ না হয়েও আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অবসান এবং বন্য যুগের সেই বিস্ময়কর দাম্পত্য ব্যবস্থার ধীরে ধীরে বিলোপ ঘটা—এই দুয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছিল গোত্রীয় সংগঠন। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকে গড়ে উঠলেও এই সংগঠন সমাজকে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিল ঐ পরিবারের স্তর ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত।

৩। তুরানিয় বা গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা

এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা এবং প্রাচীন ধাঁচের গোত্রীয় সংগঠন—এ দুটোকে সাধারণত একসঙ্গে দেখা যায়। এ দুটো অবশ্য পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়, তবে সমাজের অগ্রগতির ক্রমপর্যায়ে এ দুটো সম্ভবত কাছাকাছি সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা আর বিভিন্ন ধরনের পরিবারের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। পরিবারের মধ্যে সর্বদাই একটা নিয়মের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরিবার কখনোই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার অগ্রসর হয় নিম্নতর রূপ থেকে উচ্চতর রূপে এবং শেষপর্যন্ত উন্নীত হয় একটা উচ্চতর স্তরে। বিপরীতে, জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা কিন্তু অনেকটাই অনড় একটা ব্যাপার। পরিবারের মধ্যে যে-সব অগ্রগতি ঘটে চলে, তার ছাপ দীর্ঘদিন অন্তর দেখা যায় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে। পরিবারের যখন আমূল পরিবর্তন ঘটে, একমাত্র তখনই আমূল পরিবর্তন ঘটে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার।

সে সময় দলগত বিবাহ ও দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব না থাকলে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারত না। যে সমাজে কয়েকজন বোন দলবদ্ধভাবে বিবাহিত হয় পরস্পরের স্বামীর সঙ্গে আর কয়েকজন ভাই দলবদ্ধভাবে বিবাহিত হয় পরস্পরের স্ত্রীর সঙ্গে, সেই সমাজের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার বীজ। ঐ ধরনের পরিবারের প্রকৃত সম্পর্ককে ব্যক্ত করার জন্য গড়ে ওঠা যে-কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মত হতে বাধ্য ছিল। আর এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্হার উপস্হিতিই প্রমাণ করে যে তা গড়ে ওঠার সময় সমাজে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল।

এবার আমরা তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় বর্গের মধ্যে এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্হাটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এই ব্যবস্হা গড়ে ওঠার সময় যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারই চালু ছিল, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করব। যে ধরনের বিবাহ-প্রথার মধ্যে এর জন্ম হয়েছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং পরিবার তার দলগত বিবাহের স্তর পেরিয়ে জোড়-বাঁধা বিবাহের স্তরে এসে পৌঁছোনোর পরেও দুটো মহাদেশে আজও এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্হা টিকে আছে।

প্রমাণগুলো যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য গোটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্হাটাকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করা দরকার। আমেরিকার গ্যানোয়ানিয় গোষ্ঠীগুলোর আদর্শ প্রতিনিধি হিসেবে আমরা গ্রহণ করব সেনেকা-ইরোকোয়াদের এবং এশিয়ার তুরানিয় গোষ্ঠীগুলোর আদর্শ প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেব দক্ষিণ ভারতের তামিলদের। এইসব রূপগুলোতে একই ব্যক্তির প্রায় একইরকম দুশোটা করে সম্পর্কের কথা জানা যায়। এই পরিচ্ছেদের শেষে একটা সারনীতে এই সম্পর্কগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে। পূর্বতন একটা রচনায়[১] আমি আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের প্রায় সত্তরটা গোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্বব্যবস্হার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছি। এশিয়ার দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলুগু ও কানাড়িদের মধ্যেও এই

১। সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি,” স্মিথসনিয়ান কন্‌ট্রিবিউশন্‌স্ টু নলেজ, খণ্ড ১৭।

ব্যবস্থাই চালু আছে (সারনীতে এদের সম্পর্কের তালিকাও দেওয়া হয়েছে)। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় এ-রকম কিছু বিভিন্নতা থাকলেও, মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু একই থেকেছে। সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই জ্ঞাতিত্বসম্পর্ক অনুযায়ী সম্বোধনের রীতি চালু আছে, তবে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেই গেছে। যেমন, নিজের থেকে বয়সে ছোট কাউকে সম্বোধন করার সময় তামিলরা তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের নির্দিষ্ট রূপটা অবশ্যই উল্লেখ করে ; কিন্তু বয়সে বড় কারুর ক্ষেত্রে শুধু জ্ঞাতিত্বটা অথবা তার নামটা ব্যবহার করে থাকে। আবার আমেরিকার আদিবাসীরা সকলকেই সম্বোধন করে থাকে সম্পর্কের নির্দিষ্ট রূপ অনুযায়ী। আসলে গোটা ব্যবস্থাটা জ্ঞাতিত্ব আর আত্মীয়তার ব্যবস্থা বলেই সম্বোধনের ক্ষেত্রেও তারা এই ব্যবস্থাটা অনুসরণ করে চলে। যতদিন না একবিবাহ প্রথা এসে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত প্রাচীন গোত্রগুলোর প্রতিটি সদস্য এই ব্যবস্থার সাহায্যেই নিজের গোত্রের অন্য সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা চিনে নিতো। কোন পুরুষের সঙ্গে অন্যদের যা সম্পর্ক, কোন নারীর সঙ্গে তা নয়—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সেইজন্যেই সম্বোধনের ব্যাপারটাকে আমরা দু'বার করে উল্লেখ করেছি—একবার পুরুষের দিক থেকে, আর একবার নারীর দিক থেকে। কিছু কিছু বিভিন্নতা সত্ত্বেও গোটা ব্যবস্থাটা আদ্যন্ত যুক্তিসম্মত। এই ব্যবস্থার প্রকৃতিটা ফুটিয়ে তোলার জন্য সম্পর্কের কয়েকটা ধারা নিয়ে আলোচনা করা দরকার, যেমনটা করা হয়েছিল মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এখানে আমরা সেনেকা-ইরোকোয়াদেরকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে বেছে নিচ্ছি।

ঊর্ধমুখী ও নিম্নমুখী—উভয় ধরণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বীকৃত দূরতম সম্পর্ক হচ্ছে পিতামহ বা মাতামহ (হোক-সোটে) এবং পিতামহী বা মাতামহী (ওক-সোটে), আর পৌত্র বা দৌহিত্র (হা-ইয়া-ডা) এবং পৌত্রী বা দৌহিত্রী (কা-ইয়া-ডা)। এই সম্পর্কগুলোর আগের বা পরের পূর্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষরা যথাক্রমে ঐ একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

ভাইবোনের সম্পর্কটা মোটেই বিমূর্ত ধরনের নয়। তাদের ক্ষেত্রে দুটো ভাগ থাকে—জ্যেষ্ঠ বা বড় আর কনিষ্ঠ বা ছোট। প্রতিটা সম্পর্কের জন্য এক একটা অভিধাও আছে। যেমন :

বড় ভাই—হ্যা-গে ; বড় বোন—আহ্-জে।

ছোট ভাই—হ্যা-গা ; ছোট বোন—কা-গা।

বড় বা ছোট ভাইবোনদের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারী উভয়েই এই অভিধাগুলো ব্যবহার করে থাকে। তামিলদের মধ্যে এ ব্যাপারে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক পৃথক সম্বোধনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বর্তমানে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলেই এগুলোকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারি : কোন সেনেকা-ইরোকোয়া পুরুষের ভাইয়ের পুত্র-কন্যারা হচ্ছে তারও পুত্র-কন্যা (হা-আহ্-ওয়াক এবং কা-আহ্-ওয়াক) এবং তারা সকলেই ঐ পুরুষটিকে পিতা (হা-নিহ্) বলেই সম্বোধন করে। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য। কোন ব্যক্তির নিজের সন্তানরা আর তার ভাইয়ের সন্তানরা একই পর্যায়ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা যেমন তার ভাইয়ের সন্তান, তেমনি তারও সন্তান। ভাইয়ের পৌত্র-

পৌত্রীরা তারও পৌত্র-পৌত্রী (হা-ইয়া-ডা এবং কা-ইয়া-ডা, একবচনে) এবং তারা সকলে ঐ ব্যক্তিকে পিতামহ (হোক-সোটে) বলেই সম্বোধন করে। স্বীকৃত ও প্রাত্যাহিক জীবনে ব্যবহৃত সম্পর্কগুলোর কথাই আমরা এখানে উল্লেখ করছি। এদের মধ্যে অন্য আর কোন সম্পর্কের কথা জানা যায় নি।

কয়েকটা সম্পর্ক সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে থাকে। এই সম্পর্কগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সম্পর্কগুলোকে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর, এমনকি বিভিন্ন জাতির (যেমন তুরানিয় ও গ্যানোয়নিয়দের) জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে যখন এই সম্পর্কগুলোর একইরকম গুরুত্ব দেখা যায়, তখন এই ব্যবস্থাগুলোর মূলগত অভিন্নতার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের সামনে।

এবার স্ত্রী-ধারার দিকটা দেখা যাক। কোন পুরুষের বোনের পুত্র ও কন্যারা হচ্ছে তার ভাগ্নে-ভাগ্নী (হা-ইয়া ওয়ান-ডা এবং কা-ইয়া য়ান-ডা), এবং এরা সকলেই তাকে মামা বলে ডাকে। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। ভাগ্নে বা ভাগ্নীর সম্পর্কটা-শুধুমাত্র কোন পুরুষের আপন ও জ্ঞাতিবোনেদের সন্তানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, আর কারও ক্ষেত্রে নয়। এইসব ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী এবং তারা তাকে যথাযথ নামেই সম্বোধন করে।

কোন নারীর ক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে কয়েকটা বিপরীত রূপ নেয়। কোন নারীর ভাইয়ের পুত্র-কন্যারা হচ্ছে তার ভাইপো-ভাইঝি (হা-সোহ্-নেহ্ এবং কা-সোহ্-নেহ্ এবং এরা সকলেই তাকে পিসীমা বলে সম্বোধন করে। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, পুরুষ-দের ক্ষেত্রে ভাগ্নে-ভাগ্নীর অভিধা এবং নারীদের ক্ষেত্রে ভাইপো-ভাইঝির অভিধা আলাদা আলাদা। এইসব ভাইপো-ভাইঝির সন্তানরা হচ্ছে ঐ নারীটির নাতি-নাতনী। স্ত্রী-ধারার ক্ষেত্রে ঐ নারীর বোনের পুত্র-কন্যারা হচ্ছে তারও পুত্র-কন্যা, এবং তারা সকলে তাকে মা (নোহ্-ইয়েহ্) বলেই সম্বোধন করে। এদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী এবং তারা তাকে সম্বোধন করে পিতামহী বা মাতামহী (ওক-সোটে) বলে।

এইসব পুত্র ও ভাইপোদের স্ত্রীরা হচ্ছে ঐ নারীর পুত্রবধূ (কা-সা), এবং এইসব কন্যা ও ভাইঝিদের স্বামীরা হচ্ছে তার জামাই (ওক-না-হোসে, প্রতিটি অভিধাই একবচনে)। এরা প্রত্যেকে তাকে যথাযথ নামেই সম্বোধন করে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারি : প্রথমে এই সারির পুরুষ-ধারাটা, অর্থাৎ বাবার দিকটা লক্ষ্য করা যাক। পুত্র বা কন্যা উভয়েই বাবার ভাইকেও বাবাই বলে এবং তারাও এদেরকে পুত্র-কন্যা বলেই ডাকে। এটাই এই ব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। কোন ব্যক্তির বাবার সব ভাইরাই তার বাবা হিসাবে স্বীকৃত হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা হচ্ছে তার বড় বা ছোট ভাই-বোন। আপন ভাইবোনদের সে যে নামে সম্বোধন করে, সেই নামেই সম্বোধন করে ঐ-সব ভাইবোনদেরও। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। এর দরুণ বিভিন্ন ভাইয়ের পুত্র-কন্যারা পরস্পরের ভাইবোন হিসেবে পরিগণিত হয়। কোন পুরুষের ক্ষেত্রে এইসব ভাইদের সন্তানরা তারও সন্তান হিসেবে গণ্য হয় এবং তাদের সন্তানরা স্বীকৃত হয় তার নাতি-নাতনী হিসেবে ; আর এইসব বোনেদের সন্তানরা গণ্য হয় তার ভাগ্নে-ভাগ্নী হিসেবে এবং তাদের সন্তানরা স্বীকৃত হয় তার নাতি-নাতনী হিসেবে। কিন্তু কোন নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়। একজন নারীর এইসব ভাই-

নের সন্তানরা বিবেচিত হয় তার ভাইপো-ভাইঝি হিসেবে আর এইসব বোনেদের সন্তানরা গণ্য হয় তার পুত্রকন্যা হিসেবে। এদের সকলকার সন্তারাই হচ্ছে তার নাতি-নাতনী। অতএব দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারির শ্রেণীবিন্যাসটাই দ্বিতীয় সারির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। তৃতীয় সারির এবং আরও দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিদের ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীবিন্যাসটাই কার্যকর থাকে।

কোন ব্যক্তির বাবার বোন হচ্ছে তার পিসী এবং সে তাকে ডাকে ভাইপো (পুরুষদের ক্ষেত্রে) বলে। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য। নিজের বাবার বোনেরা এবং আর যারা বাবার মর্যাদা পায় তাদের বোনেরাই শুধু পিসী হিসেবে বিবেচিত হয়—মায়ের বোনেরা এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। পিসীরা সন্তানরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির পিসতুত ভাই-বোন (আহ্-গারে-সেহ্, একবচনে), এবং তারা প্রত্যেকেই তাকে মামাত ভাই বলে ডাকে। কোন পুরুষের পিসতুত ভাইদের সন্তানরা হচ্ছে তার পুত্র-কন্যা এবং পিসতুত বোনেদের সন্তানরা হচ্ছে তার ভাগ্নে-ভাগ্নী। কিন্তু কোন নারীর ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত সম্পর্কগুলো ঠিক বিপরীত চেহারা নেয়। ঐ-সব পুত্রকন্যা আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সন্তানরা বিবেচিত হয় উদ্দীষ্ট ব্যক্তির নাতি-নাতনী হিসেবে।

এবার আসা যাক মায়ের দিকের কথায়। কোন পুরুষের মায়ের ভাই হচ্ছে তার মামা। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার ষষ্ঠ্য বৈশিষ্ট্য। মায়ের আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইরাই শুধু মামা বলে গণ্য হয়, বাবার ভাইরা এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। মামার সন্তানরা পুরুষটির মামাত ভাই বোন ; মামাত ভাইয়ের সন্তানরা হচ্ছে তার পুত্রকন্যা এবং মামাত বোনের সন্তানরা ভাগ্নে-ভাগ্নী। কোন নারীর ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত সম্পর্কগুলো বিপরীত চেহারা নেয়। ঐ-সব পুত্র-কন্যা আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সন্তানরা গণ্য হয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাতি-নাতনি হিসেবে।

কোন ব্যক্তির মায়ের বোনেরাও তার মা হিসেবেই স্বীকৃত হয়। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার সপ্তম বৈশিষ্ট্য। সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনেরা পরস্পরের সন্তানদের মা হিসেবে গণ্য হয়। মায়ের বোনের সন্তানরা হল ঐ ব্যক্তির বড় বা ছোট ভাইবোন। এই ব্যবস্থার অষ্টম বৈশিষ্ট্য এটাই। এর ফলে সমস্ত বোনেদের সন্তানরা পরস্পরের ভাইবোন হিসেবে পরিগণিত হয়। এইসব ভাইদের সন্তানরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির পুত্রকন্যা আর এইসব বোনেদের সন্তানরা হল তার ভাগ্নে-ভাগ্নী। এইসব পুত্রকন্যা আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সন্তানরা তার নাতি-নাতনী। কোন নারীর ক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলো বিপরীত চেহারা নেয়।

এইসব ভাই আর এইসব মামাত-পিসতুত ভাইদের স্ত্রীরা প্রত্যেকেই ঐ ব্যক্তির ভাদ্রবধূ (আহ্-গে-আহ্-নে-আহ্), এবং ঐ ভাদ্রবধূরা প্রত্যেকেই তাকে দেবর বা ভাসুর বলে ডাকে (প্রথমোক্ত অভিধাটার সঠিক অর্থ আমার জানা নেই)। আবার ঐ-সব বোন আর মামাত-পিসতুত বোনেদের স্বামীরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ভগ্নীপতি এবং তারাও তাকে যথাযথ নামে ডেকে থাকে। আমেরিকার আদিবাসীদের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে দলগত বিবাহ-প্রথার নানান নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। যেমন, কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার বিভিন্ন ভাইয়ের স্ত্রীদের এবং বিভিন্ন বোনের স্বামীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। মান্দানদের মধ্যে কোন পুরুষের ভাইদের স্ত্রীরা তারও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। পাওনী এবং অ্যারিকারীদের

মধ্যেও একই নিয়ম চালু আছে। ক্রো-দের মধ্যে কোন নারীর স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী হচ্ছে তার "সাথী" (বট-জে-নো-পা-চে), ক্রীকদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটা হল "সহ-বাসিন্দা"-র (চু-হা-চো-ওয়া) আর মুনসীদের ক্ষেত্রে "বন্ধু"-র (নেইন-জোসে)। উইনে-ব্যাগো ও অ্যাকাওটিনেদের মধ্যে স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী হচ্ছে নারীদের "বোন"। কোন কোন গোষ্ঠীতে কোন পুরুষের স্ত্রীর বোনের স্বামীরা বিবেচিত হয় তার "ভাই" হিসেবে, আবার কোন কোন গোষ্ঠীতে 'ভায়রাভাই" হিসেবে, এবং ক্রীকদের মধ্যে "ছোট বিভাজক" (কথাটার মানে আমার জানা নেই) হিসেবে।

জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারি : এই সারির সমস্ত শাখার সম্পর্কগুলো ঠিক দ্বিতীয় সারির সম্পর্কগুলোর মতই—শুধু এই তৃতীয় সারিতে একজন পূর্বপুরুষ বেশি থাকে। তাই এখানে আমরা চারটি শাখার মধ্যে কেবলমাত্র একটি শাখা নিয়েই আলোচনা করব। কোন ব্যক্তির বাবার বাবার ভাই তার পিতামহ হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং ঐ পিতামহ তাকে নাতি বলে ডাকেন। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার নবম ও সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য। এর ফলে কারুর পিতামহের সব ভাইরাই তার পিতামহের মর্যাদা পায় এবং জ্ঞাতিসম্পর্কিত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বজায় থাকে। নিজের বংশের ধারার সঙ্গে জ্ঞাতি-সম্পর্কিত ধারাগুলোকে মিশিয়ে দেওয়া হয় যে নীতির সাহায্যে, সেই নীতিটা প্রযোজ্য হয় উভয় দিকেই, অর্থাৎ, পূর্বপুরুষদের দিকে এবং উত্তরপুরুষদের দিকে। ঐ পিতামহর (অর্থাৎ পিতামহর ভাইয়ের) পুত্ররা হচ্ছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বাবা, তাদের সন্তানরা তাদের ভাইবোন, এই ভাইদের সন্তানরা তার পুত্রকন্যা, এই বোনেদের সন্তানরা তার ভাগ্নে-ভাগ্নী এবং এইসব পুত্রকন্যা ও ভাগ্নেভাগ্নীদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী। কোন নারীর ক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলোও আগের মতই বিপরীত চেহারা নেয়। ঐ-সব পিতামহ, পিতা, ভাইবোন, পুত্র-কন্যা, ভাগ্নেভাগ্নী আর নাতি-নাতনীরাও ঐ ব্যক্তিকে যথাযথ সম্বোধনে চিহ্নিত করে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের চতুর্থ সারি : আগের মত একই কারণে এই সারিরও একটিমাত্র শাখা নিয়েই আলোচনা করব আমরা। কোন ব্যক্তির পিতামহর পিতার ভাই হচ্ছে তার পিতামহ। ঐ পিতামহের পুত্রও তার পিতামহ। এই শেষোক্তজনের পুত্র হচ্ছে তার পিতা। ঐ পিতার সন্তানরা তার বড় অথবা ছোট ভাইবোন। এদের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক আগের সারির মতই। জ্ঞাতিত্বের পঞ্চম সারির সম্পর্কগুলোও দ্বিতীয় সারির সম্পর্কগুলোর মতই, বাড়তি হিসেবে শুধু কয়েকজন পূর্বপুরুষের নাম তাতে যুক্ত হয়।

গোটা ব্যবস্থাটার প্রকৃতির দিকে নজর দিলে বোঝা যায়, জ্ঞাতিদের সঠিক শ্রেণীবিন্যাসের জন্য জ্ঞাতিত্বের সংখ্যাগত মাত্রা সংক্রান্ত ধারণা থাকা একান্তই জরুরী। কিন্তু যে আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা এই ব্যবস্থাকে প্রতিদিন ব্যবহার করে থাকে, তাদের কাছে সম্পর্কের এই আপাত অস্পষ্টতাগুলো কোনরকম সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় না।

সেনেকা-ইরোকোয়াদের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে শ্বশুরের দুটো অভিধা আছে—ওক-না-হোসে অর্থাৎ স্ত্রীর বাবা এবং হা-গা-সা অর্থাৎ স্বামীর বাবা। প্রথম অভিধাটার আরেকটা অর্থ হল জামাতা, অর্থাৎ একই অভিধা পরস্পরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। বিপিতা ও বিমাতার অভিধা হচ্ছে যথাক্রমে হোক-নো-এসে এবং ওক-নো-এসে। সৎ-পুত্র ও

সং-কন্যার অভিধা যথাক্রমে হা-নো এবং কা-নো। কোন কোন গোষ্ঠীতে দুজন শ্বশুর এবং দুজন শাশুড়ী পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়েথাকে এবং এদের সম্পর্কটা বোঝানোর জন্য উপযুক্ত অভিধাও নির্দিষ্ট করেছে তারা। গোটা ব্যবস্থাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ পৃথকী-করণের দরুণ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠলেও, জ্ঞাতিত্বের এই সুবিশাল তালিকাটা অত্যন্ত লক্ষ্যনীয়। সেনেকা-ইরোকোয়া এবং তামিলদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বিশদ পরিচয় এই পরিচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত সারণীতে পাওয়া যাবে। এই দুটো ব্যবস্থার সাদৃশ্যটা এক নজরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ থেকে এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দলগত বিবাহ চালু থাকার প্রমাণ তো পাওয়া যায়ই, সেইসঙ্গেই বোঝা যায় ঐ ধরণের বিবাহ প্রাচীন সমাজের ওপর কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমাজব্যবস্থার ওপর আজ পর্যন্ত মানুষ তার যুক্তিসম্মত চিন্তাভাবনার যতগুলো অত্যাশ্চর্য প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছে, এটা তার অন্যতম।

মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা বা প্রায় সবদিক থেকে ঐ ধরনের কোন ব্যবস্থার গর্ভ থেকেই যে জন্ম নিয়েছিল তুরানিয় এবং গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা, তা আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি। উল্লিখিত সম্পর্কগুলোর প্রায় অর্ধাংশ উভয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একই। সেনেকা আর তামিলদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সঙ্গে হাওয়াইয়ানদের ব্যবস্থার পার্থক্যগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে পার্থক্যটা গড়ে উঠেছে সেইসব সম্পর্কের ভিত্তিতেই, যেগুলো সৃষ্টি হয় ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ হওয়া অথবা না-হওয়ার ফল হিসেবে। যেমন, সেনেকা আর তামিলদের মধ্যে কোন ব্যক্তির বোনের পুত্র হচ্ছে তার ভাগ্নে, কিন্তু হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবেই গণ্য হয়। আসলে ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার আর দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেকার পার্থক্যটাই ফুটে উঠেছে এই সম্পর্ক দুটোর মধ্যে। ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের বদলে দলগত বিবাহ চালু হওয়ার ফলে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো দেখা দিয়েছিল, তারই ফল হিসেবে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বদলে গড়ে উঠেছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে হাওয়াইয়ানদের মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠা সত্ত্বেও কেন তারা নিজেদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কোনরকম সংস্কার সাধন করে নি? এ প্রশ্নের উত্তর আগেও দেওয়া হয়েছে, এখানে আবার তা উদ্ধৃত করছি। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা পাল্টানোর আগেই পাল্টে যায় পরিবারের রূপ। পলিনেশিয়ায় পরিবার ছিল দলগত বিবাহভিত্তিক, কিন্তু চালু ছিল মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। আমেরিকায় জোড়-বাঁধা বিবাহ-পরিবার চালু থাকার সময় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা ছিল তুরানিয় ধাঁচের। ইওরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় একবিবাহভিত্তিক পরিবার চালু হয়ে যাওয়ার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত টিকে ছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা, কিন্তু অতঃপর এই ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং গড়ে ওঠে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। তাছাড়া, আজ পর্যন্ত মোট পাঁচ ধরনের পরিবার দেখা গেলেও, জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা দেখা গেছে মূলত তিন ধরনের। একটা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সমাজের মধ্যে ব্যাপক মাত্রার পরিবর্তন ঘটে যাওয়া একান্ত দরকারী ছিল। আমার ধারণা, মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার মত যথেষ্ট শক্তি ও যথেষ্ট সার্বিকতা গোত্রীর সংগঠনের ছিল এবং এই তুরানিয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা চালু করার মত

যথেষ্ট শক্তি নিহিত ছিল অগ্রসর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠা একবিবাহ-প্রথার (এ ব্যাপারে সম্পত্তিও একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল)।

যে-সব তুরানিয় সম্পর্ক মালয়ী ব্যবস্থার সম্পর্কের থেকে আলাদা, সেগুলোর উৎস নিয়ে এবার আলোচনা করা দরকার। এই ব্যাখ্যার ভিত্তি হচ্ছে দলগত বিবাহ এবং গোত্রীয় সংগঠন।

১। কোন পুরুষের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইয়ের সন্তানরা তার পুত্র-কন্যা।

হেতু: কোন সেনেকা পুরুষের সমস্ত ভাইয়ের স্ত্রীরা তারও স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়। মানে, জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় এই প্রথাই চালু ছিল। মালয়ী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম দেখা যায় এবং তার কারণটাও একই।

২। কোন পুরুষের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনের সন্তানরা হচ্ছে তার ভাগ্নে-ভাগ্নী।

হেতু: গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে গোত্রের নিয়মানুসারে এইসব নারীরা ঐ পুরুষটির স্ত্রী হতে পারে না। কাজেই, তাদের সন্তানরাও বিবেচিত হতে পারে না তার সন্তান হিসেবে। তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা দূরতর হয়ে যায়, গড়ে ওঠে ভাগ্নে-ভাগ্নী নামক নতুন সম্পর্ক। এই সম্পর্কটা মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার থেকে আলাদা।

৩। কোন নারীর সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইয়ের সন্তানরা তার ভাইপো-ভাইঝি।

হেতু: ২-নং-এর অনুরূপ। এই সম্পর্কটাও মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার থেকে আলাদা।

৪। কোন নারীর সমস্ত আপন এবং মামাত-পিসতুত বোনের সন্তানরা হচ্ছে তার পুত্র-কন্যা।

হেতু: এই সমস্ত বোনের স্বামীরা ঐ নারীটিরও স্বামী। সঠিক অর্থে বললে এই সমস্ত পুত্র-কন্যারা হচ্ছে তার সৎ-সন্তান। ওজিবোয়া এবং অন্য কয়েকটি অ্যালগনকিন গোষ্ঠীর মধ্যে এদেরকে সৎ-সন্তানই বলা হয়। কিন্তু সেনেকা এবং তামিলরা প্রাচীন শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী এদেরকে পুত্র-কন্যাই বলে থাকে, যার কারণটা মালয়ী জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার অনুরূপ।

৫। এই সমস্ত পুত্র-কন্যার সন্তানরা ঐ নারীটির নাতি-নাতনী।

হেতু: এরা ঐ নারীটির পুত্র-কন্যার সন্তান।

৬। এই সমস্ত ভাইপো-ভাইঝিদের সন্তানরা হচ্ছে ঐ নারীর নাতি-নাতনী।

হেতু: তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পূর্ববর্তী মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় এদের সঙ্গে এই সম্পর্কটাই চালু ছিল। নতুন কোন সম্পর্কের উদ্ভাবন করা যায় নি বলে পুরনো সম্পর্কটাই চালু রাখা হয়েছে।

৭। কোন ব্যক্তির পিতার সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইরাও তার পিতা।

হেতু: তারা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মায়ের স্বামী। মালয়ী ব্যবস্থাতেও সম্পর্কটা একই।

৮। কোন ব্যক্তির পিতার সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনেরা তার পিসি।

হেতু: গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে এরা কেউই তার পিতার স্ত্রী হতে পারে না, কাজেই আগের মত এরা আর তার মা হিসেবে গণ্য হয় না। তাই দেখা দিয়েছিল নতুন একটা

সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, গড়ে উঠেছিল পিসির সম্পর্কটা।

৯। কোন ব্যক্তির মায়ের আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইরা হচ্ছে তার মামা।

হেতু: এখন আর এরা তার মায়ের স্বামী হতে পারে না, কাজেই তার পিতা হিসেবেও এরা বিবেচ্য নয়। ফলে গড়ে উঠেছিল একটা নতুন সম্পর্ক—মামা।

১০। কোন ব্যক্তির মায়ের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনেরা হচ্ছে তার মা।

হেতু: ৪-নং-এর অনুরূপ।

১১। পিতার সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইয়ের সন্তানরা এবং মায়ের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনের সন্তানরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ভাইবোন।

হেতু: মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই সম্পর্কটা একই ছিল। ঐ ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনায় কারণগুলো উল্লিখিত হয়েছে।

১২। আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত সমস্ত মামা ও পিসিদের সন্তানরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মামাত-পিসতুতো ভাইবোন।

হেতু: গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে এইসব মামা আর পিসিদের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির মা এবং বাবার বিবাহ হতে পারে না। কাজেই মালয়ী ব্যবস্থার মত এদের সন্তানরা ঐ ব্যক্তির আপন ভাইবোন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তাই গড়ে ওঠে নতুন সম্পর্ক—মামাত-পিসতুত ভাইবোন।

১৩। কোন তামিল পুরুষের সমস্ত মামাত-পিসতুত ভাইয়ের সন্তানরা হচ্ছে তার ভাইপো-ভাইঝি এবং সমস্ত মামাত-পিসতুত বোনের সন্তানরা হচ্ছে তার পুত্র-কন্যা। সেনেকা-ইরোকোয়াদের মধ্যে নিয়মটা এর ঠিক বিপরীত। এ থেকে বোঝা যায় যে তামিলদের মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় কোন পুরুষের সমস্ত মামাত-পিসতুত বোনেরা তার স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হত, কিন্তু তার মামাত-পিসতুত ভাইয়ের স্ত্রীরা তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হত না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রায় দুশো জনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যেকার এই পার্থক্যটাই হচ্ছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

১৪। পিতামহ এবং পিতামহীর সমস্ত ভাইবোনরাই ঐ ব্যক্তির পিতামহ-পিতামহী।

হেতু: মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই সম্পর্কগুলো একই ছিল এবং এর কারণটাও ঐ ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

এতক্ষণে এটা যথেষ্টই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, একটা আদি মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে সরিয়ে মাথা তুলেছিল তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা (যে দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই), এবং মালয়ের লোকেরা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এশিয়ার প্রায় সর্বত্র মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই চালু ছিল। তাছাড়া এটাও বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে, মালয়ী ধাঁচের এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটাই রক্তের সংমিশ্রণের পথ বেয়ে পৌঁছে গিয়েছিল ঐ তিনটি বর্গের মানুষদের পূর্বপুরুষদের কাছে এবং পরবর্তীকালে তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় বর্গের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষরা এই ব্যবস্থার মধ্যে নানান পরিবর্তন ঘটিয়ে এটাকে বর্তমান রূপে রূপায়িত করেছিল।

তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার প্রধান প্রধান সম্পর্কগুলোর উৎস আমরা ব্যাখ্যা করে দেখলাম। দেখা গেল, সন্তানদের পিতৃত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে যতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায়, তার ভিত্তিতেই

এই সম্পর্কগুলো গড়ে উঠত দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে। গোটা ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল একটা সাংগঠনিক চেহারা নিয়ে। আর যেহেতু পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া ব্যবস্থাটা গড়ে উঠতে পারত না, সেহেতু সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারই এই ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। তবে লক্ষ্য করা দরকার যে কয়েক ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থায় সমস্ত ভাইরা হচ্ছে পরস্পরের স্ত্রীর স্বামী, সমস্ত বোনরা হচ্ছে পরস্পরের স্বামীর স্ত্রী, এবং এদের সকলকার বিবাহ হয় দলগতভাবে। ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় কোন পুরুষের যে-কোন আপন বা জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইয়ের (সে সময় এ-রকম অসংখ্য ভাই থাকত প্রত্যেকের) স্ত্রীরা তারও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হত। একইভাবে, কোন নারীর যে-কোন আপন বা জ্ঞাতিবোনের (সে সময় এ-রকম অসংখ্য বোনও থাকত প্রত্যেকের) স্বামীরা গণ্য হত তারও স্বামী হিসেবে। স্বামীদের পরস্পর ভ্রাতৃত্ব আর স্ত্রীদের পরস্পর ভগ্নীত্ব—এটাই ছিল গোটা ব্যবস্থাটার বনিয়াদ। হাওয়াইয়ানদের 'পুনালুয়া'-প্রথার মধ্যেই এর একটা পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্বগতভাবে বিচার করলে মনে হয়, বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ গোটা দলটাকে নিয়েই গড়ে উঠত সে সময়কার পরিবারগুলো। কিন্তু বাস্তবে নিশ্চয়ই বসবাস এবং জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের সুবিধার জন্য ছোট ছোট কয়েকটা পরিবারে বিভক্ত হয়ে যেত ঐ দলগুলো। ব্রিটনদের মধ্যে দশ-বারজন ভাইয়ের বিবাহ হত পরস্পরের স্ত্রীর সঙ্গে। দলগত বিবাহের দলগুলোর সদস্যসংখ্যা মোটামুটি এ-রকমই হত বলে ধরে নেওয়া যায়। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের আমলে প্রয়োজনের খাতিরেই জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সাম্যবাদ দেখা দিয়েছিল। পরে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের আমলে এবং আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে জোড়-বাঁধা পরিবারের আমল পর্যন্ত তা টিকে থেকেছে (আমেরিকার আদিবাসীদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সময় পর্যন্ত এদের মধ্যে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সাম্যবাদ চালু ছিল)। এইসব আদিবাসীদের মধ্যে এখন আর দলগত বিবাহের কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ঐ বিবাহের ফলে সৃষ্ট জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ প্রথাগুলো আজও টিকে আছে। বন্য গোষ্ঠীগুলোর পারিবারিক জীবন এবং বসবাসের ধরন নিয়ে আজও খুব গভীর অনুসন্ধান চালানো হয় নি। এ-সব ব্যাপারে তাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে এবং তাদের জীবনধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেলে আলোচ্য প্রশ্নগুলোর ওপর অধিকতর আলোকপাত করা যাবে।

দুটো সমান্তরাল জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সাহায্যে দু'ধরনের পরিবারের উদ্ভব নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এই আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলোকে মোটামুটিভাবে সুনিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। একটা নিম্নতর অবস্থা থেকে উঠে এসে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের দ্বারপ্রান্তে মানবসমাজের পা রাখার যাত্রাবিন্দুটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এ থেকে। এই প্রথম রূপ থেকে দ্বিতীয় রূপে উত্তরণটা ঘটেছিল একান্ত স্বাভাবিকভাবেই—পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে নিম্নতর সামাজিক অবস্থা থেকে উচ্চতর সামাজিক অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল মানুষ। মানবজাতির বেড়ে চলা মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীরই অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল এই

উত্তরণ। বন্যতার বেশির ভাগ সময় জুড়ে মানুষ যে অগ্রগতির ইতিহাস রচনা করেছে, তার সারাংশ নিহিত রয়েছে ঐ ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার আর দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের মধ্যেই। দ্বিতীয় ধরনের পরিবারটা প্রথম ধরনের পরিবারের থেকে অনেকটা উন্নত হয়ে উঠলেও, একবিবাহভিত্তিক পরিবার তখনও অনেক দূরের ব্যাপার। বিভিন্ন ধরনের পরিবারের মধ্যে তুলনা করলেও বন্য যুগে প্রগতির মন্থর গতির কথা বিচার করলে (যখন প্রগতির উপকরণ ছিল খুবই কম আর প্রতিবন্ধক ছিল প্রচুর) গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। যুগের পর যুগ কেটে গেছে অনড়-অচল অবস্থায়, মাঝে-মধ্যে ঘটেছে অগ্রগতি, কখনও বা অধঃপতন। এটাই হচ্ছে ঘটনাপ্রবাহের মূল গতিধারা। কিন্তু সমাজের মূল গতিমুখটা সবসময়ই থেকেছে নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হওয়ার দিকে, নাহলে মানুষ আজও রয়ে যেতে বন্য যুগেই। আমাদের কাজ হচ্ছে মানবজাতির এই বিস্ময়কর অগ্রগতির প্রকৃত সূচনাবিন্দুটা খুঁজে বার করা এবং সে সূচনাবিন্দু খুঁজে পাওয়া যায় মানব-ইতিহাসের একেবারে অনুন্নত অবস্থায় ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মত একটা বিচিত্র ধরনের পরিবারের মধ্যেই।

নিউইয়র্কের সেনেকা-ইরোকোয়া ইণ্ডিয়ান এবং দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর তামিলভাষী অধিবাসীদের সম্পর্কব্যবস্থার তুলনামূলক সারণী

(তামিল ভাষায় এন = আমার)

	ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১.	আমার প্রপিতামহের বাবা	হোক-সোটে	আমার পিতামহ	এন মূম্পাত্তান	আমার ৩য় পিতামহ
২.	,, ,, মা	ওক-সোটে	,, পিতামহী	,, মূম্পাত্তি	,, ,, পিতামহী
৩.	,, প্রপিতামহ	হোক-সোটে	,, পিতামহ	,, পূত্তান	,, ২য় পিতামহ
৪.	,, প্রপিতামহী	ওক-সোটে	,, পিতামহী	,, পূত্তি	,, ,, পিতামহী
৫.	,, পিতামহ	হোক-সোটে	,, পিতামহ	,, পাত্তান	,, পিতামহ
৬.	,, পিতামহী	ওক-সোটে	,, পিতামহী	,, পাত্তি	,, পিতামহী
৭.	,, পিতা	হ্-নিহ্	,, পিতা	,, টাক্কাপ্পান	,, পিতা
৮.	,, মাতা	নো-ইয়েহ্	,, মাতা	,, টেই	,, মাতা
৯.	,, পুত্র	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
১০.	,, কন্যা	কা-আহ্-ওয়াক	,, কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
১১.	,, পৌত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
১২.	,, পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্টি	,, পৌত্রী
১৩.	,, প্রপৌত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, ইরানডাম পেরান	,, ২য় পৌত্র
১৪.	,, প্রপৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, ,, পেরাট্টি	,, ,, পৌত্রী
১৫.	,, প্রপৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, মূনডাম পেরান	,, ৩য় পৌত্র

	ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে		তামিলদের ক্ষেত্রে	
		সম্পর্ক	ভাষান্তর	সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৬.	আমার প্রপৌত্রের কন্যা	কা-ইয়া-ডা	আমার পৌত্রী	এন মনডাম পেরাট্টি	আমার ৩য় পৌত্র
১৭.	„ বড় ভাই	হা-জে	„ বড় ভাই	„ রামালিয়ান, বি আন্নান	„ বড় ভাই
১৮.	„ „ বোন	আহ্-জে	„ „ বোন	„ আক্কারি, বি রামাকাই	„ „ বোন
১৯.	„ ছোট ভাই	হ্যা-গা	„ ছোট ভাই	„ এন টাম্বি	আমার ছোট ভাই
২০.	„ „ বোন	কা-গা	„ „ বোন	„ টাঙ্গাইচ্চি, বি টাঙ্গে	„ „ বোন
২১.	„ ভাইরা	ডা-ইয়া-গুয়া-ডান-নো-ডা	„ ভাইরা	„ সাকোথারী	আমার ভাইরা (সংস্কৃত)
২২.	„ বোনেরা	„ „	„ „ বোনেরা	„ সাকোথারিকাল	„ বোনেরা („)
২৩.	„ ভাইয়ের পুত্র (পুরুষের ক্ষেত্রে)	হা-আহ্-ওয়াক	আমার পুত্র	„ মাকান	„ পুত্র
২৪.	„ „ পুত্রের স্ত্রী („ „)	কা-সাহ্	„ পুত্রবধূ	„ মারুমাকাল	„ পুত্রবধূ ও ভাইঝি
২৫.	„ „ কন্যা („ „)	কা-আহ্-ওয়াক	„ কন্যা	„ মাকাল	„ কন্যা
২৬.	„ „ কন্যার স্বামী („ „)	ওয়ে-না-হোসে	„ জামাতা	„ মারুমাকান	„ জামাতা ও ভাইপো
২৭.	„ „ পৌত্র („ „)	হা-ইয়া-ডা	„ পৌত্র	„ পেরান	„ পৌত্র
২৮.	„ „ পৌত্রী („ „)	কা-ইয়া-ডা	„ পৌত্রী	„ পেরাট্টি	„ পৌত্রী
২৯.	„ „ প্রপৌত্র („ „)	হা-ইয়া-ডা	„ পৌত্র	„ ইরানডাম পেরান	„ ২য় পৌত্র
৩০.	„ „ প্রপৌত্রী („ „)	কা-ইয়া-ডা	„ পৌত্রী	„ „ পেরাট্টি	„ „ পৌত্রী
৩১.	„ বোনের পুত্র („ „)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	„ ভাগ্নে	„ মারুমাকান	„ ভাগ্নে
৩২.	„ „ পুত্রের স্ত্রী („ „)	কা-সা	„ ভাগ্নে-বৌ	„ মাকাল	„ কন্যা
৩৩.	„ „ কন্যা („ „)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	„ ভাগ্নী	„ মারুমাকাল	„ ভাগ্নী
৩৪.	„ „ কন্যার স্বামী („ „)	ওক-না-হোসে	„ ভাগ্নীজামাই	„ মাকান	„ পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
৩৫. আমার বোনের পৌত্র (পুং ক্ষেত্রে)	হা-ইয়া-ডা	আমার পৌত্র	এন পেরান	আমার পৌত্র
৩৬. „ „ পৌত্রী („ „)	কা-ইয়া-ডা	„ পৌত্রী	„ পেরাট্টি	„ পৌত্রী
৩৭. „ „ পৌত্রের পুত্র („ „)	হা-ইয়া-ডা	„ পৌত্র	„ ইয়ানডাম পেরান	„ ২য় পৌত্র
৩৮. „ „ „ কন্যা („ „)	কা-ইয়া-ডা	„ পৌত্রী	„ „ পেরাট্টি	„ „ পৌত্রী
৩৯. „ ভাইয়ের পুত্র (নাঃ ক্ষেত্রে)	হা-সোহ্-নেহ্	„ ভাইপো	„ মারুমাকান	„ ভাইপো
৪০. „ „ পুত্রের স্ত্রী („ „)	কা-সা	„ ভাইপো-বৌ	„ মাকাল	„ কন্যা
৪১. „ „ কন্যা („ „)	কা-সোহ্-নেহ্	„ ভাইঝি	„ মারুমাকাল	„ ভাইঝি
৪২. „ „ কন্যার স্বামী („ „)	ওক-না-হোসে	„ জামাতা	„ মাকান	„ পুত্র
৪৩. „ „ পৌত্র („ „)	হা-ইয়া-ডা	„ পৌত্র	„ পেরান	„ পৌত্র
৪৪. „ „ পৌত্রী („ „)	কা-ইয়া-ডা	„ পৌত্রী	„ পেরাট্টি	„ পৌত্রী
৪৫. „ „ পৌত্রের পুত্র („ „)	হা-ইয়া-ডা	„ পৌত্র	„ ইয়ানডাম পেরান	„ ২য় পৌত্র
৪৬. „ „ „ কন্যা („ „)	কা-ইয়া-ডা	„ পৌত্রী	„ „ পেরাট্টি	„ „ পৌত্রী
৪৭. „ বোনের পুত্র („ „)	হা-আহ্-ওয়াক	„ পুত্র	„ মাকান	„ পুত্র
৪৮. „ „ পুত্রের স্ত্রী („ „)	কা-সা	„ পুত্রবধু	„ মারুমাকাল	আমার পুত্রবধূ ও বোনঝি
৪৯. „ „ কন্যা („ „)	কা-আহ্-ওয়াক	„ কন্যা	„ মাকাল	„ কন্যা
৫০. „ „ কন্যার স্বামী („ „)	ওক-না-হোসে	„ জামাতা	„ মাকান	„ পুত্র
৫১. „ „ পৌত্র („ „)	হা-ইয়া-ডা	„ পৌত্র	„ পেরান	„ পৌত্র
৫২. „ „ পৌত্রী („ „)	কা-ইয়া-ডা	„ পৌত্রী	„ পেরাট্টি	„ পৌত্রী
৫৩. „ „ পৌত্রের পুত্র („ „)	হা-ইয়া-ডা	„ পৌত্র	„ ইয়ানডাম পেরান	আমার ২য় পৌত্র

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	তামিলদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর
৫৪. আমার বোনের পৌত্রের কন্যা (নাঃ)	কা-ইয়া-ডা	আমার পৌত্রী	এন ইয়ানভাম পেরাট্রি	আমার ২য় পৌত্রী
৫৫. ,, পিতার ভাই	হা-নিহ্	,, পিতা	,, পেরিয়া টাক্কাপান—	,, বড় পিতা(জ্যাঠা)
			,, সেরিয়া ,,	,, ছোট ,, (কাকা)
৫৬. ,, ,, ভাইয়ের স্ত্রী	উক-নো-এসে	,, বিমাতা	,, টেই	,, মাতা
৫৭. ,, ,, ,, পুত্র (বয়সে বড়)	হা-জে	,, বড় ভাই	,, টামাইয়ান	,, বড় ভাই
৫৮. ,, ,, ,, ,, (,, ছোট)	হ্যা-গা	,, ছোট ,,	,, টাম্বি	,, ছোট ভাই
৫৯. ,, ,, ,, পুত্রের স্ত্রী	আহ্-গে-আহ্-নে-আহ্	,, ভাদ্রবধূ	,, মাইট্টুনি, আন্নি	,, খুঃ বোন, ভাইবৌ
৬০. ,, ,, ,, কন্যা (বয়সে বড়)	আহ্-জে	,, বড় বোন	,, আক্কারি বি, টামাকাই—	আমার বড় বোন
৬১. ,, ,, ,, ,, (,, ছোট)	কা-গা	,, ছোট ,,	,, টাঙ্গাইচ্চি বি, টাঙ্গাই	,, ছোট ,,
৬২. ,, ,, ,, কন্যার স্বামী	হা-ইয়া-ও	,, ভগ্নীপতি	,, মাইট্টুনান	আমার ভগ্নীপতি ও খুঃ ভাই
৬৩. ,, ,, ,, পুত্রের পুত্র (পুঃ)	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
৬৪. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	হা-সোহ্-নেহ্	,, ভাইপো	,, মারুমাকান	,, ভাইপো
৬৫. ,, ,, ,, ,, কন্যা (পুঃ)	কা-আহ্-ওয়াক	,, কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
৬৬. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	কা-সোহ্-নেহ্	,, ভাইঝি	,, মারুমাকাল	,, ভাইঝি
৬৭. ,, ,, ,, কন্যার পুত্র (পুঃ)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নে	,, মারুমাকান	,, ভাগ্নে
৬৮. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
৬৯. ,, ,, ,, ,, কন্যা (পুঃ)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নী	,, মারুমাকাল	,, ভাগ্নী
৭০. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	কা-আহ্-ওয়াক	,, কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
৭১. ,, ,, ,, পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
৭২. ,, ,, ,, ,, কন্যা	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্রি	,, পৌত্রী

* পুঃ—পুরুষের ক্ষেত্রে। নাঃ—নারীদের ক্ষেত্রে। খুঃ—খুড়তুতো।

	ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে		তামিলদের ক্ষেত্রে	
		সম্পর্ক	ভাষান্তর	সম্পর্ক	ভাষান্তর
৭৩.	আমার পিতার বোন	আহ্-গা-হ্রে	আমার পিসি	এন আট্টাই	আমার পিসি
৭৪.	” ” বোনের স্বামী	হোক-নো-এসে	” বিপিতা	” মামান	” কাকা
৭৫.	” ” ” পুত্র (পুং)	আহ্-গারে-সেহ	” পিসতুতো ভাই	” আট্টান বি, মাইট্টুনান	” পিসতুতো ভাই
৭৬.	” ” ” ” (নাঃ)	” ” ”	” ” ”	” মাচ্চান	” ” ”
৭৭.	” ” ” পুত্রের স্ত্রী	আহ্-গে-আহ্-নে-আহ্	” ভাদ্রবধূ	” টাঙ্গাই	” ছোট বোন
৭৮.	” ” ” কন্যা (পুং)	আহ-গারে-সেহ্	” পিসতুতো বোন	” মাইট্টুনি	” পিসতুতো বোন
৭৯.	” ” ” ” (নাঃ)	” ” ”	” ” ”	” মাচ্চি, বি মাচ্চিনি	” ” ”
৮০.	” ” ” কন্যার স্বামী	হা-ভা-এ	” ভগ্নীপতি	” আন্নান, বি টাম্বি	” বড় বা ছোট ভাই
৮১.	” ” ” পুত্রের পুত্র (পুং)	হা-আহ্-ওয়াক	” পুত্র	” মারুমাকান	” ভাইপো
৮২.	” ” ” ” ” (নাঃ)	হা-সোহ্-নেহ্	” ভাইপো	” মাকান	” পুত্র
৮৩.	” ” ” ” কন্যা (পুং)	কাহ্-আহ্-ওয়াক	” কন্যা	” মারুমাকাল	” ভাইঝি
৮৪.	” ” ” ” ” (নাঃ)	কা-সোহ্-নেহ্	” ভাইঝি	” মাকাল	” কন্যা
৮৫.	” ” ” কন্যার পুত্র (পুং)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	” ভাগ্নে	” মাকান	” পুত্র
৮৬.	” ” ” ” ” (নাঃ)	হা-আহ্-ওয়াক	” পুত্র	” মারুমাকান	” বোনপো
৮৭.	” ” ” কন্যা (পুং)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	” ভাগ্নী	” মাকাল	” কন্যা
৮৮.	” ” ” ” ” (নাঃ)	কা-আহ-ওয়াক	” কন্যা	” মারুমাকাল	” বোনঝি
৮৯.	” ” ” পৌত্রের পুত্র	লা-ইয়া-ডা	” পৌত্র	” পেরান	” পৌত্র
৯০.	” ” ” ” কন্যা	কা-ইয়া-ডা	” পৌত্রী	” পেরাট্টি	” পৌত্রী
৯১.	” মায়ের ভাই	হোক-নে-সেহ	” মামা	” মামান	” মামা

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	তামিলদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর
৯২. আমার মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী	আহ্-গা-নে-আহ্	আমার মামী-মা	এন মামে	আমার মামী
৯৩. ,, ,, ,, পুত্র (পুং)	আহ্-গারে-সেহ—	,, মামাত ভাই	,, মাইট্রুনান	,, মামাত ভাই
৯৪. ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	,, ,, ,,	,, ,, ,,	,, মাচ্চান	,, ,, ,,
৯৫. ,, ,, ,, পুত্রের স্ত্রী	আহ্-গে-আহ্-নে-আহ্	,, ভাদ্রবধূ	,, টাঙ্গাই	,, ছোট্ট বোন
৯৬. ,, ,, ,, কন্যা (পুং)	আহ্-গারে-সেহ্	,, মামাত বোন	,, মাইট্রুনি	,, মামাত বোন
৯৭. ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	,, ,, ,,	,, ,, ,,	,, মাচ্চারি	,, ,, ,,
৯৮. ,, ,, ,, কন্যার স্বামী	হা-ইয়াও	,, ভগ্নীপতি	,, আন্নান, টাম্বি—আমার বড় বা ছোট ভাই	
৯৯. ,, ,, ,, পুত্রের পুত্র (পুং)	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মারুমাকান	,, ভাইপো
১০০. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	হা-সোহ্-নেহ্	,, ভাইপো	,, মাকান	,, পুত্র
১০১. ,, ,, ,, ,, কন্যা (পুং)	কা-আহ্-ওয়াক	,, কন্যা	,, মারুমাকাল	,, ভাইঝি
১০২. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	কা-সোহ্ নেহ্	,, ভাইঝি	,, মাকাল	,, কন্যা
১০৩. ,, ,, ,, কন্যার পুত্র (পুং)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নে	,, মাকান	,, পুত্র
১০৪. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মারুমাকান	,, বোনপো
১০৫. ,, ,, ,, ,, কন্যা (পুং)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নী	,, মাকাল	,, কন্যা
১০৬. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	কা-আহ্-ওয়াক	,, কন্যা	,, মারুমাকাল	,, বোনঝি
১০৭. ,, ,, ,, পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
১০৮. ,, ,, ,, ,, কন্যা	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্টি	,, পৌত্রী
১০৯. ,, ,, বোন	নো-ইয়েহ্	,, মা	,, পেরিয়া টেই (বড়)	,, মা (ছোট বা বড়)
১১০. ,, ,, বোনের স্বামী	হোক-নো-এসে	,, বিপিতা	,, টাকাপ্পান	,, পিতা (,, ,,)

	ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১১১.	আমার মায়ের বোনের পুত্র (বড়)	হা-জে	আমার বড় ভাই	এন টামাইয়ান, বি আন্নান	আমার বড় ভাই
১১২.	” ” ” ” (ছোট)	হ্যা-গা	” ছোট ”	” টাম্বি	” ছোট ”
১১৩.	” ” ” পুত্রের স্ত্রী	আহ্-গে-আহ্-নে আহ্	” ভাদ্রবধূ	” মাইট্টুনি—আমার ভাইবৌ, মাসতুত বোন	
১১৪.	” ” ” কন্যা (বড়)	আহ্-জে	” বড় বোন	” আক্কারি বি, টামাকে	” বড় বোন
১১৫.	” ” ” ” (ছোট)	কা-গা	” ছোট ”	” টাঙ্গাচ্চি, বি টাঙ্গে	” ছোট ”
১১৬.	” ” ” কন্যার স্বামী	হা-ইয়া-ও	” ভগ্নীপতি	” মাইট্টুনান-আমার ভগ্নীপতি, মাসতুতভাই	
১১৭.	” ” ” পুত্রেরপুত্র (পুং)	হা-আহ্-ওয়াক	” পুত্র	” মাকান	” পুত্র
১১৮.	” ” ” ” পুত্র (নাঃ)	হা-সোহ্-নেহ্	” ভাইপো	” মারুমাকান	” ভাইপো
১১৯.	” ” ” ” কন্যা (পুং)	কা-আহ্-ওয়াক	” কন্যা	” মাকাল	” কন্যা
১২০.	” ” ” ” ” (নাঃ)	কা-সোহ্-নেহ্	” ভাইঝি	” মারুমাকাল	” ভাইঝি
১২১.	” ” ” কন্যার পুত্র (পুং)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	” ভাগ্নে	” মারুমাকান	” ভাগ্নে
১২২.	” ” ” ” ” (নাঃ)	হা-আহ-ওয়াক	” পুত্র	” মাকান	” পুত্র
১২৩.	” ” ” ” কন্যা (পুং)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	” ভাগ্নী	” মারুমাকাল	” ভাগ্নী
১২৪.	” ” ” ” ” (নাঃ)	কা-আহ-ওয়াক	” কন্যা	” মাকাল	” কন্যা
১২৫.	” ” ” পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	” পৌত্র	” পেরান	” পৌত্র
১২৬.	” ” ” ” কন্যা	কা-ইয়া-ডা	” পৌত্রী	” পেরাট্টি	” পৌত্রী
১২৭.	” পিতার পিতার ভাই	হোক-সোটে	” পিতামহ	” পাট্টান	” পিতামহ
১২৮.	” ” ” ভাইয়ের পুত্র	হা-নিহ	” পিতা	” টাকাপ্পান” ” ”	” পিতা
১২৯.	” ” ” ”পুত্রের পুত্র (বড়)	হা-জে	” বড় ভাই	” আন্নান, বি, টামাইয়ান	” বড় ভাই

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৩০. " " " " " " " (ছোট)	হ্যা-গা	আমার ছোট ভাই	এন টাম্বি	আমার ছোট ভাই
১৩১. " " " " " " পুত্র (পুং,	হা.আহ-ওয়াক	" পুত্র	" মাকান	" পুত্র
১৩২. " " " " " " " (না)	কা-সোহ্-নেহ্	" ভাইপো	" মারুমাকান	" ভাইপো
১৩৩. " " " " " " কন্যা (পুং)	কা-আহ্-ওয়াক	" কন্যা	" মাকাল	" কন্যা
১৩৪. " " " " " " " (না)	কা-সোহ্-নেহ্	" ভাইঝি	" মারুমাকাল	" ভাইঝি
১৩৫. " " " " পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	" পৌত্র	" পেরান	" পৌত্র
১৩৬. " " " " পৌত্রের পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	" পৌত্রী	" পেরাট্টি	" পৌত্রী
১৩৭. " পিতার পিতার বোন	ওক-সোটে	" পিতামহী	" পাড্ডি	আমার পিতামহী, বড় বা ছোট
১৩৮. " " " বোনের কন্যা	আহ্-গা-হাক	" পিসি	" টেই	" মাতা " বা "
১৩৯. আমার পি. পি. বো. কন্যার কন্যা (না,	আহ্-গারে-সেহ্	" পিসতুত বোন	" টামাকাই, টাঙ্গাই,	" বড় বা ছোট বোন
১৪০. " " " " " " (পুং)	" " "	" " "	" " " "	" " " "
১৪১. " " " " " " (পুং)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	" ভাগ্নে	" মারুমাকান ?	আমার ভাগ্নে
১৪২. " " " " " " (না)	হা-আহ্-ওয়াক	" পুত্র	" মাকান ?	" পুত্র
১৪৩. " " " " " " (পুং)	কা-ইয়া-ওয়া-ডা	" ভাগ্নী	" মারুমাকাল ?	" ভাগ্নী
১৪৪. " " " " " " (না)	কা-আহ্-ওয়াক	" কন্যা	" মাকাল ?	" কন্যা
১৪৫. " " " " পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	" পৌত্র	" পেরান	" পৌত্র
১৪৬. " " " " " পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	" পৌত্রী	" পেরাট্টি	" পৌত্রী
১৪৭. " মায়ের মায়ের ভাই	হোক-সোটে	" মাতামহ	" পাড্ডান	" মাতামহ, বড় বা ছো
১৪৮. " " " ভাইয়ের পুত্র	হোক-নো-সেহ	" মামা	" মামান	" মামা

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৪৯. আমার মা. মা. ভা. পুত্রের পুত্র (পু)	আহ্-গারে-সেহ্	আমার মামাত ভাই	এন মাইট্টুনান	আমার মামাত ভাই
১৫০. ,, ,, ,, ,, ,, ,, (না)	,, ,, ,,	,, ,, ,,	,, মাচ্চান	,, ,, ,,
১৫১. ,, ,, ,, ,, ,, পু. পু. (পু	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মারুমাকান	,, ভাইপো
১৫২. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, (না)	হা-সোহ্-নেহ্	,, ভাইপো	,, মাকান	,, পুত্র
১৫৩. ,, ,, ,, ,, ,, ,, কন্যা (পু)	কা-আহ্-ওয়াক	,, কন্যা	,, মারুমাকাল	,, ভাইঝি
১৫৪. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, (না)	কা-সোহ্-নেহ্	,, ভাইঝি	,, মাকাল	,, কন্যা
১৫৫. ,, ,, ,, ,, পৌত্রের পৌত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
১৫৬. ,, ,, ,, ,, ,, পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্টি	,, পৌত্রী
১৫৭ ,, ,, ,, বোন	ওক-সোটে	,, মাতামহী	,, পাড্ডি	আমার মাতামহী বড় বা ছোট
১৫৮. ,, ,, ,, বোনের কন্যা	নো-ইয়েহ্	,, মা	,, টেই ,, ,,	,, মা ,, ,,
১৫৯. ,, ,, ,, ,, কন্যার কন্যা (বড়)	আহ্-জে	,, বড় বোন	,, টামাকেই	আমার বড় বোন
১৬০. ,, ,, ,, ,, ,, ,, (ছোট)	কা-গা	,, ছোট বোন	,, টাঙ্গাই	,, ছোট ,,
১৬১. ,, ,, ,, ,, ,, কন্যার পুত্র (পু)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নে	,, মারুমাকান	,, ভাগ্নে
১৬২. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, (না)	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
১৬৩. ,, ,, ,, ,, ,, ,, কন্যা (পু	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নী	,, মারুমাকাল	,, ভাগ্নী
১৬৪. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, (না)	কা-আহ্-ওয়ান-ডা	,, কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
১৬৫. ,, ,, ,, ,, পৌত্রের পৌত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
১৬৬. ,, ,, ,, ,, ,, পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্টি	,, পৌত্রী
১৬৭. ,, পিতার পিতার পিতার ভাই	হোক-সোটে	,, পিতামহ	,, ইরানডাম পাড্ডান	,, ২য় পিতামহ

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৬৮. আমার পিতার পিতার পিতার ভাইয়ের	হোক-সোটে	আমার পিতামহ	এন পাড্ডান আমার পিতামহ (বড় বা ছোট)	
১৬৯. „ „ „ „ „ পুত্রের পুত্র (বড়)	হা-নিহ্	„ পিতা	এন টাক্কাপ্পান „ পিতা	„
১৭০. „ „ „ „ „ পুত্রের পুত্রের পুত্র	হা-আহ্-ওয়াক	আমার পুত্র	এন মাকান „	পুত্র
১৭১. „ „ „ „ „ পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	„ পৌত্র	এন পেরান „	পৌত্র
১৭২. „ „ „ „ „ স্ত্রী	ওক-সোটে	„ পিতামহী	এন ইরানডাম পাড্ডি „	২য় পিতামহী
১৭৩. „ „ „ বোনের কন্যা	ওক-সোটে	„ পিতামহী	এন পাড্ডি	আমার পিতামহী ব.ছ
১৭৪. „ „ „ „ „ কন্যার কন্যা	নো-ইয়েহ্	„ মাতা	„ টেই	আমার মাতা (বড় বা ছোট)
১৭৫. „ „ „ „ „ কন্যার কন্যা (পু)	আহ্-জে	„ বড় বোন	এন টামাকেই টাঙ্গাই আমার	বড় বা ছোট বোন
১৭৬. „ „ „ „ „ কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা	হা-সোহ্-নেহ্	„ ভাগ্নী	এন মারুমাকাল	আমার ভাগ্নী
১৭৭. „ „ „ „ „ কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা	হা-ইয়া-ডা	„ দৌহিত্রী	এন পেরাট্টি	আমার দৌহিত্রী
১৭৮. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাই	হোক-সোটে	„ মাতামহ	এন ইরানডাম পাড্ডান আমার ২য় মাতামহ	
১৭৯. „ „ „ „ ভাইয়ের পুত্র	„ „	„ „	এন পাড্ডান আমার মাতা (বড় বা ছোট)	

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৮০. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্রের পুত্র	হোক-না-সেহ্	আমার মামা	এন মামান	আমার মামা
১৮১. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের পুত্র (পু)	আহ্-গারে-হৈহ্	আমার মামাত ভাই	এন মাইট্টুনান	আমার মামাত ভাই
১৮২. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র (না)	হা-আহ্-ওয়াক	আমার পুত্র	এন মারুমাকান	আমার ভাইপো
১৮৩. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	আমার পৌত্র	এন পেরান	আমার পৌত্র
১৮৪. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোন	ওক-সোটে	আমার মাতামহী	এন ইরানডাম পাড়্ডি	আমার ২য় মাতামহী
১৮৫. „ „ „ „ বোনের কন্যা	„ „	„ „	এন পাড়্ডি (বহুবচন বা একবচন)	আমার মাতামহী (বড় বা ছোট)
১৮৬. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোনের কন্যার কন্যা	নো-ইয়েহ্	আমার মাতা	এন টেই (বহুবচন বা একবচন)	আমার মাতা (বড় বা ছোট)
১৮৭. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোনের কন্যার কন্যার কন্যা (বয়সে বড়)	আহ্-জে	আমার বড় বোন	এন আক্কারি	আমার বড় বোন
১৮৮. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোনের কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা (না)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	আমার বোনঝি	এন মাকান	আমার কন্যা
১৮৯. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোনের কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা	কা-ইয়া-ডা	আমার দৌহিত্রী	এন পেরাট্টি	আমার দৌহিত্রী

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৯০. আমার স্বামী	ডা-ইয়াকে-নে	আমার স্বামী	এন কানাভান, বি, পুর্শান	আমার স্বামী
১৯১. ,, স্ত্রী	,, ,, ,,	,, স্ত্রী	,, মাইনাভি, বি, পেন্চাট্টি	,, স্ত্রী
১৯২ ,, স্বামীর পিতা	হ্যা-গা-সা	,, শ্বশুর	,, মামান, বি, মামানার	,, মামা এবং শ্বশুর
১৯৩. ,, ,, মাতা	ওঙ্গ-গা-সা	,, শাশুড়ি	এন মামি, বি, মান্নাই	আমার মামী এবং শাশুড়ি
১৯৪. ,, স্ত্রীর পিতা	ওক-না-হোসে	,, শ্বশুর	এন মামান	আমার মামা এবং পিতা
১৯৫. ,, ,, মাতা	,, ,, ,,	,, শাশুড়ি	,, মামি	,, মামী
১৯৬. ,, জামাতা	,, ,, ,,	,, জামাতা	,, মাপিল্লাই, বি, মারুমাকান	আমার জামাতা ও ভাইপো
১৯৭. ,, পুত্রবধূ	কা-সা	,, পুত্রবধূ	এন মারুমাকাল	আমার পুত্রবধূ ও ভাইঝি (বিধবারা বিবাহ করতে পারে না)
১৯৮. ,, সৎ-পিতা	হোক-না-এসে	,, সৎপিতা		
১৯৯. ,, সৎ-মা	ওক-নো-এসে	,, সৎ মা	এন সেরিয়া টেই	আমার ছোট মা
২০০. ,, সৎ-পুত্র	হা-নো	,, সৎ-পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
২০১. ,, সৎ-কন্যা	কা-নো	,, সৎ কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
২০২. ,, সৎ-ভাই			,, আন্নান (বড়), টাম্বি (ছোট)	আমার বড় বা ছোট ভাই
২০৩ ,, সৎ-বোন			এন আক্কারি ,, টাঙ্গাই (ছোট)	আমার বড় বা ছোট বোন

	ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
২০৪	আমার দেবর বা ভাসুর (স্বামীর ভাই)	হা-ইয়া-ও	আমার দেবর বা ভাসুর	এন মাইট্টুনান	আমার দেবর বা ভাসুর এবং জ্ঞাতিভাই
২০৫.	„ ভগ্নীপতি (পু)	আহ্-গে-আহ্-নে-ও	আমার শ্যালক	„ „	„ ভগ্নীপতি এবং জ্ঞা ভা.
২০৬.	„ ভগ্নীপতি (না)	হা-ইয়া-ও	আমার ভগ্নীপতি	„ আট্টান (বড়), মাইচ্চান	আমার ভগ্নিপতি ও জ্ঞাতিভাই
২০৭.	„ শ্যালক	আহ্-গে-আহ্-নে-ও	আমার শ্যালক	„ মাইট্টুনান	আমার শ্যালক ও জ্ঞাতিভাই
২০৮.	„ ভাইরাভাই	কোন সম্পর্ক থাকে না		„ মাকালান	„ ভায়রাভাই ও জ্ঞাতিভাই
২০৯.	„ ননদাই (ননদের স্বামী)	„ „ „ „		„ সাকোটারান	„ ননদাই ও „
২১০.	„ শ্যালিকা	কা-ইয়া-ও	আমার শ্যালিকা	„ কারিউন্টে (বড়), মাইট্টিনি	আমার শ্যালিকা ও জ্ঞাতিবোন
২১১.	„ ননদ	আহ্-গে-আহ্-নে-ও	আমার ননদ	এন নাট্টানাম	আমার ননদ ও জ্ঞাতিবোন
২১২.	„ ভাদ্রবধূ (পু)	কা-ইয়া-ও	আমার ভাদ্রবধূ	„ আন্নি (বড়), মাইট্টুনি (ছোট)	আমার ভাদ্রবধূ ও জ্ঞাতিবোন
২১৩.	„ ভাজ (না)	আহ্-গে-আহ্-নে-ও	আমার ভাজ	„ „ „ „ (ছোট)	আমার ভাজ ও জ্ঞাতিবোন
২১৪.	„ জা	কোন সম্পর্ক থাকে না		„ ওরাকাট্টি	আমার জা ও জ্ঞাতিবোন
২১৫.	„ শালাজ	„ „ „ „		„ টামাকাই (বড়), টাঙ্গাই (ছোট)	আমার শালাজ ও জ্ঞাতিবোন
২১৬.	„ বিধবা স্ত্রী	গো-নো-কও-ইয়েস-হা-আহ্	বিধবা স্ত্রী	„ কিয়েম্পুন	আমার বিধবা স্ত্রী
২১৭.	„ বিপত্নীক স্বামী	„ „ „ „ „ „	বিপত্নীক স্বামী		
২১৮.	যমজ সন্তান	টাস-গীক্-হা	যমজ সন্তান	দ্বিথামরাথি	যমজ সন্তান (সংস্কৃত)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জোড়-বাঁধা এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

আমেরিকার আদিবাসীদের অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের মধ্যে যারা বর্বরযুগের নিম্ন পর্যায়ে ছিল, তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল জোড়বাঁধা পরিবার। বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ আগেকার যুগের বড় বড় দলগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার বদলে চালু হয়েছিল এক এক জোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ, ফলে গড়ে উঠেছিল পৃথক পৃথক (আংশিকভাবে হলেও) পরিবার। এই ধরনের পরিবারের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের বীজ। অবশ্য একবিবাহভিত্তিক পরিবারের থেকে এই ধরনের পরিবার যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নিম্নমানের ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জোড়-বাঁধা পরিবার ছিল এক বিশেষ ও বিচিত্র ধরনের পরিবার। একটা বাড়িতেই বেশ কয়েকটা জোড়-বাঁধা পরিবার বসবাস করত। এই পরিবারগুলো মিলেমিশে জীবনযাপন করত এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মেনে চলত সাম্যবাদী নীতি। এ-রকম কয়েকটা পরিবারের একত্রে বসবাস করার ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে জীবনের সমস্ত কঠোরতাকে একাই মোকাবিলা করার ব্যাপারে এই ধরনের পরিবার ছিল অত্যন্ত দুর্বল একটা সংগঠন। তা সত্ত্বেও, এই ধরনের পরিবার গড়ে উঠত এক জোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহের ভিত্তিতেই এবং একবিবাহভিত্তিক পরিবারের কয়েকটা বৈশিষ্ট্যও এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই পরিবারের নারীরা আর শুধুমাত্র তাদের স্বামীর প্রধান স্ত্রী-ই ছিল না, তারা হয়ে উঠেছিল স্বামীদের সঙ্গিনী, তাদের খাদ্য প্রস্তুতকারিণী এবং সন্তানের মা (এইসময় অনেকটা নিশ্চিতভাবে সন্তানদের পিতৃত্ব নিরূপন করা যেত)। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে সন্তানদের দেখাশোনা করত এবং এই সন্তানদের আকর্ষণেই তাদের বিবাহ বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠত।

কিন্তু পরিবারের মত বিবাহ ব্যাপারটাও ছিল বিচিত্র ধরনের। সভ্য সমাজের মত ভালবাসা বা প্রেমের আকর্ষণ থেকে মানুষ তখন নারীকে স্ত্রী হিসেবে চাইত না। এইসব বোধের জন্য দরকার উন্নত স্তরের মানসিকতা, যে স্তরে তারা তখনও পর্যন্ত উন্নত হতে পারেনি। তাই তাদের বিবাহের ভিত্তি হিসেবে কোনরকম আবেগ কাজ করত না। বিবাহ অনুষ্ঠিত হত সুবিধে আর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতেই। সন্তানদের বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত মায়েদের ওপর। পাত্রপাত্রীকে না জানিয়ে এবং তাদের মতামত না নিয়েই দুপক্ষের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা চলত। মাঝেমধ্যে একেবারে অপরিচিত দুজন নারী-পুরুষের মধ্যেও বিবাহ সম্পাদিত হত। উপযুক্ত সময়ে তাদেরকে জানানো হত কখন বিবাহ অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠিত হবে। ইরোকোয়া এবং আরও অনেক ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে এইরকম রীতিই চালু ছিল। এ ধরনের বৈবাহিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীকে একটা নীরব সম্মতি জানাতে হত। পারতপক্ষে

কোন পক্ষই এ ব্যাপারে অসম্মতি জানাত না। বিবাহের আগে পাত্রীর নিকটতম জ্ঞাতিদের হাতে কিছু উপহার তুলে দিতে হত। তবে স্বামী-স্ত্রী যতদিন পর্যন্ত নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইত, ততদিনই সম্পর্কটা বজায় থাকত। তারা না চাইলে সম্পর্ক ভেঙে যেতে। ঠিক এই কারণেই এই ধরনের পরিবারকে জোড়-বাঁধা পরিবার বলা হয়ে থাকে। যখন খুশি স্ত্রীকে ত্যাগ করে অনায়াসে অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে পারত পুরুষরা। একই অধিকার মেয়েদেরও ছিল। এক স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে পারত তারা এবং তার জন্য গোষ্ঠী বা গোত্রের কোন প্রথাকে লঙ্ঘন করতে হত না। কিন্তু এ-রকম বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে একটা জনমত ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। কোন দম্পতির মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব দেখা দিলে এবং তাদের বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে উঠলে তাদের দু'জনের সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা চেষ্টা করত একটা মিটমাট করে দেওয়ার। এ চেষ্টায় প্রায়শই সফল হত তারা। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিবাহবিচ্ছেদ মেনে নেওয়া হত। তখন স্ত্রীটি তার স্বামীর বাড়ি থেকে চলে যেতো, সঙ্গে নিত তাদের সন্তানদের (কারণ সন্তানরা একান্তভাবে তারই সন্তান হিসেবে বিবেচিত হত) আর নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো—যার ওপর তার স্বামীর কোন অধিকার থাকত না। তবে যৌথ বাসগৃহে সাধারণত স্ত্রীর জ্ঞাতিরাই সংখ্যায় বেশি থাকত, তাই সেক্ষেত্রে স্বামীকেই চলে যেতে হত স্ত্রীর বাড়ি থেকে।[১] এককথায়, দাম্পত্য সম্পর্ক কতদিন বজায় থাকবে, তা নির্ভর করত স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর।

১। প্রয়াত রেভারেণ্ড এ. রাইট, যিনি বহু বছর ধরে সেনেকাদের মধ্যে ধর্ম-প্রচারক হিসেবে কাজ করেছিলেন, তিনি ১৮৭৩ সালে এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন : "এদের পরিবার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে, পুরনো আমলের বড় বড় বাড়িগুলোতে বসবাস করার সময় এক একটা বাড়িতে সম্ভবত এক একটা বংশের লোকই বেশি থাকে। নারীরা অন্ত বংশের কোন পুরুষকে বেছে নেয় তাদের স্বামী হিসেবে। এদের ছেলেরা যতদিন পর্যন্ত মায়ের আশ্রয় ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত সাহসী হয়ে না ওঠে, ততদিন পর্যন্ত অনেক সময় বিবাহ করে বৌ নিয়ে আসে ঘরে। ব্যাপারটা বেশ অভিনব। সাধারণত নারীরাই বাড়িতে কর্তৃত্ব করে এবং এই নারীরা নিঃসন্দেহে একই বংশের সদস্যা হয়ে থাকে। খাদ্যভাণ্ডারগুলি সার্বজনীন। কিন্তু হায়, এই ভাণ্ডারের ওপর হতভাগ্য স্বামী বা প্রেমিকের কোন অধিকারই থাকে না! বাড়িতে তার অনেকগুলো সন্তান বা যথেষ্ট জিনিসপত্র থাকলেও, হুকুম পাওয়া মাত্রই তাকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ আমান্ত করাটা তার পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। বাড়ির সবাই মিলে তাকে উত্যক্ত করে তোলে। মাসী বা দিদিমা জাতীয় কেউ হস্তক্ষেপ না করলে ঐ বাড়ি ছেড়ে নিজের বংশের লোকেদের কাছে ফিরে যেতে সে বাধ্য হয়। অনেক সময় সে অন্ত বংশের কোন মেয়েকে বিবাহ করে তাদের সঙ্গেই বসবাস করতে শুরু করে। সব জায়গার মত এখানেও বংশের মধ্যে মেয়েরা অসীম ক্ষমতার অধিকারিনী হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে কোন প্রধানের 'শিঙ

দাম্পত্য সম্পর্কের আর একটা বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে থাকা আমেরিকান আদিবাসীরা একবিবাহপ্রথার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক বিকাশের স্তরে পেঁছতে পারেনি। বর্বর যুগে থাকা সত্ত্বেও ইরোকোয়ারা অত্যন্ত উন্নত মানসিক গুণাবলীর অধিকারী। এদের এবং একইরকম উন্নত অন্যান্য ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়—মেয়েদের সতীত্বকে এরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং কোন মেয়ে নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিলে তাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হয়; স্বামীরাও শাস্তি দিতে পারে; কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এ-রকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ পুরুষদের চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা না করা হলে নারীদের সতীত্বকেও পাকাপাকিভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, পৃথিবীর সর্বত্রই বহুবিবাহটা ছিল পুরুষদের একটা স্বীকৃত অধিকার, যদিও অনেকগুলো পরিবারের ভরণপোষণ করার অক্ষমতার দরুণ খুব কম সংখ্যক পুরুষের পক্ষেই বহুবিবাহ করা সম্ভব হত। আরও কিছু রীতি-প্রথা (যেগুলোর উল্লেখ করার কোন দরকার দেখছি না) থেকেও বোঝা যায় যে একবিবাহ বলতে আমরা যা বুঝি, সে ধারণা এদের মধ্যে তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম হয়ত ছিলই। আমার ধারনা, অন্যান্য বর্বর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও চিত্রটা এই একই রকমের ছিল। জোড়-বাঁধা পরিবারের সঙ্গে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রধান পার্থক্যটা (বেশ কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য থাকতেই পারে) হচ্ছে—একবিবাহভিত্তিক পরিবারে যৌনমিলন সীমাবদ্ধ থাকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে, কিন্তু জোড়-বাঁধা পরিবারের ক্ষেত্রে এ-রকম কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। প্রাচীন দাম্পত্য ব্যবস্থা, যার নিদর্শন তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে আজও রয়ে-গেছে, তা অবশ্যই টিকে ছিল, তবে তার রূপটা একটা সীমাবদ্ধ চেহারা নিতে বাধ্য হয়েছিল।

বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে থাকা ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে, তা থেকে বলা যায় যে তাদের ক্ষেত্রেও চিত্রটা প্রায় একই রকমের ছিল। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমেরিকান আদিবাসীদের বিভিন্ন রীতি-প্রথার মধ্যে তুলনা করলে একটা সুস্পষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে, যা থেকে বোঝা যায় একসময় এদের সকলকার মধ্যে একই প্রথা চালু ছিল। কয়েকটা প্রথার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন ক্ল্যাভিগেরো বলেছেন যে "আজটেকদের মধ্যে মা-বাবাই সন্তানদের বিবাহের ব্যবস্থা করত এবং তাদের সম্মতি ছাড়া কোন বিবাহই সম্পন্ন হতে পারত না"।[১] "একজন

ভেঙে দিতে' (ওরা এভাবেই বলে) তারা এতটুকুও ইতস্তত করে না, এবং অতঃপর ঐ পদচ্যুত প্রধানকে সাধারণ সৈনিকের স্তরে নামিয়ে দেয়। প্রধানদের মনোনয়ন করার ব্যাপারটাও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।" বাখোফেন তাঁর "ডাস্ মুটেরেশ্‌ট" (Das Mutterecht). গ্রন্থে যে নারীতন্ত্রের কথা বলেছেন, তারই সমর্থন পাওয়া যায় এই বক্তব্যের মধ্যে।

১। হিস্টি অফ মেক্সিকো, ফিলাডেলফিয়া সংস্করণ, ১৮১৭, কুলেন্-এর অনুবাদ, ii, ৯৯.

পুরোহিত কনের 'হুয়েপীল' বা পোশাকের একটা প্রান্তের সঙ্গে বরের 'টিল্‌মাল্‌টি' বা আঙরাখার একটা প্রান্ত বেঁধে দিত, এবং এটাই ছিল দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রধান অনুষ্ঠান"।[১] এই একই অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করার পর হেরেরা লিখেছেন, "কনের সঙ্গে যা যা জিনিসপত্র আসত, তার প্রত্যেকটার কথাই মনে রাখা হত। বিবাহ ভেঙে গেলে—যা এদের মধ্যে প্রায়শই ঘটত—ঐ জিনিসগুলো ফেরৎ নিয়ে যেত স্ত্রী। বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামীরা পেত কন্যাদের আর স্ত্রীরা পেত পুত্রদের। বিবাহবিচ্ছেদের পর দুজনেই আবার বিবাহ করতে পারত"।[২]

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, ইরোকোয়াদের মত আজটেক ইন্ডিয়ানদের মধ্যেও স্ত্রীর ওপর স্বামীর ব্যক্তিগত অধিকার খুব একটা থাকত না। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারটা যতটা ব্যক্তিগত ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ছিল সার্বজনীন বা গোত্রগত। তাই ছেলেমেয়েদের বিবাহের ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবেই নিয়ন্ত্রণ করত মা-বাবারা। অবিবাহিত ইন্ডিয়ান নারী-পুরুষদের মধ্যে কোনরকম সামাজিক সম্পর্ক থাকত না বললেই চলে। প্রেম-ভালবাসার কোন মূল্য ছিল না, বিবাহের ব্যাপারে কেউ কোন প্রতিবাদ করত না। এইসব বিবাহে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা বিবেচনা করা হত না এবং তার কোন গুরুত্বও ছিল না। ইরোকোয়াদের মত আজটেকরাও স্ত্রীর নিজস্ব জিনিসপত্রের কথা নিখুঁতভাবে মনে রাখত, যাতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে (যা হরদমই ঘটত) ইন্ডিয়ান রীতি অনুযায়ী স্ত্রীরা তাদের জিনিসপত্র ফেরৎ পেতে পারে। আর শেষত, ইরোকোয়াদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের পর সমস্ত সন্তানকে স্ত্রীরাই পেত, কিন্তু আজটেকদের ক্ষেত্রে স্বামীরা পেত কন্যাদের আর স্ত্রীরা পেত পুত্রদের। আসলে প্রাচীন আমলে কোন এক সময় ইরোকোয়া ইন্ডিয়ানদের নিয়ম-কানুনগুলোই বলবৎ ছিল আজটেকদের মধ্যে, পরে আজটেকরা সেইসব প্রাচীন নিয়মের কিছুটা পরিবর্তন ঘটায়।

ইয়ুকাতান-এর অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হেরেরা লিখেছেন, "আগে এরা বিবাহ করত কুড়ি বছর বয়স নাগাদ। পরে তা কমে বারো-চৌদ্দয় দাঁড়ায়। স্ত্রীদের প্রতি কোনরকম অনুরাগের ব্যাপার এদের মধ্যে থাকত না। যে-কোন তুচ্ছ কারণেই ঘটে যেত বিবাহবিচ্ছেদ।[৩] ইয়ুকাতানের মায়াদের কৃষ্টি ও বিকাশগত মান আজটেকদের চেয়ে উন্নত ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেও বিবাহটা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করত না, নির্ভর করত প্রয়োজনের ওপর। ফলে দাম্পত্য-সম্পর্কও সুদৃঢ় হত না এবং যে-কোন পক্ষ ইচ্ছে করলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারত। তাছাড়া, ভিলেজ ইন্ডিয়ানদের মধ্যেও বহুবিবাহটা ছিল পুরুষদের একটা স্বীকৃত অধিকার। অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় বহুবিবাহের ঘটনা এদের মধ্যে অনেক বেশি ঘটত বলেই মনে হয়। ইন্ডিয়ানদের তথা বর্বরদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংক্রান্ত এইসব তথ্য থেকে আদিবাসীদের আপেক্ষিক অগ্রগতির প্রকৃত চিত্রটা একান্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

১। ঐ, ii, ৭০১.

২। "হিষ্ট্রি অফ আমেরিকা", খণ্ড ১, পরিচ্ছেদ ৩, পৃঃ ২১৭.

৩। "হিষ্ট্রি অফ আমেরিকা", iv, ১৭১.

বিবাহের মত একান্ত ব্যক্তিগত একটা ব্যাপারে পাত্রপাত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যই ছিল না। এইসব মানুষদের বর্বর দশা বোঝার পক্ষে এই একটি তথ্যই যথেষ্ট।

এবার আমরা দেখব দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার থেকে জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠায় পেছনে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রভাব কাজ করেছিল। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে সামাজিক অবস্থার কারণে একজোড়া নারী-পুরুষ কিছুটা বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। প্রত্যেক পুরুষের বেশ কিছু স্ত্রীর মধ্যে একজন হত প্রধানা স্ত্রী, আর প্রত্যেক নারীর বেশকিছু স্বামীর মধ্যে একজন হত প্রধান স্বামী। অর্থাৎ, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে প্রথম থেকেই জোড়-বাঁধা পরিবারমুখী একটা প্রবণতার অস্তিত্ব ছিল।

এ-কাজ সম্পাদনের প্রধান ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেছিল গোত্রীয় সংগঠন। তবে তা ঘটেছিল এক সুদীর্ঘ ও ক্রমান্বয়ী প্রক্রিয়ার ফল হিসেবেই। প্রথমত, দলের মধ্যে অন্তর্বিবাহের চালু প্রথাকে গোত্র প্রথমেই নিষিদ্ধ করে দেয় নি। তবে গোত্রের মধ্যে আপন ভাইবোনের বিবাহ এবং আপন বোনদের সন্তানদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ এরা সকলেই ছিল একই গোত্রের সদস্য। আপন ভাইদের অবশ্য তখনও যৌথ-স্ত্রী থাকত আর আপন বোনেদের থাকত যৌথ-স্বামী। দেখা যাচ্ছে দলগত বিবাহের গোত্র কখনো সরাসরি হস্তক্ষেপ করে নি, সে শুধু এই বিবাহের আওতা থেকে কয়েকজন সদস্যকে বাদ দিয়েছিল। গোত্রের মধ্যে স্ত্রী-ধারার প্রতিটি নারীর (ancestor) সমস্ত বংশধরদের ওপর বরাবরের মত নিজেদের মধ্যে বিবাহ না করার নীতি চালু করে দিয়েছিল গোত্র। পূর্বতন দলগত বিবাহের দলগুলো যে নীতিতে চলত, তার তুলনায় এটা ছিল এক দারুণ অগ্রগতি। গোত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর তার প্রতিটি শাখাতেই এই নিয়ম দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরী ছিল, যার নজির আমরা দেখেছি ইরোকোয়াদের মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, এই সংগঠনের কাঠামো ও নীতিগুলোর দরুন জ্ঞাতিদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের বিরুদ্ধে একটা ঝোঁক গড়ে ওঠে মানুষের মনে, কারণ গোত্রের বাইরে রক্ত সম্বন্ধহীন নারী-পুরুষকে বিবাহ করার সুবিধাগুলো মানুষ ততদিন একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছে। দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিল এই ঝোঁকটা। অবশেষে ব্যাপারটা একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। আমেরিকান আদিবাসীদের অস্তিত্ব যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের প্রায় সবার মধ্যেই এই নিয়মটা চালু ছিল।[১] যেমন, জ্ঞাতিত্বের সারনীতে ইরোকোয়াদের যে সমস্ত রক্তসম্বন্ধ যুক্ত জ্ঞাতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা কেউই পরস্পরকে বিবাহ করতে পারে না। অন্য গোত্র থেকে স্ত্রী সংগ্রহের ব্যাপারটা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠার ফলে তারা আলাপ-আলোচনা করে এবং মূল্যপ্রদান করে স্ত্রী সংগ্রহ করতে শুরু করে। আগে স্ত্রী পাওয়ার কোন অসুবিধেই ছিল না। কিন্তু গোত্রীয়

১। শিয়ান্দের জনৈক প্রধানের কাছে তাদের একটা ঘটনার কথা শুনেছিলাম। চালু প্রথা না মেনে দুজন মামাত-পিসতুত ভাইবোন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। এ-জন্য তাদেরকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু লোকেরা তাদের এমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করে যে তা সহ্য করতে না পেরে তারা নিজেরাই বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা করে নেয়।

সংগঠনের প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী সংগ্রহ করাটা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে দলগত বিবাহের দলগুলোর সদস্য সংখ্যাও ক্রমশ কমতে থাকে। এই সিদ্ধান্তটা মোটেই অযৌক্তিক নয়, কেননা তুরানীয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বসর্ত হিসাবে এই ধরনের দলগুলোর বিদ্যমান থাকাটা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। এখন ঐ দলগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলেও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা টিকে আছে আজও। ঐ দলগুলো একটু একটু করে ভাঙছিল, অবশেষে জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার পর দলগুলো পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, তারা শুধু নিজেদের গোষ্ঠী বা মিত্র গোষ্ঠীগুলো থেকেই স্ত্রী সংগ্রহ করত না, সঙ্গেই বৈরি গোষ্ঠীগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়েও নারীদের ধরে নিয়ে এসে জোর করে বিবাহ করত। পুরুষ বন্দীদের হত্যা করা এবং নারী বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখা—ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই রীতি চালু থাকার প্রধান কারণ ছিল এটাই। আর যেখানে স্ত্রী সংগ্রহ করা হচ্ছে মূল্য দিয়ে বা গায়ের জোরে, এবং তার জন্য করতে হচ্ছে মেহনত, স্বীকার করতে হচ্ছে ত্যাগ— সেখানে সেইসব স্ত্রীদের অনেকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে কে-ই বা রাজি হবে! দলের মধ্যে যারা জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রহের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়, তারা অন্তত স্বামীদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলই। ফলে পরিবারে আয়তন এবং দাম্পত্য-ব্যবস্থার সীমানা আরও ছোট হয়ে এসেছিল। বস্তুতপক্ষে এক একটা দলের মধ্যে শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল কিছু আপন ভাই যারা পরস্পরের স্ত্রীদের স্বামী, আর কিছু বোন যারা পরস্পরের স্বামীদের স্ত্রী। শেষত, এতদিন পর্যন্ত সমাজকাঠামোর যে রূপটা বিদ্যমান ছিল তার থেকে উন্নত একটা কাঠামো গড়ে উঠেছিল গোত্রের প্রভাবে। সভ্যতার যুগে পা রাখার আগে পর্যন্ত মানুষের যা যা প্রয়োজন হত, তা পূরণ করার পক্ষে গোত্রই ছিল যথেষ্ট। একটা সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে আর বিকাশের প্রক্রিয়াই এ কাজ সমাধা করত। গোত্রের ছত্র ছায়ায় সমাজের যে অগ্রগতিটা ঘটতে পেরেছিল, সেই অগ্রগতিই প্রশস্ত করে দিয়েছিল জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের অভ্যুদয়ের পথ।

রক্তসম্বন্ধহীন নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহের রীতি চালু হওয়ার এই নতুন ঘটনাটা সমাজকে নিশ্চয়ই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই ধরনের বিবাহের ফলে যে-সব সন্তান জন্ম নিয়ে ছিল, শারীরিক ও মানসিকভাবে তারা ছিল অনেক শক্তিশালী। বিভিন্ন বংশের পরস্পরের মধ্যে সংমিশ্রন মানবজাতির অগ্রগতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্বর জীবনের বিভিন্ন আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে উন্নত দুটো গোষ্ঠী যখন কাছাকাছি আসত এবং তাদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটত, তখন সেই মিলন থেকে জাত সন্তানদের করোটি ও মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবেই অনেক বড় হত আর তাদের কার্যক্ষমতাও তুলনায় অনেক বেশি হতো। এই নতুন বংশধরদের আগমনের ফলে দুটো গোষ্ঠীই উন্নত হয়ে উঠত, সেই সঙ্গেই উন্নতি ঘটত তাদের বুদ্ধিমত্তার, লোকসংখ্যা ও জীবনযাপনে কৃৎকৌশলের উন্নতি ঘটত এবং বেড়ে চলত দ্রুত গতিতে।

আজকের সুসভ্য জাতিগুলোর জীবনে একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ একটা সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দলবিবাহ প্রথার অবসান সূচিত হওয়ার

আগে পর্যন্ত মানুষের মনে এই প্রবণতাটা দেখা দেয় নি। কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, নানান রীতি-প্রথার সাহায্যে সেগুলোকে টিকিয়েও রাখা হত। কিন্তু জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের অভ্যুদয় ঘটার আগে পর্যন্ত সেটা কোন সার্বজনীন রীতিতে পরিণত হতে পারে নি। কাজেই এই প্রবণতাটাকে মানবজাতির জীবনে কোন স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। আসলে অন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মানসিক ক্ষমতা ও আবেগের মত এই প্রবণতাটাও মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল অভিজ্ঞতায় পথ বেয়েই।

এই ধরনের পরিবারের বিকাশে বাধাদানকারী আর একটা বিষয়ের কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। যুদ্ধবিগ্রহের দরুন বন্যযুগের মানুষদের যত প্রাণহানি ঘটত, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণহানি ঘটত বর্বর যুগের মানুষদের। উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং বেশি ক্ষমতা লাভের আশায় অধিকতর উদ্দীপনাই ছিল এর প্রধান কারণ। সবযুগে এবং সব ধরনের সমাজব্যবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহের কাজটা পুরুষরাই করে এসেছে। তার ফলে নারী-পুরুষের সংখ্যায় দেখা দিয়েছে ভারসাম্যের অভাব, পুরুষের তুলনায় বেশি হয়ে গেছে নারীদের সংখ্যা (কারণ যুদ্ধে যুবক পুরুষরাই মারা যেত) এই ঘটনার ফল হিসেবে আরও জোরদার হয়ে উঠেছে দলগত-প্রথা। নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং নারীদের চরিত্র ও মর্যাদা সম্বন্ধে সমাজে অত্যন্ত নিম্ন স্তরের ধারণা চালু থাকার দরুন জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটাও যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে।

অন্যদিকে, আমেরিকার আদিবাসীরা ভুট্টা ও অন্যান্য ফসলের চাষ শুরু করার পর তাদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছিল, তা-ও এই ধরনের পরিবারের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছে। এই চাষবাসের কাজ শুরু হওয়ার পর মানুষ এক একটা জায়গায় স্থিতু হয়ে বসবাস করতে থাকে, আবিষ্কৃত হয় এ কাজের সহায়ক কিছু কৃৎকৌশল, উন্নত হয়ে ওঠে ঘরবাড়ি তৈরির পদ্ধতি এবং জীবনযাপন হয়ে ওঠে সামগ্রিক ভাবেই অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। জোড়-বাঁধা পরিবারের গড়ে ওঠার ফলে জীবনের নিরাপত্তাও বেড়েছিল, আর তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছিল অন্তত কিছুটা বেশী শ্রমশীল ও মিতব্যয়ি। এইসব দিকগুলো বাস্তবায়িত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল জোড়-বাঁধা পরিবার এবং আরও বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার নিজস্ব চরিত্র।

যৌথ বাসগৃহগুলোতে আশ্রয় নেওয়ার পর (দলগত বিবাহভিত্তিক দলগুলোর পর এই নতুন ধরণের পরিবারের সদস্যরাই বসবাস করেছিল ঐ-সব বাড়িগুলোতে) জোড়-বাঁধা পরিবারের প্রধান ভরসা ছিল দুটো—এক : নিজের ওপর ভরসা ; আর দুই : স্বামী এবং স্ত্রী-র নিজ নিজ গোত্রের ওপর ভরসা। সমাজ বন্য যুগ অতিক্রম করে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে এবং এই হওয়ার ছাপ পড়েছিল পরিবারগুলোর ওপরেও। উন্নত হয়ে উঠেছিল পরিবার ব্যবস্থা এবং তার অগ্রগতির গতিমুখটা ছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের দিকে। জোড়-বাঁধা পরিবারের কথা যদি আমাদের জানা নাও থাকত, যদি শুধু জানা থাকত যে ইতিহাসের একদিকে আছে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর অন্যদিকে একবিবাহভিত্তিক পরিবার, তাহলেও আমরা এ-রকম একটা অন্তর্বর্তী স্তরের কথা অনুমান করে নিতে পারতাম। মানুষের অভিজ্ঞতার ইতিহাসে এই

পরিবার অনেকটা জায়গাই দখল করে রেখেছে। বন্য যুগ এবং বর্বর যুগের সন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়ে অনেকটা পথ উজিয়ে, বর্বর যুগের পুরো মধ্য পর্যায়ের অধিকাংশ সময়টা পেরিয়ে এসেছিল এই পরিবার। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের শেষদিকে এই জোড়-বাঁধা পরিবারকে স্থানচ্যুত করে মাথা তোলে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের অঙ্কুর। সে যুগের চালু দাম্পত্যব্যবস্থার ছত্রছায়ায় এই পরিবার প্রথম দিকে ঠিকমতো মেলে ধরতে পারে নি নিজেকে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে এই একবিবাহভিত্তিক পরিবার। পুরুষদের আত্মপরতা নারীদের আত্মপরতার তুলনায় পুরোপুরি একবিবাহ প্রথা চালু হওয়ার প্রক্রিয়াকে অনেকটা বিলম্বিত করেছিল। অবশেষে সভ্যতার আগমন সুপ্রতিষ্ঠিত করে একবিবাহপ্রথাকে।

জোড়-বাঁধা পরিবারের আগে দু'ধরনের পরিবার প্রথা দেখা গেছে পৃথিবীতে এবং এই দু'ধরণের প্রথা জন্ম দিয়েছে দুটো জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার, বা বলা যায়, একই জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার দুটো পৃথক পৃথক রূপের। কিন্তু এই তৃতীয় ধরনের পরিবার প্রথা কোন নতুন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থারও সৃষ্টি করে নি বা পুরনো ব্যবস্থার তেমন কোন পরিবর্তনও ঘটায় নি। নতুন পরিবারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য কয়েকটা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো হলেও, পুরানো ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত রয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে জোড়-বাঁধা পরিবার বেশ কিছুদিন ধরে টিকে থেকেছিল চালু সম্পর্ক-গুলোর সঙ্গে বেমানান একটা জ্ঞাতিব্যবস্থার ভিত্তিতেই। ঐ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা জোড়-বাঁধা পরিবারের ছিল না। কিন্তু উদীয়মান একবিবাহভিত্তিক পরিবারের আমলে এসে আর টিকে থাকতে পারে নি পুরনো জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা। নিজে থেকে কোন নতুন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার জন্ম না দিলেও, পূর্বতন পরিবারগুলোর মত জোড়-বাঁধা পরিবারও ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর ব্যাপক অংশে বিদ্যমান ছিল এবং অসংখ্য বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যে আজও বিদ্যমান আছে।

পরিবারের বিভিন্ন রূপগুলোকে আমরা যে ভাবে ক্রমানুসারে সাজিয়েছি, তাতে একটা ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়ে যেতে পারে। সমাজের একটা বিশেষ অবস্থায় একেবারে পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে উঠেছে কোন এক ধরণের পরিবার, ঐ অবস্থায় থাকা সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সেই ধরণের পরিবার আর তারপর পরবর্তী উচ্চতর রূপের পরিবারের মধ্যে তা ক্রমশ লীন হয়ে গেছে—এমন কথা আমি আদৌ বলতে চাই নি। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেও দেখা যেতে পারে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের কোন ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত, অথবা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এর ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্তও, দলগত বিবাহের মধ্যে খোঁজ মিলতে পারে জোড়-বাঁধা পরিবারের, অথবা দ্বিতীয়টার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে প্রথম ধরনের পরিবারের নজির। আবার জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যে চোখে পড়তে পারে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের নমুনা, অথবা সামনে আসতে পারে এর বিপরীত দৃষ্টান্তও। এমনকি দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরেও দেখা যেতে পারে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের কোন ব্যতিক্রমী নজির, ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগে খোঁজ মিলতে পারে জোড়-বাঁধা পরিবারের কোন একটা ব্যতিক্রমী ঘটনার। তাছাড়া, কোন কোন গোষ্ঠী অন্যান্য উন্নততর গোষ্ঠীর চেয়ে আগেই কোন একটা বিশেষ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে—এমন ঘটনাও বিরল নয়। যেমন,

ইরোকোয়ারা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে থাকার সময়ই তাদের মধ্যে জোড়-বাঁধা পরিবার গড়ে ওঠেছিল, কিন্তু ব্রিটনদের মধ্যে বর্বরযুগের মধ্য পর্যায়েও চালু ছিল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারই। ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগের সুউন্নত সভ্যতা ব্রিটেনে ছড়িয়ে দিয়েছিল এমন সব কৃৎকৌশল ও উদ্ভাবন, যেগুলো সেখানকার কেল্টিক্ আদিবাসীদের মানসিক বিকাশের থেকে অনেক অগ্রসর মানের ছিল। তাদের মস্তিষ্ক অর্থাৎ চিন্তা-শক্তি ছিল বন্য মানুষের স্তরের, কিন্তু কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে তারা উন্নততর গোষ্ঠীগুলোর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণ ধরে আমি যা বলার চেষ্টা করেছি এবং যে বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট প্রমানও উপস্থিত করা গেছে, তা হল—সেই বন্যতার যুগে ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের ফল হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছিল পরিবারের এবং তারপর দুটো সুস্পষ্ট অন্তবর্তী রূপের পথ বেয়ে এগোতে এগোতে পরিবার এসে পৌঁছেছে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে। প্রত্যেক ধরনের পরিবারই প্রথমে অল্প কয়েকটা জায়গায় গড়ে উঠেছে, তারপর ছড়িয়ে পড়েছে আরও কিছু জায়গায় এবং অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই। অতঃপর তার স্থান গ্রহণ করেছে পরবর্তী ধরণের পরিবার, যা-ও ঠিক একই প্রক্রিয়ায় বিস্তৃত হয়েছে পৃথিবীর বুকে। এই পর্যায়ক্রমিক রূপগুলোর বিবর্তনের প্রধান গতিমুখটা ছিল ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার থেকে একবিবাহভিত্তিক পরিবার এর দিকে। অগ্রগতির পথে মূল ধারা থেকে কিছু-না-কিছু বিচ্যুতি মাঝে মাঝে ঘটেছে ঠিকই, তবু বিভাজনটা মোটামুটি এ-রকমই দাঁড়ায় : ভাইবোন বিবাহভিত্তিক এবং দল-গত বিবাহভিত্তিক পরিবার হচ্ছে বন্য যুগের অন্তর্গত, যার মধ্যে প্রথমটা চালু ছিল বন্য যুগের নিম্নতম পর্যায়ে আর দ্বিতীয়টা ঐ যুগের উচ্চতম পর্যায়ে ; দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার বন্য যুগ অতিক্রম করে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল ; জোড়-বাঁধা পরিবার হচ্ছে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের ব্যাপার, এবং ঐ যুগের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত টিকে ছিল এই পরিবার ; আর একবিবাহভিত্তিক পরিবার হচ্ছে বর্বর যুগের উচ্চপর্যায়ের অন্তর্গত, এবং সেই যুগ অতিক্রম করে এই সভ্যতার যুগেও টিকে থাকতে পেরেছে এই ধরণের পরিবার।

বিভিন্ন পর্যটক ও পর্যবেক্ষকের আংশিক বিবৃতির ওপর নির্ভর করে বর্বর গোষ্ঠী-গুলোর মধ্যে জোড়-বাঁধা পরিবারের নজির খুঁজে বেড়ানোর কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। যে কথাগুলো এতক্ষণ বলা হয়েছে, সেগুলোকে পাঠকেরা তাঁদের জানা ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখলেই এর সত্যতা বুঝতে পারবেন। আমেরিকান আদিবাসীদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সময় তারা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের ছিল এবং তখন তাদের মধ্যে চালু ছিল জোড়-বাঁধা পরিবারই। ভিলেজ্ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে চালু ছিল এই পরিবারই, যদিও এ ব্যাপারে স্পেনীয় লেখকদের বিবরণগুলো নিতান্তই অস্পষ্ট এবং ভাসাভাসা। তাদের যৌথ বাসগৃহগুলোর সার্বজনীন চরিত্র থেকেই বোঝা যায় যে তখনও তারা জোড়-বাঁধা পরিবারের স্তরেই ছিল। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের মত মানুষদের নিজস্বতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঝোঁকটা জোড়-বাঁধা পরিবারের আমলে ছিল না।

পূর্ব গোলার্ধে কিছু কিছু জায়গায় দেশীয় সংস্কৃতি সঙ্গে বিদেশী সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে একটা অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ-সব জায়গায় সভ্য

জীবনের উপকরণগুলোকে বন্য ও বর্বররা প্রয়োজন আর প্রবণতা অনুযায়ী কাজে লাগাত।[১] পুরোপুরি যাযাবর গোষ্ঠীগুলোর কিছু কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো গড়ে উঠেছে তাদের অস্বাভাবিক ধরনের জীবনযাপন প্রণালীর ফল হিসেবেই। এইসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা হয়নি। উন্নততর জাতিগুলোর প্রভাব অনেক গোষ্ঠীরই নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অপমিশ্রণের ফলে অনেক গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতিপথ পাল্টে গেছে। এর ফলস্বরূপ পরিবর্তন এসেছে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর সামাজিক অবস্থার মধ্যেও।

যে-সব জায়গায় মানুষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই ধরণের, সেইসব জায়গায় বন্য ও বর্বর উভয় গোষ্ঠীগুলোরই অবস্থার স্বাভাবিক বিকাশের পর্যালোচনা করাটা জাতিতত্ত্ব নিয়ে প্রণালীবদ্ধ আলোচনার জন্য একান্ত জরুরী। বন্য গোষ্ঠীগুলো সংক্রান্ত পর্যালোচনার ব্যাপারে পলিনেশিয়া আর অস্ট্রেলিয়াই যে শ্রেষ্ঠ এলাকা, তা আগেই বলা হয়েছে। এই দুটো জায়গার মানুষদের প্রতিষ্ঠান, রীতি, প্রথা, উদ্ভাবন আর আবিষ্কারকে পর্যালোচনা করলেই বন্য সমাজজীবনের প্রায় সমগ্র ছবিটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বর্বর যুগের নিম্ন আর মধ্য পর্যায়ের সামাজিক অবস্থাকে উপলব্ধি করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকায় (এই এলাকাগুলো যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন)। রক্ত এবং বংশগত সূত্রে একই কুলের অন্তর্গত অধিবাসীরা (একমাত্র এস্কিমোরা ছাড়া) এমন একটা মহাদেশে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিল, যে মহাদেশটা একমাত্র গৃহপালনযোগ্য জীবজন্তুর দিক থেকে ছাড়া অন্য সব দিক থেকেই মানুষের বসবাসের পক্ষে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল। ঐ মহাদেশে তারা নিরুপদ্রবে উন্নত হয়ে ওঠার পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিল। বন্য অবস্থায় থাকার সময়ই তারা ঐ মহাদেশে বসতি স্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু গ্রীক ও রোমানদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে অগ্রগতির যে প্রধান প্রধান উপাদানগুলো ছিল, সেগুলো তারা অর্জন করতে পেরেছিল গোত্রভিত্তিক সংগঠন গড়ে ওঠার পরই।[২] এইভাবে একেবারে প্রথম দিকেই অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং মানবপ্রগতির মূল স্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ-

১। আফ্রিকায় কিছু কিছু মানব গোষ্ঠী, যেমন হটেন্‌টটরা, সুপ্রাচীন কালেই আকরিক লোহাকে গলিয়ে লোহা বার করতে শুরু করেছিল আমাদের এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের বহু পূর্ব থেকে। ধাতুটা তৈরি করে বিদেশীদের কাছ থেকে শেখা বিভিন্ন স্থূল প্রক্রিয়ার সাহায্যে তারা নানারকম স্থূল জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বানাত।

২। আমেরিকার আদিবাসীরা এশিয়া থেকেই এসেছিল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই সাদৃশ্যের ব্যাপারটা মানবজাতির একইভাবে উদ্ভব এই তত্ত্বের মধ্যে নিহিত মিলেরই ফলাফল। এই শেষোক্ত বক্তব্যটাও একটা অনুমানই, কিন্তু নৃতত্ত্বের যাবতীয় তথ্য এইদিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করে। দুটো বক্তব্যের সমর্থনেই অজস্র জোরদার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কোন সুচিন্তিত দেশান্তরের ফল হিসেবে তাদের আমেরিকায় বসবাস শুরু হয়নি। সামুদ্রিক দুর্ঘটনার ফলস্বরূপ এবং এশিয়া থেকেউত্তর-পশ্চিম উপকূল অভিমুখী প্রবল সামুদ্রিক স্রোতই এদেরকে সম্ভবত আমেরিকায় নিয়ে এসেছিল।

শন্যে হয়ে এবং বন্য মানুষদের অনুন্নত মানসিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে নতুন মহাদেশে জীবনযাত্রা শুরু করেছিল তারা। যে-সব প্রাথমিক ধ্যানধারণা তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, সেগুলোর নিজস্ব বিবর্তন এবার শুরু হল এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে যা সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত। সরকার, পরিবার, গার্হস্থ্যজীবন, সম্পত্তি ও জীবনধারণের কৌশল—যাবতীয় ধারণার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেই এ কথাটা সত্য ছিল। বন্য যুগ থেকে শুরু করে বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য পর্যায় পর্যন্ত সময়কালে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারগুলো ছিল একই ধরনের, কিন্তু তাসত্ত্বেও এগুলোর মধ্যে সেই মূল ধ্যানধারণার ক্রমান্বয় বিকাশই চোখে পড়ে।

বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের যে নিখুঁত চিত্র ইরোকোয়া এবং মিসিসিপি নদীর পূর্ব দিকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে, পাওয়া গেছে তেমনটা আজকের পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বিদেশী প্রভাব মুক্ত দেশীয় কলা-কৌশল এবং অবিমিশ্র ও সমরূপ চরিত্রবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাদের এই যুগের সংস্কৃতির চৌহদ্দি, উপাদান আর সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এইসব বিষয়গুলো পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগেই এগুলো নিয়ে প্রণালীবদ্ধ আলোচনা হওয়া দরকার।

উল্লিখিত সমস্ত বিষয়গুলোই আর একটু উচ্চমাত্রায় বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের ক্ষেত্রেও সত্য, যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি নিউ মেক্সিকোর ভিলেজ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে, মেক্সিকোয়, মধ্য আমেরিকায়, গ্রেনাডায়, ইকুয়েডরে আর পেরুতে। উন্নত কলাকৌশল আর উদ্ভাবন, উন্নত স্থাপত্য, নানারকম জিনিসপত্র তৈরির সদ্য-আবিষ্কৃত পদ্ধতি আর বিজ্ঞানের প্রাথমিক অঙ্কুরসহ সমাজের এই পর্যায়ের এত চমৎকার ছবি ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর আর কোথাও লভ্য ছিল না। এই উর্বর ক্ষেত্রটিতে আমেরিকার বিদ্বজ্জনদের গবেষণা কিন্তু নিতান্তই নগণ্য। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল প্রাচীন সমাজের হারানো অবস্থারই একটা ছবি, যা ইওরোপীয় পর্যবেক্ষকদের চোখের সামনে হঠাৎই ফুটে উঠেছিল আমেরিকা আবিষ্কারের পর। কিন্তু এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বা ঐ সমাজের গঠনকাঠামো নির্ধারণ করতে তাঁরা সক্ষম হননি।

সমাজের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়। আজকের কোন জাতির মধ্যে সমাজের এই অবস্থাটা আর দেখা যায় না। কিন্তু গ্রীক ও রোমানদের এবং পরবর্তীকালে জার্মান গোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস আর প্রথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের ছবি। এই পর্যায়ের সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেলেও (বিশেষত হোমারের রচনায়), প্রকৃত অবস্থাটাকে বুঝতে হবে মূলত তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের সাহায্যেই।

সবথেকে উপযুক্ত অঞ্চলে সমাজের এই বিভিন্ন অবস্থাগুলোকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে এবং প্রতিটা পর্যায়কে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলে বন্য যুগ থেকে শুরু করে বর্বর যুগের পথ বেয়ে সভ্যতার যুগে এসে পৌঁছনোর প্রক্রিয়ায় মানুষের বিকাশের সমগ্র গতিপথটা একটা পরম্পর সম্পর্কযুক্ত অবিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে প্রতিভাত হয়। আর সেইসঙ্গেই দেখা যায় যে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের অগ্রগতির ধারা প্রায় একই রকম।

সেমিটিক গোষ্ঠীগুলোর পিতৃপ্রধান পরিবার নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন যে নেই, তা আমরা আগেই বলে এসেছি। এখানে আমরা পিতৃপ্রধান পরিবার প্রসঙ্গে দু'একটা কথা উল্লেখ করব মাত্র। এই পরিবার বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার। সভ্য যুগ শুরু হওয়ার পরও কিছুদিন তা টিকে ছিল। প্রধানরা বহুবিবাহ করতই, কিন্তু সেটা পিতৃপ্রধান প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূলক নীতি ছিল না। এই ধরনের পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল একজন পিতা বা কর্তার অধীনে কয়েকজন মুক্ত ও দাস মানুষদের একটা পরিবারে জোটবদ্ধ হওয়া। জমির ওপর অধিকার বজায় রাখা এবং গবাদি পশুর পাল ঠিকমত দেখাশোনা করার জন্যও তারা এইভাবে পরিবারে জোটবদ্ধ হত। বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ ক্রীতদাসরা আর ভৃত্যরা, এবং তাদের প্রধান হিসেবে একজন কর্তা—এদের নিয়েই গড়ে উঠত একটি পিতৃপ্রধান পরিবার। পরিবারের সদস্যদের ওপর এবং পারিবারিক সম্পত্তির ওপর ঐ কর্তারই কর্তৃত্ব ছিল এর মূল ভিত্তি। পিতৃপ্রধান পরিবার একটা মৌলিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পেরেছিল আমাদের অজানা কোন এক সময়ে ক্রীতদাস আর অন্যান্য অধীনস্থ ব্যক্তিদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করার ফলেই, বহুবিবাহের জন্য নয়। সেমিটিক সমাজের যে বিরাট আন্দোলনের ফলে গড়ে উঠেছিল এই পিতৃ-প্রধান পরিবার, সেই আন্দোলনের জন্য দলের ওপর একজন পিতা বা কর্তার সর্বময় ক্ষমতা এবং প্রতিটি ব্যক্তির আরও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ব্যবস্থা করা ছিল একান্তই প্রয়োজনীয়।

এই একই কারণে রোমেও গড়ে উঠেছিল পিতার কর্তৃত্বাধীন পরিবার (patria potestas)। নিজের সমস্ত সন্তান, বংশধর, ক্রীতদাস এবং ভৃত্যদের জীবন-মরণের ওপর পূর্ণ অধিকার থাকত ঐ পিতাটির। পিতাই ছিল গোটা পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। তার নাম অনুযায়ীই পরিবারের নামকরণ করা হত। ঐ পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সৃষ্ট যাবতীয় সম্পত্তিরও পূর্ণ মালিকানা থাকত তার হাতে। এই পরিবারে বহুবিবাহ চলত না। পরিবারের কর্তা বা 'প্যাটার ফ্যামিলিয়াস' (Pater familias) কুলপতির মর্যাদা পেত আর তার অধীনস্থ পরিবারটা হত পিতৃপ্রধান পরিবার। প্রাচীন আমলের গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর পরিবারের মধ্যেও এই একই বৈশিষ্ট্য দেখা যেত—অবশ্য অনেকটা কম মাত্রায়। মানবপ্রগতির এই যুগটাতেই মানুষের স্বতন্ত্রতা গোত্রের প্রভাব ছাড়িয়ে (আগে গোত্রের মধ্যেই মিশে থাকত তার স্বতন্ত্রতা) মাথাচাড়া দিতে শুরু করে, গড়ে উঠতে থাকে মানুষের নিজস্ব জীবন আর স্বাধীনভাবে কাজ করার ব্যাপকতর ক্ষেত্র। এরই প্রভাবে দেখা দেয় একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে তোলার প্রবণতা, কারণ তখনকার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে একবিবাহভিত্তিক পরিবার ছিল অপরিহার্য। আগেকার অন্য সমস্ত ধরনের পরিবারের থেকে পিতৃপ্রধান পরিবারের পার্থক্যটা এখানেই, আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোই ইতিহাসে একে এক বিশিষ্ট আসন করে দিয়েছে। তবে, হিব্রু এবং রোমানদের মধ্যে চালু থাকা পরিবারের এই রূপটা মানব ইতিহাসে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক ও দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব চালু থাকা সম্ভব ছিল না এবং চালু ছিলও না। জোড়-বাঁধা পরিবারের যুগে পিতৃপ্রাধান্য কিছুটা মাথা তুলতে পেরেছিল। পরিবার যত বেশি করে স্বাধীন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে শুরু করে, ততই জোরদার হতে থাকে পিতার কর্তৃত্ব। অবশেষে

একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার পর যখন সন্তানদের পিতৃত্ব নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছিল, তখন থেকেই পিতৃপ্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হয় পুরোপুরিভাবে। রোমান ধরনের পিতৃপ্রধান পরিবারে পিতার হাতে অসীম ক্ষমতা থাকত।
হিব্রুদের পিতৃপ্রধান পরিবার কোন নতুন জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে নি। এই পরিবারের কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রে তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা দিয়েই কাজ চলে যেত। কিন্তু এই পরিবারের অবসান ঘটিয়ে একবিবাহভিত্তিক পরিবার চালু হওয়ার পর তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বদলে গড়ে উঠে সেমিটিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা, ঠিক যেমন গ্রীক ও রোমান জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার বদলে গড়ে উঠেছিল আর্য জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা। মালয়ী, তুরানিয় এবং আর্য —এই তিনটি জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার প্রত্যেকটিই সমাজের এক একটা পূর্ণাঙ্গ কাঠামোগত পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে এবং প্রতিটিই সুনিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দেয় সেই ধরনের পরিবারের অস্তিত্বের, যে ধরনের পরিবারের অন্তর্গত সম্পর্কগুলো তার মধ্যে বিধৃত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একবিবাহভিত্তিক পরিবার

একবিবাহভিত্তিক পরিবারের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এইসব গবেষণায় বলা হয়েছে যে, একবিবাহভিত্তিক পরিবার তুলনামূলকভাবে যথেষ্টই আধুনিক। সমাজের ইতিহাসকে যাঁরা দার্শনিক দিক থেকে বিচার করেছেন, তাঁরা দেখেছেন সমাজের প্রাথমিক একক যে পরিবার, তাকে বাদ দিয়ে সমাজের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না আর এই শেষ যুগের পরিবারকে একবিবাহভিত্তিক পরিবার ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে ভাবাও সম্ভব নয়। তাঁরা আরও দেখেছিলেন যে একজোড়া বিবাহিত দম্পতিকে একদল মানুষের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেওয়াটা একান্তই প্রয়োজনীয়। এই একদল মানুষের মধ্যে একটা অংশ ছিল ক্রীতদাস এবং দলের সকলেই ছিল একজনের কর্তৃত্বাধীন। এইসব বিষয় লক্ষ করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ সংগঠিত সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল পিতৃপ্রধান পরিবারের আমলেই। এটাই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনতম রূপ, যার নজির আমরা দেখেছি লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। তাই লাতিন বা হিব্রু ধরনের পিতৃপ্রধান পরিবারকেই প্রাচীন সমাজের একান্ত নিজস্ব পারিবারিক রূপ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, যে পরিবারের মর্মবস্তু ছিল পিতার কর্তৃত্ব।

বর্বর যুগের শেষ পর্যায়ে গোত্রের যে রূপ দেখা গেছে, তা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন অনেকেই। কিন্তু ভ্রান্তি থেকেগেছে এক জায়গায়—অনেকেই ধরে নিয়েছেন যে সময়ের নিরিখে গোত্র হচ্ছে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের পরের ব্যাপার। আমাদের আজকের দিনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যাখ্যা করার উপাদান হিসেবে বর্বর গোষ্ঠী-গুলোর, এমনকি বন্য গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করাটা ক্রমেই আরও বেশি জরুরী হয়ে উঠছে। একবিবাহভিত্তিক পরিবারকে সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক হিসেবে ধরে নিয়ে অনেকে গোত্রকে ধরে নিয়েছেন কিছু পরিবারের সমষ্টি হিসেবে, গোষ্ঠীকে ধরে নিয়েছেন কিছু গোত্রের সমষ্টি হিসেবে এবং জাতিকে ধরে নিয়েছেন কিছু গোষ্ঠীর সমষ্টি হিসেবে। এই ভাবনার গলদ রয়ে গেছে প্রথম প্রতিপাদ্যটার মধ্যেই। আমরা আগেই দেখেছি যে পুরো গোত্রটাই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত, ভ্রাতৃত্ব গোষ্ঠীর অন্তর্গত আর গোষ্ঠী জাতির অন্তর্গত। কিন্তু কোন পরিবার পুরোপুরিভাবে একটা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না, কারণ স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য। রোমানদের মধ্যে বর্বর যুগের একেবারে শেষ পর্যায় পর্যন্ত মেয়েরা নিজেকে পিতার গোত্রের সদস্যা বলেই মনে করত এবং পিতার গোত্রের উপাধিই ব্যবহার করত। যেহেতু সমস্ত অংশকে অবশ্যই সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে সেহেতু পরিবার কখনোই গোত্রভিত্তিক সংগঠনের প্রাথমিক একক হতে পারত না। এই প্রাথমিক এককের ভূমিকা পালন করত গোত্রই। তাছাড়া, বন্যযুগের

সমগ্র পর্যায়ে এবং বর্বর যুগের প্রথম পর্যায়ে, সম্ভবত মধ্য পর্যায়ে, এমনকি এই যুগের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্তও রোমান বা হিব্রু কোন ধরনের পিতৃপ্রধান পরিবারের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। গোত্রের আবির্ভাব আর একবিবাহভিত্তিক পরিবারের অভ্যুদয়ের মাঝে কেটে গেছে বহু বহু বছর, যুগের পর যুগ। একমাত্র সভ্য যুগ শুরু হওয়ার পরই সমাজের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে একবিবাহভিত্তিক পরিবার।

লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পরবর্তীকালে যে অনেক পরিবার গড়ে উঠেছিল, তা অনুমান করা যায় 'ফ্যামিলি' (পরিবার) শব্দটা থেকেই। এই ফ্যামিলি (family) শব্দটা এসেছে 'ফ্যামিলিয়া' (familia) থেকে। ফ্যামিলিয়ার সঙ্গে আবার সব থেকে বেশি সাদৃশ্য 'ফ্যামুলাস' (famulus) শব্দটার, যার অর্থ হচ্ছে ভৃত্য। ফ্যামিলিয়া শব্দটা এসেছে সম্ভবত ওস্কানদের 'ফ্যামেল' (famel) শব্দ থেকে, যার অর্থ ক্রীতদাস।[১] আদতে ফ্যামিলি শব্দটার সঙ্গে বিবাহিত দম্পতি অথবা সন্তানসন্ততির কোন সম্পর্ক ছিল না, বরং এই শব্দটা ছিল একদল ক্রীতদাস ও ভৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এইসব দাস ও ভৃত্যরাই ঐ দম্পতি আর তাদের সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য মেহনত করত এবং এরা 'প্যাটার ফ্যামিলিয়াস' (pater familias) বা পরিবারের কর্তার অধীনে থাকত। কোন কোন উইল বা ইচ্ছাপত্রে ফ্যামিলিয়া শব্দটাকে ব্যবহার করা হয়েছে 'প্যাট্রিমনিয়াম' (patrimonium) শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে, যার সাহায্যে উত্তরাধিকারীর হাতে হস্তান্তরিত উত্তরাধিকারকেই বোঝানো হত।[২] লাতিন সমাজে এই শব্দটা এসেছিল একটা নতুন সংগঠনকে চিহ্নিত করার জন্য, যে সংগঠনে কর্তার স্ত্রী এবং সন্তানাদি থাকত আর তার অধীনে থাকত কিছু 'ক্রীতদাস।' ফ্যামিলিয়া শব্দটার লাতিন অর্থ বোঝানোর জন্য মমসেন "একদল ভৃত্য" কথাটা ব্যবহার করেছেন।[৩] কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে এই শব্দটা এবং এই শব্দের মধ্যে নিহিত ধারণাটা লাতিন গোষ্ঠীগুলোর আঁটোসাঁটো পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার থেকে পুরনো নয়, আর লাতিনদের মধ্যে এই ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল চাষাবাদ শুরু হওয়ার ও ক্রীতদাস রাখাটা আইনসম্মত হয়ে ওঠার পর, এবং অবশ্যই গ্রীক আর লাতিন-গোষ্ঠিদের মধ্যে বিভাজনের পর। তার আগের যুগে প্রাচীন পরিবারের কোন নাম থেকে থাকলেও আজ আর তা জানার কোন উপায় নেই।

ভাইবোন বিবাহভিত্তিক ও দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব আদৌ সম্ভব ছিল না। একসময় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে গড়ে উঠল গোত্র। এক একটা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হল কয়েকজন বোন, তাদের সন্তানরা এবং ঐ বোনেদের স্ত্রী-ধারার সমস্ত বংশধররা। এই গোত্রই হয়ে উঠেছিল সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক। এই অবস্থার মধ্যে থেকেই ধাপে ধাপে গড়ে উঠল জোড়-বাঁধা পরিবার, আর এই পরিবারের মধ্যেই নিহিত ছিল পিতৃপ্রাধান্যের বীজ। প্রথম দিকে পিতার ক্ষমতা ছিল নিতান্তই

১। Famuli origo ab Oscis dependet, apud quo servus Famul nominabuntur, unde "familia" vocata.—"Festus", পৃঃ ৮৭,

১। Amico familiam suam, id est patrimonium sunm manoipio dabat.—Gaius "Inst.", ii, ১০২.

২। "হিস্ট্রি অফ রোম", খণ্ড ১, পরিচ্ছেদ ১, পৃঃ ৯৫.

দুর্বল। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন ধরনের পরিবারের মধ্যে যতই বেশি করে ফুটে উঠতে লাগল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের লক্ষণগুলো, ততই বেড়ে উঠতে লাগল পিতার ক্ষমতাও। তারপর যখন সমাজে প্রচুর সম্পত্তি সৃষ্টি হল এবং সেই সম্পত্তিকে নিজের সন্তানদের হাতে তুলে দিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল মানুষের মনে, তখন চালু হল বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারার অনুসরণ। পিতৃপ্রাধান্যের প্রকৃত বনিয়াদ গড়ে দিল এই পদক্ষেপটাই। হিব্রু ও লাতিন গোষ্ঠীগুলোর কথা যখন প্রথম জানা যায়, তখন প্রথমোক্তদের মধ্যে চালু ছিল হিব্রু ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবার আর শেষোক্তদের মধ্যে চালু ছিল রোমান ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবার। উভয় ক্ষেত্রেই পরিবারের ভিত্তি ছিল একদল মানুষের আংশিক বা পূর্ণ দাসত্ব। এই ক্রীতদাসরা এবং সেইসঙ্গে প্রথম ক্ষেত্রে পরিবার-প্রধানের ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিবার-কর্তার স্ত্রী আর সন্তানরা ছিল পিতৃকর্তৃত্বের অধীন। পিতৃপ্রাধান্যের এই ঘটনাটা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা ব্যতিক্রম। বিশেষত রোমানদের মধ্যে এই কর্তৃত্বটা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। এ-রকম পিতৃকর্তৃত্ব কিন্তু উল্লিখিত স্থানসমূহ বাদে পৃথিবীর আর কোথাও চালু ছিল না। গেইয়াস্ (Gaius) বলেছেন, নিজের সন্তানদের ওপর কোন রোমান পিতার যে কর্তৃত্ব থাকত, তা একান্তই রোমান সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ; অন্য কোন দেশের পিতারা এতটা ক্ষমতার অধিকারী ছিল না।[১]

প্রথম দিকের একবিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রকৃতিটা ঠিক কেমন ধরনের ছিল, তা বোঝানোর জন্য ধ্রুপদী লেখকদের রচনা থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বর্বর যুগের শেষ পর্যায়েই একবিবাহ একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। তার অনেক আগে জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যেও একবিবাহের কিছু কিছু লক্ষণ অবশ্যই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যে একবিবাহের প্রধান উপাদান, অর্থাৎ যৌনসহবাস কেবলমাত্র একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার ব্যাপারটা ছিল না।

এ ব্যাপারে একটা অত্যন্ত প্রাচীন ও চিত্তাকর্ষক নজির খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীন আমলের জার্মানদের পরিবারের মধ্যে। এদের প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল একইরকম চরিত্র-বিশিষ্ট ও দেশজ, এবং এরা তখন এগিয়ে চলেছিল সভ্যতার অভিমুখে। এদের বিবাহ সংক্রান্ত প্রথাকে অল্পকথায় বর্ণনা করেছেন ট্যাসিটাস, তবে পরিবারের কাঠামো কিংবা তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেননি তিনি। এদের বিবাহবিধি খুব কঠোর ছিল এবং তা যথেষ্টই প্রশংসনীয়—এ-কথা বলার পর ট্যাসিটাস বলেছেন যে বর্বরদের মধ্যে বোধহয় শুধুমাত্র এরাই এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকত ; কেউ কেউ যে বহুবিবাহ করত না এমন নয়, তবে তার পিছনে যৌনকামনার প্রভাব কাজ করত না, কাজ

১। Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos justis nuptiis procreauimus, quod jus proprium ciuium Romanorum est ; fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus :—"Inst.", ১,৫৫। অন্যান্য কিছুর সঙ্গে জীবন-মরণের ওপরেও তাদের কর্তৃত্ব থাকত—jus vitae necispue.

করত তাদের পদমর্যাদা। তিনি আরও বলেছেন যে স্ত্রীরা স্বামীদের কোন যৌতুক দিত না, স্বামীরাই যৌতুক দিত স্ত্রীদের······দিতে হত একটা সাজসজ্জাবিশিষ্ট ঘোড়া, একটা ঢাল, বর্শা আর তরবারি। এইসব সামগ্রী প্রদান করার পরই কোন নারীকে বিবাহ করা সম্ভব হত।[১] বিবাহের পাত্রী সংগ্রহের জন্য প্রদত্ত এই যৌতুকগুলো আগে সম্ভবত পাত্রীর সগোত্রীয় জ্ঞাতিরাই পেত, কিন্তু পরে স্বয়ং পাত্রীই এগুলোর অধিকারিণী হত। অন্যত্র ট্যাসিটাস আরও দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর মধ্যে একবিবাহের মর্মবস্তু মূর্ত হয়ে উঠেছে।[২] প্রথমত, প্রত্যেক পুরুষ একস্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকত (singulis uxoribus contenti sunt); এবং দ্বিতীয়ত, নারীরা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করত কঠোরভাবে (septoe pudicitia agunt)। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে পরিবারের অবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে, তা থেকে মনে হয় যে জীবনধারণের যাবতীয় সমস্যাকে একাকী মোকাবিলা করার পক্ষে জার্মানদের এই পরিবারগুলো ছিল নিতান্তই দুর্বল সংগঠন। আর ঠিক সেই কারণেই কয়েকটা পরস্পরসম্পর্কযুক্ত পরিবার এক একটা যৌথ বাসগৃহে বসবাস করত। দাসপ্রথা পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে যাওয়ার পর এই যৌথ-বাসগৃহগুলো আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিল। এই পর্যায়ের জার্মান সমাজ তখনও পর্যন্ত যথেষ্ট উন্নত ধাঁচের একবিবাহভিত্তিক পরিবারের জন্ম দেওয়ার মত অগ্রসর হয়ে ওঠে নি।

হোমারের যুগের গ্রীকদের মধ্যে একবিবাহভিত্তিক পরিবার চালু থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত নিম্ন মানের। স্বামীরা স্ত্রীদের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইত এবং তার জন্য জোর করে তাদেরকে বাইরের জগৎ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব স্বীকার করতে তারা রাজি ছিল না, অথচ এক-বিবাহের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। হোমারের রচনায় এমন দৃষ্টান্ত বিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায় নারীদের পুরুষরা মর্যাদা দিত খুবই কম। ট্রয়ের পথে পাড়ি দেওয়ার সময় গ্রীক প্রধানরা যে-সব নারী বন্দীকে জাহাজে করে নিয়ে গিয়েছিল, নির্বিচারে তাদের সম্ভোগ করেছিল তারা। মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাগুলো সত্য বা কাল্পনিক যা-ই হোক না কেন, এগুলোকে তৎকালীন সমাজের একটা নির্ভর-যোগ্য প্রতিচ্ছবি হিসেবে মেনে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। উল্লিখিত ঐ নারীরা বন্দিনী ছিল ঠিকই, কিন্তু এ থেকে নারীদের কতটা হীন চোখে দেখা হত তা বুঝে নেওয়া যায়। নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না এবং তাদের ব্যক্তিগত অধিকারও সুরক্ষিত ছিল না আদৌ। অ্যাকিলিসের অসন্তোষ প্রশমনের জন্য গ্রীক প্রধানদের একটি সভায় অ্যাগামেম্‌নন প্রস্তাব দেন—অন্যান্য জিনিসপত্র ছাড়াও অ্যাকিলিসের হাতে তুলে দেওয়া হোক লেস্‌বিয়া নগরী থেকে নিয়ে আসা সাতজন সুন্দরী রমণীকে। লেস্‌বিয়া নগরী ধ্বংস করার পর এই সাত সুন্দরীকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল অ্যাগামেম্‌ননের জন্যই, যাদের মধ্যে ছিল স্বয়ং ব্রাইসেইস-ও। সেই সঙ্গেই অ্যাগামেম্‌নন আরও বলেন যে ট্রয় বিজিত হলে কুড়িজন ট্রোজান রমণীকে নিজের জন্য বেছে নেওয়ার অধিকার

১ "জার্মা নয়া", পৃঃ ১৮.

১ "জার্মানিয়া", পৃঃ ১৯.

পাবেন অ্যাকিলিস, সৌন্দর্যে যাদের স্থান হেলেনের পরেই।[১] "নারী আর লুণ্ঠিত সামগ্রী"—সেই বীর যুগের গ্রীকদের কাছে এটাই ছিল প্রধান জিগির। নারীবন্দীদের প্রতি তাদের আচরণ থেকেই নারীদের সম্বন্ধে সে সময়কার সাধারণ মনোভাবটা বুঝতে পারা যায়। যে পুরুষরা তাদের শত্রুদের পৈতৃক, দাম্পত্য সম্পর্ক কিংবা ব্যক্তিগত অধিকার, কোন কিছুরই পরোয়া করত না, তারা যে নিজেদের মধ্যেও ঐ সব অধিকার সম্বন্ধেও কোন উচ্চতর ধারণায় পৌঁছতে সক্ষম ছিল না—সেটা স্বতঃসিদ্ধ। অবিবাহিত অ্যাকিলিস আর তাঁর বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের শিবির-জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে, একজন প্রধান হিসেবে অ্যাকিলিসের চরিত্র ও মর্যাদার প্রমাণ দেওয়াটা প্রয়োজনীয় বলে বোধ করেছিলেন হোমার। তিনি লিখেছেন—নিজের সুনির্মিত শিবিরে অবসর যাপন করতেন অ্যাকিলিস, আর তাঁর সঙ্গে শয়ন করত লেসবিয়া থেকে নিয়ে আসা এক উজ্জ্বল-কপোল রমণী—ডায়োমিডে। শিবিরের অন্যদিকে শয়ন করতেন প্যাট্রোক্লাস। তাঁর শয্যাসঙ্গিনী ছিল এক ক্ষীণকটি রমণী—ইফিস্। এই ইফিস্‌কে অ্যাকিলিস বন্দিনী করেছিলেন স্কাইরস্-এ, এবং তাকে তুলে দিয়েছিলেন প্রিয়তম বন্ধুর হাতে।[২] সে যুগের মহান কবি কর্তৃক বর্ণিত এবং মানুষের সমর্থনপুষ্ট এইসব রীতি ও প্রথা থেকে (অবিবাহিত ও বিবাহিত পুরুষ, উভয়েরই) বোঝা যায়, একবিবাহ বলতে যা চালু ছিল, তা হচ্ছে আসলে স্ত্রীদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া একটা বাধ্য-বাধকতা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্বামীরা আদৌ একপত্নীগামী ছিলনা। এ ধরনের পরিবারের মধ্যে একবিবাহের বৈশিষ্ট্য যতটা থাকে, ঠিক ততটাই থেকে যায় জোড়-বাঁধা বিবাহের বৈশিষ্ট্যগুলোও।

অনেকের ধারণা মহাকাব্যের যুগে নারীদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, এবং সভ্যতার যুগ শুরু হওয়ার সময় ও তার পরে নারীদের অবস্থার বিপুল উন্নতি ঘটার সময়েও পরিবারে তাদের যা মর্যাদা ছিল, তার থেকে অনেক বেশি মর্যাদা তারা পেত সেই মহাকাব্যের যুগে। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারা অনুসরণ চালু হওয়ার অনেক আগে নারীরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী হয়ত ছিল, কিন্তু মহাকাব্যের যুগে ব্যাপারটা আদৌ সে-রকম ছিল না। জীবনধারণের উপকরণ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন, একটা বিপুল অগ্রগতি ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই অগ্রগতি বর্বর যুগের সমগ্র অন্তিম পর্যায়টা জুড়ে নারীদের প্রতি অসম্মানজনক মনোভাবকে আরও বাড়িয়েই তুলেছিল।

আমরা আগেই বলেছি যে বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হওয়ার ফলে স্ত্রী ও মায়েদের ভূমিকা ও অধিকার যথেষ্টই ক্ষুন্ন হয়েছিল। সন্তানরা আর তাদের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত না, তারা বিবেচিত হল পিতার গোত্রের সদস্য হিসেবে। তাছাড়া, বিবাহের পর মেয়েরা নিজেদের গোত্রের অধিকারগুলো হারালো, অথচ তার সমতুল কোন অধিকার স্বামীর গোত্রে এসে পেল না। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঘটার আগে পরিবারের মধ্যে খুব সম্ভবত নারীদের গোত্রের

১। ইলিয়াড, নবম পর্ব, পৃঃ ১২৮.

২। ঐ, পৃঃ ৬৬৩.

লোকদেরই সংখ্যাধিক্য থাকত। ফলে মাতৃত্বের বন্ধনটা সক্রিয় থাকত পুরোপুরিভাবে, এবং পুরুষদের বদলে নারীরাই পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হত। বংশধারার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার পর নিজের গোত্রের জ্ঞাতিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বামী-দের সংসারে একা হয়ে পড়ল নারীরা। স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ল মাতৃত্বের বন্ধন, অবনতি ঘটল নারীর সামাজিক মর্যাদার, অবরুদ্ধ হল তাদের অগ্রগতির পথ। বিত্তবান শ্রেণীগুলোর মধ্যে নারীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত, আর তার সঙ্গে তাদের ওপর দায়িত্ব থাকত আইনসিদ্ধ বিবাহ মারফৎ সন্তান উৎপাদনের। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পরবর্তী যুগের তুলনায় (যে যুগ সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশি ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ পেয়েছি) মহাকাব্যের যুগে নারীদের অবস্থা অনেক হীন ছিল।

গ্রীক পুরুষদের মধ্যে বরাবরই এমন একটা অহংবোধ বা ইচ্ছাকৃত স্বার্থপরতা ছিল, যার দরুন তারা সর্বদাই নারীদের হীন চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। বন্যদের মধ্যে কিন্তু এই ব্যাপারটা প্রায় কখনোই দেখা যায়নি। গ্রীকদের সাংসারিক জীবনে এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের স্ত্রীরা একমাত্র স্বামীর সঙ্গে ছাড়া আর কোন পুরুষের সঙ্গে সহবাসের সুযোগ পেত না। অথচ স্বামীরা কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে এ-রকম কোন বাধ্যবাধকতা মেনে চলত না। এ থেকে বোঝা যায় যে আগে তাদের মধ্যে চালু ছিল তুরানিয় ধাঁচের জ্ঞাতি-ব্যবস্থা, আর সেই ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানোই ছিল তৎকালীন গ্রীকদের উদ্দেশ্য। শত শত বছরের অভ্যাসে নিজেদের হীন বলে মনে করতে গ্রীক নারীরা এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে এমনকি গ্রীকদের চরম উন্নতির একেবারে শেষ পর্যায়েও তারা সেই মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। গ্রীক সমাজকে জোড়-বাঁধা পরিবারের স্তর থেকে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে উন্নীত করার জন্য নারীদের এই ত্যাগ হয়ত প্রয়োজনীয়ই ছিল। যে-জাতিটা নিজেদের চিন্তাভাবনাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল সারা পৃথিবীর সামনে, তারা যে কি করে সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছতে নিজেদের নারীদের প্রতি আচার-আচরণে প্রায় বর্বরসুলভই রয়ে গিয়েছিল, সেটা আজও বুঝে ওঠা দুষ্কর। না, নারীদের প্রতি কোন রকম নিষ্ঠুর আচরণ করা হত না কিংবা তাদের সঙ্গে প্রদত্ত সুযোগগুলোর ক্ষেত্রে অভদ্র ব্যবহারও করা হত না। কিন্তু তারা শিক্ষার সুযোগ প্রায় পেতই না, পেত না পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ। নারীরা যে হীন, এটা ধরেই নেওয়া হত এবং একসময় নারীরাও সেটাকেই সত্য বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গিনী ও সমকক্ষ ছিল না, বরং স্ত্রীকে স্বামীরা অনেকটা কন্যার চোখেই দেখত। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই একবিবাহের মৌলিক নীতি লঙ্ঘিত হত, কারণ যথেষ্ট উন্নত একবিবাহের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা ঘটা অসম্ভব। মর্যাদায়, ব্যক্তিগত অধিকারে এবং সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে স্ত্রী অবশ্যই স্বামীর সমকক্ষ। এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আজকের এই একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে তোলার পিছনে কী বিপুল অভিজ্ঞতা আর কত সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়েছিল।

ঐতিহাসিক যুগে গ্রীক নারীদের আর গ্রীক পরিবারগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের হাতে প্রচুর সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। বেকার তাঁর বিপুল গবেষণাসমৃদ্ধ রচনা-

গুলোতে প্রধান প্রধান তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন।[১] তাঁর বিবরণের মধ্যে ঐতিহাসিক যুগের পরিবারের কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া না গেলেও, এই বর্ণনা থেকে যথেষ্ট ভাল ভাবেই বোঝা যায় গ্রীকদের পরিবার আর আধুনিক সুসভ্য পরিবারের মধ্যে পার্থক্যটা কত বিশাল। একেবারে প্রথম দিককার একবিবাহভিত্তিক পরিবারের অবস্থাটা কেমন ছিল, সেটাও জানা যায় বেকারের বিবরণ থেকে।

বেকারের উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে দুটো বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রথমত, বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক মারফৎ সন্তান উৎপাদন করা ; আর দ্বিতীয়ত, এই উদ্দেশ্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য বাইরের জগৎ থেকে নারীদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। এই দুটো ব্যাপার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলো থেকে তাদের পূর্বতন অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। প্রথমত, বর্বর যুগের মানুষদের কাছে প্রেম ছিল একটা অজানা বস্তু। প্রেমের সূক্ষ্ম বোধ তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। প্রেম হচ্ছে সভ্যতার ফসল, সভ্য যুগের সূক্ষ্ম অনুভূতির

১। চ্যারিক্লস্ থেকে গৃহীত ("এক্সকারসাস", xii লংম্যান সংস্করণ, মেট্‌কাফের অনুবাদ) নিম্নোক্ত সংক্ষেপিত বিবৃতিটির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগের নারীদের থেকে হোমারের যুগের নারীরা সাংসারিক জীবনে অনেক বেশি সম্মানজনক অবস্থায় ছিল—এ কথা বলার পর তিনি গ্রীক সংস্কৃতির উন্নত পর্যায়ে নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে, বিশেষত এথেন্স আর স্পার্টার নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নারীদের তারা বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী হিসেবে মনে করত (পৃঃ ৪৬৪) ; স্বাধীনতার কোন সুযোগই ছিল না নারীদের, সারা জীবন ধরেই তাদেরকে নিতান্ত নাবালিকা হিসেবে গণ্য করা হত ; মেয়েদের জন্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা ছিল না, যাবতীয় শিক্ষাই তারা পেত নিজেদের মা আর ধাত্রীদের কাছ থেকে, আর সে শিক্ষা বলতে সেলাই বুনন এবং অন্যান্য মেয়েলী কাজকর্মকেই বোঝানো হত (পৃঃ ৪৬৫) ; নারীদের সংস্কৃতি যাদের ছাড়া বিকশিত হতে পারে না তাদের সঙ্গে, অর্থাৎ পুরুষ সমাজের সঙ্গে, মেলামেশার প্রায় কোন-রকম সুযোগই পেত না নারীরা ; বিদেশীদের সঙ্গে এবং নিজেদের নিকটতম আত্মীয়দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও ছিল না তাদের ; এমনকি নিজেদের পিতা বা স্বামীর সঙ্গেও তাদের খুব একটা দেখাসাক্ষাত হত না, কারণ পুরুষরা বেশি সময়টাই কাটাত দেশের বাইরে, আর বাড়িতে থাকলেও তারা বসবাস করত নিজেদের আলাদা মহলে ; বাড়ির অন্তঃপুর বা জেনানাম হলটা ঠিক কারাগার বা বদ্ধদুয়ার হারেম না হলেও, ঐ সংরক্ষিত জায়গ টুকুর মধ্যেই বাড়ির মেয়েদের সারাটা জীবন বদ্ধ হয়ে থাকতে হত ; সবথেকে করুণ অবস্থা ছিল কুমারী মেয়েদের, কারণ বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে প্রায় কোথাওই বেরোতে দেওয়া হত না, বলা যায় প্রায় তালাবন্ধ করে রাখা হত (পৃঃ ৩৬৫)। কোন অল্পবয়সী স্ত্রী তার স্বামীকে না জানিয়ে বাড়ির বাইরে গেলে সেটাকে অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার বলে মনে করা হত, আর বস্তুত তারা বাড়ির বাইরে প্রায় বেরোতই না ; ফলে, নিজের ক্রীতদাসীদের সঙ্গেই তাকে দিন কাটাতে হত ; তার স্বামী ইচ্ছে করলে তাকে বাড়ির মধ্যে কয়েদ করেও রাখতে পারত (পৃঃ ৪৬৬) ;

কতকগুলো উৎসবে শুধু মেয়েরাই যোগ দিতে পারত, পুরুষরা নয় ; সেইসব উৎসবের সময় মেয়েরা পরস্পরকে জানার কিছুটা সুযোগ পেত, তাই এই উৎসগুলো তারা উপভোগ করত প্রাণভরে ; নানান বিধিনিষেধের দরুণ মেয়েদের পক্ষে বাড়ির বাইরে বেরোনোটা ছিল নিতান্তই দুষ্কর ; স্বামীর দ্বারা নিয়োজিত একজন ক্রীতদাসীকে সঙ্গে না নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোনোর কথা কোন অভিজাত মহিলা ভাবতেও পারত না (পৃঃ ৪৬৯) ; এইসব বিধিনিষেধের ফলে মেয়েরা হয়ে উঠত অত্যধিক লাজুক, বেশি-রকম শালীনতার ভান করাটা হয়ে উঠত তাদের মজ্জাগত, এমনকি কোন বিবাহিতা মহিলাকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কোন পুরুষ হঠাৎ দেখে ফেললে মহিলাকে লজ্জায় একেবারে জড়োসড়ো হয়ে যেত (পৃঃ ৪৭১) ; ঈশ্বর, রাষ্ট্র আর পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য পালনের স্বার্থে সন্তান উৎপাদনের জন্যই বিবাহ করাটাকে একটা প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে করত গ্রীকরা ; কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিবাহকে এর থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত না, প্রণয়ঘটিত বিবাহের ঘটনাও ছিল নিতান্তই নগণ্য (পৃঃ ৪০৩) ; অনুরাগের উৎস ছিল যৌনকামনা এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেহজ ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কের স্থান ছিল না (পৃঃ ৪৭৩) ; এথেন্সে এবং সম্ভবত গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রেও বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করা হত সন্তান উৎপাদনকেই, পাত্রীর সঙ্গে আগে থেকে জানা পরিচয় থাকার, অন্তত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার কোন প্রয়োজনই হত না ; পাত্রীর নিজস্ব গুণাগুণের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব পেত তার তার পরিবারের অবস্থা, প্রদত্ত যৌতুকের পরিমাণ ইত্যাদি ; এ-রকম বিবাহে সত্যি-কারের ভালবাসা গড়ে ওঠা খুবই কঠিন, তাই স্বাভাবিকভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিস্পৃহতা, ঔদাসীন্য ও অসন্তোষ জন্ম নিত বহু ক্ষেত্রেই (পৃঃ ৪৭৭) ; গৃহকর্তার সঙ্গে অন্য কোন পুরুষ আহারে না বসলে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে খেতে বসত, কারণ বারাঙ্গনা হিসেবে গণ্য হতে না চাইলে কোন নারী এমনকি তার নিজের বাড়িতেও পুরুষদের পান-ভোজনের সভায় কিংবা কোন বন্ধুর সঙ্গে স্বামীর আহার করার সময় সামনে হাজির থাকার কথা চিন্তাও করতে পারত না (পৃঃ ৪৯০) ; স্ত্রীর কাজ ছিল গৃহস্থালির কাজকর্ম দেখাশোনা করা আর সন্তানদের লালনপালন করা ; কোন একজন শিক্ষকের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত লালনপালন করতে হত পুত্রদের আর বিবাহের আগে পর্যন্ত কন্যাদের ; কোন স্ত্রী তার স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গ করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত ; নারীদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য নারীরা রীতিলঙ্ঘন করার সুযোগ খুব একটা পেত না ঠিকই, কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা নানাভাবে স্বামীদের প্রতারিত করার উপায় খুঁজে নিত ; সচ্চরিত্র সংক্রান্ত আইনটা ছিল নিতান্তই একপেশে, কেননা স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীরা চাইত চূড়ান্ত বিশ্বস্ততা এবং স্ত্রী কোনভাবে সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি দিত, অথচ স্বামীরা কিন্তু যখন খুশি বারাঙ্গনা বা রক্ষিতাদের সঙ্গে মিলিত হত ; পুরুষদের এই ধরনের কাজকে ঠিক সমর্থন করা না হলেও এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না এবং এগুলোর ফলে দাম্পত্য অধিকার ভঙ্গ হয় বলেও মনে করা হত না (পৃঃ ৪২৪)।

সন্তান। গ্রীকদের বিবাহপ্রথা থেকে বোঝা যায় যে সাধারণভাবে তাদের মধ্যে প্রেমের কোন অস্তিত্ব ছিল না—তবে বেশ কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। গ্রীকদের বিচারে নারীদের যাবতীয় যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি ছিল শারীরিক গুণাগুণ। কাজেই তাদের বিবাহের পিছনে আবেগের কোন স্থান ছিল না, প্রয়োজনের তাগিদে এবং কর্তব্যপালনের খাতিরেই তারা বিবাহ করত। ইরোকোয়া এবং আজটেকরাও বিবাহকে এই চোখেই দেখত। এই দৃষ্টিভঙ্গীটা আসলে বর্বর যুগেরই ফসল এবং এ থেকে গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর পূর্বপুরুষদের বর্বরসুলভ অবস্থাটা ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, গ্রীক সভ্যতা যখন মধ্য গগনে, তখনও তাদের পারিবারিক সম্পর্কের ধারণার পিছনে এই দৃষ্টিভঙ্গীই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বস্তুতপক্ষে, সম্পত্তির উদ্ভব এবং সেই সম্পত্তি নিজের সন্তানদের হাতে তুলে দিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই জন্ম দেয় একবিবাহের। একবিবাহের ফলে সুনিশ্চিত হত বৈধ উত্তরাধিকার এবং বিবাহিত দম্পতির প্রকৃত সন্তানরাই শুধু বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হত। জোড়-বাঁধা পরিবারের আমলেই সন্তানদের পিতৃত্ব নিরূপণ করা অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল (গ্রীকদের ঐ পারিবারিক ধাঁচটাও গড়ে উঠেছিল জোড়-বাঁধা পরিবার থেকেই), কিন্তু পুরনো আমলের বিবাহপ্রথা তখনও পর্যন্ত আংশিকভাবে চালু থাকার দরুন পিতৃত্ব নিরূপণের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যেত না। তার জন্যই বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে দেখা দিয়েছিল এক নয়া রীতি—বাইরের জগৎ থেকে স্ত্রীদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। আসলে ঐ সময়ে স্ত্রীদের এইভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার একটা প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই ছিল। আর এই প্রয়োজনটা ছিল এতই মারাত্মক ধরনের যার দরুন সভ্য যুগের গ্রীকদের পারিবারিক জীবন মূলত নারীদের প্রায় বন্দিনী করে রাখার আর বিধিনিষেধের বেড়াজালে বেঁধে রাখার একটা ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল। আমাদের উল্লিখিত তথ্যগুলো প্রধানত সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, এই মনোভাবটা ছড়িয়ে পড়েছিল সকলকার মধ্যেই।

এবার একটু রোমান পরিবারগুলোর দিকে নজর দেওয়া যাক। এদের মেয়েরা কিছুটা অনুকূল পরিবেশ পেত ঠিকই, কিন্তু তাদের পরাধীনতা ছিল একই রকম।

এথেন্সের মত রোমেও মেয়েদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করা হত, কিন্তু রোমান পরিবারে মেয়েদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল অনেক বেশি। পরিবারের কর্ত্রী ছিল মেয়েরাই। তারা অবাধে বাড়ির বাইরে যেতে পারত, স্বামীরা তাতে কোন আপত্তি করত না। নাট্যশালায় এবং বিভিন্ন উৎসবের ভোজসভাতেও তারা যোগ দিত পুরুষদের সঙ্গে। বাড়িতে তাদের কোন বিশেষ মহলের মধ্যে আটকে থাকতে হত না, পুরুষদের আসরেও তারা হাজির থাকতে পারত। গ্রীক নারীদের মত জঘন্য বিধিনিষেধ রোমান নারীদের ওপর না থাকার ফলে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদা ও স্বাধীনতাবোধ গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল অনেক বেশি। প্লুটার্ক বলেছেন, স্যাবাইন নারীদের হস্তক্ষেপের ফলে স্যাবাইনদের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর রোমের নারীরা নানারকম সম্মানের অধিকারিণী হয়েছিল। রাস্তায় সামনাসামনি পড়ে গেলে পুরুষরা তাদের পথ ছেড়ে দিত; নারীদের সামনে পুরুষরা কোন অশালীন শব্দ উচ্চারণ করতে কিংবা নগ্ন

অবস্থায় নারীদের সামনে যেতে পারত না।[১] তবে বিবাহের পর নারীরা থাকত স্বামীর অধীনে (in manum viri)। নারীদের স্বামীর অধীনে রাখার ধারণাটা গড়ে উঠেছিল প্রয়োজনের খাতিরেই—বিবাহের পর তারা মুক্তি পেত পিতার কর্তৃত্ব থেকে। স্ত্রীদের সঙ্গে স্বামীরা সমকক্ষের মত আচরণ করত না, আচরণ করত কন্যার সঙ্গে পিতার মত। তাছাড়া, স্ত্রী ব্যভিচার করলে তাকে সংশোধন করার এবং প্রয়োজনে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারও থাকত স্বামীদের। তবে এই শেষ অধিকারটা প্রয়োগ করার জন্য সম্ভবত স্ত্রীর গোত্রের পরিষদের সর্বসম্মত মতামত নিতে হত।

রোমানদের মধ্যে তিন ধরনের বিবাহ চালু ছিল, যেটা অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় নি। এই তিন ধরনের বিবাহেই স্ত্রীকে তুলে দেওয়া হত স্বামীর হাতে এবং বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে মনে করা হত বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক মারফৎ সন্তান উৎপাদনকে liberorum gucrcndorum causa)।[২] বিবাহের এই রূপগুলো (covfarreation coemptio এবং usns) রোমান প্রজাতন্ত্রের সমগ্র যুগটা জুড়েই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের যুগে এসে এগুলো আর টিকে থাকতে পারেনি। এই যুগে দেখা দেয় বিবাহের চতুর্থ রূপ: অবাধ বিবাহ। এই রূপটা সাধারণভাবে গৃহীত হয়, কারণ অবাধ বিবাহে স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্বাধীন করা হত না। স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছে করলে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারত (এই ব্যাপারটা একেবারে প্রথম থেকেই চালু ছিল)। বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর এই অধিকার ছিল জোড়-বাঁধা পরিবারের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, এবং সম্ভবত সেখান থেকেই অধিকারটা এসে পৌঁছেছিল পরবর্তী যুগে। তবে গণতন্ত্রের জমানা শেষ হওয়ার কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা প্রায় ঘটতো না বললেই চলে।[৩]

১। "ভিট. রোম," পৃঃ ২০.

২। Quinctilian.

৩। দাম্পত্য জীবনে রোমান নারীদের বিশ্বস্ততা প্রসঙ্গে বেকার মন্তব্য করেছেন, "একেবারে গোড়ার দিকে নারী বা পুরুষ কেউই খুব একটা অনাচার করত না।" যদিও কথাটা নেহাতই অনুমান মাত্র। কিন্তু, "যখন নৈতিকতায় অবনতি ঘটতে শুরু করল, ভাঙন ধরল এই বিশ্বস্ততাতেও। নারী-পুরুষ একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে লাগল উচ্ছৃঙ্খলতায়। নারীদের নিজস্ব লজ্জাবোধ কমতে শুরু করল, বেড়ে উঠল বিলাসিতা আর অসংযম। তাঁর নিজের পূজারিনীদের (Bacchis) সম্বন্ধে ক্রিটিফো যে অভিযোগ করেছিলেন (Ter., "Heaut.," ii, ১,১৫), তা অনেক নারীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ছিল: "Mca est petax, pracax, magnifica, sumptuous, nobilis।" স্বামীদের অবহেলার জবাবে অনেক রোমান মহিলাই কোন একজন পুরুষকে নিজের প্রণয়ী হিসেবে গ্রহণ করত। এই প্রণয়ীটি ঐ মহিলার, প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অছিলায় সারাক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। এর ফলস্বরূপ অবিবাহিত পুরুষদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিল আর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে উঠেছিত নিতান্ত সাধারণ ঘটনা।" —গ্যালাস, "এক্সকার্সাস," i, পৃঃ ১৫৫, লংম্যান সংস্করণ, মেট্কাফের অনুবাদ।

সভ্যতার চরম উন্নতির সময় গ্রীস ও রোমের নগরগুলোতে যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকোপ দেখা গিয়েছিল, সেটাকে সাধারণত উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর সদাচার এবং নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতি বলেই মনে করা হয়। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। ব্যাপারটাকে অন্যরকম-ভাবে, অন্তত কিছুটা পরিবর্তিত রূপে, ব্যাখ্যা করাই যায়। প্রকৃতপক্ষে, নারী-পুরুষের মিলনের ব্যাপারে তারা কখনোই কোন বিশুদ্ধ নৈতিকতার স্তরে উন্নীত হতে পারে নি, ফলে বিচ্যুতি বা অবনতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। নানান যুদ্ধবিগ্রহের দরুন জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতাটা সাময়িকভাবে অবদমিত বা কিছুটা প্রশমিত হত ঠিকই, কিন্তু শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা বেড়ে উঠত, কারণ এই উচ্ছৃঙ্খলতার মূলোচ্ছেদ করার মত নৈতিক উপাদান সমাজের মধ্যে তখনও পর্যন্ত গড়েই ওঠেনি। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল সম্ভবত তাদের প্রাচীন দাম্পত্য ব্যবস্থারই স্মারক। এই উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের জীবন থেকে কখনোই পুরোপুরি দূর হয়নি। বর্ব্বর যুগ থেকেই একটা সামাজিক কলঙ্ক হিসেবে চালু থেকেছে উচ্ছৃঙ্খলতা, তারপর সভ্যতার যুগে এসে বণিকাগমনের নতুন পথ বেয়ে তা আরও বেড়ে উঠেছে। স্ত্রীদের বাড়ির অন্দরমহলে আটকে না রেখে কিংবা নিজেদের অধীন করে না রেখে গ্রীক ও রোমানরা যদি একবিবাহের অন্তর্নিহিত সমকক্ষতাকে মর্যাদা দিতে শিখত, তাহলে তাদের সমাজব্যবস্থার আদল অনেকটাই বদলে যেত। গ্রীক বা রোমানদের নীতিবোধ আর উন্নত হয়নি বলে জনজীবনে নৈতিকতার কোনরকম স্খলন দেখেই তারা বিচলিত হত না। আসল কথা হল গ্রীস বা রোম কোন জায়গাতেই একবিবাহের নীতি সামগ্রিকভাবে স্বীকৃত হয় নি, অথচ কেবলমাত্র একবিবাহই তাদের নিজ নিজ সমাজকে একটা মজবুত নৈতিক বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলতে পারত। ইতিহাসের এই বিশিষ্ট জাতিগুলোর অকাল পতনের একটা বড় কারণ হচ্ছে নারীদের মানসিক, নৈতিক ও সংরক্ষণপ্রবণ ক্ষমতার বিকাশ না ঘটানো এবং তা ব্যবহার না করা। প্রগতির জন্য এবং টিকে থাকার জন্য নারীদের এই ক্ষমতাগুলো কাজে লাগানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুদীর্ঘকাল বর্বরতার.অবস্থায় থাকার পর (এই অবস্থার মধ্যেই তারা সভ্যতার বাকি উপাদানগুলো অর্জন করেছিল), একটা অল্পকাল স্থায়ী উজ্জ্বল অধ্যায় পার হয়ে, রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তারা। নতুন জীবনে পা রাখার অতিরিক্ত উল্লাসই এর কারণ ছিল বলে মনে হয়।

হিব্রুদের মধ্যে প্রথম দিকে পিতৃপ্রধান পরিবারই চালু ছিল। অতঃপর তার বদলে গড়ে ওঠে একবিবাহভিত্তিক পরিবার এবং মানুষের মধ্যে তা বেশ চালু হয়ে ওঠে। কিন্তু এদের এই পরিবারের গঠনকাঠামো বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের হাতে তথ্য খুবই কম।

দৃষ্টান্ত আর না বাড়িয়েও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় একটা নিম্নতর রূপ থেকেই গড়ে উঠেছিল একবিবাহভিত্তিক বিবাহের নির্দিষ্ট রূপটা। ধ্রুপদী যুগে (elassibal period) এই পরিবার যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিল, তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় নি তখনও। আগের যুগের জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যে থেকেই যে গড়ে উঠেছিল এই পরিবার, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নত হয়ে উঠছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারও। কিন্তু ধ্রুপদী যুগে এসে

নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সরে যায় এই পরিবার। সবথেকে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠার জন্য একবিবাহভিত্তিক পরিবারকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আধুনিক কাল পর্যন্ত। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে পুরেনো আমলের লেখকরা যা লিখে গেছেন, তা থেকে জানা যায় যে সমাজে তখন একবিবাহ সাধারণভাবে চালু ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার মূল্যায়ন করলে বোঝা যায় যে আসলে বিভিন্ন প্রভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে টিঁকে থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিল ভবিষ্যতের একবিবাহভিত্তিক পরিবার। এই পরিবারের জীবনীশক্তি, অধিকার এবং নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা ছিল খুবই কম। তাছাড়া, প্রাচীন দাম্পত্য ব্যবস্থার নানান অবশেষ তখনও পর্যন্ত মধ্যে এর বিদ্যমান ছিল।

মালয়ী জ্ঞাতি-ব্যবস্থার মধ্যে যেমন অভিব্যক্ত হত ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্কগুলো, তুরানিয় জ্ঞাতি-ব্যবস্থার মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্ক-গুলো,—ঠিক তেমনি আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থার মধ্যে অভিব্যক্ত হত একবিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্কগুলো তিনটি আলাদা ধরনের বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে উঠত এই তিন ধরনের পরিবার।

আর্য, সেমিটিক ও উরালিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে আগে তুরানিয় জ্ঞাতি-ব্যবস্থাই চালু ছিল এবং একবিবাহের প্রচলন হওয়ার পর তা বাতিল হয়ে যায়—এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা আমাদের আজকের জ্ঞানে সম্ভব নয়। তবে, আমাদের জানা তথ্যগুলো এই দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। আমাদের প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য-প্রমাণের অভিমুখ সুস্পষ্টভাবেই এই সিদ্ধান্তমুখী, ফলে অন্য কোন সম্ভাবনার কথা অনায়াসেই বাতিল করে দেওয়া যায়। প্রথমত, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেই নিহিত ছিল গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার বনিয়াদ, কারণ সেখানে পরস্পরের স্বামীদের সঙ্গে বিবাহিতা একদল বোন এবং তাদের সন্তান ও স্ত্রী-ধারার বংশধরদের নিয়ে গড়ে উঠত প্রাচীন ধরনের গোত্রের সম্পূর্ণ কাঠামো। আর্যদের প্রধান প্রধান শাখা গুলোর কথা যখন প্রথম জানা যায়, তখন তারা প্রত্যেকেই গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই আরও জোরদার হয়ে ওঠে যে একটা অবিভক্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে থাকার সময় আর্যরা সংগঠিত ছিল গোত্রের ভিত্তিতেই। এ থেকেই আবার অনুমান করা চলে যে এই সংগঠন তারা তাদের বহু আগেকার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল যারা নিজেরাও বসবাস করত দলগত বিবাহের অবস্থাতে। এই দলগত বিবাহই জন্ম দিয়েছিল গোত্রের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ও বহু-বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানের। তাছাড়া, আমেরিকার আদিবাসীদের প্রাচীন ধরনের গোত্রের মধ্যে আজও তুরানিয় জ্ঞাতি-ব্যবস্থা চালু আছে। এই অবস্থার অবসান ঘটানোর মত জোরদার কোন সামাজিক অবস্থাগত পরিবর্তন (একবিবাহের মত) না ঘটা পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু থাকবে। দ্বিতীয়ত, আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থার মধ্যেও এমন কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে যা এই একই সিদ্ধান্তের দিকে আঙ্গুলিনির্দেশ করে। এটা সহজেই অনুমেয় যে আর্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আগে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা চালু থেকে থাকলেও একবিবাহ প্রথা শুরু হওয়ার পর সেই জ্ঞাতি-ব্যবস্থার বেশ কিছু সম্বোধনের অস্তিত্ব থাকা আর সম্ভব ছিল না। নতুন ব্যবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের পার্থক্য

দেখাদিল, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে গেল পুরনো ব্যবস্থার সম্বোধনগুলো। আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থার আদি সম্বোধন-তালিকার হতশ্রী অবস্থাটা ব্যাখ্যা করার এই অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্ত চাপা ছাড়া আর উপায় কী? অন্য কোন উপায় নেই। পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং পুত্র-কন্যার জন্য আর্যদের বিভিন্ন উপভাষায় একই অভিধা চালু ছিল। ভাইপো, নাতি আর খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাইদের জন্যও চালু ছিল একটিই সম্বোধন। (সংস্কৃত—নাপতার ; লাতিন—নেপোস : গ্রীক—অ্যানেপ্‌সিওস)। জ্ঞাতি-দের সম্বোধন করার এই অল্প কয়েকটা অভিধা নিয়ে তারা কখনোই একবিবাহসৃষ্ট উন্নত অবস্থায় পেঁছিতে পারত না। এই হতশ্রী অংস্থাটাকে কেবলমাত্র আগে তুরানিয় ব্যবস্থার সদৃশ কোন জ্ঞাতি-ব্যবস্থা চালু থাকা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। ভাই ও বোনের সম্বোধনগুলো এইসময় সৃষ্টি হয়েছিল তত্ত্বগতভাবে এবং এটা ছিল একটা নতুন ব্যাপার। কারণ তুরানিয় ব্যবস্থায় ভাইবোনের সম্পর্ককে শুধুমাত্র বয়সে বড় না ছোট—এই দিয়েই বিচার করা হত। বিভিন্ন বর্গের লোকদের ক্ষেত্রে একই অভিধা প্রয়োগ করা হত, এমনকি যারা আপন ভাইবোন নয় তাদের ক্ষেত্রেও। আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থায় এইধরনের বিভাজন আর রাখা হল না এবং এই সম্পর্কগুলোকে এই প্রথম তত্ত্বগতভাবে বিচার করা হল। একবিবাহের আমলে পুরনো সম্বোধনগুলো আর প্রযোজ্য রইল না, কেননা এগুলো কেবলমাত্র সমকক্ষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। তবে, উরালিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এবং হাঙ্গেরিয়দের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তুরানিয় ব্যবস্থার কিছু ছাপ রয়ে গেছে। এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে ভাই বোনদের বয়সে বড় ও ছোট অনুয়ারী বিশেষ বিশেষ সম্বোধনে ডাকার রীতি চালু আছে। ফরাসীদের মধ্যে ফ্যারে (frere) এবং সউর (soeur)-এর পাশাপাশিই চালু আছে এই (aine) অর্থাৎ বড় ভাই, পুন (Pune) ও কাদেৎ (cadet) অর্থাৎ ছোট ভাই, এবং এইনে (ainee) ও কাদেতে (cadette) অর্থাৎ বড় ও ছোট বোন—এই সম্বোধনগুলো। সংস্কৃত ভাষাতেও এই সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে চালু আছে অগ্রজর ও অনুজর এবং অগ্রজা ও অনুজা নামক সম্বোধন। তবে এই শেষোক্ত শব্দগুলো সংস্কৃত ভাষার না আদিবাসীদের ভাষার, তা আমি বলতে পারছি না। আর্যরা ভাই ও বোনের একই সম্বোধনগুলোকে ঠিক বিপরীত করে নিয়েছে, গ্রীকরা ফ্র্যাটার (phrater)-এর বদলে চালু করে অ্যাডেল্‌ফস্‌ (adelphos) শব্দটা। এইসব ভাষায় যদি কোন সময় বড় ও ছোট ভাইবোনের জন্য কোন সাধারণ সম্বোধন চালু থেকে থাকে, তাহলে, আপন ভাইবোনদের ক্ষেত্রে সেগুলো আর পরবর্তীকালে প্রযোজ্য থাকতে পারে না, কারণ তখন আপন ভাইবোনরা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বর্গ হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থা থেকে তুরানিয় জ্ঞাতি-ব্যবস্থার এই লক্ষণীয় ও চমৎকার বৈশিষ্ট্যটা বাতিল হয়ে যাওয়ার জন্য একটা জোরদার কারণ দরকার ছিল, যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় আগে তুরানিয় ব্যবস্থা চালু থাকা এবং পরে তা পরিত্যক্ত হওয়ার মধ্যেই। অন্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া মুশ্কিল। সমস্ত বন্য ও বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যেই পিতামহের সম্পর্কটা একটা স্বীকৃত সম্পর্ক। সেখানে আর্য জ্ঞাতি-গুলোর আদি ভাষায় পিতামহের জন্য কোন অভিধা না থাকাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও ঘটনা সেটাই—আর্য উপভাষাগুলোয় পিতামহের জন্য কোন

সাধারণ অভিধা নেই। সংস্কৃতে বলা হয় পিতামহ, গ্রীকরা বলে প্যাপ্পোস, লাতিনে আভুস, রুশ ভাষায় দ্‌জেদ, ওয়েল্‌শ্‌-এ বলা হয় হেন্দাদ। শেষোক্ত শব্দটা জার্মান গ্রসভাডার (grossvader) এবং ইংরিজী গ্র্যান্ডফাদার-এর মতই একটা মিশ্র শব্দ। এই অভিধাগুলো একে অপরের থেকে পুরোপুরি আলাদা। কিন্তু পূর্বতন ব্যবস্থায় যেখানে একই সম্বোধনে সম্বোধিত করা হত নিজের পিতামহকে, তার সমস্ত আপন ভাই ও বেশ কিছু খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাইকে, এমনকি পিতামহীর সমস্ত আপন ভাই ও বেশ কিছু খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাইকেও, সেখানে একবিবাহের আমলে ঐ একই সম্বোধনের সাহায্যে নিজের পিতামহ ও পূর্বপুরুষকে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। যথাকালে ওটা পরিত্যক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। আদি ভাষায় এই সম্পর্কটার জন্য কোন অভিধা না থাকার কারণটাকে আমরা এভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি। শেষত, বিভিন্ন আর্য উপভাষায় বাবার দিকে কাকা-পিসি এবং মায়ের দিকে মামা-মাসীর জন্য কোন বিশেষ অভিধা নেই। সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন ভাষায় কাকা বা জ্যাঠার প্রতিশব্দ যথাক্রমে পিতৃব্য, প্যাট্রস ও প্যাট্রাস ; স্লাভ ভাষায় এই শব্দটা হল স্ট্রিক (stryc) ; অ্যাংলো-স্যাক্সন, বেলজিয়ান এবং জার্মান ভাষায় অভিধাটা প্রায় একই, যথাক্রমে ইম (eam), উম (oom) এবং ওহিম (oheim) ; কেল্টিক ভাষায় কাকা-জ্যাঠা বোঝানোর কোন শব্দই নেই। বর্বর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে সম্পর্কটা অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল গোত্রের কল্যাণে, সেই কাকা সম্পর্কটার জন্য আদি আর্য ভাষায় কোন অভিধা থাকবে না—এটা ভাবাও যায় না। তাদের আগেকার জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা যদি তুরানিয় ধাঁচের হয়ে থাকে, তাহলে তখন মামার জন্য একটা নির্দিষ্ট সম্বোধন নিশ্চয়ই ছিল। তবে সেই সম্বোধনটা প্রযোজ্য হত শুধু মায়ের আপন ভাই আর কয়েকজন জ্ঞাতি-ভাইয়ের ক্ষেত্রেই। একই সঙ্গে যতজনকে এই সম্বোধনের সাহায্যে সম্বোধিত করা হত, তাদের মধ্যে অনেকেই একবিবাহের আমলে আর মামার পদবাচ্য হতে পারত না। ফলে পরিত্যক্ত হয়েছিল সম্বোধনটা। সব কিছু মিলিয়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার আগে কোন-না-কোন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই চালু ছিল।

আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় বর্গের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আগে তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থাই চালু ছিল ধরে নিলে, তা থেকে একটা বর্ণনাত্মক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার রূপান্তরকে নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা বলে বুঝে নিতে মোটেই অসুবিধে হয় না। একবিবাহপ্রথা চালু হওয়ার পর যখন পুরনো জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা আর নতুন বংশধারার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছিল না, তখনই ঘটেছিল এই রূপান্তরটা। একবিবাহের আওতায় প্রতিটি সম্পর্কই সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠা নতুন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হত এক একটা মৌলিক সম্বোধনে কিংবা কয়েকটা মৌলিক সম্বোধনের সমন্বয়ে। যেমন, ভাইয়ের ছেলে ভাইপো, বাবার ভাই কাকা বা জ্যাঠা, বাবার ভাইয়ের ছেলে খুড়তুত বা জ্যাঠতুত ভাই। আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় গোষ্ঠীগুলোর বর্তমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার আদি ধাঁচটা এ-রকমই ছিল। এদের বর্তমান ব্যবস্থায় যে সাধারণীকরণগুলো এখন দেখা যায়, সেগুলো সবই পরবর্তীকালের সংযোজন। কোন একজন লোকের সঙ্গে অপর একজনের কী সম্পর্ক—এ প্রশ্নের জবাবে তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব-

ব্যবস্থাবিশিষ্ট সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরা একইভাবে উত্তর দিয়ে থাকে। খুব সম্ভবত আর্য ধাঁচের একটা বর্ণনাত্মক ব্যবস্থার অস্তিত্ব তুরানিয় ও মালয়ী ব্যবস্থার মধ্যে বরাবরই ছিল। না, কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা হিসেবে সেটা চালু ছিল না, কারণ একটা স্থায়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা তো সক্রিয়ই ছিল। আসলে ঐ বর্ণনাত্মক ব্যবস্থাটাকে কাজে লাগানো হত সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য। তাদের সম্বোধন-তালিকার হতশ্রী অবস্থাটা থেকে সহজেই বোঝা যায় আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় গোষ্ঠীগুলো পূর্বতন কোন-না-কোন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে অবশ্যই বাতিল করেছিল। কাজেই আমরা সঙ্গত-ভাবেই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, একবিবাহভিত্তিক পরিবার সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই জাতিগুলো তুরানিয় ব্যবস্থার মধ্যে বরাবর বিদ্যমান পুরনো বর্ণনাত্মক ধরনটা গ্রহণ করেছিল এবং নতুন বংশধারার সঙ্গে বেমানান বলে পুরনো জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থাটাকে পরিত্যাগ করেছিল। তুরানিয় ব্যবস্থা থেকে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় রূপান্তরের এটাই ছিল স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পদ্ধতি। আর এ থেকে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উৎপত্তি ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোরও একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সঙ্গে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্কের চিত্রায়ণ সম্পূর্ণ করার জন্য আগের দুটো ব্যবস্থার মত এই ব্যবস্থাটা নিয়েও একটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

বিভিন্ন আর্য উপভাষায় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার রূপের তুলনা করলে দেখা যায়—বর্তমান ব্যবস্থার আদি রূপটা ছিল পুরোপুরিই বর্ণনাত্মক।[১] একান্তই আর্য ধাঁচের আর্য ভাষায় (স্কটল্যান্ডের পশ্চিম পার্বত্যাঞ্চলে বা আয়ার্ল্যান্ডে ব্যবহৃত গেলিক ভাষা) এবং একান্তই উরালিয় ধাঁচের এস্তোনিয়ান ভাষায় এই ব্যবস্থাটা এখনও বর্ণনাত্মকই রয়ে গেছে। আর্য ভাষায় রক্তসম্পর্ক বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র প্রাথমিক কিছু সম্বোধনই, অর্থাৎ বাবা-মা, ভাই-বোন এবং পুত্র-কন্যা, এগুলোই চালু আছে। বাকি সমস্ত জ্ঞাতিদের চিহ্নিত করা হয় এই সম্বোধনগুলোর সাহায্যেই, তবে তা শুরু হয় উল্টো দিক থেকে—ভাই, ভাইয়ের পুত্র, ভাইয়ের পুত্রের পুত্র ইত্যাদি। আর্য জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার মধ্যে একবিবাহের অন্তর্গত প্রকৃত সম্পর্কগুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং এই ব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হয় যে সন্তানদের পিতৃপরিচয়টা সঠিকভাবে জানা আছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেল্টিক পদ্ধতির থেকে পৃথক একটা বর্ণনাপদ্ধতি নতুন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে এই পদ্ধতি ঐ ব্যবস্থার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন পরিবর্তন ঘটায় নি। বংশধারা নির্ণয়ের নিয়মকানুনের কাঠামোটা যথাযথ করে তোলার জন্যই এ কাজটা করেছিলেন রোমের পৌরপিতারা এবং তার জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। যে-সব আর্য গোষ্ঠীর মধ্যে রোমানদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, তারাও এই উন্নত পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিল। স্লাভদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো স্পষ্টতই তুরানিয় ব্যবস্থার লক্ষণ।[২] আমাদের বর্তমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা ঐতিহাসিক ধারণা পেতে হলে রোমিয় সমাজপিতাদের দ্বারা যথাযথ হয়ে

১। সিস্টেম্স্ অফ কন্স্যাঙ্গুইনিটি, সারণী ১, পৃঃ ১৯.
২। ঐ, পৃঃ ৪০.

ওঠা রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার দিকেই তাকাতে হবে।[১] সংযোজন করা হয়েছিল খুব অল্পই, কিন্তু সেটুকুই জ্ঞাতিদের বর্ণনা দেওয়ার পদ্ধতিটাকে পাল্টে দিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে এই পরিবর্তনগুলো ঘটানো হয়েছিল মূলত বাবার ভাই-বোনের থেকে মায়ের ভাই-বোনদের পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য এবং এই সম্পর্কগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট অভিধাও উদ্ভাবিত হয়েছিল. আর সেই সঙ্গেই পৌত্রের (nepos) বিপরীত অভিধা হিসেবে একটা সম্বোধন উদ্ভাবিত হয়েছিল পিতামহকে চিহ্নিত করার জন্য। এইসব অভিধা এবং প্রাথমিক অভিধাগুলোর সাহায্যে (এবং উপযুক্ত ধাতুরূপ ইত্যাদি সহযোগে) তারা বংশগত এবং জ্ঞাতিত্বের প্রথম পাঁচটি ধারার সম্পর্ককে প্রণালীবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, যার অন্তর্ভুক্ত হত প্রতিটি ব্যক্তির সমস্ত জ্ঞাতিরাই। একবিবাহের আমলে আজ পর্যন্ত যত ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা দেখা গেছে, তার মধ্যে সবথেকে নিখুঁত এবং সবথেকে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল রোমানরাই। দাম্পত্য সম্পর্ককে অভিব্যক্ত করার মত বেশ কিছু অভিধা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য এদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আমাদের নিজেদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে (যা রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বিশেষত্বগুলো গ্রহণ করেছে) বোঝার জন্য অ্যাংলো-স্যাক্সন বা কেল্টিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার থেকে রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অনেক বেশি সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। আর্য এবং সেমিটিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার নমুনা হিসেবে যথাক্রমে লাতিন ও আরবী ব্যবস্থার সম্পর্কগুলোর একটা সারণী এই পরিচ্ছেদের শেষে দেওয়া হল। আরবী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মত একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং তার ফলাফলও হয়েছে একইরকম। তাই এখানে আমরা শুধুমাত্র রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা নিয়েই আলোচনা করছি।

বংশগত ধারায় কোন ব্যক্তির থেকে শুরু করে তার প্রপিতামহ (tritavus) পর্যন্ত ছয়টি ঊর্ধ্বমুখী প্রজন্ম এবং তার থেকে শুরু করে তার প্রপৌত্রের প্রপৌত্র (trinepos) পর্যন্ত ছয়টি নিম্নমুখী প্রজন্ম দেখা যায়। এগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য মাত্র চারটি মূল সম্বোধন ব্যবহার করা হয়। ষষ্ঠ পূর্বপুরুষের থেকেও আগেকার প্রজন্মকে চিহ্নিত করার দরকার হলে ঐ 'ট্রাইটেভাস' অভিধাটাকেই সম্পর্ক চিহ্নিতকরণের সূচনাবিন্দু বলে ধরা হত। যেমন, ট্রাইটেভাসের পিতা হচ্ছেন 'ট্রাইটেভি প্যাটার।' এইভাবে এগোতে এগোতে বংশগত পুরুষধারায় কোন ব্যক্তির দ্বাদশতম পূর্বপুরুষ চিহ্নিত হতেন 'ট্রাইটেভি ট্রাইটেভাস' নামে। আমাদের সম্বোধনতালিকা অনুযায়ী ঐ সম্পর্কটা ব্যক্ত করার জন্য বা তাঁর পরিচয় দেওয়ার জন্য পিতামহের পিতামহ কথাটাকে ছয়বার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। একইভাবে, বংশের নিম্নমুখী পুরুষধারায় কোন ব্যক্তির দ্বাদশতম বংশধর চিহ্নিত হয় 'ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস' নামে।

পুরুষধারায় জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারিটা শুরু হয় 'ফ্র্যাটার' (frater) অর্থাৎ ভাই দিয়ে। তারপর সারিটা এগোয় এইভাবে : 'ফ্র্যাট্রিস ফিলিয়াস' অর্থাৎ ভাইয়ের পুত্র, 'ফ্র্যাট্রিস নেপোস' অর্থাৎ ভাইয়ের পৌত্র, 'ফ্র্যাট্রিস প্রোনেপোস' অর্থাৎ ভাইয়ের প্রপৌত্র, এবং এইভাবে গিয়ে পৌঁছয় 'ফ্র্যাট্রিস ট্রাইনেপোস' অর্থাৎ ভাইয়ের প্রপৌত্রের

১। "প্যান্‌ডেক্টস্‌", lib xxviii, tit. x, এবং জাস্টিনিয়ান-এর 'ইনস্টিটিউটস্‌", lib iii. tit. vi.,

প্রপৌত্র পর্যন্ত। এই সারিকে দ্বাদশতম বংশধর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হলে ফ্র্যাট্রিস ট্রাইনেপোসকে ধরা হত দ্বিতীয় সূচনাবিন্দু হিসেবে এবং সারির একেবারে শেষে গিয়ে সম্বোধনটা দাঁড়ায় 'ফ্র্যাট্রিস ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস'-এ। এই সহজ-সরল পদ্ধতিতে 'ফ্র্যাটার' অর্থাৎ ভাই-ই হচ্ছে এই সারির বংশধারার উৎসস্থল এবং সারির সমস্ত লোককে তার সঙ্গে সম্পর্কিত করেই চিহ্নিত করা হয়। ফলে এইভাবে বর্ণিত প্রতিটি ব্যক্তিকে জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারির পুরুষধারার সদস্য বলে চিনে নিতে আমাদের কোন অসুবিধেই হয় না। তাই এই পদ্ধতিটিকে আমরা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বলে ধরে নিতে পারি। একইভাবে, জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারির স্ত্রী-ধারাটা শুরু হয় 'সোরোর' (soror) অর্থাৎ বোন থেকে, তারপর সারিটা এগোয় এইভাবেঃ 'সোরোরিস ফিলিয়া' অর্থাৎ বোনের কন্যা, 'সোরোরিস নেপ্‌টিস' অর্থাৎ বোনের দৌহিত্রী, 'সোরোরিস প্রোনেপ্‌টিস' অর্থাৎ বোনের প্রদৌহিত্রী, এবং এইভাবে এগোতে এগোতে 'সোরোরিস ট্রাইনেপ্‌টিস' অর্থাৎ বোনের ষষ্ঠ বংশধর এবং 'সোরোরিস ট্রাইনেপ্‌টিস ট্রাইনেপ্‌টিস' অর্থাৎ বোনের দ্বাদশতম বংশধর পর্যন্ত পৌঁছে যায় সারিটা। জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারির দুটো শাখা সঠিক অর্থে 'প্যাটার' অর্থাৎ পিতার থেকে শুরু হলেও এবং সেটা এই দুটো শাখার মধ্যেকার সংযোগসূত্র হয়ে থাকলেও, বংশধারার ক্ষেত্রে ভাই ও বোনদের বংশের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে শুধু মূল বংশধারাটাই যে আলাদা আলাদা থাকে তা-ই নয়, সেই সঙ্গেই আলাদা আলাদা থাকে তার দুটো শাখাও, এবং যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্কও সুনির্দিষ্ট থাকে। এটা হচ্ছে এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান গুণ, কারণ জ্ঞাতিত্ব নির্ধারণ করার ও জ্ঞাতিদের বর্ণনা দেওয়ার পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে এই নিয়মটা জ্ঞাতিত্বের সমস্ত সারির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারিতে পিতার দিকে পুরুষধারায় সারিটা শুরু হয় 'প্যাট্রুস' অর্থাৎ পিতার ভাইকে দিয়ে এবং এই সারির মধ্যে ঐ ভাই আর তার বংশধররা থাকে। নির্দিষ্ট অভিধার সাহায্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তার সঙ্গে সম্পর্কটাও চিহ্নিত করা হয় সুনির্দিষ্টভাবে। সারিটা এরকমঃ 'প্যাট্রুই ফিলিয়াস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের পুত্র, 'প্যাট্রুই নেপোস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের পৌত্র, 'প্যাট্রুই প্রোনেপোস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের প্রপৌত্র এবং এইভাবে 'প্যাট্রুই ট্রাইনেপোস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের ষষ্ঠ বংশধর পর্যন্ত এগোয়। এই সারিটাকে দ্বাদশতম প্রজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত করতে হলে, অন্তর্বর্তী প্রজন্মগুলো পার হয়ে অভিধটা গিয়ে পৌঁছয় 'প্যাট্রুই ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস' পর্যন্ত, যে হচ্ছে পিতার ভাইয়ের প্রপৌত্রের প্রপৌত্রের প্রপৌত্রের প্রপৌত্র। একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল— 'প্যানডেক্টস'-এ ব্যবহৃত পদ্ধতিতে খুড়তুত-জ্যাঠতুত প্রভৃতি জ্ঞাতিভাইদের জন্য কোন আলাদা অভিধা রাখা হয় নি। তাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে 'প্যাট্রুই ফিলিয়াস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের পুত্র হিসেবে। কিন্তু এদেরকে 'ফ্র্যাটার প্যাট্রুয়েলিস' অর্থাৎ খুড়তুত বা জ্যাঠতুত ভাই-ও বলা হত, আর সাধারণ মানুষরা সাধারণত ব্যবহার করত 'কনসোব্রিনাস' (consobrinus) সম্বোধনটা, যা থেকে ইংরিজি 'কাজিন' (cousin) শব্দটা এসেছে।[১] জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারিতে পিতার দিকের স্ত্রী-ধারাটা

শুরু হয় 'অ্যামিতা' অর্থাৎ পিতার বোন বা পিসির থেকে। তাঁর বংশধরদেরও চিহ্নিত করা হয় একইভাবে: 'অ্যামিতে ফিলিয়া' অর্থাৎ পিতার বোনের মেয়ে, 'অ্যামিতে নেপ্‌টিস' অর্থাৎ পিতার দৌহিত্রী। এইভাবে এগোতে এগোতে ষষ্ঠ বংশধর চিহ্নিত হয় 'অ্যামিতে ট্রাইনেপ্‌টিস' নামে এবং দ্বাদশতম বংশধর 'অ্যামিতে ট্রাইনেপ্‌টিস ট্রাইনেপ্‌টিস' নামে। এই শাখাতেও পিসতুত বোনকে বর্ণনাত্মক 'অ্যামিতে ফিলিয়া' নামেই উল্লেখ করা হয়েছে, লোকের মধ্যে চালু 'অ্যামিতিনা' সম্বোধনটি উল্লিখিত হয় নি।

একইভাবে জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারিতে পিতার দিকে পুরুষধারাটা শুরু হয় পিতামহের ভাইকে দিয়ে। এঁকে বলা হয় 'প্যাট্রুস ম্যাগ্‌নাস' (Patruus magnus) বা বড় জ্যাঠা। এই জায়গায় এসে সম্বোধন-তালিকায় নির্দিষ্ট অভিধা আর দেখা যায় না, ব্যবহৃত হয় মিশ্র সম্বোধন—যদিও সম্পর্কটা নির্দিষ্টই থাকে। তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট আধুনিক কাল পর্যন্ত এই সম্পর্কটাকে যে আলাদা করে দেখা হত না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যতদূর জানা গেছে তা থেকে দেখা যায় যে বিদ্যমান কোন ভাষাতেই এই সম্পর্কটাকে চিহ্নিত করার উপযোগী কোন যথাযথ অভিধা নেই, অথচ এই সম্পর্কটাকে চিহ্নিত করতে না পারলে জ্ঞাতিত্বের এই তৃতীয় সারিটাকেও চিহ্নিত করা যায় না (একমাত্র কেল্টিক পদ্ধতি বাদে)। তাঁকে স্রেফ 'পিতামহের ভাই বলা হলে একজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় ঠিকই, কিন্তু সম্পর্কটা তাতে পুরোপুরি ব্যক্ত হয় না, সেটা ধরে নিতে হয়। কিন্তু তাঁকে বড় জ্যাঠা (great uncle) বলা হলে সম্পর্কটা একটা নির্দিষ্ট আদল পায়। এই সারির প্রথম ব্যক্তিটিকে এইভাবে নির্দিষ্ট করার পর তাঁকেই ঐ বংশধারার মূল উৎস ধরে নিয়ে তাঁর বংশধরদের পরিচয় উল্লিখিত হয় তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে। আর তার ফলে প্রতিটি ব্যক্তি কোন্‌ সারির, কোন্‌ ধারার, কোন্‌ বিশেষ শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং তার সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক কী—তা-ও চিহ্নিত হয়ে যায় সুস্পষ্টভাবে। এই সারিটাকেও দ্বাদশতম বংশধর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। সারিটা দাঁড়ায় এ-রকম: 'প্যাট্রুই ম্যাগ্‌নি ফিলিয়াস' অর্থাৎ পিতামহের ভাইয়ের পুত্র, তারপর 'প্যাট্রুই ম্যাগ্‌নি নেপোস'; ষষ্ঠ বংশধর 'প্যাট্রুই ম্যাগ্‌নি ট্রাইনেপোস' এবং দ্বাদশতম বংশধর 'প্যাট্রুই ম্যাগ্‌নি ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস'। এই সারির স্ত্রী-ধারাটা শুরু হয় পিতামহের বোন 'অ্যামিতা ম্যাগ্‌না'-কে দিয়ে, যাঁকে বলা যায় পিতার পিসীমা (great paternal aunt)। তাঁর বংশধরদেরও একইভাবে চিহ্নিত করা হয়।

জ্ঞাতিত্বের চতুর্থ সারিতে পিতার দিকের পুরুষধারাটা শুরু হয় যথাক্রমে প্রপিতামহের ভাই অর্থাৎ 'প্যাট্রুস মেজর' এবং প্রপিতামহের পিতার ভাই অর্থাৎ 'প্যাট্রুস ম্যাক্সি-

১. Item fratres patrueles, sorores patrueles, id est qui quae-ve ex duobus fratribus progenerantur; item consobrini consobrinaee id est qui quae-veex duobus sororibus nascuntur (quasi consorini); item amitini amitinae, id est qui quae-ve ex fratre es sorore propagantur; sed fere vulgos istos omnes communi appellatione consobrinus vocat.—"pandects", lib. xxx viii, tit. x.

মাস'-কে দিয়ে। চতুর্থ সারি অনুযায়ী আরও এগোলে আমরা গিয়ে পেঁছই 'প্যাট্রুই মেজারিস ফিলিয়াস' হয়ে একেবারে 'প্যাট্রুই মেজরিস ট্রাইনেপোস' পর্যন্ত। আর পঞ্চম সারি অনুযায়ী এগোলে পেঁছনো যায় 'প্যাট্রুই ম্যাক্সিমি ফিলিয়াস' হয়ে 'প্যাট্রুই ম্যাক্সিমি ট্রাইনেপোস' পর্যন্ত। এই দুটো সারির স্ত্রী-ধারাটা শুরু হয় যথাক্রমে 'অ্যামিতা মেজর' অর্থাৎ প্রপিতামহের বোন এবং 'অ্যামিতা ম্যাক্সিমা' অর্থাৎ প্রপিতামহের পিতার বোনকে দিয়ে। এই দুটো ধারার বংশধরদেরও চিহ্নিত করা হয় একইভাবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র বাবার দিকের জ্ঞাতিত্বের সারিগুলোর কথাই বলা হয়েছে। জ্ঞাতিত্ববর্ণনার রোমান পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ করার জন্য মায়ের দিকের মামা-মাসীদের চিহ্নিত করার আলাদা আলাদা অভিধাগুলোর কথা এবার উল্লেখ করা দরকার। মায়ের দিকেও অসংখ্য জ্ঞাতি থাকে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা অভিধা আছে। যেমন, 'আভাংকুলাস', (avunculus) অর্থাৎ মামা, 'ম্যাটারটেরা' (matertera) অর্থাৎ মাসী। মায়ের দিকের জ্ঞাতিদের বর্ণনা দেওয়ার সময় পুরুষধারার বদলে স্ত্রী-ধারা অনুসরণ করা হলেও, জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারিটা একইরকম থাকে। মায়ের দিকে জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারির পুরুষধারাটা শুরু হয় 'আভাংকুলাস' অর্থাৎ মামাকে দিয়ে, তারপর একে একে আসে 'আভাংকুলি ফিলিয়াস,' 'আভাংকুলি নেপোস', এবং এইভাবে এগোতে এগোতে 'আভাংকুলি ট্রাইনেপোস' হয়ে 'আভাংকুলি ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস' পর্যন্ত গিয়ে পেঁছয়। স্ত্রী-ধারার প্রথমে থাকে 'ম্যাটারটেরা' অর্থাৎ মাসী, তারপর 'ম্যাটারটেরা ফিলিয়া' ইত্যাদি। জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারির পুরুষ ও স্ত্রী-ধারাটা শুরু হয় যথাক্রমে 'আভাংকুলাস ম্যাগ্নাস' অর্থাৎ মাতামহের ভাই এবং 'ম্যাটারটেরা ম্যাগ্না' অর্থাৎ মাতামহের বোনকে দিয়ে। চতুর্থ সারির প্রথমে থাকে 'আভাংকুলাস মেজর' ও 'ম্যাটারটেরা মেজর', অর্থাৎ প্রমাতামহের ভাই ও বোন। আর পঞ্চম সারিটা শুরু হয় 'আভাংকুলাস ম্যাক্সিমাস' ও 'ম্যাটারটেরা ম্যাক্সিমা' অর্থাৎ প্রমাতামহের পিতার ভাই ও বোনকে দিয়ে। এই প্রতিটা সারি ও শাখার সদস্যদের চিহ্নিত করা হয় পূর্বোল্লিখিত নিয়ম অনুসারেই।

পুরো বংশধারার একটা ছক তৈরি করার জন্য যতজন জ্ঞাতিকে বিবেচনার মধ্যে আনা দরকার, তার সবটাই এই পাঁচটা সারির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। তাই এই পাঁচটা সারির বাইরে আর কারুর কথা ভাবার দরকার হয় নি রোমির সমাজপিতাদের।

বিবাহসূত্রে গড়া ওঠা সম্পর্কগুলো চিহ্নিত করার ব্যাপারে লাতিন ভাষা খুবই সমৃদ্ধ, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা ইংরিজী এব্যাপারে অত্যন্ত দরিদ্র। প্রায় গোটা কুড়ি অত্যন্ত সাধারণ ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝানোর জন্য ইংরিজিতে বেশ অশোভন সব শব্দ চালু আছে। যেমন ঃ ফাদার-ইন-ল্য, সন-ইন-ল্য, ব্রাদার-ইন-ল্য, স্টেপ-ফাদার, স্টেপ-সন। লাতিনদের সম্বোধন-তালিকায় এ-রকম প্রত্যেকটা সম্পর্ককে চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ বিশেষ অভিধা আছে।

রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা নিয়ে আর বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্যবস্থার প্রধান প্রধান এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা উল্লেখ করেছি এবং তা থেকে গোটা ব্যাপারটাকে উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধে হয় না। সরল পদ্ধতি, চমৎকার বর্ণনা; সারি এবং শাখা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বিন্যাস আর সম্বোধন-

তালিকার সৌন্দর্য—সবে মিলে এই ব্যবস্থাটা একেবারে অতুলনীয়। আজ পর্যন্ত মানুষ যতরকম জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তার মধ্যে এটা নিঃসন্দেহেই শ্রেষ্ঠ। আর, কোন কিছু গড়ে তোলার সময় রোমানরা যে তাকে বরাবরের জন্য একটা মজবুত বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলত, তারও একটা নজির পাওয়া যায় এই ব্যবস্থার মধ্যে।

আরবী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করছি না। তবে এই পরিচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত সারণীতে দু ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং একটা ব্যবস্থার ব্যাখ্যা জানা থাকলে অন্য ব্যবস্থাটাকে বুঝতে অসুবিধে হবে না। একই নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

আলাদা আলাদা অভিধা এবং যথাযথ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত জ্ঞাতিরা তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষের সূত্রে এবং বিবাহিত দম্পতি মারফৎ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। একটা বংশগত ধারায় ও কয়েকটা জ্ঞাতিত্বগত সারিতে তারা নিজেদের বিন্যস্ত করে এবং প্রতিটা সারি মূল ধারাটা থেকে ক্রমাগতই দূরবর্তী হতে থাকে। আসলে এগুলো হচ্ছে একবিবাহেরই স্বাভাবিক পরিণতি। কোন ব্যক্তির সঙ্গে অন্য প্রত্যেকের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে এবং একটা বিশেষ অভিধা বা বিবরণের সাহায্যে অন্য সকলের সঙ্গে তার পার্থক্যটাও নির্দিষ্ট করা থাকে (কেবলমাত্র যারা একই সম্পর্কের আওতাভুক্ত, তারা বাদে)। প্রতিটি ব্যক্তির পিতার পরিচয়টাও যে নিশ্চিতভাবে জানা যেত, সেটাও ফুটে ওঠে এই ব্যবস্থার মধ্যে। আর একমাত্র একবিবাহের আমলেই সুনিশ্চিতভাবে পিতৃত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, একবিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্কগুলোও অভিব্যক্ত হয় এই ব্যবস্থার মধ্যে। একবিবাহ চালু হওয়ার ফল হিসেবেই যে গড়ে উঠেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবার এবং এই পরিবার সৃষ্টি হওয়ার ফল হিসেবেই যে গড়ে উঠেছিল এই বিশেষ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা, এটা আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে একমাত্র বর্ণনাত্মক পদ্ধতিই চালু থাকে, সেখানে এব তিনটি বিষয় একটা গোটা কাঠামোর অপরিহার্য অংশ হিসেবে কাজ করে। একবিবাহভিত্তিক পরিবার, তার বিবাহবিধি এবং তার জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ মারফৎ আমরা যা জানতে পেরেছি, তা যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার, তার বিবাহবিধি ও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য, সেটা আমরা আগেই দেখিয়েছি। এমনকি ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার, তার বিবাহের ধরন আর জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও এগুলো একইভাবে প্রযোজ্য। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে-কোন একটার কথা জানা থাকলে তার সঙ্গে অন্য দুটো বিষয়ের উপস্থিতির কথাও নিশ্চিত-ভাবে ধরে নেওয়া যায়। এই তিনটির মধ্যে যদি কোন একটাকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বেছে নিতে হয়, তাহলে রায়টা যাবে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার স্বপক্ষেই। বিবাহ-বিধি এবং পরিবারের ধরন অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ককে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই। তাই এর মধ্যে শুধু যে গোটা ব্যাপারটার সবথেকে উজ্জ্বল নিদর্শন বিধৃত রয়েছে তা-ই নয়, সেই সঙ্গেই জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধে যতজন আবদ্ধ থাকত তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিতও করা আছে এই ব্যবস্থায়। তাদের গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠানটা কত উচ্চ স্তরের ছিল, তার প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যায় এর মধ্যে। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে মূল সত্যটা বিকৃত হতে পারে না, আর তাই এর

ওপর নির্ভর করা চলে। শেষত, আমাদের হাতে সবথেকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আছে জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধেই।

আলোচনার শুরুতে আমরা পরিবারের যে পাঁচটি ধারাবাহিক রূপের কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেগুলোর ব্যাখ্যা এবার সম্পূর্ণ হল। এই রূপগুলোর অস্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠার কাঠামোগত খুঁটিনাটি সম্বন্ধে যা-কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, তার সবটুকুই উপস্থাপিত করেছি আমরা। পরিবারের প্রতিটা রূপ নিয়ে আমরা সাধারণ-ভাবে আলোচনা করেছি ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও এই রূপগুলো সংক্রান্ত মূল তথ্য এবং এগুলোর গুণাগুণ ফুটে উঠেছে, আর সেইসঙ্গেই প্রমাণিত হয়েছে এই মূল প্রতি-পাদ্যটা যে, পরিবার শুরু হয়েছিল ভাইবোন বিবাহের মধ্যে দিয়ে, তারপর বিভিন্ন ধারাবাহিক স্তরের পথ বেয়ে উন্নত হতে হতে সমাজ এসে পেঁছেছে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে। এই সিদ্ধান্তটার মধ্যে অননুমেয় এমন কিছুই নেই। কিন্তু যে-সব সমস্যা ও বাধা অতিক্রম করে বিভিন্ন স্তরের পথ বেয়ে এগোতে বয়েছে পরিবারকে, তা অনুমান করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। বিভিন্ন যুগের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে মানুষের অভিজ্ঞতার যাবতীয় পরিবর্তনের শরিক হয়েছে পরিবার, আর আদিম বন্যতার অঞ্চল থেকে বর্বর যুগের পথ বেয়ে মানুষের এই সভ্য যুগে এসে পেঁছনোর বিভিন্ন স্তরগুলো অন্য যে-কোন প্রতিষ্ঠানের থেকে সম্ভবত অনেক বেশি করে ফুটে উঠেছে পরিবারের মধ্যেই। অগ্রগতির বিভিন্ন যুগে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবিটাও আমরা খুঁজে পাই পরিবারের মধ্যেই, এবং বিভিন্ন যুগের পরিবারের মধ্যে তুলনা করলে আমরা মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সংগ্রাম আর জয়লাভের রূপরেখাটাও আঁচ করতে পারি। আজকের দিনের পরিবারের গুরুত্ব উপলব্ধি করার সময় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটা গড়ে তোলার জন্য কত বিপুল সময় এবং কী প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজন হয়েছিল। সেই সঙ্গেই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে প্রাচীন সমাজের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যা-কিছু লাভ করেছি, তার মধ্যে পরিবারই হচ্ছে সবথেকে মূল্যবান, কারণ প্রাচীন সমাজের বহুমুখী ও সুবিস্তৃত অভিজ্ঞতার সবথেকে গুরুত্ব-পূর্ণ ফসলগুলো মূর্ত হয়ে আছে পরিবারের মধ্যেই।

পরিবার মোট চারটি ধারাবাহিক রূপের পথ বেয়ে অগ্রসর হয়ে এসে এখন এক পঞ্চম রূপে পেঁছেছে—এটা স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে যে এই পঞ্চম রূপটাই কি ভবিষ্যতে পরিবারের স্থায়ী রূপ হয়ে থাকবে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হল: সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারেরও অগ্রগতি ঘটবে এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্তন ঘটবে, ঠিক যেমনটা ঘটেছে অতীতে। সমাজ-ব্যবস্থাই পরিবার সৃষ্টি করেছে এবং তাই সমাজব্যবস্থার নিজস্ব সংস্কৃতিও প্রতিফলিত হয় পরিবারের মধ্যে। সভ্য যুগের শুরু থেকে এবং বিশেষত আধুনিক কালে একবিবাহ-ভিত্তিক পরিবার যে রকমভাবে উন্নত হয়ে উঠেছে, তা থেকে এটুকু ধরেই নেওয়া যায় যে নারী-পুরুষের সমতা না-আসা পর্যন্ত এই পরিবার উন্নত হয়েই চলবে। সুদূর ভবিষ্যতে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে একবিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যর্থ হলে তার পরবর্তী ধরনের পরিবার ঠিক কেমন চরিত্রের হবে, তা এই মুহূর্তে বলা অসম্ভব।

রোমান এবং আরবী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১. প্রপিতামহের প্রপিতামহ	ট্রাইটেভাস	প্রপিতামহের প্রপিতামহ	জিদ্দ জিদ্দ জিদ্দে	পিতামহের পিতামহের পিতামহ
২. ,, পিতামহ	আটাভাস	,, পিতামহ	,, ,, আবি	পিতামহের পিতামহের পিতা
৩. ,, পিতা	আবাভাস	,, পিতা	,, জিদ্দি	পিতামহের পিতামহ
৪. ,, মাতা	আবাভিয়া	,, মাতা	সিত্ত সিত্তি	পিতামহীর পিতামহী
৫. প্রপিতামহ	প্রোয়াভাস	প্রপিতামহ	জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহ
৬. প্রপিতামহী	প্রোয়াভিয়া	প্রপিতামহী	সিত্ত আবি	,, পিতামহী
৭. পিতামহ	অ্যাভাস	পিতামহ	জিদ্দ	পিতামহ
৮. পিতামহী	অ্যাভিয়া	পিতামহী	সিত্তি	পিতামহী
৯. পিতা	প্যাটার	পিতা	আবি	পিতা
১০. মাতা	ম্যাটার	মাতা	উম্মি	মাতা
১১. পুত্র	ফিলিয়াস	পুত্র	ইব্নি	পুত্র
১২. কন্যা	ফিলিয়া	কন্যা	ইব্নেতি বি, বিন্তি	কন্যা
১৩ পৌত্র	নেপোস	পৌত্র	ইব্ন ইব্নি	পুত্রের পুত্র
১৪. পৌত্রী	নেপ্টিস	পৌত্রী	ইব্নেত ইব্নি	পুত্রের কন্যা
১৫. প্রপৌত্র	প্রোনেপোস	প্রপৌত্র	ইব্ন ইব্ন ইব্নি	পুত্রের পুত্রের পুত্র
১৬. প্রদৌহিত্রী	প্রোনেপ্টিস	প্রদৌহিত্রী	বিন্ত বিন্ত বিন্তি	কন্যার কন্যার কন্যা
১৭. প্রপৌত্রের পুত্র	অ্যাব্নেপোস	প্রপৌত্রের পুত্র	ইব্ন ইব্ন ইব্ন ইব্নি	পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৮. প্রদৌহিত্রীর কন্যা	অ্যাব্‌নেপ্‌টিস	প্রদৌহিত্রীর কন্যা	বিন্‌ত বিন্‌ত বিন্‌ত বিন্‌তি	কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা
১৯. প্রপৌত্রের পৌত্র	অ্যাট্‌নেপোস	প্রপৌত্রের পৌত্র	ইবন ইবন ইবন ইবন ইবনি	পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র
২০. প্রদৌহিত্রীর দৌহিত্রী	অ্যাট্‌নেপ্‌টিস	প্রদৌহিত্রীর দৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত বিনত বিনতি	কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা
২১ প্রপৌত্রের প্রপৌত্র	ট্রাইনেপোস	প্রপৌত্রের প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবনি	পুত্রের পুত্রের পুত্রের পু ত্রর পুত্রের পুত্র
২২ প্রদৌহিত্রীর প্রদৌহিত্রী	ট্রাইনেপ্‌টিস	প্রদৌহিত্রীর প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত বিনত বিনত বিনতি	কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা
২৩. ভাইরা	ফ্র্যাট্রেস	ভাইরা	আহওয়াতি	ভাইরা
২৪. বোনেরা	সোরোরেস	বোনেরা	,,	বোনেরা
২৫. ভাই	ফ্র্যাটার	ভাই	আখি	ভাই
(জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারি)				
২৬. ভাইয়ের পুত্র	ফ্র্যাট্রিস ফিলিয়াস	ভাইয়ের পুত্র	ইব্‌ন আখি	ভাইয়ের পুত্র
২৭. ,, পুত্রের স্ত্রী	,, ফিলি উক্সর	,, পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইব্‌ন আখি	,, পুত্রের স্ত্রী
২৮. ,, কন্যা	,, ফিলিয়া	,, কন্যা	বিন্‌ত আখি	,, কন্যা
২৯. ,, কন্যার স্বামী	,, ফিলিয়ে ভির	,, কন্যার স্বামী	জোজ বিন্‌ত আখি	,, কন্যার স্বামী
৩০. ,, পৌত্র	,, নেপোস	,, পৌত্র	ইব্‌ন ইব্‌ন আখি	,, পুত্রের পুত্র
৩১. ,, পৌত্রী	,, নেপ্‌টিস	,, পৌত্রী	বিন্‌ত ইব্‌ন আখি	,, ,, কন্যা
৩২. ,, প্রপৌত্র	,, প্রোনেপোস	,, প্রপৌত্র	ইবন ইবন ,, ,,	,, ,, পুত্রের পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
৩৩. ভাইয়ের প্রদৌহিত্রী	ফ্র্যাট্রিস প্রোনেপ্টিস	ভাইয়ের প্রদৌহিত্রী	বিন্ত বিন্ত বিন্ত আখি	ভাইয়ের কন্যার কন্যার কন্যা
৩৪. বোন	সোরোর	বোন	আখ্তি	বোন
৩৫. বোনের পুত্র	সোরোরিস ফিলিয়াস	বোনের পুত্র	ইব্ন আখ্তি	বোনের পুত্র
৩৬ " পুত্রের স্ত্রী	" ফিলি উক্সর	বোনের পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইব্ন আখ্তি	বোনের পুত্রের স্ত্রী
৩৭. " কন্যা	" ফিলিয়া	" কন্যা	বিন্ত আখ্তি	" কন্যা
৩৮. " কন্যার স্বামী	" ফি‍‍‍‍লিয়ে ভির	" কন্যার স্বামী	জোজ বিন্ত আখ্তি	বোনের কন্যার স্বামী
৩৯. " পৌত্র	" নেপোস	" পৌত্র	ইব্ন ইব্ন আখতি	বোনের পুত্রের পুত্র
৪০. " পৌত্রী	" নেপ্টিস	" পৌত্রী	বিন্ত আখতি	" " কন্যা
৪১. " প্রপৌত্র	" প্রোনেপোস	" প্রপৌত্র	ইব্ন ইব্ন ইব্ন আখতি	বোনের পুত্রের পুত্রের পুত্র
৪২. " প্রদৌহিত্রী	" প্রোনেপ্টিস	" প্রদৌহিত্রী	বিন্ত বিন্ত বিন্ত আখতি	বোনের কন্যার কন্যার কন্যা
(জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারি)				
৪৩. পিতার ভাই	প্যাট্রুস	কাকা বা জ্যাঠা	আম্মি	কাকা বা জ্যাঠা
৪৪. " ভাইয়ের স্ত্রী	প্যাট্রুই উক্সর	কাকা বা জ্যাঠার স্ত্রী	আমরাত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার স্ত্রী
৪৫. " " পুত্র	" ফিলিয়াস	" " " পুত্র	ইব্ন আম্মি	" " " পুত্র
৪৬. " " পুত্রের স্ত্রী	" ফিলিউক্সর	কাকা বা জ্যাঠার পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইব্ন আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার পুত্রের স্ত্রী
৪৭. " " কন্যা	" ফিলিয়া	" " " কন্যা	বিনত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার কন্যা

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
৪৮. পিতার ভাইয়ের কন্যার স্বামী	প্যাট্রুই ফিলিয়ে ভির	কাকা বা জ্যাঠার কন্যার স্বামী	জোজ বিনত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার কন্যার স্বামী
৪৯. ,, ,, পৌত্র	,, নেপোস	কাকা বা জ্যাঠার পৌত্র	ইবন ইবন আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার পুত্রের পুত্র
৫০. ,, ,, দৌহিত্রী	,, নেপ্‌টিস	কাকা বা জ্যাঠার দৌহিত্রী	বিনত বিনত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার কন্যার কন্যা
৫১. ,, ,, প্রপৌত্র	,, প্রোনেপোস	কাকা বা জ্যাঠার প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার পুত্রের পুত্রের পুত্র
৫২. ,, ,, প্রদৌহিত্রী	,, প্রোনেপ্‌টিস	কাকা বা জ্যাঠার প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার কন্যার কন্যার কন্যা
৫৩. পিতার বোন	অ্যামিটা	পিসি	আম্মেতি	পিসি
৫৪. ,, বোনের স্বামী	অ্যামিটে ভির	পিসির স্বামী	আরাত আম্মেতি	পিসির স্বামী
৫৫. ,, ,, পুত্র	,, ফিলিয়াস	,, পুত্র	ইবন আম্মেতি	,, পুত্র
৫৬. ,, ,, পুত্রের স্ত্রী	,, ফিলি উক্সর	,, পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইরন আম্মেতি	,, পুত্রের স্ত্রী
৫৭. ,, ,, কন্যা	,, ফিলিয়াস	,, কন্যা	বিনত আম্মেতি	,, কন্যা
৫৮. ,, ,, কন্যার স্বামী	,, ফিলিয়ে ভির	,, কন্যার স্বামী	জোজ বিনত আম্মেতি	,, কন্যার স্বামী
৫৯. ,, ,, পৌত্র	,, নেপোস	,, পৌত্র	ইবন ইবন আম্মেতি	,, পুত্রের পুত্র
৬০. ,, ,, দৌহিত্রী	,, নেপ্‌টিস	,, দৌহিত্রী	বিনত বিনত ,,	,, কন্যার কন্যা
৬১. ,, ,, প্রপৌত্র	,, প্রোনেপোস	,, প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন আম্মেতি	পিসির পুত্রের পুত্রের পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
৬২. পিতার বোনের প্রদৌহিত্রী	অ্যামিটে প্রোনেপ্‌টিস	পিসির প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত আম্মেতি	পিসির কন্যার কন্যার কন্যা
৬৩. মায়ের ভাই	আভাঙ্কুলাস	মামা	খালি	মামা
৬৪. মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী	আভাঙ্কুলি উক্সর	মামার স্ত্রী	আমরাত খালি	মামার স্ত্রী
৬৫. „ „ পুত্র	„ ফিলিয়াস	„ পুত্র	ইবন খালি	„ পুত্র
৬৬. „ „ পুত্রের স্ত্রী	„ ফিলি উক্সর	„ পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইবন খালি	„ পুত্রের স্ত্রী
৬৭. „ „ কন্যা	„ ফিলিয়া	„ কন্যা	বিনত খালি	„ কন্যা
৬৮. „ „ কন্যার স্বামী	„ ফিলিয়ে ভির	„ কন্যার স্বামী	জোজ বিনত খালি	„ কন্যার স্বামী
৬৯. „ „ পৌত্র	„ নেপোস	„ পৌত্র	ইবন ইবন „	„ পুত্রের পুত্র
৭০. „ „ দৌহিত্রী	„ নেপ্‌টিস	„ দৌহিত্রী	বিনত বিনত „	„ কন্যার কন্যা
৭১. „ „ প্রপৌত্র	„ প্রোনেপোস	„ প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন খালি	„ পুত্রের পুত্রের পুত্র
৭২. „ „ প্রদৌহিত্রী	„ প্রোনেপ্‌টিস	„ প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত খালি	„ কন্যার কন্যার কন্যা
৭৩. মায়ের বোন	ম্যাটারটেরা	মাসী	খালেতি	মাসী
৭৪. „ বোনের স্বামী	ম্যাটারটের ভির	মাসীর স্বামী	জোজ খালেতি	মাসীর স্বামী
৭৫. „ „ পুত্র	„ ফিলিয়াস	„ পুত্র	ইবন খালেতি	„ পুত্র
৭৬. „ „ পুত্রের স্ত্রী	„ ফিলিউক্সর	„ পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইবন খালেতি	„ পুত্রের স্ত্রী
৭৭. „ „ কন্যা	„ ফিলিয়া	„ কন্যা	বিনত খালেতি	„ কন্যা
৭৮. „ „ কন্যার স্বামী	„ ফিলিয়ে ভির	„ কন্যার স্বামী	জোজ বিনত খালেতি	„ কন্যার স্বামী
৭৯. „ „ পৌত্র	„ নেপোস	„ পৌত্র	ইবন ইবন „	„ পুত্রের পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
৮০. মায়ের বোনের দৌহিত্রী	ম্যাটারটেরে নেপ্টিস	মাসীর দৌহিত্রী	বিনত বিনত খালেতি	মাসীর কন্যার কন্যা
৮১. „ „ প্রপৌত্র	„ প্রোনেপোস	„ প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন „	„ পুত্রের পুত্রের পুত্র
৮২. „ „ প্রদৌহিত্রী	„ প্রোনেপ্টিস	„ প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত খালেতি	মাসীর কন্যার কন্যার কন্যা
(জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারি)				
৮৩. পিতার পিতার ভাই	প্যাট্রুস ম্যাগ্নাস	বড় কাকা (বা জ্যাঠা)	আম্ম আবি	পিতার কাকা (বা জ্যাঠা)
৮৪. „ „ ভাইয়ের পুত্র	প্যাট্রুই ম্যাগ্নি ফিলিয়াস	বড় কাকার পুত্র	ইবন আম্মি আবি	পিতার কাকার পুত্র
৮৫. „ „ „ পৌত্র	„ „ নেপোস	বড় কাকার পৌত্র	ইবন ইবন আম্মি আবি	„ „ পুত্রের পুত্র
৮৬. „ „ „ প্রপৌত্র	„ „ প্রোনেপোস	„ „ প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন আম্মি আবি	পিতার কাকার পুত্রের পুত্রের পুত্র
৮৭. „ „ বোন	অ্যামিটা ম্যাগ্না	বড় পিসি	আম্মেত আবি	পিতার পিসি
৮৮ „ „ বোনের কন্যা	অ্যামিটে ম্যাগ্নে ফিলিয়া	„ পিসির কন্যা	বিনত আম্মেত আবি	„ পিসির কন্যা
৮৯ „ „ „ দৌহিত্রী	„ „ নেপ্টিস	„ „ দৌহিত্রী	„ বিনত „ „	„ „ কন্যার কন্যা
৯০. „ „ „ প্রদৌহিত্রী	„ „ প্রোনেপ্টিস	„ „ প্রদৌহিত্রী	„ „ বিনত „ „	„ „ „ কন্যার কন্যা
৯১. মায়ের মায়ের ভাই	আভাংকুলাস ম্যাগ্নাস	বড় মামা	খাল উম্মি	মায়ের মামা
৯২. „ „ ভাইয়ের পুত্র	আভাংকুলি ম্যাগ্নি ফিলিয়াস	বড় মামার পুত্র	ইবন খাল উম্মি	„ মামার পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
৯৩. মায়ের মায়ের ভাইয়ের পৌত্র	আভাঙ্কুলি ম্যাগ্‌নি নেপোস	বড় মামার পৌত্র	ইবন ইবন খাল উম্মি	মায়ের মামার পুত্রের পুত্র
৯৪. „ „ „ প্রপৌত্র	„ „ প্রোনেপোস	„ „ প্রপৌত্র	„ „ ইবন খাল উম্মি	„ „ „ পুত্রের পুত্র
৯৫. „ „ বোন	ম্যাটারটেরা ম্যাগ্‌না	„ মাসী	খালেত উম্মি	„ মাসী
৯৬. „ „ বোনের কন্যা	ম্যাটারটেরা ম্যাগ্‌নে ফিলিয়া	বড় মাসীর কন্যা	বিনত খালেত উম্মি	„ মাসীর কন্যা
৯৭. „ „ „ দৌহিত্রী	„ „ নেপ্‌টিস	বড় মাসীর দৌহিত্রী	„ বিনত „ „	„ „ কন্যার কন্যা
৯৮. „ „ „ প্রদৌহিত্রী	„ „ প্রোনেপ্‌টিস	বড় মাসীর প্রদৌহিত্রী	„ „ বিনত „ „	„ „ „ কন্যার কন্যা
(জ্ঞাতিত্বের চতুর্থ সারি)				
৯৯. পিতার পিতার পিতার ভাই	প্যাট্রুস মেজর	মহাপিতামহ	আম্ম জিদ্দ	পিতামহের কাকা বা জ্যাঠা
১০০. „ „ „ ভাইয়ের পুত্র	প্যাট্রুই মেজরিস ফিলিয়াস	মহাপিতামহের পুত্র	ইবন আম্ম জিদ্দ	পিতামহের কাকার পুত্র
১০১. „ „ „ „ পৌত্র	„ „ নেপোস	„ পৌত্র	„ ইবন „ „	„ কাকার পুত্রের পুত্র
১০২. „ „ „ „ প্রপৌত্র	„ „ প্রোনেপোস	„ প্রপৌত্র	„ „ ইবন আম্ম জিদ্দ	পিতামহের কাকার পুত্রের পুত্র
১০৩. „ „ „ বোন	অ্যামিটা মেজর	মহাপিতামহী	আম্মেত জিদ্দ	পিতামহের পিসি
১০৪. „ „ „ বোনের কন্যা	অ্যামিটমেজরিস ফিলিয়াস	মহাপিতামহীর কন্যা	বিনত আম্মেত জিদ্দ	„ পিসির কন্যা
১০৫. „ „ „ „ দৌহিত্রী	„ „ নেপ্‌টিস	„ দৌহিত্রী	„ বিনত „ „	„ „ কন্যার কন্যা

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১০৬. পিতার পিতার পিতার বোনের প্রদৌহিত্রী	অ্যামিটে মেজরিস প্রোনেপ্‌টিস	মহাপিতামহীর প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত আম্মেত জিদ্দ	পিতামহের পিসির কন্যার কন্যার কন্যা
১০৭. মায়ের মায়ের মায়ের ভাই	আভাঙ্কুলাস মেজর	মহামাতামহ	খাল সিত্তি	মাতামহীর মামা
১০৮. ,, ,, ,, ভাইয়ের পুত্র	আভাঙ্কুলি মেজরিস ফিলিয়াস	মহামাতামহের পুত্র	ইবন খাল সিত্তি	,, মামার পুত্র
১০৯. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	,, ,, নেপোস	,, পৌত্র	,, ইবন ,, ,,	,, ,, পুত্রের পুত্র
১১০. ,, ,, ,, ,, প্রপৌত্র	,, ,, প্রোনেপোস	,, প্রপৌত্র	,, ,, ইবন খাল ,,	,, ,, ,, পুত্রের পুত্র
১১১. মায়ের মায়ের মায়ের বোন	ম্যাটারটেরা মেজরিস ফিলিয়া	মহামাতামহী	খালেত সিত্তি	মাতামহীর মাসী
১১২. ,, ,, ,, বোনের কন্যা	ম্যাটারটেরে ,, ,,	মহামাতামহীর কন্যা	বিনত ,, ,,	,, মাসীর কন্যা
১১৩. ,, ,, ,, ,, দৌহিত্রী	,, ,, নেপ্‌টিস	,, দৌহিত্রী	বিনত বিনত খালেত সিত্তি	,, ,, কন্যার কন্যা
১১৪. ,, ,, ,, ,, প্রদৌহিত্রী	,, ,, প্রোনেপ্‌টিস	মহামাতামহীর প্রদৌহিত্রী	,, ,, বিনত খালেত সিত্তি	,, ,, ,, কন্যার কন্যা
(জ্ঞাতিত্বের পঞ্চম সারি)				
১১৫. পিতার পিতার পিতার পিতার ভাই	প্যাট্রুস ম্যাক্সিমাস	বৃদ্ধ মহাপিতামহ	আম্ম জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের কাকা (বা জ্যাঠা)
১১৬. ,, ,, ,, ,, ভাইয়ের পুত্র	প্যাট্রুস ম্যাক্সিমি ফিলিয়াস ,,	মহাপিতামহের পুত্র	ইবন আম্ম জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের কাকার পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১১৭. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	প্যাট্রুই ম্যাক্সিমি নেপোস	বৃদ্ধ মহা-পিতামহের পৌত্র	ইবন ইবন আম্ম জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের কাকার পুত্রের পুত্র
১১৮. ,, ,, ,, ,, প্রপৌত্র	,, ,, প্রোনেপোস	বৃদ্ধ মহা-পিতামহের প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন আম্ম জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের কাকার পুত্রের পুত্রের পুত্র
১১৯. ,, ,, ,, ,, বোন	অ্যামিটা ম্যাক্সিমি	বৃদ্ধা মহাপিতা-মহী	আম্মেত জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের পিসি
১২০. ,, ,, ,, ,, বোনের কন্যা	অ্যামিটে ম্যাক্সিমে ফিলিয়া	,, মহাপিতা-মহীর কন্যা	বিনত আম্মেত জিদ্দ আবি	,, ,, পিসির কন্যা
১২১. ,, ,, ,, ,, বোনের দৌহিত্রী	,, ,, নেপ্‌টিস	,, মহাপিতা-মহীর দৌহিত্রী	,, বিনত ,, জিদ্দ আবি	,, ,, পিসির কন্যার কন্যা
১২২. ,, ,, ,, ,, বোনের প্রদৌহিত্রী	,, ,, প্রোনেপ্‌টিস	,, মহাপিতা-মহীর প্রদৌহিত্রী	,, ,, বিনত ,, জিদ্দ আবি	,, ,, পিসির কন্যারকন্যারকন্যা
১২৩. মায়ের মায়ের মায়ের মায়ের ভাই	আভাঙ্কুলাস ম্যাক্সিমাস	বৃদ্ধ মহা-মাতামহ	খাল সিত উম্মি	মায়ের মাতামহীর মামা
১২৪. ,, মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্র	আভাঙ্কুলি ম্যাক্সিমি ফিলিয়াস	,, মহামাতা-মহের পুত্র	ইবন ,, ,, ,,	,, ,, মামার পুত্র
১২৫. ,, ,, ,, ,, ,, পৌত্র	,, ,, নেপোস	,, মহামাতা-মহের পৌত্র	,, ইবন ,, ,, ,,	,, ,, ,, পুত্রের পুত্র
১২৬. ,, ,, ,, ,, ,, প্রপৌত্র	,, ,, প্রোনেপোস	,, মহামাতা-মহের প্রপৌত্র	,, ,, ইবন খাল সিত উম্মি	,, ,, মামার পুত্রের পুত্রের পুত্র

	ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১২৭.	মায়ের মায়ের মায়ের মায়ের বোন	ম্যাটারটেরা ম্যাক্সিমা	বৃদ্ধা মহা-মাতামহী	খালেত সিত উম্মি	মায়ের মাতামহীর মাসী
১২৮.	,, ,, ,, ,, বোনের কন্যা	ম্যাটারটেরে ম্যাক্সিমে ফিলিয়া	,, মহামাতা-মহীর কন্যা	বিনত ,, ,, ,,	,, ,, মাসীর কন্যা
১২৯	,, ,, ,, ,, ,, দৌহিত্রী	,, ,, নেপ্‌টিস	,, মহামাতা-মহীর দৌহিত্রী	,, বিনত খালেত সিত উম্মি	,, ,, ,, কন্যার কন্যা
১৩০.	,, ,, ,, ,, ,, প্রদৌহিত্রী	,, ,, প্রোনেপ্‌টিস	,, মহামাতা-মহীর প্রদৌহিত্রী	,, ,, বিনত ,, সিত উম্মি	,, ,, ,, কন্যার কন্যার কন্যা
	(বিবাহজ সম্পর্ক)				
১৩১.	স্বামী	ভির বি, ম্যারিটাস	স্বামী	জোজি	স্বামী
১৩২.	স্বামীর পিতা	সকার	শ্বশুর	আম্মি	কাকা
১৩৩.	,, মা	সক্রাস	শাশুড়ি	আমরাত আম্মি	কাকার স্ত্রী
১৩৪.	,, পিতামহ	সকার ম্যাগ্‌নাস	বড় শ্বশুর	জিদ্দ জোজি	স্বামীর পিতামহ
১৩৫.	,, পিতামহী	সক্রাস ,,	,, শাশুড়ি	সিত্ত ,,	,, পিতামহী
১৩৬.	স্ত্রী	উক্সর বি, ম্যারিটা	স্ত্রী	আমরাতি	স্ত্রী
১৩৭.	স্ত্রী-র পিতা	সকার	শ্বশুর	আম্মি	কাকা
১৩৮.	,, মা	সক্রাস	শাশুড়ি	আমরাত আম্মি	কাকার স্ত্রী
১৩৯.	,, পিতামহ	সকার ম্যাগ্‌নাস	বড় শ্বশুর	জিদ্দ আমরাতি	স্ত্রীর পিতামহ
১৪০.	,, পিতামহী	সক্রাস ,,	,, শাশুড়ি	সিত্ত ,,	,, পিতামহী
১৪১.	সৎ-পিতা	ভিট্রিকাস	সৎ-পিতা	আম্মি	কাকা (uncle)
১৪২.	সৎ-মা	নোভের্কা	সৎ-মা	খালোতি	মাসী (aunt)

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৪৩. সৎ-পুত্র	প্রিভিগ্নাস	সৎ-পুত্র	কারুতি	সৎ পুত্র
১৪৪. সৎ-কন্যা	প্রিভিগ্না	সৎ-কন্যা	কারুতেতি	সৎ-কন্যা
১৪৫. জামাতা	জেনার	জামাতা	খাতান বি, সাহা	জামাতা
১৪৬ পুত্রবধূ	নুরাস	পুত্রবধূ	কিন্নেত	পুত্রবধূ
১৪৭. দেবর বা ভাশুর	লেভের	দেবর বা ভাশুর	ইবন আম্মি	কাকার পুত্র
১৪৮. ভগ্নীপতি	ম্যারিটাস সোরোরিস	ভগ্নীপতি	জোজ আখ্তি	বোনের স্বামী
১৪৯ শ্যালক	উক্সরিস ফ্র্যাটার	স্ত্রীর ভাই	ইবন আম্মি	কাকার পুত্র
১৫০. শ্যালিকা	,, সোরোর	,, বোন	বিনত ,,	কাকার কন্যা
১৫১. ননদ	গ্লস্	ননদ	,, ,,	,, ,,
১৫২. ভাদ্রবধূ	ফ্র্যাট্রিয়া	ভাদ্রবধূ	আমরাত আখি	ভাইয়ের স্ত্রী
১৫৩. বিধবা	ভিডুয়া	বিধবা	আর্মেলেত	বিধবা
১৫৪. বিপত্নীক	ভিডুয়াস	বিপত্নীক	আর্মেতি	বিপত্নীক
১৫৫. পিতার দিকের আত্মীয়	অ্যাগ্নেটি	পিতৃ-জ্ঞাতি		
১৫৬. মায়ের ,, ,,	কগ্নেটি	মাতৃ-জ্ঞাতি		
১৫৭. বিবাহসূত্রে ,,	অ্যাফিনেস্	বৈবাহিক-জ্ঞাতি		

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যায়ক্রম

বিভিন্ন ধারাবাহিক রূপের মধ্যে দিয়ে পরিবারের উন্নত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যে-সব প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, সেগুলোকে এবার যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা দরকার। এগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজানোটা কিছুটা কল্পনাশ্রয়ী ঠিকই, কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ ও সংশয়াতীত সম্পর্ক আছেই।

যে-সব প্রধান প্রধান সামাজিক ও গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিবারকে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর থেকে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করেছে, সেইসব প্রতিষ্ঠানকেই এই পর্যায়ক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১] মানবজাতির বিভিন্ন শাখায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি এরকম পর্যায়ক্রমেই গড়ে উঠেছে এবং এক একটা মানবগোষ্ঠী এক একটা নির্দিষ্ট স্তরে থাকার সময় তাদের মধ্যে সেই সেই স্তরের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোও বিদ্যমান থেকেছে।

পর্যায়ক্রমের প্রথম স্তর :

(১) অবাধ যৌনমিলন ;

(২) আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইবোনদের দলগত অন্তর্বিবাহ : যা থেকে গড়ে ওঠে—

(৩) ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার (পরিবারের প্রথম স্তর) : যা থেকে ওঠে—

(৪) জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার মালয়ী ব্যবস্থা।

পর্যায়ক্রমের দ্বিতীয় স্তর :

(৫) লিঙ্গভিত্তিক সংগঠন এবং দলগত বিবাহপ্রথা, যার ফলে ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ কমতে থাকে : যা থেকে গড়ে ওঠে—

(৬) দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার (পরিবারের দ্বিতীয় স্তর) : যা থেকে গড়ে ওঠে—

(৭) গোত্রভিত্তিক সংগঠন, যা ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ করে দেয় ; যা থেকে গড়ে ওঠে—

(৮) জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার তুরানিয় এবং গ্যানোয়ানিয় ব্যবস্থা।

পর্যায়ক্রমের তৃতীয় স্তর :

(৯) গোত্রীয় সংগঠনের ক্রমাগত প্রভাব বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের উপকরণের উন্নতি, যার ফলে মানবজাতির একটা অংশ উন্নীত হয় বর্বর যুগের নিম্ন

১। "সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি"-র ৪৮০ পৃষ্ঠায় পর্যায়ক্রমটা যেভাবে সাজিয়েছিলাম, এখানে তা কিছুটা সংশোধন করেছি।

পর্যায়েঃ যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১০) একজোড়া নারীপুরুষের মধ্যে বিবাহ, কিন্তু যৌন-সহবাস শুধু পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার কোন বাধ্যবাধকতা তাদের থাকত না : যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১১) জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার (পরিবারের তৃতীয় স্তর)।

পর্যায়ক্রমের চতুর্থ স্তর :

(১২) কিছু কিছু জায়গায় সমতলভূমিতে পশুপালননির্ভর জীবনযাত্রার সূচনা ; যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১৩) পিতৃপ্রধান পরিবার (পরিবারের চতুর্থ স্তর হলেও এটা একটা ব্যতিক্রমী স্তর, সবজায়গায় দেখা যায় নি)।

পর্যায়ক্রমের পঞ্চম স্তর :

(১৪) সম্পত্তির অভ্যুদয় এবং সম্পত্তির ওপর বংশগত উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ; যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১৫) একবিবাহভিত্তিক পরিবার (পরিবারের পঞ্চম স্তর) ; যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১৬) জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয়া ব্যবস্থা, বিলুপ্ত হয় তুরানিয় ব্যবস্থা।

বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের যে পর্যায়ক্রমটা আমরা পাচ্ছি, সেগুলোর মধ্যেকার সংযোগ ও সম্পর্ককে খুঁজে দেখার জন্য সামান্য আলোচনা করে পরিবারের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত এই পর্যালোচনা শেষ করব আমরা।

ভূতাত্ত্বিক কাঠামো যেমন বিভিন্ন ধারাবাহিক স্তরের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকেও তাদের আপেক্ষিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ধারাবাহিক স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। মানবগোষ্ঠীগুলোকে এইভাবে বিন্যস্ত করলে বন্য যুগ থেকে শুরু করে সভ্য যুগ পর্যন্ত মানুষের অগ্রগতির ছবিটা আমাদের সামনে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। প্রতিটা স্তরকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে সেই স্তরের সংস্কৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নির্দিষ্ট লক্ষণগুলো বুঝতে পারা যায়। এ-রকম পর্যালোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি একটা স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরগুলোর পার্থক্য কী কী আর একটা স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরগুলোর সম্পর্কটাই বা কেমন। এর ফলে সমগ্র প্রক্রিয়াটা সম্বন্ধেই একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে আমাদের। এই ধারণাটা গড়ে উঠলে মানুষের অগ্রগতির ধারাবাহিক স্তরগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে আর কোন অসুবিধে হয় না। এই স্তরগুলো গড়ে ওঠার ব্যাপারে সময় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কোন ঐতিহাসিক যুগই স্বল্পস্থায়ী হয় নি। সভ্যতার পূর্ববর্তী প্রতিটা পর্যায় যে বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে টিকে থেকেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবাধ যৌনমিলন :

এটাই হচ্ছে বন্যতার নিম্নতম স্তর, সমগ্র প্রক্রিয়াটার একেবারে আদি অবস্থা। এই পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে চারপাশের মূক জন্তু-জানোয়ারদের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বিবাহ বলে কোন ব্যাপার তাদের মধ্যে ছিল না। সম্ভবত দলবদ্ধভাবে বসবাস

করত তারা। এই পর্যায়ের মানুষ শুধু যে বন্য ছিল তা-ই নয়, তার বুদ্ধিমত্তা ছিল নিতান্তই দুর্বল এবং নৈতিকবোধ দুর্বলতর। তার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাটা নিহিত ছিল আবেগের তীব্রতার মধ্যে, (কারণ সমস্ত ব্যাপারেই তখনকার মানুষরা ছিল প্রচণ্ড সাহসী), মুক্ত দুটো হাতের মধ্যে এবং তার গড়ে উঠতে থাকা মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতার বিকাশযোগ্য চরিত্রের মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গীরই সমর্থন পাওয়া যায় আর একটা ঘটনায়। সভ্য যুগের মানুষদের থেকে শুরু করে পিছোতে পিছোতে ক্রমশঃ বন্য যুগের মানুষদের করোটি পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যায় করোটির আয়তন ক্রমশ ছোট হচ্ছে এবং বেড়ে উঠেছে তার পশুসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো। আদিম মানুষদের বুদ্ধিমত্তা যে যথেষ্টই কম ছিল, তার একটা প্রমাণ এখান থেকেই পাওয়া যায়। সেই আদিমতম মানুষদের জগতে গিয়ে পেঁছিতে পারলে দেখা যেত যে আজকের পৃথিবীর সবথেকে নিম্নস্তরের বন্যদের থেকেও অনেক নিম্ন স্তরে ছিল তারা। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে-সব অমার্জিত ধরেনের পাথুরে যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে, সেগুলো আজকের দিনের বন্যরা আর ব্যবহার করে না, সেগুলো থেকেই বোঝা যায় আদিম বাসস্থান থেকে সরে এসে মৎস্যশিকারী হিসেবে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সময় তখনকার বন্যরা কতটা আদিম, অমার্জিত অবস্থায় ছিল। শুধুমাত্র সেই আদিমতম বন্যদের মধ্যেই অবাধ যৌনমিলন চালু ছিল।

এই প্রাচীনতম অবস্থার কোন প্রমাণ আছে কি না, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তরে বলা যায়, ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার ও মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পূর্বশর্ত হিসাবে একটা পূর্বতন অবাধ যৌনমিলনের অবস্থার কথা ধরেই নিতে হয়। মানুষ যখন শুধু ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত এবং নিজের আদিম বাসস্থানেই বসবাস করত, কেবল-মাত্র তখনই চালু ছিল এই অবস্হাটা (এবং সেটাই স্বাভাবিক), কারণ তারা মৎস্য-শিকারী হয়ে ওঠার পর এবং কৃত্রিমভাবে অর্জিত খাদ্যের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করার পর এই অবস্হাটা চালু থাকা আর সম্ভব ছিল না। এই সময় থেকে দেখা দিচ্ছিল ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ (স্বাভাবিকভাবেই এর রূপটা ছিল দলের মধ্যে অন্তর্বিবাহ) আর তার ফল হিসেবে গড়ে উঠছিল ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার। নানা ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্হার পথ বেয়ে পিছোতে পিছোতে আমরা সবথেকে প্রাচীন যে সমাজব্যবস্থার চিত্র পাই, তা হচ্ছে এই পরিবারেরই চিত্র। যৌথভাবে জীবনধারণ করা আর নিজেদের যৌথ স্ত্রীদের সমাজের অন্য পুরুষদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু পুরুষদের একটা পারস্পরিক চুক্তির মতই ছিল ব্যাপারটা। দ্বিতীয়ত, পূর্বতন অবাধ যৌনমিলনের কিছু কিছু ছাপ ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। নির্দিষ্ট একটা সীমার মধ্যে অবাধ যৌনমিলনকে সে স্বীকৃতি দিয়েছিল, কিন্তু সবথেকে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যৌনমিলন আর স্বীকৃতি পায় নি। এই পরিবারের গঠন কাঠামোটার মধ্যে অতীতের একটা নিকৃষ্টতর অবস্হার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে সে। অবাধ যৌনমিলনের অবস্হায় থাকা দলগুলো থেকে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারে উন্নীত হওয়াটা একটা দীর্ঘ পদক্ষেপ হলেও এই দুটো অবস্হার মাঝখানে কোন অন্তর্বর্তী স্তরের আবশ্যকতা ছিল না। আর যদি তা থেকেও থাকে, তাহলেও তার

কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণও নয়। আপাতত সেই বন্যতার যুগে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার কর্তৃক সূচিত নির্দিষ্ট সূচনাবিন্দুটার কথা জানা থাকলেই চলে, যা থেকে আমরা একেবারে আদিম যুগে মানবজাতির অবস্থা কেমন ছিল তা-ও জানতে পারি।

গ্রীক ও রোমানদের পরিচিত কিছু কিছু বন্য এবং এমনকি কিছু বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যেও অবাধ যৌনমিলন চালু ছিল বলে উল্লেখ করেছেন অনেকে। যেমন হেরোডোটাস উল্লেখ করেছেন উত্তর আফ্রিকার অসিয়ানদের কথা,[১] প্লিনি উল্লেখ করেছেন ইথিওপিয়ার গ্যারামান্টেদের কথা।[২] এবং স্ট্র্যাবোর লেখায় পাওয়া যায় আয়ারল্যান্ডে কেল্টদের কথা।[৩] আরবদের ব্যাপারে এই একই কথা বলেছেন স্ট্র্যাবো।[৪] লিখিত ইতিহাসের সীমার মধ্যে কোন মানব গোষ্ঠী যূথবদ্ধ পশুদের মত বাছবিচারহীন যৌনমিলনের মধ্যে থাকতে পারে না। মানবজাতির আদিকাল থেকে শুরু করে লিখিত ইতিহাসের যুগ পর্যন্ত কোন গোষ্ঠীর মধ্যে অবাধ যৌনমিলন চালু থাকা অসম্ভব। এইসব লেখকরা যে-সব ঘটনার কথা বলেছেন সেগুলোকে এবং আরও যে-সব ঘটনার কথা এই সঙ্গে বলা যায় সেগুলোকে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারেরই অভিব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ব্যাপারটাকেই ওপর থেকে দেখে বিদেশী লেখকদের অবাধ যৌনমিলন বলে মনে হয়েছে। তত্ত্বগতভাবে বলা যায়, অবাধ যৌনমিলন হচ্ছে ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের আবিশ্যিক পূর্বাবস্থা। কিন্তু এই অবস্থাটা সুদূর অতীতের ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে, তাই এ ব্যাপারে আজ আর সঠিক ধারণা অর্জন করা সম্ভব নয়।

২। আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইবোনদের দলগত অন্তর্বিবাহ :

এই ধরনের বিবাহ থেকেই গড়ে উঠেছিল পরিবার, এই বিবাহই হচ্ছে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির জন্মদাতা। এই ধরনের বিবাহ যে সুপ্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিধৃত রয়েছে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে। প্রাচীন যুগে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হলে বিবাহের বাকি রূপগুলোকে তার পরবর্তী ধারাবাহিক স্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করতে আর কোন অসুবিধে হয় না।

এই ধরনের বিবাহ থেকে গড়ে ওঠে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার ৩। এবং মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা ৪। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমের তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপগুলো। এই ধরনের পরিবার বন্য যুগের নিম্ন পর্যায়ের অন্তর্গত।

৫। দলগত বিবাহ প্রথা :

অস্ট্রেলিয় পুরুষ ও নারী শ্রেণীগুলোর বিবাহবন্ধনের মধ্যে দলগত বিবাহপ্রথার নিদর্শন চোখে পড়ে। হাওয়াইয়ানদের মধ্যেও এই ধরনের বিবাহপ্রথা দেখা যায়।

১। লিব, iv, পৃঃ ১৮০.

২। Garamantes matrimonium exsortes passim cum femines degunt.—"ন্যাচারাল হিস্ট্রি", লিব, v, পৃঃ ৮.

৩। লিব, iv, পৃঃ ৫, অনুচ্ছেদ ৪.

৪। লিব, xvi, পৃঃ ৪, অনুচ্ছেদ ২৫.

যে-সব গোষ্ঠীর মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা চালু আছে বা একসময় চালু ছিল, তাদের প্রত্যেকের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষের মধ্যেই প্রচলিত ছিল দলগত বিবাহপ্রথা, কারণ এই ধরনের বিবাহপ্রথা ছাড়া তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। এই ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উদ্ভবের অন্য কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে একটা বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে—দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রবর্তন ভাইবোন বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের সমস্ত সদস্যই অন্তর্ভুক্ত হত, বাদ যেতে শুধু আপন ভাইবোনরা। সব ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হতে কি না বলা মুস্কিল, কিন্তু নিয়মটা তা-ই ছিল। সহজেই অনুমান করা চলে যে দলগত বিবাহপ্রথার সুবিধাজনক দিকগুলো উপলব্ধি করার পর প্রায় সব জায়গার মানুষরাই এই প্রথাটা গ্রহণ করেছিল। এই ধরনের বিবাহ থেকে গড়ে ওঠে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার ৬। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমের ষষ্ঠ ধাপটা। খুব সম্ভবত বন্য যুগের মধ্য পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল এই পরিবার।

৭। **গোত্রভিত্তিক সংগঠন ঃ**

গোটা পর্যায়ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাটা কী এখানে আমরা শুধু সেটুকুই দেখার চেষ্টা করব। অস্ট্রেলির শ্রেণীগুলোর মধ্যে বেশ ব্যাপক এবং সুবিন্যস্ত দলগত বিবাহ দেখা যায়। এরা গোত্রের ভিত্তিতেও সংগঠিত হতে পেরেছে। এখানে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গোত্রের থেকে প্রাচীন, কেননা এই পরিবার গড়ে উঠেছে গোত্রের পূর্ববর্তী শ্রেণীগুলোর ভিত্তিতে। অস্টেট্রলিয়দের মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্হাও চালু আছে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দলগুলো থেকে আপন ভাইবোনদের বাদ দিয়ে ঐ শ্রেণীগুলোই এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনা করেছিল। আপন ভাইবোনরা জন্ম সূত্রেই এমন দুটো শ্রেণীর সদস্য/সদস্যা হিসেবে পরিগণিত হত, যে দুটো শ্রেণীর সদস্য/সদস্যাদের পরস্পরকে বিবাহ করা অনুমোদনযোগ্য ছিল না। হাওয়াইদের ক্ষেত্রে কিন্তু দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে নি। এদের দলগত বিবাহের মধ্যে আপন ভাইবোনরাও প্রায়শঃই অন্তর্ভুক্ত হতো। চলতি প্রথায় এই ধরনের বিবাহের বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না, যদিও সে-রকম একটা চাপা প্রবণতা অবশ্য ছিলই। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দুটো উপাদান প্রয়োজন হয়—দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর গোত্রীয় সংগঠন। গোত্রীয় সংগঠন যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের পরে এবং ঐ পরিবারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বন্য যুগের মধ্য পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল এই সংগঠন।

৮ এবং ৯ ঃ এই দুটো ধাপ নিয়ে আগেই যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

১০ এবং ১১. একজোড়া নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহ এবং জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার ঃ

বন্য যুগ থেকে অগ্রসর হয়ে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে প্রবেশ করার পর মানবজাতির অবস্হার বিপুল উন্নতি ঘটেছিল। বলা চলে, সভ্যতায় উন্নীত হওয়ার সংগ্রামে তখনই তারা আধআধি জয়লাভ করেছিল। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দলগুলোর সদস্যসংখ্যা কমিয়ে আনার একটা প্রবণতা নিশ্চয়ই দেখা দিতে শুরু করেছিল বন্য যুগ শেষ হওয়ার আগেই, কেননা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারকে একটা

স্হায়ী ঘটনা হিসেবেই দেখেছি আমরা। যে প্রথার প্রভাবে অধিকতর অগ্রসর বন্য মানুষরা একদল স্ত্রী-র মধ্যে বিশেষ একজনকে নিজের প্রধান স্ত্রী হিসেবে চিনতে শিখছিল, সেই প্রথমটাই পরবর্তীকালে আরও পরিণত হয়ে উঠে একজোড়া নারী-পুরুষের জোড়-বাঁধার সূচনা করে এবং পরিবারের ভরণপোষণের ব্যাপারে এই স্ত্রীটি হয়ে ওঠে স্বামীর সঙ্গী ও সহযোগী। জোড়-বাঁধার প্রবণতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের পিতৃত্ব নির্ধারণও যথেষ্ট সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। তবে স্বামী স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারত এবং উভয়েই নিজের নিজের ইচ্ছে মত নতুন কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনী জুটিয়ে নিতে পারত। তাছাড়া, বিবাহবন্ধনের বাধ্যবাধকতা বা দায়দায়িত্বকে পুরুষরা স্বীকার করত না, ফলে স্ত্রীদের দিক থেকে এই বাধ্যবাধকতা দাবী করার কোন অধিকারও থাকত না তাদের। দলগত বিবাহপ্রথা ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো দাম্পত্য ব্যবস্হা সংকীর্ণ হয়ে পড়লেও নতুন ধরনের পরিবারের মধ্যে তার ছাপ রয়েই গিয়েছিল এবং একেবারে সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত এই ছাপ পুরোপুরি মুছে যায় নি। এই ছাপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল একবিবাহ চালু হওয়ার ঠিক আগে। পুরনো দাম্পত্য ব্যবস্হার ছায়াটা মুখ লুকিয়েছিল নতুন ধরনের বারাঙ্গনাবৃত্তির মধ্যে, যার অভিশাপ থেকে এই সভ্য যুগের পরিবারগুলোরও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি। জোড়-বাঁধা পরিবারের সঙ্গে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের যতটা বৈষম্য, তার চেয়ে অনেক বেশি বৈষম্য ছিল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের সঙ্গে জোড়-বাঁধা পরিবারের। সময়ের বিচারে জোড়া-বাঁধা পরিবার সৃষ্টি হয়েছে গোত্রের পরে এবং এই পরিবার গড়ে ওঠার পিছনে গোত্রের অবদান মোটেই কম নয়। এই পরিবার যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর একবিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যবর্তী একটা স্তর, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্হার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে এই পরিবারের অক্ষমতার মধ্যেই। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্হার অবসান ঘটানোর ক্ষমতা শুধুমাত্র একবিবাহেরই ছিল। কলম্বিয়া নদী থেকে শুরু করে প্যারাগুয়ে পর্যন্ত অঞ্চলের ইণ্ডিয়ান পরিবারগুলো ছিল মূলতঃই জোড়-বাঁধা পরিবার, দু'একটা জায়গায় চোখে পড়ত দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর সম্ভবত একবিবাহভিত্তিক পরিবারের কোন অস্তিত্ব তখন ছিল না।

১২ এবং ১৩। পশুপালননির্ভর জীবনযাত্রা ও পিতৃপ্রধান পরিবার ঃ আমরা আগেই বলেছি যে বহুবিবাহ এই পরিবারের কোন অবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। আসলে এই ধরনের পরিবার ছিল মানুষের নিজস্বতা অর্জন করার একটা সামাজিক পদক্ষেপ। সেমিটিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এটা ছিল গবাদি পশুর দেখাশোনা করা, জমিতে চাষ করা এবং পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও জীবনধারণের জন্য গড়ে ওঠা ভৃত্য আর ক্রীতদাসদের একটা সংগঠন, যারা কাজ করত একজন পুরুষ-কর্তার অধীনে। বহু-বিবাহের ঘটনা কদাচিৎ ঘটত। একজন মাত্র পুরুষ-কর্তা এবং যৌন-সহবাস কেবলমাত্র দুজন নারী-পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা—এই দুটো কারণে এই পরিবার ছিল জোড়-বাঁধা পরিবারের চেয়ে উন্নত ধরনের সংগঠন, আর তাই এটাকে কোনরকম অবনমন বা অধঃপতন বলা চলে না। মানবজাতির ওপর এই পরিবারের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই তার পূর্ববর্তী যুগের সামাজিক অবস্হার একটা ছবি আর বুঝতে পারি যে

ঐ অবস্থাটাকে প্রতিহত করার জন্যই উদ্ভব ঘটেছিল এই পিতৃপ্রধান পরিবারের।

১৪। সম্পত্তির অভ্যুদয় এবং সম্পত্তির ওপর বংশগত উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ঃ

যে-সব সামাজিক ঘটনার ফল হিসেবে গড়ে উঠেছিল হিব্রু ও লাতিন ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবার, সেগুলোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সম্পত্তির (নানা ধরনের সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল) ক্রমবর্ধমান প্রভাবও আসন্ন করে তুলছিল একবিবাহের অভ্যুদয়কে। মানবসভ্যতায় সম্পত্তির অবদান অসীম। সম্পত্তির প্রভাবেই আর্য ও সেমিটিক জাতি-গুলো বর্বরতার আঁধার পেরিয়ে পা রাখতে পেরেছিল সভ্যতার আঙিনায়। প্রথম দিকে মানুষের মনে সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণাটা ছিল নেহাতই দুর্বল, কিন্তু শেষপর্যন্ত এটাই হয়ে ওঠে তার সবকিছুর নিয়ন্তা। মূলত সম্পত্তি সৃষ্টি, রক্ষা এবং তা ভোগ করার চিন্তা থেকেই গড়ে ওঠে সরকার আর আইন। সম্পত্তির স্বার্থেই শুরু হয় কিছু মানুষকে দাস বানানোর প্রক্রিয়া। তারপর বেশ কয়েক হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় যখন দেখা যায় সম্পত্তি-সৃষ্টির-যন্ত্র হিসেবে একজন ক্রীতদাসের থেকে একজন মুক্ত মানুষ অনেক বেশি কার্যকরী, তখন অবসান ঘটানো হয় দাসপ্রথার। মানুষের মনের সহজাত নিষ্ঠুরতা (সভ্যতা এবং খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে কিছুটা কমলেও পুরোপুরি নির্মূল হয় নি) থেকে আজও বোঝা যায় যে মানুষ একসময় বন্য দশায় ছিল, এবং সেটা সবথেকে স্পষ্টভাবে ফুটে ওটে আমাদের লিখিত ইতিহাসের প্রতিটি শতাব্দী জুড়ে মানুষের দাসত্বের এই ইতিবৃত্তের মধ্যেই। কোন সম্পত্তিমালিকের সন্তানরাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে—এই নিয়মটাই পুরোপুরি একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার প্রথম সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। ক্রমে ক্রমে (যদিও খুবই ধীরে ধীরে) বিবাহের এই রূপটাই সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়, যেখানে যৌনমিলন সীমাবদ্ধ থাকে শুধুমাত্র একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যেই। তবে সভ্য যুগ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই বিবাহপ্রথা পাকাপাকিভাবে কায়েম হতে পারে নি।

১৫। একবিবাহভিত্তিক পরিবার ঃ

এই পরিবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিশ্চিত হয় সন্তানদের পিতৃত্ব, সমস্ত স্থাবর ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর যৌথ মালিকানার বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের বদলে ঐ-সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিগণিত হয় শুধুমাত্র সম্পত্তি-মালিকের নিজের সন্তানরা। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের বনিয়াদের ওপরেই গড়ে ওঠে আধুনিক সমাজ। মানবজাতির পূর্বতন যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি মূর্ত হয়ে ওঠে এই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে। সুদূর বন্যতার যুগ থেকে শুধু করে খুব ধীরে লয়ে সমাজ অগ্রসর হয়েছে এই লক্ষ্যের দিকে। আসলে পূর্বতন সমস্ত যুগের যাবতীয় অভিজ্ঞতারই অভিমুখ ছিল এই একবিবাহভিত্তিক পরিবার। মূলত আধুনিক যুগের ঘটনা হলেও কার্যত এই পরিবার ছিল এক সুবিস্তৃত ও বহুমুখী অভিজ্ঞতারই ফসল।

১৬। আর্য, সেমিটিক ও উরালিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা ঃ

মূলগতভাবে অভিন্ন এই তিন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রভাবেই। এই ধরনের বিবাহ ও এই ধরনের পরিবারের আওতায় যে-সব

সম্পর্ক দেখা যায়, সেগুলোই অভিব্যক্ত হয়েছে ঐ তিন ধরণের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা কোন যথেচ্ছভাবে রচিত বিধান নয়, এটা হচ্ছে স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির ফসল। ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় জ্ঞাতিত্ব ব্যাপারটাকে মানুষ যেভাবে দেখত, সেটাই মূর্ত হয়ে ওঠে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা থেকে যেমন বোঝা যায় যে ঐ ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবার, ঠিক তেমনি তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা থেকে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের এবং মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা থেকে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিটি জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার মধ্যে বিধৃত প্রমাণগুলো এতই সুদৃঢ় ধরনের যে এগুলোকে নিঃসংশয়ে সত্য বলে মেনে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। তিন ধরনের বিবাহ, তিন ধরনের পরিবার এবং তিন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার ফলে পর্যায়ক্রমের ষোলটি ধাপের নয়টি ধাপ নিয়ে আর সংশয় থাকে না। বাকি ধাপগুলোর অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারেও আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করেছি।

এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত হল, তা যে বেশ কয়েক শতাব্দী জুড়ে সাধারণভাবে স্বীকৃত একটা অনুমানের বিরোধী—তা আমি জানি। ঐ অনুমান অনুযায়ী বর্বর এবং বন্যদের অস্তিত্বের কারণ হিসেবে দেখানো হত মানুষের অধঃপতনকে; কারণ সত্যিকারের মানুষের যে কাল্পনিক মানদণ্ডটার কথা ধরে নেওয়া হয়, তার থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক নিচু অবস্থায় থাকে বর্বর ও বন্যরা। এই অনুমানটা কখনোই তথ্যের দ্বারা সমর্থিত কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হয়ে উঠতে পারে নি। মানুষের ধারাবাহিক নানান আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, সমাজব্যবস্থার প্রগতিমুখী বিকাশ এবং একের পর এক কয়েক ধরনের পরিবারের উদ্ভব এইসব ঘটনাই ঐ অনুমানের সম্ভাব্যতাকে নাকচ করে দেয়। আর্য ও সেমিটিক জাতির পূর্বপুরুষরা বর্বরই ছিল। এইখানেই প্রশ্ন ওঠে—বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে এবং ঐ পর্যায়ের বিভিন্ন কলাকৌশল ও বিকাশ অর্জন না করে তারা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে (এই পর্যায়ে থাকার সময়ই এদের কথা প্রথম জানা যায়) উন্নীত হল কী করে? আবার, বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে তারা ঐ যুগের মধ্য পর্যায়ে বা উন্নীত হল কী করে? এখানে থেকে আর একটু এগিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়—বন্যতার যুগ পার না হয়ে বর্বর যুগে উন্নীত হওয়া কি আদৌ সম্ভব? মানুষের অধঃপতনের ঐ ধারণাকে মেনে নিলে আর একটা বিষয়ও সেই সঙ্গে মেনে নিতেই হয়। সেটা হল এই যে, আর্য ও সেমিটিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত জাতিগুলো ছাড়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতিগুলো হচ্ছে অস্বাভাবিক জাতি, অর্থাৎ এই জাতিগুলো নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়ে নিম্ন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এ-কথা সত্য যে আর্য ও সেমিটিকে জাতিগুলোই মানব-প্রগতির মূল ধারার প্রতিভূ, কেননা এখনও পর্যন্ত অগ্রগতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পেরেছে এরাই। কিন্তু এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে আর্য ও সেমিটিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এরা বর্বরতার পর্যায়েই ছিল। কাজেই যখন দেখা যাচ্ছে যে এই গোষ্ঠীগুলোও একসময় বর্বর গোষ্ঠীই ছিল সেই বর্বর গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা ছিল বন্যদশার মানুষ, তখন ঐ

'স্বাভাবিক' ও 'অস্বাভাবিক' গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথকীকরণের চেষ্টাটার আর কোন তাৎপর্য থাকে না।

সমাজের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সে-সব বিশিষ্ট পণ্ডিতরা হিব্রু ও লাতিন ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবারকেই পরিবারের সবথেকে প্রাচীন রূপ বলে ধরে নিয়েছেন এবং ঐ পরিবারই প্রথম সংগঠিত সমাজব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল বলে মনে করেছেন—তাঁদের সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করছে আমাদের এই পর্যায়ক্রম। তাঁদের যুক্তি অনুযায়ী একেবারে প্রথম থেকেই পিতৃকর্তৃত্বের অধীনে পরিবার গড়ে তোলার ধারণা মানুষের মধ্যে ছিল। সাম্প্রতিককালের অত্যন্ত বিশিষ্ট পণ্ডিত স্যর হেনরি মেইন এঁদের অন্যতম। প্রাচীন আইনের উৎস এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর মননদীপ্ত গবেষণা থেকে আমরা ঐ-সব আইন আর প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বহুকিছু জানতে পেরেছি। এটা সত্যি যে ধ্রুপদী যুগের ও সেমিটিক লেখকদের বর্ণনা থেকে হিসেব করলে পিতৃপ্রধান পরিবারই সবথেকে প্রাচীন পরিবার বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এইভাবে হিসেবে করতে গেলে বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের পর আর এগোনো যায় না, অর্থাৎ পুরো চারটি ঐতিহাসিক যুগ অনালোচিত থেকে যায় আর সেই যুগগুলোর মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কটা রয়ে যায় অজানা। তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে মানবজাতির প্রথম দিককার অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি খুব বেশিদিন আগে আমাদের হাতে আসে নি, তাই পুরনো মতবাদের বদলে নতুন মতবাদকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বিচক্ষণ গবেষকদের স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে।

ইতিহাসের গতিধারায় মানুষ একটা জিনিস আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে এসেছে, যা অধঃপতনের তত্ত্বকে এককথায় নাকচ করে দেয়। তীর-ধনুক আবিষ্কারের বা বন্দুক আবিষ্কারের আগে আবিষ্কার করতে হয়েছে বারুদ তৈরির প্রণালী, রেল গাড়ী এবং বাষ্পচালিত জাহাজ আবিষ্কারের আগে আবিষ্কার করতে হয়েছে বাষ্পচালিত এনজিন। একইভাবে, জীবনধারণের বিভিন্ন কলাকৌশলও একটার পর একটা আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ কিছুদিন অন্তর অন্তর। পাথুরে যন্ত্রপাতির যুগ অতিক্রম করে মানুষ এসে পেঁৗছেছে লোহার তৈরী যন্ত্রপাতির যুগে। শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও আদিম যুগ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। সেই আদিম যুগ থেকে শুরু করে আজকের সুসভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব দেখা যায়, তার কারণ ঐ-সব প্রতিষ্ঠানের ক্রমবৃদ্ধি, বিকাশ এবং এক যুগ থেকে পরের যুগে উত্তীর্ণ হতে পারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। একইভাবে, অতি প্রাচীন সেই ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের স্তর পার হয়ে, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের পথ বেয়ে জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগ অতিক্রম করে এই সামগ্রিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পেরেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবার। কাজেই একবিবাহভিত্তিক পরিবারকে সবথেকে প্রাচীন ধরনের পরিবার বলে মেনে নেওয়ার বোকামি না করলে আমরা এই পরিবারের উদ্ভব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারি। এই ধারণাটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এ থেকে আমরা বুঝতে পারি অনেকের একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে এসে পেঁৗছানোর জন্য কতটা মূল্য দিতে হয়েছে

মানুষকে।

পৃথিবীর বুকে মানুষ যে বহু প্রাচীনকালের বাসিন্দা, তার স্বপক্ষে আমরা প্রচুর যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছি। সংস্কারমুক্ত মানুষদের বিশ্বাস উৎপাদনে জন্য এই যুক্তি প্রমাণগুলোই যথেষ্ট। ইওরোপের তুষার-যুগের সময়ে তো বটেই, এমনকি তার পূর্ববর্তী যুগেও পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। মানুষ যে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে পৃথিবীর বুকে, তা স্বীকার করতে আমরা এখন বাধ্য! এই সত্যটা উপলব্ধি করার পর বিগত লক্ষাধিক বছরে মানুষের জীবনযাত্রা কেমন থেকেছে তা জানার কৌতূহল জাগা একান্তই স্বাভাবিক। এই বিপুল সময়টা নিশ্চয়ই নিষ্ফলা যায় নি। মানুষের বিরাট বিরাট সাফল্যগুলোই প্রমাণ করে দেয় এই বিপুল সময়টা কত ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পেরেছে, আর সেই সঙ্গেই বোঝা যায় এক একটা সাফল্য অর্জনের জন্য ব্যয় হয়ে গেছে কি বিপুল সময়। মানুষ যে যথেষ্ট সাম্প্রতিককালে সভ্যতার যুগে এসে পৌঁছেছে—এই ঘটনাটা থেকেই বোঝা যায় মানুষের অগ্রগতির পথ কত দুরূহ ছিল, আর সেইসঙ্গেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মানুষের পথচলা শুরু হয়েছিল অনেক নিচের স্তর থেকে।

এতক্ষণ ধরে আমরা যে পর্যায়ক্রমের কথা বললাম, প্রয়োজনে তার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে উঠতে পারে, এমনকি এর কয়েকটি ধাপকেও যে ধারণার কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তা যে মানুষের অভিজ্ঞতা (যতদূর আমাদের জানা আছে) এবং মানুষের অগ্রগতির গতিপথ সম্বন্ধে একটা যথেষ্ট যুক্তিসম্মত ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হাজির করতে সক্ষম হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

টীকা—মিঃ জে. এফ. ম্যাকলেনান এর গ্রন্থ "প্রিমিটিভ্ ম্যারেজ"।

এই বইয়ের ছাপার কাজ চলার সময় উপরোক্ত গ্রন্থটির একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ আমার হাতে আসে। এই সংস্করণটি তাঁর মূল গ্রন্থেরই পুনর্মুদ্রণ, শুধু কয়েকটি প্রবন্ধ এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম: "স্টাডিজ ইন এনসিয়েণ্ট হিস্ট্রি কম্প্রাইজিং এ রিপ্রিণ্ট অফ প্রিমিটিভ ম্যারেজ" (Studies in Ancient History Comprising a reprint of Primitive Marriage)।

নতুনভাবে সংযোজিত "সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করার জন্য পুরো একটা অধ্যায় (৪১ পৃষ্ঠা) ব্যয় করেছেন মিঃ ম্যাক্লেনান। আরেকটি অধ্যায়ে (৩৬ পৃষ্ঠা) রেখেছেন এই ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা। আমার যে ব্যাখ্যাকে তিনি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন, সেই ব্যাখ্যাটা রয়েছে আমার "সিস্টেম্স্ অফ কন্স্যাঙ্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৪৭৯-৪৮৬)। মূলত সেই একই তথ্য এবং ব্যাখ্যাই এই বইয়ের পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে (তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে, আর "সিস্টেম্স্ অফ কন্স্যাঙ্গুইনিটি" ১৮৭১ সালে।

জ্ঞাতিত্বের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করে বিভিন্ন সারণীর সাহায্যে আমি এই ব্যবস্থার উদ্ভবের ব্যাপারে একটা প্রকল্প উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি। সত্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে প্রকল্প যে একটা প্রয়োজনীয় এবং

প্রায়শঃই অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার পূর্বোক্ত গ্রন্থে যে দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করেছি এবং এই গ্রন্থে যা আবার বলেছি, তার সঠিকতা-বেঠিকতা নির্ভর করছে এ ব্যাপারের যাবতীয় তথ্যকে এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় কি যায় না—তার ওপর। আরও কার্যকরী কোন সমাধান খুঁজে না-পাওয়া পর্যন্ত আমার রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগটা একান্তই সঙ্গত এবং বিজ্ঞান-সম্মত অনুসন্ধান-পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণই থেকে যাবে।

আমার এই প্রকল্পের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান। তাঁর সিদ্ধান্ত হল (স্টাডিজ, পৃঃ ৩৭১): "উল্লিখিত সমাধান নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি যতটা জায়গা দিয়েছি, ততটা গুরুত্ব হয়ত ঐ সমাধান দাবী করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু মিঃ মর্গ্যানের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে স্মিথ্‌সোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের ছাপাখানা থেকে এবং রচনার কাজে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সাহায্য করেছেন, সেহেতু প্রায়শঃই এই গ্রন্থটিকে একটি প্রামাণিক রচনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাই এর পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক চরিত্রটা উন্মোচিত করে দেওয়াটা আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছি।" তাঁর এই বক্তব্য শুধু আমার প্রকল্পটাকেই অবৈজ্ঞানিক হিসেবে চিহ্নিত করছে না, গোটা বইটাই এই অভিযোগের আওতায় এসে পড়ছে।

আমার ঐ বইতে ১৮৭ পৃষ্ঠা জুড়ে "জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার সারণী" দেওয়া আছে, যাতে মোট ১৩৯-টা গোষ্ঠী আর জাতির অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির চার-পঞ্চমাংশের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সম্পর্কের মধ্যে থেকে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো (বিশেষত সারণীর আকারে প্রদত্ত হলে) যে কি করে "পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক চরিত্রের" হয়—বোঝা মুশকিল। গোটা বইটা জুড়ে আমি এইসব জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বিভিন্ন নীরস দিকগুলো নিয়েই আলোচনা করেছি। বইয়ের একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে, মোট ৫৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র ৪৩ পৃষ্ঠা জুড়ে, বিভিন্ন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করেছি, আর সেখানেই এসেছে ঐ সমাধান বা প্রকল্পের বিষয়টা। ঐ জায়গাটা ছিল বেশ কিছু নতুন তথ্য নিয়ে প্রথম আলোচনা। মিঃ ম্যাক্‌লেনান যদি তাঁর বক্তব্য শুধু ঐ পরিচ্ছেদটিতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলে তা নিয়ে এখানে আলোচনা করার কোন দরকার হত না। কিন্তু তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল আমার প্রদত্ত সারণীগুলো। এইসব সারণীতে উপস্থাপিত ব্যবস্থাগুলো যে আসলে জ্ঞাতিত্ব বা আত্মীয়তার ব্যবস্থা, আর তাই এগুলোই হচ্ছে বিষয়টির বনিয়াদস্বরূপ[১] এটাই তিনি অস্বীকার করেছেন।

আসলে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের উপরোক্ত মন্তব্য অকারণ নয়। ঐ সব সারণী থেকে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার যে ব্যবস্থাগুলো মূর্ত হয়ে ওঠে, সেগুলো তাঁর "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রধান অভিমত এবং প্রধান প্রধান অভিমত এবং প্রধান প্রধান তত্ত্বের বিরোধী তো বটেই, এমনকি সেগুলো ঐ-সব অভিমত আর তত্ত্বকে ভুল বলেও প্রতিপন্ন

১। "তবে, এই অনুসন্ধানের 'প্রধান ফসল' হচ্ছে 'সারণীগুলো'-ই। এগুলোর মর্মবস্তুকে আজ পর্যন্ত যেটুকু ব্যবহার করা হয়েছে, তার থেকে এগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।"—"সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি," স্মিথ্‌সনিয়ান কন্‌ট্রিবিউশন্‌স্ টু নলেজ, খণ্ড ১৭, পৃঃ ৮.

করে। এই অবস্থায় "প্রিমিটিভ ম্যারেজ"-এর লেখক যে নিজের পূর্বধারণাকেই সমর্থন করতে চাইবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি।

যেমন, জ্ঞাতিব্যবস্থা হিসেবে এগুলো (১) দেখিয়ে দেয় যে মিঃ ম্যাকলেনান কর্তৃক উদ্ভাবিত "বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ" (Exogamy and Endogamy) নামক নতুন অভিধা দুটির উপযোগিতা মোটেই প্রশ্নাতীত নয় : "প্রিমিটিফ ম্যারেজ" গ্রন্থে এই অভিধা দুটিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে এগুলোর অর্থ একেবারে বিপরীত তাৎপর্য পেয়েছে ; তাছাড়া, ঐ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে "অন্তর্বিবাহে"-র প্রায় কোন সম্পর্কই নেই আর "বহির্বিবাহ" হচ্ছে গোত্রের একটা রীতি মাত্র এবং ব্যাপারটাকে সেভাবেই বিবৃত করা উচিত। (২) একই গোষ্ঠীর মধ্যে স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের পাশাপাশি পুরুষ-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ও যে বরাবরই চালু ছিল, এটা দেখিয়ে দিয়ে ঐ সারণীগুলো মিঃ ম্যাক্‌লেনান কথিত "শুধুমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুযায়ীই জ্ঞাতিত্ব নির্ণয় করা হত"—এই বক্তব্যকে খণ্ডন করেছে। (৩) ঐ সারণী-গুলো থেকে বোঝা যায় যে নায়ার ও তিব্বতীদের মধ্যে নারীদের বহুবিবাহের যে রীতি চালু ছিল, তা পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই চালু ছিল বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। (৪) "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে "স্ত্রী চুরি"-র যে প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতার কথা বলা হয়েছে, ঐ সারণীগুলো তাকেও নাকচ করে দেয়।

যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মিঃ ম্যাক্‌লেনান তাঁর আক্রমণ শানিয়েছেন, সেই ভিত্তিকে পর্যালোচনা করে দেখলে তাঁর সমালোচনা তো খারিজ হয়ে যায়ই, সেই সঙ্গেই যে-সব তত্ত্ব তাঁর সমালোচনার বনিয়াদ হিসাবে কাজ করেছে সেগুলোর অপ্রতুলতাটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে পর্যালোচনা করতে বসলে এমন সব সিদ্ধান্তের মুখোমুখী হই আমরা যা তাঁর গ্রন্থের সামগ্রিক বক্তব্যটাকেই নড়বড়ে করে দেয়। নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্য-গুলো নিয়ে আলোচনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই প্রতিপাদ্যগুলো হচ্ছে ঃ

ক) "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে প্রযুক্ত প্রধান প্রধান অভিধা এবং তত্ত্বগুলোর কোন মূল্যই নেই জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে।

খ) সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনান যে প্রকল্পটি হাজির করেছেন, তা দিয়ে ঐ ব্যবস্থার উদ্ভবকে আদৌ ব্যাখ্যা করা যায় না।

গ) "সিস্টেম্‌স অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি" গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রকল্পটির বিরুদ্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের বক্তব্য একেবারের অন্তঃসারশূন্য।

এবার এই প্রতিপাদ্যগুলো নিয়ে একে একে আলোচনা করা যাক।

ক) "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে প্রযুক্ত প্রধান প্রধান অভিধা এবং তত্ত্বগুলোর কোন মূল্যই নেই জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে।

এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর জাতিতত্ত্ববিদরা গ্রন্থটির বেশ প্রশংসা করেছিলেন, কেন না এই দূরকল্পী রচনাটিতে এমন কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছিল যেগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন জাতিতত্ত্ববিদরা। তবে সতর্কভাবে গ্রন্থটি পড়ার পর এর বিভিন্ন সংজ্ঞার দুর্বলতা, বিভিন্ন অনাবশ্যক অনুমান, কাঁচা দূরকল্পনা এবং

প্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিঃ হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর "প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌ অফ সোশিওলজি" (অ্যাডভান্স শিটস, পপুলার সায়েন্স মান্থলি, জানুয়ারি ১৮৭৭, পৃঃ ২৭২) প্রবন্ধে এ-রকম কিছু দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। সেইসঙ্গেই তিনি "নারী-শিশু হত্যা", "স্ত্রী চুরি" এবং "বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ" সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের তত্ত্বের ব্যাপক অংশটাকেই খারিজ করে দিয়েছেন। এর পরেও শুধু কিছু জাতি-তাত্ত্বিক বিষয়ের একত্র সমাবেশ ছাড়া ঐ বইটির আর কোন মূল্য থাকে কি?

এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই যথেষ্ট।

১. মিঃ ম্যাক্‌লেনান কর্তৃক "বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ" অভিধা দুটির ব্যবহার।

"বহির্বিবাহ" ও "অন্তর্বিবাহ" অভিধা দুটি তিনিই উদ্ভাবন করেছেন। যথাক্রমে এ দুটির অর্থ হল বিশেষ একদল লোকের "বাইরে কাউকে বিবাহ করা"-র বাধ্যবাধকতা এবং বিশেষ একদল লোকের "মধ্যে কাউকে বিবাহ করা"-র বাধ্যবাধকতা।

যে-সব লেখকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান, তাঁদের লেখার সূত্রে নানা সংগঠিত দলগুলোর ক্ষেত্রে এই অভিধাগুলোকে তিনি এত যথেচ্ছ ও অনির্দিষ্টভাবে যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন যে তাঁর অভিধা ও সিদ্ধান্ত—দুই-ই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। একটা সাংগঠনিক ক্রমমালার বিভিন্ন স্তর হিসেবে গোত্র ও গোষ্ঠীর মধ্যে, অথবা এই জাতীয় দলগুলোর মধ্যে, পার্থক্যটা কোথায়—তা চিহ্নিত না করাটা "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থের একটা প্রধান গলদ। এইভাবে চিহ্নিত না করার দরুন কোন্‌ কোন্‌ দলগুলোর ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ" বা "অন্তর্বিবাহে"-র কথা বলা হচ্ছে, তা বোঝার কোন উপায় থাকে না। যেমন, কোন গোষ্ঠীর আটটা গোত্রের মধ্যে একটা গোত্র নিজেদের গোত্রের ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ" চালু রেখে অন্য সাতটা গোত্রের সঙ্গে "অন্তর্বিবাহে"-র সম্বন্ধে বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া, এরকম ক্ষেত্রে এইসব অভিধাকে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করা হলে তা আমাদের মধ্যে ভুল ধারণারই জন্ম দেয়। মিঃ ম্যাক্‌লেনান সম্ভবত দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথাই বলতে চেয়েছেন, যে নীতি দুটো মানুষের ইতিহাসের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী দুটো পৃথক পৃথক সামাজিক অবস্থার প্রতিভূ-স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে সমাজের যে অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে "অন্তর্বিবাহে"-র প্রায় কোন সম্পর্কই নেই; আর "বহির্বিবাহ" হচ্ছে গোত্রের অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের বা সমাজ সংগঠনের প্রাথমিক এককের একটা বিশেষ নিয়ম বা আইন। মানুষের ইতিহাসে গোত্রের প্রভাব অসীম আর এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। গোত্রের কার্যকলাপ, গুণাগুণ, গোত্রের সদস্যদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধে এবং বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। কিন্তু এইসব বস্তুগত দিক নিয়ে মিঃ ম্যাক্‌লেনান কোন আলোচনাই করেন নি। আর গোত্রই যে প্রাচীন সমাজকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করত, সে ব্যাপারেও তাঁর কোন ধারণা আছে বলে মনে হয় না। গোত্রের অন্যতম দুটো নিয়ম ছিল: (১) গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ (intermarriage) নিষিদ্ধ। এই নিয়মটাই হচ্ছে মিঃ ম্যাক্‌লেনান কথিত সেই "বহির্বিবাহ" (exogamy)—যা সর্বদাই গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, অথচ তিনি গোত্রের কথা আদৌ উল্লেখ না করেই এই নিয়মের কথা বলেছেন। (২) প্রাচীন ধরনের গোত্রে বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুসারে, যাকে

মিঃ ম্যাক্‌লেনান বলেছেন "শুধুমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুসারে জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়" এবং এক্ষেত্রেও তিনি গোত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি।

বিষয়টাকে আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থার এবং গোষ্ঠীর সাতটি সংজ্ঞা দিয়েছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান (স্টাডিজ, পৃঃ ১১৩-১১৫)।

"**পুরোপুরি বহির্বিবাহ**—১। গোষ্ঠীগত (অথবা পরিবারগত) ব্যবস্থা—প্রতিটি গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য একই বংশের লোক, অথবা সেভাবেই নিজেদেরকে দেখাতে চায় তারা। একই গোষ্ঠীর নারী-পুরুষরা পরস্পরকে বিবাহ করতে পারে না।

"২। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা—গোষ্ঠী হচ্ছে বেশ কিছু পরিবারের সমষ্টি, যার মধ্যে কুল, গোত্র প্রভৃতি নানান বিভাগ থাকে। একই বিভাগের নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ হয় না, কিন্তু এক বিভাগের সঙ্গে অন্য যে-কোন বিভাগের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

"৩। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা—গোষ্ঠী হচ্ছে বেশ কিছু পরিবারের সমষ্টি।…একই পদবীবিশিষ্ট অর্থাৎ একই বংশের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না।

"৪। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা—গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ থাকে। একই বিভাগের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ঃ কয়েকটি বিভাগের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অর্থাৎ একটি বিভাগের সদস্যরা অন্য বিভাগের কারুকে বিবাহ করতে পারে। আবার একটি বিভাগের সঙ্গে অন্য কয়েকটি বিভাগের আংশিক বৈবাহিক সম্পর্ক থাকে।…

"৫। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা—গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ থাকে। একই বংশের সদস্যদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রতিটি বিভাগের পরস্পরের মধ্যে এবং অন্য কয়েকটি বিভাগের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকে। কয়েকটি বিভাগের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা একেবারেই নিষিদ্ধ। জাতিভেদ (caste)।

"**পুরোপুরি অন্তর্বিবাহ**—৬। গোষ্ঠীগত (অথবা পারিবারিক) ব্যবস্থা—প্রতিটি গোষ্ঠী পরস্পরের থেকে পৃথক। প্রতিটি গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য একই বংশের লোক, অথবা সেভাবেই নিজেদেরকে দেখাতে চায় তারা। বিবাহ হয় গোষ্ঠীর মধ্যেই। গোষ্ঠীর বাইরের কারুকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

"৭। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট।"

সাত সাতটা সংজ্ঞা! এতগুলো সংজ্ঞার সাহায্যে গোষ্ঠী নামক দলটার নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট-ভাবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়া উচিত!

তবে, প্রথম সংজ্ঞাটা নেহাতই একটা ধাঁধা মাত্র! গোষ্ঠীগত ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকে বলা হয়েছে, অথচ এই গোষ্ঠী-সমষ্টির জন্য কোন অভিধা ব্যবহার করা হয় নি। অর্থাৎ এই গোষ্ঠীগুলোর সম্মিলনের ফলে যে একটা ঐক্যবদ্ধ সংস্থা গড়ে ওঠে, এটা তিনি মনে করছেন না। সেক্ষেত্রে, আলাদা গোষ্ঠীগুলো কি করে একটা গোষ্ঠীগত ব্যবস্থার আওতায় আসে বা কিভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে—বোঝা দুষ্কর। গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য একই বংশের লোক অথবা নিজেদেরকে সেইরকমই দেখাতে চায় তারা, এবং সেই জন্য একই গোষ্ঠীর নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এ থেকে হয়ত গোত্রের প্রশ্নটা উঠে আসতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত গোত্রের থেকে আলাদা হয়ে

একটা গোত্র টিকে রয়েছে—এমনটা কখনোই দেখা যায় না। বিভিন্ন গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা যে-কোন গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দরুণ বেশ কিছু গোত্র পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু এখানে গোত্রের সমতুল হিসেবে গোষ্ঠী শব্দটা কিংবা বেশ কিছু পরিবারের সমষ্টি কথাটা মিঃ ম্যাক্লেনান ব্যবহার করতে পারেন না। একটা গোষ্ঠীগত ব্যবস্থার মধ্যে জ্ঞাতিদের পৃথক পৃথক দলগুলো একসঙ্গে বসবাস করে—বলছেন তিনি (কিন্তু সেই দলগুলোকে চিহ্নিত করছেন না আর ব্যবস্থাটারও কোন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না)। এর ফলে আমরা একেবারে অচেনা একটা বিষয়ের মুখোমুখী হচ্ছি। ৬-নং সংজ্ঞাটাও তথৈবচ। এই দুটো সংজ্ঞার কোন একটার সঙ্গেও মিল আছে—এমন কোন গোষ্ঠী পৃথিবীর কোথাও কোন সময়েই থাকতে পারে না। কারণ এইসব সংজ্ঞায় বর্ণিত কাঠামোটা না কোন গোত্রের, না কিছু গোত্র নিয়ে গঠিত কোন গোষ্ঠীর, আর না বিভিন্ন গোষ্ঠীর একাঙ্গীভবনের ফলে গড়ে ওঠা কোন জাতির।

২, ৩, ৪ এবং ৫-নং সংজ্ঞাগুলো বরং কিছুটা বোধ্য। এগুলোতে কিছু গোত্রের সমন্বয়ে অথবা জ্ঞাতিত্বভিত্তিক কিছু বিভাগের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটাকে গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা না বলে গোত্রগত ব্যবস্থাই বলা উচিত। একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত কুল, গোত্র বা বিভাগ-গুলোর মধ্যে বিবাহ হওয়া যেহেতু নিষিদ্ধ নয়, সেহেতু এ-সব ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে "বহির্বিবাহ" চালু আছে বলাটাও যুক্তি-সঙ্গত নয়। একটা কুল, গোত্র বা বিভাগ তার নিজের ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ"-ই অনুসরণ করে, কিন্তু অন্য সমস্ত কুল, গোত্র বা বিভাগের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা "অন্তর্বিবাহ-মূলক।" কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু কিছু বাধানিষেধ থাকে।

মিঃ ম্যাক্লেনান যখন কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ" কিংবা "অন্তর্বিবাহ" অভিধা-গুলো ব্যবহার করেন, তখন সেই গোষ্ঠীটা একটা গোষ্ঠীগত ব্যবস্থার (এর অর্থ যা-ই হোক না কেন) অন্তর্গত বিভিন্ন পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর অন্যতম, নাকি এমন কোন গোষ্ঠী যাকে তিনি বেশ কিছু পরিবারের সমষ্টি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—তা বোঝা যাবে কী করে? পরের পৃষ্ঠায় (পৃঃ ১১৬) তিনি বলছেন: "বহির্বিবাহ-অনুসারী পৃথক পৃথক গোষ্ঠীও অসংখ্য দেখা যায় এবং কোন কোন ব্যাপারে এরা প্রথমোক্তদের মতই অমার্জিত ধরনের হয়ে থাকে।" এখানে গোষ্ঠী বলতে যদি তিনি কিছু পরিবারের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকেন, যা আসলে কিছু গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীকেই বোঝায়, তাহলে সেই গোষ্ঠীকে কখনোই "বহির্বিবাহ-অনুসারী" বলা যায় না। পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় কিছু গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা কোন গোষ্ঠীর মধ্যে "বহির্বিবাহ" চালু থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই এবং থাকতেও পারে না। যেখানেই গোত্রীয় সংগঠন দেখা গেছে, সেখানেই একই গোত্রের নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। মিঃ ম্যাক্লেনান কথিত "বহির্বিবাহে"-র অন্তর্বস্তুটা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু কোন একটা গোত্রের নারী-পুরুষদের সঙ্গে সেই গোষ্ঠীর অন্যান্য গোত্র-গুলোর পুরুষ-নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না। গোত্র হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" আর গোষ্ঠী অপরিহার্যভাবেই "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।" এ-সব ক্ষেত্রে, এবং সম্ভবত সব ক্ষেত্রেই, প্রথমে জানা দরকার গোষ্ঠী বলতে ঠিক কোন্ দলটার কথা বলা

হচ্ছে। আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক (পৃঃ ৪২); "যদি দেখানো যায়, প্রথমত, যে বহির্বিবাহ-অনুসারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে বা ছিল, এবং দ্বিতীয়ত, প্রাচীন আমলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সবসময়ই বা প্রায় সবসময়ই শত্রুতামূলক সম্পর্ক থাকত, তাহলে আমরা এমন একটা অবস্থার মুখোমুখী হই যেখানে স্ত্রী পাওয়ার জন্য নারীদের বন্দিনী করে নিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।" এটাই হচ্ছে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের স্ত্রী-চুরি সংক্রান্ত তত্ত্বের সূচনাবিন্দু। এখানে যে "অবস্থা"-র (অর্থাৎ, শত্রুভাবাপন্ন এবং সেহেতু পৃথক পৃথক গোষ্ঠী) কথা বলা হচ্ছে, তা গোষ্ঠী বলতে নিশ্চয়ই একটা বৃহত্তর দলকে অর্থাৎ কিছু গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীকেই বোঝাচ্ছে। কেননা কোন গোষ্ঠীর বিভিন্ন গোত্রের প্রত্যেকটা পরিবার বিবাহ মারফৎ পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং ঐ গোষ্ঠী কর্তৃক অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলটা জুড়েই এই মিশ্রণ ঘটে থাকে। হয় সমস্ত গোত্রগুলোই পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হবে, অথবা কারুর সঙ্গেই কারুর শত্রুতা থাকবে না। কথাটা যদি ক্ষুদ্রতর দল অর্থাৎ গোত্র সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় গোত্র হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" এবং এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সাত-অষ্টমাংশ হচ্ছে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।" তাহলে স্ত্রী-চুরি করার "অবস্থা"-টা আসছে কোথা থেকে ?

"বহির্বিবাহ"-এর প্রমাণ দেওয়ার জন্য "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু গোষ্ঠী, যেমন খোন্দ, কল্‌মাক্‌, সার্কাসিয়ান, ইয়ুরাক, সাময়েড প্রভৃতি গোষ্ঠীর এবং ইরোকোয়া সহ আমেরিকার কিছু ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর উদাহরণ উল্লিখিত হয়েছে (পৃঃ ৭৫-১০০)। আমেরিকার গোষ্ঠীগুলো সাধারণত কয়েকটা গোত্র নিয়েই গড়ে ওঠে। কোন পুরুষ তার নিজের গোত্রের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না, কিন্তু নিজের গোষ্ঠীর অন্য কোন গোত্রের কোন নারীকে সে বিবাহ করতেই পারে। যেমন, ইরোকোয়াদের সেনেকা গোষ্ঠীর নেকড়ে গোত্রের কোন পুরুষ ঐ গোত্রের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না। ইরোকোয়াদের বাকি পাঁচটা গোষ্ঠীর মধ্যেও একই নিয়ম চালু আছে। এই হচ্ছে মিঃ ম্যাক্‌লেনান কথিত সেই "বহির্বিবাহ", তবে এই নিয়মটা শুধু নিজের গোত্রের মধ্যেই সীমিত থাকে। নেকড়ে গোত্রের ঐ পুরুষটি সেনেকা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বাকি সাতটা গোত্রের যে-কোন নারীকে বিবাহ করতেই পারে। এই হচ্ছে গোষ্ঠীর মধ্যেকার "অন্তর্বিবাহ", নেকড়ে গোত্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে সেনেকা গোস্ঠীর অন্তর্গত বাকি সাতটা গোত্রের। একই গোষ্ঠীর মধ্যে একই সময়ে দুটো প্রথাই চালু থাকে এবং এভাবেই চালু থেকেছে স্মরণাতীত কাল থেকে। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রেও মোটামুটি একই কথা প্রযোজ্য। তাসত্ত্বেও মিঃ ম্যাক্‌লেনান এদেরকে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোষ্ঠী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং এটাকেই নিজের তত্ত্বের বনিয়াদ করে তুলতে চেয়েছেন।

উপরোক্ত ক্ষেত্রটাতে মিঃ ম্যাক্‌লেনান সম্ভবত "অন্তর্বিবাহ" কথাটা ব্যবহার করতে চাইবেন না। কারণ, প্রথমত, "বহির্বিবাহ" ও "অন্তর্বিবাহ" এখানে তাঁর ধারণা মত দুটো পরস্পরবিরোধী নীতিকে তুলে ধরছে না ; এবং দ্বিতীয়ত, এখানে প্রকৃতপক্ষে একটা কথাই শুধু স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে একই গোত্রের নারী ও পুরুষদের মধ্যে বিবাহ

নিষিদ্ধ। সাধারণত আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের গোষ্ঠীর কাউকে অথবা বাইরের কোন গোষ্ঠীর কাউকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু নিজেদের গোত্রের কাউকে বিবাহ করতে পারে না। "অন্তর্বিবাহ"-এর একটা সঠিক উদাহরণ দিতে পেরেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান। এই ঘটনাটা দেখা যায় মাণ্ডু তাতারদের মধ্যে (পৃঃ ১১৬), "যারা ভিন্ন ভিন্ন পদবীবিশিষ্ট নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে।" আজকের দিনের কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যেও এই নিয়ম চালু আছে।

সাইবেরিয়ার ইয়ুরাক সাময়েড (৮২), নেপালের মাগার (৮৩), ভারতবর্ষের মণিপুরী, কুপুরী, মো, মুরাম এবং মুরিং (৮৭) প্রভৃতি গোষ্ঠীর সংগঠনকে যদি প্রকৃত তথ্যের আলোয় বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে খুব সম্ভবত দেখা যাবে যে ইরোকোয়া গোষ্ঠী-গুলোর সংগঠনের সঙ্গে এদের সংগঠনের কোন তফাৎ নেই। এদের বিভিন্ন "বিভাগ" আর "শাখা" (thum) আসলে গোত্রই। সাময়েডদের ইয়ুরাক বা কাসোভো বিভাগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ ক্র্যাপ্‌রথকে উদ্ধৃত করে ল্যাথাম্‌ লিখেছেন; "জ্ঞাতিত্বের এই বিভাগগুলোকে খুব কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। কোন সাময়েড পুরুষ তার নিজের বিভাগের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না। তাকে স্ত্রী সংগ্রহ করতে হয় অন্য দুটো বিভাগের কোন একটা থেকে।"[১] মাগারদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লাথাম লিখছেন; "এদের মধ্যে বারোটা শাখা (thum) আছে। একই শাখার অন্তর্গত সমস্ত লোককে একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলে ধরে নেওয়া হয়, মায়ের দিক থেকে বংশধারা নির্ণয় করা মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। তাই স্বামী ও স্ত্রীকে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন শাখার সদস্য হতে হয়। একই শাখার নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না। স্ত্রী চাই? তাহলে পাশের শাখায় খোঁজ কর। মোদ্দা কথা, নিজের শাখার বাইরে স্ত্রী খুঁজতে হবে। এই প্রথাটার কথা আমি এই প্রথম উল্লেখ করলাম। কিন্তু এটাই শেষ দৃষ্টান্ত নয়। এই নিয়মটা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চালু আছে।"[২] ভারতবর্ষের মুরিং ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগ দেখা যায়, এবং এদের মধ্যেও বিবাহের ব্যাপারে একই নিয়ম কার্যকরী। খুব সম্ভবত এগুলো হচ্ছে গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত বিভিন্ন গোষ্ঠী, যাদের নিয়মে নিজের গোত্রের কাউকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। প্রতিটি গোত্র তার নিজের ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" এবং ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য গোত্রগুলোর ক্ষেত্রে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।" তথাপি মিঃ ম্যাক্‌লেনান এদেরকে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলোও গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত এবং এদের মধ্যেও নিজের গোত্রের কাউকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রেও গোত্র হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" আর গোষ্ঠী হচ্ছে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।"

যেখানে গোত্র তার নিজের ব্যাপারে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" আর গোষ্ঠীর অন্যান্য গোত্রগুলোর ব্যাপারে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী", সেখানে মাত্র একটা বিষয়কে অর্থাৎ একই গোত্রের নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ—এই ব্যাপারটাকে চিহ্নিত করার

১। "ডেসক্রিপ্‌টিভ এথ্‌নোলজি", লণ্ডন সংস্করণ, ১৮৫৯, i, ৪৭৫.

২। ঐ, i, ৮০.

জন্য একজোড়া অভিধা খাড়া করার দরকারটা কী? অভিধা দুটোকে এমনভাবে হাজির করা হয়েছে যেন এগুলো সমাজের দুটো বিপরীত অবস্থাকেই মূর্ত করে তোলে। কিন্তু সে অর্থে এই "বহির্বিবাহ' আর "অন্তর্বিবাহ" অভিধা দুটোর কোন মূল্যই নেই। আমেরিকার জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এবং সম্ভবত এশিয়া ও ইওরোপের জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এগুলো নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। "বহির্বিবাহ" অভিধাটা শুধুমাত্র একটা ছোট দল অর্থাৎ গোত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। তাই এই অভিধাটাকে আলাদা করে শুধু গোত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তা মেনে নেওয়া যায়। সারা আমেরিকায় কোন "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোষ্ঠী নেই, কিন্তু "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোত্র আছে অজস্র। গোত্র থাকলে গোত্রের কিছু নিয়ম-কানুনও থাকবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সেগুলো গোত্রের নিজস্ব নিয়ম। মি: ম্যাক্‌লেনানের মতে কুল, শাখা, বিভাগ এগুলো হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" আর এইসব কুল, শাখা, বিভাগের সমষ্টিটা হচ্ছে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।" অথচ "অন্তর্বিবাহ" সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। এমনকি তিনি এ-ও বলেন নি যে ঐ কুল, শাখা, বিভাগ ইত্যাদি "বহির্বিবাহ-অনুসারী", বরং বলেছেন যে গোষ্ঠীই হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী।" আপাতভাবে মনে হতে পারে যে কুল, শাখা, বিভাগ ইত্যাদির সমতুল হিসেবেই তিনি গোষ্ঠী শব্দটা ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কিন্তু না। তিনি বলছেন, "গোষ্ঠী হচ্ছে কিছু পরিবারের সমষ্টি, যার মধ্যে থাকে নানান বিভাগ, কুল, শাখা ইত্যাদি" (১১৪)। আবার বলছেন (১১৬), "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী পৃথক পৃথক গোষ্ঠীগুলো বহির্বিবাহ-অনুসারী পৃথক পৃথক গোষ্ঠীগুলোর মতই সংখ্যায় অজস্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মতই অমার্জিতও বটে।" তাঁর প্রধান প্রধান সংজ্ঞাগুলোকে বিচার করে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এই গ্রন্থে মিঃ ম্যাক্‌লেনান "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোষ্ঠীর একটা দৃষ্টান্তও হাজির করতে পারেন নি।

এই অভিধা দুটো সম্বন্ধে আরেকটা আপত্তিও উঠতে বাধ্য। দুটো পরস্পর-বিপরীত এবং বিসদৃশ সামাজিক অবস্থাকে চিহ্নিত করার জন্য এই অভিধা দুটো আমদানী করা হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, ঐ দুটো অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা পিছিয়ে থাকা এবং কোন্‌টাই বা অগ্রগতির দ্যোতক? মিঃ ম্যাক্‌লেনান এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। "এগুলো দিয়ে বহির্বিবাহ থেকে অন্তর্বিবাহে উন্নত হওয়া কিংবা অন্তর্বিবাহ থেকে বহির্বিবাহে উন্নত হওয়া—দুটোই বোঝানো যেতে পারে" (১১৫); "দুটোই সমান প্রাচীন হতে পারে" (১১৬); এবং, "কোন কোন ব্যাপারে দুটোই" সমান অমার্জিত (১১৬)। কিন্তু আলোচনার শেষদিকে তিনি "অন্তর্বিবাহ"-কেই উচ্চতর আসন দিয়েছেন বলেছেন, এটাই হচ্ছে সভ্যতামুখী পদক্ষেপ, আর "বহির্বিবাহ" পরিণত হয়েছে বন্যতার লক্ষণে। মিঃ ম্যাক্‌লেনানের ভাবনা অনুযায়ী "বহির্বিবাহ"-কে বিভিন্নধর্মীতার দ্যোতক হিসেবে দেখানো আর তার বিপরীতে "অন্তর্বিবাহ"-কে সমধর্মীতার দ্যোতক হিসেবে দেখানোটাই সুবিধেজনক। তাই শেষ পর্যন্ত "বহির্বিবাহ"-এর তুলনায় "অন্তর্বিবাহ"-কেই অগ্রগতির সহায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি।

এই অভিধা দুটোর অন্তর্বস্তুকে ঠিক উল্টো করে দেখাটা হচ্ছে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের অন্যতম ত্রুটি। যাকে তিনি "অন্তর্বিবাহ" বলেছেন, মানবপ্রগতির পরম্পরায় তা

"বহির্বিবাহ"-এর থেকে আগেকার ব্যাপার এবং বস্তুতপক্ষে এটা ছিল মানবজাতির একেবারে নিম্নতম স্তরের ঘটনা। গোত্র গড়ে ওঠার আগের যে পর্যায়ে মালয়ী জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেই পর্যায়ে আমরা ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ হওয়ার কথা জানতে পারি। ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা থেকেই এই তথ্যটা জানা যায়, সেইসঙ্গেই বোঝা যায় ভাইবোন বিবাহভিত্তিক দলগুলোর প্রকৃতি কেমন ছিল, আর এর মধ্যেই ফুটে ওঠে "অন্তর্বিবাহ"-এর আদি রূপটা। এর পর "অন্তর্বিবাহ" প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় দলগত বিবাহের স্তরে এসে। এই স্তরে আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ চালু থাকে (এদেরকে তখনও ভাইবোনই বলা হত)। অস্ট্রেলিয়দের লিঙ্গভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা চোখে পড়ে। অগ্রগতির গতিপথে এরপর আবির্ভাব হয় গোত্রের, বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত হতে থাকে স্ত্রী-ধারা এবং একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সূচনা হয় মিঃ ম্যাকলেনান কথিত "বহির্বিবাহ"-এর। এর পর থেকে মানবজাতির জীবনে "অন্তর্বিবাহ" আর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

মিঃ ম্যাকলেনানের মতে, অগ্রসর জাতিগুলোর মধ্যে "বহির্বিবাহ" কমে যেতে শুরু করেছিল এবং বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারা চালু হওয়ার পর গ্রীক ও রোমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায় (পৃঃ ২২০)। বাস্তবে কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ এ-রকম ঘটেনি। যাকে তিনি "বহির্বিবাহ" বলছেন, তার উদ্ভব হয় বন্যতার যুগে গোত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, বর্বর যুগের সমগ্র পর্যায়টা জুড়ে তা টিকে থাকে এবং এই সভ্যতার যুগেও সেই রীতি চালু আছে। আজকের দিনের ইরোকোয়া গোত্রগুলোর মধ্যে এই রীতিটা যেমন পূর্ণ মাত্রায় চালু আছে, ঠিক তেমনি পূর্ণ মাত্রাতেই তা চালু ছিল সোলোন ও সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলের গ্রীক আর রোমানদের মধ্যেও। "বহির্বিবাহ" ও "অন্তর্বিবাহ" অভিধা দুটোকে "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে এগুলোর অর্থ পুরোপুরি বিকৃত হয়ে গেছে। তাই এখানে এগুলোকে অগ্রাহ্য করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

২। মিঃ ম্যাকলেনানের বক্তব্য ঃ "কেবলমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুসারেই জ্ঞাতিত্ব নির্ণয় করা হয়।"

"প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে এই বক্তব্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য হল—যে-সব জায়গায় এই রীতি চালু ছিল, সেইসব জায়গায় এটাই ছিল জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের একমাত্র রীতি। কথাটা কতখানি ভুল, তা এক নজরেই বোঝা যায়। তুরানিয়, গ্যানোয়ানিয় এবং মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের পাশাপাশি বরাবরই পুরুষ-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ও চালু ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাই ও বোন, পিতামহ / মাতামহ ও পিতামহী / মাতামহী, পৌত্র / দৌহিত্র ও পৌত্রী / দৌহিত্রী থাকত। অর্থাৎ স্ত্রী-ধারার মত পুরুষ-ধারা অনুসারেও জ্ঞাতিত্ব নির্ধারণ করা হত। সন্তানদের মায়ের পরিচয় নিশ্চিতভাবেই জানা যেত, কিন্তু তাদের বাবার পরিচয় সবসময় নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব ছিল না। এই অনিশ্চয়তার জন্য কিন্তু পুরুষ-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব

নির্ণয়টা বাতিল হয়ে যায় না, বরং এই সুযোগে জ্ঞাতির সংখ্যা কিছু বেড়েই যায় ও সম্ভাব্য পিতারা বিবেচিত হয় প্রকৃত পিতা হিসেবে, সম্ভাব্য ভাইরা গণ্য হয় প্রকৃত ভাই হিসেবে এবং সম্ভাব্য পুত্ররা গণ্য হয় প্রকৃত পুত্র হিসেবে।

গোত্র গড়ে ওঠার পর স্ত্রী-ধারা অনুসারী জ্ঞাতিত্বের গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে যায়। কারণ তখন থেকে স্ত্রী-ধারার জ্ঞাতিরা বিবেচিত হতে থাকে সগোত্রীয় জ্ঞাতি হিসেবে, বাকিরা পরিণত হয় ভিনগোত্রীয় জ্ঞাতিতে। মিঃ ম্যাক্‌লেনান যে-সব লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জ্ঞাতিত্বের কথাই বলেছেন। কোন গোত্রের নারী সদস্যাদের সন্তানরা ঐ গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হত, কিন্তু তার পুরুষ সদস্যদের সন্তানরা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত না। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা চালু থাকার সময় গোত্রের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কেবলমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুসারেই নিজের নিজের বংশপরিচয় নির্ধারণ করত আর পুরুষ-ধারা চালু থাকার সময় সকলেই বংশপরিচয় নির্ধারণ করত পুরুষ-ধারা অনুসারেই। গোত্রের সদস্যদের নিয়ে গড়ে উঠত জ্ঞাতিদের একটা সংগঠন এবং এরা প্রত্যেকে একই পদবী ধারণ করত। রক্তসম্বন্ধের বন্ধনে এবং পারস্পরিক অধিকার, সুযোগসুবিধে ও দায়দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকত এরা। উভয় ক্ষেত্রেই অন্যান্য জ্ঞাতিদের থেকে বেশি গুরুত্ব পেত সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা। অন্য কোন জ্ঞাতিদের স্বীকার করা হত না বলে যে এরা বেশি গুরুত্ব পেত, তা নয়। আসলে সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা ঐ গোত্রের বিভিন্ন অধিকার আর সুযোগসুবিধে এক সঙ্গে ভোগ করত বলেই গুরুত্বটা এরা বেশি পেত। এই পার্থক্যটা আবিষ্কারে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের ব্যর্থতা থেকেই বোঝা যায় নিজের গবেষণার বিষয়টা নিয়ে তিনি মোটেই পর্যাপ্ত অনুসন্ধান চালান নি। স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের নিজের গোত্রের মধ্যে থাকে তার মাতামহ ও মাতামহীরা, মায়েরা, ভাইবোনেরা, মামারা, ভাগ্নে-ভাগ্নীরা এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা। এদের মধ্যে কয়েকজন তার একেবারে আপন, আবার কেউ কেউ জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্পর্কিত। নিজের গোত্রের বাইরেও তার পিতামহ-পিতামহী, ভাইবোন, ভাইপো-ভাইঝি, পৌত্র-পৌত্রী থাকে (শুধু মামা থাকে না)। এছাড়া থাকে তার বাবারা, পিসিরা, পুত্র-কন্যারা, খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাই-বোনরা। একজন নারীরও নিজের গোত্রের মধ্যে একই জ্ঞাতিরা থাকে, সেইসঙ্গে থাকে তার পুত্রকন্যারা। গোত্রের বাইরেও তার একই জ্ঞাতিরা থাকে। নিজের গোত্রের মধ্যেই হোক আর বাইরেই হোক, ভাইকে ভাই হিসেবে, বাবাকে বাবা হিসেবে, পুত্রকে পুত্র হিসেবেই স্বীকৃতি দেওয়া হত, এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই সম্বোধনগুলো ব্যবহার করত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়, যাকে মিঃ ম্যাক্‌লেনান "কেবলমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়" বলতে চেয়েছেন, তা গোত্রের একটা নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপারটাকে এভাবেই বলা উচিত, কারণ গোত্রই হচ্ছে মুখ্য বিষয় আর সগোত্রীয় জ্ঞাতিত্বটা তার বিভিন্ন লক্ষণের অন্যতম মাত্র।

গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার আগে স্ত্রী-ধারা অনুসারে জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের রীতিটা নিশ্চয়ই পুরুষ-ধারা অনুসারে জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের থেকে অনেক বেশি জোরদার ছিল এবং মূলত এই ধরনের জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল নিম্নস্তরের গোষ্ঠীজাতীয়

দলগুলো। কিন্তু গোত্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে মানবজাতি কোন্ অবস্থায় ছিল, তার সঙ্গে "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে আলোচিত বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই।

৩। নায়ার এবং তিব্বতীদের ধাঁচে ব্যাপকভাবে নারীদের বহুবিবাহ চালু থাকার কোন প্রমাণ নেই।

মিঃ ম্যাক্লেনানের মতে এই ধরনের বহুবিবাহ প্রায় সর্বত্রই চালু ছিল। সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নারীদের এই ধরনের বহুবিবাহের সাহায্যে ব্যাখ্যাটা খাড়া করার চেষ্টা করেছেন। নায়ার ধাঁচের বহুবিবাহে বেশ কিছু অনাত্মীয় পুরুষের একজন যৌথ স্ত্রী থাকে (পৃঃ ১৪৬)। এটাকেই নারীদের বহুবিবাহের সবথেকে অমার্জিত রূপ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তিব্বতী ধাঁচের বহুবিবাহে কয়েকজন ভাইয়ের একজন যৌথ স্ত্রী থাকে। অতঃপর তিনি মানবজাতির প্রায় সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই এই দু ধরনের বহুবিবাহের কোন-না-কোনটার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ব্রতী হয়েছেন এবং তা প্রমাণ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। মিঃ ম্যাক্লেনানের একবারও মনে হয়নি যে নারীদের বহুবিবাহের এই রূপগুলো নিতান্তই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত মাত্র। এমনকি খোদ নীলগিরি পর্বত বা তিব্বতেও এগুলো ব্যাপকভাবে চালু থাকতে পারে না। গড়ে যদি তিনজন পুরুষের একজন করে স্ত্রী থাকে (নায়ারদের মধ্যে বারোজন পুরুষেরও একজন স্ত্রী থাকতে পারত, পৃঃ ১৪৭) এবং এটাই যদি কোন গোষ্ঠীর চালু রীতি হয়, তাহলে সেই গোষ্ঠীর বিবাহযোগ্যা নারীদের দুই-তৃতীয়াংশের বরাতে আর স্বামী জোটার কোন আশা থাকে না। যথেষ্ট জোর দিয়েই বলা যায় যে এই ধরনের ঘটনা পৃথিবীর কোন গোষ্ঠীর মধ্যেই ঘটতে পারে না, এবং আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নীলগিরি পর্বত বা তিব্বতের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই ধরনের বহুবিবাহের কথা মেনে নেওয়া যায় না। নায়ার নারীদের বহুবিবাহ সম্বন্ধে সব তথ্য এখনও জানা যায়নি। "একজন নায়ার পুরুষ বেশ কিছু স্বামী-গোষ্ঠীর মধ্যে থাকতে পারে। অর্থাৎ, তার যত খুশি স্ত্রী থাকতে পারে" (পৃঃ ১৪৮)। এর ফলে কিন্তু অবিবাহিতা মেয়েদের স্বামী পাওয়ার কোন সুবিধে হয় না, তবে একজন স্ত্রী-র স্বামীর সংখ্যা বেড়ে যায়। নারীশিশু হত্যাও এত প্রচুর পরিমাণে ঘটত না যার ফলে এ ধরনের বহুবিবাহ ব্যাপকভাবে চালু হতে পারে। আর এই ধরনের বিবাহ মানুষের ইতিহাসে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিতে পারেনি।

তবে মালয়ী, তুরানিয় এবং গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তাব্যবস্থা থেকে পুরুষ ও নারীদের এমন কিছু বহুবিবাহের কথা জানা যায়, যেগুলো মানুষের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছে। কারণ এই ব্যবস্থাগুলো যখন গড়ে ওঠে, তখন এই ব্যবস্থাগুলোর মত বহুবিবাহের ঐ-সব রীতিগুলোও ব্যাপকভাবে চালু ছিল। মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা থেকে আমরা ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দলগুলোর কথা জানতে পারি, কিন্তু জ্ঞাতিভাই আর জ্ঞাতিবোনরাও এই দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত হত। অর্থাৎ পুরুষদের বহু স্ত্রী আর নারীদের বহু স্বামী থাকত। তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা আরও অগ্রসর একটা

দলের সন্ধান পাই। এই দুটো জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা দু ধরনের দলগত বিবাহের সাক্ষ্য দেয়। এক ধরনের দলগত বিবাহের ভিত্তি ছিল স্বামীদের ভ্রাতৃত্ব, অপরটির ভিত্তি ছিল স্ত্রীদের ভগ্নীত্ব। এই স্তরে এসে আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষদের থাকত বহু স্ত্রী আর নারীদের বহু স্বামী। একই দলের মধ্যে দু ধরনের বিবাহই দেখা যায় এবং এই উভয় ধরনের বিবাহরীতি ছাড়া তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব নয়। গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তাব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বশর্তই ছিল দলগত বিবাহ। এই ব্যবস্থা আর মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা পুরুষদের বহু স্ত্রী এবং নারীদের বহু স্বামী প্রথার যে রূপগুলো দেখতে পাই, তা জ্ঞাতিতত্ত্বের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে নারীদের বহু স্বামী প্রথার নায়ার ও তিব্বতী ধাঁচগুলো থেকে তাদের জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থাকে ঠিকমত ব্যাখ্যা তো করা যায়ই না, উপরন্তু এগুলো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণও নয়।

আমার প্রদত্ত সারণীগুলোতে উপস্থাপিত জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার এইসব ব্যবস্থার রূপরেখাটা "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে অভিব্যক্ত তত্ত্ব ও অভিমতগুলোকে পুরোপুরি খারিজ করে দেয়। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ঠিক সেই কারণেই ঐ-সব ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে আমার উপস্থাপিত প্রকল্পকে আক্রমণ করেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান এবং এগুলোকে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে একটি ভিন্ন প্রকল্প খাড়া করার চেষ্টা করেছেন।

খ। সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনান যে প্রকল্প হাজির করেছেন, তা দিয়ে ঐ ব্যবস্থার উদ্ভবকে আদৌ ব্যাখ্যা করা যায় না।

মিঃ ম্যাক্‌লেনান এই বলে শুরু করেছেন (পৃঃ ৩৭২) যে, "[বর্ণনামূলক ব্যবস্থার] যাবতীয় রূপের মধ্যে যে বিষয়টা ফুটে ওঠে, তা শেষ বিচারে বিবাহরীতির সঙ্গেই যুক্ত। কাজেই এই ব্যবস্থার উদ্ভবও যে বিবাহরীতির সঙ্গেই সম্পর্কিত, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।" এটা আসলে আমার ব্যাখ্যার ভিত্তি। তাঁর ব্যাখ্যায় এটা কেবলমাত্র আংশিক ভিত্তির ভূমিকা পালন করেছে।

যে বিবাহরীতির সাহায্যে তিনি মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তা হল নায়ার নারীদের বহুস্বামী প্রথা, আর যে বিবাহরীতির সাহায্যে তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তা হল তিব্বতী নারীদের বহুস্বামী প্রথা। কিন্তু নায়ার বা তিব্বতীদের জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তাব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলতে পারেন নি, ফলে তাঁর প্রকল্পকে ব্যাখ্যা করার কিংবা পরীক্ষা করে দেখার কোন উপায়ও তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। অর্থাৎ নায়ার বা তিব্বতীদের সমাজজীবন থেকে সংগৃহীত কোন উপাদান ছাড়াই তিনি আলোচনার পথে পা বাড়িয়েছেন এবং এমন সব বিবাহরীতিকে সেই আলোচনার ভিত্তি করে তুলতে চেয়েছেন যেগুলো সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থাবিশিষ্ট গোষ্ঠী ও জাতিগুলোর মধ্যে কোনদিনই চালু ছিল না। কাজেই একেবারে প্রথম থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর ব্যাখ্যাটি আসলে একটা এলোমেলো অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

সারণীতে (সিস্টেম্‌স্‌ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি, পৃঃ ২৯৮-৩৮২ ; ৫২৩-৫৬৭) প্রদত্ত ব্যবস্থাগুলোকে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান। তাঁর মতে এগুলো হচ্ছে "বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার পদ্ধতিগত ব্যবস্থা।" খুব দ্ব্যর্থহীনভাবে এগুলোকে তিনি জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা হিসেবে অস্বীকার করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থটা এই অস্বীকৃতির দিকেই অঙ্গুলীনির্দেশ করে। 'সিস্টেম্‌স্‌ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি' রচনায় আমি বলেছিলাম যে ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত হলে কিংবা আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে সম্ভাষণ জানানোর সময় আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা পরস্পরকে সম্বোধন করে নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক অনুযায়ী, কখনোই কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না। দক্ষিণ ভারত এবং চীনেও একই রীতি চালু আছে। সম্ভাষনের সময় তারা ঐ ব্যবস্থাটাকেই ব্যবহার করে, কারণ এটা হচ্ছে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা। এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আর কি-ই বা হতে পারে! মিঃ ম্যাক্‌লেনান আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে এই সর্বব্যাপী ব্যবস্থাগুলো ছিল নিছকই আনুষ্ঠানিক একটা ব্যাপার এবং লোকেদের পরস্পরকে সম্বোধনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া ছাড়া এর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই ব্যবস্থাগুলো নিয়ে আলোচনায় ছেদ টানার এবং মানবজাতির প্রথম দিককার অবস্থা সংক্রান্ত বিদ্যমান সবথেকে উল্লেখযোগ্য স্মারকটাকে বাতিল করে দেওয়ার সহজতম উপায় তো এটাই!

সম্বোধনের ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি পৃথক একটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান। তিনি বলছেন (পৃঃ ৩৭৩): "এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে রক্তসম্বন্ধের ব্যবস্থা আর সম্বোধনের ব্যবস্থা একসঙ্গেই গড়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং এই দুটো ব্যবস্থা অল্প কিছুদিন পরস্পর-মিশ্রিতই ছিল।" রক্তসম্বন্ধের ব্যবস্থা বলতে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকেই বোঝায়। তাহলে সেই হারানো ব্যবস্থাটার কী হল ? সে সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনান কিছু বলেন নি বা তাঁর অস্তিত্বের কোন প্রমাণও দেন নি। কিন্তু সারণীতে প্রদত্ত জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থাগুলো তার প্রকল্পের পক্ষে যতটুকু উপযোগী, ততদূর পর্যন্ত এগুলোকে ব্যবহার করতে তিনি ইতস্তত করেন নি। অথচ তা করতে গিয়ে তাঁর নিজেরই বক্তব্য "এগুলো হচ্ছে নিছকই বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার পদ্ধতিগত ব্যবস্থা"—এই কথাটা সংশোধন করার কষ্টটুকুও স্বীকার করেন নি তিনি।

সারা পৃথিবীর বন্য ও বর্বর গোষ্ঠীগুলো বহু যুগ ধরে বিভিন্ন জ্ঞাতি ও আত্মীয়কে সম্বোধন করার একটা যথাযথ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য এত ব্যগ্র ছিল যে শুধু সেই উদ্দেশ্যেই তারা যাবতীয় জটিলতা সহ মালয়ী, তুরানিয় ও গ্যানোয়ানির জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ আকারে গড়ে তুলেছিল ; অন্য কোন ব্যবস্থা নয়, ঠিক এই ব্যবস্থাগুলোই ; তাদের ব্যগ্রতাটা এতই তীব্র ছিল যে এশিয়া, আফ্রিকা, পলিনেশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি সমস্ত জায়গাতেই পিতামহর ভাইকে পিতামহ বলে সম্বোধন করতে, বড় ভাইকে দাদা বলতে কিংবা ছোট ভাইকে ভাই বলতে তারা সবাই রাজি হয়ে গিয়েছিল ; সবটাই আসলে জ্ঞাতিদের সম্বোধন করার একটা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়—একসঙ্গে একরাশ সমাপতন! কিন্তু এত তুচ্ছ কারণে এতগুলো

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাপতন ঘটছে, এটা মেনে নিতে স্বয়ং লেখকেরও নিশ্চয়ই একটু অসুবিধে হবে।

সম্বোধন পদ্ধতির ব্যবস্থাটা সবসময়ই স্বল্পমেয়াদী হয়, কারণ যাবতীয় আনুষ্ঠানিক রীতিই স্বল্পমেয়াদী হতে বাধ্য। তাছাড়া, প্রতিটা জাতির মধ্যে এইসব সম্বোধন আলাদা আলাদা হওয়াটাও একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপারে। এর সম্পর্কগুলো উদ্ভূত হয় পরিবার আর বিবাহবিধির মধ্যে থেকে। আর পরিবারের থেকে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার স্থায়ীত্বও অনেক বেশি, কারণ পরিবার ক্রমান্বয়ে উন্নত হয়ে চলে কিন্তু জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা অপরিবর্তিতই থেকে যায়। কোন একটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় সামাজিক অবস্থাটা ঠিক কেমন ছিল, তা ঐ ব্যবস্থার অন্তর্গত সম্পর্কগুলোর মধ্যেই ফুটে ওঠে। মানবজাতির প্রাত্যহিক জীবনে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহবিধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফল হিসেবেই পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাগুলো প্রায় একই ধরনের হয়ে উঠেছে এবং বহু যুগ ধরে টিকে থাকতে পেরেছে।

মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর যে-কোন মা বুঝতে পারত যে নিজের পুত্র কন্যাদের সঙ্গে তার একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে আর সেই সম্পর্ককে এক একটা উপযুক্ত সম্বোধনের সাহায্যে প্রকাশও করা যায়; বুঝতে পারত যে নিজের মা এবং মায়ের নিজের মা-র সঙ্গে তার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে; বুঝতে পারত যে নিজের মায়ের অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে তার অন্য সম্পর্ক আছে; আবার নিজের মেয়ের সন্তানদের সঙ্গে তার রয়েছে আলাদা একটা সম্পর্ক—আর এই সমস্ত সম্পর্কগুলোকেই যথাযথ সম্বোধনের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ সুস্পষ্ট রক্তসম্বন্ধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল মালয়ী ব্যবস্থার অন্তর্গত পাঁচ ধরনের সম্পর্কের বনিয়াদ, যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহবিধির কথা উল্লেখ করার কোন দরকার হয় না।

দলবদ্ধ বিবাহ এবং ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার পর (এই দুটো বিষয়েরই প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে) এইসব ধারণার ভিত্তিতেই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দলটার মধ্যে। আপন ও জ্ঞাতি-সম্পর্কিত ভাইবোনদের দলবদ্ধ বিবাহের ফল হিসেবে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার যে ব্যবস্থাটা গড়ে উঠতে পারে, তা হচ্ছে এই মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। এই বিষয়গুলোকে বিবেচনা না করলে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উদ্ভব সংক্রান্ত কোন প্রকল্পই সঠিক সিদ্ধাতে উপনীত হতে পারে না। এই ধরনের বিবাহ এবং এই ধরনের পরিবারই জন্ম দের মালয়ী ব্যবস্থার। এই ব্যবস্থাটা একেবারে প্রথম থেকেই হয়ে ওঠে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার একটা ব্যবস্থা এবং শুধু এইভাবেই ঐ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করা যায়।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীটিকে সঠিক বলে মেনে নিলে মিঃ ম্যাকলেনানের প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার আর প্রয়োজন হয় না। দার্শনিক আলোচনার পক্ষে তাঁর প্রকল্পটি নিতান্তই অস্পষ্ট এবং এইসব ব্যবস্থার উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে একেবারেই অক্ষম।

গ। "সিস্টেম্‌স্‌ অফ কনস্যাঙ্গুনিটি" গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রকল্পটির বিরুদ্ধে মিঃ ম্যাকলেনানের বক্তব্য একেবারেই অন্তঃসারশূন্য।

মিঃ ম্যাক্‌লেনানের আগের প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন ঘটনার যে-সব ভুল মূল্যায়ণ এবং বিভিন্ন ধারণার ব্যাপারে যে-সব বিভ্রান্তি দেখা গেছে, সেগুলো এই প্রবন্ধটিতেও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্পর্ক এবং বৈবাহিকসূত্রে সম্পর্কের মধ্যে কোন পার্থক্যই তিনি দেখান নি, অথচ একই ব্যক্তির জীবনে এই দু ধরনের সম্পর্কই দেখা যায়। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সম্পর্কগুলোর ব্যাপারেও ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন তিনি।

আমার উপস্থাপিত প্রকল্পটি সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনান যে সমালোচনা করেছেন, তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কয়েকটা বিষয়ে তিনি শব্দার্থ ধরে সমালোচনা করেছেন, কোন কোন জায়গায় আমার বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন, কিন্তু কোথাওই মূল প্রশ্নগুলোর মর্মবস্তুকে স্পর্শ করতে পারেন নি। প্রথম প্রতিপাদ্যটা খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "সম্পর্কের মালয়ী ব্যবস্থাটা হচ্ছে রক্তসম্বন্ধেরই একটা ব্যবস্থা। মিঃ মর্গ্যান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল বিষয়গুলো প্রসঙ্গে তিনি কিছুই বলেন নি" (পৃঃ ৩৪২)। এটা যে অংশত রক্তসম্বন্ধের ব্যবস্থা এবং অংশত বৈবাহিক সম্বন্ধের ব্যবস্থা, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। বাবা-মা, ভাইবোন (বড় বা ছোট), পুত্র-কন্যা, মামা-মাসী, ভাগ্নে-ভাগ্নী, খুড়তুত-জ্যাঠতুত-মামাত-পিসতুত ভাইবোন, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী, পৌত্র/দৌহিত্র, পৌত্রী/দৌহিত্রী এবং দেবর, ভগ্নীপতি, শ্যালক, শ্যালিকা, জামাতা, পুত্রবধূ—এই সমস্ত সম্পর্কের কথাই সারণীতে উল্লিখিত হয়েছে এবং মিঃ ম্যাক্‌লেনান সেগুলো পড়ে দেখার সুযোগও পেয়েছেন। এই ব্যবস্থা-গুলো স্বতঃই প্রতীয়মান এবং এগুলো জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। মিঃ ম্যাক্‌লেনান কি মনে করেন যে সারণীতে উপস্থাপিত ব্যবস্থাটা থেকে আলাদা কোন ব্যবস্থা উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চালু ছিল? তা মনে করলে সেই আলাদা ব্যবস্থাটা উপস্থাপিত করার কিংবা তার অস্তিত্বের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব তাঁর ওপরেই বর্তায়। কিন্তু সে দায়িত্ব তিনি পালন করেন নি।

তাঁর উল্লিখিত দু'তিনটি বিশেষ বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা যায়। তিনি বলছেন (পৃঃ ৩৪৬): "কোন পুরুষকে যদি এমন কোন নারী তার পুত্র বলে সম্বোধন করে যে তাকে গর্ভে ধারণ করে নি, তাহলে তা স্বাভাবিক বংশধর সংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যাটির বিরোধিতাই করে। সে ক্ষেত্রে সম্পর্কটা যতটুকু নিশ্চিতভাবে সন্তানদের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিরূপন করা যায়, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। কাজেই মিঃ মর্গ্যানের প্রতিপাদ্যটাও প্রমাণিত হয় না।" তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় যে প্রশ্নটা পিতৃত্ব-মাতৃত্ব নিয়ে নয়, প্রশ্নটা বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্কের। মায়ের বোনকে মা-ই বলা হয় এবং সে তাকে নিজের পুত্র বলে সম্বোধন করে—যদিও ঐ নারী তাকে গর্ভে ধারণ করে নি। মালয়ী, তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় এটাই হচ্ছে রীতি। ভাইবোন বিবাহ বা দলগত বিবাহের ক্ষেত্রে মায়ের বোনেরাও বাবার স্ত্রী হিসেবেই বিবেচিত হয়। আমাদের আজকের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিচার করলে এদেরকে সৎ-মা বলা যায়। আমাদের ব্যবস্থাতেও সৎ-মাকে মা বলেই ডাকা হয় এবং সে-ও তার সৎ পুত্রকে পুত্র বলেই ডাকে। এটা যে রক্তসম্বন্ধের সম্পর্ক নয় তা সত্যি এবং সে-রকম কোন ইঙ্গিতও এর মধ্যে নেই, কিন্তু এটা অবশ্যই বৈবাহিক সূত্রের

একটা সম্পর্ক এবং তার ইঙ্গিত এর মধ্যে স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। মিঃ ম্যাক্‌লেনানের যুক্তিগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আপাতভাবে সত্য বলে মনে হলেও আসলে ভুলে-ভরা। মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পর তুরানির ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখছেন (পৃঃ ৩৫৪) ঃ "এ থেকে মনে হয় যে 'গোষ্ঠীগত সংগঠন, গড়ে ওঠার পর কোন ব্যক্তির পুত্র আর তার বোনের কন্যা, যারা ভাইবোন হিসেবেই স্বীকৃত, তারা স্বচ্ছন্দে পরস্পরকে বিবাহ করতে পারত, কেননা বংশধারা অনুযায়ী তারা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্য।" তুরানিয় বা গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে মিঃ ম্যাক্‌লেনান দেখতে পেতেন যে "কোন ব্যক্তির পুত্র আর তার বোনের কন্যা" মোটেই "ভাইবোন হিসেবে স্বীকৃত" নয়। এরা হচ্ছে মামাত-পিসতুত ভাইবোন। মালয়ী ও তুরানিয় ব্যবস্থার মধ্যে যে ক'টা সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে, এটা তার অন্যতম। তাছাড়া, মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার আর তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেকার পার্থক্যটাও মূর্ত হয়ে ওঠে এই ব্যাপারটার মধ্যে।

সাধারণ পাঠক নিশ্চয়ই এইসব ব্যবস্থার সমস্ত অনুপুঙ্খকে আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু সম্পর্কগুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলে এইসব ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনাকে ঠিকমত উপভোগ করা যায় না, বরং গোটা-ব্যাপারটা আরও বেশি করে জট পাকিয়ে যায়। সম্পর্কসূচক সম্বোধনগুলোকে মিঃ ম্যাক্‌লেনান যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সেগুলোকে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করতে পারেন নি।

আর এক জায়গায় (পৃঃ ৩৬০) বিবাহ ও যৌন-সহবাসের মধ্যেকার একটা পৃথকীকরণের দায়ভার তিনি আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, অথচ ও-রকম কোন মন্তব্য আমি করিই নি। অতঃপর প্রচুর গালভরা কথার মালা সাজিয়েছেন তিনি। "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থের এই জায়গাটাতেই সম্ভবত সবথেকে চটকদার কথার খেলা দেখা যায়।

শেষত, মিঃ ম্যাক্‌লেনান আমার দুটো তথাকথিত ভুলের কথা বলেছেন, তাঁর মতে যে-গুলো নাকি শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করে। "শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মিঃ মর্গ্যান দুটো মৌলিক ভুল করে বসেছেন। তাঁর পৃথক ভুলটা হল এই যে, ঐ ব্যবস্থার মূলে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারটা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন নি। শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভবের মধ্যেই গোটা ব্যবস্থাটার উদ্ভবকে খুঁজে দেখার কোন চেষ্টাই করেন নি তিনি" (পৃঃ ৩৬০)। এক্ষেত্রে ব্যবস্থা আর শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে পার্থক্যটা কী? এ দুটো তো একই অর্থ প্রকাশ করছে, অন্য কোন অর্থ তো এগুলোর মধ্যে কোনভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় না। একটার উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা করা মানেই অপরটারও উৎস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এগোনো। "দ্বিতীয় ভুল, বা বলা ভাল ভ্রান্তিটা হচ্ছে এত সহজেই ঐ ব্যবস্থাটাকে রক্তসম্বন্ধের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া" (পৃঃ ৩৬১)। এখানে কোন ভুলের অবকাশই নেই, কেননা সারণীতে উল্লিখিত ব্যক্তিরা হয় একই পূর্বপুরুষের বংশধর অথবা তাদের এক বা

একাধিক জনের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত। আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সংক্রান্ত সারণীতেও এইসব ব্যক্তির কথাই উল্লিখিত হয়েছে (সিস্টেম্স্ অফ কন্স্যাঙ্গুইনিটি, পৃঃ ৭৯-১২৭)। বস্তুতপক্ষে এই প্রত্যেকটা ব্যবস্থাতেই এরা পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। শেষোক্ত ব্যবস্থায় প্রতিটা সম্পর্কই সুনির্দিষ্ট আর প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় সম্পর্কগুলো বিভিন্ন বর্গে বিন্যস্ত। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থার মূল ভিত্তিটা একই—প্রকৃত জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে দলগত বিবাহ আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহের ফল হিসেবেই দুটো ব্যবস্থার মধ্যে ঐ পার্থক্যটা সৃষ্টি হয়েছিল। মালয়ী, তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় রক্তসম্বন্ধের একটা সুদৃঢ় বনিয়াদ খুঁজে পাওয়া যায় বহু সদস্যের একই পূর্বপুরুষের বংশধর হওয়ার মধ্যে ; বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্কগুলো উপলব্ধি করার জন্য খোঁজ করতে হবে এইসব ব্যবস্থার নির্দিষ্ট বিবাহরীতির মধ্যে। মালয়ী ও তুরানিয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও তুলনা করলে বোঝা যায় যে এ দুটো ব্যবস্থা হচ্ছে পৃথক পৃথক দুটো বিবাহরীতির ফসল—একটার ভিত্তি ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ, অপরটার দলগত বিবাহ।

কাউকে সম্ভাষণের সময় সম্পর্কসূচক সম্বোধন গুলো সর্বদাই ব্যবহার করা হয় কেন ? উত্তরটা সহজ : সম্পর্কসূচক সম্বোধন বলেই এগুলোকে এভাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসেবে দেখানোর জন্য বৃথাই চেষ্টা করেছেন মিঃ ম্যাক্লেনান। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর বিপুল গুরুত্ব দিলেও, এগুলোর উৎস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিন্তু তিনি এগুলোকে "সম্বোধনের পদ্ধতি" হিসেবে আদৌ ব্যবহার করেন নি। এইসব সম্বোধন প্রসঙ্গে তিনি যখনই কথা বলেছেন, তখনই এগুলোকে ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তাসূচক অভিধা হিসেবেই। যে-সব ভাবনাকে সে ফুটিয়ে তোলে, ব্যক্ত করে, সেইসব ভাবনা ব্যতিরেকে যেমন ভাষার উৎপত্তি হতে পারে না, ঠিক তেমনি জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে "বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধনের পদ্ধতিগত ব্যবস্থা"-রও উদ্ভব ঘটা অসম্ভব (পৃঃ ৩৭৩)। বিভিন্ন আত্মীয় বা জ্ঞাতিকে সম্বোধনের ব্যাপারে এইসব অভিধাগুলো কেন এত তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পেরেছিল ? কারণ এগুলোর মধ্যে জ্ঞাতি বা আত্মীয়দের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কটা মূর্ত হয়ে উঠত। স্রেফ বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধনের প্রয়োজন থেকে পৃথিবীর একটা বিশাল এলাকা জুড়ে যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারেও প্রায় একইরকম এত প্রকাণ্ড একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।

শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্লেনানের ব্যাখ্যা আর এই গ্রন্থে উপস্থাপিত আমার ব্যাখ্যার মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যটা, অর্থাৎ এটা বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধনের একটা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা নাকি জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা, তা নির্ণয় করার ভার আমি পাঠকদের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

চতুর্থ খণ্ড

সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণার ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উত্তরাধিকারের তিনটি নিয়ম

এবার আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে সম্পত্তির ক্রমবিকাশ নিয়ে, সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মগুলো নিয়ে এবং প্রাচীন সমাজের ওপর সম্পত্তির প্রভাব সম্পর্কে।

সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রাচীনতম ধারণাগুলো মানুষের প্রাথমিক চাহিদা অর্থাৎ জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে। যে-সব জিনিসের ওপর জীবনধারণের উপায় নির্ভর করত, সেগুলো বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা ঐতিহাসিক যুগে মালিকানার বিষয়বস্তুও স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠেছিল। তাই উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়েই ক্রমবিকাশ ঘটেছিল সম্পত্তির। প্রতিটা ঐতিহাসিক যুগই তার আগের যুগের থেকে উন্নত চেহারা নিয়ে আসত। এই উন্নতিটা শুধুমাত্র উদ্ভাবনের সংখ্যার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকত না, সেইসব উদ্ভাবনের ফল হিসেবে উদ্ভূত সম্পত্তির বৈচিত্র্য আর পরিমাণের মধ্যেও তার ছাপ ফুটে উঠত স্পষ্ট-ভাবে। নানা ধরনের সম্পত্তি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার ভোগদখল ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কিছু বিধিনিয়মও তৈরি হয়েছিল। ভোগদখল এবং উত্তরাধিকারের এই নিয়ম-গুলো যে-সব রীতি-প্রথার ওপর নির্ভর করত, সেগুলো সমাজ-সংগঠনের অবস্থা আর অগ্রগতির দ্বারাই নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হত। তাই দেখা যায় উদ্ভাবন আর আবিষ্কার বেড়ে চলার সঙ্গে আর মানবপ্রগতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের সূচনাকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অগ্রগতির সঙ্গে সম্পত্তির ক্রমবিকাশ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

১। বন্য যুগের সম্পত্তি

বিভিন্ন উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতি ও প্রথার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠা ধারণাগুলোর ক্রমবিকাশ মারফৎ মানুষ যা-কিছু অর্জন করেছিল, সেগুলোকে বাদ দিয়ে এই সুপ্রাচীন যুগটায় মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। একেবারে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার অবস্থা থেকে মানবসমাজের অগ্রগতি খুব ধীরে ধীরে ঘটলেও সেই অগ্রগতির অনুপাতটা ছিল জ্যামিতিক বা গুণোত্তর। এমন একটা সময় ছিল, যখন মানুষ আগুন জ্বালাতে জানত না, ভাষার ব্যবহার জানত না, জানত না কৃত্রিম হাতিয়ার বানানোর কৌশলও। সেই যুগে অন্যান্য বন্য জীবজন্তুদের মত মানুষকেও খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হত আপনা থেকে জন্মানো নানারকম ফলের ওপরেই। তারপর খুব ধীরে ধীরে, প্রায় চোখে না-পড়ার মত পদক্ষেপে, অগ্রসর হল মানুষ। বন্যতার যুগের পথ বেয়ে এগোল মানুষের ইতিহাস। অঙ্গভঙ্গী আর অর্ধোচ্চারিত কিছু শব্দের বদলে সৃষ্টি হল স্পষ্টোচ্চারিত ভাষা। আদি হাতিয়ার লাঠি থেকে মানুষ পৌঁছে গেল পাথরের ফলা লাগানো বর্শায়

স্তরে এবং অবশেষে তার হাতে উঠে এল তীর-ধনুক। পাথুরে ছুরি আর বাটালির স্তর পেরিয়ে সে পা রাখল পাথুরে কুঠার আর হাতুড়ির স্তরে। বেতের ঝুড়ির বদলে দেখা দিল কাদামাটির প্রলেপ লাগানো ঝুড়ি, ফলে আগুনের তাপে খাদ্য সেদ্ধ করার মত একটা পাত্র পেল মানুষ। আর অবশেষে গড়ে উঠল মৃৎশিল্প, মাটির পাত্র বানাতে শিখল মানুষ, আগুনের তাপ সহ্য করার পাত্র এসে গেল তার হাতে। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতিজ ফলের ওপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকার যুগ পেরিয়ে সমুদ্রের উপ-কূলবর্তী অঞ্চলে সে আঁশযুক্ত ও খোলাযুক্ত মাছের ওপর নির্ভর করতে শুরু করল, এবং অবশেষে সে ব্যবহার করতে শিখল বিভিন্ন গাছের কন্দ আর সেই সঙ্গেই শিখল খাদ্যের জন্য পশুপাখি শিকার করতে। গাছের ছালের আঁশ থেকে দড়ি ও সুতো তৈরি করা, লতাপাতার মণ্ড দিয়ে এক ধরনের পোশাক বানানো, পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা আর তাঁবুর ছাউনি হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য চামড়া পাকা করা, খুঁটির ওপরে গাছের ছালের চাল দেওয়া বাড়ি কিংবা পাথরের গোঁজ দিয়ে গড়া কাঠের তক্তার বাড়ি—এগুলোও বন্য যুগেই দেখা দিয়েছিল। ছোটখাট উদ্ভাবন হিসেবে নাম করা যায় আগুন জ্বালানোর গর্ত (যেখানে কোন একটা জিনিসকে তুরপুনের মত ঘুরিয়ে আগুন জ্বালানো হত), হরিণের চামড়ার জুতো, তুষার-পাদুকা প্রভৃতির।

এই পর্যায়টা শেষ হওয়ার আগেই পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় অনেক বেশি করে মানুষ শিখে নিতে পেরেছিল দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করার রীতিটা। ততদিনে পৃথিবীর অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে সে, বিভিন্ন মহাদেশের মানব-অগ্রগতির সহায়ক সমস্ত সম্ভাবনাগুলোকে শুরু করেছে আয়ত্ত করতে। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক দলের সীমা পেরিয়ে সে পা রেখেছে গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত গোষ্ঠীর স্তরে। অর্থাৎ, শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করার প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর বীজ এসে গেছে তার আয়ত্তে। মানুষ এগোতে শুরু করেছে সভ্যতার দিকে। একদিন-না-একদিন মানুষ যে সভ্যতার যুগে পেঁছিবেই, তার সুনিশ্চিত ইঙ্গিত সেই আদিম যুগেই খুঁজে পাওয়া যায়, যখন মানুষ আবিষ্কার করেছে ভাষা, মৃৎশিল্প আর গোত্র।

বন্য যুগেই মানুষের অবস্থার বিপুল পরিবর্তনের বীজ রোপন করে গিয়েছিল। মানবজাতির অগ্রসর অংশটা অবশেষে গড়ে তুলতে পেরেছিল গোত্রভিত্তিক সংগঠন, ছোট ছোট গোষ্ঠী আর এখানে-সেখানে কিছু গ্রাম। এতে করে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আরও বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। তাদের কর্মক্ষমতা আর বিভিন্ন অমার্জিত কলাকৌশলগুলো প্রধানত জীবনধারণের কাজেই ব্যবহৃত হত। আত্মরক্ষার জন্য গ্রামের চারদিকে বেড়া দেওয়ার ধারণা তখনও গড়ে ওঠে নি তাদের মধ্যে, গম থেকে আটা জাতীয় খাদ্য বানাতেও শেখে নি, এমনকি নরখাদকবৃত্তিটাও তাদের মধ্যে থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। যে-সব কলাকৌশল, উদ্ভাবন আর প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলোই হচ্ছে বন্যতার যুগে মানবজাতির অগ্রগতির সামগ্রিক যোগফল—এর সঙ্গে শুধু যোগ করে নিতে হবে ভাষার ব্যাপারটাকে। আপাতদৃষ্টিতে এই যোগ-ফলটাকে নেহাতই সামান্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যেই লুকিয়েছিল অসীম সম্ভাবনার অঙ্কুর। কেননা এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় ভাষার বীজ, সরকার,

পরিবার, ধর্মের অঙ্কুর, গৃহ নির্মাণ আর সম্পত্তির স্বরূপ এবং জীবনধারণের কলা-কৌশলগুলোর প্রাথমিক বীজ। বর্বরযুগে তাদের বংশধররা এগুলোকে উন্নত করে তোলে এবং সভ্যতার যুগে তাদের বংশধররা এগুলোকে আরও উন্নত করে চলেছে।

তবে বন্য যুগের মানুষদের সম্পত্তি ছিল নিতান্তই নগণ্য। সম্পত্তির মূল্য, তার কাম্যতা আর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল খুবই দুর্বল। বন্যদের জীবনে সম্পত্তি বলতে ছিল কিছু অমার্জিত হাতিয়ার, পোশাক-আশাক, বাসনপত্র, চকমকি, পাথর আর হাড়ের জিনিস এবং কিছু ব্যক্তিগত অলংকার। সম্পত্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষাও তাদের খুব বেশি ছিল না, কারণ সম্পত্তি বলতেই তো আসলে বিশেষ কিছু ছিল না। সভ্যতার যুগে এসেই মানুষের মধ্যে "লাভের লোভ" টা (studium lucri) বেড়ে উঠেছিল আর এখন তো সেটা একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে। বন্যতার যুগে জমিকে ঠিক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হত না। জমির মালিক ছিল সমগ্র গোষ্ঠী। যৌথ বাস-গৃহগুলি ছিল গোষ্ঠীর সদস্যদের এজমালি সম্পত্তি। বিভিন্ন ছোটখাট উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের সংখ্যাও বেড়ে উঠছিল, আর তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠছিল সম্পত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাও। কেউ মারা গেলে তার সবথেকে মূল্যবান সম্পত্তিগুলো তার কবরের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হত, যাতে করে প্রেতলোকে গিয়েও সে ওগুলো ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির বাকি সম্পত্তির উত্তরাধি-কারের প্রশ্নটা নিশ্চয়ই উঠত। গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার আগে এই সম্পত্তি কিভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করা হত, সে ব্যাপারে আমাদের হাতে কোন তথ্য নেই বললেই চলে। গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার পর দেখা দিল উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা। এই নিয়ম অনুসারে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় জিনিসপত্র তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। কার্যত তার নিকটতম জ্ঞাতিরাই পেত জিনিসপত্রগুলো, কিন্তু নিয়মটা ছিল সার্বজনীন—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার গোত্রের মধ্যেই থাকত এবং গোত্রের সদস্যদের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া হবে। গ্রীক ও লাতিন গোত্রগুলো সভ্যতার যুগে এসেও এই নিয়মটা মেনে চলত। সন্তানরা তাদের মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত, কিন্তু যাকে তাদের বাবা বলে গণ্য করা হত তার কোন কিছুরই উত্তরাধিকারী হত না তারা।

২। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে সম্পত্তি।

মৃৎশিল্প উদ্ভাবন থেকে শুরু করে পশুদের পোষ মানানো অথবা সেচের সাহায্যে ভুট্টা ও বিভিন্ন লতা-গুল্ম চাষের প্রচলন হওয়া পর্যন্ত সময়টা নিশ্চয়ই বন্যতার সমগ্র যুগের থেকে অনেক কম ছিল। মৃৎশিল্প, হাত দিয়ে বয়ন করা আর কৃষিকাজ (যার ফলে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য পাওয়া গিয়েছিল) ছাড়া এই ঐতিহাসিক যুগটিতে আমেরিকায় তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন বা আবিষ্কার হয় নি। তবে ঐ যুগে আমেরিকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দারুণ অগ্রগতি ঘটেছিল। টানাপোড়েনের সাহায্যে হাত দিয়ে বয়ন করাটা এই যুগেরই ব্যাপার, এবং এটা অবশ্যই একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন। তবে বন্যতার যুগে মানুষ যে এই কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারেনি, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এই পর্যায়ের ইরোকোয়ারা এবং আমেরিকার অন্যান্য

গোষ্ঠীগুলো চমৎকার টানাপোড়েনের সাহায্যে দারুণ দারুণ কোমরবন্ধ ও বোঝা-বাঁধার দড়ি তৈরি করত। একাজের জন্য তারা ব্যবহার করত দেবদারু ও অন্যান্য গাছের আঁশ থেকে বানানো সুতো।[১] এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের মূল নিয়মটাকে (যা আজ পর্যন্ত মানবজাতির পোশাক যুগিয়ে আসছে) তারা ঠিক ঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু এই জ্ঞানকে আরও উন্নত করে তুলে বুনন জাত পোশাক বানানোর ব্যাপারে তারা সক্ষম হতে পারে নি। ছবির সাহায্যে লেখার ব্যাপারটাও সম্ভবত এই যুগেই প্রথম শুরু হয়েছিল। কারণ তার আগে এভাবে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে থাকলে এই যুগে এসে তা নিশ্চয়ই অনেক উন্নত হয়ে উঠত। ধ্বনিগত বর্ণমালা উদ্ভাবনের এটা অন্যতম স্তর। অতঃপর একের পর এক উদ্ভাবনের পথ বেয়ে এগিয়েছে মানুষ। সারিটা মোটামুটি এরকম : ১। অঙ্গভঙ্গীনির্ভর ভাষা অথবা ব্যক্তিগত প্রতীকের ভাষা ;

২। ছবির সাহায্যে লেখা বা ভাবনির্দেশক প্রতীক ; ৩। চিত্রবর্ণমালা বা প্রচলিত প্রতীক ; ৪। ধ্বনিভিত্তিক চিত্রবর্ণমালা বা একটা নির্ঘণ্টের মধ্যে ব্যবহৃত ধ্বনিগত ; ৫। ধ্বনিভিত্তিক বর্ণমালা বা বিভিন্ন শব্দের লিখিত রূপ যেহেতু বিভিন্ন শব্দের লিখিত রূপনির্ভর ভাষাটা নানান ধারাবাহিক স্তরের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেহেতু এর পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াগুলোর উদ্ভব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা থেকে অনেক কিছু বোঝাও যায়। কোপান্ (copan) স্মৃতিস্তম্ভগুলোর খোদাই করা ছবিগুলো সম্ভবত প্রচলিত প্রতীক ধরনের চিত্রবর্ণমালা। এগুলো থেকে বোঝা যায় যে আমেরিকার আদিবাসীরা, যারা প্রথম তিন ধরনের ভাষার ব্যবহার জানত, তারা একটা ধ্বনিভিত্তিক বর্ণমালা উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে চলেছিল স্বাধীনভাবেই।

গ্রামের প্রতিরক্ষার জন্য বেড়া উদ্ভাবন, তীরের (যা ততদিনে এক ভয়ঙ্কর ক্ষেপনাস্ত্র হয়ে উঠেছিল) হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পশুচর্মের ঢাল উদ্ভাবন, ঢাকা-দেওয়া পাথর কিংবা হরিণের শিং বসানো নানা ধরনের গদা উদ্ভাবন এগুলোও সম্ভবত এই পর্যায়েরই ঘটনা। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই এই জিনিসগুলোর ব্যবহার চালু ছিল। অরণ্যচর গোষ্ঠীগুলো ফলার পাথর বা হাড় বসানো বর্শা সাধারণত ব্যবহার করত না, যদিও কালে ভদ্রে এর ব্যবহার দেখা যেত।[২] এই হাতিয়ারটা মানুষ তৈরি করেছিল বন্যতার যুগেই, তীর ধনুক উদ্ভাবনের আগেই। পরবর্তীকালে বর্বরযুগের উচ্চ পর্যায়ে এই হাতিয়ারটা নতুন রূপে সামনে আসে। তখন এর মুখে লাগানো হত তামার ফলা। ফলে সেই সময় কাছা-কাছি থেকে লড়াই করাটাই যুদ্ধের প্রধান পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে আমেরিকার আদিবাসীদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক আর গদা। তাদের বড় বড় মাটির পাত্র আর তার গায়ের অলঙ্করণ থেকে বোঝা যায় সে সময় মৃৎশিল্পে

১। "লীগ অফ দ্য ইরোকোয়া", পৃঃ ৩৬৪.

২। যেমন, ওজিবোয়ারা পাথর বা হাড় লাগানো বর্শা ব্যবহার করত, যার নাম ছিল শি-মা-গান।

তারা কিছুটা উন্নত হয়ে উঠেছিল।[১] কিন্তু এই উন্নতি সত্ত্বেও ঐ পর্যায়ের শেষ পর্যন্ত তাদের মৃৎশিল্প ছিল নিতান্তই অমার্জিত ধরনের। বাড়ি বানানোর কলাকৌশলে, বাড়ির আয়তন এবং নির্মাণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল। ছোটখাট উদ্ভাবনের মধ্যে ছিল পাখি শিকারের অস্ত্র (গুলতি জাতীয়), ভুট্টা জাতীয় শস্য গুঁড়ো করার কাঠের হামান দিস্তা, রঙ তৈরি করার পাথুরে হামানদিস্তা, মাটির ও পাথরের হুঁকো (তামাক খাওয়ার জন্য), উন্নত ধরনের বিভিন্ন রকম হাড়ের ও পাথরের যন্ত্রপাতি, পাথরের তৈরি হাতুড়ি ও মুগুর (পাথুরের হাতলটা আর ওপরের দিকটা ঢাকা থাকত পশুর চামড়া দিয়ে) এবং হরিণের চামড়ার পাদুকা ও কোমরবন্ধ, যেগুলোকে তারা সুসজ্জিত করত শজারুর কাঁটা দিয়ে। এই সব উদ্ভাবনের মধ্যে কয়েকটা তারা শিখেছিল বর্বর যুগের পর্যায়ে থাকা গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে। ব্যাপারটা একান্তই স্বাভাবিক, কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে বারবারই দেখা গেছে যে অনুন্নত গোষ্ঠীগুলো অগ্রগতির উপায়গুলোকে উপলব্ধি করা ও আত্মস্থ করার মত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলেই অগ্রসর গোষ্ঠীগুলো তাদের উন্নত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

ভুট্টা এবং লতাগুল্মের চাষ শুরু হওয়ার ফলে টাটকা রুটি, জলে সেদ্ধ ভুট্টাচূর্ণ এবং স্যালাড হিসেবে খাওয়ার মত পাতা ইত্যাদি পেতে শুরু করেছিল মানুষ। আর এ থেকেই দেখা দিয়েছিল এক নতুন ধরনের সম্পত্তি—কর্ষিত ভূমি বা বাগান। জমির মালিকানা গোষ্ঠীর সার্বজনীন হলেও, কর্ষিত জমির ওপর ব্যক্তির বা কোন দলের ভোগদখলের অধিকার এই সময় থেকে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছিল। এই সম্পত্তির ওপর উত্তরাধিকারও স্বীকৃত হয়েছিল। যৌথ বাসগৃহে বসবাসকারী দলগুলো সাধারণত একই গোত্রের সদস্য হত এবং উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী সম্পত্তি কখনোই জ্ঞাতিদের বাইরে কারুর হাতে যেত না।

স্বামী ও স্ত্রী-র সম্পত্তি ও বিভিন্ন জিনিসপত্র আলাদা আলাদাভাবে রাখা হত এবং তাদের মৃত্যুর পর সেগুলো তাদের নিজ নিজ গোত্রের হাতে বর্তাত। স্ত্রী এবং সন্তানরা স্বামী এবং বাবার কাছ থেকে কিছুই নিত না, আর স্বামীও তার স্ত্রী-র কাছ থেকে নিত না কিছুই। কোন ইরোকোয়া পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানদের রেখে মারা গেলে তার সম্পত্তি সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হত যাতে তার বোনেরা ও তাদের সন্তানরা এবং তার মামারা ঐ সম্পত্তির বেশির ভাগ অংশটা পেতে পারে। মৃতের ভাইরাও কিছুটা অংশ পেতে পারত। কোন নারী তার স্বামী ও সন্তানদের রেখে মারা গেলে তার যাবতীয় জিনিসপত্র ভাগ করে দেওয়া হত তার সন্তান, বোন, মা এবং মায়ের বোনেদের মধ্যে, তবে বেশির ভাগ অংশটা পেত তার সন্তানরাই। উভয় ক্ষেত্রেই মৃতের সম্পত্তি রয়ে যেত তার গোত্রের মধ্যেই। ওজিবোয়াদের কোন নারী মারা গেলে তার জিনিসপত্র ভাগ করে দেওয়া হত তার সন্তান-

১। দুই থেকে দশ গ্যালন পর্যন্ত তরল ধরার মত মাটির পাত্র তৈরি করত গ্রীকরা (অ্যাডেয়ার, "হিস্ট্রি অফ আমেরিকান ইণ্ডিয়ান্স," পৃঃ ৪২৪)। ইরোকোয়ারা তাদের মাটির বয়াম আর নলগুলোর গায়ে মানুষের ছোট ছোট মুখ এঁকে দিত। স্মিথ্সনিয়ান ইন্স্টিটিউশনের মিঃ এফ. এ. কুশিং সম্প্রতি এই আবিষ্কারটি করেছেন।

দের মধ্যে—যদি তারা সেগুলোকে ব্যবহার করার মত বয়স্ক হত। তা না হলে কিংবা ঐ নারীর কোন সন্তান না থাকলে, জিনিসপত্রগুলো ভাগ করে দেওয়া হত তার বোন, মা এবং মায়ের বোনেদের মধ্যে—মৃতার ভাইরা তার কোন জিনিসই পেত না। বংশ-ধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তারা স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুসরণ করতে শুরু করেছিল বটে, কিন্তু উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তারা স্ত্রী-ধারা চালু থাকার সময়কার সেই পুরনো নিয়মটাই অনুসরণ করত।

বন্য যুগের চেয়ে এই যুগে সম্পত্তির বৈচিত্র্য ও পরিমাণ অনেকটা বেড়ে উঠলেও তা এমন কোন মাত্রায় পৌঁছতে পারে নি যাতে করে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে পারে। সম্পত্তি ভাগাভাগির যে পদ্ধতির কথা ওপরে বলা হয়েছে, তার মধ্যেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটার বীজ নিহিত ছিল। এই নিয়ম অনুসারে মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা, গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের তাতে কোন অধিকার থাকত না। এই সময় থেকে সগোত্রীয় জ্ঞাতিত্ব নির্ধারণ করা হত পুরুষ-ধারা অনুসারে। তবে এই ধারা অনুসারে যে-সব লোক জ্ঞাতি হিসেবে পরিগণিত হত, তারা স্ত্রী-ধারার জ্ঞাতিদের থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতিত্ব নির্ধারণের মূল নীতিটা ছিল একই এবং একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সম্বোধন অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা চলত স্বচ্ছন্দে। স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৃতের সগোত্রীয় জ্ঞাতি বলতে একমাত্র তাদেরকেই মনে করা হত, যারা মৃত ব্যক্তির মূল পূর্বনারী থেকে স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী জাত। পুরুষ-ধারার ক্ষেত্রেও এই নিয়মটাই বলবৎ ছিল, শুধু স্ত্রী-ধারার বদলে জ্ঞাতিত্বটা নির্নীত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী। অর্থাৎ সগোত্রীয় জ্ঞাতিত্বের ভিত্তি ছিল একই আদি পূর্বনারী বা পূর্বপুরুষ থেকে স্ত্রী বা পুরুষ-ধারা অনুসারে প্রত্যক্ষ বংশধারা মাফিক গোত্রের সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকা।

বর্তমানে অগ্রসর ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোত্রীয় উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একটা বিমুখতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কোন কোন গোষ্ঠীতে এই নিয়ম রদ করে শুধুমাত্র মৃতের সন্তানদের হাতেই তার সম্পত্তি তুলে দেওয়ার নিয়ম চালু করা হয়েছে। আগের থেকে পরিমাণে অনেক বেড়ে যাওয়া সম্পত্তি যাতে পিতারা তাদের নিজের সন্তানদের হাতে তুলে দিতে পারে তার জন্য নানান বিধিনিয়ম চালু হয়ে গেছে ইরোকোয়া, ক্রীক, চেরোকী, চোক্‌টা, মেনোমিনী, ক্রো এবং ওজিবোয়া গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। এইসব বিধিনিয়ম চালু করার মধ্যে ঐ বিমুখতারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

নরখাদকবৃত্তি ছিল বন্য যুগের এক নিষ্ঠুর অভিশাপ। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে এই ব্যাপারটা অনেক কমে যায়। সাধারণভাবে এই প্রথাটা পরিত্যক্তই হয়েছিল, তবে বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে যুদ্ধের সময় নরখাদকবৃত্তিটা স্বীকৃত রীতি হিসেবে রয়ে যেতে পেরেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এর নিদর্শন দেখা গেছে। তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য ব্যবহার করতে শেখার ফলেই এই নিষ্ঠুর প্রথার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল মানুষ।

এতক্ষণ আমরা এক নজরে দুটো ঐতিহাসিক যুগকে দেখার চেষ্টা করলাম। পৃথিবীতে

মানবজাতির সমগ্র অস্তিত্বের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ জুড়ে রয়েছে এই দুটো যুগই। এর মধ্যে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়েই মানুষের উন্নততর গুণগুলো ফুটে উঠতে শুরু করে। ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ, বাক্‌পটুতা, ধর্মীয় ভাবপ্রবণতা, ন্যায়পরায়ণতা, শৌর্য ও সাহস তখন মানুষের চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। তবে সেইসঙ্গেই নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্ধ গোঁড়ামি প্রভৃতিও ব্যাপকভাবেই চালু ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পুজা, দেবদেবী ও ভূতপ্রেত সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা, অমার্জিত পদ্য রচনা, যৌথ-বাসগৃহ বানানো এবং ভুট্টাজাতীয় শস্য থেকে রুটি তৈরি করা—এগুলো সবই এই পর্যায়ের অবদান। তাছাড়া এই সময়েই গড়ে উঠেছিল জোড়-বাঁধা পরিবার আর গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত গোষ্ঠীগুলোর মিত্রসঙ্ঘ। মানবজাতিকে সুউন্নত করে তোলার কাজে বিপুল অবদান রয়েছে যে কল্পনাশক্তির, তা এই সময় সৃষ্টি করে চলেছিল পুরাণ, রূপকথা আর লোককথার এক অলিখিত সাহিত্য। মানুষের জীবনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এই অলিখিত সাহিত্যগুলো।

৩. বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে সম্পত্তি।

মানব ইতিহাসের অন্য যে-কোন পর্যায়ের তুলনায় এই পর্যায়টার কথাই আমরা সব-থেকে কম জানতে পেরেছি যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন তারা বর্বর যুগের এই মধ্য পর্যায়েই ছিল। সে সময় চেষ্টা করলে তাদের শাসনবিষয়ক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় মতবাদ, গার্হস্থ্য জীবনের ধাঁচ, বিভিন্ন ব্যবহারিক কলাকৌশল এবং সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলো সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করা যেত। কিন্তু সে সুযোগটা হেলায় হারানো হয়। তাই আমাদের হাতে নানান ভ্রান্ত ধারণা আর অতিরঞ্জিত গল্পকথার মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো কিছু সত্যের টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই।

পূর্ব গোলার্ধে এই পর্যায়টা শুরু হয়েছিল পশুদের পোষ-মানানো দিয়ে আর পশ্চিম গোলার্ধে শুরু হয়েছিল ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের আবির্ভাব দিয়ে। এই ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা বসবাস করত রোদে-পোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি যৌথ-বাসগৃহে এবং কোথাও থাক্ দিয়ে সাজানো পাথরের বাড়িতে। সেচের সাহায্যে ভুট্টা ও লতাগুল্ম চাষ চালু হয়েছিল। তার জন্য দরকার ছিল কৃত্রিম খাল আর বাগান। জলটা মাটিতে শুষে না যাওয়া পর্যন্ত সেটাকে ধরে রাখার জন্য জমিতে উঁচু করে আল দেওয়ারও দরকার হত। তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সময় তারা এই মধ্য পর্যায়ের প্রায় শেষ ভাগে এসে গিয়েছিল। তাদের একটা অংশ ততদিনে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখে গেছে। এর ফলে তারা আকরিক লোহাকে গলানোর উন্নততর প্রক্রিয়াটার দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিল অনেকটাই। যৌথ-বাসগৃহগুলো ছিল অনেকটা দুর্গ ধরনের বাড়ি। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের বেড়া-ঘেরা গ্রাম আর উচ্চ পর্যায়ের প্রাচীরবেষ্টিত শহরের মধ্যবর্তী অবস্থা ছিল এই যৌথ-বাসগৃহগুলো। আমেরিকা যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন সেখানে সঠিক অর্থে শহর বলে কিছু ছিল না। যুদ্ধ কৌশলের ব্যাপারে তারা খুব একটা উন্নত হয়ে উঠতে পারে নি, তবে আত্মরক্ষার ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি ঘটাতে পেরেছিল। আত্মরক্ষার জন্য তারা বড় বড় বাড়ি বানিয়েছিল, যেগুলোতে ইণ্ডিয়ানরা সহজে আক্রমণ চালাতে পারত না। তবে তারা তুলোয় ভরা একরকম বর্ম (escaupiles) উদ্ভাবন করেছিল যা

তীরের বিরুদ্ধে ঢালের কাজ করত[১], আর উদ্ভাবন করেছিল দুদিকে ধারবিশিষ্ট একরকম তরোয়াল (macuahuitl)[২] যার দুধারেই কাঠের পাতের ওপর এক সারি করে তীক্ষ্ণধার পাথর বসানো থাকত। তখনও তারা তীরধনুক, বর্শা, গদা, পাথরের ছুরি, পাথরের কুঠার এবং পাথরের তৈরি অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করত।[৩] তামার কুঠার ও বাটালি তৈরি করতেও জানত তারা, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে এগুলোকে তারা কখনোই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে নি।

ভুট্টা, শিম, লাউ ও তামাকের পর এইসময় তারা তুলো, গোলমরিচ, টম্যাটো, ক্যাকাও এবং অন্যান্য কিছু ফলের চাষ করতে শিখেছিল। একরকম ফলের রস গাঁজিয়ে এক ধরনের মদ বানানোও শুরু হয়েছিল। মেপ্‌ল্‌ গাছের রসকে গাঁজিয়ে ইরোকোয়ারাও একরকম মদ বানাতো। মৃৎশিল্পের কলাকৌশলেও কিছুটা উন্নতি ঘটেছিল। সুন্দর-ভাবে তৈরি ও চমৎকার কারুকাজ করা এমন সব মাটির পাত্র বানাতো তারা, যাতে বেশ কিছু গ্যালন তরল রাখা যেত। গামলা, বাটি, জলপাত্র ইত্যাদি বানানো হত প্রচুর পরিমাণে। স্থানীয় বিভিন্ন ধাতু আবিষ্কার এবং প্রথমে অলঙ্কারের জন্য ও পরে নানা-রকম যন্ত্রপাতি (যেমন তামার কুঠার ও বাটালি) আর বাসনপত্র তৈরির জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করাটাও এই পর্যায়েরই ব্যাপার। এই পর্যায়ে আমেরিকায় আর যে-সব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল, তার মধ্যে আছে—মাটির পাত্র বা মুচিতে করে এই ধাতুগুলোকে গলানো আর গলানোর কাজে খুব সম্ভবত ব্লো-পাইপ বা বাঁকনল ও কাঠকয়লার ব্যবহার, গলানো ধাতুকে ছাঁচে ফেলে জিনিস বানানো, ব্রোঞ্জ তৈরি, পাথর দিয়ে অমার্জিত ধরনের ভাস্কর্যের সূত্রপাত, তুলো দিয়ে বোনা পোশাক,[৪] মসৃণ পাথরের বাড়ি, মৃত প্রধানদের সমাধিফলকের ওপর খোদাই করা চিত্রবর্ণমালার লেখা, সময় পরিমাপের বর্ষপঞ্জী (calendar), ঋতু নির্ণয়ের অয়ন-পাথর, বড় বড় দেওয়াল, লামা (উট জাতীয় পশু), এক ধরনের কুকুর আর টার্কি ও মুরগী জাতীয় অন্যান্য পাখিদের পোষ-মানানো ইত্যাদি। এই সময়েই প্রথম দেখা দেয় একটা যাজকতন্ত্র, তাদের বিশেষ পোশাক, আলাদা আলাদা দেবতা ও তাদের মূর্তি এবং নরবলির প্রথা। গড়ে ওঠে দুটো ইন্ডিয়ান বসতি—মেক্সিকো ও কাস্কো। এই দুটো বসতি বা গ্রামে বাসিন্দার সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজারেরও বেশি। আগেকার কোন যুগে এক জায়গায় এত লোককে বসবাস করতে দেখা যায় নি। পৌর ও সামরিক প্রধানদের সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল এবং ঘটনাবলী জটিল হয়ে ওঠার ফলে এদের প্রভাবও বেড়ে ওঠে। এইসব প্রধানদের মধ্যে দিয়েই সমাজে অভিজাততন্ত্রের বীজ মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

এবার পূর্ব গোলার্ধের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই পর্যায়ে সেখানকার স্থানীয় গোষ্ঠী-গুলো বিভিন্ন পশুকে পোষ মানাতে শুরু করেছিল। এইসব পশুদের থেকে তারা মাংস আর দুধ পেত। তবে বাগান-চাষ বা আটাজাতীয় খাদ্যের ব্যবহার তারা জানত

১। হেরেরা, প্রথম পরিচ্ছেদ, iv, ১৬.

২। ঐ, iii, ১৯; iv, ১৬, ১৩৭. ক্ল্যাভিগেরো, ii, ১৬৫.

৩। ক্ল্যাভিগেরো, ii, ২৩৮. হেরেরা, ii, ১৪৫; iv, ১৩৩.

৪। হ্যাক্লুইট-এর "বল অফ ভয়েজেস্‌," পরিচ্ছেদ ১, iii, ৩৭৭.

বলে মনে হয় না। বন্য ঘোড়া, গরু, ভেড়া, গাধা, শুয়োর ও ছাগল যে পোষ মানানো যায় এবং তাদেরকে বংশানুক্রমভাবে পোষ মানাতে পারলে তা জীবনধারণের একটা স্থায়ী উপায় হয়ে উঠতে পারে—এই আবিষ্কারটা মানুষের অগ্রগতির পথে বিপুল প্রেরণা যুগিয়েছিল। কিন্তু এইসব পশুদের লালনপালন করা এবং তাদের প্রজননের সাহায্যে নতুন নতুন পশুর জন্ম দেওয়ার জন্য দরকার ছিল পশুপালন নির্ভর জীবনযাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এটা না হওয়া পর্যন্ত ঐ প্রেরণাটা সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে নি। ইওরোপ ছিল মূলত অরণ্যময় অঞ্চল, তাই সেখানে পশুপালননির্ভর জীবনযাত্রা শুরু করাটা খুব সুবিধেজনক ছিল না। কিন্তু এশিয়ার সমুদ্রতীর থেকে দূরবর্তী তৃণময় অঞ্চল এবং ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস ও এশিয়ার অন্যান্য নদীর সন্নিহিত অঞ্চলগুলো ছিল পশুপালক গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে আদর্শ জায়গা। স্বাভাবিকভাবেই তারা ঐ-সব জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেছিল। আমাদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষরা এইসব অঞ্চলেই বসবাস করতেন। পশুপালক সেমিটিক গোষ্ঠীগুলোর মত সংগ্রাম করে এখানে টিকে থাকতে হত তাদের (তৃণময় অঞ্চল ছেড়ে পশ্চিম এশিয়া ও ইওরোপের অরণ্যময় অঞ্চলে চলে যাওয়ার আগেই নিশ্চয়ই তারা বিভিন্ন শস্য ও লতা-গুল্মের চাষ শুরু করেছিল। বিভিন্ন গৃহপালিত জীবজন্তু তাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে ওঠার ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের এ-সব চাষ শুরু করতে হয়েছিল। তাই আর্য গোষ্ঠীগুলো পশ্চিমের দিকে চলে যাওয়ার আগেই যে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের চাষ শুরু করেছিল, এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে (সম্ভবত শুধুমাত্র কেল্ট-রা বাদে)। এই সময় থেকেই পূর্ব গোলার্ধে শন ও পশমের পোশাক এবং ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বানানো শুরু হয়।

এগুলোই ছিল বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের প্রধান প্রধান উদ্ভাবন ও আবিষ্কার। সমাজ এ-সময় আরও সংগঠিত হয়ে উঠেছিল এবং তার ঘটনাবলী হয়ে উঠেছিল জটিলতর। অসম অবস্থার দরুন দুটো গোলার্ধের সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও প্রগতির মূল স্রোতটা এগিয়ে চলেছিল লোহা সংক্রান্ত ধারণা আর তা ব্যবহারের দিকেই। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছনোর জন্য তখন একান্ত দরকার ছিল ধার ও ডগাবিশিষ্ট ধাতব যন্ত্রপাতি। এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা একমাত্র লোহারই ছিল। সবথেকে উন্নত গোষ্ঠীগুলো ঠিক সীমারেখাটায় পৌঁছে থমকে গিয়েছিল। তাদের সামনে তখন আকরিক লোহাকে গলানোর পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ তখন প্রচুর বেড়ে উঠেছিল এবং জমির সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কের ব্যাপারেও ঘটেছিল কিছু পরিবর্তন। মতবাদের সমগ্র অঞ্চলটার ওপর গোষ্ঠীর সার্বজনীন অধিকার থাকলেও তার একটা অংশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হত সরকারি কার্যকলাপের জন্য, একটা অংশ নির্দিষ্ট থাকত ধর্মীয় কাজকর্মে ব্যবহারের জন্য এবং আর একটা বৃহত্তর অংশ (যেখান থেকেই লোকেরা নিজেদের জীবধারনের উপকরণ সংগ্রহ করত) ভাগ করে দেওয়া হত ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্র বা দলের মধ্যে (সুপ্রা, পৃঃ ২০০)। কোন ব্যক্তি একাই একখণ্ড জমি বা একটা বাড়ির মালিক আর ইচ্ছে করলে যাকে খুশি

সে সেই জমি বা বাড়ি বিক্রী করতে কিংবা দিয়ে দিতে পারে—এই ব্যাপারটা তখনও চালু হয় নি, চালু হওয়া সম্ভবও ছিল না। জমির মালিক ছিল গোত্র বা দল, যৌথ-বাসগৃহগুলোয় পরস্পর জ্ঞাতিত্বসম্পর্কযুক্ত কয়েকটা পরিবার একত্রে বসবাস করত। এই পদ্ধতি চালু থাকার ফলে বাড়ি বা জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা তখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এইসব জমি বা বাড়ি বাইরের লোকদের কাছে বিক্রী বা হস্তান্তর করা হলে তাদের জীবনযাত্রার ধাঁচটাই বদলে যেত।[১] জমি বা বাড়ি ভোগ-দখলের ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের একটা অধিকার ছিলই এবং গোত্রের বাইরের কারুর কাছে তা হস্তান্তর করা চলত না। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার জমি বা বাড়ি ভোগদখলের অধিকার পেত তার সগোত্রীয় উত্তরাধিকারীরাই। যৌথ-বাসগৃহ এবং সার্বজনীন জমি—এই দুটো বিষয় থেকেই বোঝা যায় যে তাদের জীবনযাত্রার ধাঁচটা ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে প্রতিকূল।

মোকি ভিলেজ্ ইণ্ডিয়ানরা এই সময় তাদের সাতটা গ্রাম আর বাগানগুলো ছাড়াও বেশ কিছু ভেড়ার পাল, ঘোড়া, খচ্চর এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। নানান আয়তনের ও চমৎকার ধরনের মৃৎপাত্র বানাত তারা আর নিজেদের তৈরি সুতো দিয়ে তাঁতের সাহায্যে বানাত পশমী কম্বল। ওরেবি গ্রামের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন মেজর জে. ডব্লিউ. পাওয়েল, যা থেকে বোঝা যায় যে স্ত্রী-র সম্পত্তির ওপর কিংবা সন্তানদের ওপর স্বামীদের কোন অধিকারই থাকে না। জুনি গ্রামের জনৈক পুরুষ ওরেবি-র একজন নারীকে বিবাহ করে। তিনটি সন্তান হয় তাদের। স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে সে ওরেবিতেই বসবাস করত। তার স্ত্রী মারা যায় (মেজর পাওয়েল তখন ঐ গ্রামেই ছিলেন)। মৃতার জ্ঞাতিরাই তার সন্তানদের গ্রহণ করে এবং তার গেরস্থালির জিনিসপত্রগুলো নিয়ে নেয়। স্বামীটি ফেরৎ পায় শুধু নিজের ঘোড়া, পোশাক আর হাতিয়ারগুলো। স্বামীকে তার নিজের কিছু কম্বল নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার স্ত্রী-র কম্বলগুলো রেখে দেওয়া হয়েছিল। স্বামীটি মেজর পাওয়েলের সঙ্গেই যাত্রা করে এবং বলে যে সে সান্তাফে? যে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যাবে, তারপর ফিরে যাবে তার নিজের গ্রাম জুনিতে। মোকিদের আর

১। রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গর্ম্যান, যিনি লাগুনা পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে মিশনারি হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ নিউ মেক্সিকো-র এক অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে (পৃঃ ১২) বলেন যে, "সম্পত্তির অধিকার পরিবারের নারীদের হাতে থাকে এবং ঐ ধারা অনুযায়ী মায়ের কাছ থেকে সেই অধিকার বর্তায় মেয়েদের ওপর। তাদের জমিগুলো সার্বজনীন অর্থাৎ গোটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। কিন্তু কোন ব্যক্তি একটা জমিতে চাষ করার পর সেই জমির ওপর তার একটা ব্যক্তিগত অধিকার জন্মায়, 'যা সে ঐ সম্প্রদায়ের অন্য কারুর কাছে বিক্রি করতে পারে।' তাদের শস্যভাণ্ডারের দায়িত্ব থাকে মেয়েদেরই হাতে এবং তাদের স্পেনীয় প্রতিবেশীদের তুলনায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা অনেক বেশি দূরদর্শী। সাধারণত তারা সবসময়ই পুরো এক বছরের খাদ্য মজুত রাখার চেষ্টা করে। একমাত্র পর পর দু'বছর আকাল দেখা দিলে তবেই তাদেরকে অনাহারের মুখোমুখি হতে হয়।

একটা গ্রামেও (শি-পাও-এ-ল্ভ-ইহ্) এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এবং সেই ঘটনারও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন আমার সংবাদদাতা। স্বামী, সন্তান এবং কিছু সম্পত্তি রেখে মারা যায় জনৈক নারী। মৃতার জ্ঞাতিরাই তার সন্তানদের গ্রহণ করে এবং মৃতার যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার করে। স্বামীটি শুধু নিজের পোশাকগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার অনুমতি পায়। মেজর পাওয়েল এই স্বামীটিকে দেখেছিলেন। কিন্তু সে মোকি ইণ্ডিয়ান ছিল নাকি অন্য কোন গোষ্ঠীর সদস্য ছিল, তা তিনি জানতে পারেন নি। এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে সন্তানদের ওপর মায়েরই অধিকার থাকত, বাবার নয়। এমনকি মায়ের মৃত্যুর পরও বাবা তাদের সন্তানদের নিয়ে যেতে পারত না। ইরোকোয়া এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই রীতিই চালু ছিল। তাছাড়া স্ত্রী-র সম্পত্তিও আলাদা করে রাখা হত এবং তার মৃত্যুর পর সেগুলো পেত তার জ্ঞাতিরা। এ থেকে বোঝা যায় যে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী কিছুই নিত না, কারণ স্ত্রী-র কাছ থেকে স্বামীও নিত না কিছুই। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে মেক্সিকোর ভিলেজ্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও এই রীতিই চালু ছিল।

গ্রামের বাড়িগুলোর যে-সব ঘরে এবং অংশে যে যে নারী ও পুরুষরা বসবাস করত, সেইসব ঘর ও অংশের ওপর তাদের একটা ভোগদখলের অধিকার থাকতই। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই অধিকার তাদের কাছ থেকে বর্তাতো তাদের নিকটতম জ্ঞাতিদের ওপর। প্রতিটি গ্রামের এইসব অংশগুলোর ওপর কীভাবে বিভিন্ন জনের মালিকানা গড়ে উঠত, কীভাবে তা উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হত, বাইরের কোন লোকের কাছে তা বিক্রি ও হস্তান্তর করার অধিকার মালিকের ছিল কি না, এবং তা না থাকলে ভোগদখলের অধিকারের প্রকৃতিটা ঠিক কেমন ছিল এবং এই অধিকারের সীমা ছিল কতটা—এগুলো আমাদের জানা দরকার। সেইসঙ্গেই জানা দরকার পুরুষদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীই বা কারা হত। একটু পরিশ্রম করলেই এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে।

দক্ষিণাঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার জমি ভোগদখলের অধিকার সম্বন্ধে স্পেনীয় লেখকরা প্রচণ্ড বিভ্রান্তিকর সব মন্তব্য করেছেন। যেখানেই তাঁরা দেখেছেন যে একদল লোক যৌথভাবে কিছু জমির মালিক, সেই জমি তারা বাইরের কারুর কাছে হস্তান্তর করতে পারে না এবং কোন একজন ব্যক্তি তাদের প্রধান হিসেবে স্বীকৃত সেখানেই তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে এগুলো হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি, ঐ প্রধানকে বলেছেন সামন্তপ্রভু এবং যৌথভাবে জমির অধিকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেছেন তার প্রজা হিসেবে। তাঁদের এইসব মন্তব্যে প্রকৃত অবস্থাটা বিকৃত হয়ে উঠেছে। একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে একদল লোক যৌথভাবে এইসব জমির মালিক ছিল। কিন্তু একইরকম গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয়ের কথা তাঁরা উল্লেখ করেন নি। তা হল—কোন্ ঐক্যবন্ধন এইসব লোকদের একত্রে ধরে রাখত। এটা যদি কোন গোত্র, বা গোত্রের অংশ হয়ে থাকে, তাহলে গোটা ব্যাপারটা মুহূর্তে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের রীতি চালু আছে। কিন্তু অধিকাংশ গোষ্ঠীই স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের রীতি গ্রহণ করেছে। এই পরিবর্তনের পিছনে-

সম্পত্তিই প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। অর্থাৎ, সন্তানরা যাতে জ্ঞাতি হিসেবে বাবার সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে, তার জন্যই এই পরিবর্তনটা ঘটানো হয়েছে। যাভাদের মধ্যে পুরুষ ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের রীতিই চালু ছিল। আজ্‌টেক, টেজ,কুকান, টুলাকোপান এবং টুলাস্‌কালানদের মধ্যে পুরুষ-ধারা চালু ছিল নাকি স্ত্রী-ধারা, তা বলা মুশ্কিল। সম্ভবত ভিলেজ্‌ ইণ্ডিয়ানদের সব গোষ্ঠীর মধ্যেই স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হয়েছিল, তবে পুরনো রীতির কিছু কিছু ছাপ এখানে-ওখানে রয়েই গিয়েছিল—যার প্রমাণ হিসেবে টিউক্‌টুলি পদটার কথা উল্লেখ করা যায়। এই পরিবর্তনের ফলে গোত্রীয় উত্তরাধিকারের রীতির কোন হেরফের ঘটে নি। কয়েকজন স্পেনীয় লেখক বলেছেন যে মৃত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত সন্তানরা, কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র। এইসব বক্তব্য থেকে তাদের ব্যবস্থার একটা বর্ণনা পাওয়া গেলেও এই জাতীয় বক্তব্যগুলো নিতান্তই গুরুত্বহীন।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম, অর্থাৎ মৃতের সম্পত্তি তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার রীতিটা ভিলেজ্‌ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে চালু ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারা চালু থাকার দরুণ কোন মৃত ব্যক্তির সন্তানরাই তাঁর নিকটতম জ্ঞাতি হিসেবে গণ্য হত এবং স্বাভাবিক ভাবেই তার সম্পত্তির বৃহত্তম অংশটাও তারাই পেত। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওপর শুধুমাত্র তার সন্তানদেরই অধিকার থাকার রীতিটা তাদের মধ্যে চালু হওয়া মোটেই সম্ভবপর ছিল না। উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে আগেকার যুগের ও পরবর্তী যুগের লেখকরা যে-সব আলোচনা করেছেন, তা মোটেই সন্তোষজনক নয় এবং এগুলোর মধ্যে যথাযথ তথ্যেরও অভাব আছে। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতি ও প্রথাই তখনও পর্যন্ত নির্ণায়ক ভূমিকা নিত এবং শুধুমাত্র এগুলোর সাহায্যেই গোটা ব্যবস্থাটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমাদের হাতে এখনও পর্যন্ত যতটুকু প্রমাণ আছে, তার থেকে আরও ভালো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায় না যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে শুধুমাত্র তার সন্তানরাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তরাধিকারের তিনটি নিয়ম—পূর্বানুবৃত্তি

বর্বর যুগের শেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টায় আমেরিকার আদিবাসীরা কখনোই পারে নি। এই পর্যায়টা শুরু হয়েছিল পূর্ব গোলার্ধে। লোহা তৈরি ও তা ব্যবহার করা দিয়েই সূচনা হয় এই পর্যায়ের।

আমরা আগেই বলেছি যে আকরিক লোহাকে গলানোর পদ্ধতি উদ্ভাবনের পাশে মানুষের অন্য সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কার ম্লান হয়ে যায়। ব্রোঞ্জের ব্যবহার রপ্ত করা করা সত্ত্বেও মজবুত ধাতব যন্ত্রপাতির অভাবে এবং যান্ত্রিক কাজকর্মে প্রয়োগ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তপোক্ত ও কঠিন একটা ধাতুর অভাবে মানুষের অগ্রগতির পথটা ঠিক মসৃণ হয়ে উঠতে পারছিল না। এই সব গুণগুলো প্রথম পাওয়া গেল লোহার মধ্যে। এই উদ্ভাবনের পর থেকেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা বেড়ে উঠতে লাগল দ্রুত গতিতে। মানবজাতির অভিজ্ঞতার সমগ্র ইতিহাসে এই চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক যুগটা নানা দিক থেকে সবথেকে উজ্জ্বল ও সবথেকে উল্লেখযোগ্য যুগ। এই যুগে মানুষের এত বেশি সাফল্যের কথা জানা গেছে যে মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয় এর মধ্যে কয়েকটা হয়ত পূর্বতন যুগেই ঘটে গিয়েছিল।

৪। বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় সম্পত্তি।

এই পর্যায়ের শেষ দিক নাগাদ নানা ধরনের সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হতে শুরু করে। এক জায়গায় স্থানীয় বাণিজ্য এবং বৈদেশিক ব্যবসা—এইসব ঘটনাই সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। তবে জমি ভোগদখলের যে পুরনো নিয়ম অনুসারে জমির ওপর সার্বজনীন মালিকানা কায়েম ছিল, তা কিন্তু (কোন কোন জায়গা বাদে) জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে তখনও পর্যন্ত পথ ছেড়ে দেয় নি, তাই জমির ওপর সার্বজনীন মালিকানাই বহাল ছিল। এই সময় থেকেই দাসত্বপ্রথা মাথা তুলতে শুরু করে। সম্পত্তি উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরিভাবেই সম্পর্ক যুক্ত ছিল এই দাসত্বপ্রথা। এ থেকেই গড়ে ওঠে হিব্রু ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবার, এবং গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠে এই ধরনের পরিবারেরই একটা পরিবর্তিত রূপ। এইসব কারণে এবং বিশেষত ক্ষেত্রচাষের ফলে জীবনধারণের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে হাতে আসার দরুণ জাতিগুলো সংখ্যায় বেড়ে উঠতে থাকে। আগে যেখানে মাত্র কয়েক হাজার জাতি ছিল, এখন সেখানে একটা সরকারের অধীনেই বহু হাজার জাতির অভ্যুদয় ঘটে। এক একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে এবং প্রাচীরবেষ্টিত শহরে এক একটা গোষ্ঠী বসবাস করতে শুরু করে, বেড়ে ওঠে লোকসংখ্যা, আর তার ফল হিসেবে সবথেকে ভালো অঞ্চলগুলো দখলের জন্য প্রতিযোগিতাও বেড়ে উঠতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হয়ে ওঠে যুদ্ধকৌশল আর ব্যক্তিগত শৌর্যের জন্য মানুষ আরও বেশি পুরস্কার পেতে থাকে। অবস্থা এবং জীবনযাত্রার এই পরিবর্তন সভ্যতার

আগমনকেই সূচিত করেছিল। গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল সভ্যতাই।

পশ্চিম গোলার্ধের বাসিন্দারা এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতার শরিক না হলেও তারা এগিয়ে চলেছিল সেই পথ ধরেই, যে পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিল পূর্ব গোলার্ধের অধিবাসীরা। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায় এবং তারপর সভ্যতার কিছু বছর—এই সময়টুকুতে তারা মানবজাতির অগ্রসর অংশের থেকে পিছিয়ে পড়েছিল।

এখন আমাদের খুঁজে দেখতে হবে অগ্রগতির এই পর্যায়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণা কোন্ স্তরে পোঁছেছিল। বিভিন্ন বস্তুর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মগুলোর মধ্যেই তার প্রমাণ বিধৃত আছে।

সভ্যতার যুগ শুরু হওয়ার পর গ্রীক, রোমান ও হিব্রুরা প্রথম যে আইনগুলো রচনা করেছিল, সেগুলো আসলে তাদের পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন রীতি ও প্রথাকে একটা আইনী চেহারা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সর্বশেষ আইনগুলো আর আগেকার নিয়মগুলো জানা থাকলে এ দুয়ের অন্তর্বর্তী পরিবর্তনগুলোর কথা যথাযথভাবে জানা না গেলেও আন্দাজ করে নেওয়া যায় সহজেই।

বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের শেষ দিকে জমি ভোগদখলের ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল সমাজের বুকে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল দু'ধরনের মালিকানা—রাষ্ট্রীয় আর ব্যক্তিগত। তবে সভ্যতার যুগ শুরু না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারটা পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। আমরা আগেই দেখেছি যে তখন গ্রীকদের মধ্যে কিছু জমি ছিল গোষ্ঠীগুলোর সার্বজনীন, কিছু জমি ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের জন্য থাকত ভ্রাতৃত্বের হাতে আর কিছু জমি ছিল গোত্রগুলোর যৌথ সম্পত্তি, কিন্তু জমির বেশির ভাগই চলে গিয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে। সোলোনের আমলে (এথেনীয়দের সমাজ-ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত গোত্রভিত্তিকই ছিল) জমির মালিক ছিল মূলত বিভিন্ন ব্যক্তিই এবং ততদিনে তারা জমি বাঁধা রাখতেও শিখে গিয়েছিল।[১] তবে ব্যক্তিগত মালিকানা তখন আর কোন নতুন জিনিস ছিল না। রোমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একেবারে প্রথম থেকেই একটা সার্বজনীন এলাকা থাকত, যাকে বলা হত 'এজার রোমানাস' (Ager Romunus); আর কিছু জমি ধর্মীয় কাজকর্মের জন্য থাকত কিউরিয়ার হাতে, কিছু জমি থাকত গোত্রের হাতে এবং বাকি কিছু জমি থাকত বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে। এইসব প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হওয়ার পর তাদের সার্বজনীন জমিগুলো ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। আমাদের শুধু এইটুকুই জানা আছে যে বিশেষ কিছু কাজে ব্যবহারের জন্য কিছু জমি এইসব সংগঠনের হাতে থাকত আর দেশের সম্পদ-গুলো ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছিল।

এইসব নানান ধরনের মালিকানা থেকে বোঝা যায় যে সবথেকে আগে জমি ভোগদখলের অধিকার থাকত সমগ্র গোষ্ঠীর হাতে। তারপর জমিতে চাষের কাজ শুরু হওয়ার পর গোষ্ঠীর জমির একটা অংশ ভাগ করে দেওয়া হত গোত্রগুলোর মধ্যে এবং প্রতিটি গোত্রের ভাগের জমিটুকু হয়ে উঠত গোত্রের সার্বজনীন সম্পত্তি। একটা সময়ে এসে

১। প্লুটার্ক, "সোলোন" রচনায়, পরিচ্ছেদ ১৫.

গোত্রের জমি আবার ভাগ করে দেওয়া হয় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এবং এ থেকেই জমির ওপর কায়েম হয় ব্যক্তিগত মালিকানা। অনধিকৃত এবং পতিত জমিগুলোর তখনও পর্যন্ত গোত্র, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রের সার্বজনীন সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচিত হত। জমির মালিকানার ব্যাপারটা মোটামুটি এভাবেই এগিয়েছে। অস্থাবর সম্পত্তির ওপরেও ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয়।

বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়েই গড়ে ওঠে একবিবাহভিত্তিক পরিবার। পূর্বতন জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যে থেকে এই একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার সঙ্গে সম্পত্তি বৃদ্ধি এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মগুলোর একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল। বংশ-ধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারার বদলে চালু হয়েছিল পুরুষ-ধারা। কিন্তু স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বরাবরের মতই গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক রয়ে গিয়েছিল। গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই সময় কোন্ কোন্ ধরনের সম্পত্তি বিদ্যমান ছিল, সে সম্বন্ধে তথ্য বলতে আমাদের হাতে আছে মূলত হোমারের কাব্য এবং সভ্যতার যুগের প্রথম দিকের আইনগুলো (যার মধ্যে প্রাচীন রীতিগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে)। ইলিয়াডে কর্ষিত জমির চারদিকে বেড়া দেওয়ার[১] কথা উল্লেখ করা হয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে, 'পঞ্চাশ একরব্যাপী ঘেরা এলাকা'-র কথা যার অর্ধেকটা ছিল আঙ্গুর-চাষের উপযোগী আর বাকি অর্ধেকটা অন্যান্য চাষের উপযোগী।[২] টাইডেয়ুস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সে প্রচুর সম্পদে ভরা একটা প্রাসাদে বাস করত এবং তার প্রচুর ফলন্ত জমি ছিল।[৩] জমির চারদিকে যে তখন বেড়া দেওয়া হত, জমির মাপজোক করা হত এবং জমির ওপর যে ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণায় ও সম্পত্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। কোন্ ধরনের ঘোড়ার বাচ্চা উৎকৃষ্টতর হয়, তা ততদিনে শিখে নিয়েছিল মানুষ।[৪] ব্যক্তিগত মালিকানার গরু-ভেড়ার পাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "খোঁয়াড়ে এক ধনী ব্যক্তির অসংখ্য ভেড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে।"[৫] মুদ্রার প্রচলন তখনও হয় নি, তাই বাণিজ্য চলত পণ্য-বিনিময় মারফৎ। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "অতঃপর দীর্ঘকেশ-বিশিষ্ট গ্রীকরা তাদের পিতল, চক্‌চকে লোহা, পশুচর্ম, ষাঁড় এবং ক্রীতদাসের বিনিময়ে সুরা ক্রয় করল।"[৬] তবে কথাপ্রসঙ্গে সোনার বাটের ওজন এবং তার গুণমানের কথাও উল্লিখিত হয়েছে।[৭] সোনা, রুপো, পিতল ও লোহার জিনিসপত্র, ক্ষৌমবস্ত্র বা লিনেন ও পশমের নানারকম জামাকাপড়, বিভিন্ন বাড়ি, প্রাসাদ—এ-সবের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর আর প্রয়োজন নেই। প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলো থেকে স্পষ্ট·

১। ইলিয়াড, v, ৯০.
২। ঐ, ix, ৫৭৭.
৩। ঐ, xiv, ১২১.
৪। ঐ, v, ২৬৫.
৫। ঐ, iv, ৪৩৩, বাক্‌লে-র অনুবাদ।
৬। ঐ, vii, ৪৭২, বাক্‌লে-র অনুবাদ।
৭। ঐ, xii, ২৭৪.

ভাবেই বোঝা যায় অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বর্বর যুগের এই উচ্চ পর্যায়ে সমাজ কতটা উন্নত হয়ে উঠেছিল।

বাড়ি, জমি, গবাদি পশু ও বিনিময়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে ওঠার পর এবং সেগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হওয়ার পর এইসব সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নটা মানুষের মনে চেপে বসেছিল। গ্রীকদের ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিমত্তাকে সন্তুষ্ট করার মত মজবুত একটা বনিয়াদের ওপর এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারা পর্যন্ত ঐ চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় নি মানুষ। পরবর্তীকালের নতুন ধ্যানধারণা অনুসারে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল পুরনো প্রথার। আগেকার যুগের সমস্ত সম্পত্তির থেকে মূল্যবান ছিল গৃহপালিত পশুর দল। এরা মানুষকে খাদ্য যোগাত, বিনিময়যোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেত এদের, কাজে লাগানো যেত যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য, জরিমানা দেওয়ার জন্য এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলি দেওয়ার ব্যাপারেও। তাছাড়া এই গৃহপালিত পশুদের বংশবৃদ্ধি ঘটত দ্রুত হারে আর এ থেকেই সম্পদের ধারণাটা মানুষের মধ্যে প্রথম গড়ে ওঠে। এর পর জমিতে প্রণালীবদ্ধভাবে চাষ করতে শেখে মানুষ। এর ফলে পরিবারগুলো জমির সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পরিণত হয় এক একটা সম্পত্তি-উৎপাদক সংগঠনে। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠে ক্রীতদাস ও ভৃত্যসহ পিতৃপ্রধান পরিবার। পিতা ও তার সন্তানরা আরও বেশি করে যুক্ত হয়ে পড়ল জমির সঙ্গে, গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে। এই সব কিছুর ফলে তৎকালীন একবিবাহভিত্তিক পরিবারগুলো একটা নিজস্বতা, একটা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছিল তো বটেই, সেই সঙ্গেই যে সম্পত্তি সৃষ্টিতে সন্তানরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে তার উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তাদের দাবীটাও আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে গবাদি পশুরা স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সদস্যদের যৌথ সম্পত্তি ছিল। সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকারের নিয়ম যে এই অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়াবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু জমি যখন সম্পত্তিতে পরিণত হল এবং বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ জমিগুলো পরিণত হল তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, তখন ঐ সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকারের বদলে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, যে নিয়ম অনুসারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সন্তানরা। লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু গোষ্ঠী-গুলোর মধ্যে সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকারের নিয়ম কখনও পুরোপুরিভাবে চালু ছিল কি না, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে রোমান, গ্রীক ও হিব্রু আইন থেকে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের হাতে তুলে দেওয়ার রীতি চালু ছিল তাদের মধ্যে। এ থেকে মনে হয় যে প্রথম দিকে তাদের মধ্যে সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকারের নিয়মটা পুরোপুরিভাবেই ক্রিয়াশীল ছিল।

ক্ষেত্রে চাষের ফলে দেখা গেল যে পৃথিবীর সবটুকু অঞ্চলই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পর্যবসিত হতে পারে এবং উঠল, তখন থেকেই সম্পত্তির ব্যাপারে এক নতুন যাত্রা শুরু হল মানব-জাতির। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায় শেষ হওয়ার আগেই গোটা ব্যাপারটা একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা নিতে পেরেছিল। এই সময় থেকে মানুষের চিন্তাভাবনার ওপর সম্পত্তি কতটা

শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল এবং তার ফলে মানুষের চরিত্রে কতরকম নতুন নতুন উপাদান মাথা তুলতে শুরু করেছিল—তা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে বন্য মানুষদের চিন্তাভাবনায় যে জিনিসটা নিতান্ত দুর্বল একটা রেখাপাত করতে পেরেছিল, সেই জিনিসটাই মহাকাব্যীয় যুগের বর্বরদের মনে দেখা দিয়েছিল এক বিপুল প্রেরণা হিসেবে এই বিকশিত অবস্থার সামনে প্রাচীন প্রথা অথবা পরবর্তী যুগের রীতি নীতি—কারুর পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। তখন সেই সময়টা এসে গিয়েছিল, যখন সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে একবিবাহভিত্তিক পরিবার নিশ্চিতভাবে, নির্ধারণ করা যাচ্ছে সন্তানদের পিতৃত্ব এবং মৃত পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে চলেছে তার সন্তানরা।[১]

হিব্রু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে (যাদের বর্বর দশা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় নি) সভ্যতার যুগ শুরু হওয়ার আগে থেকেই জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা চালু ছিল। এফ্রনের কাছ থেকে আব্রাহামের ম্যাক্‌পেলাহ্‌ গুহাটা কেনার ঘটনা এরই একটা দৃষ্টান্ত।[২] তার আগে তারা নিশ্চয়ই ঠিক আর্য গোষ্ঠীগুলোর মত একই অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করে এসেছিল আর তাদেরই মত গৃহপালিত পশু, খাদ্যশস্য, লোহা, পিতল, সোনা, রুপো, মাটির তৈরি জিনিসপত্র এবং পোশাক-পরিচ্ছদের অধিকারী হয়ে পেরিয়ে এসেছিল বর্বর যুগ। কিন্তু আব্রাহামের আমলে ক্ষেত্রচাষ সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুব একটা উন্নত ছিল না। অভিনিষ্ক্রমণের (Exodus) পর ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর (প্যালেস্তাইনে গিয়ে পেঁছিনোর পর যাদের জন্য বিভিন্ন এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল) ভিত্তিতে হিব্রু সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাঠামো থেকে বোঝা যায় সভ্যতার শুরুতে তাদের মধ্যে গোত্রীয় প্রতিষ্ঠান চালু ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার ধারণা তখনও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। মোজেস্‌-এর আইন থেকে মোটামুটি স্পষ্টভাবেই মনে হয় যে সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তাদের ধ্যানধারণায় ক্রমোন্নতি অনেকটা গ্রীক আর রোমান গোষ্ঠীগুলোর মত একই পথ ধরে এগিয়েছে। উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা পুরোপুরি-

---

১। জার্মান গোষ্ঠীগুলোর কথা যখন প্রথম জানা যায়, তখন তারা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে ছিল। তারা লোহা ব্যবহার করত (খুব অল্প পরিমাণে), গরু-ভেড়ার পাল ছিল তাদের, খাদ্যশস্যের চাষ করত তারা, এবং লিনেন ও পশম দিয়ে পোশাক বানাত। কিন্তু জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা তখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। সিজারের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে চাষের উপযোগী জমিগুলো প্রধানরা প্রতি বছর গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন আর পশুচারণভূমিগুলো থাকত গোষ্ঠীর সার্বজনীন এক্তিয়ারে। তাই মনে হয় এশিয়া এবং ইওরোপে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে মানুষের মধ্যে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার কোন ধারণা ছিল না, এই ধারণাটা গড়ে উঠেছিল বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর।

২। "জেনেসিস," xxiii, ১৩.

ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল ভ্রাতৃত্বের মধ্যে, বা সম্ভবত শুধু গোত্রের মধ্যেই, অর্থাৎ "পিতার বংশের মধ্যে।" উত্তরাধিকারের ব্যাপারে হিব্রুদের পুরোনো নিয়ম কী ছিল, জানা যায় নি। একমাত্র মৃতের সম্পত্তি প্রত্যর্পণের নিয়ম থেকে যেটুকু আন্দাজ করা যায়। এদের এই সম্পত্তি প্রত্যর্পণের নিয়মটা ছিল হুবহু রোমানদের 'টুয়েল্ভ্ টেব্ল্'-এর আইনের মত। সম্পত্তি প্রত্যর্পণের এই নিয়মাবলী ছাড়াও একটা ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে পিতার সম্পত্তির ওপর তার সন্তানদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কোন অপুত্রক পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হত তার কন্যারা। সেক্ষেত্রে, উত্তরাধিকারণীর অধিকারের ওপর কোন বিশেষ বাধানিষেধ না থাকলে, তাদের বিবাহের পর ঐ সম্পত্তি তাদের নিজেদের গোত্র থেকে তাদের স্বামীদের গোত্রের এক্তিয়ারভুক্ত হত। নিজেদের গোত্রের মধ্যে বিবাহ যে নিষিদ্ধ ছিল, সেটা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না। গোত্রীয় উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে শেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা ঠিক এখান থেকেই দেখা দিয়েছিল। ঐ সম্পত্তিকে নিজের সদস্যদের মধ্যেই রাখতে চাইতে গোত্র। মোজেসের সামনে প্রশ্নটা এসেছিল হিব্রুদের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন হিসেবে আর সোলোনের সামনে এসেছিল এথেনীয়দের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন হিসেবে। দুজনে প্রশ্নটার সমাধানও করেছিলেন একই-ভাবে। ধরে নেওয়া যায় রোমান গোত্রগুলোর মধ্যেও এই প্রশ্নটা উঠেছিল। প্রশ্নটার আংশিক সমাধান করা হয় এই নিয়ম চালু করে যে বিবাহের পর মেয়েরা আর নিজেদের গোত্রের কোন অধিকারের দাবীদার থাকবে না। আর একটা প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রশ্নটা হল—নিজেদের গোত্রের মধ্যে বিবাহকে কি পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে নাকি সে-রকম কোন বাধানিষেধ থাকবে না। বিবাহের বাধানিষেধের ব্যাপারে জ্ঞাতিত্বটা কোন্ পর্যায়ের সেটাই ছিল বিবেচ্য, মূল জ্ঞাতিত্বটা নয়। এই শেষোক্ত নিয়মটাই হচ্ছে বিবাহের ব্যাপারে মানুষের অভিজ্ঞতার সর্বশেষ ফলাফল। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নিম্নোক্ত ঘটনাটার দিকে তাকালে হিব্রুদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান-গুলোর চেহারাটা বোঝা যায় আর সেইসঙ্গেই গ্রীক ও রোমানদের গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এগুলোর মূলগত সাদৃশ্যটা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

জেলোফিহাদের কোন পুত্র ছিল না, কন্যাদের রেখে তিনি মারা যান। তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীনী হয় তাঁর কন্যারাই। তারপর একসময় এই কন্যারা তাদের নিজেদের গোষ্ঠী অর্থাৎ জোসেফ গোষ্ঠীর বাইরের পুরুষদের বিবাহ করতে উদ্যোগী হয়। গোষ্ঠীর সম্পত্তি বাইরে চলে যাওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় গোষ্ঠীর সদস্যারা। প্রশ্নটা নিয়ে তারা হাজির হয় মোজেসের সামনে, বলে: "যদি ইজরায়েলের সন্তানদের অন্য কোন গোষ্ঠীর কোন ওরা ছেলেকে বিয়ে করে, তাহলে উত্তরাধিকারটা আমাদের পিতাদের থেকে নিয়ে ওরা যে গোষ্ঠীতে যাবে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এবং এই উত্তরাধিকার বিষয়টা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।"[১] কথাটা একটা প্রস্তাবিত কাজের বিবৃতির আকারে পেশ করা হলেও আসলে এর মধ্যে একটা ক্ষোভ লুকিয়ে আছে। গোত্র এবং গোষ্ঠীর হাত থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার অন্যত্র চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই এই ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। হিব্রু আইনপ্রণেতা তাঁর সিদ্ধান্তে গোত্র ও গোষ্ঠীর এই

১। "নাম্বার্স", xxxvi, ৪.

অধিকারকে সমর্থনই করেছিলেন।* জোসেফের পুত্রদের গোষ্ঠী তাদের বক্তব্য চমৎকার-ভাবে পেশ করেছে। জেলোফিহাদের কন্যাদের সম্বন্ধে প্রভু ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যাদেরকে ওরা সবথেকে ভাল বলে মনে করে, তাদেরকেই বিবাহ করুক, তবে সেই বিবাহটা নিজের পিতার গোষ্ঠীর মধ্যে হওয়া চাই। তাহলে আর ইজরায়েলের সন্তানদের উত্তরাধিকার এক গোষ্ঠীর হাত থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে চলে যাবে না। ইজরায়েলের প্রতিটি সন্তানেরই উচিত তার নিজের পিতার গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখা। যে-সব কন্যারা ইজরায়েলের সন্তানদের কোন গোষ্ঠীতে কোন উত্তরাধিকার লাভ করেছে, তাদের উচিত পিতার গোষ্ঠীর মধ্যে কাউকে বিবাহ করা যাতে করে ইজরায়েলের প্রতিটি সন্তান তার পিতার উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে।"[১] নিজেদের গোত্রের মধ্যেই না হলেও নিজেদের ভ্রাতৃত্বের মধ্যেকার কাউকেই বিবাহ করতে হত তাদের (সুপ্রা, পৃঃ ৩৬৮)। তাই জেলোফিহাদের কন্যাদেরও তাদের পিতার ভাইয়ের পুত্রদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল।[২] এরা শুধু তাদের নিজেদের ভ্রাতৃত্বেরই সদস্য ছিল না, ববং একই গোত্রের সদস্যও ছিল। তাছাড়া এরা তাদের নিকটতম জ্ঞাতিও ছিল।

এর আগের একটি ঘটনায় উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে রায় দিতে গিয়ে মোজেস সুস্পষ্ট ভাষায় নিম্নোক্ত নিয়মটি জারি করেন—"ইজরায়েলের সন্তানদের তোমরা জানিয়ে দেবে যে কোন লোক যদি মারা যায় এবং তার কোন পুত্র না থাকে, তাহলে তার উত্তরাধিকার বর্তাবে তার কন্যাদের ওপর। তার যদি কোন কন্যাও না থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারী হবে তার ভাইরা। কোন ভাইও যদি না থাকে তার, তাহলে ঐ উত্তরাধিকার বর্তাবে তার পিতার ভাইদের ওপর। তার পিতারও যদি কোন ভাই না থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারী হবে তার পরিবারের নিকটতম আত্মীয় এবং সে সেটা ভোগদখল করবে।"[৩]

এখানে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত, মৃত ব্যক্তির সন্তানরা; দ্বিতীয়ত, সম্পর্কের নিকটত্ব অনুযায়ী জ্ঞাতিরা; এবং তৃতীয়ত, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের মধ্যেকার আত্মীয়রা। উত্তরাধিকারীদের প্রথম শ্রেণীতে থাকত মৃত ব্যক্তির সন্তানরা। তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে পিতার সম্পত্তির অধিকারী হত পুত্ররাই, কিন্তু পিতার কন্যাদের অর্থাৎ বোনেদের ভরণপোষণের দায়িত্বটাও নিতে হত তাদের। আমরা আগেই দেখেছি যে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিগুণ অংশ পেত। পুত্র না থাকলে উত্তরাধিকার বর্তাতো কন্যাদের ওপর।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকত দু ধরনের জ্ঞাতিরা। প্রথমত, মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার ভাইরা। দ্বিতীয়ত, কোন ভাই না থাকলে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার পিতার ভাইরা। তৃতীয় শ্রেণীতে থাকত তার গোত্রের সদস্যরা এবং সেক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার নির্বাচিত হত সম্পর্কের নিকটত্ব অনুযায়ী,

---

১। "নাম্বার্স", xxxvi, ৫-৯.

২। ঐ, xxxvi, ১১.

৩। ঐ, xxxvi, ৮-১১.

অর্থাৎ, “তার পরিবারের নিকটতম আত্মীয়রা।” “গোষ্ঠী পরিবার” কথাটা যেহেতু ভ্রাতৃত্বেরই সমতুল (স্প্রো, পৃঃ ৩৬৯), তাই মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান ও জ্ঞাতি না থাকলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত ভ্রাতৃত্বের মধ্যে তার নিকটতম ব্যক্তিরা। স্ত্রী-ধারার আত্মীয়রা উত্তরাধিকারের আওতা থেকে পুরোপুরি বাদ পড়ে যেত। তাই মৃত ব্যক্তির বোনের সন্তানরা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না, বরং প্রয়োজন হলে উত্তরাধিকারী হত তার ভ্রাতৃত্বের সদস্যরা—যাদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা পিতার ভাইয়ের থেকেও দূরের। বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুসারে এবং সম্পত্তি ছিল গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, পিতা কখনও পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না কিংবা পিতামহ কখনও পৌত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না। এ ব্যাপারে এবং প্রায় সব ব্যাপারেই টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌স্‌-এর আইনের সঙ্গে মোজেসের আইনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, মানবজাতি যে একইরকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসেছে এবং একই ধ্যানধারণা যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমান্তরাল-ভাবে পুষ্ট হয়ে উঠেছে—তারই একটা উজ্জ্বল নজির খুঁজে পাওয়া যায় এই সাদৃশ্যের মধ্যে।

পরবর্তীকালে বিবাহ সম্বন্ধে লেভি-র আইন প্রচলিত হয়। এই আইন বিবাহকে এক নতুন ভিত্তিতে স্থাপিত করে, যার সঙ্গে গোত্রীয় আইনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই নতুন আইনে নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞাতি ও আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয় এবং ঐ-সব সম্পর্কের বাইরেকার যে-কোন নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই আইন বিবাহের ব্যাপারে হিব্রুদের গোত্রীয় রীতিগুলোর অবসান ঘটায়। আজকের দিনে খ্রিষ্টিয় জাতিগুলোর মধ্যে এই নতুন আইনই প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়েছে।

উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সোলোন যে-সব বিধি-বিধান চালু করেছিলেন, তার সঙ্গে মোজেসের আইনের প্রায় কোন পার্থক্য নেই। এ থেকে অনুমান করা যায় যে সম্পত্তির ব্যাপারে এথেনীয় ও হিব্রুদের প্রাচীন রীতি, প্রথা আর প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটা একই-রকম ছিল। সোলোনের আমলে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা এথেনীয়দের মধ্যে পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে গিয়েছিল। মৃত পিতার সম্পত্তি তার পুত্ররা সমানভাবে ভাগ করে নিত। তবে বোনেদের ভরণপোষণ এবং তাদের বিবাহের সময় তাদেরকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত অংশ দেওয়ার দায়িত্বও তাদের নিতে হত। মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র না থাকলে তার কন্যারা সম্পত্তিটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত সমানভাবে। এর ফলে নারীরাও সম্পত্তির অধিকারিণী হত আর জেলোফিহাদের কন্যাদের মত এদের সম্পত্তিও বিবাহের পর নিজেদের গোত্রের বদলে স্বামীদের গোত্রে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মোজেসের সামনে যে প্রশ্ন এসেছিল, সেই একই প্রশ্ন সোলোনের কাছেও আসে এবং তিনি তার সমাধানও করেন একইভাবে। বিবাহের ফলে এক গোত্রের হাত থেকে সম্পত্তি অন্য গোত্রের হাতে চলে যাওয়া ঠেকানোর জন্য সোলোন এই নিয়ম জারি করেন যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীদের বিবাহ করতে হবে তাদের সগোত্রীয় নিকটতম পুরুষ জ্ঞাতিদের—যদিও তারা একই গোত্রের সদস্য এবং তার আগে পর্যন্ত নিজের গোত্রের কাউকে বিবাহ করা নিষিদ্ধই ছিল।

এথেনীয় আইনে এটা এমন এক অটল বিধিতে পরিণত হয় যার ফলে ফক. দ্য কুলাগে তাঁর মৌলিক গ্রন্থটিতে মন্তব্য করেন যে উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করার সুযোগ নিয়ে আসলে সগোত্রীয় জ্ঞাতিরাই মৃতের সম্পত্তির উপর নিজেদের অধিকার কায়েম করত।[১] এমন ঘটনাও দেখা গেছে, যেখানে মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করে সম্পত্তিটা দখল করার জন্য তার সগোত্রীয় নিকটতম জ্ঞাতি নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তাকে বিবাহ করেছে। ডিমস্থিনিসের ইউবুলাইড্স্-এর প্রোটোম্যাকাস্ এর একটা দৃষ্টান্ত।[২] তবে, নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে কোন উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করার জন্য আইন কাউকে বাধ্য করত না কিংবা ঐ উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ না করে কেউ তার সম্পত্তি দাবীও করতে পারত না। মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার জ্ঞাতিরা আর কোন জ্ঞাতিও না থাকলে তার গোত্রের সদস্যরা। হিব্রু ও রোমানদের মত এথেনীয়রাও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিকে যে-কোন মূল্যে তার নিজের গোত্রের মধ্যেই রাখার ব্যবস্থা করেছিল। আগে যা সম্ভবত একটা চালু রীতি ছিল, সেটাকেই সোলোন পর্যবসিত করেছিলেন সুনির্দিষ্ট আইনে।

সম্পত্তি সম্বন্ধে মানুষের ধ্যানধারণার ক্রমোন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায় সোলোনের একটা আইনের মধ্যে। এই আইন অনুসারে লোকেরা উইল্ বা ইচ্ছাপত্র রচনা করে নিজেদের সম্পত্তি বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা করতে পারত। এই অধিকারটা যে একসময় সর্বত্রই স্বীকৃত হবে, তা নিশ্চিতই ছিল। তবে তার জন্য সময় ও অভিজ্ঞতা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। প্লুটার্ক বলেছেন যে ইচ্ছাপত্রের আইন চালু করে সোলোন বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কারণ তার আগে ইচ্ছাপত্র রচনা করে যাওয়ার কোন স্বীকৃতি ছিল না। তবে ইচ্ছাপত্রে সম্পত্তি ও বাস্তুকে অবশ্যই নিজের গোত্রের মধ্যে রাখতে হত। কোন ব্যক্তির সন্তান না থাকলে নিজের সম্পত্তি সে যাকে খুশি দিয়ে যেতে পারে—এই আইন চালু করার সময় সোলোন জ্ঞাতিত্বের থেকেও বেশি মূল্য দিয়েছিলেন বন্ধুত্বকে এবং সম্পত্তিকে তার মালিকের ন্যায্য অধিকারে পরিণত করেছিলেন।[৩] এই আইন অনুযায়ী নিজের সম্পত্তির ওপর জীবিতকালে প্রতিটি ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার থাকত এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিজের কোন সন্তান না থাকলে ঐ সম্পত্তি ইচ্ছেমত যাকে খুশি দিয়ে যাওয়ার অধিকার। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তির সন্তানরা গোত্রের মধ্যে তার ধারাবাহিকতার প্রতিনিধি ছিল, ততদিন পর্যন্ত সম্পত্তির ওপর গোত্রীয় অধিকারটাই ছিল চূড়ান্ত, অর্থাৎ গোত্রের বাইরের কারুর কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করা চলত না। এর প্রমাণ আমরা সর্বত্রই পাই। যে নীতিগুলো আজকের সমাজকে পরিচালিত করছে, সেগুলো গড়ে উঠেছিল ক্রমান্বয়ে এবং এগিয়ে এসেছিল একই লক্ষ্যের দিকে আমাদের উদাহরণগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটাই নেওয়া হয়েছে সভ্যতার যুগের ইতিহাস থেকে। কিন্তু তাই বলে এমনটা ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই যে সোলোনের আইনগুলো একেবারে অভিনব, একেবারে নতুন সৃষ্টি, আগেকার যুগে তার সমতুল

১। "দ্য এনশিয়েন্ট সিটি", লী অ্যাণ্ড শেপার্ড-এর সংস্করণ, স্মল্-এর অনুবাদ, পৃঃ ২৯.

২। "ডিমস্থিনিস এগেনস্ট ইউবুলাইড্স্", ৪১.

৩। প্লুটার্ক, "ভিটা সোলোন", পৃঃ ২১.

কোন কিছু ছিলই না। আসলে সম্পত্তি সম্বন্ধে মানুষের যে-সব ধ্যানধারণা অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে পুষ্ট হয়ে উঠছিল, সেগুলোকেই একটা ইতিবাচক পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিল সোলোনের আইন। প্রথাগত আইনের বদলে চালু হয়েছিল সুনির্দিষ্ট আইন।

টুয়েল্ভ্ টেব্ল্-এর রোমান আইনের (যা প্রথম ঘোষিত হয় ৪৪৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে)[১] মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তৎকালীন নিয়মগুলো বিধৃত হয়েছে। কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সন্তানরা এবং তার স্ত্রী। মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান এবং পুরুষধারায় কোন বংশধর না থাকলে ঐ সম্পত্তির অধিকারী হত সম্পর্কের নিকটত্ব অনুসারে তার জ্ঞাতিরা এবং কোন জ্ঞাতিও না থাকলে তার গোত্রের সদস্যরা।[২] এখানে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি যে আইনের মৌলিক ভিত্তিটা হল সম্পত্তি অবশ্যই গোত্রের মধ্যে থাকবে। লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু গোষ্ঠীগুলোর সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের মধ্যে আমাদের আলোচ্য এই উত্তরাধিকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম যথাক্রমে চালু ছিল কি না, তা জানার পিছু হেঁটে হেঁটে ব্যাপারটাকে বিচার করা ছাড়া আমাদের হাতে অন্য কোন উপায় নেই। যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে টুয়েল্ভ্ টেব্ল্স্-এর আইনে আমরা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মের যে কাঠামোটা দেখতে পাই, সেটা অর্জিত হয়েছিল একেবারে উল্টোদিক থেকে অর্থাৎ, জ্ঞাতিরা উত্তরাধিকারী হওয়ার আগের যুগের গোত্রের সদস্যরাই উত্তরাধিকারী হত এবং পিতার সম্পত্তির ওপর শুধু-মাত্র সন্তানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের যুগে জ্ঞাতিরাই অধিকারী হত ঐ সম্পত্তির।

বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে সমাজের বুকে মাথাচাড়া দেয় এক নতুন উপাদান : অভিজাত-তন্ত্র। মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র আর বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পদ ক্রমাগত বেড়ে চলা, এই দুয়ে মিলে ব্যক্তিগত প্রভাবের বনিয়াদটা গড়ে উঠেছিল। জনসাধারণের একটা অংশকে চির-দিনের মত হীনতার অবস্থায় নামিয়ে আনত যে ক্রীতদাসপ্রথা, তা-ও বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে এমন এক বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল যা পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক যুগগুলোতে একেবারেই দেখা যায় নি। এই ঘটনা, সম্পত্তি আর সরকারি পদ—এইসব উপাদানের মিশ্রণে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল এক অভিজাততান্ত্রিক মনোবৃত্তি (যা আজকের সমাজের বুকে একেবারে দৃঢ়মূল হয়ে চেপে বসেছে), অবহেলিত হচ্ছিল গোত্র কর্তৃক সৃষ্ট ও সযত্নে রক্ষিত গণতান্ত্রিক নীতিগুলো। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, কিছু লোক অন্যদের তুলনায় বেশি সুযোগসুবিধে পাচ্ছে, একই জাতির মধ্যে কিছু লোক অন্যদের তুলনায় বেশি সম্মান পাচ্ছে। নষ্ট হয়ে গেল সমাজের ভারসাম্য, দেখা দিল নানান বিবাদ, শত্রুতা।

বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে গ্রীক ও লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভিন্ন স্তরের প্রধানের পদগুলো সাধারণত পিতাদের কাছ থেকে পুত্রদের ওপর বর্তাতে শুরু করে (যা আদতে ছিল গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক এবং তার সদস্যদের মধ্যে মনোনয়ন-ভিত্তিক)। এই পদগুলো যে উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হত, তা আমাদের জানা

১। লিভি, iii, ৫৪,৫৭.

২। গেইয়াস, "ইনস্টিটিউটস", iii, ১, ৯, ১৭.

তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা যাবে না। তবে গ্রীকদের ক্ষেত্রে আর্কন, ফাইলো-ব্যাসিলিয়ুম কিংবা ব্যাসিলিয়ুম পদের যে-কোন একটা আর রোমানদের মধ্যে প্রিন্সেপ্স্ ও রেক্স পদের যে-কোন একটার যারা অধিকারী হত, তাদের মধ্যে অভিজাততন্ত্রের মনোবৃত্তিটা জোরদার হয়ে উঠত। তবে, এই মনোবৃত্তিটা একটা স্থায়ী চেহারা নিলেও তা এইসব গোষ্ঠীর পুরনো শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কাঠামোটাকে মূলগতভাবে পাল্টে দেওয়ার মত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। সম্পত্তি আর পদ—এই দুটো জিনিসই ছিল অভিজাততন্ত্রের বনিয়াদ।

পরবর্তী কালে আধুনিক সমাজকে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়েছে, তার অন্যতম ছিল এই সমস্যাটা, অর্থাৎ, এই নীতিটাকে টিকিয়ে রাখা হবে কি হবে না। প্রশ্নটা যেখানে সকলের সমান অধিকার ও অসম অধিকারের মধ্যে, সকলের জন্য সমান আইন ও অসম অধিকারের মধ্যে, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা ও সরকারি পদের অধিকার এবং ন্যায়বিচার ও বুদ্ধিমত্তার মধ্যে—সেখানে এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ফলাফল সম্বন্ধে সন্দেহের তেমন অবকাশ থাকে না। সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলোর উচ্ছেদ না ঘটিয়েই (একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাদে) বেশ কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে স্পষ্টভাবেই বোঝা গেছে যে সমাজের বুকে এরা একটা বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সভ্যতার অভ্যুদয়ের সময় থেকে সম্পত্তির পরিমান এত বেড়ে গেছে, এত বিচিত্র ধরনের সম্পত্তি সৃষ্টি হয়েছে, সম্পত্তি-মালিকদের স্বার্থে তার ব্যবহার এত বেড়ে উঠেছে এবং এত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা একটা অসম্ভব চাপে পরিণত হয়েছে। নিজেরই সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ছে। তবুও, এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে, যখন মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হবে, নির্ধারণ করতে পারবে রাষ্ট্রের সঙ্গে তার রক্ষনাধীন সম্পত্তির সম্পর্ককে এবং সম্পত্তিমালিকদের দায়দায়িত্ব ও অধিকারের সীমাকে। ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে সমাজের স্বার্থ অনেক মূল্যবান। এই দুয়ের মধ্যে একটা ন্যায্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। অতীতের মত মানুষের ভবিষ্যতের নিয়মও যদি এগিয়ে চলাই হয়, তাহলে শুধু সম্পত্তি বাড়িয়ে চলাটা মানবসমাজের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। সভ্যতার অভ্যুদয়ের কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে সময়টুকু অতিক্রান্ত হয়েছে, তা মানুষের অস্তিত্বের অতীত ইতিহাসের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। এখনও বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হতে বাকি। যে যাত্রাপথের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পত্তি, তার পরিণতিতে সমাজের ভাঙন ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। কারণ এই সম্পত্তিমুখী ছুটে চলার মধ্যে নিহিত থাকে আত্মহননের বীজ। মানুষের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান যে পথে এগিয়ে চলেছে, সে পথে চলতে গিয়ে মানুষ পা রাখবে সমাজের এক উচ্চতর পর্যায়ে, যেখানে শাসনব্যবস্থায় থাকবে গনতন্ত্র, সেকাজের মধ্যে ফুটে উঠবে ভ্রাতৃত্ববোধ, সকলে সমান অধিকার ও সমান সুযোগসুবিধা পাবে, সকলের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। প্রাচীন আমলে গোত্রগুলোর মধ্যে যে স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব দেখা যেত, তা-ই এক উন্নততর রূপ নিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

মানুষের চিন্তায় সম্পত্তি সংক্রান্ত ধ্যানধারনার ক্রমোন্নতির কয়েকটা নীতি এবং তার কয়েকটা ফলাফল নিয়ে আমরা এতক্ষন আলোচনা করলাম। আমাদের আলোচনা খুব বিস্তারিত না হলেও মূল বিষয়টার গুরুত্বটুকু অন্তত তুলে ধরা গেছে।

উৎসটা একই হওয়ার দরুন এবং বুদ্ধিমত্তার একই নীতি ও একই ভৌত রূপের ফলে একই ঐতিহাসিক অবস্থায় সব যুগে ও সব জায়গায় মানবজাতির অভিজ্ঞতার ফলাফল মূলত একই পথে বেয়ে অগ্রসর হয়েছে।

বুদ্ধিমত্তার নীতির মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকলেও তা সর্বত্র একই মানের হয়ে উঠতে চায়। তাই মানবপ্রগতির সমস্ত স্তরে এর কার্যকলাপও একই ধরনের হয়ে থাকে। গোটা মানবসমাজ একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে প্রমান করতে পারলে ব্যাপারটাকে আরও সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যেত, কিন্তু সে-রকম কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। বন্য, বর্বর এবং সভ্য যুগের মানুষের মধ্যে আমরা বুদ্ধিমত্তার একই নীতির প্রকাশ দেখতে পাই। ঠিক এই কারণেই বিভিন্ন জায়গার মানুষ একই অবস্থায় থাকায় সময় একই ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, একই উদ্ভাবনের পথ বেয়ে এগোতে পেরেছে এবং একই চিন্তাসূত্র থেকে গড়ে তুলতে পেরেছে একইরকম প্রতিষ্ঠানসমূহ। ছোট্ট জায়গা থেকে শুরু করে কী অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে মানুষের বুদ্ধিমত্তা তাকে পেঁছে দিয়েছে সভ্যতার আঙিনায়, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একেবারে শুরুর যুগের সেই তীরের ফলার কথা ভাবুন, যার মধ্যে মূর্ত হয়েছে বন্য যুগের মানুষের চিন্তাভাবনা। পরের যুগে আকরিক লোহাকে গলানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বর্বর যুগের মানুষদের উন্নত বুদ্ধিমত্তার ছাপ। আর শেষত আমরা দেখতে পাচ্ছি ছুটন্ত রেলগাড়ি, যাকে চিহ্নিত করা যায় সভ্যতার জয়টীকা হিসেবে। মানবজাতির একটা অংশ প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই সভ্যতার যুগে পা রাখতে পেরেছিল। এটা একটা বিশাল কৃতিত্ব। সঠিক অর্থে বললে সেমিঠিক ও আর্য, এই দুটো জাতির লোকেরাই পুরোপুরি নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সভ্য যুগে উন্নীত হতে পেরেছিল। আর্যরাই হচ্ছে মানবপ্রগতির মূল স্রোত, কেননা আর্যদের মধ্যেই সবথেকে উন্নত ধরনের মানুষ দেখা গেছে এবং একটু একটু করে সমগ্র পৃথিবীর ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার করে আর্যরা নিজেদের শ্রেষ্টত্ব প্রমান করতেও সক্ষম হয়েছে। তবুও, সভ্যতা কিন্তু আসলে নানান পরিস্থিতির বিক্রিয়জাত একটা আকস্মিক ঘটনাই, কোন-না-কোন সময় সভ্যতা যে আসবেই, সেটা নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু যে সময়ে মানুষ সভ্য যুগে এসে পেঁছেছে, সেই সময়ে এসে পেঁছোনোটা মোটেই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। বন্য যুগে মানুষের সামনে ছিল বিরাট বিরাট বাধার পাহাড়, বিস্তর পরিশ্রম করে সে-সব বাধা পেরোতে হয়েছিল তাদের। বর্বর যুগের মধ্য-পর্যায়ে পেঁছে মানুষ যখন বিভিন্ন ধাতু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চলেছে আকরিক লোহাকে গলানোর প্রক্রিয়া আবিষ্কারের দিকে, তখনও সভ্যতার আগমন সম্ভব-অসম্ভবের দোলায় দুলেছে। যতদিন না মানুষ লোহার ব্যবহার শিখতে পেরেছে, ততদিন পর্যন্ত সভ্যতার আবির্ভাবের কোন সম্ভাবনাই মাথা তুলতে পারে নি। মানব-জাতি যদি আজ পর্যন্ত এই বাধাটা অতিক্রম করতে না পারত, তাহলেও তাতে বিস্মিত হওয়ার তেমন কোন কারণ থাকত না। পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্বের সুদীর্ঘ

ইতিহাস, বন্য ও বর্বর যুগের অসংখ্য উত্থানপতন আর টিঁকে থাকার জন্য মানুষের উন্নত হয়ে ওঠার কথা মনে রাখলে এটাও মেনে নিতে অসুবিধে হয় না যে সভ্য যুগে পৌঁছতে মানুষের আরও কয়েক হাজার বছর দেরি হতেই পারত, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তা ঘটেনি। গোটা ব্যাপারটার পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে বাধ্য হচ্ছি যে বেশ কিছু আকস্মিক ঘটনার ফল হিসেবেই মানুষ ঐ সময় সভ্য যুগে পা রাখতে পেরেছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে এই যে অবস্থায় আমরা আজ বসবাস করছি, এই যে চারদিকে এতরকম নিরাপত্তা আর সুখের উপকরণের ছড়াছড়ি, এ-সবই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সেই বর্বর এবং আরও আগের যুগের বন্য পূর্বপুরুষদের কঠোর সংগ্রাম, তাদের যন্ত্রণাভোগ, বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা আর ধৈর্যশীল পরিশ্রমের ফলেই। তাদের এই পরিশ্রম, প্রচেষ্টাও সাফল্য—সবই ছিল সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সমগ্র পরিকল্পনাই এক একটা অংশ, যে পরিকল্পনায় গতিপথে তিনি বন্য মানুষকে উন্নত করে তুলেছেন বর্বর মানুষে আর বর্বর মানুষকে পরিণত করেছেন সুসভ্য মানুষে ।।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

রোমান গোত্র

ল্যাটিনরা যখন তাদের স্বগোত্রীয় স্যাবেলিয়ান্, ওস্কান্ আর আম্‌ব্রিয়ান্‌দের সঙ্গে সম্ভবত একটা একত্রিত গোষ্ঠী হিসাবে ইতালির উপদ্বীপ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল, তখন তারা পশুদের পোষ মানাতে এবং সম্ভবত বিভিন্ন খাদ্যশস্য ফলমূল শাকসব্জীর চাষ করতেও শিখেছিল।[১] তখন তারা অন্ততপক্ষে বর্বর যুগের মধ্য অবস্থায়

১। ইন্দো-জার্মান যে জাতিগুলো বর্তমানে পৃথক পৃথক হয়ে গেছে, তারা যখন একই ভাষাভাষী একটা ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠি ছিল, তখন তারা সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়েছিল আর তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা শব্দভাণ্ডারও গড়ে তুলতে পেরেছিল। এই শব্দভাণ্ডারকে তার প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ীই নিজেদের সঙ্গে নানান দেশে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল তারা। এই ভাণ্ডার তাদের কাছে একটা সার্বজনীন সম্পদ বিশেষ ছিল, আর এর বনিয়াদটা এমনই ছিল যাতে করে প্রত্যেকটা জাতি ভবিষ্যতে তার নিজের নিজের মতো করে এটাকে সাজিয়ে নিতে পারে……। সেই সুপ্রাচীন যুগে তাদের মধ্যে পশুপালননির্ভর জীবনযাত্রা বিকাশের প্রমান আমরা খুঁজে পাই গৃহ-পালিত পশুদের অপরিবর্তনশীল নামগুলোর মধ্যে—সংস্কৃতের "গৌ", লাতিন ভাষার "বোঃ" গ্রীক্-এ "বওঁ"; সংস্কৃত "অবিঃ", লাতিনে "ওভিঃ", গ্রীক-এ "ওহিঃ"; সংস্কৃত "ঐভঃ", লাতিনে "ইকুয়া", গ্রীক্-এ "হিপ্পো"; সংস্কৃত "হংস," লাতিনে "অন্‌সর", গ্রীক্-এ "সোন";……"অন্যদিকে, এই সময়ে কৃষির চলন ছিল কি না, সে ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট প্রমান এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে আসে নি। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বরং মনে হয় যে কৃষির অস্তিত্ব তখন ছিল না।"—মম্‌সেন্-এর "হিষ্ট্রি অফ রোম" ডিকসন-এর অনুবাদ, ক্রাইব্‌নার সংস্করণ, ১৮৭১, i ৩৭ একটা টীকায় তিনি মন্তব্য করেছেন যে, আনহ্ (Anah) থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে, ইউফ্রেটিস নদীর দক্ষিণ তীরে আপনা থেকেই কিছু যব, গম ও স্পেল্‌ট্ উৎপন্ন হত। মেসোপটেমিয়ায় এইরকম আপনা থেকে বন্য যব ও গম ফলনের কথা উল্লেখ করেছেন ব্যাবিলনীয় ইতিহাসবিদ্ বেরোসাস্। এই একই বিষয়ে ফিক্ বলেছেন: পশুচারণই গড়ে তুলেছিল আদিমকালের সামাজিক জীবনের বনিয়াদ, কিন্তু সেই সামাজিক জীবনের মধ্যে কৃষিকাজের কোন চিহ্নই প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কয়েক ধরনের খাদ্যশস্যের ব্যবহার তারা নিশ্চয়ই জানত, কিন্তু এইসব শস্যের চাষ তারা কালে-ভদ্রেই করত, কেন না সারাক্ষণেই তাদের চেষ্টা ছিল কিভাবে বেশি দুধ আর মাংস পাওয়া যায়। এদের জীবন যাত্রা আদৌ কৃষি নির্ভর ছিল না। আদিম কালে কৃষিসংক্রান্ত শব্দের সংখ্যা ছিল খুবই কম—এ থেকেই পূর্বোক্ত ব্যাপারটার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো হচ্ছে 'যব' অর্থাৎ বুনো ফল, 'ভার্কা' অর্থাৎ কোদাল বা লাঙল, 'য়াত্তা', অর্থাৎ কাস্তে, আর তাছাড়া 'পাস্নো

এগিয়ে গিয়েছিল। যখন তারা প্রথম ইতিহাসের অঙ্গনে এসে পেঁছোয় তখন ছিল বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় এবং প্রায় সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে।

রোমুলাসের সময়ের আগে ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলোর যে মৌখিক ইতিহাস পাওয়া যায়, তা গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মৌখিক ইতিহাসের তুলনায় অনেক বেশি অপ্রতুল ও ত্রুটিপূর্ণ। প্রাচীনকালে অপেক্ষাকৃত উন্নত সাহিত্যগত সংস্কৃতি এবং লিপিবদ্ধ করার গভীর প্রবণতা থাকার ফলে গ্রীকরা তাদের মৌখিক বিবরণের একটা বড় অংশকেই রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলোর মৌখিক ইতিহাসে তাদের আলবাজ পর্বতাঞ্চলে এবং রোম থেকে পূর্বদিকে অ্যাপেনাইন পর্বতাঞ্চলে বসবাস-কালীন জীবন যাত্রা ও অভিজ্ঞতা এবং তার পূর্বেকার অভিজ্ঞতার কোন কথাই পাওয়া যায় না। জীবনধারনের উপকরনের ব্যাপারে যে গোষ্ঠীগুলো এত উন্নত, তারা তাদের আদিদেশটার সব কথা ভুলে গেল কী করে! সেক্ষেত্রে ধরেই নিতে হয় যে তারা ইটালিতে সুদীর্ঘকালধরে বসবাস করেছিল। রোমুলাসের[১] সময়কালেই তারা তিরিশটা স্বাধীন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্য একটা শিথিল মিত্রসংঘের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ছিল। আশপাশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল তারা। স্যাবেলিয়ান, ওস্কান আর আমব্রিয়ানরাও এই একইরকম অবস্থায় ছিল, আর এদের নিজ নিজ গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও একইধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এদের আঞ্চলিক একতার ভিত্তি ছিল এক একটা উপ-ভাষা। উত্তরাঞ্চলের প্রতিবেশী এট্রুস্কানরা সহ এদের সকলের মধ্যেই গোত্রের অস্তিত্ব ছিল, আর ঠিক গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মত নানান সামাজিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। তারা যখন প্রথম অজানার আঁধারী পর্দার ওপার থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং ইতিহাসের আলোক-রশ্মিতে ফুটে ওঠে তাদের অস্তিত্ব, তখন তাদের সাধারণ অবস্থা একইরকম ছিল।

রোমনগরী প্রতিষ্ঠার (মোটামুটি খৃীষ্টপূর্ব ৭৫৩) আগে রোমানদের যে বিপুল অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল, তার কোন বিশদ বিবরণ রোমান ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। ইতালীয় গোষ্ঠীগুলো তখন সংখ্যায় প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল, এবং তাদের লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল যথেষ্ট। তাদের রীতি-নীতি হয়ে উঠেছিল একান্তই কৃষিজীবি সুলভ এবং বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর পাল ছিল তাদের। জীবনধারনের উপকরণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিল তারা। পেঁছে গিয়েছিল একপতি-পত্নীভিত্তিক

পিনসিয়ার' (রুটি সেঁকা), এবং 'ম্যাক' বা গ্রীক ভাষায় 'ম্যাসো', যা আভাস দেয় শস্য মাড়াই অথবা পেষাই করা সম্বন্ধে।"—ফিক-এর প্রিমিটিভ ইউনিটি অফ ইন্দো-ইওরোপীয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস্, গটিনজেন্, ১৮৭৩, পৃ: ২৮০। এছাড়াও দ্রষ্টব্য "চিপস্ ফ্রম এ জার্মান ওয়ার্কশপ"; ii, ৪২ গ্রীস ও ইটালির জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৃষির চলনের ব্যাপারে দ্রষ্টব্য—মমসেন, i, পৃ: ৪৭, এবং তার পরবর্তী লেখাগুলো।

১। রোমুলাস্ শব্দটা এবং তাঁর উত্তরসূরীদের নাম ব্যবহার করার অর্থ কিন্তু রোমানদের প্রাচীন উপকথাকে মেনে নেওয়া নয়। এই নামগুলো সেই আমলের বিভিন্ন বড় বড় ঘটনাকেই চিহ্নিত করে, আর সেগুলোই আমাদের প্রধান বিবেচ্য।

পরিবারের স্তরে। আমরা যখন এদের কথা প্রথম জানতে পারি, তখন অবস্থাটা ঠিক একইরকম ছিল। কিন্তু নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় এদের অগ্রগতির বিশদ বিবরণ জানা যায় না বললেই চলে। সরকার সংক্রান্ত ধারনার বিকাশের ব্যাপারে এরা খুবই পিছিয়ে ছিল, কারণ তখনও পর্যন্ত তারা শুধু গোষ্ঠীগুলোর মিত্রসঙ্ঘ পর্যন্তই এগোতে পেরেছিল। তিরিশটা গোষ্ঠী একটা মিত্রসঙ্ঘের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হলেও এর চরিত্রটা ছিল পারস্পরিক প্রতিরক্ষার একটা সঙ্ঘের মতো। তখনও একটা জাতিসত্বা গড়ে ওঠার মত একাত্মতায় বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছতে পারে নি গোষ্ঠীগুলো।

এট্রুস্কান গোষ্ঠীগুলো একটা মিত্রসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিল। স্যাবেলিয়ান, ওস্কান এবং আমব্রিয়ানদের মধ্যেও সম্ভবত মিত্রসঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল। ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলো সৃষ্টি করেছিল, অসংখ্য প্রাচীর-বেষ্ঠিত শহর ও সুরক্ষিত গ্রাম, আবার কৃষিগত কারণে ও নিজেদের গৃহপালিত পশুদের খাদ্যের সন্ধানে তারা দেশের নানান জায়গায় ছড়িয়েও পড়েছিল। যে ঘটনার সঙ্গে রোমুলাসের নাম জড়িত, যার পরিণতিতে গড়ে ওঠে রোম শহর, সেই ঘটনার আগে পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীভবন ও একাঙ্গীভবন ঘটে নি। শিথিলভাবে ঐক্যবন্ধ এই ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলোই ছিল নতুন শহরের শক্তির মূল উৎস। আল্‌বার প্রধানদের হাতে যখন এইসব গোষ্ঠীর সব ক্ষমতা ছিল, তখন থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের সময় পর্যন্ত এই গোষ্ঠীগুলোর যে ইতিহাস, তার বেশ খানিকটা পাওয়া যায় এদের লোককথা আর উপকথার মধ্যে। কিন্তু এদের যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতি-প্রথা ঐতিহাসিক যুগেও টিকে ছিল, সেগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে আরও কিছু তথ্য। যেগুলো তাদের পূর্বতন অবস্থাকে যথেষ্ট ভালোভাবেই চিত্রিত করে। প্রকৃত ঘটনার একটা মনগড়া খসড়া ইতিহাসের থেকে এগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় ল্যাটিনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান ছিল গোত্র (genes), কিউরিয়া (curiae) আর গোষ্ঠী (tribes)। এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই রোমুলাস ও তাঁর উত্তরসূরীরা গড়ে তুলেছিলেন রোমান শক্তিকে। এই নতুন সরকার কিন্তু সব দিক থেকে একটা স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরে গড়ে ওঠেনি। সাংগঠনিক ক্রমের উচ্চতর স্তর-গুলোতে (অর্থাৎ গোষ্ঠী ও মিত্রসঙ্ঘে) আইনগত পন্থার সাহায্যে এই সরকার গড়ে তোলা হয়েছিল। তবে, এই সংগঠনের মূল ভিত্তি ছিল গোত্র, এবং তা সৃষ্টি হয়েছিল স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরেই। গোত্রের মধ্যে মূলত একই বংশের অথবা বিভিন্ন রক্তসম্বন্ধযুক্ত বংশের লোকেরাই থাকত। আসলে, ল্যাটিন গোত্রগুলোর মধ্যে থাকত শুধু একই বংশোদ্ভূত লোকেরা, আর স্যাবাইন ও অন্যান্য গোত্রগুলোর মধ্যে (এট্রুস্কান গোত্রগুলো বাদে) থাকত বিভিন্ন রক্তসম্বন্ধযুক্ত বংশের লোকেরা। রোমুলাসের পরবর্তী চতুর্থ পুরুষে টারকুইনিয়াস প্রিস্‌কাস্‌-এর আমলে গোটা সংগঠনটা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যাগত বিন্যাসে পৌঁছায়ঃ একটা কিউরিয়ায় দশটা গোত্র, একটা গোষ্ঠীতে দশটা কিউরিয়া, এবং রোমানদের মধ্যে মোট তিনটে গোষ্ঠী, অর্থাৎ একটা গোত্র-ভিত্তিক সমাজ ছিল মোট তিনশটা গোত্র নিয়ে।

যা বিভিন্ন গোত্র নিয়ে গঠিত ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী কিছু গোষ্ঠী গঠিত

হয়েছিল, তাদের একটা মিত্রসঙ্ঘের মধ্যে যে উদ্দেশ্যের একতাও থাকে না অথবা একটা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার থেকে বেশি ক্ষমতাও থাকে না, এটা উপলব্ধি করার মত বিচক্ষণতা রোমুলাসের ছিল। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ব্যর্থ করে দিত মৈত্রী-বন্ধতার নীতিকে। রোমুলাস এবং তাঁর সমকালীন প্রাজ্ঞজনেরা এর প্রতিকার হিসাবে কেন্দ্রীভবন ও একাঙ্গীভবনের কথা বলেছিলেন। ঐ যুগে এটা ছিল একটা বিশিষ্ট ঘটনা, আর রোমুলাসের যুগ থেকে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের সময়কার রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠানে উত্তরণের পথে এটা আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এথেনীয় গোষ্ঠীগুলোর পথ অনুসরণ করে এবং একটা শহরে কেন্দ্রীভূত হয়ে, এরা নিজেদের পাঁচটা প্রজন্মের সময়কালের মধ্যেই সরকার-ব্যবস্থার ব্যাপারে এথেনীয়দের মতই পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়। এদের সরকার-ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়, গোত্রভিত্তিক সংগঠনের বদলে গড়ে ওঠে একটা রাজনৈতিক সংগঠন।

পাঠককে শুধু কয়েকটা সাধারণ তথ্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—প্যালাটাইন পর্বতমালা অঞ্চলে আর তার চারপাশে একশত ল্যাটিন গোত্রকে ঐক্যবন্ধ করেছিলেন রোমুলাস এবং এই গোত্রগুলো র‍্যামনেস্ নামে একটা গোষ্ঠীতে একত্রিত হয়েছিল; পরিস্থিতি-গত কারণে বেশ কিছু স্যাবাইন গোত্রও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এই গোত্রগুলোর সংখ্যা পরে বেড়ে প্রায় একশয় পেঁছিলে, এরা টিটি নামক আরেকটা গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে ছিল। টার্কিনিয়ান প্রিস্কাস্-এর আমলে, এট্রুস্কানরা সহ আশপাশের অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে নেওয়া একশটা গোত্র নিয়ে গড়ে উঠেছিল লুকেরেস্ নামক তৃতীয় আরেকটা গোষ্ঠী। অর্থাৎ, মোটামুটি একশ বছরের মধ্যে তিনশটা গোত্র রোমের বুকে একজোট হয়েছিল। এরা পুরোপুরিভাবে সংগঠিত হয়েছিল প্রধানদের একটা পরিষদের অধীনে, যাকে বর্তমানে রোমান ব্যবস্থাপক-সভা (Roman Senate) বলা হয়, এবং একটা গণপরিষদের অধীনে যাকে এখন 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা' বলা হয়, এবং একজন সেনাপতির অধীনে, 'রেক্স' নামে যাকে অভিহিত করা হোতো। এ সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য ছিল একই—ইতালিতে সামরিক কর্তৃত্ব অর্জন করা।

রোমুলাসের সংবিধান এবং সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের পরবর্তী আইন-কানুন অনুযায়ী, এদের সরকার ব্যবস্থাটা ছিল আসলে একটা সামরিক গণতন্ত্র, কারণ সামরিক কার্যকলাপ ও মনোভাব সরকারের মধ্যে সবথেকে প্রভাবশালী ছিল। তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে একটা নতুন ও বৈর (Antagonistic) উপাদান, অর্থাৎ রোমান ব্যবস্থাপক-সভা, ঐ সময় শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এবং এই ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা আর তাদের বংশধররা সমাজের অভিজাত অংশ হয়ে উঠেছিল। ফলে, এই একটা পদক্ষেপ থেকেই গড়ে উঠেছিল এক সুবিধাভোগী শ্রেণী। এই শ্রেণীটিকে প্রথমে রক্ষা করত গোত্রীয় ব্যবস্থা এবং পরে রাজনৈতিক ব্যবস্থা। গোত্রীয় ব্যবস্থার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাই একসময় বাতিল করে দিয়েছিল। রোমান ব্যবস্থাপক-সভা আর তার দ্বারা সৃষ্ট ঐ অভিজাত শ্রেণীই রোমান জনগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এবং তাদের ভবিতব্যকে পাল্টে দিয়েছিল, আর তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত নীতিগুলো স্বাভাবিকভাবে ও যুক্তিসম্মতভাবে যে পরিণতিতে পৌঁছোতে পারত (ঠিক এথেনীয়দের

মতো), সেখান থেকেও তাদের জীবনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

এই নতুন সংগঠনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, সামরিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে এটা ছিল এক সুগভীর প্রজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ। এই সংগঠনের দৌলতে তারা কিছুদিনের মধ্যেই অন্যান্য ইতালিয় গোষ্ঠীগুলোর থেকে বহুগুণ উন্নত হয়ে ওঠে, এবং একসময় সমগ্র উপদ্বীপ অঞ্চলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ল্যাটিন ও অন্যান্য ইতালিয় গোষ্ঠীগুলো যে গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন নিয়েবুর, হেরমান, মমসেন, লঙ্ এবং অন্যান্য আরও অনেকেই। কিন্তু তাঁদের বিবরণ থেকে ইতালিয় গোত্রগুলোর কাঠামো আর নীতি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট বা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এর মূল কারণ হচ্ছে দুটো। একদিকে, এ বিষয়ের অনেক কিছুই আজ ঢাকা পড়ে গেছে অজানার অন্ধকারে ; অন্যদিকে, লাতিন লেখকদের রচনায় তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়ার অভাব। আর একটা কারণও অবশ্য আছে। কারণটা হল এই যে গোত্রের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্কটা কী সে ব্যাপারে উপরোক্ত লেখকদের মধ্যে প্রথম কয়েকজনের একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল। এঁরা মনে করেন, গোত্রগুলো গড়ে উঠত কিছু পরিবারের সমন্বয়ে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোত্র গড়ে উঠত পরিবারের অংশগুলি নিয়ে, তাই সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক পরিবার নয়, প্রাথমিক একক ছিল গোত্র। যে জায়গায় এসে তাঁরা তাঁদের অনুসন্ধান শেষ করেছেন, তার পর আরও অনুসন্ধান চালানোটা বেশ দুরূহ। তবে, গোত্রের প্রাচীন গঠন পদ্ধতি থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলোর সাহায্যে গোত্রের বর্তমানে অপ্রচলিত কিছু বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ইতালিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে গোত্রভিত্তিক সমাজ সংগঠন চালু থাকা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিয়েবুর লিখেছেন : "এখনও যদি কেউ এই মন্তব্য করেন যে এথেনীয় গোত্রের সঙ্গে রোমান গোত্রের চরিত্রের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাহলে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে প্রাচীনকালে সমস্ত পৃথিবী জুড়েই যে প্রতিষ্ঠানটা চালু ছিল, ইতালি ও গ্রীসে তা থেকে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল কিভাবে——। নাগরিকদের প্রতিটি দল একইভাবে বিভক্ত ছিল : জেফাইরিয়ানরা, স্যালামিনিয়ানরা এথেনীয়দের মতো এবং টুস্কুলানরা ঠিক রোমানদের মতো।"[১]

রোমানদের মধ্যে যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল, এটা জানার সঙ্গে সঙ্গেই জানা দরকার ঐ সংগঠনের প্রকৃতিটা কেমন ছিল : কী কী অধিকার, সুযোগ-সুবিধা আর দায়-দায়িত্ব ছিল তার সদস্যদের, এবং একই সমাজব্যবস্থার সদস্য হিসাবে বিভিন্ন গোত্রগুলোর পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কই বা কেমন ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ করে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাবে কিউরিয়া, গোষ্ঠী এবং সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে (গোত্রের সদস্যরাও যার অংশীদার) তাদের সম্পর্ক নিয়ে।

এ বিষয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে সম্ভাব্য যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করার পরও বহু

১। "হিস্ট্রি অফ রোম", খণ্ড ১, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৪১, ২৪৫

ব্যাপারেই সেই তথ্যরাজি অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে, এমন গোত্রের কিছু কিছু বিষয় আর কাজ সম্বন্ধে অনুমানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। রোমানদের মধ্যে ঐতিহাসিক যুগ ভালোভাবে শুরু হওয়ার আগেই গোত্রের সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছিল নতুন রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর হাতে। তাই, প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া একটা ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো টিকিয়ে রাখার কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা রোমানদের ছিল না। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে গেইয়ুস তাঁর 'ইনস্টিটিউস্' গ্রন্থে লিখেছিলেন যে গোটা 'জাস জেন্টিলিসিয়াম' (Jus gentilicium) ব্যবস্থাটাই তখন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল, আর এ বিষয়ে আলোচনা করাটা তাই তখন নেহাতই অনাবশ্যক একটা ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল।[১] কিন্তু রোম নগরীর প্রতিষ্ঠার সময়, এবং তার পরেও বেশ কিছু শতাব্দী ধরে গোত্রীয় সংগঠন পুরোদমে সক্রিয় ছিল।

গোত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করার আগে বলে নেওয়া দরকার গোত্র এবং গোত্রের সদস্যদের সম্বন্ধে রোমানদের সংজ্ঞাটা কী ছিল, এবং কোন ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয় করা হত। সিসেরো তাঁর 'টপিক্স্' গ্রন্থে গোত্রের সদস্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন: কোন নির্দিষ্ট গোত্রের সদস্য তাদেরকেই বলা হবে, যারা প্রত্যেকে একই নামের অধিকারী। সংজ্ঞাটা মোটেই যথাযথ নয়। যারা স্বাধীন পিতা-মাতার সন্তান, তারাই হচ্ছে গোত্রের সদস্য। না, এটাও অপ্রতুল সংজ্ঞা। যাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনও দাস ছিল না। এখনও কিন্তু ঠিক পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না সংজ্ঞাটা। যাদের লোকসংখ্যা কখনও পুরোপুরি হ্রাস পায় নি। হ্যাঁ, এবার সবটা মিলে একটা কাজ-চলা গোত্রের সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে, কেননা যাজক স্ক্যাভোলা, এর সঙ্গে আর কিছু যোগ করেছেন বলে আমার জানা নেই।[২] ফেস্টাস বলেছেন: একই গোত্রের সদস্য তাদেরকেই বলা হত, যারা একই মূল বংশ থেকে উদ্ভূত এবং যারা একই নামে অভিহিত হত।[৩] ভ্যারো বলেছেন: যেমন, এমিলিয়াসদের সন্তান-সন্ততির এমিলি হিসাবেই পরিচিত হয়, এবং তারা গোত্রের সদস্যপদ লাভ করে; এই এমিলিয়াস নামটা থেকেই গোত্রের নাম নির্ধারিত হয়।[৪]

গোত্রের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা সিসেরো করেন নি। তিনি কতকগুলো মানদণ্ড নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন, যার সাহায্যে গোত্রের সঙ্গে কারুর যুক্ত থাকার অধিকার বা সেই অধিকার খর্ব করার কারণ নির্ণয় করা যায়। এইসব সংজ্ঞার কোনটির সাহায্যেই গোত্রের গঠনকাঠামোর ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থাৎ, কোন একজন কল্পিত গোত্র-প্রতিষ্ঠাতার বংশধরদের সকলেই সেই গোত্রীয় নামটা ধারণ করত, নাকি তার বংশধরদের মধ্যে শুধু একটা অংশই ধারণ করত ঐ গোত্রীয় নামটা; আর, যদি শুধু একটা অংশই

১। "ইনস্টিটিউট্স্', iii, ১৭

২। "সিসেরো, টপিকা ৬."

৩। স্মিথ-এর "ডিকশনারী অফ গ্রীক অ্যাণ্ড রোমান অ্যান্টিক্যুইটিস, প্রবন্ধ, গোত্র" এ উদ্ধৃত।

৪। ভ্যারো, "দ্য লিঙ্গুয়া লাতিনা," খণ্ড ৮, পরিচ্ছেদ ৪.

তার ধারক হয়ে থাকে' তাহলে সেটা তার বংশধরদের কোন অংশ। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যদি পুরুষ-ধারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত শুধু তার পুরুষ সদস্যদের বংশধররাই; আর স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী হয়ে থাকলে শুধু স্ত্রী সদস্যদের বংশধররা। যদি এরকম কোন কঠোর সীমারেখা না থেকে থাকে, তাহলে সমস্ত বংশধররাই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। এইসব সংজ্ঞা রচনার সময় ধরে নেওয়া হয়েছে যে বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারাই প্রযোজ্য হত। অন্যান্য সূত্র থেকেও মনে হয় যে কেবলমাত্র গোত্রের পুরুষ সদস্যদের বংশধররাই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। রোমানদের বংশবৃত্তান্ত থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বাস্তব তথ্যটা সিসেরোর চোখ এড়িয়ে গেছে যে, গোত্রের সদস্য হত তারাই, যারা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত কোন স্বীকৃত পূর্বপুরুষ থেকে কেবলমাত্র পুরুষ-ধারা অনুযায়ী উদ্ভূত হত। এ ব্যাপারটা ফেস্টাস আর ভ্যারো কিছুটা উল্লেখ করেছেন। ভ্যারো বলেছেন, কোন এমিলিয়াসের থেকে যে-সব পুরুষরা জন্ম নিত, তারা এমিলি নামে পরিচিত হত এবং গোত্রের সদস্যপদ লাভ করত। অর্থাৎ, গোত্রের সদস্য হওয়ার জন্য গোত্রীয় নাম ধারণকারী কোন পুরুষের সন্তান হিসাবে জন্মানোটা ছিল অপরিহার্য। তবে, গোত্রের সদস্যরা যে গোত্রীয় নাম ধারণ করতই—সে কথাটা সিসেরোও বলেছেন।

অভিজাত শ্রেণী আর সাধারণ জনগনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত একটা চালু আইন বাতিল করা সম্বন্ধে রোমান শাসক ক্যানুলিয়ুস (৪৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় যে তখন বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী। তিনি বলেছিলেন—কোন অভিজাত পুরুষ যদি কোন সাধারণ নারীকে বিবাহ করে, কিম্বা কোন সাধারণ পুরুষ যদি বিবাহ করে কোন অভিজাত নারীকে, তাতে ক্ষতিটা কী? কোন অধিকার তো পাল্টাবে না এর ফলে। সন্তানরা পিতার দিকেই যাবে।[১]

গোত্রীয় নামের হস্তান্তর থেকে নেওয়া একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে সুনিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে যে বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুসারে। কেইয়াস জুলিয়াস সিজারের বোন জুলিয়া বিবাহ করেছিল মার্কস অ্যাটিয়াস বলবাসকে। জুলিয়ার নাম থেকেই বোঝা যায় যে সে ছিল জুলিয়ান গোত্রের সদস্যা।[২] প্রথা অনুযায়ী তার কন্যা

১। লিভি, খণ্ড ৪, পরিচ্ছেদ ৪.

২। "কোন পরিবারে একটিমাত্র কন্যা থাকলে তাকে গোত্রের নাম অনুসারেই অভিহিত করা হত। যেমন সিসেরোর কন্যা টিউলিয়া, সিজারের কন্যা জুলিয়া, আগাস্টাসের কোন অক্টোভিয়া ইত্যাদি। বিবাহের পরও তাদের এই নামের কোন পরিবর্তন ঘটতো না। পরিবারে দুটি কন্যা থাকলে একজনকে বলা হত বড়, আর একজনকে ছোট। দুয়ের অধিক কন্যা থাকলে তাদেরকে চিহ্নিত করা হত জন্মের ক্রম অনুসারে। যেমন, প্রথমা (Prima), দ্বিতীয়া (Secunda), তৃতীয়া (Tertia), চতুর্থী (Quarta), পঞ্চমী (Quinta), ইত্যাদি। কখনও কখনও আদর করে টার্টুলা (Tertulla), কোয়ার্টিলা (Quartilla), কুইন্টিলা (Quintila) ইত্যাদি নামেও ডাকা হত তাদের

অ্যাটিয়া পিতার গোত্রীয় নামই গ্রহণ করে এবং অ্যাটিয়ান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। অ্যাটিয়ার সঙ্গে কেইয়াস অক্টোভিয়াসের বিবাহ হয়। তাদের পুত্রের নামও কেইয়াস অক্টোভিয়াস, প্রথম রোমান সম্রাট। প্রথা অনুযায়ী এই পুত্রও তার পিতার গোত্রীয় নামই গ্রহণ করে এবং অক্টোভিয়ান গোত্রের সদস্য হিসাবে পরিচিত হয়।[১] সম্রাট হওয়ার পর সে নিজের নামের সঙ্গে আরো দুটো শব্দ যোগ করে নেয়—সিজার অগাস্টাস।

রোমুলাসের আমল এবং তারও বহু আগের অজানা যুগ থেকে শুরু করে অগাস্টাসের আমল পর্যন্ত রোমান গোত্রগুলোর মধ্যে বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী। গোত্রের মধ্যেকার কোন স্বীকৃত পূর্বপুরুষের থেকে কেবলমাত্র পুরুষ-ধারা অনুযায়ী যারা জন্মগ্রহণ করত, তারাই গোত্রের সদস্য হিসাবে বিবেচিত হত। কিন্তু কোন একজন আদি পূর্বপুরুষের বিশেষত যে পূর্বপুরুষের নাম অনুযায়ী পরবর্তী কালে সকলকার নামকরণ হয়, তাঁর বংশধারা অনুযায়ী প্রত্যেকের উদ্ভুত হওয়াটা অপ্রয়োজনীয়ই ছিল, কারণ সেটা অসম্ভব।

লক্ষ্য করা দরকার যে উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং আরও অসংখ্য ঘটনায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের বিবাহ হয়েছে গোত্রের বাইরের কারোর সঙ্গে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এটাই ছিল সাধারণ প্রথা।

রোমান গোত্রগুলোর সদস্যদের নিম্নলিখিত অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব থাকত :

১। গোত্রের মৃত সদস্যদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক অধিকার।

২। সার্বজনীন কবরস্থান।

৩। সার্বজনীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ; স্যাক্রা জেন্টিলিসিয়া (sacra gentilicia)

৪। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার বাধ্যবাধকতা।

৫। জমির ওপর যৌথ অধিকার।

৬। সহায়তা, প্রতিরক্ষা এবং আঘাতের পরিচর্যার ব্যাপারে পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব।

৭। গোত্রীয় নাম ধারণের অধিকার।

৮। গোত্রের মধ্যে বহিরাগতদের গ্রহণ করার অধিকার।

৯। গোত্রের প্রধানদের নির্বাচন ও বরখাস্ত করার অধিকার।

এবার এইসব বিষয়গুলো নিয়ে ক্রমানুসারে আলোচনা করা যাক।

……। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে গোত্রগুলোর নাম আর তার পরিবারগুলোর পদবী কখনও পরিবর্তিত হত না। পরিবারের সমস্ত শিশুই এ-সব নামের অধিকারী হত, এবং তাদের বংশধরদের ওপরেও এগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তাতো। কিন্তু স্বাধীনতা হারানোর পর তাদের এইসব নামের অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং নামগুলো এলোমেলো হয়ে যায়।" অ্যাডাম্-এর "রোমান অ্যান্টিকুইটিস্", গ্লাসগো সংস্করণ, ১৮২৫, পৃঃ ২৭.

১। সিউটোনিয়াস, "ভিট, অক্টেভিয়ানাস" ৩-য় এবং ৪-র্থ পরিচ্ছেদ।

২। গোত্রের মৃত সদস্যদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক অধিকার

টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌স্‌-এর (Twelve Tables) আইন প্রবর্তিত হওয়ার (৪৫১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দ) পর, যে প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী কোন ব্যক্তির সম্পত্তিকে প্রমাণ ব্যতিরেকেই বণ্টন করে দেওয়া হত গোত্রের সদস্যদের মধ্যে, তা বাতিল হয়ে গেল এবং তার জায়গায় কার্যকরী হল উন্নততর নিয়মাবিধি। ঐ সময় থেকে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রথম দাবীদার হয়ে উঠল তাঁর সন্তানরা, আর মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে তার বংশের পুরুষ ধারা অনুযায়ী নিকটতম বংশধররা।[১] তার সন্তানদের মধ্যে যারা জীবিত থাকত, তারা সম্পত্তির সমান সমান ভাগ পেত, আর তার কোন পুত্র আগেই মারা গিয়ে থাকলে সেই পুত্রের সন্তানরা পিতার অংশটা ভাগ করে নিত সমান অংশে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সীমাবদ্ধ থাকত গোত্রের মধ্যেই। মৃত ব্যক্তির কন্যাদের এবং তার অন্যান্য নারী-বংশধরদের সন্তানরা ভিন্নগোত্রের সদস্য হত, ফলে ঐ সম্পত্তির ওপর তাদের কোন অধিকার থাকত না। দ্বিতীয়ত, মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে, একই নিয়ম অনুসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা।[২] সগোত্রীয় জ্ঞাতি বলতে বোঝাতো সেইসব লোকদের, যারা মৃত ব্যক্তির আদি পূর্বপুরুষের থেকে বংশানুক্রমে পুরুষ-ধারায় জন্মেছে। এই রকম বংশধারা চালু থাকার ফলে তারা প্রত্যেকেই, নারী ও পুরুষ উভয়েই, একই গোত্রীয় নাম ধারণ করত এবং এইসব বংশধরদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের চেয়ে নিকটতর হত। নিকটতম জ্ঞাতিরাই পেত অগ্রাধিকার। সবচেয়ে বেশি দাবী থাকত মৃত ব্যক্তির ভাই আর অবিবাহিতা বোনেদের ; তারপর বিবেচিত হত তার কাকা-জ্যাঠা আর অবিবাহিতা পিসীদের দাবী ; এইভাবে ক্রমানুসারে তার সমগ্র সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের দাবীই বিবেচনা করে দেখা হত। তৃতীয়ত, মৃতব্যক্তির কোন সগোত্রীয় জ্ঞাতি না থাকলে তার গোত্রের অন্যান্য সদস্যরাই উত্তরাধিকারী হত ঐ সম্পত্তির।[৩] এটা একটা লক্ষ্যনীয় ব্যাপার কেননা মৃত ব্যক্তির বোনদের সন্তানরা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত না, আর তার সগোত্রীয় এমন সব দূরে সম্পর্কের জ্ঞাতিরা অগ্রাধিকার পেত যাদের সঙ্গে ঐ মৃতব্যক্তির সম্পর্কের কোন হদিশ পাওয়াই অসম্ভব ছিল—তাদের সম্পর্কের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত গোত্রীয় নাম, অর্থাৎ তারা একই গোত্রীয় নাম ব্যবহার করত বলে বোঝা যেত যে তারা হচ্ছে একই বংশের লোক। তবে, এর কারণটাই একান্তই স্পষ্ট : মৃত ব্যক্তির বোনেদের সন্তানরা অন্য গোত্রের সদস্য হত, আর রক্তসম্বন্ধের থেকে গোত্রগত অধিকারের জোরও বেশি ছিল, কারণ গোত্রের সম্পত্তি গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখাটা ছিল একটা মৌলিক নীতি। টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌স্‌-এর

১। গেইয়াস, "ইনস্টিটিউটস" খণ্ড ৩, পৃঃ ১ এবং ২। মৃত ব্যক্তির স্ত্রীও তার সন্তানদের সঙ্গে সম্পত্তির যুগ্ম-উত্তরাধিকারিণী হত।

২। ঐ, খণ্ড ৩, পৃঃ ৯.

৩। ঐ, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৭.

আইন থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা শুরু হত উল্টো দিক থেকে, এবং তিন ধরনের উত্তরাধিকারীরা ছিল উত্তরাধিকারের তিনটি ধারাবাহিক নিয়মেরই প্রতিনিধি ঃ প্রথমত, মৃত ব্যাক্তির গোত্রের সদস্যরা ; দ্বিতীয়ত, তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা, যার মধ্যে তার বংশের সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী, বংশ-ধারা নির্ণয় করা শুরু হওয়ার পর থেকে ; আর তৃতীয়ত তার সন্তানরা এবং এই সময় থেকে শুধু মৃত ব্যক্তির সন্তানরা বাদে বাকি জ্ঞাতিদের কোন অধিকার থাকত না ঐ সম্পত্তির ওপর।

বিবাহের পর নারীরা তাদের ভোটাধিকার হারাত, বা বলা যায় সে অধিকারের পালা শেষ হত তাদের (Capital diminution)। এর ফলে তারা তাদের গোত্রগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। এক্ষেত্রেও কারণটা সহজবোধ্য। বিবাহের পরেও যদি সে জ্ঞাতিত্ব সূত্রে আগের গোত্রের কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হত, তাহলে সেই সম্পত্তি ঐ গোত্রের হাত থেকে চলে যেত তার স্বামীর গোত্রের দখলে। অবিবাহিতা বোনেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারত কিন্তু বিবাহিতা বোনেদের সে অধিকার ছিল না।

গোত্রের সুপ্রাচীন নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে আমরা যে-টুকু জানি, তার সাহায্যে সেই পুরনো দিনের দিকে চোখ ফেরালে বোঝা যায় যে সে সময় ল্যাটিন গোত্রগুলোতে বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী, সম্পত্তি ছিল একটা নগন্য ব্যাপার, আর তা গোত্রের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। এ অবস্থাটা ল্যাটিন গোত্রের আয়ুষ্কালের মধ্যেকার ঘটনা না-ও হয়ে থাকতে পারে, কেননা যখন তারা ইটালিতে থাকত, তখন থেকেই তাদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। রোমান গোত্রগুলো যে একটা প্রাচীন যুগ থেকে বিবর্তিত হয়েই ঐতিহাসিক রূপে উপনীত হয়েছিল, তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার গোত্রের সদস্যদের হাতে বর্তানোর ঘটনা থেকে।[১]

১। ক্লাডিয়ান গোত্রের দুটি পরিবার মার্সেলি আর ক্লডিদের মধ্যে মার্সেলি পরিবারের জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের পুত্রের সম্পত্তি নিয়ে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। মার্সেলি পরিবার ঐ সম্পত্তিটা দাবী করছিল পারিবারিক অধিকারের সূত্রে, আর ক্লডি পরিবার দাবী করছিল গোত্রগত অধিকারের সূত্রে। টুয়েল্ভ্‌ টেবল্‌স্‌-এর আইন অনুযায়ী মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাসটি কোন ইচ্ছাপত্র না করে এবং নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার ভূতপূর্ব প্রভুটি, কারণ তার দাসত্বমোচন করে দেওয়ার পর ঐ প্রভুটিই তার অভিভাবক হিসাবে কাজ করত। কিন্তু কোন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের পুত্রের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না। ক্লডিরা ছিল অভিজাত পরিবার আর মার্সেলিয়া ছিল সাধারণ জনগণের অন্তর্গত, কিন্তু তার প্রভুর গোত্রের কোন গোত্রগত অধিকার অর্জন করত না। তবে, নিজের অভিভাবকের গোত্রীয় নামটা যে গ্রহণ করতে পারত। যেমন, সিসেরো-বর্ণিত মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসটির নাম ছিল টাইরো, তাকে ডাকা হত এম. টিউলিয়াস টাইরো নামে! সিসেরো যে ঘটনাটির কথা বলেছেন ("ডি ওরেটোর", I, ৩৯) এবং লঙ

নিয়েবুর লিখছেন : গোত্রের যে-সব সদস্য কোন জ্ঞাতিহীন ভাবে অথবা ইচ্ছাপত্র না করে মারা যেত, তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারটাই সব থেকে দীর্ঘদিন ধরে বজায় ছিল। কথাটা একান্তই সত্য, কেননা বিভিন্ন ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষিত হয়েছিল এবং এমনকি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল গেইয়াসেরও (অবশ্য এটাকে তিনি কোন ইতিহাস-বিষয়ক প্রশ্নের থেকে বেশি গুরুত্ব দেন নি)। গেইয়াসের পাণ্ডুলিপির এই অংশটা একেবারেই অস্পষ্ট ও দুষ্পাঠ্য হয়ে গেছে—এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।[১]

২। সার্বজনীন কবরস্থান।

বর্বর যুগের উচ্চপর্যায়ে গোত্রকেন্দ্রিক মনোভাব আগের যুগগুলোর থেকে অনেক জোরদার হয়ে উঠেছিল, আর তা ঘটেছিল সমাজের উন্নততর সংগঠন এবং মানসিক ও নৈতিক অগ্রগতির দরুনই? প্রতিটি গোত্রের একটা নিজস্ব কবরস্থান থাকত, যেখানে শুধুমাত্র ঐ গোত্রের মৃত সদস্যদেরই কবর দেওয়া হত। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে কবর দেওয়ার ব্যাপারে রোমানদের রীতি প্রথাগুলো বুঝতে সুবিধে হবে।
ক্লডিয়ান গোত্রের প্রধান আপ্পিয়াস ক্লডিয়াস, স্যাবাইনের রেগিলি শহর থেকে রোমে চলে আসেন রোমুলাসের আমলে। যথা সময়ে তাঁকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য করা হয়, এবং তিনি অভিজাত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হন। ক্লডিয়ান গোত্রের অন্যান্য সদস্যরাও তাঁর সঙ্গেই রোমে এসেছিল। এইসব সহচরের সংখ্যা ছিল খুবই বেশি, ফলে তাঁর রোমে আগমনটা হয়ে উঠেছিল এক বিশেষগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিউটোনিয়াস বলেছেন ক্লডিয়ান গোত্রের সদস্যদের জন্য রাষ্ট্র তাদেরকে জমি দিয়েছিল আনিও অঞ্চলে, আর দিয়েছিল দেবরাজ জুপিটারের মন্দিরের কাছে একটা কবরস্থান।[২] এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে সেই যুগে একটা সার্বজনীন কবরস্থানকে গোত্রের পক্ষে অপরিহার্য বলেই মনে করা হত। স্যাবাইন অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে এসে রোমানদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তোলার পর ক্লডিয়া তাদের গোত্রের জন্য পেয়েছিল অনেকটা জমি আর একটা কবরস্থান। রোমান গোত্রগুলোর সঙ্গে তাদেরকে সমমর্যাদার

(স্মিথ্-এও "ডিকশনারী অফ গ্রীক অ্যাণ্ড রোমান অ্যান্টিকুইটিস, প্রবন্ধ-গোত্র")এবং নিয়েবুর-ও যে ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার সমাধান কিভাবে করা হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। তবে নিয়েবুর বলেছেন, সিদ্ধান্তটা সম্ভবত ক্লডিদের বিরুদ্ধেই গিয়েছিল (হিস্ট্রি অফ রোম, I, ২৪৫, 'টীকা)। ক্লডিরা কিভাবে ঐ দাবী তুলতে পারে, তা নির্ধারণ করা খুবই মুস্কিল। মার্সেলিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, তবে আইনগত ব্যাখ্যার সাহায্যে অভিভাবকত্বগত অধিকারকে বিস্তৃত করা হয়ে থাকলে তারা ঐ দাবী তুলতে পারত বটে। এই ঘটনাটা খুবই লক্ষ্যনীয়, কেননা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পারস্পরিক অধিকারকে গোত্রের মধ্যে কত সযত্নে রক্ষা করা হত, তা এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

১। হিস্ট্রি অফ রোম, i, ২৪২.

২। মিউটোনিয়াস, "ভিট. টাইবেরিয়াস", ১ম পরিচ্ছেদ।

অধিকারী করে তোলার জন্যই এগুলো দেওয়া হয়েছিল। এই লেনদেনের মধ্যে তৎকালীন একটা প্রথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের সামনে।'

জুলিয়াস সিজারের আমলেও গোত্রগত স্মৃতিস্তম্ভের বদলে পারিবারিক স্মৃতিস্তম্ভ বসানোর রীতিটা পুরোপুরিভাবে চালু হয়নি। কুইণ্টিলাস ভারুম-এর ঘটনা থেকে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। জার্মানীর যুদ্ধে ভারুমের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। আত্মহত্যা করেন ভারুম। তাঁর মৃতদেহ শত্রুদের হাতে পড়ে। প্যাটারকিউলাস বলেছেন—বর্বর শত্রুরা ভারুমের অর্ধদগ্ধ শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে, মাথাটা কেটে ফেলে এবং সেটা নিয়ে যায় ম্যারোবোডুম-এর কাছে। তিনি আবার ঐ কাটা-মাথাটা পাঠিয়ে দেন সিজারের কাছে। অবশেষে তাঁর গোত্রের কবরস্থানে সমাধিস্থ হয় ভারুমের ছিন্ন শির।[১]

সিসেরো তাঁর আইন বিষয়ক গ্রন্থে কবর দেওয়ার ব্যাপারে সে আমলের প্রথার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে: কবরস্থান এতই পবিত্র যে গোত্রের পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কাউকে কবর দেওয়া হলে তা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের আমলে এ. টর্কোয়াটাস পপিলিয়ান গোত্রের মৃত সদস্যদের কবর দেওয়ার সময় ঐ-সব পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান পালন করার ব্যাপারটাকে একটা বাধ্যতামূলক নিয়মে পরিণত করেছিলেন।[২] এ থেকে বোঝা যায় যে পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান পালন করে মৃতদেহে কবর দেওয়াটা ছিল একটা ধর্মীয় কর্তব্য, এবং সম্ভব হলে মৃত ব্যক্তির নিজস্ব গোত্রের জমিতে তাকে সমাধিস্থ করাটাই ছিল প্রচলিত বিধি। তাছাড়া মনে হয় যে, টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌স্‌-এর আইন বলবৎ হওয়ার আগে মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে দাহ করা ও কবর দেওয়া—উভয় পদ্ধতিই চালু ছিল। টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌স্‌-এর আইনে শহরের মধ্যে মৃতদেহ দাহ করা বা কবর দেওয়া নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।[৩] বেশ কয়েকশো শবাধার ধারণক্ষম কবরস্থান বানানো হত গোত্রের ব্যবহারের জন্য। সিসেরোর আমলেই গোত্রের ক্ষমতা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবে তার একান্ত নিজস্ব কিছু কিছু প্রথা তখনও টিকে ছিল—যেমন এই সার্বজনীন কবরস্থানের প্রথাটা। গোত্রগত স্মৃতিস্তম্ভের বদলে তখন স্থাপিত হচ্ছিল পারিবারিক স্মৃতিস্তম্ভ, কারণ প্রাচীন গোত্রের মধ্যেকার পরিবারগুলো ক্রমশই পুরোপুরি স্বশাসিত হয়েছিল। তাসত্ত্বেও, কবর দেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাচীন গোত্রীয় প্রথা তখনও নানাভাবেই টিকে ছিল, ক্রিয়াশীল ছিল।

৩। সার্বজনীন পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান; স্যাক্রা জেন্টিলিসিয়া

রোমানদের 'স্যাক্রা' হচ্ছে আমাদের পবিত্র উপাসনার সমতুল। এই উপাসনা যৌথভাবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে করত রোমানরা। কোন গোত্র কর্তৃক আয়োজিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে বলা হত 'স্যাক্রা প্রাইভেটা' কিম্বা 'স্যাক্রা জেন্টিলিসিয়া।' নির্দিষ্ট সময়ে

১। "ভেলেইয়াস প্যাটারকিউলাস", ii, ১১৯.

২। "ডি লেগ", ii, ২২.

৩। সিসেরো, "ডি লেগ", ii, ২৩.

গোত্রগুলো নিয়মিত এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করত।[১] এমন অনেক ঘটনার কথা জানা গেছে, যেখানে গোত্রের লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে এইসব আচার-অনুষ্ঠানের ব্যয় বহন করাটা দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। নানান ঘটনা মারফৎ লোকে এগুলো পালন করার অধিকার অর্জন করত কিম্বা তা হারাত, যেমন বিবাহ বা কোন গোত্রের মধ্যে গৃহীত হওয়া মারফৎ।[২] নিয়েবুর লিখেছেন, "রোমান গোত্রগুলোর সদস্যদের যে নানান সার্বজনীন পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান থাকত, তা সর্বজনবিদিত। নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন বলিদানের ব্যবস্থাও ছিল।"[৩] যৌথ এবং ব্যক্তিগত, উভয় ধরনের আচার-অনুষ্ঠানেরই নিয়ন্ত্রণভার পুরোপুরিভাবে ন্যস্ত ছিল যাজকদের হাতে, কোনরকম অ-যাজকীয় হস্তক্ষেপ চলত না সেখানে।[৪]

রোমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো মূলত গোত্রের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, পরিবারের সঙ্গে নয়। যাজকদের, কিউরিয়নদের (curiones) এবং শাকুনতত্ত্ববিদদের (augurs) একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আর এদের সবার পরিচালনায় একটা পূজাপদ্ধতি— এগুলো যথা সময়ে গড়ে উঠেছিল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে, এই গোটা ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট সহিষ্ণু এবং অবাধ। যাজকত্ব ব্যাপারটা ছিল মূলতঃ নির্বাচনভিত্তিক।[৫] প্রত্যেক পরিবারের প্রধানরাও নিজ নিজ পরিবারের যাজক বা পুরোহিত হিসাবে কাজ করত। গ্রীক আর রোমানদের গোত্রগুলো[৬] হচ্ছে এমন এক ঝর্ণাধারা, যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে ধ্রুপদী দুনিয়ার আশ্চর্য পুরাণ-সম্ভার।

পুরনো আমলের রোমে বহু গোত্র তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য নিজেদের আলাদা আলাদা নিয়মাবলী (sacellum) রচনা করত। অনেক গোত্রে আবার বিশেষ বিশেষ বলি দেওয়ার প্রথা চালু ছিল। এই প্রথা প্রজন্ম-পরম্পরায় চালু থাকত, আর তা পালন করাকে বাধ্যতামূলক বলেই মনে করত তারা। যেমন, দেবী মিনার্ভার উদ্দেশে বলির আয়োজন করত নাউটি গোত্রের লোকেরা, হারকিউলিসের উদ্দেশে বলি দিত ফ্যাবি-রা. এবং হোরেশিয়াস তার নিজের বোনকে হত্যা করেছিল বলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি দিত হোরেশি-রা।[৭] আমাদের আলোচনার পক্ষে এটুকু

১। গোত্রগুলোর কিছু কিছু নিজস্ব পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান ('স্যাক্রা জেন্টিলিনিরা') থাকত, যেগুলো পালন করার ব্যাপারে প্রতিটি সদস্যই বাধ্য থাকত। গোত্রের যারা জন্মসূত্রে সদস্য, গৃহীত হওয়ার সূত্রে সদস্য—তারা কেউই এ নিয়মের বাইরে ছিল না। কোন ব্যক্তি তার গোত্র থেকে রেহাই দেওয়া হত এবং গোত্রীয় অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা হারাত সে।—স্মিথ-এর "ডিকশনারী অফ গ্রীক······অ্যানটিকুইটি, জেনস্।"

২। সিসেরো, "প্রো ডোমো", পৃঃ ৩.

৩। "হিষ্ট্রি অফ রোম", i, ২৪১.

৪। সিসেরো, "ডি লেগ", ii, ২৩.

৫। "ডায়োনিসিয়াস", ii, ২২.

৬। ঐ, ii, ২১.

৭। নিয়েবুর, "হিষ্ট্রি অফ রোম", i, ২৪১.

জানাই যথেষ্ট যে, নিজেদের সংগঠনের অন্যতম লক্ষণ হিসাবে প্রতিটা গোত্রের নিজস্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছিল।

৪। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার বাধ্যবাধকতা

গোত্রীয় বিধি-নিষেধগুলো প্রথা হলেও, সেগুলো ছিল আইনের মতোই শক্তিশালী। গোত্রের মধ্যে বিবাহ না করার বাধ্যবাধকতাটা ছিল এ-রকমই একটা বিধি। এটা যে পরবর্তীকালে একটা আইনগত বিধিতে পরিণত হয়েছে—এমন কোন নজির পাওয়া যায় না। কিন্তু এটাই যে ছিল গোত্রের নিয়ম, তার প্রমাণ নানাভাবেই পাওয়া যায়। রোমানদের বংশবৃত্তান্ত থেকেই জানা যায় যে তারা নিজ গোত্রের বাইরের কারুকে বিবাহ করত (এর দৃষ্টান্ত তো আমরা আগেই দিয়েছি)। আমরা আগেই দেখেছি যে, রক্তসম্বন্ধযুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ এড়ানোর জন্যই প্রাচীনকালে এই রীতিটা চালু করা হয়েছিল। বিবাহের পর মেয়েরা তাদের নিজেদের গোত্রের যাবতীয় অধিকার হারাত, কোন ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম ঘটত না। আসলে এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে, অর্থাৎ তার পিতার গোত্র থেকে স্বামীর গোত্রে সম্পত্তির হস্তান্তর ঠেকানোর জন্যই এ নিয়ম চালু করা হয়েছিল। এই একই কারণে কোন নারীর সন্তানরা তাদের মামা বা মাতামহের সম্পত্তির ওপর কোনরকম উত্তরাধিকার পেত না। যেহেতু মেয়েদের বিবাহ হত নিজেদের গোত্রের বাইরে, তাই তাদের সন্তানরা নিজেদের পিতার গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হত এবং ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে কোনরকম উত্তরাধিকার হস্তান্তরিত করা চলত না।

৫। জমির ওপর যৌথ অধিকার

বর্বর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জমির ওপর যৌথ অধিকার ব্যাপারটা এতই চালু ছিল যে ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই নিয়মের খোঁজ পেয়ে আমরা আদৌ বিস্মিত হই না। মোট জমির কিছুটা অংশ বহু প্রাচীন কাল থেকে লোকদের ব্যক্তিগত অধিকারে থাকত। এ ব্যাপারটা তাদের মধ্যে বরাবরই চালু ছিল। তবে সম্ভবত জমি ভোগদখলের অধিকার থেকেই এর সূত্রপাত হয়েছিল। এ-রকম অধিকারের কথা আমরা আগে অনেক বারই বলেছি। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায় থেকেই চালু ছিল এ ব্যাপারটা।

অ-মার্জিত ল্যাটিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রতিটা গোষ্ঠীর কিছু যৌথ বা এজমালি জমি থাকত, কিছু জমি থাকত একেকটা গোত্রের যৌথ অধিকারে, আবার কিছু জমি থাকত পরিবারগুলোর হাতে।

রোমুলাসের আমলেই রোমে ব্যক্তিগতভাবে জমি বরাদ্দ করা চালু হয়, পরে সেটাই সাধারণ নিয়ম হয়ে ওঠে। ভ্যারো এবং ডায়োনিসায়াস উভয়েই বলেছেন যে, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য রোমুলাস দুই 'জুগেরা' (প্রায় সোয়া দুই একর) করে জমি বরাদ্দ করেছিলেন।[১] পরবর্তীকালে নুমা এবং সার্ভিয়াস টিউলিয়াসও এইভাবে জমি বণ্টন করতেন বলে জানা গেছে। এইভাবে জমি বণ্টন করা থেকেই জমির ওপর পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিকানা শুরু হয়েছিল। সহজেই বোঝা যায় যে এ-রকম বণ্টন চালু করার

১। ভ্যারো, "ডি রে রাষ্টিকা", খণ্ড ১, ১০-ম পরিচ্ছেদ।

জন্য দরকার ছিল একটা সুস্থিত জীবনযাত্রা আর যথেষ্ট উন্নত বুদ্ধিমত্তা। সরকার শুধু ঐ জমির পরিমাপই নির্দিষ্ট করত না, সেইসঙ্গে তা বণ্টন করার কাজটাও করত। নিজের নিজের কাজের ফল হিসাবে লোকেরা জমি ভোগদখলের যে অধিকার লাভ করত, তার থেকে এটা ছিল একেবারেই আলাদা। জমির ওপর পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিকানা ধারণাটা অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিল, আর জমির ওপর এ-রকম পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয়েছিল সভ্যতার যুগে এসে। তবে, রোমান জনগণের হাতে আগে যে সব এজমালি জমি ছিল. সেগুলোকেই ভাগ ভাগ করে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি করা হয়। সভ্যতার যুগ শুরু হওয়ার পর, লোকের হাতে ব্যক্তিগত মালিকানায় যে-সব জমি ছিল, সেগুলো ছাড়া কিছু কিছু জমি তখনও পর্যন্ত গোত্র, কিউরিয়া আর গোষ্ঠীগুলোর যৌথ অধিকারে রয়ে গিয়েছিল।

মমসেন বলেছেন, "সুপ্রাচীন কালে রোমের গোটা অঞ্চলটা কতকগুলো গোত্র বা বংশভিত্তিক জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রথম গ্রামীণ বিভাগগুলো (tribus rusticae) সৃষ্টি করার সময় এইসব জেলার ভিত্তিতেই তা গড়া হয়েছিল…। পরবর্তীকালে যে সব জেলা সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলোর নাম নির্ধারিত হয়েছিল আঞ্চলিক ভিত্তিতে। কিন্তু ঐ পুরনো জেলাগুলোর নাম সেভাবে নির্ধারিত হয় নি, নির্ধারিত হয়েছিল গোত্র বা বংশের নাম অনুযায়ী।[১]

প্রতিটি গোত্রের এক একটা নিজস্ব জেলা থাকত, এবং প্রয়োজনের খাতিরে তারা সেখানেই বসবাস করত। এই ব্যাপারটা ছিল একটা আগাম পদক্ষেপ, যদিও গোত্র-গুলোর এভাবে পৃথক পৃথক অঞ্চলে বসবাস করাটা শুধু গ্রামীন জেলাগুলোতেই চালু ছিল না, সারা রোমেই চালু ছিল এই রেওয়াজ। মমসেন আরও বলেছেন: "যেহেতু প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব কিছুটা জমি থাকত, তাই পরিবার-সমষ্টি বা গ্রামের এক্তি-য়ারেও থাকত নিজস্ব কিছুটা জমি। পরে আমরা দেখতে পাবো যে যথেষ্ঠ সম্প্রতিকাল পর্যন্ত এই জমির বিলি-বন্দোবস্ত করা হত ঠিক পারিবারিক জমিগুলোর বিলিবন্দোবস্তের পদ্ধতিতেই, অর্থাৎ, যৌথ অধিকারের নীতির ভিত্তিতে……। তবে, এই পরিবার বা বংশসমষ্টিকে কিন্তু প্রথম থেকে কোন স্বাধীন বা পৃথক সামাজিক সংগঠন বলে মনে করা হত না, বরং গোটা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর (cavitas populi) অখণ্ড অংশ বলেই ধরা হত এগুলোকে। পরিবার বা বংশসমষ্টি বলতে বোঝাতো একই মূল বংশ থেকে উদ্ভূত মানুষদের কয়েকটি গ্রামের মোট জনগোষ্ঠীকে, যাদের ভাষা ও আদব কায়দা একই, যারা সকলে একই আইন মেনে চলতে এবং প্রয়োজনের সময় একই-রকম আইনগত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে, আর আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সময় যৌথ-ভাবে কাজ করতে বাধ্য।"[২]

১। "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ৬২. তিনি এইসব জেলার নাম উল্লেখ করেছেন—ক্যামিল্লি, গ্যালেরী, লেমোন্নি, পোল্লি, পুপিন্নি ভলতিন্নি, এমিল্লি, কর্ণেলী, ফ্যাবী, হোরেশি, মেনেন্নি, প্যাপিরী, রোমিলী, সেগী, ভেচুরী।—ঐ, পৃঃ ৬৩.

২। "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ৬৩.

মমসেন অথবা তাঁর রচনার অনুবাদক এখানে গোত্রের (gens) জায়গায় পরিবার বা বংশসমষ্টি (clan) শব্দটা ব্যবহার করেছেন, আবার অন্যত্র গোষ্ঠীর (tribe) জায়গায় ব্যবহার করেছেন প্রদেশ বা অঞ্চল (canton) শব্দটা। এই ব্যাপারটা কিছুটা অদ্ভুত কেননা এইসব সুপরিচিত সংগঠনের জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ লাতিন ভাষায় আছে। মমসেনের মতে, রোম নগরী স্থাপিত হওয়ার পূর্ববর্তী লাতিন গোষ্ঠী বলতে সে-গুলোকেই বোঝাত, যেখানে পরিবার, গোত্র এবং গোষ্ঠীর হাতে কিছুটা করে জমি থাকত। ঐ সব গোষ্ঠীর সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন। দেখা যায়, ইরোকোয়াদের সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ট সাদৃশ্য ছিল কেননা লাতিন গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক সংগঠনের এই বিভাগগুলো হচ্ছে গোত্র, গোষ্ঠী আর মিত্রসঙ্ঘ।[১] ভ্রাতৃত্বের নাম মমসেনের লেখায় নেই, তবে এটারও অস্তিত্ব ছিল বলেই মনে হয়। উল্লিখিত পরিবারগুলো ছিল খুব সম্ভবত একাধিক পরিবারের সমন্বয়। এমনটা হতেই পারে যে ওগুলো ছিল জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ যুক্ত কিছু পরিবারের সমন্বয়, যাদের একটা বাসগৃহ থাকত এবং পারিবারিক জীবনে যারা সাম্যবাদ মেনে চলত।

১। "কোন বংশসমষ্টির জন্য যেমন একটা স্থায়ী স্থানীয় এলাকা দরকার হত, তেমনই এইসব প্রদেশ বা অঞ্চলের জন্যও দরকার হত একটা স্থায়ী স্থানীয় এলাকা। কিন্তু ঐ-সব বংশসমষ্টির সদস্যরা, বা অন্যভাবে বললে, ঐ-সব প্রদেশ বা অঞ্চলের বাসিন্দারা যেহেতু গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত, তাই প্রদেশ বা অঞ্চলের নিজস্ব এলাকা বা যৌথভাবে বসবাসের এলাকা কোন শহরে গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। শহরগুলো ছিল সার্বজনীন সমাবেশের জায়গা, সেখানে থাকত বিচারালয়, সমগ্র অঞ্চলের সার্বজনীন আশ্রয়স্থল। প্রতি আটদিন অন্তর তারা এখানে মিলিত হত পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ও আমোদ-প্রমোদ করার জন্য। আবার যুদ্ধের সময় অধিক নিরাপত্তার জন্য নিজেদের গোরু-ছাগল সহ তারা আশ্রয় নিত এখানেই। এমনি সময়ে কিন্তু এই জায়গাটাতে কেউ বসবাস করত না, বা বড়জোর মুষ্টিমেয় জনা কয়েক থাকত···। কোন সুরক্ষিত জায়গায় নিজেদের একটা মিলনস্থল এবং কিছু বংশসমষ্টির সমন্বয়ে এই প্রদেশ বা অঞ্চলগুলোই গড়ে তুলেছিল একটা প্রাথমিক রাজনৈতিক ঐক্য, আর তা থেকেই শুরু হয়েছে ইতালিয় ইতিহাসের পথচলা···। প্রাচীনকালে এই সবকটা প্রদেশই ছিল রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম। প্রতিটা প্রদেশের শাসক হিসাবে কাজ করত সেই প্রদেশের রাজা তাকে সাহায্য করত বয়স্কদের পরিষদ আর সৈনিক-পরিষদ। তা সত্ত্বেও, জন্মসূত্র এবং ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাথিত্বের অনুভূতিটা তাদের সকলকার মধ্যে শুধু ছড়িয়েই ছিল না, সেইসঙ্গেই এই অনুভূতিটা মূর্ত হয়ে উঠেছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও। এই প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে সমস্ত লাতিন প্রদেশগুলোর স্থায়ী মিত্রসঙ্ঘ।"—হিস্ট্রি অফ রোম", i, ৬৪-৬৬, পরিষদ ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে রাজারাই শাসন করত প্রদেশগুলো—এই বক্তব্যটা আদৌ সত্য নয়, ফলে এ থেকে একটা ভ্রান্ত ধারণাই সৃষ্টি হয়। ধরেই নেওয়া যায় যে সমর-নায়ক

৬। সাহায্য, প্রতিরক্ষা এবং আঘাতের পরিচর্যার ব্যাপারে পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব

বর্বরতার যুগে, ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের ওপরেই নির্ভর করতে হত। কিন্তু রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পর গোত্রের সদস্যরা পরিণত হল নাগরিকে, এবং তখন থেকে তাদের যে কোন ব্যক্তিগত অধিকারের ব্যাপারে গোত্র কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই তারা আইন ও রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হতে পারত। নতুন ব্যবস্থার আমলে এসে প্রাচীন ব্যবস্থার যে-সব বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এটা তার অন্যতম। তাই পুরনো দিনের লেখকদের রচনায় এই পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে তার অর্থ এই নয় যে প্রাচীন আমলে গোত্রের সদস্যরা পরস্পরের প্রতি এইসব দায়-দায়িত্ব পালন করত না। বরং গোত্রীয় সংগঠনের নীতিগুলোকে বিচার-বিবেচনা করে দেখলে এই সিদ্ধান্তই মানতে হয় যে এগুলো ছিল তাদের অবশ্য পালনীয় দায়-দায়িত্ব। ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার পরও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এইসব রীতি পালিত হতে দেখা গেছে। আপিয়াস ক্লডিয়াস যখন কারারুদ্ধ হন (৪৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ), তখন তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কেইয়াস ক্লডিয়াস সহ ক্লডিয়ান গোত্রের সমস্ত সদস্যদের বিলাপ করতে শোনা গিয়েছিল।[১] গোত্রের কোন সদস্য দুর্দশাগ্রস্ত বা অপমানিত হলে, অন্যান্য প্রত্যেকেই তা অনুভব করত এবং সেই দুর্দশা বা অপমান তাদের সকলের বুকেই বাজতো। নিয়েবুর বলেছেন কার্থেজের দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় "শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া সাথীদের মুক্ত করার জন্য গোত্রের সদস্যরা সকলে মিলে মুক্তিপণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের নির্দেশে তারা তা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। এই পারস্পরিক দায়িত্ববোধটা ছিল গোত্রের একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।"[২] ভেইয়েনাশিয়ায় ধ্বংসকার্য চালানোর কারণে ক্যামিলাসের বিচারের জন্য আহূত হয়েছিল গণ-আদালত। বিচারের আগের দিন সে নিজের বাড়িতে তার গোষ্ঠীর লোকদের আর নিজের পোষ্যদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের পরামর্শ চায়। তারা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে যে, তার জন্য যে জরিমানা ধার্য করবে গণ-আদালত, তা তারা সকলে মিলে যোগাড় করে দেবে, কিন্তু তাকে নির্দোষ প্রমাণ

একটা নির্বাচনভিত্তিক পদের অধিকারী হত, এবং নির্বাচকমণ্ডলী ইচ্ছে করলে তাকে বরখাস্তও করতে পারত। এছাড়া তার আর কোন অসামরিক কার্যকলাপের অধিকার থাকত বলে মনে করার মতো সঙ্গত কারণ নেই। অতএব, এ থেকে আবশ্যিকভাবে না হলেও যুক্তিসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, গোষ্ঠীগুলোকে শাসন করত বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটা পরিষদ এবং একটা সৈনিক-পরিষদ, আর তাদেরকে সাহায্য করত একজন সামরিক সর্বাধিনায়ক, যে শুধু সামরিক কর্তব্য পালন করা ছাড়া অন্য কোন কাজের অধিকারী ছিল না। অর্থাৎ এটা ছিল তিন-শক্তির সরকার যা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে সর্বত্রই দেখা গেছে, এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের চরিত্র আবশ্যিকভাবেই গণতান্ত্রিক ধরণেরই হয়ে থাকে।

১। লিভি, vi, ২০.

২। হিস্ট্রি অফ রোম, i, ২৪২.

করা সম্ভবপর নয়।[১] এইসব ঘটনার মধ্যে গোত্রের সদস্যদের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব-বোধের ছবি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। নিয়েবুর আরও বলেছেন যে, গোত্রের দুঃস্থ সদস্য-দের সাহায্য করার দায়িত্ব রোমান গোত্রের সদস্যদের থাকত।[২]

৭। গোত্রীয় নাম ব্যবহারের অধিকার।

গোত্রের চরিত্রই এই অধিকারের জন্ম দিয়েছিল। গোত্রের পুরুষ সদস্যদের ছেলে-মেয়েরা জন্মসূত্রেই গোত্রের সদস্যপদ লাভ করত এবং অধিকার করত গোত্রীয় নাম ব্যবহারের অধিকার। দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর গোত্রের সদস্যদের পক্ষে তাদের আদি পূর্বপুরুষকে চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং পরবর্তীকালে এইভাবেই গোত্রের মধ্যেকার বিভিন্ন পরিবারগুলির পক্ষেও পরবর্তীকোন সাধারণ পূর্বপুরুষের সূত্র ধরে নিজেদের সম্পর্ক নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অক্ষমতা তাদের বংশধারার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে, তবে এ থেকে এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে ঐ পরিবারগুলো কোন এক আদি পূর্বপুরুষের থেকে সৃষ্ট নয়। প্রতিটা মানুষ গোত্রের মধ্যেই জন্ম নিতো এবং তারা প্রত্যেকেই গোত্রের স্বীকৃত সদস্যদের সূত্র ধরে নিজের নিজের বংশধারা চিহ্নিত করতে পারত—এটুকুই ছিল তাদের গোত্রীয় বংশধারার সদস্য হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ, আর এটাই গোত্রের সমস্ত সদস্যের মধ্যেকার রক্তের সম্পর্ককে প্রমাণিত করত। কিন্তু নিয়েবুর সহ[৩] কয়েকজন পর্যবেক্ষক গোত্রের মধ্যেকার পরিবার গুলোর মধ্যে কোনরকম রক্তের সম্পর্ক থাকত বলে স্বীকার করেন নি, কারণ তারা কোন এক সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে নিজেদের সকলকার উদ্ভূত হওয়ার প্রমাণ দাখিল করতে পারত না। এর অর্থ হচ্ছে গোত্র ছিল একটা পুরোপুরি জোড়াতাড়া দেওয়া সংগঠন, আর তাই তা টিকে থাকতে পারে নি। সিসেরোর সংজ্ঞা থেকে নিয়েবুর গোত্রের সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকার বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত খাড়া করেছেন, তা মোটেই টেকসই নয়। কারুর গোত্রীয় নাম ব্যবহার করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললে এ কথাই বলতে হয় যে কোন এক আদিপুরুষ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ওপর এ অধিকার নির্ভর করত না, নির্ভর করত ঐ গোত্রের মধ্যেকার কিছু সংখ্যক সর্বজনস্বীকৃত পূর্ব-পুরুষ থেকে উদ্ভূত হওয়ার ওপর। বিভিন্ন প্রজন্মের যে সদস্যদের মারফৎ বংশ-তালিকা তৈরী করা হয়ে থাকে, তাদের ব্যাপারে কোন লিখিত নথি না থাকলে অনেক সদস্যর নামই মানুষ কাল ক্রমে ভুলে যায়। একই গোত্রের মধ্যেকার কয়েকটা পরিবারে হয়ত তাদের কোন একজন সাধারণ পূর্বপুরুষের নাম ভুলে যেতেও পারে, কিন্তু তার

১। লিভি, V, ৩২.

২। "হিস্ট্রি অফ রোম," i, ২৪২ : ডায়োনিসায়াসের রচনা থেকে উদ্ধৃতি, ii, ১০

৩। "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৪২.

অর্থ এই নয় যে তারা ঐ গোত্রের কোন সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয় নি।[১] পুরুষ ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয় শুরু হওয়ার পর গোত্রগুলোর প্রাচীন নাম বদলে যেতে থাকে। আগে স্বাভাবিকভাবেই এইসব গোত্রের নামকরণ করা হত কোন পশু[২] বা জড় পদার্থের নামে।
তার বদলে শুরু হল বিভিন্ন ব্যক্তির নামে গোত্রের নামকরণ করার প্রথা। গোত্রের ইতিহাসে অত্যন্ত বিশিষ্ট কিছু কিছু ব্যক্তি গোত্রগুলোর আদিপুরুষ হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে এবং তাদের নামেই নামকরণ করা হয় গোত্রগুলোর। আমি অন্যত্র বলেছি যে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে গোত্রগুলো এদের বদলে অন্য কিছু লোকের নামে নিজেদের নামকরণ করত। এলাকাগত বিভাজনের ফলস্বরূপ যখন গোত্রগুলোও বিভক্ত হয়ে পড়ত, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার একটা অংশ গ্রহণ করত নতুন কোন নাম। কিন্তু যে জ্ঞাতিত্ব ছিল গোত্রের ভিত্তিস্বরূপ, এই নামের পরিবর্তনের ফলে তা আদৌ বিঘ্নিত হত না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রোমান গোত্রগুলোর বংশধারা (বিভিন্ন সময়ে নামের পরিসহ) এমন একটা যুগ থেকে শুরু হয়েছিল, যখন লাতিন, গ্রীক এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতভাষী মানুষরা ছিল একই গোষ্ঠীভুক্ত (যার আদি উৎস আমাদের জানা নেই)—তাহলে রোমান গোত্রগুলোর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। যে কোন যুগেই, কোন ব্যক্তির গোত্রীয় নাম ব্যবহার করার অধিকার হারানোটা ছিল একটা প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার। আর সে কারণেই সে যে তার গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের মতো একই বংশের সন্তান—তার সবথেকে বড় প্রমাণ ছিল এই গোত্রীয় নাম ব্যবহার করার অধিকারটাই। গোত্রীয় বংশধারা ভঙ্গ করার একটাই মাত্র উপায় ছিল—ভিন্ন বংশের কোন ব্যক্তিকে গোত্রের মধ্যে গ্রহণ করা। নিয়েবুর যদি এ কথা বলতেন যে, গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে যে রক্তের সম্বন্ধ থাকত সেই সম্বন্ধ তাদের কারো কারো মধ্যে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ত—তাহলে আপত্তির কিছু

১। "তাসত্ত্বেও, রোমানদের কাছে রক্তের সম্পর্কই ছিল কোন বংশের সদস্যদের মধ্যেকার এবং আরও বেশি করে কোন পরিবারের সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তিস্বরূপ। আর, তাদের মধ্যেকার জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ককে বজায় রাখার সম্বন্ধযুক্ত বিষয় ছাড়া ঐ সব বংশ বা পরিবারের আর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রোমান জনগোষ্ঠীর ছিল না।"—মমসেন-এর "হিষ্ট্রি অফ রোম," i, ১০৩.

২। একটা কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য এখানে উল্লেখ করা যায়। আর্গস-এর ক্লাইসথেনিস সিসিওন-এর তিনটি ডোরিয়ান গোষ্ঠীর নাম বদলে দিয়েছিলেন। একটা গোষ্ঠীর নাম দিয়েছিলেন হায়াত, অর্থাৎ একবচনে "একটি শুয়োর; আরেকটার নাম দেন ওনিতা, অর্থাৎ "গাধা", আর তৃতীয়টার নাম দেন কোরিতা, অর্থাৎ "শূকরছানা।" সিসিওনিয়ানদের অপমানিত করার জন্যই এইসব নাম দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এবং তার পরে আরও ষাট বছর এইসব নামই বহাল ছিল। এইভাবে জীবজন্তুদের নামে গোষ্ঠীর নামকরণ করার ধারণাটা কি ঐতিহ্যগতভাবেই পাওয়া?—দ্রষ্টব্য, গ্রোটে-র "হিষ্ট্রি অফ গ্রীস", iii; ৩৩, ৩৬.

ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যেকার যাবতীয় সম্বন্ধকে অস্বীকার করলে গোত্র শুধুমাত্র কিছু লোকের একটা সমষ্টিতে পরিণত হয়, তার মধ্যে কোনরকম ঐক্যবন্ধন থাকে না, এবং এর ফলে সেই মৌলিক নীতিরই বিরোধিতা করা হয় যার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল গোত্র আর যে নীতির সাহায্যে পুরো তিনটে ঐতিহাসিক যুগ ধরে সেটা টিকে থাকতে পেরেছিল।

অন্যত্র আমি বলেছি যে, গোত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল রক্তসম্বন্ধের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার রক্তসম্বন্ধযুক্ত সমস্ত মানুষকে অল্প কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করা যেত এবং বহু যুগ ধরে তারা ঐ সব ভাগগুলোর মধ্যেই নিজেদের বংশ-ধারা বজায় রাখতে পারত। দুজন ব্যক্তির প্রকৃত পূর্বপুরুষ যতই প্রাচীন সময়ের হোক না কেন, তাদের দুজনকার মধ্যেকার সম্বন্ধসূত্র খুঁজে বার করা মোটেই কঠিন ছিল না। পাঁচশ সদস্য বিশিষ্ট কোন ইরোকোয়া গোত্রের প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের সম্পর্ক থাকে, এবং প্রত্যেকেই অন্যদের সঙ্গে নিজের কী সম্পর্ক, তা জানে বা খুঁজে বের করতে পারে। অর্থাৎ, প্রাচীন কালে গোত্রগুলোর মধ্যে জ্ঞাতিত্বের সম্বন্ধটা বরাবরই বজায় থাকত। একপতিপত্নীক পরিবার প্রথা চালু হওয়ার পর জ্ঞাতিত্বের এক নতুন ও একেবারে ভিন্ন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। এই ব্যবস্থায় একই বংশের ভিন্ন ভিন্ন পরিবার জাত সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক কিছুদিনের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যায়। লাতিন আর গ্রীক গোষ্ঠীগুলো যখন ঐতিহাসিক যুগে পদার্পণ করে, তখন তাদের মধ্যে এই ব্যবস্থাই চালু ছিল। খুব সম্ভবত তার আগে পর্যন্ত তাদের মধ্যে চালু ছিল তুরানিয় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ক সহজেই জানা যেত।

গোত্রীয় সংগঠনের ভাঙন শুরু হওয়ার পর সেই পুরনো বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে নতুন গোত্র গড়ে ওঠা বন্ধ হয়ে যায় এবং বিদ্যমান কিছু গোত্রও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে একটা নির্দিষ্ট বংশ হিসেবে গোত্রীয় বংশধারার গুরুত্ব বেড়ে যায় অনেকটাই। রোমান সাম্রাজ্যের আমলে অন্যান্য অঞ্চল থেকে নতুন নতুন প্রচুর পরিবার এসে রোমে বসবাস করতে শুরু করত, এবং নানান সামাজিক সুযোগ-সুবিধে আদায় করার জন্য এক একটা গোত্রীয় নাম ধারণ করে বসতো। এই ব্যাপারটা যে আসলে অন্যায়ভাবে সুবিধে আদায়ের উপায়, তা স্বীকৃত হওয়ার পর সম্রাট ক্লডিয়াস (৪০-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) বিদেশীদের রোমান নাম গ্রহণের ওপর, বিশেষত প্রাচীন গোত্রগুলোর নাম গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[১] ঐতিহাসিক যুগের রোমান গোত্রগুলো প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্য, উভয় আমলেই নিজেদের বংশধারার ওপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করত।

গোত্রের সমস্ত সদস্যই ছিল স্বাধীন, তারা প্রত্যেকেই সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে ভোগ করত। এ ব্যাপারে সবথেকে ধনীর সঙ্গে সবথেকে দারিদ্রের, অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে অখ্যাত ব্যক্তির কোন প্রভেদ ছিল না। জন্মগত অধিকারের সূত্রে তারা যে গোত্রীয় নামের অধিকারী হত, সেই নাম তাদেরকে যে মর্যাদা প্রদান করত, তা তারা সকলেই উপভোগ করত সমানভাবে। রোমান গোত্রগুলোর মৌলিক নীতি ছিল:

১। সুটন, "ভিট ক্লডিয়াস", পরিচ্ছেদ ২৫.

স্বাধীনতা, সমতা আর ভ্রাতৃত্ব, এবং যাদের মধ্যে এগুলো গ্রীক বা আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে মোটেই কম প্রভাবশালী নয়।

৮। গোত্রের মধ্যে আত্মীয়দের গ্রহণ করার অধিকার।

প্রজাতন্ত্রের আমলে, এবং সাম্রাজ্যের আমলেও, পরিবারের মধ্যে বাইরের লোকদের গ্রহণ করার প্রথা চালু ছিল। এর ফলে ঐ সব বহিরাগতরা নির্দিষ্ট পরিবারটি যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত, সেই গোত্রের সদস্য হিসাবে পরিগণিত হত। কিন্তু এভাবে কাউকে গোত্রের মধ্যে গ্রহণ করার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত এমন সব আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি, যেগুলোর দরুন এভাবে কোন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠত। সন্তানহীন কোন ব্যক্তির সন্তানের জন্ম দেওয়ার মতো বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, যাজকদের এবং 'কমিনিয়া কিউরিয়াটা'-র অনুমতি সাপেক্ষে সে কোন ছেলেকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে বা দত্তক নিতে পারত। যে পরিবার থেকে ছেলেটিকে দত্তক নেওয়া হল, তাদের পবিত্র আচার অনুষ্ঠান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তাদের পরিষদের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, তার জন্য যাজকদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে।[১] কেননা, দত্তক নেওয়া ছেলেটি তার দত্তক পিতার গোত্রীয় নামই গ্রহণ করত, আর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হয়ে উঠতে পারত। সিসেরোর আমলে যে সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চালু ছিল, সেগুলো থেকে স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তে আশা যায় যে, পূর্বতন সমাজব্যবস্থায় (যেটা ছিল পুরোপুরই গোত্রভিত্তিক) এইসব বিধি-নিষেধের সংখ্যা আরও বেশিই ছিল এবং এভাবে দত্তক নেওয়ার ঘটনাও খুব কমই ঘটত। প্রাচীন যুগে গোত্রের এবং গোত্র যে কিউরিয়ার অন্তর্গত তার মতামত না নিয়ে কাউকে দত্তক নেওয়াটা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে এভাবে গৃহীত ব্যক্তিদের সংখ্যাও সীমিত থাকতে বাধ্য। দত্তক নেওয়ার প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানের কিছু কিছু স্মারক আজও টিকে আছে।

৯। গোত্রের প্রধানদের নির্বাচন ও বরখাস্ত করার অধিকার।

প্রধান পদের শর্ত বা কার্যকাল সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ তথ্য আমদের হাতে নেই। এ থেকেই বোঝা যায় রোমান গোত্রগুলোর ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান কত সীমিত, কত অসম্পূর্ণ। রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত প্রত্যেক গোত্রেরই সম্ভবত একাধিক প্রধান থাকত। পদটা শূন্য হলে হয় গোত্রের সদস্যদের মধ্যে থেকেই কাউকে প্রধান হিসেবে নির্বাচন করা হত (ইরোকোয়াদের মতো), অথবা বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে কাউকে বসানো হত ঐ পদে। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের আমলে বা তার আগে রাজাদের আমলেও এদের মধ্যে বংশগত উত্তরাধিকার চালু থাকার কোন নজির পাওয়া যায় না, বরং সমস্ত পদের ব্যাপারে নির্বাচনমূলক নীতির অগ্রগতিই চোখে পড়ে। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে লাতিন গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বংশগত উত্তরাধিকার চালু ছিল না। সর্বোচ্চ পদ, অর্থাৎ রেক্স বা শাসক পদটা ছিল নির্বাচন ভিত্তিক, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যারা নির্বাচিত হত অথবা ঐ পদে নিয়োজিত হত, এবং রাষ্ট্রদূত বা ছোটখাট বিচারপতিদের ক্ষেত্রেও একই রীতি প্রযোজ্য

১। সিসেরো, "প্রো ডোমো", পরিচ্ছেদ ১৩.

ছিল। নুমা যে যাজকদের বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন, সেখানে একটু অন্যরকম রীতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে ঐ বিদ্যালয়ের কোন পদ শূন্য হলে যাজকেরা নিজেরাই নির্বাচনের সাহায্যে কাউকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করত। ২১২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ নাগাদ কমিশিয়া কর্তৃক জনৈক সর্বোচ্চ যাজক (pontifex maximve) নির্বাচনের কথা উল্লেখ করেছেন লিভি।[১] লেক্স ডমিটিয়া (lex Domitia) আইনে যাজক ও পুরোহিতদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সদস্যদের নির্বাচিত করার অধিকার জনসাধারণের ওপর অর্পিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে সুলা এই আইনের পরিবর্তন ঘটান।[২] লাতিন গোত্রগুলো যখন প্রথম ইতিহাসের আওতায় আসে তখন এবং তারপরে প্রজাতন্ত্রের সমগ্র পর্যায় জুড়ে তাদের মধ্যে নির্বাচনমূলক নীতির সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে একটাই সিদ্ধান্তে আসা যায়—প্রধান পদটা ছিল নির্বাচনমূলক। তাদের সমাজব্যবস্থায় বহু ক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক লক্ষণগুলো দেখা যায়, সেগুলো তারা গোত্রের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছিল। প্রধান পদটা বংশগত উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেত বলতে হলে, তার বিরুদ্ধ মতকে খণ্ডন করার মতো ইতিবাচক প্রমাণ হাজির করতে হবে। কোন পদের কার্যকাল যদি পদাধিকারীর জীবনব্যাপী হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে নির্বাচিত করার অধিকারের সঙ্গে তাকে বরখাস্ত করার অধিকারটাও সাধারণত থাকেই।

রোম নগরী প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত, এইসব প্রধানদের নিয়ে বা এদের মধ্যে থেকে জনাকয়েক প্রধানকে নিয়েই গড়ে উঠত বেশ কিছু লাতিন গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিষদ। এই পরিষদই ছিল তাদের শাসন পরিচালনার মুখ্য উপকরণ। ঠিক গ্রীকদের মতোই লাতিন গোষ্ঠীগুলোর শাসনব্যবস্থাতেও তিনটে শক্তির সমন্বয় দেখা যায়।—প্রধানদের পরিষদ, গণ-পরিষদ (অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলো গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা এদের হাতেই থাকত বলে ধরে নেওয়া যায়) এবং সমর নায়ক। মমসেন বলেছেন, "এই সমস্ত এলাকাগুলোই (গোষ্ঠীগুলো) প্রাচীন যুগে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। প্রতিটা এলাকাকে শাসন করত তাদের নিজ নিজ রাজারা, তাকে সহযোগিতা করত বয়স্কদের পরিষদ আর সৈনিক-পরিষদ।"[৩] মমসেন যেভাবে ব্যাপারটাকে সাজিয়েছেন, তাকে ঠিক উল্টো করে দেখতে হবে—তবেই পৌঁছানো যাবে সত্যের কাছাকাছি। যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছিল এই পরিষদ, সেই ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান আর নিজের কার্যকলাপের দরুন এই পরিষদ আবশ্যিকভাবেই তাদের অসামরিক বিষয়সমূহের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। পরিষদই শাসনকার্য চালাত, সমর-নায়ক নয়। নিয়েবুর লিখেছেন, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী সুসভ্য দেশগুলোর প্রত্যেকটা শহরে গণ-পরিষদগুলো রাষ্ট্রের পক্ষে যতটা অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল ব্যবস্থাপক-সভাও। এই সভা ছিল বর্ষীয়ান নাগরিকদের একটা নির্বাচিত সংস্থা। আরিস্ততল বলেছেন:

১। লিভি, XXV, ৫.

২। স্মিথ-এর "ডিকশনারী অফ আর্ট. পন্টিফেক্স।

৩। "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ৬৬.

—এই পরিষদ তাদের মধ্যে সবসময়ই ছিল, তা তার চরিত্র অভিজাততান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক, যা-ই হোক না কেন। এমনকি যেখানে অল্প কয়েকজনের শাসন চালু আছে, (রাষ্ট্রের অংশীদারদের সংখ্যা যতই কম হোক না কেন), সেখানেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের পরিকল্পনা রচনার জন্য কয়েকজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়ে থাকে।"[১] গোত্রভিত্তিক সমাজের প্রধানদের পরিষদের জায়গায় রাজনৈতিক সমাজে গড়ে উঠেছিল ব্যবস্থাপক-সভা। একশজন বর্ষীয়ান মানুষকে নিয়ে, রোমানদের প্রথম ব্যবস্থাপক-সভাটি গড়ে তুলেছিলেন রোমুলাস। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, সে সময় রোমে ঠিক একশটাই গোত্র ছিল। এ থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে ঐ সব গোত্রের প্রধানদের নিয়েই ব্যবস্থাপক-সভাটি গড়ে তুলেছিলেন রোমুলাস। সভার সদস্যরা সারা জীবনের জন্যই ঐ পদের অধিকারী হত, কিন্তু বংশগত উত্তরাধিকারসূত্রে ঐ পদের অধিকারী হওয়া যেত না। এ থেকে আমরা পৌঁছতে পারি আমাদের শেষ সিদ্ধান্তে—সে সময় প্রধানের পদটাও ছিল নির্বাচনভিত্তিক। তা যদি না হত, তাহলে রোমান ব্যবস্থাপক-সভাকে একটা বংশগত উত্তরাধিকারমূলক সংস্থা হিসেবেই গড়ে উঠতে দেখা যেত। তাদের জীবনের বহু বিষয়ের মধ্যেই আমরা প্রাচীন সমাজের গণতান্ত্রিক গঠন-কাঠামোর নজির খুঁজে পাই। গ্রীস ও রোমের গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে-সব বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে এ-সব তথ্য অনুপস্থিত।

রোমান গোত্রগুলোতে কতজন করে সদস্য থাকত, সে ব্যাপারে সৌভাগ্যক্রমে কিছু তথ্য আমাদের হাতে আছে। ৪৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ফ্যাবিয়ান গোত্রের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাপক-সভার কাছে প্রস্তাব রাখা হয়, ভিয়েন্‌শিয়ানের যুদ্ধকে একটামাত্র গোত্রের যুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করা হোক। তারা আরও বলে যে, ঐ যুদ্ধের জন্য বৃহৎ কোন সৈন্যবাহিনীর দরকার নেই, দরকার হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট, স্থায়ী বাহিনী।[২] তাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশবাসীর প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে তারা তিনশ ছয় জন সৈনিক (সকলেই অভিজাত) যাত্রা শুরু করে।[৩] প্রথমদিকে তারা বেশ কিছু জয়লাভ করে, কিন্তু শেষপর্যন্ত শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমনে তাদের পুরো বাহিনীটা ধ্বংস হয়ে যায়। তবে, রোম ত্যাগ করে যাওয়ার সময় তারা একটি অল্পবয়সী বালককে রোমে রেখে গিয়েছিল। ফ্যাবিয়ান গোত্রের বংশধারা বজায় রাখার জন্য বেঁচে ছিল শুধু ঐ একজনই।[৪] একজন মাত্র বালককে রেখে তিনশ জনেরও বেশি লোক নিজেদের পরিবার ত্যাগ করে যুদ্ধযাত্রা করল—ব্যাপারটা খুব বিশ্বাস্য হয়। কিন্তু সে রকম বিবরণই

১। ঐ, i, ২৫৮.

২। লিভি, ii, ৪৮.

৩। ঐ, ii, ৪৯.

৪। Trecentos sex perisse satis convenit : unum prope pubescem actate relictum stripem gente Fabiae, dubisque rebus populi Romani sepe domi bellique vel maximum futurum auxilium.—লিভি, ii, ৫০; এছাড়াও দ্রষ্টব্য ওভিদ্‌-এর "Fasti", ii, ১৯৩.

পাওয়া যাচ্ছে। ধরে নেওয়া যায়, যতজন পুরুষ ছিল তাদের মধ্যে, স্ত্রীলোকও ছিল ততজন। তাহলে ঐসব পুরুষদের সন্তান-সন্ততি সহ ফ্যাবিয়ান গোত্রের লোকসংখ্যা অন্তত সাতশ জন হয়ই।

রোমান গোত্রগুলোর অধিকার, দায়-দায়িত্ব ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অসম্পূর্ণ হলেও, যেটুকু আমরা জেনেছি তা থেকে নিশ্চিন্তভাবেই বোঝা যায় যে, গোত্রই ছিল তাদের সামাজিক, শাসনতান্ত্রিক এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের উৎসস্থল। সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক এককস্বরূপ এই গোত্রের বৈশিষ্টগুলো সমাজের উচ্চতর সংগঠনগুলোর মধ্যেও প্রতিফলিত হত, কেননা ঐ-সব সংগঠনের মধ্যে গোত্রের প্রতি-নিধিরা আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবেই উপস্থিত থাকত। রোমানদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশকে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে হলে রোমান গোত্রগুলো সম্বন্ধে আরও গভীর জ্ঞান অর্জন করা একান্তই প্রয়োজন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রোমিয় কিউরিয়া, গোষ্ঠী এবং জনসম্প্রদায় (populus)

রোমিয় গোত্র নিয়ে আলোচনা করার পর চোখ ফেরানো যাক কয়েকটি গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা কিউরিয়াগুলোর দিকে, কয়েকটি কিউরিয়া নিয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীগুলোর দিকে, এবং শেষত, বেশ কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে ওঠা রোমিয় জন-সম্প্রদায়ের (populus) দিকে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের অনুসন্ধানকে আমরা সীমিত রাখব রোমুলাসের আমল থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমল পর্যন্ত রোমান সমাজের কাঠামোর মধ্যেই, আর কিছুটা ছুঁয়ে যাব প্রজাতন্ত্রের যুগের গোড়ার দিকে সংঘটিত পরিবর্তনগুলোকে, যখন ভেঙে পড়ছিল গোত্রভিত্তিক কাঠামো আর তার জায়গায় মাথা তুলছিল এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে দুটো শাসনতান্ত্রিক সংগঠন কিছুদিন পাশাপাশি টিকে থেকেছিল (যেমনটি হয়েছিল এথেনীয়দের মধ্যে)—একটার চলছিল ক্ষয়, অপরটার ঘটছিল উদয়। প্রথমটা হচ্ছে গোত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটা সমাজ (societa), দ্বিতীয়টা ভূখণ্ড ও সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটা রাষ্ট্র (civitas)। প্রথমটাকে সরিয়ে ধীরে ধীরে দৃঢ়মূল হয়ে উঠছিল দ্বিতীয়টি। রূপান্তরকালীন যুগের যে-কোন শাসন ব্যবস্থার চরিত্রটা অবশ্যম্ভাবীরূপেই জটিল ধরনের হয়ে থাকে, ফলে তার স্বরূপটা বোঝাও হয়ে ওঠে দুষ্কর। এই পরিবর্তনগুলো মোটেই খুব চটজলদি প্রকৃতির ছিল না। এগুলো ঘটেছে ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে। পরিবর্তনের এই ধারা শুরু হয়েছিল রোমুলাসের আমল থেকে, আর (একেবারে নিখুঁত হয়ে না উঠলেও) সমাপ্ত হয়েছিল সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলে এসে। অর্থাৎ প্রায় দুশো বছরের একটা প্রক্রিয়া, যার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে সদ্যোজাত প্রজাতন্ত্রের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি। রাষ্ট্রের আওতায় আসার পর গোত্রগুলোর প্রভাব কিভাবে নিঃশেষিত হয়ে গেল, তার ইতিবৃত্ত খুঁজতে হলে প্রথমে আমাদের পর্যালোচনা করে দেখতে হবে তাদের কিউরিয়া, গোষ্ঠী আর জাতিকে, তারপর সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করতে হবে ঐ নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার। এই শেষ বিষয়টা নিয়ে আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করব।

রোমানদের গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংগঠনের চারটে স্তর দেখা যায়: প্রথম হচ্ছে গোত্র, যা ছিল রক্তসম্বন্ধযুক্ত কিছু মানুষের একটা সংগঠন আর সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক একক; দ্বিতীয়টা হচ্ছে কিউরিয়া, অর্থাৎ গ্রীক ভ্রাতৃত্বের সমতুল, যা গড়ে উঠত একটা উচ্চতর সংস্থায় ঐক্যবদ্ধ দশটা গোত্রকে নিয়ে; তৃতীয়টা হচ্ছে গোষ্ঠী, যা গড়ে উঠত দশটা কিউরিয়া নিয়ে এবং যা গোত্রীয় সংগঠনের আওতায় থাকার সময়

একটা জাতির সমতুল কিছু লক্ষণের অধিকারী ছিল ; এবং চতুর্থটা হচ্ছে রোমান জন-সম্প্রদায় (Populus Romanus), টুলাস হস্টিলিয়াস-এর আমলে যা গড়ে উঠেছিল একটা গোত্রভিত্তিক সমাজের মধ্যে একাঙ্গীভূত হওয়া এ-রকম তিনটে গোষ্ঠীকে নিয়ে, যার মধ্যে ছিল মোট তিনশটা গোত্র। বিভিন্ন তথ্য থেকে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার সময় সমস্ত ইতালিয়ান গোষ্ঠীগুলোর সমাজ-কাঠামো এ-রকমই ছিল। তফাৎ অবশ্য দু'একটা ছিলই। যেমন, গ্রীক ভ্রাতৃত্বগুলোর তুলনায় কিম্বা অন্যান্য ইতালিয়ান গোষ্ঠীর ভ্রাতৃত্বগুলোর তুলনায় রোমান কিউরিয়া-গুলো সম্ভবত কিছুটা উন্নত মানের সংগঠন ছিল ; তাছাড়া, বারবার অস্বাভাবিকভাবে বিস্তার ঘটার ফলে রোমান গোষ্ঠীগুলো অন্যান্য ইতালিয়ান গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক সুসংহত হয়ে উঠতে পেরেছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কিছু প্রমাণ আমরা যথাসময়ে উপস্থাপিত করব।

রোমুলাসের আমলের আগেই ইতালিয়রা তাদের বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ে এক জনবহুল সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। তারা যে-সব ছোটখাট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, সেগুলোর সংখ্যা মোটেই কম ছিল না। এই ঘটনা থেকেই তাদের অনিবার্য বিভাজনের পরিস্থিতিটা বুঝতে পারা যায়, যে পরিস্থিতি গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই মাথা তুলেছিল। তবে অন্যান্য ইতালিয়ান গোষ্ঠী এবং লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির অংকুরোদ্গম ঘটেছিল, যদিও তা থেকে কোন তাৎপর্যময় মিত্রসংঘ গড়ে ওঠেনি। এইরকম পরিস্থিতিতেই সংঘটিত হয়েছিল রোমুলাসের নামের সঙ্গে যুক্ত সেই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন : টাইবার নদীর তীরে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল একশটা লাতিন গোত্র, আর তার পরে একইভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল স্যাবাইন, লাতিন, এট্রুস্কান এবং অন্যান্য গোত্রগুলো, অর্থাৎ যোগ হয়েছিল আরও দুশোটা গোত্র, আর এই সবকটা গোত্র একাঙ্গীভূত হয়েছিল একটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এভাবেই স্থাপিত হয়েছিল রোম নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর, আর তারই পায়ে পায়ে গড়ে উঠেছিল রোমান শক্তি ও রোমান সভ্যতা। বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীকে একটি একক সরকারের পতাকাতলে সমবেত করার এই যে কাজ শুরু করেছিলেন রোমুলাস এবং যে কাজকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন তাঁর উত্তরসূরীরা, সেই কাজই গড়ে তুলেছিল নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণের পথ—ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শাসন ব্যবস্থা থেকে ভূখণ্ড এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরের পথ।

রোমের তথাকথিত সেই সাতজন রাজা বাস্তব মানুষ নাকি শুধুই পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্র মাত্র, কিম্বা যে-সব বিধি-বিধান প্রবর্তনের সঙ্গে তাঁদের এক একজনকে আলাদা আলাদাভাবে সংযুক্ত করা হয় সেগুলো কাল্পনিক ব্যাপার নাকি প্রকৃত ঘটনা —তার সঙ্গে আমাদের অনুসন্ধানের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা লাতিন সমাজের প্রাচীন বিধি-বিধান সংক্রান্ত তথ্যগুলো রোমান প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আর সেভাবেই সেগুলো পা রেখেছিল ঐতিহাসিক যুগের আঙিনায়। সৌভাগ্য-বশত মানব সমাজের ঘটনাগুলো একটা বস্তুগত নথির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে যার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই এবং এই বস্তুগত নথি পরিস্ফুট হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি ও প্রথার মধ্যে আর রক্ষিত হয় নানান উদ্ভাবন এবং

আবিষ্কারের মধ্যে। প্রয়োজনের খাতিরে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ঘটনা ঘটানোর ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর বিপুল গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এইভাবে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী নীতির জায়গায় স্থাপন করেন ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিদের। সমাজের সামগ্রিক কার্যকলাপ থেকেই সৃষ্টি হয় যাবতীয় প্রগতি। এই প্রগতির অধিকাংশ কৃতিত্বটাই তাঁরা আরোপ করেন বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর, ছোট করে দেখেন সমগ্র জনসাধারণের বুদ্ধিমত্তাকে। মানব ইতিহাসের মর্মবস্তুটা যে বিভিন্ন আইডিয়া বা ধারণার অগ্রগতির সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এইসব আইডিয়া বা ধারণা গড়ে ওঠে ব্যাপক মানুষের মধ্যে থেকেই এবং তা হয়ে ওঠে তাদের নানান প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি, উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের মধ্যে।

আগেই বলা হয়েছে যে রোমানদের প্রতিটা কিউরিয়ায় থাকত দশটা করে গোত্র, প্রতিটা গোষ্ঠীতে থাকত দশটা করে কিউরিয়া আর সমগ্র রোমান জন-সম্প্রদায়ের ছিল মোট তিনটে গোষ্ঠী। এই সংখ্যাগত বিন্যাসটা সৃষ্টি করা হয়েছিল আইনগত ব্যবস্থার সাহায্যে, এবং প্রথম দুটো গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা রোমুলাসের আমলের আগে ঘটেনি। এ-রকম বিন্যাস ঘটানো সম্ভব হয়েছিল সন্নিহিত কিছু গোষ্ঠী থেকে অনেককে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারার ফলে—অনেককে আমন্ত্রণ জানানোর সাহায্যে কিম্বা কোন কোন গোষ্ঠীকে পরাজিত করে। এর ফসল মূলতঃ মূর্ত হয়ে ওঠে পরবর্তীকালে গঠিত টিটিস (Tities) ও লুকেরেস-এর (Luceres) মধ্যে। কিন্তু এ-রকম একটা সংখ্যাসাম্যকে শত শত বছর ধরে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, বিশেষত প্রতিটা কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রগুলোর ব্যাপারে তো নয়ই।

আমরা দেখেছি যে গ্রীক ভ্রাতৃত্বগুলো শাসনতান্ত্রিক ভূমিকা যত না পালন করত, তার চেয়ে অনেক বেশি করে পালন করত ধর্মীয় ও সামাজিক ভূমিকা। এর অবস্থানটা হচ্ছে গোত্র আর গোষ্ঠীর মাঝামাঝি জায়গায় ফলে তার ওপর শাসনগত কিছু দায়-দায়িত্ব দেওয়া না হলে গোত্র আর গোষ্ঠী উভয়ের থেকেই তার গুরুত্ব কম হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। ইরোকোয়াদের মধ্যে এই সংগঠনটা ছিল একেবারেই প্রাথমিক চরিত্রের। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তার শাসনগত চরিত্রের থেকেও বিশিষ্ট ছিল সামাজিক চরিত্রটাই এবং সেটা তার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠত। কিন্তু রোমান কিউরিয়া পূর্ববর্তীকালে তা গ্রীক ভ্রাতৃত্বের তুলনায় অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ ও শাসনতান্ত্রিক কাজে অনেক বেশি করে সংশ্লিষ্ট একটা সংগঠনে পরিণত হয়। তবে এটাও সত্যি যে গ্রীক ভ্রাতৃত্বের তুলনায় রোমান কিউরিয়া সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশি তথ্য হাতে পেয়েছি। সম্ভবত প্রতিটা কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রগুলো ছিল পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধযুক্ত গোত্র, আর একটা উচ্চতর সংগঠনের মধ্যে তাদের পুনর্মিলনটা আরও মজবুত হয়ে উঠত বিবাহসূত্রে, কেননা একই কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রগুলো পরস্পর পরস্পরকে স্ত্রী সরবরাহ করত অর্থাৎ এক গোত্রের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হত অপর কোন গোত্রের ছেলের।

পুরনো আমলের লেখকরা কিউরিয়া সম্বন্ধে কিছু লিখে যান নি। কিন্তু তা থেকে মোটেই প্রমাণিত হয় না যে এই সংগঠনটা রোমুলাসই গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর আইন-সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই আমরা প্রথম একটা রোমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে কিউরিয়ার

উল্লেখ দেখতে পাই, জানতে পারি তাঁর আমলে গড়ে ওঠা দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে ক'টা করে কিউরিয়া ছিল। গ্রীক ভ্রাতৃত্বের মতো রোমান কিউরিয়াও সম্ভবত লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল।

স্যাবাইন গোষ্ঠীর নারীদের মধ্যস্থতায় স্যাবাইন ও লাতিনদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর ঐ-সব নারীদের নানা ব্যাপারে কতটা সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিভি লিখেছেন, সমস্ত মানুষকে মোট তিরিশটা কিউ-রিয়ায় ভাগ করার সময় এই কারণেই রোমুলাস প্রতিটি কিউরিয়ার নামকরণ করে-ছিলেন স্যাবাইন নারীদের নাম অনুসারে।[১] ডায়োনিসায়াস কিউরিয়ার সমতুল্য হিসাবে ভ্রাতৃত্ব শব্দটাই ব্যবহার করলেও, কিউরিয়া শব্দটাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি,[২] আর সেই সঙ্গেই বলেছেন যে রোমুলাস প্রতিটা কিউরিয়াকে দশ ভাগে ভাগ করেছিলেন ; এই দশটা ভাগ যে আসলে দশটা গোত্র, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।[৩] একইভাবে প্লুটার্ক'ও জানিয়েছেন যে, প্রতিটা গোষ্ঠীর মধ্যে থাকত দশটা করে কিউরিয়া, আর অনেকে নাকি বলে এইসব কিউরিয়ার নামকরণ করা হয়েছিল স্যাবাইন নারীদের নাম অনুসারে।[৪] লিভি কিংবা ডায়োনিয়াসের থেকে ভাষার ব্যবহারের ব্যাপারে প্লুটার্ক অনেক যথাযথ হতে পেরেছেন। কারণ তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে থাকত দশটা করে কিউরিয়া, অন্যদের মতো এগুলোকে দশটা ভাগ বলে উল্লেখ করেননি। তাঁর মতটাই সঠিক, কেননা কিউরিয়া প্রাথমিক একক ছিল গোত্রগুলোই আর গোত্রগুলো মোটেই কিউরিয়ার বাইরেকার কোন উপ-বিভাগ ছিল না। রোমুলাস শুধু প্রতিটা কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রের সংখ্যা আর প্রতিটা গোষ্ঠীর মধ্যেকার কিউরিয়ার সংখ্যাকে একটা সুসমঞ্জস বিন্যাসে এনেছিলেন, আর তা করা সম্ভব হয়েছিল সন্নিহিত গোষ্ঠীগুলোর থেকে অনেককে নিজেদের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারার ফলেই। তত্ত্বগতভাবে বললে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এ-রকম—প্রতিটি কিউরিয়া গঠিত হত এক বা একাধিক গোত্র থেকে ভেঙে আসা কয়েকটা গোত্রকে নিয়ে, এবং একাধিক কিউরিয়া গঠিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠত গোষ্ঠী। প্রতিটা কিউরিয়া গড়ে উঠত এমন সব গোত্রের সমন্বয়ে, যারা একই উপ-ভাষার কথা বলত। র‍্যামানেস্‌দের একশটা গোত্রই ছিল লাতিন গোত্র। এক একটা কিউরিয়ায় দশটা করে নিয়ে মোট দশটা কিউরিয়ায় তাদেরকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধের ওপরে যথেষ্টই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন রোমুলাস। কেননা দেখা যায় প্রতিটা কিউরিয়ায় তিনি জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্তগোত্রগুলোকেই যথাসম্ভব রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, তারপর সংখ্যাসাম্যটা ঠিকঠাক রাখার জন্য কোন কোন কিউরিয়ার বাড়তি গোত্রগুলোকে ইচ্ছামতো আলাদা করে নিয়ে সেগুলোকে জুড়ে দিয়েছিলেন অন্য কোন কিউরিয়ার সঙ্গে, তাদের সংখ্যাগত ঘাটতি পূরণের জন্য। টিটিস গোষ্ঠীর একশটা

১। লিভি, i, ১৩.

২। ডায়োনিসায়াস, "অ্যান্টিকুইটিজ অফ রোম," ii, ৭.

৩। ডায়োনিসায়াস, ii, ৭.

৪। প্লুটার্ক, "ভিট রোমুলাস," ২০-শ পরিচ্ছেদ।

গোত্র ছিল মূলত স্যাবাইন গোত্র। এগুলোকেও দশটা কিউরিয়ায় বিন্যস্ত করা হয়েছিল, এবং তা করতে গিয়ে সম্ভবত অনুসরণ করা হয়েছিল একই নীতি। তৃতীয় অর্থাৎ লুকেরেস গোষ্ঠীটা গড়ে উঠেছিল পরবর্তীকালে অন্যান্য গোষ্ঠীকে পরাজিত করা এবং সন্নিহিত গোষ্ঠীগুলো থেকে অনেককে গ্রহণ করার মারফত। এই গোষ্ঠীর গঠনটা ছিল পাঁচমিশেলী ধরনের। যেমন, এই গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে কয়েকটা এট্রুস্কান গোত্রও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এদের দশটা কিউরিয়ায় বিন্যস্ত করা হয়েছিল. প্রতিটা কিউরিয়ায় ছিল দশটা করে গোত্র। পুর্নগঠনের এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক এককস্বরূপ গোত্র অপরিবর্তিত থাকলেও, কিউরিয়াগুলো তাদের স্বাভাবিক স্তরকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাইরের লোকদেরকেও নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে হয়েছিল তাদের—এ ঘটনা কোন যথার্থ ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের ক্ষেত্রে কখনোই দেখা যায় নি। এইসঙ্গেই গোষ্ঠীগুলোও নিজেদের স্বাভাবিক স্তর ছাপিয়ে গিয়েছিল, বাইরের লোকদের গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল তারা। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা অন্য কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়নি। এই আইনগত বাধ্যবাধকতার সাহায্যে কিউরিয়া ও গোত্রসমেত গোষ্ঠীগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে পরস্পরের সমান ও সমকক্ষ করে তোলা হয়েছিল, আর তৃতীয় গোষ্ঠীটা ছিল মূলত পরিস্থিতির চাপে গড়ে ওঠা একটা কৃত্রিম সংগঠন। এট্রুস্কানদের সঙ্গে লাতিনদের ভাষাগত সাদৃশ্যটাও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। অনেকেই মনে করেন যে এট্রুস্কান-দের উপ-ভাষাটা লাতিনদের কাছে পুরোপুরি দুর্বোধ্য ছিল না, কারণ তাহলে তারা সে সময়ে পুরোপুরি গোত্রভিত্তিক রোমান সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না। গোষ্ঠীগুলোর এই সংখ্যাসাম্যটা এইভাবে গোটা সমাজের শাসনগত কার্যকলাপকে সুনিশ্চিত করেছিল, সহজতর করেছিল।

নিয়েবুর, যিনিই প্রথম ঐ যুগের রোমান প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তিনি স্বীকার করেছেন যে তখন মানুষ ছিল স্বাধীন, তথা-কথিত রাজারা ছিলেন অনেকটা প্রতিনিধি স্থানীয় শাসক, ব্যবস্থাপক সভাটা চালানো হতো প্রতিনিধিত্বমূলক নীতির সাহায্যে,প্রতিটা গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি সদস্য নেওয়া হতো ঐ সভায়। আবার তাদের সাংগঠনিক ক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একটা বিসদৃশ মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, "এই সংখ্যাসাম্য থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে রোমান বংশগুলো [গোত্রগুলো] [১] তাদের সংবিধান রচনার আমলের আগে গড়ে নি। নিজের পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোন আইনপ্রণেতা যৌথ সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন এগুলো"।[২] দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গোষ্ঠীর বিশেষত তৃতীয় গোষ্ঠীটার কিউরিয়াগুলোর মধ্যে যে বাইরের লোকদের জোর করে অন্তর্ভুক্ত

১। নিয়েবুর নিজেই গোত্রের বদলে "বংশ" শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন, নাকি এটা অনুবাদকদেরই কীর্তি—তা আমার জানা নেই। তাঁর রচনার অন্যতম অনুবাদক থার্লওয়াল প্রায়শঃই এই বংশ শব্দটা ব্যবহার করেছেন গ্রীক গোত্রগুলোর ক্ষেত্রে। বংশ শব্দটা এখানে প্রযোজ্য হতে পারে না।

২। হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৪৪.

করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু কোন গোত্রের গঠন পরিবর্তিত হয়েছিল বা তাকে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল কিম্বা নতুন কোন গোত্র গঠন করা হয়েছিল— এটা মেনে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আইন-প্রণেতাদের পক্ষে কোন গোত্র গঠন করা সম্ভব ছিল না। সাধারণ ভাবে কোন কিউরিয়া গঠন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবে জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্ত গোত্রগুলোর একটা কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে তাদেরকে জমায়েত করে কোন কিউরিয়া গঠন করতে পারার একটা সম্ভাবনা অবশ্য ছিল। কিন্তু আইন-প্রণেতারা চাপ দিয়ে কোন কিউরিয়ার মধ্যেকার গোত্রের সংখ্যা অথবা গোষ্ঠীর মধ্যেকার কিউরিয়ার সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারত। নিয়েবুর আরও দেখিয়েছেন যে গ্রীক ও রোমানদের ইতিহাসে গোত্র ছিল একটা সুপ্রাচীন ও সর্বত্র বিদ্যমান সংগঠন। এই বক্তব্যটা তার পূর্ববর্তী বক্তব্যকে আরও দুর্বোধ্য করে তোলে। তাছাড়াও নানান নজির থেকে মনে হয় যে অন্তত আইওনিয় গ্রীকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংগঠনটার অস্তিত্ব ছিলই। আর এ থেকেই ধারণা করা যায় যে লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই কিউরিয়া সংগঠনটা হয়ত অন্য কোন নামে একইরকম প্রাচীনকাল থেকেই চালু ছিল। যে সংখ্যাসাম্যের কথাটা আমরা উল্লেখ করেছি, তা রোমুলাসের আমলের আইনগত ব্যবস্থার ফলস্বরূপই সৃষ্টি হয়েছিল। এই সংখ্যাসাম্য সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন গোত্রগুলোকে কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য আমাদের হাতে আছে।

কিউরিয়ার মধ্যে ঐক্যবন্ধ দশটা গোত্রের সদস্যরা পরস্পরকে কিউরিয়েল (curiales) বলে সম্বোধন করত। তারা একজন যাজক বা কিউরিওকে (curio) নির্বাচিত করত, এই যাজকই ছিল তাদের ভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তা। প্রতিটা কিউরিয়ার নিজস্ব কিছু পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান থাকত, যেগুলোতে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করত। স্যাকেলাম (sacellum) ছিল কিউরিয়ার উপাসনা-স্থল, আর এই জমায়েত-স্থলে তারা ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য সমবেত হত। তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপের মুখ্য দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে কাজ করত ঐ যাজকটিই। সেইসঙ্গে কিউরিয়ার সদস্যরা একজন সহকারী যাজক বা ফ্ল্যামেন কিউরিয়ালিসকেও (flamen curialis) নির্বাচিত করত। এই সহকারী যাজকদের হাতে থাকত যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের প্রধান দায়িত্বভার। গোত্র সমূহের পরিষদ অর্থাৎ কামিশিয়া কিউরিয়াটার (comitia curiata) নামকরণ হত কিউরিয়ার নামানুসারেই। রোমে গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থা চালু থাকাকালীন ব্যবস্থাপকসভার চেয়েও বেশি সার্বভৌম ক্ষমতা থাকত এই পরিষদের হাতে। রোমান কিউরিয়া বা ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের চেহারাটা মোটামুটি এ-রকমই ছিল।[১]

১। যে সংগঠন গড়ার কৃতিত্বটা রোমুলাসের ওপর আরোপ করা হয়, তার একটা সুনির্দিষ্ট ও পারিপার্শ্বগত বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছেন ডায়োনিসায়াস, যদিও এই সংগঠনের একটা অংশ পরবর্তী কোন যুগে গড়ে উঠেছিল বলেই মনে হয়। গ্রীকদের গোত্রীয় সংগঠন (যার সম্বন্ধে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল) এবং রোমানদের গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে তিনি যে তুলনা করেছেন, তা খুবই চিত্তাকর্ষক। তিনি বলেছেন, প্রথমত আমি তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিন্যাসের কথা উল্লেখ করতে চাই, যা আমার মতে শান্তির সময় ও যুদ্ধের সময়—উভয় পরিস্থিতিতেই যাবতীয় রাজনৈতিক বিন্যাসের

সাংগঠনিক ক্রম অনুসারে পরবর্তী স্তরটা হচ্ছে রোমান গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর মধ্যে থাকত দশটা কিউরিয়া আর মোট একশটা গোত্র। বাইরের কোন প্রভাব ছাড়া যখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই গড়ে উঠত কোন গোষ্ঠী, তখন তার মধ্যে শুধু সেইসব গোত্রগুলোই থাকত যেগুলো গড়ে উঠেছিল একটা বা একজোড়া আদি গোত্র থেকে বিভাজনের ফলে এবং যার প্রত্যেক সদস্য একই উপ-ভাষাই কথা বলত। আগে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় গোষ্ঠীটা নিজে থেকেই বিভক্ত হয়ে না পড়লে কিন্তু রোমান গোষ্ঠীগুলোকে (এখানে আমরা শুধু এদের নিয়েই আলোচনা করতে চাইছি) বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য এবং বিশেষ উপায়ের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে প্রসারিত করা হয়েছিল, তবে গোষ্ঠীর মূল বনিয়াদ এবং কাঠামোটা গড়ে উঠেছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই।

রোমুলাসের আমলের আগে পর্যন্ত প্রতিটা গোষ্ঠী একজন করে মুখ্য কর্মকর্তা নির্বাচন করত, যার হাতে থাকত বিচারগত, সামরিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ভার।[১] শহরে সে গোষ্ঠীর বিচার সংক্রান্ত কাজগুলো দেখাশোনা করত, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের তদারক করত আর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করত।[২]

মধ্যে সবথেকে যথাযথ। বিন্যাসটা ছিল এ-রকম: সমগ্র জনসংখ্যাকে তিন ভাগে ভাগ করার পর তিনি প্রতিটা বিভাগের জন্য এক একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে নেতা হিসেবে নিয়োগ করেন; অতঃপর এই তিনটে বিভাগের প্রত্যেকটাকে তিনি ভাগ করেন দশটা করে ভাগে, এক একটা ভাগের নেতা হিসেবে নিয়োগ করেন এক একজন সাহসী ব্যক্তিকে, এই দশজন সমান মর্যাদার অধিকারী হত। বড় তিনটে বিভাগকে তিনি গোষ্ঠী নামে চিহ্নিত করেন, আর ছোট ছোট ভাগগুলোর নাম দেন কিউরিয়া—প্রথা অনুযায়ী এগুলোকে আজও এই নামেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। গ্রীক ভাষা অনুসারে এই নামগুলোর অর্থ এ-রকম দাঁড়ায়: গোষ্ঠী বা ট্রাইব শব্দটা আসছে "ট্রাইবাস" (tribus) থেকে, যার অর্থ হল তৃতীয় ভাগ, বা ফাইল (phyle); "কিউরিয়া" অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব, এবং এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে দল; গোষ্ঠীর নেতারা ছিল একই সঙ্গে ফাইলার্ক (phylarchs) বা বিভাগীয় নেতা এবং ট্রিটিয়ার্ক (trittyarchs)। রোমানরা এদেরকে বলত জননেতা (tribunes)। কিউরিয়ার নেতারা ছিল একই সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের নেতা (phratriarchs) এবং লচাগই (lochagoi), যাদেরকে রোমানরা কিউরিয়া-সর্দার (curiones) নামে অভিহিত করত। ভ্রাতৃত্বগুলোকে আবার দশটা করে ভাগে বিভক্ত করা হত, প্রতিটা ভাগের একজন করে নেতা থাকত, যাদেরকে সাধারণ নামে গোষ্ঠী এবং ভ্রাতৃত্বগুলোর বিন্যাস সম্পূর্ণ হওয়ার পর তিনি সমগ্র এলাকাটাকে তিরিশটা সমান ভাগে ভাগ করেন, প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের জন্য বরাদ্দ হয় একটা করে ভাগ, যার মধ্যে একটা পর্যাপ্ত অংশ নির্দিষ্ট করে রাখা হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মন্দিরগুলোর জন্য, এবং সকলকার যৌথ ব্যবহারের জন্যও কিছুটা জমি আলাদা করে রাখা হয়।" "অ্যান্টিকুইটিস অফ রোম," ii, ৭.

১। ডায়োনিসায়াস, ii, ৭.

২। স্মিথ-এর ডিকশনারি, ১ম পরিচ্ছেদ, 'শাসক' অধ্যায়।

সম্ভবত কোন সার্ব্বজনীন জমায়েতে একজোট হয়ে কিউরিয়ার পক্ষ থেকেই তাকে নির্বাচিত করা হত। কিন্তু এ ব্যাপারেও আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য আছে,তা অপ্রতুল। প্রাচীনকালে প্রতিটা লাতিন গোষ্ঠীর মধ্যে এই পদটার অস্তিত্ব ছিলই, এর চরিত্রটা ছিল একটু বিচিত্র ধরণের এবং পদাধিকারীর কার্যকাল ছিল নির্বাচনীভিত্তিক। এই পদটাই ছিল পরবর্তীকালের 'রেক্স' বা প্রধান সমর-নায়ক পদের বীজস্বরূপ, কেননা দেখা যায় এই দুটো পদের কার্যকলাপ ছিল একইরকম। গোষ্ঠী-প্রধানদের ডায়োনিসায়াস চিহ্নিত করেছেন গোষ্ঠীর নেতা হিসাবে।[১] রোমানদের তিনটে গোষ্ঠী যখন একটা ব্যবস্থাপক সভা, একটা গণ-পরিষদ এবং একজন সমর-নায়কের অধীনে একটা জন-সম্প্রদায় হিসাবে একাঙ্গীভূত হয়, তখন গোষ্ঠী-প্রধানের পদটা ম্লান হয়ে যায় এবং তার গুরুত্বও অনেক কমে যায়। তবে বরাবরই এই পদে কোন একজনকে নির্বাচন করার প্রথাটা চালু ছিল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় এই পদটা একসময় কতটা জনপ্রিয় ছিল।

রোমানদের মধ্যে বহু প্রাচীন কাল থেকে একটা গোষ্ঠী-পরিষদের অস্তিত্বও অবশ্যই ছিল। রোম নগরী প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত প্রতিটা ইতালিয় গোষ্ঠী কার্যত স্বাধীনই ছিল, যদিও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কম-বেশি মৈত্রীবন্ধ সম্পর্কও দেখা যেত। স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে এই প্রতিটা প্রাচীন গোষ্ঠীরই নিজস্ব প্রধানদের পরিষদ (যারা নিঃসন্দেহেই গোত্র-প্রধান ছিল), গণ-পরিষদ এবং সমর-নায়ক থাকত। গোষ্ঠী সংগঠনের এই তিনটে উপাদান, অর্থাৎ, পরিষদ, গোষ্ঠী-প্রধান এবং গোষ্ঠীর গণ-পরিষদ—এগুলোর আদলেই পরবর্তীকালে গঠিত হয়েছিল রোমান ব্যবস্থাপক-সভা, রোমান রেক্স এবং কমিশিয়া কিউরিয়াটা। রোম নগরী প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত গোষ্ঠী-প্রধানকে খুব সম্ভবত 'রেক্স' নামেই অভিহিত করা হত। ব্যবস্থাপকসভার সদস্য (senex) এবং কমিশিয়াদের (con-ire) নাম সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এই গোষ্ঠীগুলোর অবস্থা ও গঠন সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু জানা আছে, তা থেকে অনুমান করা চলে যে এগুলো গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্নই ছিল। রোমানদের তিনটে গোষ্ঠী একাঙ্গীভূত হওয়ার পর গোষ্ঠীগুলোর জাতীয় অর্থাৎ নিজস্ব চরিত্রটা মিশে গিয়েছিল ঐ উচ্চতর সংগঠনের মধ্যে। কিন্তু তা সত্বেও তাদের সাংগঠনিক ক্রমের মধ্যে গোষ্ঠী একটা অপরিহার্য স্তর হিসেবেই রয়ে গিয়েছিল।

সমগ্র সংগঠনের চতুর্থ স্তরটা হচ্ছে রোমান জাতি বা জন-সম্প্রদায় যা তিনটে গোষ্ঠীর একাঙ্গীভবনের ফলেই গড়ে উঠেছিল বলে জানা যাচ্ছে। এই সর্বোচ্চ সংগঠনটা মূর্ত উঠত তিনটে বিষয়ের মধ্যে—ব্যবস্থাপক সভা (senatus), গণ-পরিষদ (Comtia curiata) আর সামরিক সর্বাধিনায়ক (rex)। এগুলোর পাশাপাশি থাকত শহুরে শাসক বা বিচারকবর্গ, একটা সেনাবাহিনী এবং নানান পদমর্যাদাবিশিষ্ঠ একদল সার্বজনীন যাজক।[২]

১। ডায়োনিসায়াস, ii, ৭.

২। তিরিশজন কিউরিয়া-সর্দার (curiones) পুরোহিতদের একটা বিদ্যালয়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হত। তাদের মধ্যে একজন লাভ করত "সর্বোচ্চ সর্দার"-এর (curio maximus) পদ। গোত্রগুলোর পরিষদই তাকে নির্বাচন করত। এর পাশাপাশি

একটা শক্তিশালী শহরকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে তোলাটা ছিল একেবারে প্রথম থেকেই তাদের শাসনগত ও সামরিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ধারণা। রোম নগরীর বাইরের সমস্ত এলাকাকে শুধুমাত্র কয়েকটা প্রদেশ হিসেবেই গণ্য করা হত। রোমুলাসের সামরিক গণতন্ত্রের আমলে, প্রজাতন্ত্রের গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মিশ্র সংগঠনের আমলে এবং পরবর্তীকালের সাম্রাজ্যবাদের আমলে, শাসন ব্যবস্থার একটা স্থায়ী কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মাথা তুলেছিল দাঁড়িয়েছিল একটা বিরাট শহর। বিজিত যে-কোন এলাকাকে জুড়ে নেওয়া হত এই শহরের সঙ্গে, তাদেরকে কখনোই শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে ঐ শহরের সমমর্যাদাসম্পন্ন অংশে পরিণত করা হত না। মানবজাতির ইতিহাসে ঠিক এই রোমান সংগঠনের মতো, রোমান রাষ্ট্রশক্তির মতো এবং রোমান জাতির কর্মজীবনের মতো কোন ঘটনা দেখা যায় নি। রোমানদের এই ইতিহাস পৃথিবীর এক শাশ্বত বিস্ময়।

রোমুলাস কর্তৃক সংগঠিত হওয়ার পর নিজেদেরকে তারা রোমান জনসম্প্রদায় (পপুলাস রোমানাস) নামে অভিহিত করত, এবং এই অভিধাটা ছিল অত্যন্ত যথাযথ। আসলে তারা একটা গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থাই গড়ে তুলেছিল। কিন্তু রোমুলাসের আমলে এবং তাঁর আমল আর সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলের মধ্যে তার থেকেও দ্রুততর হারে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে শাসনব্যবস্থার একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো জরুরী হয়ে উঠেছিল। রোমুলাস স্বয়ং আর তার সময়কার প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। গোত্রগুলোর ওপর একটা জাতীয় ও সামরিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ছিল তাঁর সংবিধানে, এজন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী। তিনি উদ্যোগ না নিলে যে সব প্রতিষ্ঠান হয়ত লুপ্তই হয়ে যেত মানুষের স্মৃতি থেকে, সেগুলোর চরিত্র ও কাঠামো সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, সে জন্যও তাঁরই কাছে ঋণ স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিত্তিতে রোমান শক্তির অভ্যুদয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলো যে নানান রোমাঞ্চকর উপাখ্যানে, অতিকথায় অতিরঞ্জিত হয়েছে—তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রোম নগরী গড়ে উঠেছিল একটা সরকারের অধীনে যত বেশি সম্ভব গোত্রকে একটা শহরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা এবং একজন সামরিক সর্বাধিনায়কের নেতৃত্বে তাদের সকলকার সামরিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার এক চমৎকার পরিকল্পনার ফল হিসাবেই, এর মূল কৃতিত্বের দাবীদার রোমুলাস স্বয়ং এবং তাঁর উত্তরসূরীরাও ঐ পরিকল্পনার রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামরিক, অর্থাৎ ইতালির বুকে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করা। আর তার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই সংগঠনটা একটা সামরিক গণতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল।

থাকত শাকুনতত্ত্ববিদদের বিদ্যালয়। অগুল্নিয়ান আইন (৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অনুসারে গড়ে উঠেছিল এই বিদ্যালয়। এতে থাকত মোট নয়জন সদস্য। তাদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচিত করা হত মুখ্য কর্মকর্তা ("magister collegii") হিসেবে। এছাড়া থাকত যাজকদের বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছিল একই আইন অনুসারে এবং নয়জন সদস্য নিয়েই। তাদের মধ্যে একজন লাভ করত "সর্বোচ্চ যাজক"-এর (pontifex maximus) পদ।

টাইবার নদী যেখানে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বেরিয়ে দক্ষিণদিকের সমতল অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, সেই এলাকার একটা চমৎকার জায়গা বাছাই করেন রোমুলাস এবং লাতিনদের একটা গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে (যে গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন তিনিই) অধিকার করেন প্যালাটাইন পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চল। এই অঞ্চলে একটা অতি প্রাচীন নগরদুর্গ ছিল। লোককথা বলে—আলবা-র প্রধানরাই ছিলেন রোমুলাসের পূর্বপুরুষ। তবে এটা খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার মতো বিষয় নয়। একটা বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে—রোমুলাসের জীবনের শেষ দিকে তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৪৬ হাজার পদাতিক আর ১ হাজার অশ্বারোহী সেনা, অর্থাৎ রোমনগরী এবং তার আশেপাশে তাঁর অধীনস্থ এলাকায় মোট লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২ লক্ষ। এই তথ্য সত্য হলে ধরে নিতে হয়, নতুন বসতিটি বেড়ে চলেছিল প্রচণ্ড দ্রুত গতিতে।

লিভি বলেছেন, বিভিন্ন নগরীর প্রতিষ্ঠাতাদের একটা কার্যকরী সাবেক পন্থা (Vetus consilum) ছিল ঐ-সব নগরীর মধ্যে বিভিন্ন জায়গার মানুষদের জড়ো করা এবং তারপর নিজের নিজের বংশধরদের ঐ নগরীর আদিম অধিবাসী হিসেবে দেখিয়ে তাদের নাগরিকত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করা।[১] শোনা যায়, ঐ একই পন্থা অনুসরণ করে প্যালাটাইন পাহাড়ের কাছে একটা আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেছিলেন রোমুলাস এবং চরিত্র বা অবস্থা নির্বিশেষে আশপাশের গোষ্ঠীগুলোর সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে নতুন নগরীর সুযোগসুবিধে ও ভবিতব্যের অংশীদার হতে। লিভি আরও বলেছেন, আশপাশের এলাকা থেকে প্রচুর লোক ঐ জায়গায় এসে জড়ো হয়েছিল, এদের মধ্যে যেমন ক্রীতদাসরাও ছিল আবার স্বাধীন মানুষরাও ছিল, আর এটাই ছিল ঐ নতুন এলাকায় বাইরের লোকদের প্রথম আগমন।[২] প্লুটার্ক[৩] এবং ডায়োনিসায়াসও[৪] এই আশ্রয়স্থল বা কুঞ্জবনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য এবং উল্লিখিত সাফল্যের কথা বিবেচনা করলে মনে হয়—এরকম একটা কিছু সত্য সত্যিই তখন চালু করা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় সে সময় ইতালিতে বর্বরদের সংখ্যাধিক্য, এবং ব্যক্তিগত অধিকারকে ঠিক মতো রক্ষা না করা, ঘরোয়া দাসত্বের অস্তিত্ব আর হিংসার প্রাবল্যের দরুণ তাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছিল। কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে যদি যথেষ্ট সামরিক প্রতিভা থাকে তাহলে এ-রকম অবস্থায় তিনি সমবেত মানুষদের নিয়ন্ত্রন করার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই সেই প্রতিভাকে কাজে লাগাবেন। পাঠককে মনে করিয়ে দিই, রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল স্যাবাইন কুমারীদের ফাঁদে ফেলে ধরে নিয়ে আসার (যে কুমারীরা তখন তাদের বন্দী-কর্তাদের সম্মানীতা স্ত্রী) কারণে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য স্যাবাইনদের

১। লিভি i ৮.

২। Eo ex finitimis populis turba omnis sine discrimine, liber an servus esset, avida novarum rerum perfugit ; idque primum ad cocptum magnitudinem roboris fuit.—লিভি, i, ৮.

৩। ভিট রোমুলাস, ২০ পরিচ্ছেদ।

৪। অ্যান্টিকুইটিস অফ রোম, ii, ১৫.

আকস্মিক আক্রমণ। এর মীমাংসা করা হয়েছিল একটা সুচিন্তিত ব্যবস্থার সাহায্যে—লাতিন ও স্যাবাইনরা একটা সমাজের মধ্যে একাঙ্গীভূত হয়েছিল, কিন্তু উভয়েরই নিজ নিজ আলাদা সেনাপতি ছিল। স্যাবাইনরা বসবাস করতে শুরু করেছিল কুইরিনাল ও ক্যাপিটোলাইন পর্বতাঞ্চলে। একইভাবে এদের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়েছিল দ্বিতীয় গোষ্ঠীটির, অর্থাৎ টিটি গোষ্ঠীর মূল অংশটাও। এদের সেনাপতি ছিল টিটিয়াস ট্যাটিয়াস। তার মৃত্যুর পর রোমুলাসই ঐ গোষ্ঠীর সেনাপত্য গ্রহণ করেন। রোমুলাসের উত্তরসূরি নুমা পম্পিলিয়াস রোমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেকটা উন্নত করে তোলেন। তাঁর উত্তরসূরি টিউলাস হস্টিলিয়াস লাতিন শহর আল্বা অধিকার করেন এবং সেখানকার সমস্ত লোককে স্থানান্তরিত করেন রোম নগরীতে। তারা রোমান নাগরিকদের মতো যাবতীয় সুযোগ-সুবিধে পায় এবং কেলিয়ান পার্বত্যাঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে। লিভি বলেছেন, এই সময় নাগরিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল,[১] তবে তা শুধু ঐ আল্বা শহরের লোকদের আগমনের ফলে হতে পারে না। টিউলাসের উত্তরসূরি আংকাস মার্তিয়াস লাতিন শহর পলিটোরিয়াস অধিকার করেন, এবং চলতি পদ্ধতি অনুযায়ী সেখানকার সমগ্র লোকদের রোমে স্থানান্তরিত করেন।[২] এরা বসবাস করতে শুরু করে আভেন্তাইন পার্বত্যাঞ্চলে এবং একইরকম সুযোগ-সুবিধের অধিকারী হয়। কিছুদিন পর তেলিনি ও ফিকানা-র অধিবাসীরাও পরাজিত হয় এবং রোমে চলে এসে ঐ আভেন্তাইন পর্বতাঞ্চলেরই বাসিন্দা হয়ে ওঠে। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে-সব গোত্রগুলো রোমে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তারা এবং সেই-সঙ্গেই লাতিন ও স্যাবাইন গোত্রগুলোও স্থানীয়ভাবে পরস্পরের থেকে পৃথকই ছিল। বর্বর যুগের মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো যখন নানান নগরদুর্গ ও প্রাচীরবেষ্ঠিত শহরে জমায়েত হচ্ছিল, তখন সর্বত্রই গোত্র ভিত্তিক সমাজের সাধারণ রীতি অনুযায়ী গোত্রগুলো এক একটা এলাকায় নিজের নিজের গোত্র আর আর ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেই জমায়েত হত।[৪] এইভাবেই গোত্রগুলো বসবাস বরত রোমে। বাইরে থেকে এসে যারা সংযোজিত হয়েছিল, তাদের বৃহত্তর অংশটা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল লুকেরেস নামক একটা তৃতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে, যেটা লাতিন গোত্রগুলোর একটা প্রশস্ততর বনিয়াদ রচনা করেছিল। রোমুলাসের পরবর্তী চতুর্থ সামরিক নেতা টার্কুইনিয়াস প্রিস্কাস-এর আমলে এই গোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়। এর অন্তর্গত নতুন গোত্রগুলোর মধ্যে কয়েকটা

১। লিভি, I, ৩০.

২। লিভি, i, ৩৮.

৩। ঐ, i, ৩৩

৪। নিউ মেক্সিকোর যৌথ গৃহগুলোর প্রতিটি বাড়ির বাসিন্দারা একই গোষ্ঠীর সদস্য, আর কোন কোন ক্ষেত্রে একটা যৌথ বাসগৃহেপুরো একটা গোষ্ঠীই বসবাস করে। আগেই বলা হয়েছে, মেক্সিকোর যৌথ গৃহগুলোতে চারটে প্রধান ভাগ থাকত, এক একটায় বাস করত এক একটা বংশ বা সম্ভবত এক একটা ভ্রাতৃত্ব। আবার ট্লাতেলুকাসরা বসবাস করত একটা পাঁচভাগের গৃহে। ট্লাসকালাতেও অবশ্য চারটে ভাগে বাস করত চারটে বংশ বা সম্ভবত চারটে ভ্রাতৃত্ব।

এট্রুস্কান গোত্র।

এইভাবে এবং অন্যান্য কিছু উপায়ে তিনশটা গোত্র রোমে একত্রিত হয়েছিল এবং সেখানে তারা সংগঠিত হয়েছিল বিভিন্ন কিউরিয়া ও গোষ্ঠীতে। এদের পরস্পরের গোষ্ঠীগত বংশধারায় অল্পস্বল্প পার্থক্য ছিল। যেমন র‍্যামনেস্‌রা ছিল লাতিন গোষ্ঠীভুক্ত, টিটিরা ছিল মূলত স্যাবাইন গোষ্ঠীর লোক আর লুকেরেসরা খুব সম্ভবত লাতিন গোষ্ঠীভুক্ত হলেও অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রচুর লোকজন এদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ, গোত্রগুলো একটা কিউরিয়ার অন্তর্গত, কিউরিয়াগুলো একটা গোষ্ঠীর অন্তর্গত আর গোষ্ঠীগুলো একটা গোত্রীয় সমাজের অন্তর্গত—এইরকম একটা কমবেশি জোর করে গড়ে তোলা ব্যবস্থার মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল রোমান জনগন ও তাদের সংগঠন। তবে, একমাত্র শেষ সংগঠনটা বাদে বাকি প্রতিটা সংগঠনেরই একটা নমুনা বা প্রাথমিক রূপ তাদের মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল, যেখানে প্রতিটা কিউরিয়ার অন্তর্গত জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্ত গোত্রগুলোই ছিল তার স্বাভাবিক বনিয়াদ, আর একই বংশভুক্ত প্রতিটা গোষ্ঠীরও স্বাভাবিক বনিয়াদ হিসেবে কাজ করত তার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ গোত্রগুলো। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে নতুন ভাবে, কিউরিয়ার মধ্যে গোত্রের এবং গোষ্ঠীর মধ্যে কিউরিয়ার একটা সংখ্যাগত অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছিল, আর গোষ্ঠীগুলো ঐক্য-বদ্ধ হয়েছিল একটা একক জন-সম্প্রদায় হিসেবে। এটাকে বলা চলে আইনগত বাধ্যবাধকতার সাহায্যে সংগঠিত বিকাশ, কেননা এভাবে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বাইরের লোকেদের মিশ্রণ পুরোপুরিভাবে ঠেকানো যায় নি, আর তাই সৃষ্টি হয়েছিল একটা নতুন নাম—ট্রাইবাস। এই শব্দটার অর্থ হল জনসাধারণের তৃতীয় অংশ। এই শব্দটার সাহায্যেই ঐ নতুন সংগঠনকে চিহ্নিত করা হত। গ্রীক ভাষায়, 'ফাইলন'মানে গোষ্ঠী। কেননা তাদের মধ্যেও একই সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এরকম কোন শব্দ লাতিন ভাষায় থেকে থাকলেও আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঐ নতুন শব্দের উদ্ভাবন থেকে বোঝা যায় রোমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নানা ধরনের লোক থাকত, কিন্তু গ্রীকদের গোষ্ঠীগুলো ছিল একেবারে নিখাদ, নির্দিষ্ট গোত্রের বংশধারার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত লোকেরাই শুধুমাত্র ঠাঁই পেত গোষ্ঠীতে।

লাতিন সমাজের পূর্বতন গঠনকাঠামো সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি মূলত রোমু-লাসের নামে চিহ্নিত আইন থেকেই, কারণ ঐ আইনের মধ্যে লাতিন গোষ্ঠীগুলোর পুরনো গঠনপদ্ধতির কথা বিবৃত হয়েছে, এবং সেই পদ্ধতিকে যতদূর বিচক্ষণতার সঙ্গে উন্নত ও পরিবর্তিত করারও চেষ্টা হয়েছে। পুরনো প্রধানদের পরিষদ হয়ে উঠেছে ব্যবস্থাপক সভা, কিউরিয়াভিত্তিক গণ-পরিষদের বদলে এসেছে কমিশিয়াকিউরিয়াটা। বিচক্ষণতা চোখে পড়ে সার্বজনীন সেনাপতি পদের ক্ষেত্রে এবং নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সাংগঠনিক ক্রমমালার ক্ষেত্রে। এই বিচক্ষণতা আরও বেশি করে দেখা যায় স্বীকৃত সমস্ত অধিকার, সুযোগ সুবিধে ও দায়-দায়িত্ব সহ গোত্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মধ্যে। তাছাড়াও, রোমুলাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর অব্যবহিত উত্তরসূরিদের দ্বারা পরি-মার্জিত সরকার গোত্রীয় সমাজকে তাঁর সর্বোচ্চ কাঠামোগত রূপে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। সারা পৃথিবীর আর কোথাও কোন গোত্রীয় সমাজ কাঠামোগতভাবে অতটা উন্নত হতে পারে নি কোনদিন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে সাভিয়াস

টিউলিয়াস কর্তৃক রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক আগের যুগ।

আইনপ্রণেতা হিসাবে রোমুলাসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে রোমান ব্যবস্থাপক সভা গড়ে তোলা। ঐ সভায় ছিল মোট একশজন সদস্য। প্রতিটি গোত্র থেকে একজন, অর্থাৎ প্রতিটি কিউরিয়া থেকে দশ জন করে সদস্যকে নেওয়া হয়েছিল। সরকারের মুখ্য উপাদান হিসাবে প্রধানদের পরিষদকে প্রতিষ্ঠিত করাটা লাতিন গোষ্ঠীগুলোর কাছে নতুন কিছু ছিল না। স্মরণাতীত কাল থেকেই এই পরিষদের অস্তিত্ব এবং তার কর্তৃত্বে তারা অভ্যস্ত। তবে, সম্ভবত রোমুলাসের আমলের আগে গ্রীকদের প্রধানদের পরিষদের মতো এদের পরিষদেরও পরিবর্তন ঘটেছিল এবং তা পরিনত হয়েছিল একটা বিচার-বিবেচনাকারী সংস্থায়, এর কাজ ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলো নির্ধারণ করে সেগুলো গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যানের জন্য গণ-পরিষদের কাছে পেশ করা। প্রধানদের পরিষদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার আগে জনসাধারণ যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল কার্যত এটা ছিল সেই ক্ষমতারই পূর্ণগ্রহণ। কোন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলো গণ-পরিষদের সম্মতি ছাড়া কার্যকরী করা যেত না। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রধানদের পরিষদ বা সমর-নায়ক নয়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল জনসাধারণই। গণতান্ত্রিক নীতি তাদের সমাজব্যবস্থার কতখানি গভীরে প্রবেশ করেছিল সেটাও বোঝা যায় এ থেকে। রোমুলাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক-সভার কার্যকলাপ বহুলাংশে সেই পূর্বতন প্রধানদের পরিষদের মতো হলেও, বেশ কিছু বিষয়ে এই সভা ঐ পরিষদের থেকে উন্নত ছিল। এটা গড়ে উঠতে গোত্রের প্রধানদের অথবা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে। নিয়েবুর বলেছেন, "ব্যবস্থাপক-সভায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিটি গোত্র তাদের নিজ নিজ ডেকুরিয়নকে (decurion) পাঠাত, যারা ছিল তাদের পৌরমুখ্য।"[১] ফলে, একেবারে সূচনার সময় থেকেই এটা ছিল একটা প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনভিত্তিক সংস্থা, এবং রোমান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার সময় পর্যন্ত নির্বাচনভিত্তিক বা মনোনয়নভিত্তিকই ছিল। সভার সদস্যরা সারা জীবনের জন্য ঐ পদের অধিকারী হত, কেননা কোন পদের অন্য কোনরকম কার্যকাল তখন তাদের জানা ছিল না। ফলে আজীবন সদস্যপদ প্রাপ্তিটা ছিল নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার। লিভির মতে, প্রথম ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের রোমুলাসই মনোনীত করেছিলেন। কথাটা সম্ভবত ঠিক নয় কেননা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো যে তত্ত্ব অনুযায়ী পরিচালিত হত, তার সঙ্গে এই-ভাবে মনোনয়ন করাটা ঠিক খাপ খায় না। লিভি বলেছেন, ব্যবস্থাপক সভার জন্য একশ জন সদস্যকে মনোনীত করেছিলেন রোমুলাস; ঠিক একশজনকে বাছাই করার পিছনে দুটো কারণ থাকতে পারে: হয় একশজনই যথেষ্ট ছিল, অথবা ফাদার হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি একশ জনের বেশি ছিল না। সরকারী পদমর্যাদার জন্যই এদেরকে ফাদার বলা হত, আর এদের বংশধররা পরিচিত হয়েছিল প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত নামে।[২] ব্যবস্থাপক-সভার প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার চরিত্রবিশিষ্ঠ হওয়া, এর সদস্যদের

১। "হিস্ট্রি অফ রোম" ১, ২৫৮.

২। Centum creat senators : siva quia is numerus satis erat, sive soli centum erant, qui creari patres possent patres certd abhonore, patriciique progenies corum appellati—লিভি, i, ৮ এবং সিসেরো : Principes, qui appellati sunt prepter caritatem, patres.—"De Rep,"ii, ৪.

জনগনের ফাদার বা অভিভাবক আখ্যা পাওয়া, আজীবন কাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকার ব্যবস্থা, আর সবার ওপরে তাদের সন্তানদের এবং বংশের সমস্ত উত্তরসূরিদের প্যাট্রিসিয়ানের মর্যাদা লাভ করা—এই সবকিছু থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তাদের সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে পদাধিকারের একটা অভিজাতসুলভ ব্যবস্থা শক্তপোক্ত হয়ে চেপে বসেছিল। নিজের সম্মানজনক কাজ, গঠনকাঠামো এবং তার সদস্যদের ও তাদের বংশধরদের অভিজাত হিসাবে চিহ্নিত হওয়া—এগুলোর দরুণ রোমান ব্যবস্থাপক-সভা পরবর্তী কালের রাষ্ট্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করতে পেরেছিল। গোত্রভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে এই প্রথম রোপিত হল অভিজাততন্ত্রের বীজ। এই অভিজাততান্ত্রিক উপাদানই রোমান প্রজাতন্ত্রকে মিশ্র প্রকৃতির করে তুলেছিল আর তারই অনিবার্য ফল হিসাবে মাথা তুলেছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং পতন ঘটেছিল রোমান জাতির। এই উপাদান রোমের সামরিক গৌরব এবং বিজয় অভিযানকে আরও বাড়িয়েও তুলতে পারত, কেননা একেবারে প্রথম থেকেই রোমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো একটা সামরিক উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তা না করে সে এই মহান ও অতুলনীয় জাতিটির গৌরবের যুগকে সংক্ষিপ্ত করে দিল এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিল—সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবেই যে-কোন সুসভ্যজাতিকে ধ্বংস করে দিতে বাধ্য। আধা-অভিজাততান্ত্রিক আধা-গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের আমলে রোমানরা বিপুল কীর্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু, বিভিন্ন শ্রেণীর অসম সুযোগ-সুবিধে ও নির্মম দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়ে সকলকে সমান স্বাধীনতা ও সমান সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হলে এই কীর্তি আরও মহত্তর হতে পারত আর তার ফসলগুলোও টিকে থাকত আরও দীর্ঘদিন। ব্যবস্থাপক-সভার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠা অভিজাততান্ত্রিক উপাদানকে নির্মূল করা এবং গণতন্ত্রের পুরনো নীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রোমের সাধারণ মানুষ যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়েছিল, মানবজাতির ইতিহাসে তা এক বীরত্বপূর্ণ অধ্যায়।

স্যাবাইনদের সঙ্গে সংযুক্তির পর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে দুশো জন করা হয়। এই অতিরিক্ত একশ জন সদস্য[১] নেওয়া হয় টিটিস্ গোষ্ঠী থেকে। টার্কিনিয়াস প্রিস্কাস এর আমলে যখন লুকেরেসদের গোত্রের সংখ্যা বেড়ে একশয় দাঁড়ায়, তখন এই গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে আরও একশ জন সদস্যকে ব্যবস্থাপক সভায় নেওয়া হয়।[২] লিভির এই বক্তব্যের সঙ্গে কিন্তু সিসেরোর বক্তব্যের মিল নেই। সিসেরো বলেছেন, ব্যবস্থাপক সভার আদি সদস্য সংখ্যাকে দ্বিগুন করে তুলেছিলেন টার্কিনিয়াস প্রিস্কাস।[৩] দুজনের বক্তব্যের এই অমিলের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্মিৎজ্ চমৎকারভাবে বলেছেন, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা শেষ বার বাড়ানোর আগে সদস্যসংখ্যা হয়ত দেড়শয় নেমে এসেছিল, তখন প্রথম দুটো গোষ্ঠী থেকে আরও মোট পঞ্চাশজন সদস্যকে যুক্ত করে সংখ্যাটা দুশোয় নিয়ে যাওয়া হয়, আর তৃতীয় গোষ্ঠীটার থেকে নেওয়া হয় বাকি একশ জনকে। র‍্যাম্‌নেস এবং টিটিস গোষ্ঠী থেকে নেওয়া সদস্যদের এর পর

১। ডায়োনিসায়াস, ii, ৪৭

২। লিভি, i, ৩৫

৩। সিসেরো, „De Rep, ii, ২০.

থেকে বলা হত 'বড় গোত্রগুলোর অভিভাবক' (Patres maiorum gentium), আর লুকেরেস গোষ্ঠী থেকে নেওয়া সদস্যদের বলা হত 'ছোট গোত্রগুলোর অভিভাবক (Patres minorum gentium)।[১] এ থেকে মনে হয়, ব্যবস্থাপক সভার তিনশ জন সদস্য আসলে ছিলেন তিনশটা গোত্রের প্রতিনিধি, অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যেকে এক একটা গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাছাড়া, প্রতিটা গোত্রের যেহেতু একজন করে নিজস্ব মুখ্য-প্রধান (Princeps) থাকত, তাই এটা খুবই সম্ভব যে হয় তাকে তার গোত্রই ঐ পদের জন্য নির্বাচিত করত, অথবা দশটা গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা কিউরিয়ার তরফ থেকেই ঐ দশটা গোত্রের মুখ্য-প্রধানদের নির্বাচিত করত, অথবা দশটা গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা কিউরিয়ার তরফ থেকেই ঐ দশটা গোত্রের মুখ্য প্রধানদের নির্বাচিত করা হত। রোমানদের সম্বন্ধে এবং .গোত্রীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের যা জানা আছে, তার সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচনের এই ব্যবস্থাটা অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ।[২] প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যবস্থাপক-সভার শূন্যস্থানগুলোর অধ্যক্ষরা নিজেদের পছন্দমতো ব্যক্তিদের দিয়ে পূরণ করে নিতেন, এবং একসময় এই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় প্রধান শাসকদ্বয়ের হাতে। সাধারণত উচ্চপদস্থ প্রাক্তন বিচারপতিদের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করা হত এইসব সদস্যদের।

ব্যবস্থাপক সভার হাতে থাকত যথেষ্ঠ পরিমান প্রকৃত ক্ষমতা। যাবতীয় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের সূচনা হত এই সভা থেকেই। তার মধ্যে কিছু কিছু বিষয় এই সভা নিজেই

১। সিসেরো, "De Rep", ২০.

২। নিবুহর ঠিক এই মতই ব্যক্ত করেছিলেন। "আরও এগিয়ে গিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বংশের (গোত্রের) সংখ্যা সম্পূর্ণ হওয়ার পরই তারা ব্যবস্থাপক-সভার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়। ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যসংখ্যা ছিল ঠিক বংশগুলোর সংখ্যার সমান। ঐসভায় তিনশ জন সদস্য ছিল তিনশটি বংশের প্রতিনিধি। এই দুটো সংখ্যা যে সমান সমান ছিল, তা আমরা আগেই যুক্তি সহকারে দেখিয়াছি। প্রতিটা গোত্র তাদের ডেকুরিয়ানদের প্রেরণ করত ব্যবস্থাপক-সভায়। এই ডেকুরিয়নরা ছিল তাদের পৌর-মুখ্য এবং ব্যবস্থাপক-সভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের যে সভাগুলো হত, সেগুলোর সভাপতিব ভূমিকাও পালন করত এরাই......। রাজারা নিজেদের ইচ্ছেমতো ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের নিয়োগ করতেন—এমনটা কখনোই আদি প্রথা হতে পারে না। এমনকি ডায়োনিয়াসও অনুমান করেছেন যে, সভার সদস্যদের নির্বাচন করা হত। তবে এই নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর ধারনাটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, এবং অন্তত প্রথম দিকে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হত তাদের বংশের দ্বারাই, কিউরিয়ার দ্বারা নয়।" —"হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৫৮, প্রধান যদি "পদাধিকার বলে" ঐ পদের অধিকারী না হত, তাহলে কিউরিয়ার দ্বারা নির্বাচনটা নীতিগতভাবে খুবই সম্ভব ছিল, কারণ কোন কিউরিয়ার মধ্যেকার প্রতিটি গোত্রের প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকত। একই কারণে কোন ইরোকোয়া গোত্রের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সাচেমের মনোনয়ন একমাত্র তখনই সম্পূর্ণ হত যখন সেই গোষ্ঠীর অন্যান্য গোত্রগুলোও তার নির্বাচনকে অনুমোদন করত।

কার্যকরী করতে পারত, আবার কিছু কিছু বিষয় কার্যকরী করার আগে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হত গণ-পরিষদের কাছে। জনকল্যানমূলক কাজের তত্ত্বাবধান, অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যবস্থাপনা, কর আদায় এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য অর্থ সংগ্রহ, রাজস্ব ও খরচখরচা নিয়ন্ত্রণ—এইসব কাজের দায়িত্ব থাকত ব্যবস্থাপক সভার হাতেই। ধর্মীয় বিষয়গুলোর পরিচালনভার যাজকদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের হাতে থাকলেও, ধর্মের ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতাও ব্যবস্থাপক সভার হাতেই থাকত। নিজের কার্যকলাপ আর দক্ষতার দরুণ এই সভা গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে সবথেকে প্রভাবশালী সংস্থা হয়ে উঠতে পেরেছিল।

গণ-পরিষদ, যার স্বীকৃত অধিকার ছিল গরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার এবং সেগুলোকে গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার, তার অস্তিত্ব বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে ছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু, বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে এর অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা খুঁজে পেয়েছি। এর অস্তিত্ব ছিল গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর গণ-সমাবেশের মধ্যে এবং সর্বোচ্চ রূপে উন্নীত হয়েছিল এথেনীয়দের লোকসভার মধ্যে। ল্যাতিন গোষ্ঠীগুলোর সৈনিক পরিষদের মধ্যেও দেখি এর ছায়া, যার সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে রোমানদের 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা।' সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গোত্রীয় সমাজের তৃতীয় শক্তি হিসেবে মাথা তোলে গণ-পরিষদ, যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করা এবং মানুষের সম্পত্তি বা অধিকারের ওপর প্রধানদের পরিষদ ও সেনাপতির অবৈধ হস্তক্ষেপ প্রতিহত করা। বন্যতার যুগে গোত্র প্রতিষ্ঠার পর, সোলোন ও রোমুলাসের আমলে—প্রাচীন গোত্রীয় সমাজে সর্বদাই সক্রিয় ছিল জনগণের অধিকারের এই ধারণাটা। প্রথম দিকে প্রধানদের পরিষদের সামনে কথা বলার সুযোগ পেত জনসাধারণের মুখপাত্ররা। জনমত প্রভাবিত করত ঘটনাবলীকে। কিন্তু, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা যখন থেকে গ্রীক ও লাতিন গোত্রগুলোর কথা জানতে পারছি, তখন গণপরিষদ (রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা-সম্পন্ন) ঠিক প্রধানদের পরিষদের মতোই একটা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছে। সোলোনের আমলে এথেন্সে এই পরিষদ যতটা সুব্যবস্থিত হতে পেরেছিল, তার থেকে অনেক বেশি সুব্যবস্থিত হয়ে উঠেছিল রোমে, রোমুলাসের সংবিধান মারফৎ! এই প্রতিষ্ঠানটির অভ্যুদয় ও অগ্রগতির মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতির বিকাশের ধারাও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে!

রোমানরা এই পরিষদের নাম দিয়েছিল 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা,' কারণ গোত্রের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যারা কিউরিয়ার ভিত্তিতে একটা পরিষদে মিলিত হত এবং সেইভাবেই ভোট দিত। প্রতিটা কিউরিয়া একটা করে যৌথ ভোট দিতে পারত, প্রতিটা কিউরিয়ার সংখ্যাগুরুর মতামত নির্ধারিত হত পৃথক পৃথক-ভাবে এবং এইভাবে তারা আগে-থেকেই ঠিক করে নিত কোন প্রস্তাবের পক্ষে না বিপক্ষে ভোট দেওয়া হবে।[১] কেবল মাত্র গোত্র-পরিষদের সদস্যরাই সরকারের সদস্য হতে পারত। প্লিবিয়ান বা সাধারণ মানুষরা আর অভিজাতদের অনুচরেরা, যারা ততদিনে সংখ্যায় বেশ

১। লিভি, i, ৪৩, ডায়োনিসায়াস, ii, ১৪ ; iv, ২০, ৮৪.

ভারিই হয়ে উঠেছিল, তাদেরকে এর মধ্যে নেওয়া হত না, কেন-না গোত্র ও গোষ্ঠীর মারফত ছাড়া 'পপ্‌লাস রোমানাস'-এর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকত না। আগেই বলা হয়েছে যে, এই পরিষদ নিজে থেকে কোন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া কিম্বা তার কাছে পেশ করা কোন প্রস্তাবকে সংশোধন করার অধিকারী ছিল না। কিন্তু, একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেকার কোন প্রস্তাবই 'কমিশিয়া'-র সম্মতি ছাড়া কার্যকরী করা যেত না। যাবতীয় আইনই এই পরিষদ কর্তৃক চালু হত অথবা প্রত্যাহৃত হত। 'রেক্স' সমেত সমস্ত বিচারক ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের এই পরিষদ নির্বাচন করত ব্যবস্থাপক-সভার মনোনয়নের ভিত্তিতে।[১] পরিষদের একটা আইনের সাহায্যে (lex curiata de imperio) এই সব ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হত। কাউকে কোন পদে অধিষ্ঠিত করানোর ব্যাপারে এটাই ছিল রোমানদের পদ্ধতি। নির্বাচন হওয়ার পরেও, এইভাবে ক্ষমতা অর্পিত না হওয়া পর্যন্ত কেউই তার পদের অধিকারী হতে পারত না। কোন রোমান নাগরিকের জীবন-মরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে, আবেদন করা হলে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার অর্পিত হত 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা'-র হাতে। জনগণের একটা সার্বিক আন্দোলনের ফলে 'রেক্স' পদটা অবলুপ্ত হয়। গণপরিষদের হাতে নিজে থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষমতা কখনোই ছিল না সত্যি, কিন্তু তার ক্ষমতাটা ছিল একান্তই বাস্তব এবং যথেষ্ট প্রভাবসম্পন্ন। এই সময়ে রোমান জনগণই সার্বভৌম ছিল।

নিজের অধিবেশন ডাকার কোন অধিকার এই পরিষদের ছিল না। অধিবেশন বসত রেক্স-এর আহ্বানে, তাঁর অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষের (praefectus urbi) আহ্বানে। প্রজাতন্ত্রের আমলে এই অধিবেশন আহ্বানের অধিকারী ছিলেন প্রধান শাসকদ্বয়, তাঁদের অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতিরা। সমস্ত ক্ষেত্রেই এই অধিবেশন যাঁরা আহ্বান করতেন, তাঁরাই হতেন সভার সভাপতি।

রেক্স পদটা সম্বন্ধে আরও কিছু বলার আছে। রেক্স ছিলেন একজন সেনাপতি এবং পুরোহিত কিন্তু কোন কোন লেখক বলেছেন, কোনরকম অসামরিক ক্ষমতা থাকত না

১ নুমা পম্পিলিয়াস (সিসেরো, "De Rep.." ii, ১১, লিভি, i, ১৭), টিউলাস হষ্টিলিয়াস (সিসেরো, "De Rep.," ii, ১৭,) এবং আঙ্কাস মার্তিয়াস (সিসেরো, "DeRep," ii, ১৮, লিভি, i, ৩২)—এই তিনজনকে নির্বাচিত করেছিল "কমিশিয়া কিউরিয়াটা।" লিভি বলেছেন, ব্যাপক সংখ্যক মানুষের যৌথ সম্মতিই টার্কিনিয়াস প্রিস্কাসকে "রেক্স" পদে নির্বাচিত করেছিল (i, ৩৫)। অর্থাৎ, 'কমিশিয়া কিউরিয়াটা"-র দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রিস্কাস। সার্ভিয়াস টিউলিয়াস যে পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই পদটা অনুমোদিত হত "কমিশিয়া"-র দ্বারাই (সিসেরো, "De Rep., ii, ২১)। এইভাবে, জনগনের হাতেই কাউকে নির্বাচন করা না-করার অধিকার অর্পিত হওয়া থেকে বোঝা যায় "রেক্স" পদটা তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল, এবং যে ক্ষমতার সে অধিকারী হত, সেটা জনসাধারণই তার হাতে অর্পণ করত।

রেক্স-এর হাতে। [১] সেনাপতি হিসেবে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং নগরে সেনাবাহিনীর ওপর তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকত বলে ধরে নেওয়া যায় (ঠিক কতটা ক্ষমতা থাকত তাঁর হাতে, জানা যায় নি)। বিশেষ বিশেষ কিছু ঘটনায় কিছু অসামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তাঁর থাকত বলে ধরে নিলে এটাও মেনে নিতে হয় যে ঐ অধিকার শুধু এক একটা নির্দিষ্ট ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। রেক্স বলতে অনেকে রাজাই বোঝেন। কিন্তু তাঁকে রাজা বলে ঘোষণা করার অর্থ হল, যে জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের তিনি অংশীদার ছিলেন এবং যে-সব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ঐ সরকার—তাকে খাটো করা ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হাজির করা। যে ধরণের সরকারের মধ্যে রেক্স এবং ব্যাসিলিয়ুস পদের উদ্ভব ঘটেছিল, তা গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, এবং গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর ঐ ধরণের সরকারও আর টিকে থাকতে পারে নি। এ এক বিচিত্র সংগঠন, যার সমতুল কোন সংগঠন আধুনিক সমাজে নেই। রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য উদ্ভাবিত কোন অভিধার সাহায্যে এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যবস্থাপক-সভার নিয়ন্ত্রণাধীন একটা সামরিক গণতন্ত্র, একটা গণ-পরিষদ, আর তাদের দ্বারা মনোনীত ও নির্বাচিত একজন সেনাপতি—এটাই হচ্ছে ঐ বিচিত্র সরকারের মোটামুটি রূপরেখা। এ সরকার পুরোপুরিভাবেই প্রাচীন সমাজের নিজস্ব জিনিস, এবং মূলত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বনিয়াদের ওপরেই গড়ে উঠতে পেরেছিল এ সরকার। খুব সম্ভবত নিজের বিরাট সাফল্যের বলে বলীয়ান হয়েই ক্ষমতা দখল করেছিলেন রোমুলাস। ব্যবস্থাপক-সভা এবং জনসাধারণ কিন্তু এই ঘটনায় বিপদের ছায়া দেখেছিল। শোনা যায়, রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন রোমুলাস, কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি তাঁর। আমাদের অনুমান, রোমান প্রধানরা তাঁকে হত্যা করেছিলেন। নৃশংস কাজ, সন্দেহ নেই। তবে, এর মধ্যে কিন্তু গোত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেই স্বাধীনতার আকাঙ্খাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। কোন ব্যক্তিবিশেষের যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগ বরদাস্ত করতে অভ্যস্ত ছিল না তারা। ঐ পদটা যখন বিলুপ্ত হয় এবং তার বদলে সৃষ্টি করা হয় শাসকের পদ, তখন কিন্তু একজনকে নয়, দুজনকে শাসক পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নেয় তারা। ব্যাপারটা মোটেই বিস্ময়করকর কিছু নয়। শাসকের ক্ষমতা হাতে পেয়ে একজন মানুষ যথেচ্ছাচারী

১। গ্রীক এবং রোমানদের রাজতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম দৃঢ় সমর্থক মিস্টার লিওনার্দ শ্মিৎজ অকপটে বলেছেন: রাজারা ঠিক কতটা ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তা বলা মুস্কিল। কেননা, প্রাচীন কালের লেখকরা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের নিজেদের যুগের প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের আলোয় বিচার করেছেন রাজতন্ত্রের আমলকে। ফলে, যে-সব ক্ষমতা ও কার্যকলাপ কেবলমাত্র তাঁদের যুগের প্রধান শাসকদ্বয়, ব্যবস্থাপক-সভা আর 'কমিশিয়া' সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, সেগুলোকেই তাঁরা প্রায়শই আরোপ করেছেন রাজতন্ত্রের আমলের রাজা, ব্যবস্থাপক-সভা আর 'কিউরিয়ার কমিশিয়া'-র ওপর।—স্মিথ-এর ডিকশনারী অফ গ্রীক অ্যাণ্ড রোমান অ্যান্টিকুইটি। প্রবন্ধ—রেক্স থেকে উদ্ধৃত।

হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু দুজন হলে সে বিপদটা কম থাকে। এ ধরণের কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও, মিত্রসঙ্গের জন্য দুজন সমর-নায়কের পদ সৃষ্টি করে ইরোকোয়ারাও একই রকম বিবেচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছিল। কেন না, সর্বাধিনায়কের পদটা কোন একজন ব্যক্তিবিশেষের ওপর অর্পিত হলে সে অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারত। প্রধান পুরোহিত হিসেবে যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রারম্ভে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করার অধিকারী ছিলেন রেক্সই। রোমানদের ধর্মীয় ব্যবস্থায় এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারটা ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। নগরে তো বটেই, এমনকি যে-কোন যুদ্ধের আগে যুদ্ধক্ষেত্রে বসে গণনা করতেন রেক্স। এই গণনাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করত তারা। অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও পৌরহিত্য করতেন রেক্স। এটা মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে গ্রীকদের মতো রোমানদের মধ্যেও সর্বোচ্চ সামরিক পদের অধিকারীরাই পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করত। রেক্সের পদ বিলুপ্ত হওয়ার পর তাঁর ধর্মীয় কাজগুলো অন্য কারুর হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সৃষ্টি করা হয় 'রেক্স স্যাক্রিফিকুলাস, বা 'রেক্স স্যাক্রোরাম'-এর পদ। এই পদের অধিকারীই পালন করতেন উদ্দিষ্ট ধর্মীয় কাজগুলো। এথেনীয়দের নয়জন আর্কনের মধ্যে দ্বিতীয় জনও (যাঁকে বলা হত 'আর্কন ব্যাসিলিয়ুস') এই একই দায়িত্ব পালন করতেন, ধর্মীয় বিষয়গুলোর তদারকির ভার থাকত তাঁরই হাতে। রোমান ও গ্রীকদের ক্ষেত্রে রেক্স আর ব্যাসিলিয়ুস পদের সঙ্গে এবং আজটেকদের ক্ষেত্রে 'টিউক্‌টলি পদের সঙ্গে ধর্মীয় কাজগুলো কেন সংযুক্ত থাকত, আর রোমান ও গ্রীকদের ক্ষেত্রে ঐ পদদুটো বিলুপ্ত হওয়ার পর সাধারণ পুরোহিতরা কেন তাদের কাজগুলো করে উঠতে পারত না— তা অবশ্য জানা যায় নি।

রোমুলাসের আমল থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমল পর্যন্ত দুশ বছরেরও বেশি সময়ে রোমের গোত্রভিত্তিক সমাজের ছবিটা এ-রকমই ছিল। এই সময়-টুকুর মধ্যেই গড়ে উঠেছিল রোমান শক্তির বনিয়াদ। আগেই বলা হয়েছে, সরকারের মধ্যে থাকত তিনটে শক্তি-ব্যবস্থাপক-সভা, গণ-পরিষদ আর সেনাপতি। বিভিন্ন রীতি আর প্রথার বদলে নিজেরাই একটা সুনির্দিষ্ট লিখিত নিয়ম কানুন চালু করার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেছিল। রেক্স-এর পদটার মধ্যেই সুপ্ত ছিল মুখ্য কার্যনির্বাহী বিচারক পদের ভ্রূণ। তীব্র প্রয়োজন থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই পদটা সৃষ্টি করার তাগিদ। রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর এই পদটা আরও পূর্ণাঙ্গ চেহারা নিয়েছিল। কিন্তু সেই যুগে সরকার সংক্রান্ত উন্নততর ধারণার সঙ্গে তারা খুব একটা পরিচিত ছিল না। ফলে এই পদটা তাদের চোখে একটা বিপজ্জনক পদ হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছিল, কেননা রেক্স-এর ক্ষমতায় ঠিক কোন সীমা নির্দিষ্ট করা ছিল না, আর তা করা মুশ্কিলও ছিল। এটা মোটেই বিস্ময়কর নয় যে জনসাধারণের সঙ্গে টার্কিনিয়াস সুপারবাস্-এর তীব্র বিরোধ বাধার পর জনসাধারণ তাকে বরখাস্ত করে এবং পদটা বিলুপ্ত করে দেয়। কোন রাজার দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের মতো যে-কোন ঘটনাই তাদের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করত, বাধত সংঘাত, এবং জয়ী হত স্বাধীনতাই। তবে, সরকারী কাঠামোর মধ্যে অল্প কয়েকজন কার্য নির্বাহক নিয়োগ করতে তাদের আপত্তি ছিল না, তাই সৃষ্টি করা দুজন শাসকের পদ। এ ঘটনা ঘটেছিল

রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর।

ভূখণ্ড এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সার্ভিয়াস টিউলিয়সের আমলের আগে পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। কিন্তু তার আগেকার ঐ-সব ঘটনাগুলো ছিল এ-রকম একটা রাষ্ট্র গড়ারই প্রস্তুতি। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও তারা সৃষ্টি করেছিল নগর শাসকের পদ এবং অশ্বারোহী বাহিনী সমেত একটা পূর্ণাঙ্গ সামরিক ব্যবস্থা। সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলে পুরোপুরি গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক রোম পরিণত হয়েছিল ইতালির শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে।

নতুন যে-সব শাসকপদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নগর শাসকের (custos urbis) পদটা ডায়োনিসায়াস বলেছেন, প্রথম নগর শাসককে নিযুক্ত করেছিলেন রোমুলাস স্বয়ং।[১] ব্যবস্থাপক সভার প্রধানকেই (p:inceps senatus) নিযুক্ত করা হত এই পদে। নিজের সভা ডাকার অধিকার ব্যবস্থাপক-সভার ছিল না। সভার অধিবেশন আহ্বান করতেন ঐ প্রধান বা নগর শাসক। আরও জানা যায় যে ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশন ডাকার অধিকার রেক্স-এরও ছিল। ধরে নেওয়া যায়, রেক্স-এর অনুরোধে এবং সভার নিজস্ব প্রধানদের আহ্বানে অধিবেশন বসত ব্যবস্থাপক-সভার। কিন্তু ঐ সভার কার্যকলাপের স্বাধীনতা, তার নিজস্ব মর্যাদা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের দিক থেকে বিচার করলে স্পষ্টই বোঝা যায়—নিজের হুকুমে সভার অধিবেশন ডাকার অধিকার রেক্স-এর ছিল না। দশজন সভ্যবিশিষ্ট আইনসভার (Decemvirs) আমলের পর পদটার নামকরণ করা হয় নগরাধ্যক্ষ (proefectus-urbi)। পদাধিকারীর ক্ষমতাও বাড়ানো হয় এবং তাকে নির্বাচন করার দায়িত্ব অর্পিত হয় নতুন 'কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটা'-র ওপর। প্রজাতন্ত্রের আমলে ব্যবস্থাপক সভার এবং কমিশিয়ার অধিবেশন ডাকার ক্ষমতা ছিল শাসকদ্বয়ের হাতে, এবং তাঁদের অনুপস্থিতিতে, বিচারপতির হাতে। পরবর্তীকালে এই গ্রামীন পদটির কার্যকলাপ বিচারপতিদের হাতেই বর্তায় এবং তারাই এর উত্তরসূরী হয়ে ওঠে। রোমানদের এই বিচারপতিরা (praetor) আইনসংক্রান্ত বিচারকের ভূমিকা পালন করত। এই পদটাই হচ্ছে আজকের দিনের বিচারক পদের আদিরূপ। এইভাবে সরকার বা সামাজিক প্রশাসনের প্রতিটি অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠানেরই একটা সাদামাটা ভ্রূণরূপ খুঁজে পাওয়া যায় অতীতের কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, যেগুলো গড়ে উঠেছিল মানুষের প্রয়োজনের খাতিরেই, গড়ে উঠেছিল নিতান্তই অমার্জিত রূপে। এদের মধ্যে যেগুলো সময় ও অভিজ্ঞতার ঝড়-ঝাপটা সামলে টিকে থাকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, সেগুলো এক একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজের বুকে।

রোমুলাসের আমলের আগে প্রধানপদের স্থায়িত্বকাল কেমন ছিল আর প্রধানদের পরিষদের কার্যকলাপই বা কী কী ছিল জানা গেলে রোমুলাসের সময়কার রোমান গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা যেত। তাছাড়া, বিভিন্ন যুগ সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবেই অনুসন্ধান চালানো দরকার, কেননা বুদ্ধিমত্তার

১। ডায়োনিসায়াস, ii, ১২

উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছিলো তাদের সামাজিক অবস্থাও। রোমুলাসের আমলের আগেকার ইতালি, সাতজন নৃপতির (reges) আমলের ইতালি, এবং পরবর্তীকালের প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের আমলের ইতালি—এই সব যুগের সরকারের চরিত্র ও ধারণার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। কিন্তু প্রথম যুগের প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বিতীয় যুগেও টিকে ছিল, সেখান থেকে এসেছিল তৃতীয় যুগে, এবং কিছু পরিবর্তন সমেত বিদ্যমান ছিল চতুর্থ যুগেও। এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, বিকাশ আর পতনের মধ্যেই বিবৃত আছে রোমান জনগণের আমল ইতিহাস। মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে এইসব প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে বিকাশের প্রতিটি স্তরে এগুলোর অস্তিত্ব খুঁজতে খুঁজতে এগোলে আমরা মানুষের চিন্তাশক্তির বিবর্তনের একটা স্পষ্ট ছবি হাতে পাব। দেখতে পাব কিভাবে মানুষের চিন্তাশক্তি তার বন্যদশার শৈশবকাল থেকে বিকাশিত হতে হতে এসে পেঁছেছে আজকের এই অত্যুন্নত অবস্থায়। সমাজ-সংগঠনের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয়তা থেকেই গড়ে উঠেছিল গোত্র। গোত্র থেকে সৃষ্টি হল তার প্রধান, এবং প্রধানদের পরিষদবিশিষ্ট গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর বিভাজন থেকে গড়ে উঠল বিভিন্ন গোষ্ঠী, তারা আবার একত্রিত হল মিত্রসংঘে, এবং শেষপর্যন্ত সকলে একটা জাতি হিসেবে একাঙ্গীভূত হল। প্রধানদের পরিষদের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিল গণ-পরিষদ। শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে দুটো পরিষদের মধ্যে একটা ক্ষমতা-বিভাজন করা হল। অবশেষে, সম্মিলিত গোষ্ঠীগুলোর সামরিক প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হল একজন সামরিক সর্বাধিনায়কের পদ। কালক্রমে এই সর্বাধিনায়ক সরকারের তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয়, তবে তাকে প্রথম দুটো শক্তির অধীনেই কাজ করতে হত। এটা ছিল পরবর্তীকালের প্রধান বিচারক, রাজা ও রাষ্ট্রপতি পদেরই ভ্রূণরূপ। যে-সব প্রতিষ্ঠানের অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল বন্যতার যুগে এবং যেগুলো বিস্তৃত হয়েছিল বর্বর দশায়, সেগুলোর ধারাবাহিকতা হচ্ছে আজকের বিভিন্ন সুসভ্য জাতির প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ।

রোমুলাসের মৃত্যুর পরবর্তী রোমান সরকারের চরিত্রটা ছিল সামাজিক, রাজনৈতিক নয়। সরকারটা ছিল ব্যক্তিভিত্তিক, এলাকাভিত্তিক নয়। তিনটে গোষ্ঠী যে রোম নগরীর চতুঃসীমার মধ্যেই পৃথক পৃথক অঞ্চলে বসবাস করত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের আমলে এটাই ছিল বসবাসের চালু পদ্ধতি। গোত্র, কিউরিয়া এবং গোষ্ঠী হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে আর গোটা সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা ছিল একেবারেই ব্যক্তিভিত্তিক। সরকার তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত এক এক দল ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের মতো করে এবং এই সমগ্র সমাজটাকে সরকার দেখত রোমান জনগণ হিসেবে। এইভাবে তারা স্থিতু হয়েছিল এক একটা ঘেরা অঞ্চলে। ফলে, নানান বিষয়ের জটিলতা বৃদ্ধির দরুন যখন শাসন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটানোটা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল, তখন একটা শহর বা নগর গড়ে তোলার ধারণাটা আপনা থেকেই উদয় হয়েছিল তাদের চিন্তায়। এ এক বিরাট পরিবর্তন, যা গড়ে তুলতে হয়েছিল পরীক্ষামূলক আইন প্রণয়নের সাহায্যে। সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলের অল্প কিছুদিন আগে এথেনীয়রা পা বাড়িয়েছিল এই পথে। প্রতিষ্ঠিত হল রোম, আর তার প্রথম সাফল্যগুলো অর্জিত হল পুরোপুরি গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের।

আওতাতেই। কিন্তু, এইসব সাফল্যের মাত্রাই বুঝিয়ে দিয়েছিল—একটা ভূখণ্ড ও সম্পত্তির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার দ্বিতীয় রূপের প্রতিষ্ঠানসমূহের পথ প্রশস্ত করার জন্য দরকার হয়েছিল দুশ বছরের নিবিড় সম্মিলিত প্রচেষ্টা। গোত্র, কিউরিয়া আর গোষ্ঠীর হাত থেকে শাসনক্ষমতা নতুন নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে তুলে দেওয়াটাই ছিল আশু কর্তব্য। এ পরিবর্তন ঘটানোর জন্য দরকার ছিল এক দৃঢ় প্রত্যয়—বিকশিত পরিস্থিতির উপযোগী কোন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতা গোত্রের নেই। সঠিক অর্থে প্রশ্নটা ছিল এ-রকম—বর্বরতার যুগেই থেকে যাব আমরা, নাকি এগিয়ে চলব সভ্যতার পথে? পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই নতুন ব্যবস্থার সূত্রপাত নিয়েই আলোচনা করব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রোমান রাজনৈতিক সমাজের প্রতিষ্ঠা

রোমের সামরিক গণতন্ত্রের ষষ্ঠ প্রধান সার্ভিয়াস টির্উলিয়াস খুব সম্ভবত রোমুলাসের মৃত্যুর একশ তেত্রিশ বছর পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[১] অর্থাৎ তিনি ক্ষমতায় আসেন ৫৭৬—খিৃস্টপূর্বাব্দ নাগাদ। রোমের বুকে রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার মূল কৃতিত্বের দাবীদার এই সার্ভিয়াস টির্উলিয়াসই। এখানে আমরা ঐ সমাজব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এবং ঐ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কয়েকটা কারণ উল্লেখ করবার চেষ্টা করব।

রোমুলাসের আমল থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টির্উলিয়াসের আমল পর্যন্ত রোমানদের মধ্যে দুটো শ্রেণী দেখা যেত—'পপুলাস' আর 'প্লিবিয়াস'। দুটো শ্রেণীই সাধারণ-ভাবে স্বাধীন ছিল এবং দুজনরাই ফৌজে যোগ দিতে পারত। কিন্তু প্রথমোক্তরা ছিল গোত্র, কিউরিয়া ও গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সংগঠিত এবং শাসনক্ষমতাও থাকত এদেরই হাতে। অন্যদিকে, প্লিবিয়ানরা কোন গোত্র, কিউরিয়া বা গোষ্ঠীর সদস্য ছিল না, ফলে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করার অধিকারও থাকত না তাদের।[২] তারা কোন পদের অধিকারী হতে পারত না, কমিশিয়া কিউরিয়াটায় নেওয়া হত না তাদের; এবং গোত্রের কোন পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকারও তাদের ছিল না। সার্ভিয়াস টির্উলিয়াসের আমলে এরা সংখ্যায় 'আদি পপুলাস' শ্রেণীর প্রায় সমানই হয়ে উঠেছিল। একটা বিচিত্র অবস্থায় বসবাস করত এরা। সামরিক কাজকর্মে থাকতে হত এদের, নিজেদের পরিবার থাকত, সম্পত্তির অধিকারও ছিল: এগুলোর সুবাদে রোমের সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে এরা ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত হয়ে পড়েছিল। অথচ, শাসনব্যবস্থা বা সরকারের সঙ্গে এরা কোনভাবেই যুক্ত ছিল না আমরা আগেই দেখেছি, গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতায় কোন স্বীকৃত গোত্রের মধ্যস্থতা ছাড়া সরকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা অসম্ভব ছিল, এবং এই প্লিবিয়ানদের কোন গোত্র ছিল না। জনসংখ্যার একটা বড় অংশের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এই অবস্থাটা সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্ট বিপদজনক ছিল। গোত্রীয় সমাজে এ সমস্যার কোন সমাধান

১। ডায়োনিসিয়াস, iv, ১

২। নিয়েবুর বলেছেন "সমগ্র জাতির একটা স্বাধীন এবং সংখ্যায় বেশ ভারী অংশ হিসেবে প্লিবিয়ানদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় সেই আঙ্কাস-এর আমল থেকেই। কিন্তু সার্ভিয়াসের আমলের আগে পর্যন্ত এরা কোন ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী হয়ে উঠতে পারে নি, নেহাতই কিছু বিচ্ছিন্ন অংশের সমষ্টি হয়েই ছিল।—"হিস্ট্রি অফ রোম", পরিচ্ছেদ ১, ২, ৩১৫

ছিল না। তাই বলা যায়, যে-সব কারণের জন্য গোত্রীয় সমাজের বদলে রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল—এটা তার অন্যতম। এ সমস্যার সমাধান করা না গেলে রোমানদের গোটা সামাজিক কাঠামোটাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারত। নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন রোমুলাস, তা পুনরারম্ভ করেছিলেন নুমা পম্পিলিয়াস এবং সম্পূর্ণ করেছিলেন সার্ভিয়াস টিউলিয়াস।

প্লিবিয়ান ও প্যাট্রিসিয়ানদের উদ্ভব এবং পরবর্তীকালে তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে, এইসব প্রশ্ন নিয়ে কয়েকটা কথা এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে একটা কিউরিয়া ও একটা গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কোন-না-কোন গোত্রের সদস্য যারা ছিল না, তারাই ছিল প্লিবিয়ান। রোম নগরী প্রতিষ্ঠার আগে ও এক অস্থির যুগের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল রোমানদের। সেই অস্থির যুগে বহু সংখ্যক মানুষ কেন তাদের নিজ নিজ গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, বোঝা খুব একটা কঠিন নয়। আশপাশের গোষ্ঠীগুলো থেকে যে-সব লোক রোমে চলে এসেছিল, যে-সব যুদ্ধবন্দী পরে মুক্তি পেয়েছিল আর রোমে চলে আসা গোত্রগুলোর সঙ্গে কোনভাবে সম্পর্কযুক্ত না হয়েও সেগুলোর সঙ্গে মিশে ছিল যারা—এদের সকলের মিলনের ফলে অতি দ্রুত প্লিবিয়ান শ্রেণীর গড়ে ওঠা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। প্রতিটা গোষ্ঠীর মধ্যে একদশটা করে গোত্র রাখার জন্য কিছু গোত্রের ছোট-খাট অংশকে, আর যে-সব গোত্রের জনসংখ্যা একটা নির্দিস্ট সংখ্যার থেকে কম ছিল—যেগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে। এর ফলে কোন গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু লোক আর কোন কিউরিয়ার মধ্যে থাকার অধিকারহীন কিছু গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল। এরা এবং এদের সন্তানসন্ততি ও বংশধররা দ্রুতই পরিণত হয়েছিল একটা জনবহুল শ্রেণীতে। এর শ্রেণীটাই হচ্ছে রোমান প্লিবিয়ান শ্রেণী যারা রোমের গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার সদস্য ছিল না। রোমানদের তৃতীয় স্বীকৃত গোষ্ঠী লকেরেশদের মধ্যে যারা ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য ছিল, তাদেরকে বলাহত "ছোট গোত্রগলোর অভিভাবক।" এ থেকে অনুমান করা যায় যে আদি গোত্রগুলো এদেরকে নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ বলে মেনে নিতে ঠিক রাজি ছিল না। আরও গুরুতর কারণে তারা শাসনকার্যে প্লিবিয়ানদের কোনভাবেই অংশগ্রহণ করতে দিত না।

তৃতীয় গোষ্ঠীটাতেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোত্র সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এদের মধ্যে কারুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, আর প্লিবিয়ান শ্রেণীর লোকসংখ্যা আরও দ্রুত হারে বেড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নিয়েবুর বলেছেন, আংকাস-এর আমলেও এই প্লিবিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে ঐ সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল এই শ্রেণীটি।[১] বিভিন্ন ধরনের অনুচররাও যে প্লিবিয়ান শ্রেণীর

১। "হিস্ট্রী অফ রোম", i, ৩১৫.

অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা তিনি অস্বীকার করেছেন।[1] এই দুটি বিষয়েই তাঁর বক্তব্য ডায়োনিসায়াস[2] এবং প্লুটার্কের[3] বক্তব্যের থেকে আলাদা। পৃষ্ঠপোষক এবং অনুচরদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বটা ডায়োনিসায়াস ও প্লুটার্ক অর্পণ করেছেন রোমুলাসের ওপর, এবং সিউটোনিয়াসও স্বীকার করেছেন যে রোমুলাসের সময় এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল।[4] তখন তাদের মধ্যে এমন একটা শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল, যাদের কোন গোত্রীয় মর্যাদা ছিল না, কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের অধিকারও ছিল না। এই শ্রেণীটির জন্য এ-রকম একটা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ছিলই। নিজেদের রক্ষা করা আর নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এবং ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার জন্য এই শ্রেণীর সদস্যরা ঐ সম্পর্ককে কাজে লাগাত। এই ধরণের রক্ষাব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধে ছাড়া গোত্রের সদস্যরা টিকতে পারত না। গোত্রের কোন সদস্য অন্য গোত্রের কাউকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করলে সেটা ঐ প্রথমোক্ত গোত্রের পক্ষে সম্মানজনকও হত না আর গোত্রের দায়দায়িত্বের সঙ্গে সেটা সঙ্গতিপূর্ণও হত না। একমাত্র ঐ গোত্রহীন শ্রেণী বা প্লিবিয়ান শ্রেণীটির সদস্যরাই নিজেদের জন্য অভিভাবক খুঁজে বেড়াত এবং তাদের অনুচর বা পোষ্যে পরিণত হত। আগেই উল্লিখিত বিভিন্ন কারণের দরুণ এইসব অনুচররা পপুলাস বা জনসম্প্রদায়ের কোন অংশ হিসাবে বিবেচিত হত না। রোমানদের সম্পর্কে নিয়েবুরের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটা মেনে নিতেই হবে যে ঐ-সব অনুচররা ছিল প্লিবিয়ান শ্রেণীরই অংশ।

পরের প্রশ্নটা অত্যন্ত দুরূহ। প্রশ্নটা প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিস্তৃতি সংক্রান্ত। এই শ্রেণীটি কি রোমান ব্যবস্থাপক-সভার প্রতিষ্ঠার সময়ই সৃষ্টি হয়েছিল এবং শুধু ঐ ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য, তাদের সন্তানসন্ততি আর বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি প্লিবিয়ানরা বাদে সমগ্র জনসম্প্রদায়ই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল? অধিকাংশ আধুনিক লেখকই বলে থাকেন যে সমগ্র জনসম্প্রদায়ই ছিল প্যাট্রিসিয়ান। রোমানদের ব্যাপারে সবথেকে গভীর বক্তব্য রাখতে পেরেছেন নিয়েবুরই। সমগ্র জনসম্প্রদায়ই যে প্যাট্রিশিয়ান ছিল, এই কথাটা তিনিই বলেন,[5] এবং লং, শমিৎজ্ ও অন্যান্যরা তা সমর্থন করেন।[6] প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্ব রোমুলাসের

১। "বিভিন্ন ধরনের অনুচররা যে প্লিবিয়ান জনসাধারণের অংশ ছিল না, অনেক পরবর্তীকালে, যখন ক্রীতদাসত্বের বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছিল অংশত তাদের প্রভুদের ক্ষয়িষ্ণুতার দরুণ আর অংশত স্বাধীনতার দিকে সমগ্র জাতির অগ্রগতির দরুণ, একমাত্র তখনই যে তারা প্লিবিয়ান শ্রেণীর সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়েছিল—তা এই ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই প্রমাণিত হবে।"—"হিষ্ট্রি অফ রোম, i, ৩১৫.

২। ডায়োনিসায়াস, ii, ৮.

৩। প্লুটার্ক, "ভিট্. রোম", xiii, ১৬.

৪। "ভিট্ টাইবেরিয়াস", ১ম পরিচ্ছেদ।

৫। "হিষ্ট্রি অফ রোম", i, ২৫৬, ৪৫০.

৬। স্মিথ-এর ডিকশনারী···, প্রবন্ধ: গোত্র, প্যাট্রিসি এবং প্লেব্স্।"

আমলেও ছিল।[১] পপ্‌লাস অর্থাৎ সমগ্র জনসম্প্রদায় যদি গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে থাকে, সেই প্রাচীন আমলে যদি সকলেই প্যাট্রিসিয়ান হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হয় যে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রায় কোন পার্থক্যই ছিল না, কেননা প্লিবিয়ান শ্রেণীটি তখন নিতান্তই গুরুত্বহীন ছিল। তাছাড়া, সিসেরো এবং লিভির বক্তব্য এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ডায়োনিসায়াস বলেছেন, ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠার আগেই সৃষ্টি হয়েছিল প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীটা, এবং জন্মসূত্রে, গুণের বিচারে বা সম্পদের দিক থেকে বিশিষ্ট অল্প কিছু ব্যক্তিই ছিল এই শ্রেণীর সদস্য ; দরিদ্র এবং জন্মসূত্রে হীন ব্যক্তিরা এর সদস্য হতে পারত না, যদিও তারা বিভিন্ন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] ব্যবস্থাপক-সভার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একটা প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা মেনে নিলে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা আর একটা বিশাল শ্রেণীর কথাও মেনে নিতে হয়, যারা প্যাট্রিসিয়ান ছিল না। সিসেরো বলেছেন, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা আর তাদের সন্তানসন্ততিরাই ছিল প্যাট্রিসিয়ান। এদের বাইরে আর কেউ ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নি। তিনি বলেছেন, রোমুলাসের সেই ব্যবস্থাপক-সভা, যাতে শুধু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই ছিল এবং যাদেরকে রোমুলাস এতটাই সম্মান করতেন যে তাদেরকে পিতা বা অভিভাবক বলে অভিহিত করতে চাইতেন, সেই সভা যখন চেষ্টা করেছিল[৩] ইত্যাদি। এখানে ব্যবহৃত পিতা (Patres) শব্দটার যা অর্থ দাঁড়ায়, তা নিয়ে রোমানদের নিজেদের মধ্যেই মতানৈক্য ছিল। কিন্তু 'প্যাট্রিসি' (patricii) শব্দটা (কেননা শ্রেণীটা গড়ে উঠেছিল ঐ-সব পিতা বা অভিভাবকদের নিয়েই) থেকে ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যপদের সঙ্গে প্যাট্রিসিয়ানদের সম্পর্কের কথাটা স্পষ্টতই বোঝা যায়। ব্যবস্থাপক-সভা গড়ে ওঠার সময় তার প্রতিটি সদস্যই যেহেতু খুব সম্ভবত কোন-না-কোন গোত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করত এবং যেহেতু তার তিনশ জন সদস্য ছিল তিনশটা গোত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ, অতএব ধরেই নেওয়া যায় যে গোত্রের সমস্ত সদস্য কখনোই প্যাট্রিসিয়ান ছিল না, কারণ এই সম্মান অর্জন করত শুধু ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা, তাদের সন্তানসন্ততিরা আর বংশধররা। লিভিও খুব স্পষ্টভাবে এ-কথাই বলেছেন। তাঁর মতে, পদমর্যাদার দরুণ তাদেরকে পিতা বা অভিভাবক হিসাবেই চিহ্নিত করা হত, আর তাদের বংশধরদের বলা হত প্যাট্রিসিয়ান।[৪] সাতজন শাসকের আমলে এবং প্রজাতন্ত্রের আমলে সরকারই বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্যাট্রিসিয়ানের মর্যাদায় উন্নীত করত। কিন্তু ব্যবস্থাপক-সভার পদাধিকার বলে অথবা সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে এ মর্যাদা পাওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে প্যাট্রিসিয়ান হওয়া যেত না। ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠার সময় যারা তার সদস্য হতে পারে নি, এমন কয়েকজনকে পরবর্তীকালে ঐ সভার সদস্যের সমান মর্যাদা দিয়ে প্যাট্রিসিয়ানে পরিণত করাটা হয়ত খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়। তবে তা ঘটে থাকলেও মেনে

১। ডায়োনিসায়াস, ii, ৮ ; প্লুটার্ক "ভিট্ রোম," xiii .

২। ঐ, ii, ৮.

৩। "ডি রিপ." ii, ১২.

৪। লিভি, i,৮.

নিতেই হবে যে সমগ্র রোমান জনসম্প্রদায়ের মোট তিনশটা গোত্রের মধ্যে থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনই এইভাবে প্যাটিৃসিয়ানের মর্যাদা লাভ করে থাকতে পারে।
এটাও হয়ত অসম্ভব নয় যে রোমুলাসের আমলের আগে থেকেই গোত্রের প্রধানদের পিতা বলে চিহ্নিত করা হত (ঐ পদের পিতৃত্বমূলক চরিত্রটা বোঝানোর জন্যই হয়ত এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল) আর ঐ-সব প্রধানদের বংশধররা হয়ত বিশেষ একটা মর্যাদার অধিকারী হত। কিন্তু এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে এটাই যদি ঘটনা হয়ে থাকে, আর সেই সঙ্গেই যদি ধরে নেওয়া যায় যে ব্যবস্থাপক-সভা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সমস্ত মুখ্য প্রধানরা তার অন্তর্ভুক্ত হত না, এবং পরবর্তীকালে ব্যবস্থাপক-সভার কোন পদ খালি হলে তা পূরণ করা হত ব্যক্তিদের গুণ বিচার করে, স্রেফ গোত্রের সূত্রে নয়—তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে সে-সময় একটা প্যাটিৃ-সিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিলই, আর তা ব্যবস্থাপক-সভার ওপর নির্ভরশীল ছিল না। সিসেরোর নিজস্ব বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে এই অনুমানকে কাজে লাগানো যায়। সিসেরো বলেছিলেন ঃ ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের পিতা নামে অভিহিত করতে চেয়ে-ছিলেন রোমুলাস, কারণ সম্ভবত তার আগে থেকেই গোত্রের প্রধানদের এই মর্যাদা-ব্যঞ্জক নামেই অভিহিত করা হত। এইভাবে বিচার করলে ব্যবস্থাপক-সভার ওপর নির্ভরশীল নয় এমন একটা প্যাটিৃসিয়ান শ্রেণীর অস্তিত্বের মোটামুটি একটা ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভিত্তিটা এত বড় নয় যে স্বীকৃত সবকটা গোত্রই তার মধ্যে স্থান পেতে পারে। ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের প্রসঙ্গেই প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যে তাদের সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরও প্যাটিৃসিয়ান হিসেবেই চিহ্নিত করা হোক। প্যাটারকুলাসও এই একই কথা বলেছেন।[১]
অর্থাৎ, প্যাট্রিসিয়ান গোত্র বা প্লিবিয়ান গোত্র বলে নির্দিষ্ট কিছু ছিল না। তবে, কোন গোত্রের কোন বিশেষ পরিবার প্যাট্রিসিয়ান এবং অন্যরা প্লিবিয়ান হতে পারত। অবশ্য এ ব্যাপারেও কিছুটা বিভ্রান্তি থেকেই যায়। ফ্যাবিয়ান গোত্রের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষই (সংখ্যায় মোট তিনশ ছয় জন) ছিল প্যাট্রিসিয়ান।[২] ঐ ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে যে, ঐ গোত্রের সবকটা পরিবারই ছিল ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের বংশধর, অথবা কোন বিশেষ সরকারি ব্যবস্থায় তাদের সকলকার পূর্ব-পুরুষদের দেওয়া হয়েছিল প্যাট্রিসিয়ানের মর্যাদা। অনেক গোত্রের মধ্যেই কিছু প্যাট্রিসিয়ান পরিবারের অস্তিত্ব ছিল, এবং পরবর্তীকালে একই গোত্রের মধ্যে প্যাটিৃসিয়ান ও প্লিবিয়ান পরিবারের অস্তিত্বও চোখে পড়ে। যেমন, পূর্বোল্লিখিত ('রোমান গোত্র' শীর্ষক একাদশতম পরিচ্ছেদের একটি পাদটীকায়) ক্লডি আর মার্সেলি পরিবার দুটো ছিল একই ক্লডিয়ান গোত্রের অন্তর্গত। কিন্তু এদের মধ্যে শুধু ক্লডিরাই ছিল প্যাট্রিসিয়ান। মনে রাখা দরকার, সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলের আগে রোমানরা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—পপুলাস আর প্লিবিয়ান। কিন্তু তাঁর আমলের পর, বিশেষত লিসিনিয়ান আইন-প্রণয়নের (৩৬৭ খিৃষ্টপূর্বাব্দ)

১। ভেলেউস প্যাটারকুলাস, ১, ৮.
২। লিভি, ii, ৪৯.

পর (যে আইন বলে রাষ্ট্রের যে-কোন সম্মানিত পদ অর্জন করার অধিকার লাভ করে প্রতিটি নাগরিক), স্বাধীন রোমানদের মধ্যে দুটো রাজনৈতিক শ্রেণী সৃষ্টি হয়—অভিজাততন্ত্র আর সাধারণ জনগণ। প্রথমোক্ত শ্রেণীটার মধ্যে থাকত ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা, তাদের বংশধররা, তিনটি বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা (প্রধান শাসকদ্বয়, প্রধান বিচারক এবং বাসগৃহগুলোর দায়িত্বশীল বিচারক) আর তাদের বংশধররা। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সাধারণ জনগণ বলতে রোমের ব্যাপক নাগরিকদেরই বোঝাতো। গোত্রীয় সংগঠন তখন ভেঙে পড়েছে, কাজেই পুরনো বিভাজনটাকে ধরে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। আগেকার আমলে যে-সব লোক পপুলাস শ্রেণীর সদস্য ছিল, তাদেরকে প্লিবিয়ানদের সঙ্গে একত্রিত করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে এরা প্যাট্রিসিয়ান না হয়েও অভিজাত শ্রেণীর সদস্য হয়ে উঠেছিল। ক্লডিরা ছিল আপ্পিয়াস ক্লডিয়াস-এর বংশধর। রোমুলাসের আমলে এই আপ্পিয়াস ক্লডিয়াস ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হয়েছিলেন। মার্সেলিরা কিন্তু তাঁর বা ব্যবস্থাপক-সভার অন্য কোন সদস্যদের বংশধর ছিল না, যদিও, নিয়েবুর বলেছেন, "অর্জিত মর্যাদার বিচারে এরা আপ্পিদের থেকে কোন অংশে কম ছিল না, এবং রাষ্ট্রের পক্ষে এরা অনেক বেশিপ্রয়োজনীয় ছিল।"[১] নিয়েবুরের কাল্পনিক প্রকল্পকে বাদ দিয়েও বলা যায় যে, আসলে নিম্নশ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে কোনরকম বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার দরুণই মার্সেলিরা প্যাট্রিসিয়ানের মর্যাদা হারিয়েছিল।[২]

প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর সদস্য সংখ্যা নেহাত কম ছিল না, কারণ ব্যবস্থাপক-সভায় থাকত তিনশ জন সদস্য, কোন সদস্যপদ শূন্য হলে তৎক্ষণাৎ অন্য কাউকে সেই পদে নিয়োগ করা হত, সারাক্ষণই নতুন নতুন পরিবার প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পেত। তাছাড়া, তাদের বংশধররাও গণ্য হত প্যাট্রিসিয়ান হিসেবে, আর মাঝে-মাঝে কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় আইনবলে অনেককে এই শ্রেণীর সদস্য করে নেওয়া হত।[৩] প্রথমদিকে এই বিশেষ শ্রেণীটির তেমন কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু সম্পদে, সংখ্যায় আর শক্তিতে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং রোমান সমাজব্যবস্থার গোটা চেহারাটাকেই বদলে দেয়। গোত্রভিত্তিক সমাজের মধ্যে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে—সেটা বোধহয় তখন কেউই ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। আর রোমান জনগণের পরবর্তী ইতিহাসে এটা যতটা উপকারী ভূমিকা নিয়েছিল, তার থেকে যে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেনি—এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সরকারি কার্যকলাপে সংগঠন হিসেবে গোত্রের আর কোন প্রয়োজনীয়তা রইল না। আর তখন থেকে প্লিবিয়ানদের সঙ্গে পপুলাস বা জন-

১। "হিস্ট্রি অফ রোম", i, ২৪৬.

২। লিভি, iv, ৪

৩। লিভি, iv, ৫১.

সম্প্রদায়ের পার্থক্যটাও মুছে গেল। তবুও, প্রজাতন্ত্রের আমলের বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ঐ পুরনো সংগঠন আর ঐ পুরনো পার্থক্যের ছায়াটা পুরোপুরি সরে যায়নি।[১] নতুন ব্যবস্থায় প্লিবিয়ানরা রোমান নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হল এবং বিবেচিত হল মূল জনসাধারণ হিসেবে। গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা বা না-থাকার প্রশ্নটা গুরুত্বহীন হয়ে গেল।

আগেই বলা হয়েছে যে রোমুলাসের আমল থেকে শুরু করে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমল পর্যন্ত রোমান সমাজব্যবস্থা ছিল নিছকই একটা গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, ভূখণ্ড বা সম্পত্তির সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই ছিল না। তখন ছিল শুধু গোত্র, কিউরিয়া আর গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সংগঠিত কিছু মানুষ, এবং এইসব সংগঠনের সাহায্যেই ঐ মানুষদের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ থাকত। সোলোনের আমলের আগে পর্যন্ত এথেনীয়দের অবস্থাটা যেমন ছিল, অনেকটা সেইরকমই ছিল ঐ সময়কার রোমানদের অবস্থা। তবে তারা পুরনো আমলের প্রধানদের পরিষদের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল একটা ব্যবস্থাপক-সভা, গণ-পরিষদের জায়গায় কমিশিয়া কিউরিয়াটা এবং এমন একজন সামরিক সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করেছিল যিনি পুরোহিত ও বিচারকের দায়িত্বও পালন করতেন। তারা গড়ে তুলেছিল এক তিনশক্তিবিশিষ্ট সরকার, এই তিন শক্তির সমন্বয়সাধন করা হয়েছিল তাদের প্রধান প্রধান প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আর সমান সংখ্যক গোত্র ও কিউরিয়াবিশিষ্ট তিনটি গোষ্ঠী তাদের মধ্যে একাঙ্গীভূত হয়েছিল। এই সবকিছুর সমন্বয়ে তারা যে শাসনব্যবস্থাটা গড়ে তুলতে পেরেছিল, সেটা ছিল পূর্ববর্তী কালের লাতিন গোষ্ঠীগুলোর শাসনব্যবস্থার থেকে আরও উন্নত ও আরও পূর্ণাঙ্গ। তবে এরই মধ্যে গড়ে উঠেছিল এমন একটা বিশাল শ্রেণী যারা ছিল সরকারি চৌহদ্দির বাইরে, যাদের কোনরকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ ছিল না (একমাত্র যারা কারুর-না-কারুর অনুচরে পরিণত হয়েছিল, তারা বাদে)। শ্রেণী হিসেবে এরা হয়ত খুব একটা বিপজ্জনক ছিল না, কিন্তু এদের নাগরিকত্ব না পাওয়া এবং সরকারি কার্যকলাপে কোনরকম অংশ গ্রহণের সুযোগ না পাওয়াটা প্রজাতন্ত্রের পক্ষে রীতিমত ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল। বিরাট মাত্রায় গড়ে উঠছিল একটা পৌর-প্রতিষ্ঠান। এত বড় মাত্রায় কোন কিছু গড়ার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করার জন্য দরকার হচ্ছিল একটা বিশেষ সংগঠনের। শাসনব্যবস্থার ধাঁচ পাল্টানোর প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই ছাপ ফেলেছিল চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনের ওপর। লোকসংখ্যা বাড়ছিল, সম্পদ বাড়ছিল, বাড়ছিল বিভিন্ন বিষয়কে ঠিকভাবে পরিচালনা করার সমস্যাও (লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন ধরণের স্বার্থের উদ্ভবের ফলে এইসব বিষয়গুলো জটিলতর হয়ে উঠেছিল)। এ-সবের ফলে তারা ক্রমশ বুঝতে পারছিল যে গোত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের একত্রিত রাখাটা আর সম্ভব হচ্ছে না। পরবর্তীকালের বেশকিছু

১। লিভি, iv, ৫১.

প্রচেষ্টাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসাটা একান্তই জরুরী।

প্রথম বড় মাপের প্রচেষ্টাটা করেছিলেন রোমুলাসের উত্তরাধিকারী নুমা। এত বড় একটা শক্তি যে গোত্রের ভিত্তিতে টিকে থাকতে পারে না, সেটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। থেসেউসের মত নুমাও চেষ্টা করেছিলেন কাজ এবং বৃত্তির ভিত্তিতে সমগ্র জনসাধারণকে মোট আটটা শ্রেণীতে বিভক্ত করে গোত্রকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে।[১] এই কথাটা প্রধানত প্লুটার্কের লেখাতেই পাওয়া যায়। এই সঙ্গেই প্লুটার্ক বলেছেন যে, বৃত্তি অনুযায়ী জনসাধারণকে এইভাবে বিভক্ত করাই ছিল নুমার সবথেকে বড় কৃতিত্ব। তিনি আরও বলেছেন—লাতিন এবং স্যাবাইনদের একটা নতুন ব্যবস্থার মধ্যে সংমিশ্রিত করে তাদের নাম ও সম্পত্তির মধ্যেকার পার্থক্য দূর করাটাই ছিল এই প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু গোত্রগুলোর হাতে যে ক্ষমতা ছিল, সে ক্ষমতা নতুন এই শ্রেণীগুলোর হাতে তুলে দেননি নুমা। ফলে, ব্যর্থ হয় তাঁর প্রচেষ্টা। একই কারণে ব্যর্থ হয়েছিল থেসেউসের প্রচেষ্টাও। প্লুটার্ক জানিয়েছেন—প্রতিটি পৌরসভার নিজস্ব অধিবেশন-গৃহ, আদালত এবং নিজস্ব কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থাকত। এথেন্স এবং রোমে একই উদ্দেশ্যে, একই কারণে ও একই উপাদানের সাহায্যে এইসব পরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে যে-সব বিবরণ পাওয়া যায় (সেগুলোর অনেকটা মৌখিক বিবরণ হলেও,) তা থেকে যুক্তিসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষাটা চালানো হয়েছিল।

নতুন ব্যবস্থাটা গড়ে তোলেন সার্ভিয়াস টিউলিয়াস। এই ব্যবস্থায় এমন এক সুদৃঢ় বনিয়াদ তিনি রচনা করেন, যার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থাটা প্রজাতন্ত্রের যুগের প্রায় শেষ অবধি টিকে থাকতে পেরেছিল—অবশ্য এর বিকাশ ঘটানোর জন্য পরের দিকে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলটা (মোটামুটিভাবে ৫৭৬-৫৩৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ) হচ্ছে সোলোনের আমলের (৫৯৬ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ) পরে আর ক্লাইসথেনিসের আমলের (৫০৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) আগে। সোলোনের আইনের ধাঁচে তিনি যে আইনটি প্রণয়ন করেছিলেন বলে শোনা যায়, সেটিকে ঐ সময়কালেই রচিত বলে মেনে নেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। কারণ, ৫০৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যখন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ঐ ব্যবস্থাটি রীতিমত ক্রিয়াশীলই ছিল। তাছাড়া, রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার কৃতিত্ব তিনি অনেকটাই দাবি করতে পারেন, যেমন অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন আরও কেউ কেউ। তবে, আইনপ্রণেতারা আসলে সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকেই সূত্রবদ্ধ করেছিলেন মাত্র। যে তিনটি মূল পরিবর্তন গোত্রকে সরিয়ে ভূখণ্ড ও সম্পত্তি-ভিত্তিক রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার সূচনা করেছিল, সেগুলো হচ্ছে, (১) গোত্রের জায়গায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, (২) গোত্র-পরিষদ অর্থাৎ কমিশিয়া কিউরিয়াটার বদলে নতুন গণ-পরিষদ হিসেবে কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটা স্থাপন করা এবং

১ প্লুটার্ক. "ভিট্ নুমা" xvii,২০.

প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাগুলো শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া, এবং (৩) সীমারেখাবেষ্টিত চারটি নগর-বিভাগ গড়ে তোলা, যেগুলোর চরিত্রটা ছিল অনেকটা শহরের মত এবং প্রতিটা বিভাগের এক একটা নামও দেওয়া হয়েছিল ; প্রতিটি বিভাগের বাসিন্দাদের নিজেদের নাম এবং সম্পত্তি নথিভুক্ত করাতে হত।

সোলোনের শাসনব্যবস্থার ধরনটার সঙ্গে যথেষ্টই পরিচিত ছিলেন সার্ভিয়াস। সোলোনের অনুকরণে তিনিও সমগ্র জনসাধারণকে পাঁচটা শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই শ্রেণী-বিভাজনটা করা হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী। এর ফলে বিভিন্ন গোত্রের সবথেকে সম্পদশালী লোকেরা একটা শ্রেণীতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।[১] অতঃপর প্রতিটা শ্রেণীকে আবার কয়েকটা সেঞ্চুরিতে বিভক্ত করা হত। এক একটা শ্রেণীতে ক'টা করে সেঞ্চুার থাকবে, সে ব্যাপারে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। যথেচ্ছভাবে এটা নির্ধারণ করা হত। কমিশিয়ার প্রতিটা সেঞ্চুরির একটা করে ভোট থাকত। ফলে, এক একটা শ্রেণীর হাতে কতটা রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে, সেটা নির্ধারিত হত তার মধ্যে কতগুলো সেঞ্চুরি আছে, তার দ্বারাই। প্রথম শ্রেণীটার মধ্যে ছিল আশিটা সেঞ্চুরি, অর্থাৎ কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটায় তাদের ছিল মোট আশিটা ভোট। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল কুড়িটা সেঞ্চুরি আর সেইসঙ্গে কারিগরদের দুটো সেঞ্চুরি, অর্থাৎ মোট বাইশটা ভোট। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল কুড়িটা সেঞ্চুরি, কুড়িটা ভোট। চতুর্থ শ্রেণীতে ছিল কুড়িটা সেঞ্চুরি আর সেইসঙ্গে শিঙাবাদক ও ভেরীবাদকদের দুটো সেঞ্চুরি, অর্থাৎ মোট বাইশটা ভোট। পঞ্চম শ্রেণীতে ছিল ত্রিশটা সেঞ্চুরি, ত্রিশটা ভোট। এছাড়া অশ্বারোহী যোদ্ধাদের ছিল আঠারটা সেঞ্চুরি অর্থাৎ আঠারটা ভোট। এই পাঁচটা শ্রেণীর সঙ্গে আর একটা শ্রেণী যোগ করেছেন ডায়োনিসায়াস, যে শ্রেণীটির মধ্যে ছিল একটা সেঞ্চুরি, অর্থাৎ একটা ভোট। যাদের কোন সম্পত্তিই ছিল না, অথবা পঞ্চম শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে যতটা সম্পদ লাগত তার চেয়ে কম ছিল—তাদেরকে নিয়েই গঠিত হয়েছেল এই ষষ্ঠ শ্রেণীটা। এরা কোনরকম কর দিত না বা যুদ্ধেও যেত না।[২] ডায়োনিসায়াসের বক্তব্য অনুযায়ী, ঐ অশ্বারোহীদের সেঞ্চুরিগুলো সমেত এই ছটা শ্রেণীতে মোট একশ তিরানব্বইটা সেঞ্চুরি ছিল।[৩] পাঁচটা শ্রেণীর মধ্যেকার সেঞ্চুরির সংখ্যার ব্যাপারে লিভিও ডায়োনিসায়াসের সঙ্গে মোটামুটি একমত। তবে ঐ ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্যাপারটা তিনি মেনে নেননি। তার মতে, একটা সেঞ্চুরিতে ঐক্যবদ্ধ এবং একটা ভোটবিশিষ্ট ঐ-সব লোকেরা পঞ্চম শ্রেণীটারই অন্তর্ভুক্ত ছিল অথবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাছাড়াও তিনি

১। যার ১ লক্ষ গাধা থাকত, সে স্থান পেত প্রথম শ্রেণীটিতে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পেত ৭৫ হাজার গাধার মালিকরা। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে রাখা হত যথাক্রমে ৫০ হাজার, ২৫ হাজার এবং ১১ হাজার গাধার মালিকদের।—লিভি, i, ৪৩.

২। ডায়োনিসায়াস, iv, ২০.

৩। ঐ, iv, ১৬, ১৭, ১৮.

বলেছেন যে শিঙাবাদক ও ভেরীবাদকদের সেঞ্চুরি দুটো নয়, তিনটে ছিল। অর্থাৎ, মোট সেঞ্চুরি ছিল একশ চুরানব্বইটা।[১] সিসেরো বলেছেন—ছিয়ানব্বইটা সেঞ্চুরি একদিকে থাকলে সেটা সংখ্যালঘু অংশ হত, এবং এটা উভয় বক্তব্যর ক্ষেত্রেই সত্য হতে পারে।[২] প্রতিটা শ্রেণীর সেঞ্চুরিগুলো ছিল দু'ভাগে বিভক্ত : বর্ষীয়ান আর অল্পবয়সী। বর্ষীয়ানদের সেঞ্চুরিতে থাকত পঞ্চান্ন বছরের বেশি বয়সের লোকেরা। সৈনিক হিসেবে এরা নগর রক্ষার দায়িত্ব পালন করত। অল্পবয়সীদের সেঞ্চুরিতে থাকত পঞ্চান্ন বছরের থেকে কম আর সতের বছরের থেকে অধিক বয়স্ক লোকেরা। নগরের বাইরে যাবতীয় সামরিক কার্যকলাপের দায়িত্ব থাকত এদের ওপর।[৩] প্রতিটা শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা বর্ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।[৪]

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, গণ-পরিষদের পক্ষে সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার যতটুকু সুযোগ ছিল, তার সবটাই তুলে দেওয়া হয়েছিল ঐ প্রথম শ্রেণীটি এবং অশ্বারোহী সৈন্যদের সেঞ্চুরির হাতে; এরা উভয়ে মিলিয়ে মোট আটানব্বইটা ভোটের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল এরাই। কমিশিয়া কিউরিয়াটায় সমবেত হয়ে কিউরিয়াগুলো যেমন আলাদা আলাদাভাবে ঠিক করে নিত যে তারা কোন্ পক্ষে ভোট দেবে, ঠিক সেইভাবেই সেঞ্চুরিগুলোও কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটায় সমবেত হয়ে আলাদা আলাদাভাবে নিজেদের ভোট সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিত। কোন রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে ভোট দেওয়ার সময় প্রথমে ডাকা হত অশ্বারোহীদের, তারপর প্রথম শ্রেণীটিকে।[৫] এই দুজনরা কোন প্রশ্নে একমত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটির মীমাংসা হয়ে যেত, বাকিদের আর ভোট দেওয়ার জন্য ডাকাই হত না। কিন্তু এদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে ডাকা হত দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে, তারপর তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি শ্রেণীগুলোকে। যতক্ষণ না কোন এক পক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করত, ততক্ষণ সকলেই সুযোগ পেত ভোট দেওয়ার।

কমিশিয়া কিউরিয়াটার হাতে যে ক্ষমতা ছিল, তা হস্তান্তরিত হয়েছিল কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়াটার হাতে, এবং পরবর্তীকালে এই ক্ষমতা কিছুটা বাড়ানোও হয়েছিল। ব্যবস্থাপক-সভার মনোনয়নের ভিত্তিতে তারা সমস্ত কর্মকর্তা ও বিচারকদের নির্বাচন করত। ব্যবস্থাপক-সভা কর্তৃক প্রস্তাবিত যে-কোন আইনকে বলবৎ করতে অথবা বাতিল করতে পারত এই সেঞ্চুরিয়াটা। এর অনুমোদন ছাড়া কোন পদক্ষেপই আইনে

১। "লিভি" i, ৪৩.

২। "ডি রিপ", ii, ২০.

৩। ডায়োনিসায়াস, iv, ১৬.

৪। লিভি, i, ৪৩.

৫। লিভি, i, ৪৩. কিন্তু ডায়োনিসায়াস এই অশ্বারোহীদের প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেই মন্তব্য করেছেন, এবং বলেছেন যে এই শ্রেণীটিকেই ভোট দেওয়ার জন্য প্রথমে ডাকা হত।—ডায়োনিসায়াস, iv, ২০.

পরিণত হতে পারত না। ইচ্ছে করলে ব্যবস্থাপক-সভার প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোন চালু আইনকেও বাতিল করে দিতে পারত সেঞ্চুরিয়াটা। ঐ সভার প্রস্তাবের ভিত্তিতে যুদ্ধ ঘোষণা করার অধিকারও ছিল তার হাতে। তবে, এই পরিষদের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করেই যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার ব্যবস্থাপক-সভার ছিল। যে-কোন মামলা, এমনকি প্রাণদণ্ড সংক্রান্ত মামলাকেও এই পরিষদের সামনে উপস্থাপিত করা যেত, কেননা এটাই ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচার-বিভাগীয় সালিশ-সভা। এই ক্ষমতাগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও একটা জায়গায়, অর্থাৎ আর্থিক ব্যাপারে, এর কোন ভূমিকা ছিল না। অধিকাংশ ভোটই ছিল প্রথম শ্রেণীটি এবং অশ্বারোহীদের হাতে। ধরেই নেওয়া যায় যে প্রথম শ্রেণীটির মধ্যে ছিল প্যাট্রি-সিয়ানরা আর সম্পদশালী নাগরিকরা। শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত সম্পত্তির দ্বারা, সংখ্যার দ্বারা নয়। তবে পরবর্তীকালে তারা এমন কিছু আইন চালু করেছিল, যেগুলো সকলের জন্য সমান নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পেরেছিল এবং সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসাম্যের সবথেকে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াকে কিছুটা প্রশমিত করতে পেরেছিল।

বিচারপতি ও আধিকারিকদের নির্বাচন করার জন্য প্রতি বছর কমিশিয়ার অধিবেশন বসত ক্যাম্পাস মার্তিয়াসে। প্রয়োজনে অন্য সময়েও ডাকা হত এই অধিবেশন। নিজেদেরকে সেনাবাহিনীর (exercitus) কায়দায় সংগঠিত করে মানুষরা ওখানে সমবেত হত সেঞ্চুরি ও শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ ভাগ হয়ে। তাদের পরিচালনা করত আধি-কারিকরা। সেনাবাহিনীর কায়দায় সংগঠিত হয়ে আসার কারণ হল, সেঞ্চুরি ও শ্রেণী-গুলোর কাছ থেকে বেসামরিক ও সামরিক উভয় ধরনের কাজই আশা করা হত। সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলে যে প্রথম জমায়েতটা হয়েছিল, তাতে ঐ ক্যাম্পাস মার্তিয়াসে সমবেত হয়েছিল আশি হাজার সশস্ত্র নাগরিক যোদ্ধা। প্রত্যেকেই এসেছিল নিজের নিজের সেঞ্চুরির সদস্য হিসাবে, প্রতিটা সেঞ্চুরি এসেছিল নিজের নিজের শ্রেণীর সদস্য হিসাবে, আর প্রতিটা শ্রেণী ছিল স্বনির্ভর।[১] প্রতিটি সেঞ্চুরির প্রতিটি সদস্যই তখন রোমের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, আর এইটাই ছিল নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। প্রজাতন্ত্রের আমলে কমিশিয়ার সভা ডাকার অধিকার ছিল প্রধান শাসকদ্বয়ের, অথবা তাঁদের অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতির। যিনি সভা ডাকতেন, তিনিই পালন করতেন সভার সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব।

আজকের উন্নত অভিজ্ঞতার আলোকে এই ধরনের সরকার আমাদের কাছে অত্যন্ত আদিম ও অমার্জিত হিসাবেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু যতই ত্রুটিপূর্ণ এবং অনুদার বলে মনে হোক না কেন, পূর্বতন গোত্রভিত্তিক সরকারের থেকে যে এটা বেশ কিছুটা অগ্র-গতিকেই সূচিত করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই শাসনব্যবস্থার আমলের রোম

১। লিভি, i, ৪৪: ডায়োনিসায়াসের মতে ঐ জমায়েতে উপস্থিত হয়েছিল ৮৪,৭০০ জন মানুষ।—iv, ২২.

হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী। এর চরিত্র কেমন হবে, তা নির্ধারিত হয়েছিল সম্পত্তির মাপকাঠির সাহায্যে (সম্পত্তি ব্যাপারটা তখন ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে)। অভিজাততন্ত্র আর তাদের সুযোগ-সুবিধেগুলোকে একটা বিশিষ্ট আসন দিয়েছিল এই সরকার, আর তারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা জনগণের হাত থেকে অনেকটাই কেড়ে নিয়ে তুলে দিয়েছিল সম্পত্তিবান লোকদের হাতে। গোত্রের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গণতান্ত্রিক নীতিগুলো স্বাভাবিক গতিপথে যেদিকে যেতে পারত, এই ঘটনাটা তার মুখটাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চেপে বসা এই অভিজাততন্ত্র আর তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধের বিরুদ্ধে রোমান প্লিবিয়ানরা প্রজাতন্ত্রের গোটা যুগটা জুড়েই সংগ্রাম করেছে এবং মাঝে-মধ্যে সফলও হয়েছে। কিন্তু প্লিবিয়ানরা সকলকার সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধের যে মহান নীতির কথা বলত, তা দমিয়ে রাখার মত যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল প্যাট্রিসিয়ান এবং সম্পত্তিবান উচ্চ শ্রেণীর হাতে। একটা সুবিধেভোগী শ্রেণীর বোঝা বয়ে বেড়ানোটা সেই সময়কার রোমান সমাজের পক্ষেও যথেষ্টই ভারি ছিল।

দেশপ্রেমিক এবং মহৎপ্রাণ সিসেরো জনগণের এই শ্রেণীবিন্যাসটা অনুমোদন করেন এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তুলে সংখ্যালঘু নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে রায় দেন। তিনি বলেছেন, সার্ভিয়াস টিউলিয়াস "সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু জনকে অশ্বারোহী সেনায় পরিণত করার পর বাকিদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তাদের মধ্যে আবার বর্ষীয়ান ও অল্পবয়স্ক এই দুটি ভাগ সৃষ্টি করেন, এবং গোটা কাজটা এমনভাবে বিন্যস্ত করেন, যাতে করে মূল ভোটাধিকারটা থাকে সম্পত্তিবান লোকেদের হাতে, ব্যাপক মানুষের হাতে নয়। সর্বাধিক সংখ্যক লোকের হাতে সর্বাধিক ক্ষমতা থাকা উচিত নয়—এটাকেই তিনি নিয়মে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, এবং প্রতিটি সরকারের এই নিয়ম অনুযায়ীই চলা উচিত।"[১] এ ঘটনার পর আজ দু'হাজার বছর অতিক্রান্ত। এই দু'হাজার বছরের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করলে বোঝা যায়, সেই সময় থেকে বিভিন্ন মানুষের সুযোগ-সুবিধের অসাম্য এবং স্বশাসনের অধিকার অস্বীকার করার যে অঙ্কুর মাথা তুলেছিল, তা থেকেই ধীরে ধীরে জমে উঠেছিল অজ্ঞতা আর দুর্নীতির পাহাড়, ধ্বংস হয়েছিল শাসনব্যবস্থা এবং রোমান জনগণ। সমগ্র মানবজাতি ক্রমশই এই সরল সত্যটা উপলব্ধি করছে যে সামগ্রিক কল্যাণ ও সামগ্রিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে যে-কোন যুগের যে-কোন পরিশীলিত বা সুশিক্ষিত সুবিধেভোগী শ্রেণীর তুলনায় সাধারণ মানুষ অনেক বেশি দক্ষ, বিচক্ষণ। সবথেকে অগ্রসর সমাজের সরকারগুলোও এখনও পর্যন্ত একটা সংক্রমণের স্তরেই রয়েছে। নিজের শেষ উদ্বোধনী বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতি গ্রাণ্ট সঠিকভাবেই বলেছেন যে এই সরকারগুলো অপরিহার্যভাবে এবং যুক্তিসম্মতভাবে এগিয়ে চলেছে গণতন্ত্রের দিকেই। আর স্বশাসনের এই ধরণটাই কোন স্বাধীন ও সুশিক্ষিত জনসম্প্রদায়ের গড়পড়তা বুদ্ধিমত্তা এবং গুণাবলীকে ফুটিয়ে তুলতে ও প্রকাশ করতে পারে।

১। সিসেরো, "ডি রিপ," ii ২২.

আগে শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল যে গোত্র, তার সমস্ত ক্ষমতা অন্য একটা সংস্থার হাতে হস্তান্তরিত করে দেয় সম্পত্তিবান শ্রেণী, এবং এইভাবে সে গোত্রকে ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজনীয় কাজটা সম্পন্ন করে। নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গোত্রের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া এবং একমাত্র ক্রীতদাসরা ছাড়া রোমের বাকি সমস্ত বাসিন্দাদের যাতে শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন একটা বনিয়াদ রচনা করা। এই কাজ সম্পন্ন করার পর শ্রেণীগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত, যেমনটা ঘটেছিল এথেন্সে। আর বিভিন্ন নগর-বিভাগ ও গ্রামীণ এলাকাগুলো (যেখানকার বাসিন্দারা রাজনৈতিক সঙ্ঘ হিসাবে সংগঠিত ছিল) যুক্তিসম্মতভাবেই নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু রোমের পৌর সংগঠন তা ঘটতে দেয়নি। প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই পৌর সংগঠনই ছিল তাদের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুস্বরূপ। বাইরের সমস্ত এলাকাকেও এরই কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রথমে ইতালিতে এবং অবশেষে তিনটি মহাদেশের বিজিত অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়া এক কেন্দ্রীয় পৌর শাসনব্যবস্থার ব্যতিক্রমী চরিত্রটাই ফুটে উঠেছে এর মধ্যে। পাঁচটা শ্রেণীই টিকে থেকেছিল প্রজাতন্ত্রের আমলের শেষ পর্যন্ত (শুধু তাদের ভোট দেওয়ার পদ্ধতিতে কিছু রদবদল ঘটেছিল)। পুরনো গণ-পরিষদের জায়গায় এক নতুন গণ-পরিষদ সৃষ্টি করার মধ্যে সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের সংবিধানের বৈপ্লবিক চরিত্রটাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত একটা পরিষদ আর তার কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া ছাড়া এইসব শ্রেণীগুলো টিকে থাকতে পারত না। সম্পদ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিষদের কাজ ও দায়িত্বও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। স্পষ্টতই সার্ভিয়াস টিউলিয়াস চেয়েছিলেন যে এই পরিষদ কমিশিয়া কিউরিয়াটাকে বিলুপ্ত করে দিক এবং সেইসঙ্গেই ধ্বংস হোক গোত্রের ক্ষমতাও।

শোনা যায়, সার্ভিয়াস টিউলিয়াসই নাকি স্থাপন করেছিলেন কমিশিয়া ট্রিবিউটা। এটা ছিল প্রতিটা স্থানীয় গোষ্ঠী বা অঞ্চলের একটা আলাদা পরিষদ। এর প্রধান কাজ ছিল কর নির্ধারণ করা ও তা আদায় করা, এবং সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের বন্দোবস্ত করা। পরবর্তীকালে এই পরিষদই নির্বাচিত করত জনগণের শাসকদের। তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক একক ছিল ওয়ার্ড বা বিভাগ। আর রোমান জনগণ যদি একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইত, তাহলে স্থানীয় স্বশাসনের কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত এই বিভাগগুলোই। কিন্তু ব্যবস্থাপক-সভা এবং সম্পত্তিবান শ্রেণীরা তাদেরকে সে কাজ করতে দেয় নি।

সার্ভিয়াস টিউলিয়াস প্রথম যে কাজগুলো করেছিলেন, লোকগণনা তার অন্যতম। লিভি বলেছেন, ভবিষ্যতে যে সাম্রাজ্য প্রভূত শক্তিশালী হয়ে উঠবে, তার পক্ষে লোক-গণনাটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ। কারণ এই লোকগণনা অনুযায়ীই শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন কর্তব্য নির্ধারিত হত আর তা আগের মত ব্যক্তিগত ভিত্তিতে নির্ধারিত হত না, নির্ধারিত হত ব্যক্তিগত সম্পদের ভিত্তিতে।[১] প্রতিটি

১। লিভি, i, ৪২.

ব্যক্তিকে তার বাসস্থানের বিভাগে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করতে হত এবং নিজের সম্পত্তির পরিমাণটাও জানাতে হত। এ কাজ সম্পন্ন হত রাজস্ব ও শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে। তালিকা সম্পূর্ণ হওয়ার পর তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল শ্রেণীগুলো।[২] এই সঙ্গেই সম্পন্ন হয়েছিল সে যুগের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গড়ে উঠেছিল প্রাচীরবেষ্টিত চারটি নগর-বিভাগ। প্রতিটা বিভাগের এক একটা যথাযথ নামও দেওয়া হয়েছিল। সময়ের বিচারে এটা হচ্ছে ক্লাইসথেনিস কর্তৃক এথেন্সে নগর-বিভাগ প্রতিষ্ঠার আগেকার ঘটনা। কিন্তু সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এথেন্স আর রোমের নগর-বিভাগগুলোর মধ্যে মোটেই মিল ছিল না। আগেই দেখানো হয়েছে যে এথেন্সের নগর-বিভাগগুলো একটা রাজনৈতিক সংঘ হিসেবে সংগঠিত হয়েছিল, নাগরিকদের নাম আর তাদের সম্পত্তির পরিমাণ সেখানেও নথিভুক্ত করা হত, এবং সেইসঙ্গেই তাদের থাকত পরিপূর্ণ স্থানীয় স্বশাসনের ক্ষমতা আর থাকত নির্বাচিত শাসকবর্গ, বিচারকবর্গ ও পুরোহিত। অন্যদিকে, রোমানদের নগর-বিভাগগুলো ছিল এক একটা ভৌগোলিক এলাকা। সেখানে নাগরিকদের নাম ও সম্পত্তির পরিমাণ নথিভুক্ত করা হত, একটা স্থানীয় সংগঠন থাকত, নির্বাচিত শাসক ও অন্যতম নির্বাচনমূলক পদ এবং একটা পরিষদও থাকত। কতকগুলো বিশেষ কারণে এইসব নগর-বিভাগের বাসিন্দাদের সঙ্গে সরকার যোগাযোগ রাখত তাদের আঞ্চলিক সম্পর্ক মারফৎ। কিন্তু এথেন্সের নগর-বিভাগগুলোর সরকারের হাতে যে-সব ক্ষমতা থাকত, রোমান নগর-বিভাগগুলোর হাতে তা ছিল না। রোমানদের এই নগর-বিভাগগুলো ছিল অনেকটা এথেনীয়দের প্রাচীন নউক্র্যারির মত। নউক্র্যারির কাছ থেকেই এই ধাঁচটা শিখেছিল রোমানরা, যেমন সার্ভিয়াস টিউলিয়াস তাঁর কাজের ধাঁচটা নিয়েছিলেন সোলোনের থেকে। ডায়োনিসায়াস বলেছেন, সাতটা পাহাড়কে একটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরার পর সার্ভিয়াস টিউলিয়াস শহরটাকে চার ভাগে বিভক্ত করেন, এবং পাহাড়গুলোর নামে এই বিভাগগুলোর নামকরণ করেন। প্রথম বিভাগটার নাম দেন প্যালাটিনা, দ্বিতীয়টার সুবুরা, তৃতীয়টার কলিনা আর চতুর্থটার এস্কুইলিনা। আগে যে শহরে ছিল তিনটি বিভাগ, সে শহরকে তিনি চারটি বিভাগে বিভক্ত করলেন। গ্রামবাসীদের মত এই চারটি অঞ্চলের বাসিন্দাদেরও তিনি নির্দেশ দেন অন্য কোন জায়গায় গিয়ে বসবাস না করার, অন্য কোথাও কর না দেওয়ার, অন্য কোন অঞ্চলে সৈনিক হিসেবে নিজেদের নাম নথিভুক্ত না করানোর কিম্বা সামরিক ও অন্য কোন কাজের জন্য কর না দেওয়ার। অথচ সার্বজনীন কল্যাণের জন্য এ কাজগুলো ছিল অত্যাবশ্যক। আসলে, এ কাজগুলো তখন আর রক্তসম্বন্ধযুক্ত তিনটি গোষ্ঠী অনুযায়ী করা হচ্ছিল না, করা হচ্ছিল চারটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী অনুযায়ী। এই শেষ গোষ্ঠীটা তিনি নিজেই গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিটা গোষ্ঠীর জন্য তিনি একজন করে সৈনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেছিলেন। এদেরকে বলা হত ফাইলার্ক বা কমার্ক। এদের প্রত্যেককে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন

২। ডায়োনিসায়াস, iv, ১৫.

নিজেদের বসতবাড়ির কথা নথিভুক্ত করাতে।[১] মম্‌সেন বলেছেন, "এই চারটি করদ জেলার প্রত্যেকটিকে মূল সৈন্যবাহিনীর এক-চতুর্থাংশ সৈন্য যোগাতে হত তো বটেই, সেই সঙ্গেই প্রতিটা সামরিক উপ-বিভাগের এক-চতুর্থাংশও যোগাতে হত তাদের প্রত্যেককে। প্রতিটা অঞ্চল এবং প্রতিটা সেঞ্চুরি থেকে সমান অনুপাতে সৈন্য নেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থাটা চালু করা হয়েছিল। গোত্রীয় এবং এলাকাগত যাবতীয় পার্থক্য দূর করে সকলকে একটা জন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা, এবং বিশেষত সামরিক মনোভাবের মধ্যে যে শক্তিশালী সমতামূলক প্রভাবটা থাকে, তার সাহায্যে 'মিটিওকি' ও স্বশাসিত নগরের নাগরিকদের একই জনসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করাটাই ছিল এর উদ্দেশ্য।"[২]

রোমান সরকারের অধীন চারপাশের অঞ্চলগুলোকেও একইভাবে বিভিন্ন নগর হিসেবে (tribus rusticae) সংগঠিত করা হয়। কেউ কেউ বলেছেন এ-রকম নগর ছিল ছাব্বিশটা, আবার কেউ বলেছেন একত্রিশটা। কারুর মতে চারটি নগর-বিভাগসহ মোট নগরের সংখ্যা ছিল একত্রিশ, আবার কারুর মতে পঁয়ত্রিশ।[৩] মোট সংখ্যাটাকে কেউই পঁয়ত্রিশের বেশি বলে উল্লেখ করেন নি। সরকারের কার্য-পরিচালনায় অংশ-গ্রহণের ব্যাপারে এই নগরগুলো কিন্তু কোন একাত্ম রূপ নিতে পারে নি।

সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের সংবিধানের আওতায় শাসনব্যবস্থাটা যে রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছিল, প্রজাতন্ত্রের আমলেও তা ঠিক সেই রূপেই বিদ্যমান ছিল। পূর্বতন সেনাপতিদের জায়গায় অভিষিক্ত হয়েছিল প্রধান শাসকদ্বয়। এথেনীয় শাসনব্যবস্থা কিম্বা আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সরকার গড়ে ওঠে ভূখণ্ড বা অঞ্চলের ভিত্তিতে। কিন্তু রোমানদের ক্ষেত্রে ঠিক তা ঘটে নি। রোমানদের সংগঠনের প্রাথমিক একক ছিল শহর বা নগর-বিভাগ, তার ওপরে অঞ্চল বা মহকুমা, আর সবার ওপরে রাষ্ট্র। সমগ্র ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এই প্রত্যেকটা ধাপই শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সবার ওপরে থাকত কেন্দ্রীয় সরকার। ভূখণ্ড বা অঞ্চল নয়, এর প্রধান ভিত্তি ছিল সম্পত্তি। সম্পত্তিই ছিল তাদের শাসনব্যবস্থার নির্ধারক উপাদান। সবথেকে বেশি সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীগুলোর হাতে পরিচালনা-ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ঘটনা থেকেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। তা সত্ত্বেও এর একটা অঞ্চলগত বনিয়াদও ছিল, কেননা নাগরিকত্বের ব্যাপারে এবং আর্থিক ও সামরিক ব্যাপারে এই ব্যবস্থা আঞ্চলিক বিভাগগুলোকে স্বীকৃতি দিত এবং সেগুলোকে কাজে লাগাত। এ-সব ব্যাপারে নাগরিকদের আঞ্চলিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ

১। ডায়োনিসায়াস, IV, ১৪.

২। "হিস্ট্রি অফ রোম", ১ম পরিচ্ছেদ, স্ক্রিবনারের সংস্করণ, i, ১৩৬.

৩। ডায়োনিসায়াস, iv, ১৫ ; নিয়েবুর নিম্নলিখিত ষোলটা নগরের নাম উল্লেখ করেছেন : এমিলিয়ান, ক্যামিলিয়ান, ক্রুয়েনতিয়ান, কর্নেলিয়ান, ফ্যাবিয়ান, গ্যালেরিয়ান, হোরেশিয়ান, লেমোনিয়ান, মেনেনিয়ান, প্যাপেরিয়ান, রোমুলিয়ান, সার্জিয়ান, ভেচুরিয়ান, ক্লডিয়ান।—"হিস্ট্রি অফ রোম", i, ৩২০, টীকা।

রাখত রাষ্ট্র।

গোত্রভিত্তিক সমাজ থেকে রোমানরা এসে পেঁছিল দ্বিতীয় ধরনের শাসনব্যবস্থায়, যার ভিত্তি ছিল ভূখণ্ড এবং সম্পত্তি। গোত্রীয় সংগঠন ও বর্বরতার যুগ পেরিয়ে তারা পা রাখল সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে। ঐ সময় সরকারের প্রধান কাজ হয়ে উঠল সম্পত্তি রক্ষা করা আর নতুন নতুন সম্পত্তি সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গেই দেখা দিল দূর-দূরান্তের গোষ্ঠী ও জাতিগুলোকে পদানত করার তাগিদও। প্রতিষ্ঠানের এই পরিবর্তন গোত্রীয় সমাজের বদলে সৃষ্টি করল রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা। এই পরিবর্তন আসলে ছিল ভূখণ্ড ও সম্পত্তি নামক নতুন উপাদান দুটোর সূত্রপাতেরই দ্যোতক। তার আগে পর্যন্ত শাসনব্যবস্থার কাজে সম্পত্তি বড়জোর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারত, কিন্তু এখন তা শাসনব্যবস্থার একটা শক্তিতে পরিণত হল। নগর-বিভাগ আর গ্রামীণ অঞ্চলগুলো যদি আঞ্চলিক স্বশাসনের পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে গড়ে উঠত এবং যদি শ্রেণী নির্বিশেষে এইসব অঞ্চলের লোকেরা মিলে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের নির্বাচিত করার অধিকার পেত, তাহলে এথেন্সের মত রোমের এই শাসনব্যবস্থাটাও গণতান্ত্রিক সরকার হয়ে উঠতে পারত। কারণ সেক্ষেত্রে ঐ-সব আঞ্চলিক সরকারগুলো তাদের পছন্দমত গড়ে তুলতে পারত রাষ্ট্রকে। একদিকে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যদের বংশধররা উত্তরাধিকার সূত্রে উচ্চমর্যাদা পেত, আর অন্যদিকে গণ-পরিষদে ভোটাধিকারের ভিত্তি ছিল সম্পত্তির পরিমাণ—এ দুয়ে মিলে ব্যবস্থাটাকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কিছুটা বিরোধী ব্যবস্থায় পরিণত করেছিল। তৈরি হয়েছিল একটা মিশ্র সরকার—আধা-অভিজাততান্ত্রিক আধা-গণতান্ত্রিক। আইনের সাহায্যে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে এবং বিনা প্রয়োজনে নাগরিকদের যে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল, সেই দুটো শ্রেণীর মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতা জিইয়ে রাখার জন্য এই সুপরিকল্পিত পদক্ষেপটা নেওয়া হয়েছিল। আমার মতে, সার্ভি-য়াসের সংবিধান মানুষকে প্রতারিত করেছিল এবং তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল এমন একটা শাসনব্যবস্থা, যার সম্ভাব্য পরিণতির কথা পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারলে মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করতই। আগের যুগে গোত্রের গণতান্ত্রিক নীতিগুলো (বাইরের লোককে কোন অধিকার না দিলেও) যে তাদের মধ্যে পুরোপুরিই পালিত হত—তার সুনিশ্চিত প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। এই স্বাধীন মনোভাব এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রমাণগুলো খুব জোরদার। আমরা অন্যত্র বলে এসেছি যে রাজতন্ত্রের সঙ্গে গোত্রীয় প্রতিষ্ঠান খাপ খায় না। সদ্য উল্লিখিত প্রমাণগুলো এই সিদ্ধান্তকে একেবারে অকাট্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সামগ্রিক বিচারে রোমানদের শাসনব্যবস্থাটা ছিল একটু ব্যতিক্রমী ধরনের। রোমান শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল পৌরসঙ্ঘ, আর এটাই ছিল ঐ ব্যবস্থার অভিনব চরিত্রসম্পন্ন হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ। জনগণ প্রাথমিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল একটা সৈন্যবাহিনীতে, আর তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একটা সামরিক মেজাজ। এর থেকে যে আসঞ্জনীশক্তিটা জন্ম নিয়েছিল, সেটাই প্রজাতন্ত্রকে এবং পরবর্তীকালে রোমান সাম্রাজ্যকে একত্রিত করে রেখেছিল। কী কী বৈশিষ্ট্য ছিল রোমান শাসনব্যবস্থার? একটা নির্বাচিত ব্যবস্থাপক-সভা যার সদস্যরা আজীবন

ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকত এবং যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিল; তাদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধররা তাদের ব্যক্তিগত পদমর্যাদার অধিকারী হত; রাজধানীর প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটা ক্রমবিভক্ত নির্বাচিত বিচারকমণ্ডলী; সম্পত্তিভিত্তিক শ্রেণীগুলোর একটা গণ-পরিষদ, যার ভোটাধিকার ছিল অসম কিন্তু যে-কোন আইনকে অনুমোদন বা বাতিল করার ক্ষমতা যার হাতে ছিল; আর ছিল একটা বড়সড় সামরিক সংগঠন। মানবজাতির ইতিহাসে ঠিক এ-রকম আর কোন শাসন-ব্যবস্থার কথা জানা যায় না। এই ব্যবস্থাটা ছিল কৃত্রিম, অযৌক্তিক, এবং তা এগিয়ে চলেছিল এক অস্বাভাবিকতার দিকে। কিন্তু তার নিজস্ব সামরিক দক্ষতা এবং বিভিন্ন ব্যাপারকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার কাজে রোমানদের আশ্চর্য ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে সে বিপুল সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে যে জোড়াতালিটা ছিল, সেটা সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোই সৃষ্টি করেছিল সুকৌশলে। এদের উদ্দেশ্যে ছিল মূল ক্ষমতাটাই হস্তগত করা। আপাতভাবে অবশ্য এরা সকলকার অধিকার ও স্বার্থকে সমান মর্যাদা দেওয়ার ভান করে চলত।

নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ামাত্রই কিন্তু পুরনো ব্যবস্থাটা অন্তর্হিত হয়ে যায় নি। ব্যবস্থাপক-সভা আর সেনাপতির কার্যকলাপ আগের মতই রয়ে গিয়েছিল। তবে, গোত্রের স্থান অধিকার করেছিল সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলো আর গোত্র-পরিষদের স্থান অধিকার করেছিল শ্রেণীগুলোর পরিষদ। এই পরিবর্তনগুলো বৈপ্লবিক চরিত্রসম্পন্ন হলেও এগুলো মূলত ঐ-সব বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এগুলো ঘটানোর জন্য কোনরকম সংঘাত বা বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় নি। পুরনো যে পরিষদ (কমিশিয়া কিউরিয়াটা) দীর্ঘকাল ধরে গোত্র, কিউরিয়া এবং রক্তসম্বন্ধযুক্ত গোষ্ঠীগুলোর সংগঠনকে সজীব করে রেখেছিল, সেই পরিষদের হাতে কিছু ক্ষমতা তখনও রয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উচ্চতর পদাধিকারসম্পন্ন বিচারপতিদের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর এই পরিষদই তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করত। পরবর্তীকালে অবশ্য এটা নিছকই একটা মামুলী প্রথায় পরিণত হয়েছিল। কিছু পুরোহিতকে তাদের পদে অভিষিক্ত করত এই পরিষদ এবং কিউরিয়ার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোও পরিচালনা করত। এই অবস্থাটা টিকে ছিল কার্থেজের প্রথম যুদ্ধের সময় পর্যন্ত। তারপর থেকেই কমিশিয়া কিউরিয়াটার গুরুত্ব কমে যেতে থাকে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল আঁধারে। পরিষদ আর কিউরিয়া, দুটো সংগঠনই ঠিক বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, বরং অন্য সংগঠন এসে এদের স্থান দখল করে নিয়েছিল এবং পরিষদ আর কিউরিয়া শুকিয়ে মারা গিয়েছিল। কিন্তু গোত্র টিকে থাকতে পেরেছিল একেবারে রোমান সাম্রাজ্যের আমল পর্যন্ত। অবশ্য গোত্রও কোন সংগঠন হিসেবে টিকে থাকতে পারে নি, কারণ সংগঠন হিসেবে তার অস্তিত্বও কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আসলে গোত্র টিকে ছিল একটা বংশপরিচয় আর বংশধারা হিসেবে। এইভাবে, গোত্রীয় সমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণটা সাধিত হয়েছিল ধাপে ধাপে অথচ কার্যকরীভাবে। স্মরণাতীত-কাল থেকে শাসন-ব্যবস্থার যে ধাঁচটা চালু ছিল, তার জায়গায় রোমানরা স্থাপন করতে পেরেছিল

মানব-ইতিহাসের দ্বিতীয় ধাঁচের শাসনব্যবস্থাটা।

আর্য গোষ্ঠীগুলো যখন পৃথক পৃথক ভাবে ছড়িয়ে ছিল, তখন থেকেই গোত্রের অস্তিত্ব ছিল সমাজে। সেই আদি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে এই গোত্র এসে পৌঁছেছিল লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও। অবশেষে, রোমানদের মধ্যে সভ্য যুগের আগমনের পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য সরে দাঁড়াতে হল গোত্রকে। ঐ সবকটা ঐতিহাসিক যুগে সমাজের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল গোত্রের। অতঃপর এল সভ্যতা। প্রমাণিত হল—সভ্যতার বিভিন্ন দিককে পরিচালনা করতে গোত্র অক্ষম। মানবজাতির অগ্রসর অংশকে বন্যতার দশা থেকে বর্বরতায় এবং বর্বরতার পর্যায়গুলো পার করে সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার মত একটা সাংগঠনিক রূপ গড়ে তোলার জন্য মানাবজাতি তার সেই বন্য পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণী। ঐ সংগঠন অর্থাৎ গোত্র বিদ্যমান থাকা-কালীনই একটা রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান অর্জন করেছিল মানুষ। মানুষের প্রগতির ইতিহাসে গোত্র একটা অদ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। প্রভাব, সাফল্য এবং ইতিহাসের বিচারে গোত্রের থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন সংগঠনের খবর মানুষের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। সভ্য মানুষের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে শাসনব্যবস্থার ধাঁচ হিসেবে গোত্র ছিল বেমানান। তবে সেই-সঙ্গেই বলা দরকার যে এই গোত্রের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল আধুনিক সুসভ্য রাষ্ট্রগুলোর প্রধান প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভ্রূণ। যেমন, প্রাচীন আমলের সেই প্রধানদের পরিষদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল আধুনিক ব্যবস্থাপক-সভা, আর প্রাচীন আমলের গণ-পরিষদের মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছিল আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদ। এই দুয়ের সম্মিলনেই গড়ে উঠেছিল আধুনিক বিধানমণ্ডলী। প্রাচীন আমলের সামরিক সর্বাধিনায়ক পদেরই উন্নত রূপ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিক কালের প্রধান বিচারপতির পদ। সামন্ততান্ত্রিক রাজাই হোন বা সাংবিধানিক রাজাই হোন, সম্রাটই হোন অথবা রাষ্ট্রপতিই হোন—শেষোক্ত পদগুলো আসলে প্রথমোক্ত পদ গুলোরই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক পরিণতি মাত্র। আর প্রাচীন 'কাস্টস্ উর্বিস্' পদটাই চক্রাকার বিকাশের পথ বেয়ে এসে পরিণত হয়েছিল রোমানদের বিচারক পদে এবং আধুনিক বিচারপতির পদে। সকলকার সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিসমূহ—এগুলোও গোত্রের কাছ থেকেই পাওয়া। যখন প্রচুর পরিমাণ সম্পত্তি সৃষ্টি হল এবং সমাজে তার প্রভাব ও ছাপ পড়তে শুরু করল, তখনই দেখা দিল দাসপ্রথা। এই প্রথাটা যে ঐ সমস্ত নীতিকে লঙ্ঘন করেই মাথা তুলতে পেরেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা টিকে থাকতে পেরেছিল একটা স্বার্থপর ও প্রতারণামূলক যুক্তির ওপর ভর করে। যে ব্যক্তিকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হচ্ছে, তার সঙ্গে আমাদের কোনরকম রক্তের সম্পর্ক নেই এবং সে একজন বন্দী শত্রু—এটাই ছিল তাদের যুক্তি। সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ধীরে ধীরে মাথা-চাড়া দিল অভিজাততন্ত্র। বিশেষ কতকগুলো সুবিধেভোগী শ্রেণী গড়ে তোলার চেষ্টা করল এরা। সভ্যতার এই তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে সমাজ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সম্পত্তির দ্বারাই। সম্পত্তি মানবজাতিকে দিয়েছে স্বৈরতন্ত্র, সাম্রাজ্য-বাদ, রাজতন্ত্র, সুবিধেভোগী শ্রেণী, এবং অবশেষে নিয়ে এসেছে প্রতিনিধিত্বমূলক

গণতন্ত্র। সুসভ্য জাতিগুলোর যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে সে পরিণত করেছে মূলত সম্পত্তি বাড়ানোর কর্মপ্রচেষ্টায়। কিন্তু মানুষ যখন সম্পত্তির মূলে অধিকার সম্বন্ধে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পত্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকার সম্বন্ধে একটা উন্নত উপলব্ধিতে পেঁছবে, তখন এই অবস্থার একটা পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা যায়। সেই ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের চরিত্রটা ঠিক কেমন হবে, তা এখনই বলা যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে গণতন্ত্র, যা একসময় সারা পৃথিবীতেই প্রাথমিক রূপে দেখা দিয়েছিল এবং বহু সুসভ্য দেশে যা পদদলিত হয়েছে, তা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবী জুড়ে এবং পরিণত হবে সর্বোচ্চ শক্তিতে।

একজন আমেরিকাবাসী, গণতন্ত্রের নীতিগুলো যিনি আয়ত্ত করেছেন এবং মানবজাতির স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে স্বীকৃতিদানকারী মহান ধারণাগুলোর উৎকর্ষতা এবং মহনীয়তা যাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তাঁরপক্ষে স্বশাসন ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠা-নের স্বপক্ষে মুক্তকণ্ঠে কথা বলাটা একান্তই স্বাভাবিক। সেইসঙ্গেই, সাম্রাজ্যবাদী, রাজতান্ত্রিক বা অন্য যে কোন ধরনের (যা তাঁর চাহিদা পূরণ করতে পারে) সরকারকে মেনে নেওয়া ও অনুমোদন করার আগে অন্যান্য প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার, অধিকার পাওয়ার স্বাধীনতাকেও স্বীকৃতি দিতে হবে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা থেকে পুরুষ-ধারায় পরিবর্তন

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে এবার আলোচনা শুরু করা যাক। প্রশ্নটা হল—গ্রীক এবং লাতিন গোত্রগুলোতে প্রাচীনকালে যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় করা হত, তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে কি না? তত্ত্বগতভাবে বললে বলা যায়, সুপ্রাচীনকালে এদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে এই প্রথা চালু থাকতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্নটাকে শুধুমাত্র তত্ত্বের ওপর দাঁড় করাতে আমরা বাধ্য নই। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারা চালু করতে হলে গোত্রের সদস্যপদের একটা প্রায় সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটানো দরকার ছিল। কাজেই, কোন্ পদ্ধতিতে সে পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকতে পারে, সেটা অবশ্যই খুঁজে দেখা দরকার। তাছাড়াও, সমাজের ক্রম অগ্রগতির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল (অর্থাৎ যে অবস্থায় বংশধারা নির্ণয়ের এই ধারাটি গড়ে উঠেছিল), সেই অবস্থার মধ্যে এ-রকম একটা পরিবর্তন ঘটানোর মত পর্যাপ্ত কার্যকারণ যে নিশ্চিত মাথা তুলেছিল—সম্ভবপর হলে সেটাও দেখানোর চেষ্টা করা উচিত। আর শেষত, প্রাচীনকালে বংশধারা যে স্ত্রীর-ধারা অনুসারেই নির্ধারিত হত, তার ব্যাপারে প্রাপ্ত প্রমাণগুলোও উপস্থাপিত করতে হবে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে প্রাচীনকালে গোত্র গঠিত হত একজন কল্পিত আদি-নারীর সন্তানসন্ততি আর তার মেয়েদের সন্তান এবং বংশপরম্পরায় তার বংশের মেয়েদের সন্তানদের নিয়ে। সেই আদি-নারীর ছেলেদের সন্তানরা এবং তার বংশের পুরুষদের সন্তানরা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত না। অন্যদিকে, পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গোত্র গড়ে উঠত কোন এক কল্পিত আদি-পুরুষের সন্তানসন্ততি আর তার ছেলেদের সন্তান এবং বংশপরম্পরায় তার বংশের ছেলেদের সন্তানদের নিয়ে। তার মেয়েদের সন্তানরা এবং তার বংশের নারীদের সন্তানরা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত না। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে যারা গোত্রের সদস্য হতে পারত না, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তারাই হত গোত্রের সদস্য। আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যারা গোত্রের সদস্য হতে পারত না, প্রথম ক্ষেত্রে তারাই হত গোত্রের সদস্য। তাই প্রশ্ন ওঠে—গোত্রকে ভেঙে না দিয়ে স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

পরিবর্তনের কারণটা যদি সার্বজনীন, জরুরী এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে, তাহলে তার পদ্ধতিটা সরল ও স্বাভাবিক হতে বাধ্য। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই পরিবর্তনটা ঘটানো হয়ে থাকলে ধরেই নেওয়া যায় যে সেই সময় যারা গোত্রের সদস্য ছিল তারা সদস্য হিসেবেই থাকতে পেরেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ গোত্রের পুরুষ-সদস্যদের সন্তানরাই শুধু গোত্রের সদস্য হওয়ার ও গোত্রীয় নাম ধারণ করার অধিকার পেয়েছিল। গোত্রের নারী-

সদস্যাদের সন্তানরা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। সেই সময় গোত্রের সদস্যদের মধ্যে যে জ্ঞাতিত্ব বা সম্পর্ক ছিল, এই পরিবর্তনের ফলে তা ভেঙে যায়নি বা কোন অদলবদলও ঘটেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে একটা জিনিস ঘটেছিল—আগে যারা গোত্র থেকে বাদ পড়ত, এখন তারাই হল গোত্রের সদস্য ; আর আগে যারা গোত্রের সদস্য হত, এখন তারা পড়ল বাদ। এমনিতে ব্যাপারটাকে খুবই জটিল বলে মনে হয়, কিন্তু উপযুক্ত কারণ থাকার ফলে কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল এবং কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণও হয়েছিল। আমেরিকান আদিবাসীদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বংশধারা নির্ণয়ের স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হতে দেখা গেছে। যেমন, ওজিবোয়ারা এখন পুরুষ-ধারা অনুসারেই বংশধারা নির্ণয় করে থাকে। তাদের সগোত্রীয় দেলাওয়ার আর মোহেগানরা কিন্তু এখনও স্ত্রী-ধারাই অনুসরণ করে। সমগ্র অ্যালগনকিন কুলের মধ্যে আদতে যে স্ত্রী-ধারানুসারেই বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু ছিল—তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

যেহেতু স্ত্রী-ধারা অনুসরণ করাটাই প্রাচীন রীতি ছিল, এবং যেহেতু প্রাচীনকালের অবস্থার পক্ষে পুরুষ-ধারার থেকে স্ত্রীধারাই ছিল বেশি সঙ্গতিপূর্ণ, সেহেতু অনুমান করা হয় যে গ্রীক ও লাতিন গোত্রগুলোর মধ্যেও চালু ছিল এই রীতিটা। তাছাড়া, কোন সংগঠনের প্রাচীন রূপটা আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত হওয়ার পর ঐ সংগঠনের পরবর্তীকালের উন্নততর রূপের মধ্যে তার ভ্রূণরূপ খোঁজাটা অর্থহীন।

স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হওয়ার ঘটনাটা নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার বহু আগে ঘটেছিল। এদের বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না, যদিও এদের শিল্প, প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন আর ভাষার উন্নতির মধ্যে তার কিছু ছাপ রয়ে গেছে। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে এসে আমরা সন্ধান পাই কিছু প্রথা আর হোমারের রচনার। এগুলো থেকে তাদের অভিজ্ঞতা আর অগ্রগতির একটা ছবি ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। তাদের বিভিন্ন রীতি-প্রথাকে বিচার করে দেখলে মনে হয়, বর্বর যুগের উচ্চ প্রর্যায়ের শুরুতেও স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের ব্যাপারটা তাদের মধ্যে থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি, অন্তত পেলাসজিয়ান আর গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তো নয়ই।

গ্রীক আর লাতিন গোত্রগুলো যখন স্ত্রী-ধারা অনুসারে নিজেদের বংশধারা নির্ণয় করত, তখন তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় ছিলঃ (১) গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল ; অর্থাৎ সন্তানরা বাবার গোত্রের সদস্য না হয়ে অন্য গোত্রের সদস্য হত। (২) গোত্রের মধ্যে সম্পত্তি এবং প্রধানের পদটা ছিল উত্তরাধিকার-মূলক ; ফলে, সন্তানরা তাদের বাবার সম্পত্তি বা বাবার পদ পেতে পারত না। এইভাবেই চলছিল। এক সময় দেখা দিল পরিবর্তনের সার্বজনীন ইচ্ছা ও প্রয়োজনীয়তা। বাবার গোত্র থেকে সন্তানদের বাদ পড়া বন্ধ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল তারা।

এ ব্যাপারে স্বাভাবিক পথটাই ছিল বংশধারা নির্ণয়ের স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারার প্রবর্তন করা। এই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য দরকার ছিল শুধু পর্যাপ্ত কারণ। তারও অভাব ছিল না। পশুদের পোষ মানানো শুরু হওয়ার পর তা জীবনধারণের

একটা উপায় হয়ে উঠল, সেইসঙ্গেই এইসব গৃহপালিত পশুরা পরিণত হল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। কৃষিকার্যের ফল হিসেবে জমি আর বাড়ির ওপরেও সৃষ্টি হল ব্যক্তিগত মালিকানা। আবার এ-সবের ফলে গোত্রীয় উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ জন্ম নেওয়াটা ছিল একান্তই স্বাভাবিক। কারণ গোত্রীয় উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী কোন সম্পত্তির মালিকের সন্তানরা তার সম্পত্তি পেত না (অথচ পিতৃত্ব ক্রমশই নিশ্চিত হয়ে উঠছিল), পেত তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা। বাবার সম্পত্তি যাতে সন্তানরা পেতে পারে, তারজন্য এক নতুন নিয়ম চালু করার তাগিদটাকেই এই পরিবর্তন ঘটানোর পর্যাপ্ত কারণ বলে ধরে নেওয়া যায়। সম্পত্তির পরিমাণ যতই বেড়ে উঠছিল, যতই তা স্থায়ী রূপ নিচ্ছিল এবং যতই তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হচ্ছিল, ততই বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হওয়াটা নিশ্চিত হয়ে উঠছিল। এই পরিবর্তনের ফলে গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারের ব্যাপারটার কোন রদবদল হল না, শুধু সন্তানরা বাবার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হল এবং বাবার সম্পত্তিতে সগোত্রীয় অন্যান্য জ্ঞাতিদের থেকে তাদের অধিকার বেশি রইল। খুব সম্ভবত প্রথম দিকে কিছুদিন সন্তানরা নিজেদের বাবার সম্পত্তি অন্যান্য জ্ঞাতিদের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ভোগ করত। কিন্তু যে নিয়ম অনুযায়ী গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের বাতিল করে শুধু জ্ঞাতিরাই পেত সম্পত্তির ভাগ, সেই নিয়মেরই সম্প্রসারণ ঘটিয়ে একদিন বাকি জ্ঞাতিদেরও হঠিয়ে দিল সন্তানরা, এবং বাবার সম্পত্তির ওপর কায়েম হল তাদের একচ্ছত্র উত্তরাধিকার। তাছাড়া, বাবা যে পদে আসীন ছিলেন, সেই পদের উত্তরাধিকারী হিসেবেও বিবেচিত হতে লাগল ছেলেদের নাম।

সোলোনের আমলে বা তার অল্প কিছুদিন পরে এথেনীয় গোত্রগুলোর উত্তরাধিকারের নীতি এরকম চেহারাই নিয়েছিল। বাবার সম্পত্তি সমানভাগে পেত ছেলেরা। শুধু শর্ত থাকত—বোনেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে আর তাদের বিবাহের সময় তাদেরকে দিতে হবে সম্পত্তির ভাগ। কোন ব্যক্তির ছেলে না থাকলে তার মেয়েদের মধ্যেই সম্পত্তিটা সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া হত। নিঃসন্তান ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা, আর সেরকম কোন জ্ঞাতি না থাকলে তার গোত্রের সদস্যরা। রোমানদের টুয়েল্‌ভ্ টেব্‌ল্‌-এর নিয়মটাও ঠিক এরকমই ছিল।

খুব সম্ভবত বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যখন পুরুষ-ধারা চালু হয়, তখন থেকে অথবা তার আগে থেকেই গোত্রের ক্ষেত্রে পশুদের নাম বাতিল করে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা নিজস্বতাও সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, আর সম্পতি বেড়ে চলা ও তার ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হওয়ার ফলে কোন প্রাচীন বীরের নামে গোত্রের নামকরণ করার রীতি চালু হচ্ছিল। বিভাজন প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে মাঝে-মাঝেই নতুন নতুন গোত্র সৃষ্টি হত এবং পুরনো কিছু গোত্র বিলুপ্ত হয়ে যেত, তা সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-কোন গোত্রের বংশধারার কয়েক হাজার বছর না হলেও অন্তত কয়েকশ বছরের ইতিহাস থাকতই। পশু-নামের বদলে গোত্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম ব্যবহার

শুরু হওয়ার পর থেকে সেই কল্পিত আদিপুরুষের নামও দীর্ঘকাল অন্তর অন্তর পরিবর্তিত হত। গোত্রের ইতিহাসে খুব বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম ব্যবহৃত হত প্রথম জনের বদলে। আসলে ঐ প্রথম জনের কথা যখন মানুষ প্রায় ভুলে যেত, যখন তার নাম হারিয়ে যেত অতীতের ধূসরিমায়—তখনই তার বদলে ব্যবহার করা হত অন্য আর একজনের নাম। অধিকতর বিখ্যাত গ্রীক গোত্রগুলো যে চমৎকারভাবে নামের এ-রকম পরিবর্তন ঘটাত, তা একটা বিশেষ ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়ঃ গোত্রপিতার মায়ের নামটা তারা বজায় রাখত এবং বলত যে বিশেষ কোন দেবতার সঙ্গে তাঁর মিলনের ফলেই জন্ম হয়েছিল ঐ গোত্রপিতার। যেমন, এথেন্সের ইউমল-পিডাদের গোত্রপিতার সম্বন্ধে বলা হত যে তিনি ছিলেন নেপচুন আর চিওনের সন্তান। কিন্তু নেপচুনের নাম যখন থেকে শোনা যায়, তার অনেক আগেই এমনকি গ্রীক গোত্রগুলোরও অস্তিত্ব ছিল।

মূল প্রশ্নে ফেরা যাক। গ্রীক ও লাতিন গোত্রগুলোতে প্রাচীনকালে যে স্ত্রী-ধারা অনু-সারেই বংশধারা নির্ণয় করা হত, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও সিদ্ধান্তটা কিন্তু বাতিল হয়ে যায় না। তবে, গ্রীকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কোন কোন গোষ্ঠীতে স্ত্রী-ধারার চলন ছিল এবং গ্রীকদের কয়েকটা গোষ্ঠীতেও এর ছাপ দেখা গেছে।

অনুসন্ধিৎসু এবং পর্যবেক্ষণপটু হেরোডোটাস একটা বিশেষ জাতির সন্ধান পেয়ে-ছিলেন, যাদের মধ্যে তাঁর আমলে (৪৪০ খৃস্টপূর্বাব্দ) স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের রীতি চালু ছিল। এই জাতিটার নাম লাইসিয়ান, যারা বংশগত বিচারে পেলাসজিয়ান কিন্তু সম্বন্ধের বিচারে ছিল গ্রীক। হেরোডোটাস প্রথমে বলেছেন যে এই লাইসিয়ানদের উদ্ভব ঘটেছিল ক্রীট থেকে, অতঃপর সার্পেডনের নেতৃত্বে তাদের লাইসিয়ায় চলে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু খুঁটিনাটি তথ্য জানিয়ে তিনি লিখেছেনঃ "এদের প্রথাগুলো অংশত ক্রীটীয় এবং অংশত ক্যারিয়ান। তবে এদের মধ্যে এমন একটা প্রথা চালু আছে, যা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। কোন লাইসিয়ানকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে নিজের নাম বলে, নিজের মায়ের নাম বলে এবং এইভাবে স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী দিদিমার নাম, তাঁর মায়ের নাম ইত্যাদি বলে যায়। তাছাড়া, কোন স্বাধীন নারী কোন ক্রীতদাসকে বিবাহ করলে তাদের সন্তানরা স্বাধীন নাগরিক হিসেবেই গণ্য হয়। কিন্তু কোন স্বাধীন পুরুষ কোন বিদেশী নারীকে বিবাহ করলে বা কোন রক্ষিতার সঙ্গে সহবাস করলে (এমনকি সেই পুরুষটি জাতির সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও) তাদের সন্তানরা নাগরিকের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।"[১] এ থেকে অনুমান করা যায় যে লাইসিয়ানরা গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল, গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ এবং সন্তানরা তাদের মায়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত। গোত্রের প্রাচীন রূপটা কেমন ছিল, তার একটা পরিষ্কার চিত্র পারছি আমরা, আর সেই সঙ্গেই জানতে পারছি কোন লাইসিয়ান পুরুষের সঙ্গে কোন বিদেশী নারীর এবং কোন লাইসিয়ান নারীর সঙ্গে কোন ক্রীত-

১। রলিনসন-এর "হেরোডোটাস", i, ১৭৩.

দাসের বিবাহের ফল কী হত।[১] ক্রীটের আদিবাসীরা ছিল পেলাসজিয়ান, গ্রীক এবং সেমিটিক গোষ্ঠীর মানুষ। এক এক গোষ্ঠীর মানুষ এক একটা আলাদা আলাদা এলাকায় বসবাস করত। সার্পেডনের ভাই মিনোসকেই সাধারণত ক্রীটের পেলাসজিয়ানদের আদি পুরুষ বলে মনে করা হয়। কিন্তু লাইসিয়ানরা হেরোডোটাসের আমলের আগেই পুরোপুরি গ্রীক হয়ে উঠেছিল। এশিয়াটিক গ্রীকদের মধ্যে অগ্রগতির বিচারে এদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। পৌরাণিক যুগে তারা লাইসিয়ায় চলে যাওয়ার আগে তাদের পূর্বপুরুষরা ক্রীট দ্বীপে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করত। এই ঘটনাটা থেকে হয়ত অত দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের রীতি চালু থাকার কারণটা বোঝা যেতে পারে।

এট্রুস্কানদের মধ্যেও বংশধারা নির্ণয়ের এই রীতি চালু ছিল। ক্র্যামার লিখেছেন, "এট্রুস্কানদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো থেকে আমরা তাদের যে দুটো নিজস্ব প্রথার কথা জানতে পারি, সেই প্রথা দুটো এশিয়া মাইনরের লাইসিয়ান আর কনিয়ানদের মধ্যেও লক্ষ্য করেছিলেন হেরোডোটাস। এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। প্রথম প্রথাটা হল—নিজেদের পরিচয় এবং পরিবার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এট্রুস্কানরা মায়ের নামই করে থাকে, বাবার নাম নয়। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে—বিভিন্ন ভোজসভা ও উৎসবে তাদের স্ত্রীরাও যোগ দিতে পারে।"[২]

লাইসিয়ান, এট্রুস্কান ও ক্রীটানদের মধ্যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় প্রসঙ্গে কুর্টিয়াস লিখেছেন: "এই রীতিটাকে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর নিদর্শন হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। আসলে সমাজের আদিম অবস্থাই জন্ম দিয়েছিল এই রীতির। তখনও সমাজে একবিবাহপ্রথা ঠিকমত চালু হয়নি। সন্তানের পিতৃত্ব সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যেত না। তাই দেখা যায়, লাইসিয়ানরা যতটুকু এলাকায় বসবাস করত, তার বাইরেও এই রীতির চলন ছিল। আজও ভারতবর্ষে এর অস্তিত্ব আছে। প্রাচীনকালের ঈজিপ্সিয়ানদের মধ্যেও এটা চালু ছিল। সাঙ্কোনিয়াথন এই রীতির কথা উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১৬, ওরেল), চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এর টিকে থাকার কারণগুলো। প্রাচ্যজগতের বাইরে এর দেখা মেলে এট্রুস্কানদের মধ্যে, ক্রীটানদের মধ্যে। লাইসিয়ানদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং পিতৃভূমিকে এরা মাতৃভূমি বলে উল্লেখ করত। এথেনীয়দের মধ্যেও এই রীতি চালু ছিল। এ ব্যাপারে

১। সেনেকা-ইরোকোয়াদের কোন পুরুষ কোন বিদেশী নারীকে বিবাহ করলে তাদের সন্তানরাও বিদেশী হিসেবেই বিবেচিত হয়। কিন্তু সেনেকা-ইরোকোয়াদের কোন নারী কোন বিদেশী বা ওনোনডাগা পুরুষকে বিবাহ করলে তাদের সন্তানরা সেনেকা-ইরোকোয়া হিসেবেই বিবেচিত হয়, এবং সেই সন্তানরা তাদের মায়ের গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। সন্তানদের বাবা যে-ই হোক না কেন, তারা মায়ের জাতি ও গোত্রেরই সদস্য হয়ে থাকে।

২। "ডেসক্রিপশন অফ এনসিয়েন্ট ইতালি", i, ১৫৩ "ল্যান্জি"-কে উদ্ধৃত করে, ii, ৩১৪.

বাখোফেন প্রমুখের রচনা থেকে অনেক কথা জানা যায়। কাজেই, হেরোডোটাস যদি মনে করে থাকেন যে এই রীতিটা শুধুমাত্র লাইসিয়ানদের মধ্যে চালু ছিল, তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে এই রীতিটা আসলে গ্রীসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য সমস্ত জাতির তুলনায় তাদের মধ্যেই সবথেকে বেশিদিন ধরে টিকে থাকতে পেরেছিল। লাইসিয়ানদের বিভিন্ন শিলালিপি ইত্যাদি থেকেও তার প্রমাণ মেলে। তাই এ-কথাটা সাধারণভাবে স্বীকার করেই নেওয়া যায় যে, মায়ের নাম ব্যবহার করাটা ছিল সমাজ-ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবনের একটা ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার স্মারকস্বরূপ বংশপরিচয় দেওয়ার একটা রীতি। মানুষের জীবনযাত্রা আরও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠার পর এ-রীতি সারা গ্রীসেই পরিত্যক্ত হয়। শুরু হয় বাবার সূত্রে সন্তানদের পরিচয় দেওয়ার রীতি। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই বিভিন্ন ধরনের রীতিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাখোফেনের যে বক্তৃতার কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে তিনি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।"[১]

বাখোফেন তাঁর এক বিপুল গবেষণায় লাইসিয়ান, ক্রীটান, এথেনিয়ান, লেমনিয়ান, ঈজিপ্সিয়ান, অর্কোমেনিয়ান, লোক্রিয়ান, লেসবিয়ান, মান্তিনিয়ান এবং এশিয়ার পূর্বপ্রান্তীয় জাতিগুলোর মধ্যেকার নারী-কর্তৃত্ব (মাতৃ-অধিকার) ও নারী-শাসনের (gyneocracy) নিদর্শনগুলো সংগ্রহ করেছেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২] প্রাচীন সমাজের অবস্থাটা এইভাবে পর্যালোচনা করা হলে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য প্রাচীন ধরনের গোত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়াটা একান্তই জরুরী। ঐ ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার মূল সূত্র নিহিত আছে প্রাচীন গোত্রের মধ্যেই। সেই সময় মা আর সন্তানরা একই গোত্রের মধ্যে থাকত। আর গোত্রের ভিত্তিতে যে যৌথ বাসস্থান-গুলো গড়ে উঠত, তাতে কতৃত্ব থাকত মায়ের গোত্রেরই। তখন সম্ভবত জোড়বাঁধা বিয়ে দেখা দিলেও পরিবারগুলোর মধ্যে পুরনো আমলের দাম্পত্যজীবনের ছাপ

১। "হিস্ট্রি অফ গ্রীস", স্কিবেনার অ্যাণ্ড আর্মস্ট্রং সম্পাদিত, ওয়ার্ডের অনুবাদ, i, ২৪, টীকা। যে এটিওক্রীট্সদের নেতা ছিলেন মিনোস, তারা নিঃসন্দেহেই পেলাস-জিয়ান ছিল। এরা ক্রীট দ্বীপপুঞ্জের পূর্বপ্রান্তে বসবাস শুরু করে। মিনোসের ভাই সার্পেডনের নেতৃত্বে দেশান্তরীরা লাইসিয়ায় গিয়ে পৌছোয়। এখানে তারা সোলিমি নামক একটা গোষ্ঠীকে হটিয়ে এলাকাটা অধিকার করে। এই সোলিমিরা খুব সম্ভব সেমিটিক গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। কিন্তু অন্যান্য অনেক পেলাসজিয়ান গোষ্ঠীর মতো লাইসিয়ানরাও হেরোডোটাসের আমলের আগেই গ্রীকদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। গ্রীক আর পেলাসজিয়ান গোষ্ঠীগুলো যে একই আদিগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত—এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এই ঘটনাটা বড় যুক্তি হিসেবে কাজ করে। হেরোডোটাসের আমলে জীবন-যাপনের কলাকৌশলের ব্যাপারে এরা ইউরোপীয় গ্রীকদের মতোই উন্নত হয়ে উঠেছিল (কুর্টিয়াস, i, ৯৩; গ্রোটে, i, ২২৪)। সম্ভবত তাদের পেলাসজিয়ান পূর্বপুরুষের কাছ থেকেই স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের রীতিটা গ্রহণ করেছিল তারা।

২। "Das Mutterrecht", স্টুটগার্ট, ১৮৬১.

তখনও রয়ে গিয়েছিল। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী আর তাদের সন্তানসন্ততি-বিশিষ্ট এই পরিবার স্বভাবতই তাদের জ্ঞাতি পরিবারগুলোর সঙ্গে একটা যৌথ বাসগৃহে বসবাস করতে চাইত। ঐসব বাসগৃহের মায়েরা আর তাদের সন্তানরা একই গোত্রের সদস্য ছিল, আর ঐ-সব সন্তানদের বাবারা ছিল অন্য গোত্রের লোক। সার্বজনীন জমি আর যৌথ কৃষিকাজের ফল হিসেবেই গড়ে উঠেছিল যৌথ বাসগৃহ এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ। আসলে, মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য স্ত্রী-ধারা অনুসারেই বংশধারা নির্ণয় করা দরকার ছিল। বড় বড় পরিবারে বাস করতে শুরু করল নারীরা। তাদের খাদ্য আসত যৌথ ভাণ্ডার থেকে। ঐ-সব যৌথ ভাণ্ডারে সংখ্যার বিচারে তাদের নিজেদের গোত্রের প্রচুর সদস্য থাকত। এইসবের ফল হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছিল মাতৃ-অধিকার আর মাতৃতন্ত্রের। ইতিহাস আর লোককথার খণ্ড খণ্ড অংশের সাহায্যে এই ব্যাপারের ইতিবৃত্ত খোঁজার চেষ্টা করেছেন বাখোফেন। স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারায় বংশধারা নির্ণয় শুরু হওয়া এবং একপতিপত্নীক পরিবারের সূত্রপাত ঘটার ফলে মেয়েদের অবস্থাটা যে কিছুটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল, তা আমি আগেই বলেছি। একপতিপত্নীক পরিবার সৃষ্টি হওয়ার ফলে যৌথ বাসগৃহ-গুলো অকেজো হয়ে গিয়েছিল, আর পুরোপুরি গোত্রভিত্তিক একটা সমাজব্যবস্থায় স্ত্রী এবং মায়েদের হতে হয়েছিল পৃথক পৃথক গৃহের বাসিন্দা। নিজের গোত্রীয় জ্ঞাতি-দের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তারা।[১]

বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায় শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এক-বিবাহপ্রথা সম্ভবত চালু হয় নি। ঐ সময়ের আগে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে, বিশেষত এথেনীয়দের মধ্যে, একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা চলছিল। এথেনীয়দের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাখোফেন লিখেছেন: "আমরা দেখেছি যে সেক্রপ্‌স্‌-এর আমলের আগে পর্যন্ত শিশুদের একজন মা থাকত বটে, কিন্তু তাদের বাবা হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করা যেত না। শুধু মায়ের পরিচয়টাই পেত তারা। কোন একজন পুরুষের সঙ্গে আবদ্ধ থাকত না নারীরা, ফলে তারা জন্ম দিত পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের। এই অবস্থার অবসান ঘটান সেক্রপ্‌স্‌ নারী-পুরুষের অবাধ মিলনের বদলে

১। ক্রীট দ্বীপপুঞ্জের লিকটোস নগরী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাখোফেন লিখেছেন, "এই নগরীটাকে একটা ল্যাসিডামোনিয়ান উপনিবেশ হিসেবেই দেখা হত এবং এথেনীয়দের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত বলেও মনে করা হত। উভয় ক্ষেত্রেই এই সম্পর্কটা নির্ধারিত হত মায়েদের দিক থেকে, কারণ এখানকার মায়েরাই শুধু স্পার্টান ছিল। তবে, এথেনীয়দের সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল সেইসব এথেনীয় নারীদের সূত্রে, যাদেরকে ব্রউরন শৈলান্তরীপ থেকে প্রলোভিত করে নিয়ে এসেছিলেন পেলাসজিয়ান টাইরেজিয়ানরা।"—"Das Mutterrecht", পরিচ্ছেদ ১৩, পৃঃ ৩১.

পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণীত হলে নারীদের দিকটা অলক্ষিতই থেকে যেত। কিন্তু স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণীত হলে ঔপনিবেশিকরা নিজেদের বংশপরিচয় দিত কেবলমাত্র নারীদের কথা উল্লেখ করেই।

তিনি চালু করেন একমাত্র বৈবাহিক মিলনের রীতি। এর ফলে সন্তানরা তাদের বাবা ও মা, উভয়ের পরিচয়ই জানতে পারে, এবং একপক্ষীয় (unilateres) পরিচয়ের বদলে লাভ করে দ্বিপক্ষীয় (bilateres) পরিচয়।"[১] নারীপুরুষের অবাধ মিলন বলতে এখানে যা বোঝানো হয়েছে, তাকে একটু শুধরে নেওয়া দরকার। কিছুটা পরবর্তী-কালের ঐ সময়ে জোড়বাঁধা পরিবারের উদ্ভব ঘটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, তবে পুরনো আমলের দলগত বিবাহের কিছু ছাপও তার মধ্যে থেকে যেতে বাধ্য। বাখোফেনের কথা থেকে বোঝা যায় যে, এথেনীয়রা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছনোর আগেই দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অবসান ঘটেছিল। পরবর্তী-কালে পরিবারের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমরা এই বিষয়টিকে খুঁটিয়ে যাচাই করার চেষ্টা করব।

ইতালির একশটা লোক্রিয়ান পরিবার সম্বন্ধে একটা চিত্তাকর্ষক মন্তব্য করেছেন পলিবায়াস। তিনি বলেছেন, "লোক্রিয়ানরা নিজেরাই আমাকে বলেছে যে তাদের বিভিন্ন প্রথার সঙ্গে আরিস্ততলের বিবরণের যতটা মিল আছে, তাইমেউসের বিবরণের সঙ্গে ততটা মিল নেই। এ-ব্যাপারে তারা নিম্নোক্ত প্রমাণগুলোর কথা উল্লেখ করেছিল। প্রথমত, প্রাচীনকালে তাদের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই ছিল কোন-না-কোন নারীর বংশধর, পুরুষের নয়। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলতে শুধু তাদেরকেই বোঝানো হত, যারা ছিল ঐ একশটা পরিবারের কোন-না-কোনটার বংশধর। লোক্রিয়ানরা দেশান্তরী হওয়ার আগে এই পরিবারগুলোই ছিল তাদের মধ্যে অভিজাত। দৈববাণীর নির্দেশমত এদের মধ্যে থেকেই একশজন কুমারীকে পাঠানো হয়েছিল ট্রয়ে।"[২] যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে এখানে যে সম্ভ্রান্ত পদটার কথা বলা হয়েছে, সেটা গোত্র-প্রধানের পদের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত ছিল। গোত্রের যে পরিবারের কোন একজন সদস্য এই পদটা লাভ করত, সেই গোটা পরিবারটাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মর্যাদার অধিকারী হত। এই অনুমানটা সঠিক হলে ধরে নেওয়া যায় যে ব্যক্তির পরিচয় এবং পদ—উভয় ক্ষেত্রেই বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে। প্রাচীনকালে প্রধান পদটা ছিল গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক এবং তার পুরুষ সদস্যদের মধ্যে মনোনয়নভিত্তিক। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা চালু থাকার ফলে পদটা বর্তাতো এক ভাইয়ের থেকে আর এক ভাইয়ের ওপর, মামার থেকে ভাগ্নের ওপর। প্রতিটা ক্ষেত্রে পদটা হস্তান্তরিত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে। নির্দিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ভর করত তার মায়ের গোত্রের ওপর। গোত্রের সঙ্গে সন্তানের যোগসূত্র গড়ে উঠত মায়ের সাহায্যেই। যে মৃত প্রধানের পদ সে লাভ করত, তার সঙ্গেও ঐ ব্যক্তির সম্পর্ক মায়ের মারফতই গড়ে উঠত। যেখানেই দেখা যায় যে পদ ও মর্যাদা হস্তান্তরিত হয় স্ত্রী-ধারা অনুসারে, সেখানেই স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু আছে বলে মেনে নেওয়া যায়।

গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রাচীনকালে যে স্ত্রী-ধারা অনুসারেই বংশধারা নির্ণীত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীনকালের কয়েকটা বিবাহের মধ্যে। যেমন, সালমনি-

১। "Das Matterrecht", পরিচ্ছেদ ৩৮, পৃঃ ৭৩.

২। "পলিবায়াস", xii, দ্বিতীয়টি থেকে নেওয়া, হ্যাম্পটনের অনুবাদ, iii, ২৪২.

উস ও ক্রেথেউস ছিল দুই আপন ভাই। এরা ছিল ঈওলাসের সন্তান। এই সালম-নিউস তার মেয়ে তাইরোর বিবাহ দেয় তার কাকা অর্থাৎ ক্রেথেউসের সঙ্গে। পুরুষ-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণীত হলে ক্রেথেউস আর তাইরো একই গোত্রের সদস্য হত, ফলে তাদের মধ্যে বিবাহ হওয়া সম্ভব হত না। কিন্তু স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণীত হলে তারা দুজন আলদা আলাদা গোত্রের সদস্য হত, ফলে তাদের মধ্যে কোনরকম গোত্রগত আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকত না। আর সেক্ষেত্রে তাদের বিবাহের জন্য গোত্রের কঠোর বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করারও কোন প্রয়োজন হত না। উল্লিখিত দুজন ব্যক্তিকে কাল্পনিক বা পৌরাণিক চরিত্র বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই, কেননা ঐ ঘটনার মধ্যে গোত্রীয় রীতিনীতিটা ফুটে উঠেছে অত্যন্ত যথাযথভাবে। এই বিবাহটাকে ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের প্রকল্পের সাহায্যেই। আর তা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়—সে-সময় তাদের মধ্যে এইভাবেই বংশধারা নির্ণীত হত, কিম্বা তখনও পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত না হয়ে যাওয়া প্রাচীন রীতিনীতিগুলো এরকম বিবাহকে সমর্থনই করত।

ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন বিবাহের মধ্যেও এবই চিত্র ফুটে ওঠে। পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু হলেও পুরনো রীতিটা তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। বিবাহের পাত্রপাত্রীদের গোত্রীয় বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেও এ-রকম বিবাহ ঘটত। সোলোনের আমলের পর কোন পুরুষ তার সৎ-বোনকে বিবাহ করতে পারত। অবশ্য এরা দুজন আলাদা আলাদা মায়ের সন্তান হলে তবেই বিবাহ করা সম্ভব হত, আলাদা আলাদা পিতার সন্তান অথচ একই মায়ের গর্ভজাত হলে বিবাহ করা যেত না। আলাদা আলাদা মায়ের সন্তান হলে ঘটনাটা কী ঘটত? যেহেতু বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে, তাই তারা দুজন ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হত এবং কোনরকম গোত্রগত আত্মীয়তা থাকত না তাদের মধ্যে। এ-রকম বিবাহের জন্য গোত্রের কোন বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করারও প্রয়োজন হত না। কিন্তু পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণীত হলে (নিম্নোক্ত ঘটনাগুলো ঘটার সময় সেটাই ছিল চালু নীতি) তারা একই গোত্রের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হত, ফলে গোত্রীয় বিধিনিষেধের আওতায় পড়তে হত তাদের। সিমন বিবাহ করেছিলেন তাঁর সৎ-বোন এল্‌পিনিস্‌কে। তাঁরা দুজনে একই বাবার সন্তান হলেও ভিন্ন ভিন্ন মায়ের গর্ভজাত ছিলেন। ডিমস্থিনিসের লেখা 'ইউবুলাইড্‌স্‌'-এ এ-রকম একটা ঘটনার কথা পাওয়া যায়। সেখান ইউক্সিথিউস বলেছেন, "আমার ঠাকুরদা তাঁর বোনকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু সেই বোন তাঁর মায়ের গর্ভজাতা ছিলেন না।"[১] এই ধরনের বিবাহকে (সোলোনের আমলেই যার বিরুদ্ধে একটা দারুণ কুসংস্কার গড়ে উঠেছিল এথেনীয়দের মধ্যে) ব্যাখ্যা করা যায় বিবাহ সংক্রান্ত একটা প্রাচীন প্রথার স্মারক হিসেবে। যখন বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে, তখন এ-রকম বিবাহপ্রথা চালু ছিল, আর ডিমস্থিনিসের আমলেও তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের জন্য গোত্রের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয়,

১। Demosthenes contra Eudulides", ২০.

কারণ সন্তানের বংশপরিচয় নির্ধারিত হত গোত্রের ভিত্তিতেই। অস্ট্রেলিয়া সহ পাঁচটা মহাদেশে প্রাচীনকালে ও আধুনিককালে গোষ্ঠীর সংগঠনের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে এবং গোত্রের গঠনকাঠামো সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানি, তা থেকে মনে হয় স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের ঘটনা ঐতিহাসিক যুগে না ঘটলেও, বিভিন্ন প্রথার মধ্যে তার ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে সর্বত্রই। তাই এটা মোটেই ধরে নেওয়া যায় না যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় করার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ রীতি লাইসিয়ান, ক্রীটান, এথেনিয়ান আর লোক্রিয়ানরা নিজেরা উদ্ভাবন করে নিয়েছিল (শেষোক্ত গোষ্ঠী দুটোকে এর অন্তর্ভুক্ত করাটা অবশ্য প্রমাণসাপেক্ষ)। লাতিন, গ্রীক এবং গ্রেকো-ইতালিয়ান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রাচীনকালে এটাই ছিল চালু রীতি—এই প্রকল্পটাকে মেনে নিলে তৎকালীন ঘটনাবলীর একটা যুক্তিগ্রাহ্য ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সম্পত্তির প্রভাব আর সন্তানদের হাতে নিজের সম্পত্তি অর্পণ করার আকাঙ্খা—বংশধারা নির্ণয়ের পুরুষ-ধারা চালু করার পিছনে এই দুটো ব্যাপার যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে।

বিবাহের সময় স্বামীর ভ্রাতৃত্বের তালিকায় স্ত্রীর নাম নথিভুক্ত করানো এবং ছেলে-মেয়েদের নাম বাবার গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের তালিকায় নথিভুক্ত করানোর প্রথা থেকে অনুমান করা চলে যে, সোলোনের আমলের আগে ও পরে এথেনীয়দের মধ্যে গোত্রের বাইরে বিবাহ করার রীতিই প্রচলিত ছিল।[১] পরস্পর রক্তসম্বন্ধযুক্ত বলে গোত্রের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বিবাহ করতে পারে না—এই মৌলিক নীতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল গোত্র। কোন গোত্রেরই সদস্যসংখ্যা খুব বেশি হত না। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সোলোনের আমলে নথিভুক্ত এথেনীয় ছিল ষাট হাজার জন, তাহলে তাদের তিনশ ষাটটা গোত্রের গড় লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র একশ ষাট জন করে। গোত্র ছিল জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্ত কিছু লোকের একটা বৃহৎ পরিবার। এদের একটা সার্বজনীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সার্বজনীন কবরস্থান এবং সাধারণ কিছু সার্বজনীন জমি থাকত। গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ। স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় চালু হওয়া, একবিবাহপ্রথা চালু হওয়া, বাবার সম্পত্তির ওপর শুধুমাত্র সন্তানদেরই উত্তরাধিকার শুরু হওয়া এবং মেয়েদেরও বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া—এইসব ঘটনার ফলে গোত্র নির্বিশেষে অবাধ বিবাহের জমিটা আস্তে আস্তে তৈরী হচ্ছিল (শুধুমাত্র অত্যন্ত নিকট কয়েকজন আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞাটা ছিলই)। মানুষের ইতিহাসে প্রথম দেখা দিয়েছিল দলগত বিবাহ। এই বিবাহে কোন দলের শুধু শিশুরা বাদে বাকি সমস্ত নারী-পুরুষই ছিল সকলকার যৌথ স্ত্রী ও স্বামী। কিন্তু স্বামী ও

১। ডিমস্থিনিস, "ইউবুলাইড্স্", ২৪, তাঁর আমলে নাম নথিভুক্ত করানো হত শহরের তালিকায়। তবে তা থেকে বোঝা যেত যে নথিভুক্ত করানো ব্যক্তিটির স্বভ্রাতৃত্বের লোক, রক্তসম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়, এক শহরবাসী এবং সগোত্রীয় কারা; ইউক্লিথিউস এ-রকমই বলেছেন। এছাড়াও দ্রষ্টব্য, হার্মান-এর "পলিটিক্যাল অ্যান্টিকুইটি অফ গ্রীস", পৃ. ১০০.

স্বামীরা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য ছিল। অগ্রগতির পথে ধীরে ধীরে সামনে এল এক-স্বামী এক-স্ত্রী প্রথা। এরা দুজনে শুধুমাত্র পরস্পরের সঙ্গেই মিলিত হয়। বিবাহের নানান রূপ এবং প্রথম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরিবারের যে যে রূপগুলো দেখা গেছে, সেগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা করার চেষ্টা করব আমরা।

গোত্রের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধের একটা ব্যবস্থাও সৃষ্টি হয়েছিল। এই ব্যবস্থার খুব উল্লেখযোগ্য নজির দেখা গেছে এশিয়ার তুরানিয়ানদের মধ্যে, আমেরিকার গ্যানোয়ানিয়ানদের মধ্যে। এদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ তো নিষিদ্ধ ছিলই, সেইসঙ্গেই দূরসম্পর্কের জ্ঞাতিভাই আর জ্ঞাতিবোনদের মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল। আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে, এশিয়া ও আফ্রিকার কোন কোন জায়গায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় আজও চালু আছে এই ব্যবস্থা। প্রাচীনকালে গ্রীক ও লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই চালু ছিল, এবং সেই যুগেও তার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। তুরানিয়ান ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য এ-রকম: বিভিন্ন ভাইয়ের সন্তানরা পরস্পরের ভাইবোন, কাজেই তারা পরস্পরকে বিবাহ করতে পারত না; বিভিন্ন বোনের সন্তনরাও পরস্পরের ভাইবোন, কাজেই একই নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। দানায়ুসের কন্যাদের সুবিখ্যাত উপাখ্যানটিকে এই ব্যবস্থার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (যে উপাখ্যান অবলম্বনে এস্কাইলাস লিখেছিলেন তাঁর 'সাপ্লিআণ্টস' নামক ট্রাজেডিটি)। আর্গাইভ ইও-র বংশধর দানায়ুস আর ঈজিপ্টাস ছিল দুই ভাই। প্রথমজন বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে জন্ম দেয় পঞ্চাশটি কন্যার, দ্বিতীয়জন বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে জন্ম দেয় পঞ্চাশটি পুত্রের। যথাসময়ে ঈজিপ্টাসের পুত্ররা দানাউসের কন্যাদের বিবাহ করতে চায়। তখনও পর্যন্ত গোত্রের মধ্যে রক্তসম্বন্ধের যে ব্যবস্থা চালু ছিল এবং এক-বিবাহ প্রথা কর্তৃক সূচিত নতুন ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত যে ব্যবস্থা টিকে ছিল, সেই ব্যবস্থা অনুসারে তারা ছিল পরস্পরের ভাইবোন, ফলে তাদের মধ্যে বিবাহ হওয়া সম্ভব ছিল না। তখন যদি পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু থাকত, তাহলে দানায়ুস আর ঈজিপ্টাসের সন্তানরা একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন হত। আর সেটা তাদের বিবাহের পথে আর একটা বাড়তি অন্তরাল সৃষ্টি করত। তাসত্ত্বেও ঈজিপ্টাসের পুত্ররা এইসব প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করে জোর করে বিবাহ করতে চায় দানায়ুসের কন্যাদের। দানায়ুস-দুহিতারা তখন ঈজিপ্ট থেকে সাগর পার হয়ে পালিয়ে যায় আর্গস-এ। তাদের মতে ঐ বিবাহ ছিল একটা অবৈধ ও অজাচারী মিলন। এস্কাইলাসেরই 'প্রমিথিয়ুস' নাটকে দেখা যায় এই ঘটনাটার কথা প্রমিথিয়ুস পূর্বাহ্নেই জানাচ্ছেন ইও-কে। তিনি বলছেন—ইও-র ভবিষ্যৎ-পুত্র ইপ্যাফাসের সময় থেকে শুরু করে পঞ্চম প্রজন্মের সময় পঞ্চাশজন কুমারী-কন্যা চলে আসবে আর্গসে; না, স্বেচ্ছায় আসবে না তারা, ঈজিপ্টাসের পুত্রদের সঙ্গে অজাচারমূলক দাম্পত্যকে এড়ানোর জন্য পালিয়ে আসবে।[১] প্রস্তাবিত ঐ বিবাহকে ঘৃণা করে তাদের এই পলায়নের ব্যাখ্যা করার জন্য গোত্রীয় নিয়মকানুন জানার প্রয়োজন হয় না, রক্তসম্বন্ধের প্রাচীন ব্যবস্থার মধ্যেই এর ব্যাখ্যা মেলে। এই

১। "প্রমিথিয়ুস", ৮৫৩.

ব্যাখ্যাটুকু ছাড়া ঐ ঘটনার অন্য কোন তাৎপর্য নেই। তাদের এই বিবাহ-বিমুখতাটা নিছক শালীনতার ভানও হয়ে থাকতে পারে।

'সাপ্লিঅ্যাণ্টস' নাটকটা রচিত হয়েছে তাদের সাগর পেরিয়ে আর্গসে পালানোকে উপজীব্য করেই। ঈজিপ্টাসের পুত্রদের (যারা তাদের অনুসরণ করেছিল) বলপ্রয়োগের হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য তারা আর্গাইভ থেকে জাত তাদের জ্ঞাতিদের কাছে দাবি জানিয়েছে। আর্গসে গিয়ে দানায়ুস-দুহিতারা ঘোষণা করেছে—ঈজিপ্ট থেকে তারা নির্বাসিত হয়ে চলে আসেনি, তারা পালিয়ে এসেছে তাদেরই বংশের পুরুষদের সঙ্গে, অর্থাৎ ঈজিপ্টাসের পুত্রদের সঙ্গে অপবিত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে।[১] তাদের এই অনিচ্ছার পিছনে জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধই একমাত্র কারণ হিসেবে কাজ করেছে। অর্থাৎ, এ-ধরনের বিবাহের বিরুদ্ধে একটা নিষেধাজ্ঞা চালু ছিল এবং তারা সেটাকে মান্য করতে শিখেছিল। এই সাপ্লিঅ্যাণ্ট বা আবেদনকারিনীদের বক্তব্য শোনার পর আর্গসবাসীদের পরিষদ তাদের রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ থেকেও বোঝা যায় যে ঐ ধরনের বিবাহ সম্বন্ধে একটা নিষেধাজ্ঞা ছিলই, এবং দানায়ুস-দুহিতাদের আপত্তিটাও ছিল যুক্তিসঙ্গত। এই নাটক যখন রচিত হয়, তখন এথেনীয়রা উত্তরাধিকারিনীর প্রশ্নে এবং অনাথা নারীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাইয়ের পুত্রকন্যাদের মধ্যে বিবাহকে অনুমোদন করত তো বটেই, এমনকি এই ধরনের বিবাহ তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়ও ছিল (তবে এ নিয়ম সম্ভবত শুধু ঐ-সব ব্যতিক্রমী ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল)। কাজেই এ-রকম বিবাহকে অজাচারমূলক বা অবৈধ বলে মনে করার কোন কারণ এথেনীয়দের ছিল না। কিন্তু দানায়ুস-দুহিতাদের এই উপাখ্যানটা বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। সেই সময় এ-রকম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, আর এটুকুই এই উপাখ্যানের একমাত্র তাৎপর্য। প্রস্তাবিত বিবাহটাকে নিয়ম ও প্রথা অনুযায়ী নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে তাদের যে একগুঁয়ে বিরোধিতা, সেটাই এই উপাখ্যানের মূল জায়গা। অন্য কোন কারণ দেখানোও হয় নি, আর তার কোন দরকারও নেই। দানাউস-দুহিতাদের আচরণকে আর একটা দৃষ্টিকোণ থেকেও বোঝা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে—আজকের দিনে কোন আপন ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ যেমন অনুমোদনযোগ্য নয়, তখনকার দিনে ঐ ধরনের ভাইবোনের মধ্যে বিবাহও তেমনি অনুমোদনযোগ্য ছিল না। তুরানিয়ান জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিবন্ধক ভেঙে ফেলার জন্য ঈজিপ্টাসের পুত্রদের প্রচেষ্টা হয়ত সেই সময়টাকেই সূচিত করছে, যে সময় থেকে ঐ ব্যবস্থার ভাঙন শুরু হয়েছিল এবং মাথা তুলছিল একবিবাহবিশিষ্ট বর্তমান ব্যবস্থা। এই নতুন ব্যবস্থা গোত্রীয় রীতিনীতি ও তুরানিয়ান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছিল এবং শুধু বিশেষ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ককে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল।

এতক্ষণ আমরা যা যা প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি, তা থেকে মনে হয় যে পেলাসজিয়ান, গ্রীক এবং ইতালিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রাচীনকালে বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারেই। পরবর্তীকালে সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের প্রশ্ন সামনে আসার পর পুরুষ—

১। এস্কাইলাস, "সাপ্লিঅ্যাণ্টস", ৯.

ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের রীতি চালু হয়। এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে তুরানিয়ান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা চালু থেকে থাক বা না-ই থাক, প্রাচীন সমাজে যে তা ব্যাপক ভাবেই চালু ছিল—সেটা বুঝতে পাঠকের নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না।

এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ ঠিক কতদিন ছিল, তা জানা যায় না। তবে বেশ কয়েক হাজার বছর তো হবেই। সম্ভবত আকরিক লোহা গলানোর প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের সময় থেকে ঐ যুগটা শুরু হয়েছিল। তারপর বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায় পেরিয়ে তারা পা রেখেছিল বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে। এই মধ্য পর্যায়ে এদের অগ্রগতি নিশ্চয়ই আজটেক, মায়া আর পেরুভিয়ানদের (বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়েই এদের খোঁজে প্রথম পাওয়া যায়) সমান ছিল। আর বর্বরযুগের নিম্ন পর্যায়ে এদের অগ্রগতি নিশ্চয়ই উল্লিখিত ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর থেকে বেশি ছিল। উপরোক্ত দুটো বিরাট বিরাট ঐতিহাসিক যুগে (যখন তারা সভ্যতার প্রাথমিক উপাদানগুলো অর্জন করেছিল) এইসব ইউরোপীয় গোষ্ঠীগুলো যে ব্যাপক ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তা একেবারেই হারিয়ে গেছে। শুধু তার কিছু ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় তাদের লোককথার মধ্যে, আরও বেশি করে তাদের জীবনযাপন প্রণালী, বিভিন্ন প্রথা, ভাষা আর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে—যেগুলোর কথা আমরা জানতে পারি হোমারের রচনা থেকে। ঐ-সব যুগে সাম্রাজ্য বা রাজত্ব বলে কিছু ছিল না। তাদের তৎকালীন চিত্রের মধ্যে ছিল কিছু গোষ্ঠী আর নগণ্য কিছু জাতি, শহুরে ও গ্রামীণ সমাজজীবন, জীবনযাপন-প্রণালীর বিকাশ, এবং শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি। মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ঐ যুগগুলোর অভিজ্ঞতা হারিয়ে যাওয়াটা একটা অপূরণীয় ক্ষতি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মানবজাতির অন্যান্য শাখার মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব

গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠীর প্রাচীন ও পরবর্তীকালীন রূপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা। এবার দেখা দরকার মানবজাতির অন্যান্য শাখার মধ্যে এগুলোর, বিশেষত এই ভিত্তিস্বরূপ গোত্রের অস্তিত্ব ছিল কি না।

আর্য জনগোষ্ঠীর কেল্টিক্ শাখার লোকেরা তাদের স্কটল্যাণ্ডের ক্ল্যান আর আয়ারল্যান্ডের সেপ্ট-এর মধ্যে গোত্রভিত্তিক সংগঠনকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। এরা ছাড়া একমাত্র ভারতবর্ষের আর্যরাই বোধহয় অতদিন টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল ঐ সংগঠনকে। বিগত শতাব্দীর মধ্য-ভাগেও স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে জোরদারভাবে টিকে ছিল স্কটিশ ক্ল্যানগুলো। সংগঠনগতভাবে এবং চরিত্রের দিক থেকে এই ক্ল্যান হচ্ছে গোত্রেরই একটা রূপ। নিজের সদস্যদের ওপর গোত্রীয় জীবনাচরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারেও এই ক্ল্যানগুলো অত্যন্ত সফল হয়েছিল। 'ওয়েভারলী'-র সুবিখ্যাত লেখক তাঁর রচনায় ক্ল্যানের মধ্যে বেড়ে ওঠা কিছু বিশিষ্ট চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, যাদের সমস্ত কার্যকলাপে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ক্ল্যানের বৈশিষ্ট্যগুলো। ব্যক্তির চরিত্র পরিবর্তনের ওপর গোত্রটা কতটা প্রভাব বিস্তার করত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, টাঁকল, রব রয় প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে। কাহিনীর প্রয়োজনে স্যার ওয়াল্টার স্কট চরিত্রগুলোকে কিছুটা অতিরঞ্জিতও করে থাকতে পারেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও এর বাস্তব ভিত্তিটা অস্বীকার করা যায় না। কয়েকশ বছর আগে যখন ক্ল্যানের নিজস্ব জীবনযাত্রা অনেক জোরদার ছিল এবং বাইরের প্রভাব খুব একটা ছাপ ফেলতে পারে নি, তখন-কার ক্ল্যানগুলোর দিকে তাকালে এ-কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়। তাদের বংশানু-ক্রমিক সংঘাত, খুনের জবাবে খুন, এক একটা গোত্রের এক এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হওয়া, জমিকে যৌথভাবে ব্যবহার করা, ক্ল্যান-প্রধানের প্রতি বাকি সদস্যদের আনুগত্য, ক্ল্যানের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি আনুগত্য—এই সবকিছুর মধ্যে গোত্রীয় সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোই ফুটে ওঠে। স্কটের লেখা থেকে মনে হয়, গ্রীক ও রোমানদের অথবা আমেরিকার আদিবাসীদের গোত্রীয় জীবনের থেকে এদের গোত্রীয় জীবনটা ছিল অনেক গতিময়, অনেক বেশি বীরত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সংগঠনটা ছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু কোন এক সুদূর অতীতে যে ভ্রাতৃত্ব ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। মানুষকে আইনের আওতায় আর রাজনৈতিক সমাজের রীতিনীতির গণ্ডীতে নিয়ে আসার জন্য স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের ক্ল্যানগুলোর সাংগঠনিক কাঠামোটা ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। এরা বংশধারা

নির্ণয় করত পুরুষ-ধারা অনুসারে, কোন ক্ল্যানের পুরুষদের সন্তানরা সেই ক্ল্যানেরই সদস্য হিসেবে বিবেচিত হত, আর ক্ল্যানের নারীদের সন্তানরা তাদের নিজ নিজ পিতার ক্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত হত।

আইরিশদের 'সেপ্ট', আলবানিয়ানদের 'ফিস্' বা 'ফ্লারা' (যেগুলোর মধ্যে পূর্বতন গোত্রীয় সংগঠনের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়) নিয়ে, অথবা ডালমাটিয়া এবং ক্রোটিয়ায় এই একই ধরনের সংগঠনের নিদর্শনগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না। বাদ দিয়ে যাচ্ছি সংস্কৃত 'গণ'-এর প্রসঙ্গটাও (সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটার উপস্থিতি থেকেই বোঝা যায় যে আর্যদের ঐ শাখার মধ্যেও এই সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল)। আগেকার দিনে ফরাসী জমিদারীগুলোতে যে ভূমিদাস সম্প্রদায়গুলো বসবাস করত, যাদের কথা স্যার হেনরি মেইন তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় উল্লেখ করেছেন, তারা হয়ত প্রাচীন কেল্টিক্ গোত্রগুলোরই বংশধর ছিল। স্যার হেনরি লিখেছেন, "এই ব্যাখ্যার পর এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে এই সম্প্রদায়গুলো কোন স্বেচ্ছাকৃত অংশীদারী ছিল না, এগুলো ছিল সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের সংগঠন। তবে এগুলো মূলত গৃহভিত্তিক জনসম্প্রদায় হিসেবেই সংগঠিত ছিল, গ্রামীণ জনসম্প্রদায় হিসেবে নয়। সম্প্রতি ডাল-মাটিয়া আর ক্রোটিয়ায় যে অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল, তা থেকেই এটা জানা গেছে। হিন্দুরা যাকে যৌথ পরিবার বলে থাকে, এরা ছিল তা-ই। অর্থাৎ, একজন পূর্ব-পুরুষের কিছু বংশধর একসঙ্গে বসবাস করত এবং তাদের রান্না আর খাওয়াও হত একসঙ্গে। বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে চলত এই যৌথ জীবনযাত্রা।"[১]

জার্মান গোষ্ঠীগুলো যখন প্রথম ঐতিহাসিকদের নজরে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে গোত্রীয় সংগঠনের কোনরকম অবশেষ ছিল কি-না—সে প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। আর্য জাতির সাধারণ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তারাও অন্যান্য আর্য গোষ্ঠীদের মতই উত্তরাধিকারসূত্রে এই সংগঠনটা লাভ করে থাকতে পারে। রোমানরা যখন তাদের কথা প্রথম জানতে পারে, তখন তারা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে ছিল। গ্রীক আর লাতিন গোষ্ঠীগুলোর কথা প্রথম জানা যাওয়ার সময় তাদের মধ্যে সরকার সম্বন্ধে যেটুকু ধ্যানধারণা ছিল, তার থেকে উন্নত ধারণা জার্মান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে থাকা সম্ভব ছিল না। ভূখণ্ড এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সম্বন্ধে জার্মানদের কোন অপূর্ণাঙ্গ ধারণা থেকে থাকলেও দ্বিতীয় ধরনের সরকারব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা থাকাও সম্ভব ছিল না (যে ব্যবস্থাটা আর্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এথেনীয়রাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল)। সিজার এবং ট্যাসিটাসের বিবরণে জার্মান গোষ্ঠীগুলোর অবস্থা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল, এলাকার ভিত্তিতে নয়। তাদের শাসনব্যবস্থাও পরিচালিত হত এইসব সম্পর্ক মারফতই। পৌরপ্রধান আর সামরিক নেতারা তাদের পদে অধিষ্ঠিত হত নির্বাচন মারফত, এবং সরকার পরিচালনার প্রধান উপাদানস্বরূপ পরিষদটা গঠিত হত তাদের নিয়েই। ট্যাসিটাস বলেছেন—ছোট খাট ব্যাপারে প্রধানরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-

---

১। "আর্লি হিস্ট্রি অফ ইনস্টিটিউশনস". হোল্ট কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ৭.

আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিত, কিন্তু অধিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়গুলোর নিষ্পত্তির জন্য গোষ্ঠীর সকলেরই মতামত নিতে হত। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত জনসাধারণই, তবে সেগুলো নিয়ে প্রধানরা প্রথমে ভালোভাবে আলোচনা করে নিত।[1] এই রীতির সঙ্গে গ্রীক আর লাতিনদের রীতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যটা ভেবে দেখার মত। সরকার গঠিত হত তিনটি শক্তির সমন্বয়ে—প্রধানদের পরিষদ, গণ-পরিষদ আর সামরিক সর্বাধিনায়ক।

সিজার বলেছেন, কৃষিকাজের ব্যাপারে জার্মানরা খুব একটা দড় ছিল না। তাদের মূল খাদ্য ছিল দুধ, পনির আর মাংস। কারুরই কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বা জমিতে নিজস্ব সীমানা বলে কিছু ছিল না। বিভিন্ন গোত্র আর সেই সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের জন্য প্রতিবছর কিছুটা করে জমি বরাদ্দ করে দিত বিচারক আর প্রধানরা, এবং উচিত মনে করলে পরের বছর তাদের জন্য অন্য জমি বরাদ্দ করত।[2] তাঁর বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে এদের মধ্যে তিনি দলবদ্ধ মানুষদের দেখা পেয়েছিলেন। এই দলগুলো আয়তনে পরিবারের থেকে বড় ছিল। দলগুলো গড়ে উঠত জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে। এ-রকম এক একটা দলের জন্য বরাদ্দ করা হত কিছুটা করে জমি। তাঁর বিবরণে ব্যক্তি বা পরিবারের কথা নেই। আসলে কৃষিকাজ চালানো এবং জীবনধারণের জন্য যে দলগুলো গড়ে উঠত, তার মধ্যেই মিশে যেত ব্যক্তি ও পরিবার। তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় যে সে-সময় জার্মানীতে জোড়বাঁধা বিবাহ ভিত্তিক পরিবারই চালু ছিল, এবং জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কযুক্ত কিছু পরিবার একটা বাসস্থানে বসবাস করত এবং জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করত সাম্যবাদী নীতি।

যুদ্ধের সময় জার্মান গোষ্ঠীগুলো যে ভাবে তাদের সৈন্যদের বিন্যাস করত, সেকথার উল্লেখ করেছেন ট্যাসিটাস। তারা বিভিন্ন জ্ঞাতিদের পরস্পরের পাশাপাশি বিন্যস্ত করত। জ্ঞাতিত্ব যদি শুধু রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়দের মধ্যেই সীমিত থাকত, তাহলে এ ব্যাপারটা বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়ার দরকার হত না। তাদের শৌর্যের ব্যাপারে আর একটা কথাও বলছেন তিনি। অশ্বারোহী বা পদাতিক বাহিনীকে তারা মোটেই যথেচ্ছ বা এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত করত না। এদেরকে বিন্যস্ত করা হত পরিবার এবং জ্ঞাতিত্ব অনুযায়ী (Familiae propinquitates)।[3] এই বক্তব্য এবং সিজারের পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে মনে হয় যে তখনও তাদের মধ্যে একটা প্রাক্-গোত্রীয়

১। "জার্মানীয়া", ২য় পরিচ্ছেদ।

২। "ডি বেল. গল.," vi, ২২।

৩। "জার্মানীয়া", ৭ম পরিচ্ছেদ। লেখক বলেছেন, সৈন্যসারিকে পাশাপাশি সাজানো হত। "Acies per cuneou componitur."—"জার্মানীয়া", ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। কোল্‌রাউশ লিখেছেন, "একটা বা একশটা জেলার এবং একটা জাতি বা সেপ্ট-এর সম্মিলিত বাহিনী ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করত।"—"হিস্ট্রি অব জার্মানী", অ্যাপ্‌লটন কর্তৃক সম্পাদিত, অনুবাদ জি. ডি হ্যাস-এর, পৃঃ ২৮।

সংগঠনের অন্তিম অস্তিত্বটুকু রয়ে গিয়েছিল, এবং সেই সময় থেকেই সেই সংগঠনের বদলে গড়ে উঠেছিল মার্ক বা আঞ্চলিক জেলাগুলো। এই জেলাগুলোই ছিল তাদের অপূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বনিয়াদ।

সামরিক কর সংগ্রহের জন্য জার্মান গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন আঞ্চলিক জেলা বা মার্ক (markgenossenschaft) গড়ে তুলেছিল। ইংল্যাণ্ডের স্যাক্সনদের মধ্যেও এ-রকম জেলার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এছাড়াও জার্মানদের মধ্যে 'গউ' (gau) বলে আর একটা বড় বিভাগ ছিল, যাকে সিজার এবং ট্যাসিটাস চিহ্নিত করেছেন 'প্যাগাস' (pagus) নামে।[১] এই মার্ক এবং গউগুলো ঠিক ভৌগোলিক জেলা ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এদের মধ্যেকার সম্পর্কটা ছিল শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সম্পর্কের মত। প্রতিটা গউ আর মার্ক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত, বাসিন্দারা সংগঠিত থাকত রাজনৈতিকভাবে। খুব সম্ভবত গউগুলো ছিলো সামরিক কর সংগ্রহের জন্য সংগঠিত কিছু বসতির সমষ্টি। এই মার্ক আর গউগুলোই ছিল ভবিষ্যতের শহর আর গ্রামেরই ভ্রূণরূপ, ঠিক যেমন এথেনীয় নউক্রারি আর ট্রিট্টিগুলো ছিল ক্লাইসথেনিসের আমলে গড়ে ওঠা ডেমি আর আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলোর অবশেষ। এই সংগঠনগুলো ছিল গোত্রীয় ব্যবস্থা আর রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেকার একটা পরিবর্তনশীল স্তর। এগুলোর মধ্যে লোকেরা সংগঠিত হত জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে।[২]

১। "ডি বেল. গল.," iv, ১. "জার্মানীয়া", ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২। ডঃ ফ্রিম্যান এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন, "রাজনৈতিক ব্যবস্থার একেবারে প্রাথমিক এককটা আজও বিভিন্ন নামে টিকে আছে। যেমন—মার্ক, জেমেইণ্ড, কমিউন, প্যারিশ। আমরা আগেই দেখেছি যে এগুলো হচ্ছে 'গোত্র' বা বংশেরই এক একটা রূপ। এগুলোর মধ্যে সংগঠিত মানুষ আর যাযাবর বা লুণ্ঠনজীবী দল হিসেবে থাকত না। তবে তখনও পর্যন্ত তারা কোন বিভিন্ন দলের সম্মিলিত নগর গড়ে তোলার জন্য অন্যদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়নি। এই পর্যায়ে গোত্রগুলো এক একটা কৃষিজীবী সংগঠন রূপে ছিল, তাদের নিজেদের যৌথ জমি থাকত—রোমের 'এজার পাবলিকাস' বা ইংল্যাণ্ডের 'ফোকল্যাণ্ড'-এর মত সংগঠন গড়ে ওঠার অঙ্কুর বলা যেতে পারে এগুলোকে। একেই বলা হত 'markgenossenschaft', অর্থাৎ পাশ্চাত্যের গ্রামীণ জনসম্প্রদায়। এই প্রাথমিক রাজনৈতিক এককটা, প্রকৃত কিম্বা পাতানো জ্ঞাতিদের এই সমন্বয়টা গড়ে উঠত বিভিন্ন পরিবারকে নিয়ে, কিন্তু প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ পিতার কর্তৃত্ব (mund) মেনে চলত। এটা হচ্ছে অনেকটা রোমের 'প্যাট্রিয়া পোতেস্তাস'-এর মত ব্যাপার, যার ভিত্তিতে রোমান আইনের একটা বিশিষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠত 'গোত্র', আর কিছু 'গোত্রের' সমন্বয়ে গড়ে উঠত 'মার্কজেনোসেনশ্যাফ্ট্'। এ-রকম কিছু গ্রামীণ জনসম্প্রদায় এবং তাদের 'মার্ক' বা যৌথ জমির সমন্বয়ে গড়ে উঠত পরবর্তী উচ্চতর রাজনৈতিক এককটা। এর নাম ছিল হাণ্ড্রেড বা শতক, টিউটনিক

গোত্রীয় সংগঠনের প্রাচীনতম নিদর্শন খোঁজার জন্য এবার আমরা তাকাব এশিয়া মহাদেশের দিকে। এই এশিয়া মহাদেশেই সবথেকে বেশি ধরনের মানুষ দেখা যায়, আর এখানেই মানুষের বসবাস সবথেকে দীর্ঘ দিনের। কিন্তু এশিয়ার সমাজের রূপান্তর ঘটেছে বহুভাবে, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতিগুলো পরস্পরের ওপর সবথেকে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সুপ্রাচীন কালে চৈনিক এবং ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ আর আধুনিক সভ্যতার বিপুল প্রভাব এশিয়ার জাতিগুলোর মধ্যে এমন সব পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে যার ফলে তাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা করা মুস্কিল। তাসত্ত্বেও, এশিয়া মহাদেশে মানব-জাতির বন্যতা থেকে সভ্যতা পর্যন্ত সমগ্র অভিজ্ঞতার একটা রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যায়, এবং সেখানকার বিভিন্ন ছড়ানো-ছিটানো গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় কি না—তার চেষ্টা এখন করা দরকার।

এশিয়ার পিছিয়ে-থাকা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয় করার রীতি এখনও যথেষ্টই চালু আছে। আবার অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে এ-ব্যাপারে পুরুষ-ধারারাই অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যে-কোন একটা ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণীত হয়, সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের সংগঠন সেই নিয়ম অনুযায়ীই গড়ে ওঠে। এইভাবে সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা এক একটা নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত হয়। এগুলোই হচ্ছে গোত্র।

লাথাম লিখেছেন যে নেপালের মাগার গোষ্ঠীর মধ্যে "বারোটা ঠাম (thum) আছে। একই ঠামের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মানুষকে একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলে মনে করা হয়। একই মায়ের গর্ভজাত কি না, সে ব্যাপারে তারা আদৌ মাথা ঘামায় না। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন ঠামের সদস্য হয়ে থাকে। নিজের ঠামের মধ্যেকার কারুকে বিবাহ করা চলে না। স্ত্রী খুঁজছ? তাহলে পাশের ঠামের কোন মেয়েকে বাছো। নিজের ঠামের মধ্যে বিবাহ করা সম্ভব নয়। এ-রকম রীতির কথা আমি এই প্রথম উল্লেখ করলাম। কিন্তু এটাই শেষ নয়। এ রীতি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চালু আছে। অস্ট্রেলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ—সর্বত্রই এর দেখা মেলে। এমনকি যে-সব জায়গায় এর স্বপক্ষে পূর্ণাঙ্গ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেখানেও রীতিটা চালু আছে বলে ধরে নেওয়া যায়।"[১] এখানে এই 'ঠাম'-এর মধ্যে আমরা গোত্রের অস্তিত্বেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি, যেখানে বংশধারা নির্ণীত হয় পুরুষ

জাতির লোকেরা যে যে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেইসব অঞ্চলের অধিকাংশ জমিতেই এই নামটা কোন-না-কোন রূপে দেখা যায়…। এই হাণ্ড্রেড-এর ওপরে থাকত 'প্যাগাস', 'গউ', ড্যানিশদের ক্ষেত্রে 'সিসেল', ইংল্যাণ্ডে 'শায়ার।' অর্থাৎ, গোষ্ঠীগুলো এক একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল অধিকার করে বসবাস করতে শুরু করত। ছোটবড় এই সমস্ত বিভাগেরই নিজস্ব প্রধান থাকত… । হাণ্ড্রেড গড়ে উঠত গ্রাম, মার্ক, জেমেইও ইত্যাদির সমন্বয়ে অর্থাৎ প্রাথমিক এককগুলোর ভিত্তিতে। 'শায়ার', 'গউ', 'প্যাগাস' প্রভৃতি গড়ে উঠত হাণ্ড্রেডগুলোর সমন্বয়ে।"—"কম্প্যারেটিভ পলিটিকস", ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং-এর সংস্করণ, পৃঃ ১১৬.

১। "ডেসক্রিপটিভ এথ্নোলজি", i, ৮০।

ধারা অনুসারে।

"মণিপুরীরা এবং মণিপুরের পাহাড়ে বসবাসকারী কুপু, মাউ, মুরাম এবং মুরিংদের প্রত্যেকের মধ্যে চারটি করে পরিবার রয়েছে—কুমুল, লুআং, আংগোম, এবং মিংথাজা। এক পরিবারের সদস্যরা অন্য যে-কোন পরিবারের কাউকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।"[১] সম্ভবত এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার চারটি করে গোত্রকেই পরিবার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সারকাসিয়ানদের 'তেলুশ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বেল্ লিখেছেন, "এদের লোককথায় বলা হয়েছে এরা সকলে একই মূল বংশ বা পূর্বপুরুষ থেকে জাত। কাজেই এদেরকে কতকগুলো সেপ্ট বা বংশ হিসেবে মনে করা যেতে পারে··· । এই-সব জ্ঞাতিভ্রাতা ও জ্ঞাতিভগ্নীদের মধ্যে বা একই ভ্রাতৃত্বের কোন সদস্যের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তো বটেই, এমনকি তাদের ভূমিদাসদেরকেও অন্য কোন ভ্রাতৃত্বের কোন ভূমি-দাসীকে বিবাহ করতে হত।"[২] সম্ভবত তেলুশ বলতে এখানে গোত্রকেই বোঝান হয়েছে।

বাঙালিদের মধ্যে "চারটি বর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত, এগুলি আবার বিভিন্নভাগে বিভক্ত। যেমন, আমি হচ্ছি নন্দী গোষ্ঠীর (গোত্রের ?) লোক। আমি যদি নিচু বর্ণের লোক হতাম, তাহলে আমার গোষ্ঠীর কোন নারীকে আমি বিবাহ করতে পারতাম না। তবে একই বর্ণের নারীকে বিবাহ করাটা অবশ্য কর্তব্য। সন্তানরা তাদের বাবার গোষ্ঠীর সদস্য হয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় পুত্ররা। কোন ব্যক্তির পুত্র না থাকলে কন্যারাই উত্তরাধিকারিণী হয়। পুত্র-কন্যা কিছুই না থাকলে তার সম্পত্তি নিকটতম জ্ঞাতিরাই পেয়ে থাকে। বর্ণের মধ্যেও ভাগ আছে। যেমন, শূদ্র বর্ণের মধ্যে রয়েছে তিলি, তামলী, তাঁতি, চামার ইত্যাদি ভাগ। এইসব ভাগের কোন পুরুষ এই ভাগের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না।"[৩] এই ছোট-ছোট ভাগগুলোতে সাধারণত শতখানেক সদস্য থাকে, তা-সত্ত্বেও এদের মধ্যে গোত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

মিঃ টাইলার বলেছেন যে "ভারতবর্ষের কোন ব্রাহ্মণ একই পদবী বা গোত্রের (যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে গোয়াল) কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না। এই নিষেধা-জ্ঞার সাহায্যে কোন বংশের পুরুষ-ধারা অনুসারে যাবতীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ রদ করা হয়েছে। এই আইনটা নির্দিষ্ট হয়েছিল মনুসংহিতায়। প্রথম তিনটি বর্ণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল এই বিধি। স্ত্রী-ধারা অনুসারে যারা পরস্পরের আত্মীয়, তাদেরও বেশ কয়েকটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ।"[৪] অন্যত্র তিনি লিখেছেন: "ছোটনাগ-

১। ম্যাক্‌লেনান, "প্রিমিটিভ ম্যারেজ", পৃঃ ১০৯.

২। "প্রিমিটিভ ম্যারেজ"-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ১০১

৩। ভারতবর্ষের জনৈক বাঙালী রেভারেণ্ড গোপীনাথ নন্দী লেখককে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন।

৪। "আর্লি হিষ্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড", পৃঃ ২৮২.

পুরের কোলদের মধ্যে অনেক ওরাওঁ এবং মুণ্ডা গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়েছে পশু-পাখির নামে। যেমন—বানমাছ, বাজপাখি, কাক, সারস ইত্যাদি। যে পশু বা পাখির নামে কোন গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয়, সেই গোষ্ঠীর লোকেরা সেই পশু বা পাখি হত্যা করতে বা আহার করতে পারে না।"[১]

মঙ্গোলীয়দের শারীরিক আকৃতি অনেকটা আমেরিকার আদিবাসীদের মতই। এদের মধ্যে অসংখ্য গোষ্ঠী আছে। লাথাম লিখেছেন, "কোন গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে রক্ত বা বংশধারার সম্পর্ক থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর নামকরণ করা হয় কোন বাস্তব অথবা কল্পিত গোষ্ঠীপতির নামে। গোষ্ঠী (তাদের ভাষায় আইমক বা আইম্যাক) হচ্ছে একটা বিরাট বিভাগ। তার মধ্যে কয়েকটা করে কোথুম বা দল থাকে।"[২] এই বক্তব্য থেকে গোত্রের অস্তিত্বের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। এদের প্রতিবেশী তুঙ্গাসিয়ানদের মধ্যেও পশুর নাম অনুযায়ী কিছু বিভাগ দেখা যায়, যেমন, কুকুর, বলগাহরিণ ইত্যাদি। এগুলোকে গোত্রীয় সংগঠন বলেই মনে হয়, বিস্তৃত তথ্য ছাড়া জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

কালমাকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্যর জন লুবক্ বলেছেন যে ডি হেল-এর মতে এরা "বিভিন্ন দলে বিভক্ত, এবং কোন পুরুষ তার নিজ দলের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না।" ওস্টিয়াক্দের ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে এরা "একই পরিবারে, এমনকি পদবীবিশিষ্ট কোন নারীকে বিবাহ করাকে রীতিমত অপরাধ বলে মনে করে থাকে।" তিনি আরও বলেছেন, "কোন জাকুত্ (সাইবেরিয়ার) বিবাহ করতে চাইলে তাকে অন্য বংশের কোন মেয়েকে বাছাই করতে হয়।"[৩] সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা গোত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্ছি। একই গোত্রের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। যুরাক্ সামোয়েড্রা গোত্রের ভিত্তিতেই সংগঠিত। ক্ল্যাপ্রথ্ (লাথম কর্তৃক উদ্ধৃত) বলেছেন, "জ্ঞাতিত্বের এই বিভাজনটাকে এত কঠোরভাবে মেনে চলা হয় যে কোন সামোয়েডই তার নিজের জ্ঞাতিদের মধ্যেকার কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না। অন্য দুটো বিভাগের কোন একটা থেকে তাকে স্ত্রী নির্বাচন করতে হয়।"[৪]

চীনাদের মধ্যে একটা বিচিত্র পরিবার ব্যবস্থা চালু আছে। এটা সম্ভবত একটা প্রাচীন গোত্রীয় সংগঠনেরই স্মারক। আমার কাছে লেখা একটা চিঠিতে ক্যান্টনের অধিবাসী মিঃ রবার্ট হার্ট জানিয়েছেন, "চীনা ভাষায় জনগণকে বলা হয় 'পিহ্-সিং' (Pih-sing), অর্থাৎ; একশটা পদবী।" কিন্তু এটা কিছুতেই কোন শব্দের খেলা, নাকি যখন ও চৈনিক জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল একশটা উপশাখা বা গোষ্ঠী (গোত্র ?) তখনকার অবস্থার মধ্যেই এর উৎস নিহিত রয়েছে—তা আমি বলতে পারছি না। বর্তমানে এ-দেশে প্রায় চারটা পদবী রয়েছে; যার মধ্যে কিছু নাম পশু-পাখি, ফলমূল, ধাতু, প্রাকৃতিক বস্তু ইত্যাদির নাম অনুসারী। যেমন—ঘোড়া, ভেড়া, ষাঁড়, মাছ, পাখি, ফিনিক্স,

৩। "প্রিমিটিভ কালচার", হোল্ট অ্যাণ্ড কোং সংস্করণ, ii, পৃঃ ২৩৫.

৪। "ডেসক্রিপটিভ এথ্নোলজি", i, পৃঃ ২৯০.

১। "অরিজিন অফ সিভিলাইজেশন", পৃঃ ৯৬.

২। "ডেসক্রিপটিভ এথ্নোলজি", i, পৃঃ ৪৭৫.

খেজুর, ফুল, পাতা, ধান, অরণ্য, নদী, পাহাড়, জল, মেঘ, সোনা, পশুচর্ম, শূকরের লোম ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-দেশে এমন অনেক বড় বড় গ্রাম আছে, যেখানে গ্রামের সকলের একই পদবী : যেমন, কোন জেলায় হয়ত তিনটি গ্রাম আছে, প্রতি গ্রামে হয়ত দু' তিন হাজার করে লোক বাস করে ; দেখা যাবে একটা গ্রামে হয়ত শুধু ঘোড়া পদবীর লোকেরাই থাকে, দ্বিতীয়টাতে থাকে ভেড়া পদবীধারীরা, আর তৃতীয়টার লোকেদের পদবী হচ্ছে ষাঁড়···। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে যেমন স্বামী এবং স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর (গোত্রের) সদস্য হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি চৈনিক স্বামী এবং স্ত্রীকে হতে হয় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পদবীর মানুষ। একই পদবীধারী নারী ও পুরুষের বিবাহ, প্রথা এবং আইন—উভয় চোখেই নিষিদ্ধ। সন্তানরা তাদের বাবার পরিবারের সদস্য হয়, অর্থাৎ বাবার পদবীই ধারণ করে···। বাবা কোন উইল না করে মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি সাধারণত ভাগাভাগি করা হয় না। তাঁর বিধবা স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকেন, ততদিন তাঁদের বড় ছেলেই ঐ সম্পত্তি দেখাশোনা করে। ঐ স্ত্রী মারা যাওয়ার পর, বড় ছেলে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা করে। ভাগ পায় সে আর তার ভাইরা। তবে, ছোট ভাইরা কতটা করে ভাগ পাবে তা পুরোপুরি নির্ভর করে বড় ভাইয়ের মর্জির ওপর।"

এখানে যে পরিবারের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে গোত্রের ছবিই দেখছি আমরা। রোমুলাসের আমলে রোমানদের মধ্যে যে-রকম গোত্র ছিল, এটা তার সমতুল। তবে একই বংশধারার অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে এরা কোন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পুনর্মিলিত হয়েছিল কি না—তা আমরা জানতে পারছি না। তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে, প্রাচীনকালে রোমান গোত্রগুলো যেমন এক একটা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত, এরাও তেমনি সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের এক একটা স্বাধীন সংগঠন হিসেবে কেন্দ্রীভূত হয় এক একটা অঞ্চলে। এদের গোত্রের নামগুলো এখনও প্রাচীনকালের মতই রয়ে গেছে। চারশটা গোত্রে বিভাজিত হওয়াটা হয়ত খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সেগুলো যে আজ পর্যন্ত টিকে আছে, বর্বর যুগ অতিক্রান্ত হওয়ায় এতদিন পরেও—এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আর এই ঘটনা থেকে একটা জনসম্প্রদায় হিসেবে চৈনিকদের অনড়-অচলতারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুমান করা যেতে পারে যে ঐ-সব গ্রামে আজও হয়ত এক-বিবাহপ্রথা পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, তাদের জীবনযাত্রা এবং যৌন-জীবনের ক্ষেত্রে সাম্যবাদ বোধহয় আজও চালু আছে। চীনের পার্বত্য অঞ্চলে যে বন্য আদিবাসীরা আজও বসবাস করে, যারা কথা বলে মান্দারিন (সার্বজনীন কথ্য চীনা-ভাষা) ভাষার থেকে আলাদা একটা উপভাষায়, তাদের মধ্যে আজও প্রাচীন রূপের গোত্রের দেখা মিলতে পারে। এইসব ছড়ানো-ছিটোনো গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে চৈনিকদের প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন।

শোনা যায় আফগানিস্তানের গোষ্ঠীগুলোও বিভিন্ন বংশে বিভক্ত। তবে সেই বংশগুলো প্রকৃত অর্থে গোত্র কি না, তা জানা যায় নি।

একই ধরনের আরও তথ্যের ভার চাপিয়ে পাঠককে আর বিব্রত করব না। আজকের এশিয় গোষ্ঠী ও জাতিগুলোর প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মধ্যে গোত্রীয় সংগঠন যে রীতিমত

বিদ্যমান ছিল, তার স্বপক্ষে বেশ কিছু নজির ইতিমধ্যেই দাখিল করেছি আমরা।

বাইবেলের চতুর্থ পুস্তক থেকে জানা যায় হিব্রুদের বারোটা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল আইনগত ব্যবস্থা অনুসারে হিব্রু সমাজের পুনর্গঠনের ফলে। বর্বর যুগ তখন অতিক্রান্ত শুরু হয়েছে সভ্য যুগ। সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের জোট হিসেবে যে নীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছিল গোষ্ঠীগুলোকে, তা থেকে বোঝা যায় যে তার আগে একটা গোত্রীয় ব্যবস্থা চালু ছিল তাদের মধ্যে এবং সেটাকেই একটা সুসম্বন্ধ চেহারা দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পর্ক মারফৎ ঐক্যবন্ধ সগোত্রীয় জ্ঞাতি-দের কিছু দলকে নিয়ে গড়ে ওঠা গোত্রীয় সমাজব্যবস্থা ছাড়া অন্য ধাঁচের শাসনব্যবস্থা কথা তখন তাদের জানা ছিল না। পরবর্তীকালে তারা সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের আলাদা আলাদা দল হিসেবে সমবেত হয়েছিল পালেস্তাইনে; এক একটা জেলার নামকরণ করে-ছিল জ্যাকবের বারো জন পুত্রের এক একজনের নামে (একমাত্র লেভি গোষ্ঠী বাদে)। এ থেকে প্রমাণ হয় যে তারা একটা সামগ্রিক জনসম্প্রদায় হিসেবে সংগঠিত হয় নি, সংগঠিত হয়েছিল এক একটা বংশধারা অনুযায়ী। সেমিটিক বর্গের সবথেকে বিশিষ্টতম এই জাতিটির ইতিহাস কেন্দ্রীভূত হয়েছে আব্রাহাম, ইসাক, জ্যাকব এবং এই জ্যাকবের বারোজন পুত্রের নামের চারপাশে।

হিব্রুদের ইতিহাস শুরু হয়েছে মূলত আব্রাহামের থেকে। আব্রাহামের পূর্বপুরুষদের একটা বংশতালিকা পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তার থেকে বেশি আর কিছু জানা যায়নি। কয়েকটা উদ্ধৃতির সাহায্যে সে সময়ের প্রগতির স্তর এবং আব্রাহামের আমলের অগ্র-গতির অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। আব্রাহাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাঁর "প্রচুর গবাদি পশু, রুপো এবং সোনা ছিল।"[১] ম্যাকপেলার গুহার জন্য "হেথ্-এর পুত্রদের সামনে আব্রাহাম চারশ শেকেল রুপো ওজন করে দিয়েছিলেন এফ্রনকে। বণিকদের কাছে মুদ্রা হিসেবে রুপোই চালু ছিল।"[২] গার্হস্থ্যজীবন এবং জীবনধারণ পদ্ধতি প্রসঙ্গে এই কথাগুলো উদ্ধৃত করা যায়: "আব্রাহাম দ্রুত সারার তাঁবুতে হাজির হয়ে বললেন, এক্ষুনি তিনটি চমৎকার খাদ্য প্রস্তুত করো; সবটা মেখে নিয়ে উনুনে চাপিয়ে পিঠে বানাও।"[৩] "এবং তিনি মাখন ও দুধ নিলেন, যে বাছুরটির শুশ্রূষা করেছিলেন সেটিকে নিলেন, আর বাছুরটিকে তাদের সামনে রাখলেন।"[৪] যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার প্রসঙ্গে: "আব্রাহাম নিজের হাতে আগুন এবং ছুরি নিলেন।"[৫] ভৃত্যটি রুপো ও সোনার অলঙ্কার নিয়ে এল এবং সেগুলি রেবেকাকে প্রদান করল: তাঁর ভ্রাতা ও মাতাকেও সে মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়েছিল।"[৬] ইশাকের সঙ্গে যখন রেবেকার দেখা হয়, তখন রেবেকা "একটা ওড়নায় মুখ ঢাকে।"[৭]

১। "জেনেসিস", xiii, ২.

২। "জেনেসিস", xxiii, ১৬.

৩। ঐ, xviii, ৬.

৪। ঐ, xviii, ৮.

৫। ঐ, xxii, ৬.

৬। ঐ, xxiv, ৫৩.

৭। ঐ, xxiv, ৬৫

এই একই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে উট, গাধা, ষাঁড়, ভেড়া, ছাগল এবং গরুর কথা। এছাড়াও পাওয়া যায় শস্য পেষাইয়ের জাঁতাকল, জলের কলসী, কানের দুল, ব্রেসলেট, তাঁবু, বাড়ি এবং নগরের উল্লেখ। তীর-ধনুক, তরোয়াল, শস্য, মদ এবং শস্য চাষের জমির উল্লেখও চোখে পড়ে। অর্থাৎ, আব্রাহাম, ইশাক এবং জ্যাকব ছিলেন বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের মানুষ। সেমিটিক বর্গের এই শাখাটির মধ্যে লিখনপদ্ধতি সম্ভবত তখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ঐ যুগে তারা অগ্রগতির যে স্তরে পেঁছেছিল, তার সঙ্গে হোমারের যুগের গ্রীকদের যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

হিব্রুদের প্রাচীন বিবাহপ্রথা থেকে বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে প্রাচীন ধরনের গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। আব্রাহাম তাঁর ভৃত্যের মারফৎ রেবেকাকে কিনে এনেছিলেন ইশাকের স্ত্রী হিসেবে। "মূল্যবান জিনিসপত্র" দেওয়া হয়েছিল পাত্রীর ভাই এবং মাকে, বাবাকে নয়। স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের প্রথাবিশিষ্ট কোন গোত্র বিদ্যমান থাকলে বাবাকে দেওয়া যে-কোন জিনিস তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরাই পেয়ে যেত। আবার, আব্রাহাম তাঁর সৎ-বোন সারাকে বিবাহ করেন। তিনি বলেছেন, "ও আমার ভগ্নী; ও আমার পিতার কন্যা বটে, কিন্তু আমার মাতার কন্যা নয়। কাজেই ও আমার স্ত্রী হতেই পারে।"[১]

স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথাবিশিষ্ট গোত্র বিদ্যমান ছিল বলেই আব্রাহাম আর সারা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য হতে পেরেছিলেন। 'রক্তসূত্রে জ্ঞাতি' হলেও তাঁরা 'সগোত্রীয় জ্ঞাতি' ছিলেন না। কাজেই, গোত্রীয়প্রথা অনুযায়ী তাঁরা বিবাহ করতেই পারতেন। পুরুষ-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রথা চালু থাকলে চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত হত। নাহর তাঁর ভাই হারানের কন্যাকে বিবাহ করেন,[২] এবং মোজেসের পিতা আম্‌রাম তাঁর পিতার ভগ্নি অর্থাৎ পিসিকে বিবাহ করেন। আম্‌রামের এই পিসি অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছেন হিব্রু আইনপ্রণেতার জননী।[৩] এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে বংশধারা নির্ণয়ের ব্যাপারে স্ত্রী-ধারা চালু থেকে থাকলে তবেই এ-সব বিবাহ সম্ভব ছিল, কারণ সেক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট নারী-পুরুষরা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হত। পুরুষ-ধারা অনুসরণ করা হলে এরা একই গোত্রের সদস্য হত, বিবাহও সম্ভব হত না। এ-সব ঘটনা থেকে গোত্রের অস্তিত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও অনুমান করা যায় যে তাদের মধ্যে প্রাচীন ধাঁচের গোত্রের অস্তিত্ব ছিল।

মোজেসের আইন প্রণয়নের সময় হিব্রুরা সভ্যতার যুগে পেঁছে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মত অভিজ্ঞতা তখনও সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। বাইবেলের বিবরণ থেকে জানা যায়, রক্তসম্বন্ধযুক্ত দলের ভিত্তিতে তারা একটা ক্রমান্বয়ী সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত ছিল। এই সাংগঠনিক ক্রমটা ছিল গ্রীকদের গোত্র, ভ্রাতৃত্ব আর গোষ্ঠীরই সমতুল। সিনাই উপদ্বীপ অঞ্চলে যখন তারা বসবাস করত, তখন একটা সমাজ হিসেবে ও ফৌজ হিসেবে তাদের সমাবেশ ও সংগঠন প্রসঙ্গে

১। "জেনেসিস", xx, ১২.

২। ঐ, xi, ২৯.

৩। "এক্সোডাস", vi, ২০.

গোত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠীর সমতুল এই রক্তসম্বন্ধযুক্ত দলগুলোর উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়। যেমন, লেভি গোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি ভ্রাতৃত্বে সংগঠিত আটটা গোত্র ছিল।

লেভি গোষ্ঠী

লেভির পুত্ররা
- ১। গেরশন—৭৫০০ জন পুরুষ
- ২। কোহাথ—৮৬০০ জন পুরুষ
- ৩। মেরারি—৬২০০ জন পুরুষ

ক। গেরশনীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১) লিবনি ২) শিমেই।

খ। কোহাথীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১) আমাম ২) ইঝার ৩) হেব্রন ৪) উজ্জিয়েল।

গ। মেরারীয় ভ্রাতৃত্ব

গোত্র—১) মাহ্‌লি ২) মুশি।

"পিতার গোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী লেভির সন্তানদের গোষ্ঠী-গুলির জনসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়···। লেভির পুত্রদের নাম ছিল গেরশন, কোহাথ এবং মেরারি। গেরশনের পুত্রদের নাম ছিল লিবনি এবং শিমেই। কোহাথের পুত্ররা হচ্ছে আমরাম, ইঝার, হেব্রন এবং উজ্জিয়েল। মেরারির পুত্রদের নাম মাহ্‌লি এবং মুশি। পিতার গোষ্ঠী অনুযায়ী এইগুলিই হচ্ছে লেভাইটদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা।"[১]

এই দলগুলোর বিবরণ কখনও সাংগঠনিক ক্রমের ওপরদিক থেকে শুরু হয়েছে, আবার কখনও শুরু হয়েছে নিচের দিক অর্থাৎ প্রাথমিক একক থেকে। যেমন; "সিমিওনের সন্তানরা, তাদের বংশধররা, তাদের পিতার বংশের পরিবারবর্গ।"[২] এখানে সিমিওনের সন্তানরা আর তাদের বংশধররা হচ্ছে গোষ্ঠী, পরিবারবর্গ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব আর পিতার বংশ হচ্ছে গোত্র। আবার, "উজ্জিয়েলের পুত্র এলিজাফান হবে পরিবারের প্রধান, যে পরিবার তার পিতার বংশের, অর্থাৎ কোহাথীয়দের।"[৩] এখানে প্রথমে এসেছে গোত্রের কথা, তারপর ভ্রাতৃত্বের. সবশেষে গোষ্ঠীর। যে ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয়েছে, সে ছিল ভ্রাতৃত্বের প্রধান। পিতার প্রতিটি বংশেরও আলাদা আলাদা প্রতীক-চিহ্ন বা নিশানা থাকত, যাতে করে একের থেকে অপরকে পৃথক করা যায়। "ইজরায়েলের প্রতিটি সন্তান তার পিতার বংশের প্রতীক-চিহ্নে ভূষিত হবে।"[৪] এই সব অভিধাগুলি থেকে তাদের সংগঠনের প্রকৃত চেহারাটা বোঝা যায়, আর জানা যায় যে তাদের সামরিক সংগঠনটা গড়ে উঠেছিল গোত্র, ভ্রাতৃত্ব এবং গোষ্ঠী অনুযায়ী।

১। "নাম্বার্স্", iii, ১৫-২০

২। ঐ, i, ২২.

৩। ঐ, iii, ৩০.

৪। ঐ, ii, ২.

প্রথম ও ক্ষুদ্রতম বিভাগ হচ্ছে, "পিতার বংশ।" প্রতিটা ভ্রাতৃত্বের লোকসংখ্যার কথা মনে রাখলে বোঝা যায় এগুলোতে কয়েকশ করে লোক থাকত। হিব্রু ভাষায় 'বেথ অ্যাব' (beth' ab) শব্দের অর্থ হচ্ছে পৈত্রিক বাড়ি, বাবার বংশ এবং পারিবারিক আবাস। হিব্রুদের মধ্যে যদি গোত্র থেকে থাকে, তাহলে এই অংশটাই হচ্ছে সেই গোত্র। এটিকে চিহ্নিত করার জন্য দুটো অভিধা প্রয়োগ করার দরুণ একটা সন্দেহ অবশ্য দানা বাঁধে। তবে সে সময় এক-বিবাহপ্রথা চালু হয়ে যাওয়ার ফলে যদি প্রচুর সংখ্যক পৃথক পৃথক পরিবার গড়ে ওঠে থাকে এবং সেগুলো যদি খুব উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত জ্ঞাতিদের বোঝানের জন্য বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগের একটা প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায়। আমরামের বংশ, ইঝারের বংশ, হেব্রোনের বংশ, উজ্জিয়েলের বংশ এরকম কথা আমরা প্রায়শই খুঁজে পাই। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পদবীধারী পরিবারকে আজ আমরা যে অর্থে বংশ বলে থাকি, সে ধারণা হিব্রুদের মধ্যে তখনও পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। তাই মনে হয় কথাটার অর্থ ছিল খুব সম্ভবত জ্ঞাতিত্ব বা বংশধারা।[1] যেহেতু প্রতিটি শাখা-প্রশাখার প্রধান হিসেবে কোন-না-কোন পুরুষেরই নাম পাওয়া যায় এবং যেহেতু শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্য দিয়েই বংশধারার পরিচয় দেয়, সেহেতু জোর দিয়েই বলা যায় যে ঐ-সময় হিব্রুদের বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারাই অনুসৃত হত। সাংগঠনিক ক্রমের পরবর্তী স্তর হচ্ছে পরিবার, অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব। হিব্রু ভাষায় এই সংগঠনকে বলা হয় মিশপাকাহ (mishpacah), যার অর্থ হল একতা বা একদলীয়তা। এটা গড়ে উঠত দু'তিনটি বংশকে নিয়ে। একই আদি পরিবার থেকে ভেঙে সৃষ্টি হত এই বংশগুলো। এদের এক একটা আলাদা আলাদা ভ্রাতৃত্বগত নাম থাকত। গ্রীকদের ভ্রাতৃত্ব সংগঠনের সঙ্গে এর মিলটা চোখে পড়ার মত। প্রতি বছর এই পরিবার বা ভ্রাতৃত্বের তরফ থেকে একটা ভোজসভার আয়োজন করা হত, সেখানে বিভিন্ন পশুকে বলি দেওয়া হত।[2] আর সবশেষে ছিল গোষ্ঠী। হিব্রুভাষায় একে বলা হত মাঠেই (matteh), যার অর্থ হল শাখা, কাণ্ড বা অঙ্কুর। এটা ছিল গ্রীক গোষ্ঠীর সমতুল সংগঠন।

জ্ঞাতিদের এইসব সংগঠনের সদস্যদের অধিকার, সুযোগসুবিধে বাধ্যবাধকতা কী কী ছিল, সে সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। 'পিতার বংশ' থেকে শুরু করে 'গোষ্ঠী' পর্যন্ত এদের প্রতিটা সামাজিক সংগঠন যে জ্ঞাতিত্বের ধারণার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকত, দেখা যাচ্ছে সেটা গ্রীক, লাতিন বা আমেরিকার ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর ঐ-সব ধরণের সংগঠনের জ্ঞাতিত্ব সংক্রান্ত ধারণার থেকে অনেক সুস্পষ্ট এবং যথাযথ ছিল। এথেনীয় লোককথায় বলা হয়েছে যে তাদের চারটি গোষ্ঠী উদ্ভূত হয়েছিল ইওনের চারজন পুত্রের থেকে। কিন্তু গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের উদ্ভব সম্বন্ধে কোন কথা সেখানে পাওয়া যায় না। বিপরীতে, হিব্রুদের বিবরণে জ্যাকবের বারোজন পুত্রের

১। এক্সোডাস, vi, ১৪ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কিয়েল এবং দেলিৎশ্ বলেছেন, "পিতার বংশ বলতে বোঝানো হত কোন এক সাধারণ পূর্বপুরুষের নামে চিহ্নিত কিছু পরিবারের সমষ্টিকে।" এই উক্তির মধ্যে আমরা গোত্রের সংজ্ঞাই খুঁজে পাই।

২। "আই স্যামুয়েল", XX, ৬, ২৯.

থেকে তাদের বারোটা গোষ্ঠীর উদ্ভবের কথা বলার পাশাপাশিই তাদের প্রত্যেকের সন্তান ও বংশধরদের থেকে গোত্র এবং ভ্রাতৃত্বগুলোর উদ্ভবের বিবরণও দেওয়া হয়েছে। ঠিক এইভাবে গোত্র এবং ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠার বিবরণ পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বিবরণটাকে দেখতে হবে লোককথা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সাহায্যে বিদ্যমান রক্তসম্বন্ধযুক্ত দলগুলোকে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করার একটা প্রক্রিয়া হিসেবে। এবং দেখা যাচ্ছে এ কাজ করতে গিয়ে ছোটখাট প্রতিবন্ধকগুলি দূর করা হয়েছিল আইনগত পদক্ষেপের সাহায্য নিয়ে।

হিব্রুরা নিজেদের বলে "ইজরায়েলের মানুষ" এবং বলে যে তারা হচ্ছে একটা "জনমণ্ডলী।"[১] এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তাদের সংগঠনটা ছিল সামাজিক সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন নয়।

এবার আফ্রিকার কথায় আসা যাক। আফ্রিকায় বন্যতা আর বর্বরতার এক নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখতে পাই আমরা। বাইরে থেকে আসা নানান কারিগরী ও যন্ত্রপাতির ধাক্কায় তাদের নিজস্ব কারিগরী ও উদ্ভাবনগুলো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মহাদেশের ব্যাপক অংশ আজও রয়েছে বন্য যুগের নিম্ন পর্যায়ে। (নরখাদকবৃত্তিসহ) এবং কিছু অংশ বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে। আফ্রিকার ভেতর দিকের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে স্বদেশীয় সংস্কৃতি এবং স্বাভাবিক অবস্থার দিকে এগোনোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতিতাত্ত্বিক দিক থেকে আফ্রিকা একটা উষর মহাদেশ।

আফ্রিকা মহাদেশ নিগ্রো জাতির আদি বাসস্থান হলেও, এ-কথা সুবিদিত যে সেখানে নিগ্রোদের সংখ্যা মোটেই বেশি নয় এবং তাদের বসবাসের এলাকাও তেমন বড় নয়। লাথাম চমৎকারভাবে বলেছেন, "নিগ্রোরা হচ্ছে ব্যতিক্রমী আফ্রিকান।"[২] দু শাইলু কঙ্গো এবং নাইজার নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলে যেসব মানব গোষ্ঠীদের যেমন আশির, আপোনো, ইশোগো এবং আশাঙ্গোদের দেখেছিলেন, তারা হচ্ছে খাঁটি নিগ্রো। তিনি লিখেছেন, "প্রতিটা গ্রামে একজন করে প্রধান থাকত। তাছাড়া, অভ্যন্তরভাগের গ্রামগুলো পরিচালনা করত বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা। গ্রামের এক একটা অংশ এক একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তির অধীনে থাকত। সেখানে তার সঙ্গে থাকত তার নিজের লোকেরা। প্রতিটা বংশের একজন ইফোউমৌ (ifoumou), ফুমৌ (fumou) বা স্বীকৃত বংশপ্রধান থাকত (ইফোউমৌ শব্দের অর্থ হল উৎস, জনক)। কেন তাদের গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন বংশে বিভক্ত হয়ে গেল, সে সম্বন্ধেওখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে কোন খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। ব্যাপারটা যে কেন ঘটেছিল, তা বোধহয় তাদের জানা নেই। তবে এখন আর তাদের মধ্যে নতুন নতুন বংশ সৃষ্টি হচ্ছে না··· । প্রতিবেশীদের বাড়ির থেকে প্রবীণ বা বর্ষীয়ান ব্যক্তির বাড়ি মোটেই ভাল হয় না। স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার কথা তারা জানে না··· । কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে বর্ষীয়ান ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেন··· । একটি গোষ্ঠী ও বংশের নারী-পুরুষের সঙ্গে অন্য

১। "নাম্বারস্", 1, ২.

২। "ডেসক্রিপটিভ এথ্নোলজি", ii, ১৮৪.

গোষ্ঠীর পুরুষ-নারীদের বিবাহ হয়। এর ফলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের একটা অনুভূতি গড়ে ওঠে। একই বংশের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কোন নারী ও পুরুষের মধ্যে অত্যন্ত দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক থাকলেও তারা বিবাহ করতে পারে না। তবে ভাইপো তার কাকার স্ত্রী অর্থাৎ কাকীমাদের অনায়াসেই বিবাহ করতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, যেমন বালাকাইদের মধ্যে, একমাত্র নিজের মা ছাড়া পিতার অন্যান্য স্ত্রীদের, অর্থাৎ সৎমাদের, বিবাহ করতে পারে···। আমি যে-সব গোষ্ঠীকে দেখেছি, তাদের সকলকার মধ্যেই বহুবিবাহ ও দাসপ্রথা চালু আছে···। পশ্চিম আফ্রিকার গোষ্ঠীগুলোর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মটা এ-রকম—বড় ভাইয়ের সম্পদের (নারী, দাস ইত্যাদি) উত্তরাধিকারী হয় তার পরের ভাই, কিন্তু সবথেকে ছোট ভাই আগে মারা গেলে তার যাবতীয় সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় সবথেকে বড় ভাই ; মৃতের কোন ভাই না থাকলে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় তার ভাগ্নে। বংশ বা পরিবারের প্রধানও মনোনীত হয় উত্তরাধিকারসূত্রে, ঠিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মতই। কোন পরিবারের সব ভাই মারা গেলে পরিবারের প্রধান হিসেবে মনোনীত হয় তাদের বড় বোনের বড় ছেলে। যতদিন না বংশের ঐ শাখাটা বিলুপ্ত হয়ে যায়, ততদিন এই নিয়মই চালু থাকে, কেননা সমস্ত বংশই নারী-ধারায় উদ্ভূত বলে মনে করা হয়।”[১]

ওপরের বিবরণে একটা সাচ্চা গোত্রের যাবতীয় লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা চালু থাকা। অর্থাৎ, গোত্রের প্রাচীন রূপটাই টিকে আছে সেখানে। তাছাড়া, পদ, সম্পত্তি এবং গোত্রীয় নাম বা পদবীও বর্তায় স্ত্রী-ধারা অনুসারেই। প্রধানের পদ, এক ভাইয়ের কাছ থেকে অপর ভাইদের ওপর বর্তায়, অথবা বর্তায় মামার কাছ থেকে ভাগ্নের ওপর, অর্থাৎ বোনের ছেলের ওপর—ঠিক আমেরিকার আদিবাসীদের মতই। মৃত প্রধানের ছেলেরা কিন্তু তার পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কেননা তারা অন্য গোত্রের সদস্য। গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহও নিষিদ্ধ। এই চমৎকার বিবরণে একটা জিনিসই শুধু অনুপস্থিত—কয়েকটা গোত্রের নাম। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটা আরও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

জাম্বেসি নদী অঞ্চলের বানযাইরারা নিগ্রোদের চেয়ে উন্নত স্তরের গোষ্ঠী। এদের সম্বন্ধে ডাঃ লিভিংস্টোন বলেছেন : “বানযাইরা শাসনব্যবস্থাটা বেশ বিচিত্র ধরনের। এদের মধ্যে এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র চালু আছে। মৃত প্রধানের নিজের ছেলেকে এরা পরবর্তী প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করে না, পদটা পায় মৃত প্রধানের বোনের ছেলে। কোন প্রধানের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হলে তাকে বরখাস্ত করে অন্য আরেকজনকে ঐ পদে বসানো হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও প্রয়োজন হলে তারা মৃত দূরের কোন গোষ্ঠী থেকে ঐ প্রধানের কোন ভাইকে কিম্বা বোনের ছেলেকে নিয়ে আসে নিজেদের প্রধান হিসেবে, কিন্তু কখনোই তার নিজের ছেলে বা মেয়েকে নির্বাচিত করে না···। পূর্ববর্তী প্রধানের সমস্ত স্ত্রীদের যাবতীয় সম্পত্তি পরবর্তী প্রধান পায় এবং পূর্ববর্তী প্রধানের

১। “আশাঙ্গো ল্যাণ্ড”, অ্যাপলটন সংস্করণ, পৃঃ ৪২৫ এবং তৎপরবর্তী

সন্তানরাও গণ্য হয় তার সন্তান হিসেবেই।"[১] এদের সামাজিক সংগঠনের কোন বিশদ বিবরণ ডাঃ লিভিংস্টোন লিখে যাননি। কিন্তু এক ভাইয়ের কাছ থেকে অপর ভাইয়ের ওপর অথবা মামার কাছ থেকে ভাগ্নের ওপর প্রধান পদটা বর্তানো থেকে বোঝা যায়—গোত্রের অস্তিত্ব ছিলই, এবং বংশধারা নির্ণীত হত স্ত্রী-ধারা অনুসারে।

ডাঃ লিভিংস্টোনের মতে, জাম্বেসি নদীবিধৌত অঞ্চলের অসংখ্য গোষ্ঠীর জনসমষ্টিরা এবং সেখান থেকে টানা দক্ষিণ দিকে কেপ্ কলোনি পর্যন্ত অঞ্চলের জনসমষ্টি মনে করে তারা সকলে একই আদি বংশের তিনটি মূল শাখা থেকে উদ্ভূত—বেচুয়ানা, বাসুতো আর কাফির।[২] প্রথমোক্তদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "বেচুয়ানা গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু জীবজন্তুর নাম অনুযায়ী কয়েকটা বিভাগ রয়েছে। সম্ভবত পুরনো অঞ্চলের ঈজিপ্সীয়দের মত এরাও প্রাচীনকালে পশু-উপাসনা করত। যেমন, বাকাত্‌লা মানে হচ্ছে 'বানরের বংশধর', বাকুওনা মানে 'বড় কুমীরের বংশধর', বাত্‌লাপি মানে 'মাছের বংশধর'। যে পশুর নামে যে গোষ্ঠীর নাম, সেই পশুটা সম্বন্ধে সেই গোষ্ঠীর মানুষদের একটা অহেতুক আতঙ্ক থাকে···। সেই পশুর মাংস সেই গোষ্ঠীর লোকেরা কখনও খায় না···। অনেক বিলুপ্ত গোষ্ঠীর অবশিষ্ট দু' একজন সদস্যের নামের মধ্যে সেই প্রাচীন গোষ্ঠীর পরিচয় লুকিয়ে থাকে। যেমন বাতাউ, অর্থাৎ 'সিংহের বংশধর', বাশোগা অর্থাৎ "সাপের বংশধর। এইসব নামের কোন গোষ্ঠী আজ আর বর্ত্তমান নেই।"[৩] এইসব জীবজন্তুর নাম খুব সম্ভবত গোত্রেরই সাক্ষ্যবাহী, গোষ্ঠীর নয়। তাছাড়া, ঐ-সব গোষ্ঠীর সর্বশেষ জীবিত সদস্য হিসেবে মাত্র একজন করেই ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারটাও গোত্রের ক্ষেত্রে ঘটা যতটা সহজ, কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ঘটা ঠিক ততটা সহজ নয়। অ্যাঙ্গোলার কামাঙ্গে উপত্যকার বাঙ্গালাদের সম্বন্ধে লিভিংস্টোন বলেছেন, "কোন প্রধান মারা গেলে তার পদের উত্তরাধিকারী হয় তার ভাই, কিন্তু পুত্ররা নয়। ভাগ্নেরা তাদের মামার কর্তৃত্বাধীনে থাকে। নিজের ঋণ শোধের জন্য মামা অনেক সময় ভাগ্নেকে বিক্রি করে দেয়।"[৪] এখানেও আমরা স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি। তবে এখানে এবং অন্য

১। "ট্র্যাভ্‌ল্‌স্ ইন সাউথ আফ্রিকা", অ্যাপ্‌ল্‌টন সংস্করণ, পরিচ্ছেদ ৩০, পৃঃ ৬৬০.—"কোন যুবক যদি অন্য গ্রামের কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে আর তাদের বিবাহে যদি দু' পক্ষের মা-বাবার কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে যুবকটিকে ঐ মেয়েটির গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে হয়। তার শাশুড়ীর জন্য তাকে বিশেষ কিছু কাজও করে দিতে হয়···। এ-রকম ক্রীতদাসসুলভ জীবন সহ্য করতে না পেরে সে যদি তার মা-বাবার কাছে ফিরে আসতে চায়, তাহলে আসতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তার সব সন্তানদের ছেড়ে আসতে হবে, কেননা ঐ সন্তানরা তার স্ত্রীর সন্তান হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে।" —ঐ, পৃঃ ৬৬৭.

২। "ট্র্যাভ্‌ল্‌স্ ইন সাউথ আফ্রিকা", পৃঃ ২১৯.

৩। ঐ, পৃঃ ৪৭১.

৪। ঐ, পৃঃ ৪৭১.

সর্বত্রই ডাঃ লিভিংস্টোনের বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। ফলে তাঁর বক্তব্যের সাহায্যে গোত্রের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো খুবই মুস্কিল।

অস্ট্রেলিয়ায় কামিলারইদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। নৈতিকতার বিচারে এই বিরাট দ্বীপের আদিবাসীরা খুবই নীচের স্তরে রয়েছে। এদের অস্তিত্ব যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন এরা বন্যতার বেশ নিম্ন স্তরে ছিল। কয়েকটা গোষ্ঠীর লোকেরা নরখাদক ছিল। এই শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে মিঃ ফিসন (যাঁর নাম আগেই উল্লিখিত হয়েছে) আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন "এদের অন্তত কয়েকটা গোষ্ঠী নরখাদক। এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। ওয়াইড উপসাগর অঞ্চলের গোষ্ঠীর লোকেরা যুদ্ধে নিহত শত্রুর মাংস তো খায়ই, এমনকি যুদ্ধে নিহত বা স্বাভাবিক কারণে মৃত (যদি তারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়) বন্ধুদের মাংস খেতেও কসুর করে না। খাওয়ার আগে মৃতের শরীরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, তারপর চর্বি আর কাঠকয়লার মিশ্রণ দিয়ে সেটাকে ভালো করে ঘষে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। এই চামড়াগুলো এদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এদের ধারণা, ঐ চামড়ার মধ্যে দারুণ ভেষজগুণ থাকে।"

মানবজীবনের এ-রকম চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারি বন্যতা ঠিক কোন্ পর্যায়ে রয়েছে, তার বিভিন্ন রীতিনীতি কোন্ স্তরে রয়েছে, বস্তুগত বিকাশ কতটা হয়েছে আর মানুষের মানসিক ও নৈতিক জীবন কতটা নিম্ন স্তরে আটকে আছে। আজও অস্ট্রেলিয়ানরা মানুষ খায়। এ থেকেই বোঝা যায় তারা কতটা পিছিয়ে রয়েছে। অথচ, তারা বসবাস করে একটা মহাদেশের মত বিশাল অঞ্চলে, প্রচুর খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় সেখানে, জলবায়ু মোটেই প্রতিকুল নয় এবং জীবনধারণের উপকরণও যথেষ্টই সুলভ। তা সত্ত্বেও, এ-রকম একটা জায়গায় কয়েক হাজার বছর ধরে বসবাস করার পরও তারা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের বন্যই রয়ে গেছে। বাইরে থেকে কোন আলোকরশ্মি গিয়ে না পৌঁছলে তারা হয়ত আরও হাজার বছর বন্যতার এই আঁধারঘেরা পরিমণ্ডলেই রয়ে যাবে।

অস্ট্রেলিয়ানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাভাবিক চরিত্রের এবং একই ধরনের। ওখানে শুধু কামিলারইদের মধ্যেই যে গোত্রীয় সংগঠন আছে, তা নয়। সম্ভবত ওখানকার সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই গোত্রের অস্তিত্ব আছে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার লেস্‌পেড উপসাগরের কাছাকাছি বসবাস করে নারিন্‌ইয়েরিরা। এদের মধ্যে পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের নামে অভিহিত নানান গোত্র আছে। আমার বন্ধু মিঃ ফিসনকে লেখা চিঠিতে রেভারেণ্ড জর্জ টাপ্‌লিন জানিয়েছেন—নারিন্‌ইয়েরিরা নিজেদের গোত্রের কাউকে বিবাহ করে না, এবং সন্তানরা তাদের বাবার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর তিনি লিখেছেন: "নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্-এর কামিলারই ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর মত এদের মধ্যেও কোন বর্ণ বা জাতপাত নেই, কোন শ্রেণীও নেই। তবে প্রত্যেক গোষ্ঠী বা বংশের (আর গোষ্ঠী হচ্ছে আসলে বংশই) নিজস্ব একটা কুলপ্রতীক (totem) বা

ন্‌গাইতিয়ে (ngaitye) থাকে। কোন কোন ব্যক্তিরও নিজস্ব ন্‌গাইতিয়ে থাকে। এই প্রতীকটা হচ্ছে রক্ষাকর্তা হিসেবে ঐ-সব ব্যক্তিদের ক্ষমতার পরিচায়ক। কোন জীব-জন্তু, পাখি বা কীটপতঙ্গকেই কুলপ্রতীক করা হয়।...এঁদের বিবাহরীতি অত্যন্ত কঠোর। গোষ্ঠীকে (গোত্রকে) এরা বংশ বলেই মনে করে, তাই কেউ তার নিজের গোষ্ঠীর কাউকে বিবাহ করতে পারে না।"

মিঃ ফিসনও লিখেছেন, "মিঃ এ. এস. পি. ক্যামেরন আমাকে যে সব তথ্য জানিয়েছেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কুইন্সল্যাণ্ডের মারানোআ জেলার গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও (যাদের উপভাষা হচ্ছে উর্দি) শ্রেণী-নাম (পদবী) এবং কুলপ্রতীকের ব্যাপারে ঠিক কামিলারয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর মত একই নিয়ম চালু আছে।" মিঃ চার্লস জি. এন. লক্‌উড-এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডার্লিং নদী অঞ্চলের অস্ট্রেলিয়ানদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "এরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে (গোত্র) বিভক্ত। এদের মধ্যে নাম পাচ্ছি এমুপাখি, বুনোহাঁস আর ক্যাঙ্গারু গোষ্ঠীর। অন্য আরও গোষ্ঠী আছে কি-না, তা জানতে পারিনি। সন্তানরা তাদের মায়ের শ্রেণী-নাম (পদবী) এবং কুল-প্রতীকই গ্রহণ করে যাচ্ছে।"[১]

উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোত্রীয় সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানার পর স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যেই গোত্রের অস্তিত্ব আছে। তবে এটাও সত্য যে সেগুলে মোটেই কোন উন্নত মানের সংগঠন হয়ে উঠতে পারেনি আজও। পলিনেশিয়া, মাইক্রোনেশিয়া ও পাপুয়া দ্বীপের অধিবাসীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান একান্তই সীমিত এবং অপূর্ণাঙ্গ। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, সামোয়া, মার্কেসাস দ্বীপ অথবা নিউজিল্যাণ্ড—এ-সব জায়গায় গোত্রীয় সংগঠনের কোন নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয়নি। এদের জ্ঞাতিত্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাটাও নিতান্তই আদিম ধরনের। এ থেকে বোঝা যায় যে গোত্রের অস্তিত্বের জন্য যে অবস্থাটার দরকার হয়, সে অবস্থায় এখনও পেঁছতে পারেনি তারা।[২] মাইক্রোনেশিয়ার কোন কোন দ্বীপে প্রধানের পদটা হস্তান্তরিত হয় নারীদের মারফৎ,[৩] তবে এ রীতিটা গোত্র ছাড়াও চালু থাকতে পারে। ফিজির অধিবাসীরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত, এরা একই মূল ভাষার বিভিন্ন উপ-ভাষায় কথা বলে থাকে। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে রেওয়া গোষ্ঠী। এদের মধ্যে পৃথক পৃথক নামবিশিষ্ট চারটি উপবিভাগ আছে, আবার এই চারটি উপবিভাগের প্রত্যেকটার মধ্যেও আছে কয়েকটা করে ভাগ। এই শেষোক্ত ভাগগুলোকে গোত্র হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না। তার অন্যতম কারণ হল—এই ভাগগুলোর সদস্যারা নিজেদের ভাগেরই কাউকে বিবাহ করতে পারে। অর্থাৎ অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুসারে। টোঙ্গানদের মধ্যে কিছু উপ-বিভাগ আছে, আবার সেই উপবিভাগগুলোর মধ্যেও রেওয়াদের মত কয়েকটা করে ভাগ আছে।

১। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য, টেলর-এর "আর্লি হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইণ্ড", পৃঃ ২৮৪.

২। "সিস্টেমস্ অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি" ইত্যাদি, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৫১, ৪৮২.

৩। "মিশনারি হেরাল্ড", ১৮৫৩, পৃ. ৯০.

বিবাহ, পরিবার, জীবনযাপন এবং শাসনব্যবস্থা—এইসব সাদামাটা ধারণাগুলোকে কেন্দ্র করেই প্রথম সামাজিক সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল। তাই প্রাচীন সমাজের কাঠামো আর নীতির ব্যাখ্যাও শুরু হয় এগুলো থেকেই। বিভিন্ন যুগের অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে মানবজাতি এগিয়ে চলে প্রগতির পথে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিচার করলে বোঝা যায়—ওসিনিয়ার অধিবাসীদের এই আলাদা আলাদা থাকা, তাদের প্রত্যেকের বসবাসের সীমিত এলাকা এবং জীবনধারণের অপ্রতুল উপাদনের দরুণ তাদের অগ্রগতি ঘটেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। সুদূর অতীতে এশিয়ার বাসিন্দারা যে অবস্থায় ছিল, এরা আজ সেই অবস্থায় রয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে থাকার দরুণ এদের মধ্যে কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই গড়ে উঠেছে। তবু, এইসব দ্বীপ আজও অগ্রগতির একটা প্রাথমিক দশাতেই আটকে আছে। এদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন, আবিষ্কার এবং মানসিক ও নৈতিক প্রলক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য নৃতাত্ত্বিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

গোত্রভিত্তিক সংগঠন এবং কোথায় কোথায় তা আছে, সে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এ সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা গেছে অস্ট্রেলিয়ায়, দেখা গেছে আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে। আফ্রিকার অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও এর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। আমেরিকার আদিবাসীদের সেই অংশটার অস্তিত্ব, প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ার সময় যারা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে ছিল, তাদের সমাজে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। সে সময় যে ভিলেজ ইন্ডিয়ানরা ছিল বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে, তাদের একটা অংশের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া গেছে গোত্রের অস্তিত্ব। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের গ্রীক ও লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় ছিল গোত্র, এবং আর্য জাতির বাকি শাখাগুলোর বেশ কয়েকটার মধ্যেও এর অস্তিত্ব ছিল। তুরানিয়, উরালিয় ও মঙ্গোলিয়দের মধ্যে, তুঙ্গুসিয় ও চৈনিকদের মধ্যে এবং সেমিটিক জাতিগুলোর ক্ষেত্রে হিব্রুদের মধ্যে গোত্রের অস্তিত্ব দেখা গেছে বা তার অস্তিত্বের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই যে গোত্রের অস্তিত্ব ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট তথ্য হাজির করতে পেরেছি। বন্য-যুগের উচ্চ পর্যায়ে এবং বর্বরতার সমগ্র পর্যায় জুড়েই পৃথিবীর বুকে টিকে থেকেছে গোত্র।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকেও আরও প্রমাণিত হয়েছে যে এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানটাই ছিল প্রাচীন মানব সমাজের উৎস এবং বনিয়াদ। এটাই ছিল অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে গড়ে ওঠা প্রথম সুসম্বন্ধ নীতি, যা মানুষকে একটা নির্দিষ্ট ধাঁচ অনুযায়ী সংগঠিত করতে পেরেছিল এবং সমাজব্যবস্থা রাজনৈতিক সমাজে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত তার ঐক্যকে টিকিয়ে রাখতেও সক্ষম হয়েছিল। আজও পর্যন্ত সবকটা মহাদেশে গোত্রের কিছু-না-কিছু অবশেষ রয়ে গেছে। এ থেকে এই সংগঠনটার প্রাচীনত্ব, সারা পৃথিবীতে বিদ্যমানতা আর প্রবল জীবনীশক্তিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীতে গোত্রের ছড়িয়ে থাকা আর আজও টিকে থাকা থেকে বোঝা যায়, মানবজাতির প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে গোত্রীয় সংগঠন কত সুন্দরভাবে খাপখেয়ে গিয়েছিল। মানব-জাতির ইতিহাসের সবথেকে ঘটনাবহুল পর্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে এই সংগঠন।

সমাজের কোন এক নির্দিষ্ট অবস্থায় গোত্র কি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদ্ভূত হয়েছিল, সে কারণেই কি নানান বিচ্ছিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদাভাবে গোত্র গড়ে উঠেছিল? নাকি এটা একটা জায়গা থেকেই সৃষ্টি হওয়ার পর সেই আদি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া লোকদের মারফৎ ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য অনুমানের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে, একটু-আধটু পরিবর্তন করে নিলে দ্বিতীয় বক্তব্যটাকেই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। কারণ গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের আগে পৃথিবীতে দু-ধরনের বিবাহ ও পরিবার দেখা গেছে; এর মধ্যে দ্বিতীয় ধরনের বিবাহ ও পরিবার প্রথা চালু করার জন্য দরকার হয়েছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা, আবার এই অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের ফলেই মানুষ গোত্রের উদ্ভাবন করতে পেরেছিল। এক বিস্ময়কর ধরনের দাম্পত্য ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফৎ একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়ার চূড়ান্ত ফল স্বরূপ গড়ে উঠেছিল ঐ দ্বিতীয় ধরনের পরিবার। প্রথমোক্ত ধরনের দাম্পত্য ব্যবস্থা বন্য মানুষদের ওপর চেপে বসেছিল শক্ত হয়ে। তার হাত থেকে মানুষের চরম মুক্তিটা যে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন জায়গায় ঘটেছিল—সেটা বিশ্বাস করা শক্ত। মানব ইতিহাসের প্রথম থেকেই নিরাপত্তা আর জীবন ধারণের জন্য রক্তসম্বন্ধীয় জ্ঞাতিরা যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস করত, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গোত্র হচ্ছে জ্ঞাতিদের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের একটা সংগঠন। জ্ঞাতিদের শুধুমাত্র একটা অংশকেই নিজের অন্তর্ভুক্ত করে, বাকিদের বাদ দেয় সে। নিজের মধ্যেকার ঐ অংশটাকে সে সংগঠিত করে রক্তসম্বন্ধের ভিত্তিতে, তারা প্রত্যেকে একই পদবী ধারণ করে এবং সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধে পায়। সম্বন্ধহীন ব্যক্তিদের সাথে বিবাহ সুবিধেজনক দিকটা সুনিশ্চিত করার জন্য গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সাংগঠনিক বিচারে এটা ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি, কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ ঘটানো খুবই দুরূহ ছিল। গোত্র সংক্রান্ত ধারণাটা মোটেই খুব সহজ-স্বাভাবিক নয়, বরং যথেষ্টই দুর্বোধ্য, নিগূঢ়। তাই বলা যায়, গোত্রের সূচনা যথেষ্ট উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়েছিল। ধারণার প্রথম অংকুরটা মাথা তোলার পর তাকে পরিণত করে তুলতে (যাবতীয় রীতি-প্রথা সহ) প্রয়োজন হয়েছিল সুদীর্ঘ সময়। পলিনেশিয়দের মধ্যে দলগত বিবাহ ভিত্তিক পরিবার চালু ছিল, কিন্তু তারা কোন গোত্র গড়ে তুলতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যেও ঐ একই ধরনের পরিবার চালু থাকলেও তারা গোত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এই দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকেই উদ্ভব ঘটেছিল গোত্রের। যে-সব গোষ্ঠী গোত্র গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই গোত্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো বিদ্যমান ছিল। গোত্র গড়ে ওঠা সম্বন্ধে একটু আগে যে মত উল্লিখিত হয়েছে, এটা হচ্ছে তারই একটা পরিবর্তিত রূপ। গোত্র পূর্ব সমাজে গোত্রের ভ্রূণটা লুকিয়ে ছিল নারী-পুরুষ বিভাজনের মধ্যেই। এক সময় গড়ে উঠল গোত্রের প্রাচীন কাঠামোটা, সৃষ্টি হল একদল উন্নত মানুষ। স্বাভাবিক-

ভাবেই তখন গোত্র সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। গোত্রের সংগঠনটার ব্যাখ্যা করার চেয়ে তার ছড়িয়ে পড়ার ব্যাখ্যা করা অনেক সহজ। এইসব দিকগুলোর কথা বিচার করে দেখলে বোঝা যায়—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে আলাদা আলাদাভাবে গোত্র গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, যে-সব বন্য মানুষদের মধ্যে গোত্র গড়ে উঠেছিল, তারা স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্যদের তুলনায় অনেক উন্নত হয়ে 'উঠতে পেরেছিল। সে সময় মানুষ দেশান্তরী হত বন্য-জীবজন্তুদের থেকে পালানোর কারণে অথবা বসবাসের কোন উৎকৃষ্ট অঞ্চল খুঁজে বার করার জন্য। এই অবস্থায় একটা উন্নত সংগঠন অর্থাৎ গোত্রবিশিষ্ট কোন জাতি যে সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে তা আর আশ্চর্য কি! অতএব, যাবতীয় প্রধান প্রধান তথ্যগুলো মিলিয়ে দেখলে মনে হয়—গোত্রীয় সংগঠন কোন একটি মাত্র জায়গায় সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য আমরা যদি অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণীগুলোকে (যাদের দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকে গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল) প্রাচীন সমাজের মূল বনিয়াদ বলে ধরে নিই, তাহলে আলাদা কথা। সে-ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয় যে যেখানেই এই শ্রেণীসমূহে অস্তিত্ব ছিল, সেখানেই গোত্র গড়ে উঠেছিল।

কোন একটা বিশেষ অঞ্চলেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল ধরে নিলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়, যে একটা মূল বা আদি কেন্দ্র থেকে দেশান্তরের মধ্য দিয়েই তারা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। সেক্ষেত্রে এশিয়া মহাদেশকেই মানবজাতির জন্মভূমি বলে মেনে নিতে হয়, কেননা ইউরোপ, আফ্রিকা আর আমেরিকার তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক আদি ধরনের মানবগোষ্ঠী বসবাস করে এশিয়ায়। এইসঙ্গেই মনে হয় যে সেই মূল গোষ্ঠী থেকে নিগ্রোরা এবং অস্ট্রেলিয়ানরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তখন সমাজ ছিল লিঙ্গের ভিত্তিতে সংগঠিত, এবং পরিবার ছিল দলগত বিবাহ ভিত্তিক। পলিনেশিয়রা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল আরও পরে, তবে তখনও সমাজের কাঠামোটা একইরকম ছিল। আর গ্যানোয়ানিয়ান বর্গের আমেরিকায় চলে যাওয়াটা ঘটেছিল আরও পরবর্তীকালে এবং গোত্র গড়ে ওঠার পর। অবশ্য ওপরের এই কথাগুলো নিতান্তই অনুমান মাত্র।

প্রাচীন সমাজকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য গোত্র আর তার কার্যকলাপ, এবং কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এই সংগঠন—তা জানা একান্তই জরুরী। সভ্য জাতিগুলোর পূর্বপুরুষদের মধ্যে এই সংগঠন সব থেকে উন্নত হয়ে উঠেছিল বর্বর যুগের একেবারে শেষ দিকে। কিন্তু তার অনেক আগেও গোত্র ছিল। সেই অবস্থায় থাকা বন্য ও বর্বরদের মধ্যেই আজ তার অস্তিত্ব খুঁজে দেখতে হবে। সুসংগঠিত সমাজ গড়ার ধারণাটা মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসের পথ বেয়ে ধীরে-ধীরে বিকশিত হয়েছে। এই সংগঠিত সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলো পরস্পর সংযুক্ত, একটা স্তর জন্ম দিয়েছে আর একটা স্তরের। এই সমাজের যে রূপটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা

করলাম, তার সূচনা হয়েছিল গোত্রের মধ্যেই। মানবজাতির পথচলার ইতিহাসে এমন আর কোন প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পাওয়া যায় না, মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে যার সম্পর্ক গোত্রের মত এত প্রাচীন এবং এত অঙ্গাঙ্গী। মানবজাতির প্রকৃত ইতিহাস ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব আর বিকাশের ইতিহাসের মধ্যেই, আর এইসব প্রতিষ্ঠানেরই অন্যতম হচ্ছে গোত্র। অন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান মানুষের ইতিহাসে সবথেকে বেশি বস্তুগত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, সেইসব প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করেছে গোত্রই।

তৃতীয় খণ্ড

পরিবার সম্পর্কিত ধারণার উন্মেষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন পরিবার

পৃথিবীতে বরাবর এক বিবাহভিত্তিক পরিবারই চালু ছিল, তবে তারই মধ্যে কোথাও কোথাও দেখা যেত পিতৃপ্রধান পরিবার—এ-রকম একটা ধারণা আমাদের মধ্যে চালু আছে। কিন্তু ধারণাটা আদৌ সত্য নয়। পরিবার সংক্রান্ত ধারণার ক্রমবিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক স্তরের মধ্যে দিয়ে, আর এই স্তরগুলোর চূড়ান্ত স্তর হিসেবেই গড়ে উঠেছে এক বিবাহভিত্তিক পরিবার। এখানে আমি দেখাতে চেষ্টা করব যে এর আগে পৃথিবীর সর্বত্রই আরও প্রাচীন ধরনের বিভিন্ন পরিবারব্যবস্থা চালু ছিল, বন্যতার সমগ্র যুগটা ধরে এবং বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে সেইসব পরিবার বিদ্যমান ছিল, আর এই এক বিবাহভিত্তিক বা পিতৃপ্রধান পরিবারের কোন অস্তিত্ব বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের আগে পর্যন্ত ছিল না। এগুলো হচ্ছে অনেক উন্নত স্তরের ফসল। তাছাড়া, মানবসমাজের প্রতিটি জাতির মধ্যে পরিবারের প্রাচীন রূপ সংক্রান্ত কোন-না-কোন পূর্বতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ-ধরনের পরিবার গড়ে ওঠার বনিয়াদ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত প্রাচীন সমাজে এগুলোর অস্তিত্ব থাকা সম্ভবও ছিল না।

ভিন্ন ভিন্ন ও পর্যায়ক্রমিক পাঁচ ধরনের পরিবারের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এগুলোর প্রতিটারই একটা নিজস্ব বিবাহপদ্ধতি ছিল।

১। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার।

এই পরিবার গড়ে উঠত একদল আপন ও জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধযুক্ত (মামাতো-পিসতুতো-খুড়তুতো-মাসতুতো ইত্যাদি) ভাইবোনের অন্তর্বিবাহের ভিত্তিতে।

২। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার।

এক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক আপন ও জ্ঞাতিবোনের বিবাহ হত দলগতভাবে, এক বোনের স্বামী অপর প্রত্যেক বোনেরই স্বামী হিসেবে গণ্য হত। এই যৌথ স্বামীদের একই গোত্রভুক্ত হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আবার, একদল আপন ও জ্ঞাতি-ভাইয়ের বিবাহ হত একদল নারীর সঙ্গে, একজনের স্ত্রী অপর প্রত্যেকেরই স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হত, এবং এক্ষেত্রেও ঐ স্ত্রীদের একই গোত্রভুক্ত হওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা থাকত না। তবে, উভয় ক্ষেত্রেই এইসব স্বামী বা স্ত্রীরা সাধারণত একই গোত্রের সদস্য বা সদস্যা হত। উভয় ক্ষেত্রেই একদল পুরুষের দলগতভাবে বিবাহ হত একদল নারীর সঙ্গে।

৩। জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার।

এক্ষেত্রে বিবাহটা হত একজন নারীর সঙ্গে একজন পুরুষের, কিন্তু যৌনমিলনের ব্যাপারটা শুধু পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। উভয় পক্ষ ইচ্ছামত সম্পর্ক বজায় রাখতে বা সম্পর্ক ভেঙে দিতে পারত।

৪। পিতৃপ্রধান পরিবার।
এই পরিবারের ভিত্তি ছিল একজন পুরুষের সঙ্গে বেশ কিছু নারীর বিবাহ। প্রত্যেক স্ত্রীকে আলাদা আলাদা করে রাখা হত।
৫। এক বিবাহভিত্তিক পরিবার।
একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিবাহের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে এই পরিবার, এবং তাদের যৌন সহবাসও কেবলমাত্র পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।
এই পাঁচ ধরনের পরিবারের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয়, আর পঞ্চম ধরনের পরিবার, কেননা তিনটি সুনির্দিষ্ট জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল এই পরিবারগুলো। ঐ তিন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা আজও বিদ্যমান। আবার, এই ব্যবস্থাগুলো থেকেই পূর্ববর্তী যুগের পরিবার ও বিবাহের রূপগুলোর কথা জানা যায়, যে রূপগুলোর সঙ্গে এইসব জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বাকি দু-ধরনের পরিবার, অর্থাৎ জোড়বাঁধা পরিবার ও পিতৃপ্রধান পরিবার ছিল একটা অন্তর্বর্তী স্তরের ব্যাপার, এবং এগুলো কোন নতুন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সৃষ্টি করতে অথবা তৎকালীন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। তাই মানুষের ইতিহাসে এগুলোর গুরুত্ব কিছুটা কমই। পরিবারের এইসব রূপগুলো কিন্তু পরস্পরের থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রথম রূপটা থেকেই গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় রূপটা, তা থেকে আবার তৃতীয়টা, সেখান থেকে চতুর্থ, চতুর্থের মধ্যে থেকে পঞ্চম রূপটা— এইভাবেই এসেছে একের পর এক পরিবার। তবে, একটা রূপ থেকে আরেকটা রূপে যাওয়ার পথে অসংখ্য ছোটখাট স্তর অবশ্যই পেরিয়ে আসতে হয়েছে। আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে, পর্যায়ক্রমে পরিবারের একটা রূপের মধ্যে থেকেই আরেকটা রূপ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই সবকটি রূপের সম্মিলিত কাঠামোর মধ্যেই পরিবার সংক্রান্ত ধ্যানধারণার ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিহিত রয়েছে।
পরিবার এবং বিবাহের বিভিন্ন রূপের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে হলে রক্তসম্বন্ধ ও ও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার (যে দুটি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত) মর্মবস্তুটা বুঝে নেওয়া দরকার। এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যেই আলোচ্য বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ও সুনিশ্চিত প্রমাণ নিহিত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে থেকে যে সুনিশ্চিত ধারণাটা পাওয়া যায়, তা থেকে আমরা কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। কিন্তু কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকলে ব্যবস্থাটাকে অত্যন্ত জটিল ও বিভ্রান্তিকর বলেই মনে হয়। ঐ ব্যবস্থার মধ্যে যে-সব প্রমাণ নিহিত আছে, তার গুরুত্ব ও মূল্য যাচাই করে দেখার মত পাণ্ডিত্য অর্জন করতে বলা হয় যদি পাঠককে, তাহলে তা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে। এ বিষয়ে আমি "সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি"[১] শীর্ষক একটি রচনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে আমি শুধু মূল তথ্যগুলোর কথাই উল্লেখ করব, উল্লেখ করব পাঠকের পক্ষে বোধগম্য যথাসম্ভব কম দৃষ্টান্ত, এবং বিস্তারিত বিবরণ ও সারণীর জন্য দেখতে বলব ঐ 'সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি' রচনাটি। পরিবার যে বেশ কিছু ধারাবাহিক রূপের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আধুনিক

১। "স্মিথ্‌সনিয়ান কনট্রিবিউশন্‌স্ টু নলেজ", খণ্ড ১৭.

চেহারায় এসে পৌঁছেছে—আমাদের এই মুখ্য প্রতিপাদ্যটি মানুষের ইতিহাসের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রকৃত ইতিহাস খোঁজার জন্য এই ব্যবস্থাগুলোকে জানাটা তাই একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পরিচ্ছেদে এবং পরবর্তী চারটি পরিচ্ছেদে আমরা এগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সবথেকে আদিম ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া গেছে পলিনেশিয়দের মধ্যে। এদের মধ্যে হাওয়াইয়ানদেরকেই আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করব। এই ব্যবস্থাকে আমি 'মালয় ব্যবস্থা' নামে চিহ্নিত করেছি। এই ব্যবস্থায় নিকট ও দূর সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতিরাই পরস্পরের সঙ্গে নিম্নলিখিত এই কয়েকটি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়—পিতামাতা, সন্তান, মাতামহ-মাতামহী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, ভাই এবং বোন। অন্য কোনরকম রক্ত সম্পর্ককে এরা স্বীকার করে না। এগুলো ছাড়া একমাত্র স্বীকৃত সম্পর্ক হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক। জ্ঞাতিত্বের এই ব্যবস্থাটা প্রথম ধরনের পরিবার, অর্থাৎ ভাই বোন বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে যে এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছিল, তার প্রমাণ এদের এই ব্যবস্থার মধ্যেই পাওয়া যায়। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে এই প্রমাণটুকু যথেষ্ট কিনা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। কিন্তু স্বীকৃত প্রতিটা সম্পর্ক সত্য সত্যই বিদ্যমান ছিল ধরে নিলে মেনে নিতেই হয় যে আমাদের সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি বাস্তব-সম্মত। পলিনেশিয়ার প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা দেখা যেত, যদিও তাদের পরিবারগুলো ভাই বোন বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের স্তর অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিল দলগত বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের স্তরে। জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থাটা অপরিবর্তিত থাকার পিছনে দুটো বিষয় কাজ করেছিল। পরিবর্তন ঘটানোর মত জোরদার কোন প্রেরণা দেখা দেয়নি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেনি। বছর পঞ্চাশ আগে আমেরিকান মিশনারিরা যখন স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে যান, তখনও ঐ দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনে ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। এশিয়াতেও যে এই ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা চালু ছিল, সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কারণ এশিয়ায় আজও পর্যন্ত বিদ্যমান তুরানিয় ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছে এই ধরনের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার ভিত্তিতেই। চৈনিক জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থারও ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এই ব্যবস্থাই।

সময়ের গতিপথে জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় ব্যবস্থাটা, অর্থাৎ তুরানিয় ব্যবস্থাটা প্রথম ব্যবস্থাটার থেকে জোরদার হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীর বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর আমেরিকার সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যেই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক জায়গাতেও এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয়, দক্ষিণ আমেরিকাতেও এই ব্যবস্থাটা সর্বত্রই চালু ছিল। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে এই ব্যবস্থা চালু থাকার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে আফ্রিকান গোষ্ঠীগুলোর জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার সঙ্গে মালয়ের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থারই বেশি সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী হিন্দুদের মধ্যে, এবং কিছুটা পরিবর্তিত রূপে উত্তর ভারতের গৌড় ভাষাভাষী হিন্দুদের মধ্যে এই ব্যবস্থা আজও টিকে আছে। কিছুটা উন্নত রূপে এইব্যবস্থার দেখা মেলে অস্ট্রেলিয়াতেও। অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে হয়

শ্রেণীভিত্তিক সমাজ-সংগঠনের মধ্যে থেকে, অথবা উদ্ভবমান গোত্রভিত্তিক সংগঠনের মধ্যে থেকে। যা থেকেই গড়ে উঠে থাকুক না কেন, ফলাফলটা হয়েছে একই। তুরানিয় এবং গ্যানোনিয় বর্গের প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহ এবং গোত্রীয় সংগঠন মারফৎ। এই গোত্রীয় সংগঠন আবার ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিল। গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কিভাবে এই পদক্ষেপটা সম্পন্ন করা হয়েছিল, তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। এর ফলে আপন ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের মত। তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পরিবারগুলো ছিল দলগত বিবাহ ভিত্তিক পরিবার। এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় সহজেই। ঐ ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রধান প্রধান সম্পর্ক-গুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় একমাত্র দলগত বিবাহের মধ্যেই। একমাত্র দলগত বিবাহ চালু থাকলেই ঐ ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভবপর ছিল। বিভিন্ন তথ্যকে যুক্তিসম্মতভাবে সাজালে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মত দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারও একসময় পৃথিবীর বহু অংশে প্রচলিত ছিল। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল গোত্রীয় সংগঠন আর দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকেই। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাব যে মালয় ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই ব্যবস্থাটা। তফাৎ ছিল শুধু একটা বিষয়ে—আপন এবং জ্ঞাতি ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহের ফলে আগেকার যুগে যে-সব সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলোর পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। এই পরিবর্তন ঘটানোর পিছনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল গোত্রই। অতএব, তুরানিয় ও মালয়ের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রমাণ আমরা পেয়েই যাচ্ছি। ব্যবস্থার এই পরিবর্তন থেকেই বোঝা যায় সমাজের ওপর, বিশেষত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ দলগুলোর ওপর গোত্রীয় সংগঠন কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। আর্যদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার যাবতীয় সম্পর্ককে তো এই ব্যবস্থা স্বীকার করেই, এমনকি স্বীকার করে আর্যদের অলক্ষিত কিছু সম্পর্ককেও। নিকট এবং দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। জ্ঞাতিত্বসম্পর্ক খোঁজার ব্যাপারে এই ব্যবস্থার একান্ত নিজস্ব পদ্ধতি আছে। আর্যরা যতজনকে নিজেদের জ্ঞাতি বলে স্বীকার করে, তার থেকে অনে বেশি জনকে জ্ঞাতি বলে স্বীকার করা হয় এই ব্যবস্থায়। পারিবারিক এবং সাধারণ সম্ভাষণের সময় লোকেরা পরস্পরের সম্পর্ক ধরে ডাকে, কখনোই কাউকে নাম ধরে ডাকে না। এর ফলে, দূরতম জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কটাও বজায় থাকে, অর্থাৎ সম্পর্কটা সারাক্ষণই স্বীকৃতি পায়। তাছাড়া এ থেকে গোটা ব্যবস্থাটা সম্বন্ধেও একটা ধারণা পাওয়া যায়। পরস্পরের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন ব্যক্তিরা একে অপরকে সম্ভাষণ করে "বন্ধু" বলে। মানুষের ইতিহাসে আর কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় এত বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক ও এত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নি।

আমেরিকার আদিবাসীদের অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন তারা দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের স্তর থেকে এসে পৌঁছেছিল জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তখনও পর্যন্ত আগেকার জ্ঞাতিত্বসম্পর্কই চালু ছিল, নতুন

ধরনের পরিবারের ভিত্তিতে কোন নতুন জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা চালু হয় নি। মালয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানেও পরিবার পেঁছে গিয়েছিল ভাই-বোন বিবাহের স্তর থেকে দলগত বিবাহের স্তরে, কিন্তু জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে তাদের জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কগুলোও ছিল ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যবস্থার সম্পর্ক, দলগত বিবাহের সম্পর্ক নয়। একইভাবে, তুরানিয় ব্যবস্থার সম্পর্কগুলোও হচ্ছে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার-ব্যবস্থার সম্পর্ক, জোড়-বাঁধা বিবাহ থেকে সৃষ্ট সম্পর্ক-গুলোর সঙ্গে এগুলো খুব একটা মানানসই নয়। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা যে গতিতে অগ্রসর হয়, তার থেকে অনেক দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয় পরিবার। প্রয়োজনের তাগিদেই অগ্রসর হতে হয় পরিবারকে। আর পারিবারিক সম্পর্ককে ধরে রাখার জন্য পিছু পিছু আসে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা যেমন মালয় ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের পর্যাপ্ত কারণ হয়ে উঠতে পারেনি, ঠিক তেমনি জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাও তুরানিয় ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে পর্যাপ্ত কারণ হয়ে উঠতে পারেনি। মালয় ব্যবস্থাকে তুরানিয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল গোত্রীয় সংগঠনের মত একটা প্রতিষ্ঠানের। আবার, এই তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সূত্রপাত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল সম্পত্তির মত একটা প্রতিষ্ঠানের, যার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়েছিল সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরা-ধিকার এবং সম্পত্তি কর্তৃক সৃষ্ট এক বিবাহভিত্তিক পরিবার।

সময়ের গতিপথে তৃতীয় আর একটি জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অভ্যুদয় ঘটেছিল। এই ব্যবস্থাকে স্বচ্ছন্দে আর্য, সেমিটিক অথবা উরালিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা বলা যেতে পারে। যে-সব প্রধান প্রধান জাতিগুলো পরবর্তীকালে সভ্যতার যুগে পেঁছেছিল, তাদের মধ্যে প্রচলিত তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েই সম্ভবত এই তৃতীয় ব্যবস্থাটা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগে জ্ঞাতিত্বসম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল এই ব্যবস্থা মারফতই। তুরানিয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মালয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে। কিন্তু তুরানিয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই তৃতীয় ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠেনি। সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে প্রচলিত তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ব্যবস্থাটা। নানান ঘটনা থেকেই একথার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

পরিবারের শেষ চারটি রূপ দেখা গেছে ঐতিহাসিক যুগের সময়সীমার মধ্যেই। কিন্তু প্রথম রূপটা, অর্থাৎ ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবার পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে প্রাচীনকালে এ-রকম পরিবার যে বিদ্যমান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মালয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে। তাহলে আমরা পরিবারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি রূপের হদিশ পাচ্ছি। এই তিনটি রূপ আসলে সমাজজীবনের তিনটি পৃথক পৃথক অবস্থারই প্রতিভূ। এই তিন ধরনের পরিবারের যুগে দেখা গেছে পৃথক পৃথক ও সুনির্দিষ্ট তিন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। শুধু এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাগুলো দিয়ে বিচার করলেও ঐ তিন ধরনের পরিবারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাগুলোর সুদীর্ঘ স্থায়ীত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং বোঝা যায় যে প্রাচীন সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে এগুলোর মধ্যে যে প্রমাণগুলো ছড়িয়ে আছে—সেগুলো কতটা মূল্যবান।

এইসব পরিবারগুলো বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে টিকে থেকেছে দীর্ঘদিন ধরে। প্রত্যেক ধরনের পরিবারের জীবনে তিনটি স্তর দেখা গেছে—গড়ে ওঠার স্তর, পূর্ণ বিকশিত হওয়ার স্তর। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের উৎস নিহিত রয়েছে সম্পত্তির মধ্যে। আবার, যে জোড়বাঁধা পরিবারের মধ্যেই একবিবাহভিত্তিক পরিবারের ভ্রূণ রয়ে গিয়েছিল, সেই জোড়বাঁধা পরিবারের উৎস নিহিত ছিল গোত্রের মধ্যে। গ্রীক গোষ্ঠীগুলো যখন প্রথম ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের আওতায় আসে, তখন তাদের মধ্যে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। তবে সুনির্দিষ্ট আইনের সাহায্যে এর মর্যাদা ও অধিকার নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এই পরিবার চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

মানুষের মনে সম্পত্তি সংক্রান্ত ধ্যানধারণার উদয়টা সম্পত্তি সৃষ্টি ও তা ভোগদখল করা এবং তার উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আইনী বন্দোবস্ত চালু করা—এগুলোর সাহায্যে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল এই ধরনের পরিবার গড়ে ওঠার সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে সম্পত্তির প্রভাব। সমাজের কাঠামোর ওপর ছাপ ফেলতে শুরু করে সম্পত্তি। সন্তানের পিতা কে, তা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তার আগের যুগগুলোতে এ সুযোগ ছিল না। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিবাহের প্রথা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায় থেকেই চালু ছিল। তবে তখন ঐ দুজন যতদিন পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে চাইত, শুধু ততদিনই তারা স্বামী-স্ত্রী থাকত। প্রাচীন সমাজ যত এগিয়েছে, প্রতিষ্ঠানগুলো যতই উন্নত হয়ে উঠেছে এবং মানুষ যতই নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেছে, ততই সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে এই বিবাহবন্ধন। কিন্তু একবিবাহভিত্তিক পরিবারের যা মর্মবস্তু, অর্থাৎ যৌনসহবাস শুধুমাত্র একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা, তা তখনও পর্যন্ত চালু হয় নি। সেই বর্বরযুগেও স্ত্রীদের কাছে আনুগত্য দাবি করত পুরুষরা, আনুগত্যের অভাব ঘটলে কঠোর দণ্ডও দেওয়া হত নারীদের। কিন্তু নিজেদেরকে এই আনুগত্যের আওতার বাইরে রাখত পুরুষরা। অথচ এই বাধ্যবাধকতাটা দ্বিপাক্ষিক হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয়। আনুগত্যের ব্যাপারটাও তো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হোমারের আমলে গ্রীকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়—পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে নারীদের অবস্থাটা ছিল একটা বিচ্ছিন্নতা ও দাম্পত্যসূত্রে অধীনতার অবস্থা। তাদের অধিকারগুলোও ঠিক যথাযথ ছিল না। পুরুষদের অধিকার আর নারীদের অধিকারের মধ্যে ছিল বিপুল অসাম্য। হোমারের আমল থেকে শুরু করে পেরিক্লিসে-এর আমল পর্যন্ত গ্রীক পরিবারের ধারাবাহিক বিবর্তনের দিকে তাকালে একটা সুস্পষ্ট অগ্রগতি চোখে পড়ে। দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিবার। গ্রীক ও রোমানদের ঐ পরিবারের থেকে অনেকটাই অগ্রসর হয়ে এসেছে আধুনিক পরিবার, কেননা আধুনিক পরিবারের নারীদের সামাজিক অবস্থান যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছে। গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্কটা ছিল অনেকটা বাবার সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্কের মত। আধুনিক পরিবারের স্ত্রীর মর্যাদা এবং ব্যক্তিগত অধিকার প্রায় তার স্বামীর সমান হয়ে উঠেছে। একবিবাহভিত্তিক পরিবার প্রায় তিন হাজার বছর ধরে চালু আছে। এই তিন হাজার বছর ধরে এই

পরিবার অবিরাম উন্নত হয়ে উঠেছে ধাপে ধাপে। যতদিন পর্যন্ত নারী-পুরুষ সমানাধিকার না পায় এবং যতদিন পর্যন্ত দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের সমতা পুরোপুরি-স্বীকৃতি না পায়, ততদিন পর্যন্ত এই পরিবার আরও উন্নত হয়ে চলতে বাধ্য। ঠিক এতটা পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও, জোড়বাঁধা পরিবারের অগ্রগতি সম্বন্ধেও একইরকম প্রমাণ আমাদের চোখে পড়ে। এই জোড়বাঁধা পরিবার শুরু হয়েছিল একটা অনুন্নত জায়গা থেকে আর শেষ হয়েছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারে এসে। এই বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার, কারণ আমাদের আলোচনার পক্ষে এগুলো অত্যন্ত জরুরী।

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি সেই বিস্ময়কর দাম্পত্য ব্যবস্থার দিকে, যা মানব জাতির অস্তিত্বের সূচনা থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে এবং মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছেছে এই সভ্যতার যুগেও। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঐ দাম্পত্য ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সমাজের নৈতিক উপাদানগুলো এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠার ফলে ব্যবস্থাটা কিভাবে একটু একটু করে বিলুপ্ত হয়েছে—তার সাহায্যে মানবসভ্যতার অগ্রগতির হার কিছুটা বুঝতে পারা যায়। পরিবার ও বিবাহের প্রতিটি ধারাবাহিক রূপ এই ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করার এক একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করেছে। এই ব্যবস্থাটা পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হওয়ার পরই গড়ে উঠতে পেরেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবার। ঐ প্রথম ধরনের পরিবার বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়েও দেখা গেছে। ঐ সময়ে এসে এই পরিবারের কাঠামো ভেঙে গড়ে ওঠে জোড়বাঁধা পরিবার।

এই দু'ধরনের পরিবার যখন গড়ে উঠছিল আর উন্নত হয়ে উঠছিল, তখনকার অবস্থা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা পেয়ে যাই এ থেকে। পরস্পরের থেকে পৃথক ধরনের এবং সমাজের একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল পরিবারের পাঁচটি ধারাবাহিক রূপ। ফলে, সেই ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন অন্তর্বর্তী রূপের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হতে হতে আজকের একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে এসে পৌঁছনোর পথে এক একটা যুগ কতটা দীর্ঘ ছিল—সে সম্বন্ধেও আমাদের ধারণাটা অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানবজাতির জীবনে আর কোন প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এত উল্লেখযোগ্য ও ঘটনাবহুল নয়। এত সুদীর্ঘ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলাফলও এমনভাবে মূর্ত হয়ে ওঠেনি আর কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং বিভিন্ন যুগের মধ্যে দিয়ে একে বর্তমান রূপে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন হয়েছে সর্বোচ্চ স্তরের মানসিক ও নৈতিক প্রচেষ্টার।

দলগত বিবাহ থেকে জোড়বাঁধা বিবাহের মধ্যে দিয়ে এক বিবাহের স্তরে এসে পৌঁছনোর পথে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কোন বস্তুগত পরিবর্তন ঘটেনি। এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটি (যার মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্কগুলোই মূর্ত হয়ে উঠেছিল) একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছিল। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা মানুষের বংশধারার পক্ষে একেবারেই বেমানান হয়ে পড়ল, এমনকি একবিবাহের পক্ষে অমর্যাদাকরও হয়ে উঠল। যেমন মালয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অনুযায়ী লোকেরা তাদের ভাইয়ের পুত্রকে নিজের পুত্রই বলত, কারণ তার ভাইয়ের স্ত্রী ছিল তারও স্ত্রী; বোনের পুত্রকেও তারা নিজের পুত্র

বলত, কারণ বোনেরাও তাদের স্ত্রীই ছিল। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় তাদের ভাইয়ের পুত্ররা ঐ একই কারণে তাদেরও পুত্র হিসেবেই বিবেচিত হত, কিন্তু বোনেদের পুত্ররা বিবেচিত হত তাদের ভাগ্নে হিসেবে—কারণ গোত্রীয় সংগঠনে বোনেরা আর ভাইদের স্ত্রী হতে পারত না। ইরোকোয়াদের মধ্যে (যেখানে জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার চালু আছে) দেখা যায় যে লোকেরা এখনও তাদের ভাইয়ের ছেলেদেরকে নিজেদের ছেলেই বলে, যদিও ভাইয়ের স্ত্রী এখন আর তাদের স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হয় না। এইভাবে অনেক সম্পর্কই বিবাহের চালু রূপের সঙ্গে বেমানান হয়ে উঠেছে। যে-সব প্রথার মধ্যে থেকে এর উদ্ভব হয়েছে, সেইসব প্রথাকে এখনও টিকিয়ে রেখেছে এই ব্যবস্থা। চালু বংশধারার সঙ্গে অবশ্য প্রথাগুলো অনেকটাই বেমানান হয়ে উঠেছে। সুপ্রাচীন জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর মত জোরদার কোন কারণ তখনও পর্যন্ত দেখা দেয় নি। তারপর সামনে এল একবিবাহপ্রথা। সভ্যতার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া আর্যদের কাছে এই প্রথাই ঐ সুপ্রাচীন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রেরণা হিসেবে কাজ করল। নিশ্চিত হয়ে উঠল সন্তানের পিতৃত্ব এবং উত্তরাধিকারের বৈধতা। একবিবাহ থেকে সৃষ্ট বংশধারার উপযোগী করে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সংস্কার ঘটানো আদৌ সম্ভব ছিল না। একবিবাহের সঙ্গে ঐ ব্যবস্থাটা ছিল পুরোপুরি বেমানান। তবে, হাতের কাছেই একটা সরল ও পরিপূর্ণ সমাধান ছিলই। তুরানিয় ব্যবস্থা বাতিল করা হল এবং কোন বিশেষ সম্পর্ককে সুনির্দিষ্ট করে তোলার জন্য তুরানিয় গোষ্ঠীগুলো যে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করত, সেই পদ্ধতি চালু করা হল। জ্ঞাতিত্বের সাধারণ দিকটার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ককে কতকগুলো নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত করা হল। যেমন তারা বলতে শুরু করল—ভাইপো, ভাইয়ের নাতি, কাকা, কাকার ছেলে ইত্যাদি। প্রতিটা নামই কোন-না-কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করত, আর তার সঙ্গে সম্পর্কটা বোঝা যেত ঐ নাম থেকেই। গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত ভাষী, জার্মান এবং কেল্টিক প্রভৃতি আর্য জাতিগুলোর মধ্যে এই ব্যবস্থারই প্রাচীন রূপটা চালু ছিল। হিব্রু ধর্মগ্রন্থের বংশলতিকা থেকে জানা যায় যে সেমিটিকদের মধ্যেও চালু ছিল এই ব্যবস্থাই। আর্য এবং সেমিটিক জাতিগুলোর মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কিছু কিছু অবশেষ (যেগুলোর কয়েকটার কথা আগেই বলা হয়েছে) ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তবে মোটের ওপর ঐ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছিল, আর তার বদলে চালু হয়েছিল বর্ণনাত্মক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা।

এই প্রতিপাদ্যগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া আর এগুলোকে সপ্রমাণ করার জন্য ক্রমানুসারে এই তিনটি ব্যবস্থা নিয়ে এবং যথাক্রমে এই তিনটি ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত তিন ধরনের পরিবার নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এগুলোর একটা থেকে আরেকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সবকিছুর থেকে আলাদা করে নিয়ে বিচার করলে তার তেমন কিছু গুরুত্ব থাকে না। কারণ, যে-কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই গড়ে ওঠে অল্প কয়েকটা ধারণার ভিত্তিতে। ফলে, মানবসমাজের প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে বা সে ব্যাপারে কোনরকম আলোকপাত করতে পারে না সে। একদল

জ্ঞাতির পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ককে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা হলে স্বাভাবিকভাবেই উপনীত হতে হয় এই সিদ্ধান্তে। কিন্তু অনেকগুলো গোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার তুলনা করা হলে (এবং তা যদি একটা ঘরোয়া প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে থাকে আর, সুদীর্ঘকাল ধরে চালু থেকে থাকে) তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার থেকে শুরু করে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর পর্যন্ত একের পর এক এ ধরনের মোট তিনটি জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা দেখা গেছে। ধরে নেওয়া যায় যে প্রতিটা ব্যবস্থাই নিজের নিজের আমলের পরিবারগুলোর মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্ককে অভিব্যক্ত করে। আর এই সম্পর্কগুলো থেকে আবার তৎকালীন বিবাহ ও পরিবারের রূপগুলোর কথা জানা যায়। অবশ্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অপরিবর্তিত থেকে গেলেও বিবাহ ও পরিবারের রূপ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়ে থাকতেই পারে।

তাছাড়া, এইসব ব্যবস্থাগুলো আসলে সমাজের নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হওয়ার স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। সমাজের কাঠামোর ওপর গভীরভাবে প্রভাববিস্তারকারী কোন-না-কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবের মধ্যেই প্রতিটা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মূল নিহিত থেকেছে। মা এবং সন্তান, ভাই আর বোন, দিদিমা আর নাতি- নাতনী—এই সম্পর্কগুলো যে-কোন যুগেই সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যেত। কিন্তু বাবা আর সন্তান, ঠাকুর্দা আর নাতি-নাতনী—এই সম্পর্কগুলো একবিবাহ চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যেত না। দলগত বিবাহের যুগে বেশ কয়েকজন এইসব সম্পর্কের (অর্থাৎ বাবা আর সন্তান, ঠাকুর্দা আর নাতি-নাতনী) সমান দাবিদার হত। প্রাচীন সমাজের আদিমতম অবস্থায়ও এইসব প্রকৃত ও সম্ভাব্য সম্পর্কগুলোকে মানুষ বুঝতে পারত এবং এগুলোকে অভিব্যক্ত করার উপযোগী বিভিন্ন অভিধাও তারা নিশ্চয়ই উদ্ভাবন করেছিল। একদল জ্ঞাতির ক্ষেত্রে কিছু নাম এইভাবে অনেকদিন ধরে প্রয়োগ করে চলার ফলে একটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠা একান্তই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার রূপটা কেমন হবে, তা নির্ভর করত বিবাহের রূপের ওপর। যেখানে দলগতভাবে বিবাহ হত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইবোনদের মধ্যে, সেখানে পরিবারটা হত ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার এবং জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা হত মালয় ধরনের ব্যবস্থা। যেখানে বেশ কিছু বোনের দলবদ্ধভাবে বিবাহ হত পরস্পরের স্বামীদের সঙ্গে এবং বেশ কিছু ভাইয়ের বিবাহ হত পরস্পরের স্ত্রীদের সঙ্গে, সেখানে পরিবারটা হত দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা হত তুরানিয় ধাঁচের। যেখানে বিবাহ হয় কেবলমাত্র একজন নারীর সঙ্গে একজন পুরুষের এবং তাদের যৌন সহবাসও শুধুমাত্র পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেখানে পরিবারটা হয় একবিবাহভিত্তিক পরিবার আর জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা হয় আর্য ধাঁচের। অর্থাৎ, তিন ধরনের বিবাহের ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে এই তিন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। একেক ধরনের বিবাহের আমলে বিভিন্ন লোকের মধ্যে সম্পর্কগুলো কেমন হয় বা হত, সেটাই ফুটে ওঠে এইসব ব্যবস্থার মধ্যে অর্থাৎ, এগুলো আপনা-আপনি গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে বিবাহের ভিত্তিতে ; কাল্পনিক কোন ধ্যানধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে। প্রতিটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই এক একটা যুক্তিসম্মত এবং বাস্তবোচিত ব্যবস্থা। এগুলোর মধ্যে বিধৃত বিভিন্ন নিদর্শন অত্যন্ত মূল্য-

বান। এইসব নিদর্শন থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। প্রাচীন সমাজের অবস্থাটা ঠিক কেমন ছিল, তা একান্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে এগুলোর মধ্যে।

এই সব ব্যবস্থাগলো মূলত দুটো পৃথক পৃথক রূপে বিভক্ত। একটা হচ্ছে 'শ্রেণীবিন্যাসকারী' ধারা, আর অপরটা হচ্ছে 'বর্ণনাত্মক' ধারা। প্রথম ধারার ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের কখনও নাম ধরে চিহ্নিত করা হয় না, তাদেরকে ভাগ করা হয় বিভিন্ন বর্গে। এই বিভাজন করার ব্যাপারে জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক খুব নিকট নাকি দূরসম্পর্কিত—তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। একই বর্গের সমস্ত ব্যক্তিকে সম্পর্কের একই অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। ফলে, কোন ব্যক্তির নিজের ভাইরা এবং তার বাবার ভাইয়ের ছেলেরা—সকলেই তার ভাই হিসেবে পরিগণিত হয়। তার নিজের বোনেরা এবং তার মায়ের বোনের মেয়েরা—সকলেই পরিগণিত হয় তার বোন হিসেবে। মালয় এবং তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় সম্পর্কের বিভাজনটা এ-রকমই ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের চিহ্নিত করা হয় সম্পর্কের প্রাথমিক সম্বোধন অনুসারে অথবা এ-রকম কিছু সম্বোধনের মিশ্রণ ঘটিয়ে। ফলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক একটা সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। যেমন, ভাইপো, কাকা, খুড়তুতো ভাই ইত্যাদি। একবিবাহ চালু হওয়ার দরুন যে-সব আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় পরিবারগুলো গড়ে উঠেছিল, তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা এ-রকমই ছিল। পরবর্তীকালে সম্বোধনের জন্য সাধারণ কিছু নাম উদ্ভাবনের দরুন সম্পর্কের কিছুটা শ্রেণীবিভাজন এদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপটা (যা আর্য এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়দের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট চেহারা নিয়েছিল) ছিল পুরোপুরিই বর্ণনাত্মক। এই দুটো ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের কারণ হল—একটা ব্যবস্থা গড়েছিল দলগত বিবাহের ফল হিসেবে, আর অপর ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছে একবিবাহের ফল হিসেবে।

আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় জাতিগুলোর মধ্যে বর্ণনাত্মক ব্যবস্থাটা একইরকম। কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসকারী ব্যবস্থার দুটো পৃথক পৃথক রূপ ছিল। প্রথমটা হচ্ছে মালয় ধরনের ব্যবস্থা, সময়ের বিচারে যা প্রাচীনতম। দ্বিতীয়টা হচ্ছে তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় ব্যবস্থা, যে দুটো মূলগতভাবে ছিল একই ধরনের। পূর্বতন মালয় ধরনের ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েই গড়ে উঠেছিল এই ব্যবস্থাগুলো।

যাবতীয় ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে যে নীতিগুলো, সেগুলোকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

সম্পর্ক দু'ধরনের হয়। প্রথমত, জ্ঞাতিত্ব বা রক্তসূত্রের সম্পর্ক; দ্বিতীয়ত, বিবাহসূত্রের সম্পর্ক। জ্ঞাতিত্বও দু'ধরনের হয়ে থাকে—একই পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব আর ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব। একই বংশের মধ্যে যারা পরস্পরের সঙ্গে জন্মসূত্রে সম্পর্কযুক্ত, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে বলা হয় একই পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব। যে-সব লোক একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্ট, কিন্তু যাদের মধ্যে জন্মসূত্রের কোন সম্বন্ধ নেই, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে বলা হয় ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব। বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় বিভিন্ন প্রথা অনুযায়ী।

বিষয়ের খুব গভীরে প্রবেশ না করেও সাধারণভাবে বলা চলে যে, যেখানে একবিবাহ চালু আছে সে-রকম প্রতিটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে একটা একই পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব এবং

বেশ কিছু ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্ব থাকতে বাধ্য। প্রথম সম্পর্কটা থেকেই সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় সম্পর্কটা। প্রতিটি ব্যক্তিই হচ্ছে একসারি জ্ঞাতিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। তার সঙ্গে সম্পর্কিত করে কিছু লোকের সম্পর্কগত অবস্থান নির্বাচিত হয়, আবার সে-ও কিছু জনের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত হয়। অবস্থানটা একই পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের ধারায়, এবং সেই ধারাটা গড়ে ওঠে উপর থেকে নিচের দিকে। তার আগে এবং পরে, অর্থাৎ ওপরে ও নিচে থাকে তার কিছু পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষ—বাবা, তার ছেলে, তার ছেলে এইসব লোকেদের সম্মিলনেই গড়ে ওঠে তার নিজস্ব পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের পুরুষ ধারা। এই প্রধান ধারা থেকে সৃষ্টি হয় কিছু সংখ্যক ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের পুরুষ ও স্ত্রী-ধারা। গোটা ব্যবস্থাটা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার জন্য মূল পরিবার-গত ধারণাটিকে এবং তার প্রথম পাঁচটি ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী-ধারাকে (বাবার দিকের এবং মায়ের দিকের) ধরে নিয়ে পর্যালোচনা করলেই চলে। সবক্ষেত্রেই পর্যালোচনা শুরু হবে মা-বাবার থেকে, তারপর ধরে নিতে হবে তাদের যে-কোন একজন সন্তানকে। এ-রকম পর্যালোচনায় অবশ্য পূর্বপুরুষ, ও উত্তরপুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই আলোচ্য ব্যক্তির জ্ঞাতিদের একটা ক্ষুদ্র অংশই মাত্র অন্তর্ভুক্ত হবে। ভিন্ন পরিবারভুক্ত জ্ঞাতিদের সমস্ত শাখাগুলোকে (ওপরের দিকে যেগুলোর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলে) খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু গোটা ব্যবস্থাকে বোঝার ব্যাপারে তা খুব একটা সাহায্য করবে না।

পুরুষ-ধারায় ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারিটা গড়ে ওঠে নিজের ভাই আর তার বংশধরদের নিয়ে। স্ত্রী-ধারায় এই সারিটা গড়ে ওঠে নিজের বোন আর তার বংশধরদের নিয়ে। বাবার দিকে পুরুষ-ধারায় ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারিতে থাকে বাবার ভাই আর তার বংশধররা। বাবার দিকে স্ত্রী-ধারায় এই সারিতে থাকে বাবার বোন আর তার বংশধররা। মায়ের দিকে পুরুষ-ধারায় এই দ্বিতীয় সারিটা গড়ে ওঠে মায়ের ভাই আর তার বংশধরদের নিয়ে। মায়ের দিকে স্ত্রী-ধারায় এই সারিতে থাকে মায়ের বোন আর তার বংশধররা। বাবার দিকে পুরুষ-ধারায় ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারিটা গড়ে ওঠে ঠাকুর্দার ভাই আর তার বংশধরদের নিয়ে, বাবার দিকে স্ত্রী-ধারায় এই সারিতে থাকে ঠাকুর্দার বোন আর তার বংশধররা। মায়ের দিকে এই দুটো সারিতে থাকে যথাক্রমে দিদিমার ভাই ও বোন এবং তাদের বংশধররা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ধারাটা ঘুরে গেছে মায়ের দিকে—এটা লক্ষ্য করা দরকার। ভিন্ন পরিবারগত জ্ঞাতিত্বের পুরুষ ও স্ত্রী-ধারার চতুর্থ সারিটা শুরু হয় যথাক্রমে প্রপিতামহের ভাই ও বোনের থেকে, এবং অন্যদিকে প্রমাতামহীর ভাই ও বোনের থেকে। পঞ্চম সারিটা শুরু হয় একদিকে প্রপিতামহের বাবার ভাই ও বোনের থেকে, অপরদিকে প্রমাতামহীর বাবার ভাই ও বোনের থেকে। শেষের এই দুটো ধারার প্রতিটা শাখার সঙ্গে জ্ঞাতিত্বটা তৃতীয় ধারাটির নিয়ম অনুযায়ীই গড়ে ওঠে। এই পাঁচটা ধারার সদস্যরা এবং নিজের পরিবার—এদেরকে নিয়েই গড়ে ওঠে আমাদের মূল জ্ঞাতিবর্গ। অর্থাৎ, জ্ঞাতিদেরকে আমরা যতদূর পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারি, তার সীমার মধ্যে এরাই পড়ে।

জ্ঞাতিত্বের এই বিভিন্ন ধারাগুলো সম্বন্ধে আরও কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

আমার যদি বেশ কয়েকজন ভাই ও বোন থাকে, তাহলে তারা আর তাদের বংশধররা মিলে এক একটা পৃথক পৃথক ধারা গড়ে তোলে। আর সেইসঙ্গেই পুরুষ ও স্ত্রী-ধারা অনুসারে আমার প্রথম জ্ঞাতিত্ব ধারাগুলোও গড়ে ওঠে। একইভাবে আমার বাবা আর মায়ের ভাই ও বোনেরা আর তাদের বংশধররা মিলে গড়ে তোলে এক একটা পৃথক পৃথক ধারা। আর এদের সকলকে নিয়েই গড়ে ওঠে আমার দ্বিতীয় জ্ঞাতিত্ব ধারার দুটো ভাগ—বাবার দিকের আর মায়ের দিকের। এইসব সম্পর্কের মধ্যে আবার চারটি প্রধান শাখা থাকে—দুটো পুরুষ-শাখা ও দুটো স্ত্রী-শাখা। জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় ধারার বিভিন্ন শাখাগুলো যদি পরিপূর্ণভাবে বেড়ে উঠতে পারে, তাহলে তার মধ্যে থেকে সৃষ্টি হয় পূর্বপুরুষদের চারটি সাধারণ বিভাগ এবং আটটি প্রধান শাখা। এই প্রতিটা শাখার সদস্যসংখ্যা জ্ঞাতিত্বের প্রতিটা ধারায় একই অনুপাতে বেড়ে চলে।

এক কথায়, জ্ঞাতিত্বের অজস্র ভাগ, অজস্র শাখা, এবং এ-সবের মধ্যে থাকে বিপুল সংখ্যক জ্ঞাতি। এই সমস্ত জ্ঞাতিদের ঠিকঠাকভাবে বিন্যস্ত করা ও তাদের যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার যে পদ্ধতিটা প্রত্যেককে পৃথক পৃথক রাখতে পেরেছে আর গোটা ব্যাপারটাকে সম্ভবপর করে তুলেছে, সেই পদ্ধতির উদ্ভাবনটা কিন্তু আদৌ কোন সাদামাটা সাফল্য নয়। রোমান আইনপ্রণেতারা এ কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছিলেন এবং ইউরোপের প্রধান জাতিগুলো তাঁদের সৃষ্ট পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিল। এই পদ্ধতির আশ্চর্য সরলতাটা আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।[১] বিভিন্ন জ্ঞাতিদের নামের বিন্যাসটা যথাযথ করে তোলা খুবই দুরূহ কাজ ছিল। একটা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া এ কাজটা করে ওঠা বোধহয় কখনোই সম্ভব হত না। ঐ জরুরী প্রয়োজনটা ছিল সম্পত্তির উত্তরাধিকার সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য বংশ-ধারার একটা যথাযথ প্রণালী গড়ে তোলা।

নতুন পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথমেই দরকার ছিল বাবার ভাই-বোন আর মায়ের ভাই-বোনদের নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত করে তাদের পার্থক্যটা সুনিশ্চিত করা। পৃথিবীর অল্প কয়েকটা ভাষাতেই মাত্র এই পৃথকীকরণটা সম্ভবপর হয়েছিল। রোমানরা বাবার ভাই আর বোনকে যথাক্রমে প্যাট্রুস (patruus) ও অ্যামিতা (amita) বলতে শুরু করে, এবং মায়ের ভাই আর বোনের নামকরণ করে যথাক্রমে আভাঙ্কুলাস (ovunculus) ও ম্যাটার্টেরা (motertera)। এই নামগুলো উদ্ভাবিত হওয়ার পর জ্ঞাতিদের চিহ্নিত করা সংক্রান্ত রোমানদের উন্নত পদ্ধতিটা

১। "Pandects", tib. xxxviii, title x. De gradibus et ad finibus et nominibus eorum : and "Institutes of Justinian", lib. title vi. De gradibus cognationem.

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে।[১] আর্স, স্ক্যান্ডিনেভিয় এবং স্লাভরা বাদে আর্যদের অন্যান্য শাখার লোকেরা এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করেছিল।

তুরানিয় পদ্ধতি পরিত্যক্ত হওয়ার পর আর্যরা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বর্ণনাত্মক রূপটাই গ্রহণ করে (যেমন আর্সরা)। স্ববংশগত এবং প্রথম পাঁচটা জ্ঞাতি ধারার অন্তর্গত প্রত্যেকটা সম্পর্ক (যাদের মোট সদস্যসংখ্যা একশ বা ততোধিক হত) পরস্পরের থেকে পৃথক পৃথক হত। এই প্রত্যেকটা সম্পর্ককে চিহ্নিত করার জন্য সমসংখ্যক নাম বা সাধারণ কিছু অভিধা উদ্ভাবন করে নিতে হত।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, শ্রেণীবিভাজনমূলক এবং বর্ণনাত্মক এই দুটো পদ্ধতি আসলে বর্বর ও সভ্য জাতিগুলোর মধ্যেকার একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যরেখা হিসেবেই সামনে আসে। বিবাহ এবং পরিবারের এই রূপগুলো অগ্রগতির যে নিয়মের অনুসরণ করেছে, সেই অনুযায়ী এই পরিণতিটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

বিভিন্ন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে মোটেই যথেচ্ছভাবে গ্রহণ করা, পরিবর্তিত করা বা পরিত্যাগ করা হয় নি। যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমাজের অবস্থাকে ব্যাপকভাবে পাল্টে দিয়ে গেছে, সেইসব ঘটনার সঙ্গে এগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কোন একটা বিশেষ ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা যদি বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে, সেই ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন সম্পর্কের নাম এবং তা ব্যবহারের পদ্ধতি যদি সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলে স্বাভাবিক কারণেই সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে খুব ধীরে ধীরে। প্রতিটি ব্যক্তিই কিছু জ্ঞাতিত্বসম্পর্কের কেন্দ্রস্বরূপ, কাজেই বিদ্যমান ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে ও উপলব্ধি করতে প্রত্যেকেই বাধ্য। এইসব সম্পর্কের যে-কোন একটার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানোও একান্ত দুঃসাধ্য। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার স্থায়িত্বমুখী এই প্রবণতা আরও জোরদার হয়ে ওঠে একটা বিশেষ কারণে। এই ব্যবস্থাগুলো টিকে থাকে বিভিন্ন রীতির সাহায্যে, কোন আইনী হস্তক্ষেপের সাহায্যে নয়; এগুলো কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলা হয় না, এগুলো গড়ে ওঠে স্বাভাবিক বিকাশের ফল হিসেবেই। কাজেই এইসব ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য এমন কোন কারণ বা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয় যা ঐ-সব রীতির মতই সার্বজনীন। এখানে প্রতিটি ব্যক্তিই ঐ ব্যবস্থার অংশীদার এবং বংশধররা সঞ্চারিত হয় রক্তসূত্রে। অর্থাৎ সমাজের যে-সব অবস্থার মধ্যে ঐ ব্যবস্থাগুলোর জন্ম হয়েছিল, সেই অবস্থাগুলো পরিবর্তিত বা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেও সুদীর্ঘকাল ধরে ব্যবস্থাগুলোকে টিকিয়ে রাখার মত জোরদার কিছু প্রভাব সমাজের মধ্যে থাকতই। স্থায়ীত্বের এই উপাদানগুলোই আমাদের সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। তাছাড়া, এই উপাদানগুলোর মধ্যেই রয়ে গেছে প্রাচীন

১। ইংরিজির আর্ট শব্দটা এসেছে 'আমিতা' থেকে আর আঙ্কল শব্দটা এসেছে 'আভাঙ্কুলাস' থেকে। 'আভাস' (avus) মানে হচ্ছে ঠাকুর্দা। তার সঙ্গে ছোটবাচক শব্দটা যোগ করে দাঁড়িয়েছে আভাঙ্কুলাস। অর্থাৎ শব্দটার অর্থ হচ্ছে 'ছোট ঠাকুর্দা।' ম্যাটার্টেরা শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে সম্ভবত 'ম্যাটার' (mater) আর 'অলটেরা' (altera) থেকে। অর্থাৎ শব্দটা 'আরেকজন মা'-এর সমার্থক।

সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র। এগুলো না থাকলে ঐ চিত্রটা মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যেত।

তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মত জটিল একটা ব্যবস্থার কাঠামোটা বিভিন্ন জাতি ও মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একেবারে একই চেহারা নিয়ে গড়ে উঠেছিল—এমনটা ধরে নেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার ছোটখাট নানান বিষয়ে ফারাক ছিল। তবে এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো মূলত সর্বত্র একই। দক্ষিণ ভারতের তামিলদের আর নিউইয়র্কের সেনেকা-ইরোকোয়াদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা (উভয়ের মধ্যেই প্রায় দুশোটা করে সম্পর্ক দেখা যায়) আজও একই রকম। এই সাদৃশ্যটা আসলে সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক যুক্তি বিদ্যা প্রয়োগেরই ফল, যার সমতুল কোন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ব্যবস্থার একটা পরিবর্তিত রূপেরও সন্ধান পাওয়া গেছে, যা গড়ে উঠেছে একটা স্বতন্ত্র চেহারা নিয়ে। এই ব্যবস্থাটা দেখা যায় উত্তর ভারতের হিন্দি, বাংলা, মারাঠী ও অন্যান্য ভাষাভাষীদের মধ্যে। আর্য আর তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই ব্যবস্থাটা। সুসভ্য ব্রাহ্মণরা একটা বর্বর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাঙ্গীভূত হয়েছিল এবং নিজেদের আদি ভাষার বদলে গ্রহণ করেছিল হিন্দি, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি চলিত ভাষা। এইসব ভাষার মধ্যে আদিবাসীদের কথ্য ভাষার ব্যাকরণগত কাঠামোটা মূর্ত হয়ে উঠেছিল আর এ গুলোর শব্দ ভাণ্ডারের নব্বই শতাংশই এসেছিল সংস্কৃত ভাষা থেকে। এর ফলে তাদের দুটো জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল একবিবাহ বা জোড়বাঁধা বিবাহের ভিত্তিতে, আর অপর ব্যবস্থাটার ভিত্তি ছিল দলগত বিবাহ। ফলস্বরূপ গড়ে ওঠে একটা মিশ্র ব্যবস্থা। সংখ্যায় বেশি ছিল আদিবাসীরাই। তারা ঐ মিশ্র ব্যবস্থার মধ্যে তুরানিয় ব্যবস্থার একটা আদল এনে দেয়। আর সংস্কৃত ভাষাভাষীরা নিয়ে আসে এমন কিছু পরিবর্তন যার ফলে একবিবাহ প্রথা টিকে থাকার সুযোগ পায়। স্লাভ গোষ্ঠীর উদ্ভবও সম্ভবত বিভিন্ন জাতির এই ধরনের মিশ্রণের ফলেই ঘটেছিল। বন্যতা আর বর্বরতার যুগে যে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার দুটো রূপ দেখা গেছে এবং বহু পরবর্তী সভ্যতার যুগে এসেও যে ব্যবস্থা টিকে থাকতে পেরেছে একটা তৃতীয় ও পরিবর্তিত রূপে, তার মধ্যে স্থায়িত্বের উপাদানটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান। এই ব্যাপারটা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

বহুবিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পিতৃপ্রধান পরিবার নিয়ে আলোচনা তেমন কোন প্রয়োজন নেই। এই পরিবার খুবই অল্পকাল টিকে ছিল এবং মানুষের ইতিহাসে তেমন কোন প্রভাব রেখে যেতে পারে নি।

বন্য ও বর্বরদের পারিবারিক জীবন যতটা মনোযোগ দাবি করে, বিষয়টার প্রতি ততটা মনোযোগ কখনোই দেওয়া হয় নি। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জোড়াবাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার চালু ছিল। কিন্তু তারা বসবাস করত যৌথ-বাসগৃহে এবং সেখানে জীবনধারণের ক্ষেত্রে সাম্যবাদীপ্রথানুসরণ করত। দলগত ও ভাইবোন বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবারগুলোর সদস্যসংখ্যা আরও বেশি হত এবং অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ বসবাস করত একই বাসগৃহে। ভেনিজুয়েলা উপকূল অঞ্চলের

গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সম্ভবত দলগত বিবাহই চালু ছিল। এরা গম্বুজাকার বাড়িতে বাস করত। প্রতিটা বাড়িতে থাকত একশ ষাটজন করে মানুষ।[১] স্বামী-স্ত্রীরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করত একই বাড়িতে এবং সাধারণত একই কামরায়। এ থেকে যুক্তিসম্মত ভাবেই অনুমান করা চলে যে বন্যতার পর্যায়ে পারিবারিক জীবনযাপনের এই ধরনের পদ্ধতি প্রায় সর্বত্রই চালু ছিল।

জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার এসব ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচনা করা হবে। বিবাহ ও পরিবারের যে-সব রূপের মধ্যে থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এই ব্যবস্থাগুলো, সেইসব রূপের ভিত্তিতেই আলোচনা করব আমরা। প্রতিটা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে ঐ ব্যবস্থাগুলোর জন্মদাতাস্বরূপ বিবাহ ও পরিবারের রূপগুলোর পূর্ববর্তী অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যাবে। যে-সব প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ধারাবাহিক রূপের মধ্যে দিয়ে পরিবারের বিকাশে সাহায্য করেছে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা ধারাবাহিক ক্রমবিন্যাস উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব এই আলোচনার শেষ পরিচ্ছেদে। মানবজাতির প্রথম দিককার অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও অত্যন্ত সীমিত। কাজেই আমরা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বা লক্ষণগুলোর ভিত্তিতেই আলোচনা করার চেষ্ট করব। যে ক্রমবিন্যাসটা উপস্থাপিত করা হবে, সেটা কিছুটা কল্পনামূলক। কিন্তু এর পিছনে যথেষ্ট প্রমাণও আমাদের হাতে আছে। ভবিষ্যৎ জাতিতাত্ত্বিক গবেষণাই এ কাজকে সম্পূর্ণ করে তুলবে।

১। হেরেরা, "হিষ্ট্রি অফ আমেরিকা", i, ২১৬, ২১৮, ৩৪৮.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার

ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারেরর অস্তিত্বের ব্যাপারে ঐ পরিবার সৃষ্টি হওয়া-টাকেই প্রমাণ হিসেবে দাখিল করলে চলবে না। তারজন্য আরও কিছু প্রমাণ দরকার। এটাই হচ্ছে পরিবারের প্রথম এবং প্রাচীনতম রূপ। আজকের দিনে সবথেকে নিম্নস্তরের বন্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই পরিবার আর দেখা যায় না। সমাজের যে অবস্থার মধ্যে থেকে মানবজাতির সবথেকে অনুন্নত অংশের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অবস্থার মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল এই পরিবার। ঐতিহাসিক যুগেও বর্বরদের মধ্যে এবং এমনকি সভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও কখনো কখনো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের কথা জানা গেছে। কিন্তু দলগতভাবে কিছু ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ হওয়া আর সেই বিবাহেরই সমাজ-ব্যবস্থার বনিয়াদস্বরূপ হয়ে ওঠার থেকে এইসব বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো একেবারে আলাদা ধরনের। পলিনেশিয়া, পাপুয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় আজও প্রায় আদিম অবস্থায় থাকা কিছু বন্য গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ভাইবোনের বিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগের সমাজের অবস্থা যেমনটা হওয়া উচিত, তার থেকে এরা অগ্রসর হয়ে এসেছে। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে মানুষের মধ্যে এ ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব যে কখনো সত্যিই ছিল, তার কী প্রমাণ আছে? এ ব্যাপারে যে-কোন প্রমাণকেই চূড়ান্ত প্রমাণ হতে হবে, নাহলে প্রতিপাদ্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এই প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় একটা জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা-ব্যবস্থার মধ্যে, যা তার জন্মদাতা ঐ বিবাহপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরেও শত শত বছর ধরে টিকে থেকেছে। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় যে ঐ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় এধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছিলই।

এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা হচ্ছে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার যে-সব সম্পর্ক দেখা যায়, তা একমাত্র ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেই গড়ে ওঠা সম্ভব। আর এধরনের সম্পর্ক থাকলে ঐ পরিবারের অস্তিত্বও থাকতে বাধ্য। তাছাড়া, এইসব সম্পর্ক থেকে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় যে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবারই চালু ছিল।

আমাদের মূল বক্তব্যগুলোই ব্যাখ্যা করার জন্য এবার আমরা আজপর্যন্ত আবিষ্কৃত এই প্রাচীনতম জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটির অন্তর্গত বিভিন্ন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। আর আমরা আজপর্যন্ত যত ধরনের পরিবারের কথা জানতে পেরেছি, তার মধ্যে এই ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারই সবথেকে প্রাচীন।

জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকতে পেয়েছে বলেই প্রাচীন সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে এই গুরুত্বপূর্ণ বিবরণটা আজপর্যন্ত বিদ্যমান আছে। যেমন, আর্যদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা প্রায় তিনহাজার বছর ধরে টিকে আছে কোনরকম মৌলিক পরিবর্তন

ছাড়াই। একবিবাহভিত্তিক পরিবার (এই পরিবারের সম্পর্কগুলোই নির্ধারণ করেছে আর্যদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা) যদি আরও এক লক্ষ বছর টিকে থাকে, তাহলে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাও ততদিন টিকে থাকবে তার সঙ্গে। এই ব্যবস্থা একবিবাহের আওতাভুক্ত সম্পর্কগুলোকেই নির্ধারণ করেছে, কাজেই একবিবাহভিত্তিক পরিবার যতদিন তার বর্তমান রূপে টিকে থাকবে, ততদিন ঐ ব্যবস্থারও কোন পরিবর্তন ঘটবে না। আর্য জাতিগুলোর মধ্যে কোন নতুন ধাঁচের পরিবার সৃষ্টি হলেও যতদিন পর্যন্ত না সেই পরিবার সর্বত্র চালু হয়, ততদিন পর্যন্ত জ্ঞাতিত্বের বর্তমান ব্যবস্থাটির কোন অদল-বদল ঘটতে পারে না। আর ঐ নতুন ধরনের পরিবার যদি একবিবাহের থেকে মূলগতভাবে আলাদা ধরনের না হয়, তাহলে সেটি বর্তমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটালেও একে পুরোপুরি বাতিল করে দিতে পারবে না। এই ব্যবস্থার পূর্ববর্তী তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং তার আগেকার মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের সঙ্গেই জন্ম নিয়েছিল মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে টিকে ছিল এই ব্যবস্থা। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের উদ্ভব ঘটার পরেও এ ব্যবস্থা টিকে ছিল বহুদিন। তারপর সমাজে গোত্রীয় সংগঠনের অভ্যুদয় ঘটে, তার সঙ্গেই মাথা তোলে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। এই তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে মালয়ী জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার অবসান ঘটায়।

পলিনেশিয়ার অধিবাসীরা মালয়ী বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত। এদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা বলা হলেও মূল মালয়ের অধিবাসীরা কিন্তু নিজেদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছে। হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে এবং পলিনেশিয়ার অন্য কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে এমন এক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা আজও চালু আছে (যার বিবরণ সারণীতে পাওয়া যাবে), যাকে আমাদের জানা প্রাচীনতম জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই ব্যবস্থার বিশিষ্টতম প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় হাওয়াইয়ান আর রোতুমানদের[১]। এটাই হচ্ছে শ্রেণীবিভাজন-মূলক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সরলতম এবং প্রাচীনতম রূপ। পরবর্তীকালে যে আদিম রূপটির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা, তার প্রকৃত চেহারাটাও বোঝা যায় এ থেকে।

এটা স্পষ্ট যে মালয়ী ব্যবস্থাটা অন্য কোন বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট হয় নি, কেননা এই ব্যবস্থার পূর্ববর্তী কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কথা আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রাথমিক সম্পর্কগুলোকেই স্বীকার করা হয়। এ-রকম সম্পর্ক সংখ্যায় মোট পাঁচটা। এ ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করা হয় না। নিকট ও দূরসম্পর্কীয় সমস্ত জ্ঞাতিদের পাঁচটা

১। রোতুমানদের কথা এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। রোতুমায় বসবাসকারী মেথডিস্ট মিশনারি রেভারেণ্ড জন অসবোর্ণ এদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে এই বিবরণ আমার কাছে পাঠিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি অঞ্চলের বাসিন্দা রেভারেণ্ড লোরিমার ফিসন্।

বর্গে ভাগ করা হয়। ব্যক্তি নিজে, তার ভাইবোনেরা এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির ও আরও দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি ভাইবোনদের নিয়ে গড়ে ওঠে প্রথম বর্গটা। এরা সকলেই ঐ ব্যক্তির ভাই বা বোন হিসেবে স্বীকৃত হয়। এখানে 'জ্ঞাতি ভাইবোন' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের অর্থে, কারণ পলিনেশিয়ায় এই সম্পর্কটাই অজানা। সম্পর্কের দ্বিতীয় বর্গটা গড়ে ওঠে ঐ ব্যক্তির মা-বাবা, তাঁদের ভাইবোন এবং তাঁদের প্রথম, দ্বিতীয় ও আরও দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভাইবোনদের নিয়ে। এরা সকলেই ঐ ব্যক্তির মা অথবা বাবা হিসেবে বিবেচিত হয়। তৃতীয় বর্গে থাকে ঐ ব্যক্তির বাবার দিকের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আর মায়ের দিকের দাদু-দিদিমা এবং এঁদের সমস্ত ভাইবোন ও জ্ঞাতি ভাইবোনেরা। এরা সকলেই ঐ ব্যক্তির ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বা দাদু-দিদিমা হিসেবে গণ্য হয়। চতুর্থ বর্গে থাকে ঐ ব্যক্তির ছেলেমেয়েরা আর তাদের সমস্ত জ্ঞাতি ভাইবোনেরা। এরা সকলেই তার ছেলেমেয়ে হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐ ব্যক্তির নাতি-নাতনী আর তাদের সমস্ত জ্ঞাতি ভাইবোনদের নিয়ে গড়ে ওঠে পঞ্চম বর্গটা। এরা সকলেই তার নাতি-নাতনী হিসেবে গণ্য হয়। তাছাড়া, একই বর্গের সমস্ত ব্যক্তি বিবেচিত হয় পরস্পরের ভাই বোন হিসেবে। এইভাবে যে-কোন ব্যক্তির সমস্ত জ্ঞাতিরা পাঁচটা বর্গে বিন্যস্ত থাকে। একই বর্গের প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে একই সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ থাকে। মালয়ী ব্যবস্থার সম্পর্কের এই পাঁচটা বর্গের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কেননা চীনাদের "নয় বর্গের সম্পর্ক"-এর মধ্যেও এই একই বিন্যাস দেখা যায়। চীনারা শুধু পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে দুটি আর উত্তর-পুরুষদের দুটি বর্গ বাড়িয়ে নিয়েছে (এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে)। দুটো ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা মৌলিক সম্পর্ক আছে, তা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না।

হাওয়াইয়ান ভাষায় বাবার বাবা-মাকে বা মায়ের বাবা-মাকে বলা হয় 'কুপ্পুনা', মা-বাবাকে বলা হয় 'মাকুয়া', সন্তানদের বলা হয় 'কাইকি' আর নাতি-নাতনীদের বলা হয় 'মুপুনা'। এ গুলোর মধ্যে পুরুষবাচক নামগুলোর সঙ্গে যোগ করা হয় 'কানা', শব্দটা, আর স্ত্রীবাচক নামগুলোর সঙ্গে 'ওয়াহিনা' শব্দটা। যেমন, 'কুপ্পুনা কানা' বলতে বোঝায় ঠাকুর্দা বা দাদুকে, আর 'কুপ্পুনা ওয়াহিনা' মানে হচ্ছে ঠাকুমা বা দিদিমা। এই সম্বোধনগুলো আমাদের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বা দাদু-দিদিমার সমতুল। এই সম্পর্কগুলোই ঐ-সব সম্বোধনের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। পূর্বপুরুষ এবং উত্তর পুরুষদের সঙ্গে যে সম্পর্কগুলোর কথা উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলোর আরও পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সম্পর্কগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে হলে সংখ্যাবাচক প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন, প্রথম কুপ্পুনা কানা, দ্বিতীয় কুপ্পুনা ওয়াহিনা ইত্যাদি। তবে সাধারণত ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বা দাদু-দিদিমার পূর্ববর্তী সকলকেই বলা হয় কুপ্পুনা আর নাতি-নাতনীর পরবর্তী সকলকেই বলা হয় নুপুনা।

ভাইবোনের সম্পর্কের দুটো রূপ—বড় আর ছোট। এ দুটো বোঝানোর জন্য আলাদা আলাদা অভিধাও আছে। তবে এগুলো খুব পূর্ণাঙ্গ আকার নিতে পারে নি। হাওয়াইয়ান ভাষায় ব্যাপারটা এ-রকম:

ছোট ভাইরা বড় ভাইকে বলে 'কাইকুয়ানা', ছোট বোনরা বড় ভাইকে বলে

'কাইকুনানা'।

ছোট ভাইকে বড় ভাইরা বলে 'কাইকাইনা', ছোট ভাইকে বড় বোনেরা বলে 'কাইকুনানা'।

বড় বোনকে ছোট ভাইরা বলে 'কাইকুওয়াহিনা', বড় বোনকে ছোট বোনেরা বলে 'কাইকুয়ানা'।

ছোট বোনকে বড় ভাইরা বলে 'কাইকুওয়াহিনা', ছোট বোনকে বড় বোনেরা বলে 'কাইকাইনা'।

দেখা যাচ্ছে একজন পুরুষ তার বড় ভাইকে বলে কাইকুয়ানা, আবার একজন নারীও তার বড় বোনকে ঐ নামেই ডাকে। একজন পুরুষ তার ছোট ভাইকে বলে কাইকাইনা, আবার একজন নারীও তার ছোট বোনকে ঐ নামেই ডাকে। অর্থাৎ এই সম্বোধনগুলো হচ্ছে উভয়লিঙ্গবাচক। কারেনদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পিছনে যে ভাবনা কাজ করেছে, এর পিছনেও সেই একই ভাবনার অস্তিত্ব চোখে পড়ে। অর্থাৎ জন্ম-সূত্রে কে বড় কে ছোট, তা চিহ্নিত করার ভাবনা।[১] বড় আর ছোট বোনদের সম্বোধন করার জন্য পুরুষরা একই শব্দ ব্যবহার করে, আবার বড় আর ছোট ভাইদের সম্বোধন করার জন্য নারীরাও একই শব্দ ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষদের ক্ষেত্রে তাদের বড় ভাই আর ছোট ভাইদের আলাদা করা হয়, কিন্তু তাদের বোনেদের ব্যাপারে এ-রকম কোন ভাগাভাগি করা হয় না। আবার নারীদের ক্ষেত্রে তাদের বড় বোন আর ছোট বোনদের আলাদা করা হয়, কিন্তু তাদের ভাইদের ব্যাপারে এ-রকম কোন ভাগাভাগি করা হয় না। এইভাবে দু প্রস্থ সম্বোধন সৃষ্টি হয়েছে, যার এক প্রস্থ ব্যবহার করে পুরুষরা, আর এক প্রস্থ ব্যবহার করে নারীরা। পলিনেশিয়ার কয়েকটা গোষ্ঠীর মধ্যেও এই রীতি চালু আছে।[২] বন্য এবং বর্বর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ককে প্রায় কখনোই বিমূর্তভাবে দেখা হয় না।

পাঁচ ধরনের জ্ঞাতিত্বই এই ব্যবস্থায় মর্মবস্তু। তবে এর মধ্যেও এমন কিছু উল্লেখ-যোগ্য বিষয় আছে যার জন্য জ্ঞাতিত্বের প্রথম তিনটি সারি সম্বন্ধে বিস্তৃত চিত্রটা উপস্থাপিত করা দরকার। এগুলো উপস্থাপিত করা গেলে আপন ও জ্ঞাতি সম্পর্কিত ভাইবোনদের দলবন্ধ অন্তর্বিবাহের সঙ্গে এ ব্যবস্থার সংযোগটা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারিঃ কোন হাওয়াইয়ান পুরুষের ভাইয়ের সন্তানরা তারও সন্তান। এরা প্রত্যেকেই তাকে বাবা বলে ডাকে। এদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী। এরা তাকে ঠাকুর্দা বা দাদু বলেই ডাকে।

এ পুরুষটির বোনের সন্তানরাও তার সন্তান হিসেবে বিবেচিত হয়। এরাও তাকে বাবা বলে ডাকে। এদের সন্তানরা তার নাতি-নাতনী। এরাও তাকে ঠাকুর্দা বা দাদু বলেই ডাকে। কোন নারীর ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সম্পর্কগুলো উভয় শাখায় একইরকম থাকে, শুধু তাকে ডাকা হয় মা বলে অথবা ঠাকুমা বা দিদিমা বলে।

১। সিস্টেম্স্ অফ কন্স্যাঙ্গুইনিটি", পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৪৫.

২। ঐ, পৃঃ ৫২৫, ৫৭৩.

এইসব ছেলে-মেয়ের স্ত্রী ও স্বামীরা ঐ ব্যক্তিটির পুত্রবধূ বা জামাই হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সম্বোধনগুলো উভয়লিঙ্গবাচক, শুধু তার সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে পুরুষ বা স্ত্রী-বাচক পদ জুড়ে দেওয়া হয়।

জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারি : কোন ব্যক্তির বাবার ভাইরাও তার বাবা এবং তারাও তাকে নিজেদের ছেলে বা মেয়ে বলেই ডাকে। তাদের সন্তানরা ঐ ব্যক্তির বড় বা ছোট ভাইবোন হিসেবেই পচিত হয়। এই ভাইবোনদের সন্তানরা ঐ ব্যক্তিরও সন্তান। এদের সন্তানরা আবার তার নাতি-নাতনী। এরা প্রত্যেকেই তাকে যথাযথ নামে ডেকে থাকে। ঐ ব্যক্তির বাবার বোন তার মা হিবেই গণ্য হয়। তার সন্তানরা পরিচিত হয় ঐ ব্যক্তির বড় বা ছোট ভাইবোন হিসেবে। তাদের সন্তানরা হচ্ছে তারও সন্তান। এদের সন্তানরা বিবেচিত হয় তার নাতি-নাতনী হিসেবে।

একইভাবে ঐ ব্যক্তির মায়ের ভাইরা হচ্ছে তার বাবা, তাদের ছেলেমেয়েরা তার ভাইবোন, তাদের সন্তানরা তারও সন্তান এবং এই শেষোক্তদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি নাতিনী। আবার তার মায়ের বোনেরাও হচ্ছে তার মা, তাদের ছেলেমেয়েরা তার ভাই বোন, তাদের সন্তানরা তারও সন্তান এবং এই শেষোক্তদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী। কোন নারির ক্ষেত্রেও এই সমস্ত শাখার সকলের সঙ্গে সম্পর্কটা একইরকম থাকে।

এইসব আপন ও জ্ঞাতিভাইদের স্ত্রীরা ঐ ব্যক্তিরও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। এইসব স্ত্রীদের মধ্যে কাউকে ডাকার সময় সে নিজের স্ত্রীকে ডাকার সম্বোধনই ব্যবহার করে থাকে। এইসব স্ত্রীদের স্বামীরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ভগ্নীপতি। কোন নারীর ক্ষেত্রে তার সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিবোনদের স্বামীরা বিবেচিত হয় তারও স্বামী হিসেবে। ঐ-সব স্বামীদের মধ্যে কাউকে ডাকার সময় সে নিজের স্বামীকে ডাকার সম্বোধনই ব্যবহার করে থাকে। এই সব স্বামীদের স্ত্রীরা হচ্ছে ঐ নারীটির বৌদি।

জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারি : এই সারির পুরুষ-ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির ঠাকুর্দার ভাইও তার ঠাকুর্দা, তার সন্তানরা ঐ ব্যক্তির বাবা ও মা, তাদের সন্তানরা তার বড় বা ছোট ভাইবোন, এদের সন্তানরা তারও সন্তান এবং ঐ শেষোক্তদের সন্তানরা তার নাতি-নাতনী। আবার, ঠাকুর্দার বোন হচ্ছে তার ঠাকুমা এবং তার সন্তান ও বংশধরদের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কটা বরাবর একইভাবে নির্ধারিত হয়।

ঐ ব্যক্তির দিদিমার ভাই হচ্ছে তার দাদু, দাদুর বোন হচ্ছে তার দিদিমা, এবং তাদের উভয়ের সন্তান ও বংশধরদের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও বরাবর পূর্বোল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়।

এই তৃতীয় সারির বৈবাহিক সম্পর্কে নিয়মটাও ঠিক দ্বিতীয় সারির মতই। এর ফলে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ মানুষের সংখ্যাটা বেশ বড় একটা চেহারা নিয়ে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের সম্পর্কটা যত দূরেই হোক না কেন, ব্যবস্থাটা একইরকম থাকে। তাই জ্ঞাতিত্বের চতুর্থ সারিতে কোন ব্যক্তির প্রপিতামহও তার ঠাকুর্দা হিসেবেই পরিচিত হয়, তার ছেলে হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ঠাকুর্দা, তার ছেলে গণ্য হয় ঐ ব্যক্তির বাবা হিসেবে, বাবার ছেলেরা তার বড় বা ছোট ভাই এবং ভাইদের ছেলে ও নাতিরা তারও ছেলে ও নাতি।

অর্থাৎ জ্ঞাতিত্বের এই ধারাগুলো ওপরদিকে ও নিচের দিকে উভয়তঃই একটা রৈখিক চেহারা নেয়, আর তার ফলে কোন ব্যক্তির জ্ঞাতি ভাইবোনদের পূর্বপুরুষ ও উত্তমপুরুষ হিসেবে পরিগণিত হয়। শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার এটা হচ্ছে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞাতিদের কারুর সঙ্গেই কারুর সম্পর্ক অজ্ঞাত থাকে না।

এই ব্যবস্থার সরলতা থেকে বোঝা যায় তাদের মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞাতিদের মধ্যেকার সম্পর্ক কত দ্রুত চিহ্নিত করা যায় এবং এইসব সম্পর্কের ধারণাটা কিভাবে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। উদাহরণ হিসেবে একটা নিয়মের কথা বলা যায়ঃ বিভিন্ন ভাইয়ের সন্তানরা হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন ; আবার এই শেষোক্তদের সন্তানরাও হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন, এবং পরবর্তী সমস্ত প্রজন্ম ধরে এই নিয়মই চলতে থাকে। বিভিন্ন বোনের সন্তান ও বংশধরদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য।

প্রত্যেক সারির সদস্যদের জ্ঞাতিত্বের বিচারে একই স্তরে নিয়ে আসা হয়। এ ব্যাপারে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বা দূরত্বকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না। অর্থাৎ, একজন ব্যক্তির বিভিন্ন সারির একই পর্যায়ভুক্ত জ্ঞাতিদের সঙ্গে তার একই সম্পর্ক থাকে। জ্ঞাতিত্বের এই সারিভিত্তিক ব্যাপারটা হাওয়াইয়ান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এটা ছাড়া জ্ঞাতিত্বতালিকায় প্রতিটি ব্যক্তির সার্বিক অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব। এই ব্যবস্থার সরল ও বৈশিষ্ট্যসূচক চরিত্রটা সৃষ্টি হয়েছে আপন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে দলগত অন্তর্বিবাহের ফল হিসেবেই।

পরে আমরা দেখতে পাব যে এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পিছনে ভাষার দৈন্য বা সম্পর্কের প্রতি উদাসীনতা কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

হাওয়াইয়ান এবং রোতুমানরা ছাড়া অন্যান্য পলিনেশিয় গোষ্ঠীর মধ্যেও এই ব্যবস্থাই চালু আছে। যেমন, মার্কেসাস দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে, নিউজিল্যান্ডের মারোয়াদের মধ্যে। তাছাড়া, সামোয়ানদের মধ্যে, কুসেইয়েনদের মধ্যে এবং মাইক্রোনেশিয়ার কিংসমিল দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যেও এই ব্যবস্থার দেখা পাওয়া যায়।[১] প্রশান্ত মহাসাগরের প্রতিটি জনবসতিপূর্ণ দ্বীপেও এই প্রথা চালু আছে, তবে কোথাও কোথাও তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে ঐ-সব জায়গায় এসময় ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার প্রথা চালু ছিল। এটা একটা স্বাভাবিক ও বাস্তব ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় সম্পর্কের যে-সব সম্পর্কগুলো চালু ছিল, সেগুলোই ফুটে উঠেছে এই ব্যবস্থার মধ্যে। বিবাহের ব্যাপারে যে-সব প্রথা তখন চালু ছিল, সেগুলো হয়ত এখন আর চালু নেই। তবে ঐ-সব প্রথা আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকলেও তার দরুণ আমাদের সিদ্ধান্তের কোন হেরফের ঘটে না। যে-সব বিবাহপ্রথার মধ্যে থেকে কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে, সেইসব বিবাহপ্রথা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বহুদিন পরেও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা যে প্রায় অপরিবর্তিত রূপেই টিকে থাকে, তা আমরা আগেই বলেছি। মানবসমাজের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে খুবই অল্প-সংখ্যক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এ-থেকেই প্রমাণ হয় যে ঐ

১। "সিস্টেমস্ অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি", পরিচ্ছেদ ১, সারণী ৩, পৃঃ ৫৪২, ৫৭৩.

ব্যবস্থাগুলো সুদীর্ঘকাল ধরে টিকে ছিল। সমাজব্যবস্থার কোন যুগান্তর-অগ্রগতির সময় ছাড়া এই ব্যবস্থাগুলো আর কখনোই পরিবর্তিত হয়। মালয়ী জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার উৎস খুঁজতে গিয়ে তার বংশধারার প্রকৃতিটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে এক-সময় এদের মধ্যে আপন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে দলগত অন্তর্বিবাহ চালু ছিল। আর যদি দেখা যায় যে এদের মধ্যেকার স্বীকৃত প্রধান প্রধান সম্পর্কগুলো ঐ ধরনের বিবাহের ফলেই গড়ে ওঠা সম্ভব, তাহলে ঐ ব্যবস্থা থেকেই অতীতে এই ধরনের বিবাহ চালু থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি যে এই ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল জ্ঞাতিদের মধ্যে (আপন ভাইবোন সহ) বহুবিবাহের ফলেই। বস্তুতপক্ষে এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল আপন ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ থেকেই, পরবর্তীকালে দাম্পত্যব্যবস্থা সীমারেখা প্রসারিত হওয়ার ফলে জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহও শুরু হয়। সময়ের গতিপথে আপন ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের ক্ষতিকর দিকগুলো তারা উপলব্ধি করে, আর তখন থেকে তারা নিজের বোনকে বিবাহ না করে অন্য অন্য সূত্র থেকে স্ত্রী সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করে। অস্ট্রেলিয়দের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার পর আপন ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ বরাবরের মত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তুরানিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোত্রভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার পর আরও ব্যাপকভাবে এই একই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। একমাত্র ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের ফল হিসেবেই এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে, অন্য কোন যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারে স্বামীদের বহু স্ত্রী থাকত এবং স্ত্রীদের থাকত বহু স্বামী। এই বহুস্ত্রী ও বহুস্বামী প্রথাটা একেবারে সুপ্রাচীন কাল থেকেই চালু আছে। এই ধরনের পরিবার মোটেই অস্বাভাবিক নয়, আবার খুব উল্লেখযোগ্য কিছুও নয়। আদিম যুগে এই পথ ছাড়া পরিবার গড়ে ওঠার অন্য কোন সম্ভাব্য উপায়ও ছিল না। কিছু কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে আংশিকভাবে টিকে থাকাটা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। যেমন, হাওয়াইয়ান-দের অস্তিত্ব যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখনও তাদের মধ্যে ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের নানান নিদর্শন বিদ্যমান ছিল।

মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদে এবং তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থের লেখক মিস্টার জন এফ. ম্যাক্‌লেনান সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু আমি আমার মতামত ("সিস্টেমস অফ কনস্যাঙ্গু-ইনিটি"—তেও আমি এই মতই উপস্থাপিত করেছি) পরিবর্তিত করার মত কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাইনি। তবে এখানে পুনঃপ্রদত্ত ব্যাখ্যাটির দিকে এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত টীকাটির (যে এখানে মিস্টার ম্যাক্‌লেনানের বিরোধিতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে) দিকে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার স্বীকৃত সম্পর্কগুলোকে এই ধরনের বিবাহের সাহায্যে যাচাই করলেই বোঝা যাবে যে আপন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের দলগত অন্তর্বিবাহের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল ঐ ব্যবস্থাটা।

মনে রাখা দরকার যে পরিবারের মধ্যে থেকে দু' ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় : রক্তসূত্রে

জ্ঞাতির আর বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়তা। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারে থাকে দু-দল মানুষ—বাবার দল আর মায়ের দল। দু দলের সঙ্গেই সন্তানদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ফলে এই ব্যবচ্ছায় রক্তসূত্রে সম্বন্ধ আর বৈবাহিকসূত্রে সম্বন্ধকে সবসময় আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না।

১) কোন পুরুষের সমস্ত ভাইদের সন্তানরা হচ্ছে তারও সন্তান।

হেতু ; কোন হাওয়াইয়ান পুরুষের সমস্ত ভাইদের স্ত্রীরা তারও স্ত্রী। ফলে তার পক্ষে নিজের সন্তান আর ভাইদের সন্তানদের পৃথক করা আদৌ সম্ভব নয়। কাজেই কোন একজনকে নিজের সন্তান বললে বাকিদেরও নিজের সন্তানই বলতে হয়। ঐ সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেকেরই তার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২) কোন পুরুষের সমস্ত ভাইদের নাতি-নাতনীরা হচ্ছে তারও নাতি-নাতনী।

হেতু ঃ তারা হচ্ছে ঐ ব্যক্তি ছেলে ও মেয়েদের সন্তান।

৩) কোন নারীর ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সম্পর্কগুলো একই থাকে।

এটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবেই বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্কের প্রশ্ন। যেহেতু কোন নারীর ভাইরা হচ্ছে তার স্বামী, কাজেই তাদের ঔরসে অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তানরা হচ্ছে তার সৎ-সন্তান। কিন্তু এই সম্পর্কটা ঐ ব্যবস্থায় স্বীকৃত না। ফলে তারা ঐ নারীটির সন্তান হিসেবেই গণ্য হয়। অন্যথায় তারা ঐ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আমাদের মধ্যেও সৎ-মাকে মা এবং সৎ-ছেলেকে ছেলে বলাই চালু রীতি।

৪) কোন পুরুষের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতি বোনদের সন্তানরা তারও সন্তান।

হেতু ঃ যে কোন পুরুষের সমস্ত বোনেরাই হচ্ছে তার স্ত্রী এবং তার ভাইদেরও স্ত্রী।

৫) কোন পুরুষের সমস্ত বোনেদের নাতি-নাতনীরা হচ্ছে তারও নাতি-নাতনী।

হেতু ঃ তারা হচ্ছে ঐ পুরুষটির সন্তানদের ছেলেমেয়ে।

৬) কোন নারীর সমস্ত বোনেদের সন্তানরা হচ্ছে তারও সন্তান।

হেতু ঃ কোন নারীর বোনেদের স্বামীরা হচ্ছে তারও স্বামী। তবে, এক্ষেত্রে একটা পার্থক্য থাকেই ঃ বোনেদের সন্তানদের থেকে নিজের সন্তানদের সে পৃথক করতে পারে। হিসেব মত সে হচ্ছে তার বোনেদের সন্তানদের সৎ-মা। কিন্তু যেহেতু এ-রকম কোন সম্পর্ক ঐ ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়, তাই বোনেদের সন্তানরাও তার নিজের সন্তান হিসেবেই গণ্য নয়। অন্যথায় তারা ঐ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

৭) আপন ভাইদের সন্তানরা হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন।

হেতু ঃ এই ভাইরা হচ্ছে ঐ সন্তানদের সব কজন মায়ের স্বামী। ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের মাকে চিনতে পারে, কিন্তু বাবার পরিচয়টা অনির্দিষ্টই থাকে। কাজেই মায়ের দিক থেকে তাদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছে পরস্পরের সহোদর ভাইবোন এবং অন্যদের সৎ-ভাই বা সৎ-বোন। কিন্তু বাবার দিক থেকে তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্ভাব্য ভাই বা বোন। তাই স্বাভাবিকভাবেই এরা পরস্পরের ভাইবোন হিসেবেই স্বীকৃত হয়।

৮) এইসব ভাইবোন সন্তানরাও হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন। আবার এই শেষোক্তদের সন্তানরাও হচ্ছে পরস্পরের ভাইবোন। এদের বংশধরদের মধ্যেও অনির্দিষ্টকাল ধরে সম্পর্কের এই ধারাই চলতে থাকে। আপন বোনেদের সন্তান ও বংশধরদের ক্ষেত্রে এবং

বিভিন্ন ভাই ও বোনেদের সন্তান ও বংশধরদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এই-ভাবে সৃষ্টি হয় একটা অন্তহীন ধারা, যা এই ব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই ধারাটা গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে বলা যায় যে, যেখানেই ভাইবোনদের সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেই বেড়ে গেছে বৈবাহিক সম্পর্কের সীমানা। অর্থাৎ একজন পুরুষের আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্ক মিলিয়ে যতজন বোন থাকে, তার স্ত্রীর সংখ্যাও হয় ততজন ; আবার একজন নারীর আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্ক মিলিয়ে যতজন ভাই থাকে, তার স্বামীর সংখ্যাও হয় ততজন। বিবাহ এবং পরিবার গড়ে ওঠে বর্গ অনুযায়ী এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই অগ্রসর হয়। যে বিস্ময়কর দাম্পত্য ব্যবস্থার কথা আমরা আগে কয়েকবার উল্লেখ করেছি, তার সূত্রপাত এইভাবেই হয়েছিল।

৯) কোন ব্যক্তির বাবার সমস্ত ভাইরাই হচ্ছে তার বাবা ; তার মায়ের সমস্ত বোনেরাই তার মা।

হেতু : ১, ৩, এবং ৬নং-এর মত।

১০) কোন ব্যক্তির মায়ের সমস্ত ভাইরাই তার বাবা।

হেতু : তারা হচ্ছে তার মায়ের স্বামী।

১১) মায়ের সমস্ত বোনেরাই হচ্ছে তার মা।

হেতু : ৬নং-এর মত।

১২) তার সমস্ত জ্ঞাতি ভাইবোনদের প্রত্যেকটি সন্তানই হচ্ছে তারও সন্তান।

হেতু : ১, ৩, ৪ এবং ৬ নং-এর মত।

১৩) শেষোক্তদের সমস্ত সন্তানরাই হচ্ছে তার নাতি-নাতনী।

হেতু : ২ নং-এর মত।

১৪) বাবার দিকে ঠাকুর্দা ও ঠাকুমার সমস্ত ভাইবোনই হচ্ছে তার ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা, আর মায়ের দিকে দাদু ও দিদিমার সমস্ত ভাইবোনই হচ্ছে তার দাদু ও দিদিমা।

হেতু : তারা হচ্ছে তার বাবা-মার বাবা-মা।

এইভাবে, আপন ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের দলগত অন্তর্বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের নিজস্ব প্রকৃতির সাহায্যেই এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সন্তানদের পিতৃত্ব সম্বন্ধে যতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায়, সেই অনুযায়ীই গড়ে ওঠে বাবার দিকের সম্পর্কগুলো। কোন সন্তানের সম্ভাব্য পিতা হিসেবে যে ক'জন পুরুষকে চিহ্নিত করা যায়, তারা প্রত্যেকেই তার প্রকৃত পিতা হিসেবে গণ্য হয়। মায়ের দিকের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় আত্মীয়তার সূত্রে। সৎ-সন্তানরা গণ্য হয় আপন সন্তান হিসেবেই।

বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কিছু সুনিশ্চিত তথ্য আমাদের হাতে আছে। নিচের সারণীটা দেখুন :

পুরুষের ক্ষেত্রে	টোঙ্গান	হাওয়াইয়ান
আমার ভাইয়ের স্ত্রী	উনোহো, আমার স্ত্রী	ওয়াহিনা, আমার স্ত্রী
আমার স্ত্রীর বোন	উনোহো, আমার স্ত্রী	ওয়াহিনা, আমার স্ত্রী
নারীর ক্ষেত্রে		

পুরুষের ক্ষেত্রে	টোঙ্গান	হাওয়াইয়ান
আমার স্বামীর ভাই	উনোহো, আমার স্বামী	কেনু, আমার স্বামী।
পুরুষের ক্ষেত্রে		
আমার বাবার ভাইয়ের ছেলের স্ত্রী	উনোহো, আমার স্ত্রী	ওয়াহিনা, আমার স্ত্রী।
আমার মায়ের বোনের ছেলের স্ত্রী	উনোহো, আমার স্ত্রী	ওয়াহিনা, আমার স্ত্রী।
নারীর ক্ষেত্রে		
আমার বাবার ভাইয়ের মেয়ের স্বামী	উনোহো, আমার স্বামী	কাইকোয়েকা, আমার ভগ্নীপতি।
আমার মায়ের বোনেব মেয়ের স্বামী	উনোহো, আমার স্বামী	কাইকোয়েকা, আমার ভগ্নীপতি।

যেখানে স্ত্রীর সম্পর্কটা জ্ঞাতিত্বের ধারায় গড়ে ওঠে, সেখানে স্বামীর সম্পর্কটা থাকে বংশগত ধারায়। আবার যেখানে স্ত্রীর সম্পর্কটা ওড়ে ওঠে বংশগত ধারায়, সেখানে স্বামীর সম্পর্কটা থাকে জ্ঞাতিত্বের ধারায়।[১] জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার এই ব্যবস্থাটা যখন প্রথম কার্যকরী হয়েছিল (এবং আজও তা কার্যকরী আছে), তখন যে সম্পর্ক-গুলো গড়ে উঠেছিল সেগুলো বাস্তবে বিদ্যমান সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। বৈবাহিক রীতির ক্ষেত্রে অবশ্য পরবর্তীকালে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে যে-সব প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এই ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠার সময় পলিনেশিয় গোষ্ঠীগুলোর পূর্বপুরুষদের মধ্যে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। কারণ এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছাড়া ঐ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তাছাড়া এ থেকে তাদের মধ্যেকার প্রতিটা সম্পর্কের একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়।

মিস্টার অস্কার পেশেচল-এর নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য: "একই মায়ের গর্ভজাত সন্তানরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের মধ্যে যৌনমিলন মারফৎ বংশবৃদ্ধি করেছে—এ কথাটা যে-কোন জায়গাতে এবং যে-কোন সময়েই অবিশ্বাস্য। কেননা এটা এখন প্রমাণিত সত্য যে এমনকি রক্তবিহীন প্রাণীদের (যেমন, উদ্ভিদের) ক্ষেত্রেও একই পিতা-মাতার সন্তানদের পরস্পরের সঙ্গে যৌনমিলন মারফৎ বংশবিস্তার করা প্রায় অসম্ভব।"[২] মনে রাখা দরকার যে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ভাইবোন বিবাহভিত্তিক দলগুলো শুধু-মাত্র আপন ভাইবোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জ্ঞাতি ভাইবোনরাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দলের পরিধি অর্থাৎ বিবাহ করার মত নারী-পুরুষের সংখ্যা যত বেশি হয়,

১। দক্ষিণ আফ্রিকার কাফিরদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অনুযায়ী কোন ব্যক্তির বাবার ভাইয়ের ছেলের স্ত্রী, বাবার বোনের ছেলের স্ত্রী, মায়ের ভাইয়ের ছেলের স্ত্রী এবং মায়ের বোনের ছেলের স্ত্রী এরা প্রত্যেকেই ঐ ব্যক্তিরও স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়।

২। "রেসেস অফ ম্যান", অ্যাপ্লটন সম্পাদিত, ১৮৭৬, পৃঃ ২৩২.

ঘনিষ্ঠ জনদের যৌনমিলনের বিপদটাও ততই কমে যায়।
সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাচীনকালে এ ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব সম্ভবপর ছিল। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের সঙ্গে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের সঙ্গে জোড়বাঁধা পরিবারের এবং জোড়বাঁধা পরিবারের সঙ্গে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী সম্পর্কগুলোর কথা বিবেচনা করলে (একটার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পরেরটা) এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার একটা যুক্তিসম্মত সম্পর্ক আছে এবং এই ধারাবাহিক ক্রমটা তার চলার পথে বন্যতার যুগ থেকে শুরু করে নানান ঐতিহাসিক পর্যায় অতিক্রম করে এসে পেঁছেছে সভ্যতার যুগে।
একইভাবে, পরিবারের তিনটি প্রধান প্রধান রূপের সঙ্গে সংযুক্ত জ্ঞাতিত্বের তিনটি প্রধান প্রধান ব্যবস্থাও পরস্পরের সঙ্গে একইরকম সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ থেকেছে। একটার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে পরের ব্যবস্থাটা। এই ধারাবাহিক ক্রমটাও তার চলার পথে বন্যতার যুগ থেকে উজিয়ে এসে পেঁছেছে সভ্যতার যুগে। এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় পরিবারগুলো যখন বন্যতার দশায় ছিল, তখন তাদের মধ্যেও চালু ছিল মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অনুরূপ কোন ব্যবস্থা। গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার পর এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সূচিত হয় তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। অবশেষে, একবিবাহভিত্তিক পরিবার সৃষ্টি হওয়ার পর অবসান ঘটে সেই ব্যবস্থারও। গড়ে ওঠে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা।
প্রাচীনকালে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করেছি। কিন্তু প্রাচীনকালে হাওয়াই দ্বীপবাসীদের মধ্যে এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও এমন কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে, যেগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়।
স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে যখন প্রথম বিস্তারিতভাবে জানা যায়, তখন সেখানকার সমাজ যে অবস্থায় ছিল তা থেকে অনুমান করা যায় যে আগে সেখানে এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। আমেরিকান মিশনগুলো যখন সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮২০), তখন ওখানকার সমাজের অবস্থা দেখে মিশনারিরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সবথেকে বিস্মিত হয়েছিলেন ওখানকার নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক আর তাদের বিবাহপ্রথা দেখে। তাঁরা হঠাৎই গিয়ে পড়েছিলেন প্রাচীন সমাজের এমন এক অবস্থায়, যেখানে একবিবাহভিত্তিক পরিবার অথবা জোড়াবাঁধা পরিবার একেবারেই অজানা বস্তু। তারা দেখতে পেয়েছিলেন দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। যার মূল কাঠামোটা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি, যেখানে আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ তখনও পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায় নি। পুরুষ এবং নারী, উভয়েই বহুবিবাহে অভ্যস্ত ছিল। তাঁদের মনে হয়েছিল এটাই মানুষের অধঃপতনের নিম্নতম স্তর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরল হাওয়াই দ্বীপবাসীরা তখনও পর্যন্ত বন্যদশা থেকে উন্নত হয়ে উঠতে না পারলেও বন্যদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক জীবনই যাপন করত। বিভিন্ন সামাজিক রীতি ও প্রথাই তাদের কাছে আইনস্বরূপ ছিল। ঐ-সব মিশনারিরা যেমন নিষ্ঠা-ভরে নিজেদের রীতিনীতি মেনে চলতেন, তেমন নিষ্ঠাভাবেই নিজেদের রীতিনীতি

তাদের অবস্থা দেখে মিশনারিরা প্রচন্ড বিস্মিত হয়েছিলেন। এ থেকেই বন্য মানুষের সঙ্গে সভ্য মানুষের দূরত্বের পরিধিটা বোঝা যায়। বহু বছর ধরে বিকাশের গতিপথে উন্নত হয়ে ওঠা সভ্য মানুষের নৈতিক বোধ ও পরিশীলিত দায়িত্ব সচেতনতা মুখোমুখী হয়েছিল বহু যুগ পিছিয়ে থাকা বন্য মানুষদের দুর্বল নৈতিক বোধ ও অমার্জিত দায়িত্বসচেতনতার। এক পরিপূর্ণ বৈষম্য। ঐ-সব মিশনারীদের অন্যতম বর্ষীয়ান রেভারেন্ড হিরান বিংঘাম তাঁর মৌলিক অনুসন্ধানকে অবলম্বন করে স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের একটা চমৎকার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে ওখানকার লোকেরা মানুষের পক্ষে সব থেকে ঘৃণ্য কাজগুলোই করে থাকে। রেভারান্ড বিংঘাম লিখেছেন, "বহুস্ত্রী ও বহুস্বামী প্রথা, অবিবাহিত অবস্থায় যৌনমিলন, ব্যাভিচার, স্বজনমেহন, শিশুহত্যা, স্বামী বা স্ত্রীকে ফেলে পালানো, মা-বাবা বা সন্তানদের পরিত্যাগ করা, ডাকিনীবিদ্যা, লালসা এবং অত্যাচার—এ-সবই ওখানে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে, এমনকি তাদের প্রচলিত ধর্মও এগুলোকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি।"[১] দলগত বিবাহ প্রথা এবং ঐ বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারসমূহই এই অবস্থাটার সৃষ্টি করেছিল, এই বিবাহ ও পরিবারই হাওয়াইদ্বীপবাসীদের নৈতিক চরিত্রের ঐ ধাঁচটা গড়ে তুলেছিল। বন্যদের মধ্যেও নৈতিকতা থাকে, অবশ্য তার মানটা হয় নিচু। সমগ্র ইতিহাসে পুরোপুরি নৈতিকতাহীন কোন যুগের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। মিস্টার বিংঘাম লিখেছেন—হাওয়াইবাসীদের আদিপুরুষ ওয়াকিয়া নিজের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ভাইবোনদের নির্দ্বিধায় পরস্পরকে বিবাহ করে—এ ঘটনা ঐ-সব মিশনারিরা দেখেছিলেন। বিংঘাম লিখেছেন, "ভাইবোনের যৌনমিলন ব্যাপকভাবেই চালু ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা তাদের কাছে পেঁছনোর আগে পর্যন্ত এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।[২] স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে ভাইবোন-বিবাহভিত্তিক-পরিবার-এর কাল থেকে এই ভাইবোনেদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের ব্যাপারটা কয়েকটি ক্ষেত্রে দলগত-বিবাহভিত্তিক-পরিবার-এর সময়েও টিকে থেকেছিল এবং সেটা মোটেই কোন একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়। আসলে তাদের মধ্যে তখনও গোত্রভিত্তিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি বলে এবং ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর পেরিয়ে দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা তখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি বলেই এটা ঘটতে পেরেছিল। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে উঠলেও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের ধাঁচেরই রয়ে গিয়েছিল, শুধু বিশেষ কয়েকটি সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল।

যে-সব দলগুলো বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হত, তাদের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে একটা পরিবার গড়ে তোলাটা হাওয়াইয়ানদের পক্ষে সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। জীবনধারণের রসদ সংগ্রহ করা এবং পরস্পরকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তাদেরকে বাধ্য করত ঐ দলগুলোকে কয়েকটা ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে রাখতে। তবে, প্রতিটা ক্ষুদ্রতর পরিবারই হত গোটা দলটার একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের এবং দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে ব্যক্তিরা বোধহয় নিজেদের ইচ্ছেমত

১। বিংঘাম, "স্যাণ্ডউইচ আইল্যাণ্ডস", হার্টফোর্ড সংস্করণ, ১৮৪৭, পৃঃ ২১.

২। ঐ, পৃঃ ২৩.

একটা উপ-পরিবার থেকে আরেকটা উপ-পরিবারে চলে যেতে পারত। মিস্টার বিংহাম সম্ভবত এই ঘটনাকেই উল্লেখ করেছেন স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে পরিত্যাগ করা এবং মা-বাবা কর্তৃক সন্তানদের পরিত্যাগ করা হিসেবে। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক ও দলগত বিবাহভিত্তিক—উভয় ধরনের পরিবারেই জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাম্যবাদ চালু ছিল। সেই পরিস্থিতিতে এছাড়া অন্য উপায়ও অবশ্য ছিল না। বন্য এবং বর্বর গোষ্ঠী-গুলোর মধ্যে এখনও এই সাম্যবাদ অনেকাংশে চালু রয়েছে।

"চৈনিকদের সম্পর্কের নয়টি স্তর" সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা দরকার। প্রাচীন আমলের জনৈক চৈনিক লেখক লিখেছেনঃ "পৃথিবীতে জাত যাবতীয় মানুষের সম্পর্কের নয়টি স্তর থাকে। আমার নিজের প্রজন্ম হচ্ছে একটি স্তর, আমার পিতার প্রজন্ম একটি, পিতামহের প্রজন্ম একটি, প্রপিতামহের প্রজন্ম একটি এবং প্রপিতামহের পিতার প্রজন্ম একটি স্তর। অর্থাৎ, আমার উর্ধ্বতন স্তর হচ্ছে চারটি। আবার, আমার পুত্রের প্রজন্ম একটি স্তর, পৌত্রের প্রজন্ম একটি, প্রপৌত্রের প্রজন্ম একটি এবং প্রপৌত্রের পুত্রের প্রজন্ম একটি স্তর। অর্থাৎ, আমার অধস্তন স্তর হচ্ছে চারটি। তাহলে আমাকে নিয়ে মোট স্তর দাঁড়াচ্ছে নয়টি। প্রতিটা স্তরের জ্ঞাতিরা পরস্পরের ভাইবোন। প্রত্যেকটা স্তর পৃথক পৃথক গৃহ বা পরিবারভুক্ত হলেও এরা প্রত্যেকেই আমার আত্মীয়, এবং এগুলোই হচ্ছে সম্পর্কের নয়টি স্তর।

"পরিবারের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের ধারাগুলো হচ্ছে কোন ঝর্ণা থেকে সৃষ্ট ছোট ছোট সোঁতা কিংবা কোন গাছের বিভিন্ন শাখার মতো। সোঁতাগুলো পরস্পরের থেকে কম-বেশি দূরে দূরে থাকতে পারে, গাছের শাখাগুলোও থাকতে পারে কম-বেশি কাছাকাছি, কিন্তু মূল ঝর্ণা বা মূল কান্ড থাকে একটাই।"[১]

আজকের দিনের চৈনিকদের থেকে অনেক যথাযথভাবে সম্পর্কের এই নয়টি স্তরকে বাস্তবায়িত করেছে হাওয়াইয়ানরা (উপরের দিকের দুটি এবং নিচের দিকের দুটি স্তর বাদ দিয়ে এটাকে তারা পাঁচটি স্তরে পরিণত করেছে)[২]। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উপাদানগুলো সূচিত হওয়ার ফলে এবং জ্ঞাতিত্বের বিভিন্ন ধারাকে পৃথকীকৃত করার জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে চৈনিকদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অনেকটাই পরি-বর্তিত হয়েছে। কিন্তু হাওয়াইয়ানদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে সেই প্রাথমিক স্তরগুলো (যেগুলোতে আদতে চৈনিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থারই বিশেষত্ব ছিল) আজও বজায় আছে। এটা একান্তই সুস্পষ্ট যে চৈনিক এবং হাওয়াইয়ান, উভয় ব্যবস্থাতেই জ্ঞাতিদের প্রজন্ম অনুসারে বিভিন্ন বর্গে ভাগ করা হয়। একই স্তরের সমস্ত জ্ঞাতিরা বিবেচিত হয় পরস্পরের ভাইবোন হিসেবে। তাছাড়া, বিবাহ এবং পরিবারগঠন সম্পন্ন হয় এই এক একটা স্তরের মধ্যেই, অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকে শুধুমাত্র একই স্তরের পুরুষ ও নারীদের মধ্যেই। হাওয়াইয়ানদের বিভিন্ন বর্গগুলোর সাহায্যে ব্যাখ্যা করলে এই ব্যাপারটা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। সেই সঙ্গেই এ থেকে চৈনিকদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের অবস্থা সম্বন্ধেও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই

১। "সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি", পৃঃ ৪১৫.

২। পৃঃ ৪৩২, এখানে চৈনিকদের জ্ঞাতিব্যবস্থা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন অবস্থার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই টিকে আছে এই ব্যাপারটা, আর এর সঙ্গে হাওয়াই-য়ানদের অবস্থার সাদৃশ্যটাও একান্তই সুস্পষ্ট। অন্য কথায়, এথেকে বোঝা যায় যে ঐ-সব স্তরগুলো গড়ে ওঠার সময় সেখানে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল (আর ঐ পরিবারের আগে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান ছিল ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার)।

প্লেটোর "টাইমেয়ুস"-এও সম্পর্কের এই পাঁচটা প্রাথমিক স্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'আদর্শ প্রজাতন্ত্র'-এ যাবতীয় জ্ঞাতিদের পাঁচটি বর্গে বিভক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে নারীরা হবে সার্বজনীন স্ত্রী আর সন্তানরা হবে সমস্ত পিতামাতার সন্তান। "কিন্তু সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে কী করা হবে?" সক্রেটিস বলছেন টাইমেয়ুসকে, "প্রস্তাবটির অভিনবত্বের দরুণ এ ব্যাপারটা স্মরণ করতে তোমার নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না। কারণ আমরা আদেশ দিয়েছিলাম যে বৈবাহিক সম্পর্কটা হবে সার্বজনীন, সমস্ত পুরুষ ও নারীই তার অন্তর্ভুক্ত হবে, আর সন্তানরাও হবে সার্বজনীন সন্তান। আমরা আরও আদেশ দিয়েছিলাম যে, কেউ যাতে তার নিজের সন্তানদের আলাদা করে চিনে নিতে না পারে সে ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সমবয়স্ক প্রত্যেকেই যেন পরস্পরকে জ্ঞাতি বলে মনে করতে শেখে, জীবনের যৌবনলগ্নে যেন পরস্পরকে মনে করে ভাইবোন হিসেবে, পূর্ববর্তীদের যেন মনে করে পিতামাতা ও পিতামহ-পিতামহী বা মাতামহ-মাতামহী হিসেবে আর পরবর্তীদের মনে করে নিজেদের সন্তান এবং নাতি-নাতনী হিসেবে।"[১] গ্রীক ও পেলাসজিয়ান রীতিনীতিগুলোর সঙ্গে প্লেটো অবশ্যই পরিচিত ছিলেন (যেগুলোর কথা আমরা জানতে পারিনি)। এইসব রীতিনীতি চালু ছিল সেই বর্বর যুগ থেকেই এবং এগুলো থেকে গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর আরও প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মনে হয়, প্লেটোর আদর্শ পরিবারের ধারণাটা কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ঐ-সব প্রাচীন রীতিনীতিগুলোর কথা মাথায় রেখেই তিনি এই পরিবারের কথা বলেছিলেন। হাওয়াইয়ানদের মধ্যে প্রচলিত সম্পর্কের পাঁচটি স্তরের সঙ্গে প্লেটোপ্রদত্ত সম্পর্কের পাঁচটি স্তরের সাদৃশ্যটা লক্ষনীয়। তিনি বলেছেন, প্রতিটা স্তরের সদস্যারা হবে পরস্পরের ভাইবোন এবং তাদেরকে নিয়েই গড়ে উঠবে একেকটা স্তরের পরিবার ; আর, এক একটা দলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে গণ্য হবে।

শেষত, ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগে সমাজের যে অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা থেকে অত্যন্ত যুক্তিসম্মতভাবেই বোঝা যায় যে তার আগে সমাজে অবাধ, বাছবিচারহীন যৌনমিলনের রীতিই প্রচলিত ছিল। এ সিদ্ধান্তটা একেবারেই অপরিহার্য, যদিও মিস্টার ডারউইনের মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[২] আদিম যুগে ছোট ছোট দলগুলোর মধ্যেও দীর্ঘকাল ধরে অবাধ যৌনমিলন চালু থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের তাগিদে এই দলগুলো ভেঙে গড়ে উঠত আরও ছোট ছোট কিছু দল এবং সেগুলোর মধ্যে

১। "টাইমেয়ুস", পরিচ্ছেদ ২, ডেভিস এর অনুবাদ।

২। "ডিসেন্ট অব ম্যান", ২, ৩৬০.

গড়ে উঠত ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার। এই জটিল বিষয়টা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারই ছিল সমাজের প্রথম সংগঠিত রূপ ; এবং তার আগে যে অবস্থাই থেকে থাক না কেন, সেই অসংগঠিত অবস্থার মধ্যে থেকেই গড়ে উঠতে পেরেছিল এই উন্নততর রূপটা। সে সময় মানবজাতি তার বিকাশের একেবারে নিম্নতম অবস্থায় ছিল। এটাকেই আমরা মানবজাতির প্রগতির সূচনাবিন্দু হিসেবে ধরে নিতে পারি, তারপর একে খুঁজে দেখতে পারি বন্যযুগ থেকে সভ্যযুগে এসে পেঁাছোনোর পথে তার বিভিন্ন গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের ধারাকে। এই অগ্রগতির গতিপথকে সবথেকে ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় বিভিন্ন ধারাবাহিক রূপের মধ্য দিয়ে পরিবার সংক্রান্ত ধারণার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হওয়ার পর (যে ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করেছি) পরিবারের অন্যান্য রূপগুলোকে বুঝতে পারা অনেক সহজ হয়ে যায়।

হাওয়াইয়ান ও রোতুমানদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা

(কা-না = পুরুষ ; ওয়া-হী-না = নারী)

	ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক (মাননীয় থমাস মিলার কৃত)	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক (রেভারেণ্ড জন অস্‌বোর্ন কৃত)	ভাষান্তর
১.	আমার প্রপিতামহ	কু-পু-না	আমার পিতামহ	মা-পি-গা-ফা	আমার পিতামহ
২.	,, প্রপিতামহের ভাই	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,
৩.	,, ,, বোন	,, ,,	,, ,,	,, ,, হোন্‌-ই	,, পিতামহী
৪	,, প্রপিতামহী	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,
৫.	,, প্রপিতামহীর বোন	,, ,,	,, ,,	,, ,, ,,	,, ,,
৬.	,, পিতামহ	,, ,,	,, ,,	,, ,, ফা	,, পিতামহ
৭.	,, পিতামহী	,, ,,	,, ,,	,, ,, হোন্‌-ই	,, পিতামহী
৮.	,, পিতা	মা-কু-আ কা-না	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
৯.	,, মাতা	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	,, মাতা	ওই-হোন্‌-ই	,, মাতা
১০.	,, পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
১১.	,, কন্যা	কাই-কী ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন্‌-ই	,, কন্যা
১২.	,, পৌত্র	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্র
১৩.	,, পৌত্রী	মু-পু-না ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, ,, হোন্‌-ই	,, পৌত্রী
১৪.	,, প্রপৌত্র	,, ,, কা-না	,, পৌত্র	,, ,, ,, ফা	,, পৌত্র
১৫.	,, প্রপৌত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, ,, হোন্‌-ই	,, পৌত্রী

	ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৬.	আমার প্রপৌত্রের পুত্র	মু-পু-না কা-না	আমার পৌত্র	মা-পি-গা ফা	আমার পৌত্র
১৭.	,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, ,, হোন্-ই	,, পৌত্রী
১৮.	,, বড় ভাই (পুরুষের ক্ষেত্রে)	কাই-কু-আ-না	,, ভাই (বড়)	সা-সি-গি	,, ভাই (বড়)
১৯.	,, ,, ,, (নারীর ,,)	কাই-কু-না-না	,, ,, (,,)	সাগ-ভে-ভেন্-ই	,, ,, (,,)
২০.	,, ,, বোন (পুরুষের ,,)	কাই-কু-ওয়া-হী-না	,, বোন (,,)	সাগ-হোন্-ই	,, বোন (,,)
২১.	,, ,, ,, (নারীর ,,)	কাই-কু-আ-না	,, ,, (,,)	সা-সি-গি	,, ,, (,,)
২২.	,, ছোট ভাই (পুরুষের ,,)	কাই-কা-ই-না	,, ভাই (ছোট)	সা-সি-গি	,, ভাই (ছোট)
২৩.	,, ,, ,, (নারীর ,,)	কাই-কু-না-না	,, ,, (,,)	সাগ-ভে-ভেন-ই	,, ,, (,,)
২৪.	,, ,, বোন (পুরুষের ,,)	কাই-কু-ওয়া-হী-না	,, বোন (,,)	সাগ-হোন ই	,, বোন (,,)
২৫.	,, ,, ,, (নারীর ,,)	কাই-কা-ই-না	,, ,, (,,)	সা-সি-গি	,, ,, (,,)
২৬.	,, ভাইয়ের পুত্র (পুরুষের ,,)	কাই-কী-কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
২৭.	,, ,, পুত্রের স্ত্রী (,, ,,)	হু-নো-না	,, পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
২৮.	,, ,, কন্যা (,, ,,)	কাই-কী ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
২৯.	,, ,, কন্যার স্বামী (,, ,,)	হু-নো-না	,, জামাতা	লি-ই ফা	,, জামাতা
৩০.	,, ,, পৌত্র (,, ,,)	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্র
৩১.	,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৩২.	,, ,, প্রপৌত্র (,, ,,)	,, ,, কা-না	,, পৌত্র	,, ,, ফা	,, পৌত্র
৩৩.	,, ,, প্রপৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৩৪.	,, বোনের পুত্র (,, ,,)	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
৩৫. আমার বোনের পুত্রের স্ত্রী (,, ,,)	হু-নো-না	আমার পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	আমার কন্যা
৩৬. ,, ,, কন্যা (,, ,,)	কাই-কী ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
৩৭. ,, ,, কন্যার স্বামী (,, ,,)	হু-নো-না	,, জামাতা	লি-ই ফা	,, পুত্র
৩৮ ,, ,, পৌত্র (,, ,,)	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্র
৩৯. ,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৪০. ,, ,, প্রপৌত্র (,, ,,)	,, ,, কা-না	,, পৌত্র	,, ,, ফা	,, পৌত্র
৪১ ,, ,, প্রপৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৪২ ,, ভাইয়ের পুত্র (নারীর ক্ষেত্রে)	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
৫৩. ,, ,, পুত্রের স্ত্রী (,, ,,)	হু-নো-না	,, পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
৪৪ ,, ,, কন্যা (,, ,,)	কাই-কী ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
৪৫. ,, ,, কন্যার স্বামী (,, ,,)	হু-নো-না	,, জামাতা	লি-ই ফা	,, পুত্র
৪৬. ,, ,, পৌত্র (,, ,,)	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্র
৪৭. ,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৪৮. ,, ,, প্রপৌত্র (,, ,,)	,, ,, কা-না	,, পৌত্র	,, ,, ফা	,, পৌত্র
৪৯. ,, ,, প্রপৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৫০. ,, বোনের পুত্র (,, ,,)	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই-ফা	,, পুত্র
৫১. ,, ,, পুত্রের স্ত্রী (,, ,,)	হু-নো-না	,, পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
৫২. ,, ,, কন্যা (,, ,,)	কাই-কী ওয়া-হীনা	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
৫৩. ,, ,, কন্যার স্বামী (,, ,,)	হু-নো-না	,, জামাতা	লি-ই ফা	,, পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইনানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
৫৪. আমার বোনের পৌত্র (নারীর ক্ষেত্রে)	মদ্-পদ্-না কা-না	আমার পৌত্র	মা-পি-গা ফা	আমার পৌত্র
৫৫. " " পৌত্রী (" ")	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
৫৬. " " প্রপৌত্র (" ")	" " কা-না	" পৌত্র	" " ফা	" পৌত্র
৫৭. " " প্রপৌত্রী (" ")	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
৫৮. " পিতার ভাই	মা-কু-আ কা-না	" পিতা	ওই-ফা	" পিতা
৫৯. " " ভাইয়ের স্ত্রী	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	" মাতা	ওই-হোন-ই	" মাতা
৬০. " " " পুত্র (বড়, পুং ক্ষেত্রে)	কাই-কু-আ-না	" ভাই (বড়)	সা-সি-গি	" ভাই
৬১ " " " " (ছোট, " ")	কাই-কা-ই-না	" " (ছোট)	" "	" "
৬২. " " " পুত্রের স্ত্রী	ওয়া-হী-না	" স্ত্রী	সাগ-হোন-ই	" বোন
৬৩. " " " কন্যা (বড়, পুং ক্ষেত্রে)	কাই-কু-ওয়া-হী-না	" বোন	" "	" "
৬৪. " " " " (ছোট, " ")	" " " "	" "	" "	" "
৬৫. " " " কন্যার স্বামী	কাই-কো-ঈ-কা	" ভগ্নীপতি	সা-সি-গি	" ভাই
৬৬. " " " পুত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	" পুত্র	লি-ই ফা	" পুত্র
৬৭. " " " " কন্যা	কাই-কী ওয়া-হী-না	" কন্যা	লি-ই হোন-ই	" কন্যা
৬৮. " " " কন্যার পুত্র	কাই-কী কা-না	" পুত্র	লি-ই ফা	" পুত্র
৬৯. " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" কন্যা	লি-ই হোন-ই	" কন্যা
৭০. " " " পৌত্রের পুত্র	মদ্-পদ্-না কা-না	" পৌত্র	মা-পি-গা ফা	" পৌত্র
৭১. " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
৭২. " " " পৌত্রের পৌত্র	" " কা-না	" পৌত্র	" " ফা	" পৌত্র

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
৭৩. আমার পিতার ভাইয়ের পৌত্রের পৌত্রী	মু-পু-না ওয়া-হী-না	আমার পৌত্রী	মা-পি-গা হোন-ই	আমার পৌত্রী
৭৪. ,, ,, বোন	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	,, মাতা	ওই-হোন-ই	,, মাতা
৭৫. ,, ,, বোনের স্বামী	,, ,, কা-না	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
৭ . ,, ,, ,, পুত্র (বড়, পুং ক্ষেত্রে)	কাই-কু-আ-না	,, ভাই (বড়)	সা-সি-গি	,, ভাই
৭৭. ,, ,, ,, ,, (ছোট, ,, ,,)	কাই-কা-ই-না	,, ,, (ছোট)	,, ,,	,, ,,
৭৮. ,, ,, ,, পুত্রের স্ত্রী	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	সাগ-হোন-ই	,, বোন
৭৯. ,, ,, ,, কন্যা	কাই-কু ওয়া-হী না	,, বোন	,, ,,	,, ,,
৮০. ,, ,, ,, কন্যার স্বামী	কাই-কো-ঈ-কা	,, ভগ্নীপতি	সা-সি-গি	,, ভাই
৮১. ,, ,, ,, পুত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
৮২. ,, ,, ,, ,, কন্যা	কাই-কী ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
৮৩. ,, ,, ,, কন্যার পুত্র	,, ,, কা-না	,, পুত্র	,, ,, ফা	,, পুত্র
৮৪. ,, ,, ,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, কন্যা	,, ,, হোন-ই	,, কন্যা
৮৫. ,, ,, ,, পৌত্রের পুত্র	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্রী
৮৬. ,, ,, ,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৮৭. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	,, ,, কা-না	,, পৌত্র	,, ,, ফা	,, পৌত্র
৮৮. ,, ,, ,, ,, পৌত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
৮৯. ,, মাতার ভাই	মা-কু-আ কা-না	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
৯০. ,, ,, ভাইয়ের স্ত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, মাতা	,, হোন-ই	,, মাতা
৯১. ,, ,, ,, পুত্র (বড়, পুং ক্ষেত্রে)	কাই-কু-আ-না	,, ভাই (বড়)	সা-সি-গি	,, ভাই

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
৯২ আমার মাতার ভাইয়ের পুত্র (ছোট, পুং)	কাই-কা-ই-না	আমার ভাই (ছোট)	সা-সি-গি	আমার ভাই
৯৩. ” ” ” পুত্রের স্ত্রী	ওয়া-হী-না	” স্ত্রী	সাগ-হোন-ই	” বোন
৯৪. ” ” ” কন্যা	কাই-কু-ওয়া-হী-না	” বোন	” ”	” ”
৯৫. ” ” ” কন্যার স্বামী	কাই-কো-ঈ-কা	” ভগ্নীপতি	সা-সি-গি	” ভাই
৯৬. ” ” ” পুত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	” পুত্র	লি-ই ফা	” পুত্র
৯৭. ” ” ” ” কন্যা	” ” ওয়া-হী-না	” কন্যা	” ” হোন-ই	” কন্যা
৯৮. ” ” ” কন্যার পুত্র	” ” কা-না	” পুত্র	” ” ফা	” পুত্র
৯৯. ” ” ” ” কন্যা	” ” ওয়া-হী-না	” কন্যা	” ” হোন-ই	” কন্যা
১০০. ” ” ” পৌত্রের পুত্র	মু-পু-না কা-না	” পৌত্র	মা-পি-গা ফা	” পৌত্র
১০১. ” ” ” ” কন্যা	” ” ওয়া-হী-না	” পৌত্রী	” ” হোন-ই	” পৌত্রী
১০২. ” ” ” ” পৌত্র	” ” কা-না	” পৌত্র	” ” ফা	” পৌত্র
১০৩. ” ” ” ” পৌত্রী	” ” ওয়া-হী-না	” পৌত্রী	” ” হোন-ই	” পৌত্রী
১০৪. ” মাতার বোন	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	” মাতা	ওই-হোন-ই	” মাতা
১০৫. ” ” বোনের স্বামী	” ” কা-না	” পিতা	” ফা	” পিতা
১০৬. ” ” ” পুত্র (বড়, পুং ক্ষেত্রে)	কাই-কু-আ-না	” ভাই (বড়)	সা-সি-গি	” ভাই
১০৭. ” ” ” ” (ছোট, ” ”)	কাই-কা-ই-না	” ” (ছোট)	” ”	” ”
১০৮. ” ” ” পুত্রের স্ত্রী	ওয়া-হী-না	” স্ত্রী	সাগ-হোন-ই	” বোন
১০৯. ” ” ” কন্যা	কাই-কু ওয়া-হী-না	” বোন	” ”	” ”
১১০. ” ” ” কন্যার স্বামী	কাই-কো-ঈ-কা	” ভগ্নীপতি	সা-সি-গি	” ভাই

	ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১১১.	আমার মাতার বোনের পুত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	আমার পুত্র	লি-ই ফা	আমার পুত্র
১১২.	" " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" কন্যা	" " হোন-ই	" কন্যা
১১৩.	" " " কন্যার পুত্র	" " কা-না	" পুত্র	" " ফা	" পুত্র
১১৪.	" " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" কন্যা	" " হোন-ই	" কন্যা
১১৫.	" " " পৌত্রের পুত্র	মু-পু-না কা-না	" পৌত্র	মা-পি-গা ফা	" পৌত্র
১১৬.	" " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
১১৭.	" " " " পৌত্র	" " কা-না	" পৌত্র	" " ফা	" পৌত্র
১১৮.	" " " " পৌত্রী	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
১১৯.	" পিতার পিতার ভাই	কু-পু-না কা-না	" পিতামহ	" " ফা	" পিতামহ
১২০.	" " " ভাইয়ের পুত্র	মা-কু-আ কা-না	" পিতা	ওই-ফা	" পিতা
১২১.	" " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" মাতা	ওই-হোন ই	" মাতা
১২২.	" " " " পৌত্র (বড়)	কাই-কু-আ-না	" ভাই (বড়)	সা-সি-গি	" ভাই
১২৩.	" " " " পৌত্রী (বড়)	" " ওয়া-হী-না	" বোন (বড়)	সাগ-হোন-ই	" বোন
১২৪.	" " " " পৌত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	" পুত্র	লি-ই ফা	" পুত্র
১২৫.	" " " " " কন্যা	" " ওয়া-হী-না	" কন্যা	লি-ই হোন-ই	" কন্যা
১২৬.	" " " " পৌত্রের পৌত্র	মু-পু-না কা-না	" পৌত্র	কা-পি-গা ফা	" পৌত্র
১২৭.	" " " " " পৌত্রী	" " ওয়া-হী-না	" পৌত্রী	" " হোন-ই	" পৌত্রী
১২৮.	" " " বোন	কু-পু-না ওয়া-হী-না	" পিতামহী	" " " "	" পিতামহী
১২৯.	" " " বোনের পুত্র	মা-কু-আ কা-না	" পিতা	ওই-ফা	" পিতা

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৩০. আমার ঠাকুরদার বোনের কন্যা	মা-কু-আ ওয়া-হী-না	আমার মাতা	ওই-হোন-ই	আমার মাতা
১৩১. ,, ,, ,, পৌত্র (বড়)	কাই-কু-আ-না	,, ভাই (বড়)	সা-সি-গি	,, ভাই
১৩২. ,, ,, ,, পৌত্রী (,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, বোন (,,)	সাগ-হোন-ই	,, বোন
১৩৩. ,, ,, ,, পৌত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
১৩৪. ,, ,, ,, পৌত্রের কন্যা	কাই-কী ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
১৩৫. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্র
১৩৬. ,, ,, ,, ,, পৌত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
১৩৭. ,, মাতার মাতার ভাই	কু-পু-না কা-না	,, মাতামহ	,, ,, ফা	,, মাতামহ
১৩৮. ,, ,, ,, ভাইয়ের পুত্র	মা-কু-আ ,,	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
১৩৯. ,, ,, ,, ,, কন্যা	,, ,, ,, ওয়া-হী-না	,, মাতা	ওই-হোন-ই	,, মাতা
১৪০. ,, ,, ,, ,, পৌত্র (বড়)	কাই-কু-আ-না	,, ভাই (বড়)	সা-সি-গি	,, ভাই
১৪১. ,, ,, ,, ,, পৌত্রী (,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, বোন (,,)	সাগ-হোন-ই	,, বোন
১৪২. ,, ,, ,, ,, পৌত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
১৪৩. ,, ,, ,, ,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, কন্যা	,, ,, হোন-ই	,, কন্যা
১৪৪. ,, ,, ,, ,, ,, পৌত্র	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি-গা ফা	,, পৌত্র
১৪৫. ,, ,, ,, ,, ,, পৌত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
১৪৬. ,, মাতার মাতার বোন	কু-পু-না ওয়া-হী-না	,, মাতামহী	,, ,, ,, ,,	,, মাতামহী
১৪৭. ,, ,, ,, বোনের পুত্র	মা-কু-আ কা-না	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
১৪৮. ,, ,, ,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, মাতা	ওই-হোন-ই	,, মাতা

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৪৯. আমার দিদিমার বোনের পৌত্র (বড় পুং)	কাই-কু-আ-না	আমার ভাই (বড়)	সা-সি-গি	আমার ভাই
১৫০. ,, ,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	,, ,, ওয়া-হী-না	,, বোন (,,)	সাগ-হোন-ই	,, বোন
১৫১. ,, ,, ,, পৌত্রের পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
১৫২. ,, ,, ,, ,, কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, কন্যা	,, ,, হোন-ই	,, কন্যা
১৫৩. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	মু-পু-না কা-না	,, পৌত্র	মা-পি গা ফা	,, পৌত্র
১৫৪. ,, ,, ,, ,, পৌত্রী	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পৌত্রী	,, ,, হোন-ই	,, পৌত্রী
১৫৫. ,, স্বামী	কা-না	,, স্বামী	ভে-ভেন-ই	,, স্বামী
১৫৬. ,, স্ত্রী	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	হোই-এ-না, এবং হেন্	,, স্ত্রী
১৫৭. ,, স্বামীর পিতা	মা-কু-আ-হু-না-আই	,, শ্বশুর	ওই-ফা	,, পিতা
১৫৮. ,, ,, মাতা	,, ,, ,,	,, শাশুড়ী	ওই-হোন-ই	,, মাতা
১৫৯. ,, স্ত্রী পিতা	,, ,, ,,	,, শ্বশুর	ওই-ফা	,, পিতা
১৬০. ,, ,, মাতা	,, ,, ,,	,, শাশুড়ী	ওই-হোন-ই	,, মাতা
১৬১. ,, জামাতা	হু-নো-না কা-না	,, জামাতা	লি-ই ফা	,, পুত্র
১৬২. ,, পুত্রবধূ	,, ,, ওয়া-হী-না	,, পুত্রবধূ	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা
১৬৩. ,, স্বামীর ভাই (দেবর বা ভাশুর	কা-না	,, স্বামী	হোম্-ফু-এ	,, দেবর বা ভাশুর
১৬৪. ,, ভগ্নীপতি (নারীর ক্ষেত্রে)	,,	,, ,,	মে-ই	,, ভগ্নীপতি
১৬৫. ,, ভায়রাভাই (স্ত্রীর বোনের স্বামী)	পু-না-লু-আ	,, ঘনিষ্ঠ সাথী	—	—
১৬৬. ,, শ্যালক	কাই-কো-আ-কা	,, শ্যালক	মে-ই	,, শ্যালক
১৬৭ ,, শ্যালিকা	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	হোম্-ফু-এ	,, শ্যালিকা

ব্যক্তির বিবরণ	হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	রোতুমানদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৬৮. আমার ননদ (স্বামীর বোন)	কাই-কো-আ-কা	আমার ননদ	মে-ই	আমার ননদ
১৬৯. ,, ভ্রাতৃবধূ (ভাইয়ের স্ত্রী)	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	হোম্-ফু-এ	,, ভ্রাতৃবধূ
১৭০. ,, ভাজ (ভাইয়ের স্ত্রী, নারীর ক্ষেত্রে	কাই-কো-আ-কা	,, ভাজ	,, ,,	,, ভাজ
১৭১. ,, জা (দেবর বা ভাশুরের স্ত্রী)	পু-না-লু-আ	,, ঘনিষ্ঠ সাথী	—	—
১৭২. ,, শালাজ (শালকের স্ত্রী)	ওয়া-হী-না	,, স্ত্রী	—	—
১৭৩. ,, বিপিতা	মা-কু-আ কা-না	,, পিতা	ওই-ফা	,, পিতা
১৭৪. ,, বিমাতা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, মাতা	ওই-হোন-ই	,, মাতা
১৭৫. ,, সৎ-পুত্র	কাই-কী কা-না	,, পুত্র	লি-ই ফা	,, পুত্র
১৭৬. ,, সৎ-কন্যা	,, ,, ওয়া-হী-না	,, কন্যা	লি-ই হোন-ই	,, কন্যা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার

ঐতিহাসিক যুগে ইওরোপ, এশিয়া ও আমেরিকায় এবং বর্তমান শতাব্দীতে পলিনেশিয়ায় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। বন্যতার যুগে মানবজাতির প্রায় সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পরও কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে এই পরিবার টিকে থেকেছে। আর ব্রিটনরা বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে পেঁছনোর পরও তাদের মধ্যে এই দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার প্রথা টিকেছিল।

মানব ইতিহাসের গতিপথে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের পর দেখা দিয়েছিল এই পরিবার। আসলে এটা ছিল ঐ ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারেরই একটা পরিবর্তিত রূপ। প্রথম ধরনের পরিবার থেকে দ্বিতীয় ধরনের পরিবারটা গড়ে উঠেছিল আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ ক্রমান্বয়ে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফল হিসেবেই। এই ধরনের বিবাহের অশুভ দিকটা আস্তে আস্তে উপলব্ধি করেছিল মানুষ। ঠিক কী কী ঘটনার ফলে এই পরিবর্তন ঘটেছিল, তা জানা আজ আর সম্ভব নয়। তবে বিষয়টার একটা রূপরেখা দেওয়ার মত প্রমাণাদি আমাদের হাতে এসেছে। যে-সব তথ্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছি, সেগুলো মোটেই খুব আকর্ষণীয় ধরনের নয়। কিন্তু এগুলো থেকে মূল সত্যটা খুঁজে নেওয়ার জন্য দরকার ধৈর্যশীল ও সযত্ন পর্যালোচনা।

ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারে আপন ভাইবোনদের মধ্যেও বিবাহ হত, আবার জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যেও বিবাহ হত। এই পরিবারকে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে পরিবর্তিত করার জন্য দরকার ছিল জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহের রীতিটা চালু রেখে আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহটা বন্ধ করা। এইভাবে একটা দলের মধ্যে বিবাহ চালু রাখা আর অন্য একদল নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করে দেওয়াটা ছিল খুবই দুরূহ একটা প্রক্রিয়া। কেননা এর সঙ্গে পরিবারের কাঠামোর একটা আমূল পরিবর্তনের ব্যাপার জড়িয়ে ছিল (গার্হস্থ্য জীবনের প্রাচীন ধাঁচটার পরিবর্তনের কথা তো না বললেও চলে)। একটা বিশেষ সুবিধা পরিত্যাগের ব্যাপারও জড়িয়ে ছিল এর সঙ্গে, যা করতে বন্য মানুষরা খুব একটা রাজি ছিল না। প্রক্রিয়াটা প্রথমে শুরু হয়েছিল দু'একটা গোষ্ঠীর মধ্যে—এটা ধরেই নেওয়া যায়। তারপর ধীরে ধীরে স্বীকৃতি পেয়েছে এই পদক্ষেপটা। দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এ নিয়ে। বন্যদশায় থাকা অগ্রসর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই প্রথমে শুরু হয়েছিল প্রক্রিয়াটা। প্রথমে এই পদক্ষেপটা আংশিকভাবে গৃহীত হয়, ক্রমে ক্রমে তা একটা সাধারণ চেহারা নেয়, আর সবশেষে ঐ-সব গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পুরোপুরিভাবে এই পদক্ষেপটা গৃহীত

ও স্বীকৃত হয়। এ ঘটনাকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মের কার্যকলাপের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণীগত ব্যবস্থার তাৎপর্যটা নতুন করে সামনে এসে দাঁড়ায়। শ্রেণীগুলো গড়ে তোলার পদ্ধতি থেকে এবং বিবাহ ও বংশধারা নির্ণয়ের রীতিনীতি থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহের অবসান ঘটানো আর জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহটা চালু রাখা। শ্রেণীগুলোর ওপরে প্রথম এই উদ্দেশ্যটা আইনের সাহায্যে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা আপাতভাবে স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও, তাদের বংশধারার পর্যালোচনা করলেই ঐ উদ্দেশ্যটা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।[১] দেখা যায় যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং আরও দূরবর্তী সারির জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠাটা চলতেই থাকে, শুধু আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহটা বন্ধ হয়ে যায়। হাওয়াইয়ানদের তুলনায় দলগত বিবাহের দলগুলোর সদস্য সংখ্যা অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে কিছুটা বেশিই হয়, আর এদের দলগুলোর কাঠামোটাও কিছুটা অন্যরকম। কিন্তু একদা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হাওয়াইয়ান আর অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ঃ উভয় ক্ষেত্রেই স্বামীদের দলটা গড়ে ওঠে কয়েকজন ভাইকে নিয়ে আর স্ত্রীদের দলটা গড়ে ওঠে কয়েকজন বোনকে নিয়ে। তবে হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য ছিল। তাদের মধ্যে এমন কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না, যাদের মধ্যে বিবাহ হওয়াটা বাধ্যতামূলক হিসেবে দেখা যেত। অস্ট্রেলিয়ানদের শ্রেণীগুলোর মধ্যে থেকেই গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহের দলগুলো (যার মধ্যেই নিহিত ছিল গোত্রের বীজ)। এ থেকে মনে হয় যে-সব মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পরবর্তীকালে গোত্রীয় সংগঠন গড়ে উঠেছিল, তাদের সকলকার মধ্যেই একসময় এই লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। সুপ্রাচীনকালে হাওয়াইয়ানদের মধ্যেও এ-রকম শ্রেণীর অস্তিত্ব থেকে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

মানবজাতির তিনটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সবথেকে বহুল বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানের উৎস হিসেবে কাজ করেছে দলগত বিবাহের দলগুলোর মত একটা প্রাচীন সংগঠন। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার, গোত্রীয় সংগঠন আর তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার নিয়ে আলোচনা করলে এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কিছু প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

দলগত বিবাহ থেকে যেমন গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার, ঠিক তেমনি এই পরিবারই জন্ম দিয়েছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার। আসলে, এই পরিবারের আওতায় থাকা সম্পর্কগুলোর প্রকৃত রূপটা ব্যক্ত করার জন্যই পূর্বতন জ্ঞাতিত্ব-

১। ইপ্পাই আর কাপোটাদের বিবাহ হয় একটা দলের মধ্যে। ইপ্পাইদের সন্তানরা হয় মুরি, আবার মুরিদের সন্তানরা হয় ইপ্পাই। একইভাবে, কাপোটাদের সন্তানরা হয় মাটা, আবার মাটাদের সন্তানরা হয় কাপোটা। অর্থাৎ ইপ্পাই আর কাপোটাদের নাতি-নাতনিরাও ইপ্পাই আর কাপোটাই হয় এবং তাদের সম্পর্কটা হয় জ্ঞাতি ভাইবোনের সম্পর্ক। ফলে, জন্মসূত্রেই তারা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরিচিত হয়।

ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করতে হয়েছিল। কিন্তু এ-কাজ করার জন্য দলগত বিবাহের ঐ দলগুলোর থেকেও উন্নত একটা-কিছুর দরকার ছিল। সেই উন্নত কাঠামোর কাজটা করেছিল গোত্রীয় সংগঠন। এই সংগঠন একটা সাংগঠনিক বিধান জারি করে ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল (তার আগে পর্যন্ত ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ প্রায়শই ঘটত বলে ধরে নেওয়া যায়)। ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই ধরনের বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যাবতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। সম্পর্কের এই নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য দরকার হল নতুন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। তারই ফলস্বরূপ মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বদলে গড়ে উঠল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। হাওয়াইয়ানদের মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু গোত্রীয় সংগঠন বা তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অন্তর্গত জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকেই তারা টিকিয়ে রেখেছিল। এ থেকে একটা সন্দেহ দানা বাঁধে, যার সমর্থন পাওয়া যায় বিংঘামের বক্তব্যের মধ্যেও। সন্দেহটা হল—এদের দলগত বিবাহের দলগুলোয় আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহও হামেশাই ঘটত, ফলে পুরোনো জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সংস্কার করা আদৌ সম্ভব ছিল না। হাওয়াইয়ান ধাঁচের দলগত বিবাহভিত্তিক দলগুলো অস্ট্রেলিয়ার শ্রেণীগুলোর মত সুপ্রাচীন যুগে গড়ে উঠেছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। কেননা আজ পর্যন্ত যত ধরনের সমাজকাঠামোর কথা জানা গেছে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ানদের এই শ্রেণীগুলোই সবথেকে প্রাচীন। কিন্তু, গোত্র গড়ে ওঠার জন্য কোন-না-কোন ধরনের দলগত বিবাহভিত্তিক দলের অস্তিত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, ঠিক যেমন তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল গোত্রের উপস্থিতি। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমরা এখন আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করব।

১। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার

কয়েকটি বিরল ক্ষেত্রে এমন দু'একটি নির্দিষ্ট রূপবিশিষ্ট প্রথার খোঁজ পাওয়া গেছে, যেগুলোকে প্রাচীন সমাজের কয়েকটি রহস্যের জট ছাড়ানোর চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যে-সব বিষয়কে আগে ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যেত না, সেগুলোর ব্যাখ্যা করা যায় এইসব প্রথার সাহায্যে। হাওয়াইয়ানদের 'পুনালুয়া' হচ্ছে এ-রকমই একটা প্রথা। হনলুলুর বিচারপতি লরিন অ্যান্ড্রুজ ১৮৬০ সালে লেখা একটি চিঠিতে (যার মধ্যে হাওয়াইয়ান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার একটা তালিকাও দিয়েছিলেন তিনি) হাওয়াইয়ানদের জ্ঞাতিত্বসূচক একটি সম্বোধন সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: "এদের 'পুনালুয়া' সম্বন্ধটা দ্ব্যর্থবোধক। আদতে এর অর্থ ছিল যে দুই বা ততোধিক ভাই আর তাদের স্ত্রীরা এবং দুই বা ততোধিক বোন আর তাদের স্বামীরা প্রত্যেকেই পরস্পরের স্বামী বা স্ত্রী। বর্তমানে এর অর্থ হল 'প্রিয় বন্ধু' বা 'ঘনিষ্ঠ সাথী'।" বিচারপতি অ্যান্ড্রুজ-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যে তাদের মধ্যে একসময় দলগত বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং এখন তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গেই বোঝা যায় যে তাদের জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা একসময় ওখানকার সকলের মধ্যেই চালু ছিল। ঐ দ্বীপপুঞ্জের সবথেকে বিশিষ্ট

মিশনারীদের অন্যতম রেভারেণ্ড আর্টেমান বিশপ (সম্প্রতি প্রয়াত) ঐ ১৮৬০ সালেই আমার কাছে পাঠানো একটি চিঠিতে (জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার তালিকা তিনিও দিয়েছিলেন) এ বিষয়ে লিখেছিলেন : "সম্পর্কের ব্যাপারে এই বিভ্রান্তিটা আসলে প্রাচীন আমলের দলগত স্বামী-স্ত্রী প্রথারই ফল।" মিস্টার বিংঘামের মন্তব্য তো আগেই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে এদের বহুবিবাহের অর্থ হচ্ছে "বহু স্বামী ও বহু স্ত্রী থাকা।" ডাঃ বার্টলেটও একই কথা বলেছেন : "এখানকার আদিবাসীদের শালীনতা বা লজ্জাবোধ জন্তু-জানোয়ারদের থেকে মোটেই উন্নত নয়। স্বামীদের বহু স্ত্রী থাকে, স্ত্রীদের থাকে বহু স্বামী, এবং যথেচ্ছভাবে একে অপরের সঙ্গে স্বামী বা স্ত্রী বিনিময় করে।"[১] এঁরা সকলে যে ধরণের বিবাহপ্রথা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা হচ্ছে দলগত বিবাহ। অর্থাৎ, একদল পুরুষ ও একদল নারী পরস্পরের সঙ্গে দলগতভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এদের সন্তানসন্ততি সমেত এই ধরনের প্রতিটা দলই ছিল একেকটা দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। একটা পরিবারে থাকত কিছু সংখ্যক ভাই আর তাদের স্ত্রীরা, আর একটা পরিবারে থাকত কয়েকজন বোন আর তাদের স্বামীরা।

হাওয়াইয়ানদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে পুরুষরা তাদের স্ত্রীর বোনকেও নিজের স্ত্রী বলেই সম্বোধন করে। কোন পুরুষের স্ত্রীর সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিবোনেরাই তার স্ত্রী। কিন্তু নিজের স্ত্রীর বোনের স্বামীকে সে বলে 'পুনালুয়া', অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সাথী। তার স্ত্রীর সমস্ত বোনেদের স্বামীরাই তার ঘনিষ্ঠ সাথী। এদের বিবাহ হত দলগতভাবে। খুব সম্ভবত এইসব স্বামীরা পরস্পরের ভাই ছিল না। তারা পরস্পরের ভাই হলে জ্ঞাতিত্বের ক্ষেত্রে রক্তের সম্বন্ধটা বজায় থাকত। তবে, তাদের স্ত্রীরা ছিল পরস্পরের বোন—আপন এবং জ্ঞাতিসম্পর্কিত, এক্ষেত্রে স্ত্রীদের এই ভগ্নীত্বের ভিত্তিতেই দলগুলো গড়ে উঠত, তাদের স্বামীরা বিবেচিত হত পরস্পরের 'পুনালুয়া' বা ঘনিষ্ঠ সাথী হিসেবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দলগুলো গড়ে উঠত স্বামীদের ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে, এবং স্ত্রীরা তাদের স্বামীর ভাইকেও নিজের স্বামী বলেই সম্বোধন করত। কোন নারীর স্বামীর সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিভাইরাই তার স্বামী হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রীকে সে ডাকত 'পুনালুয়া' বলে। স্বামীর সমস্ত ভাইদের যতজন স্ত্রী থাকত, সকলেই ছিল তার 'পুনালুয়া'। আগের ক্ষেত্রে যে-কারণে স্বামীরা পরস্পরের ভাই হত না বলে ধরা হয়েছে, সেই একই কারণে এক্ষেত্রেও এই স্ত্রীরা সম্ভবত পরস্পরের বোন হত না—অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই কিছু-না-কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই থাকত। এই সমস্ত স্ত্রীরাই ছিল পরস্পরের 'পুনালুয়া।'

ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকেই যে গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভাইদের সঙ্গে আপন বোনেদের বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমাজের বুকে গোত্রীয় সংগঠন পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনেদের সঙ্গে বিবাহও। কিন্তু এই অন্তর্বর্তী

১। "হিস্টোরিক্যাল স্কেচ অফ দ্য মিশনস্, এট্ সেট্রা, ইন দ্য স্যাণ্ডউইচ আইল্যাণ্ডস," পৃঃ ৫।

যুগটার দলের একজন সদস্যের বাকি স্ত্রীরা অন্য সকলেরও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হত।' একইভাবে, বোনেদের সঙ্গে আপন ভাইদের বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তার দীর্ঘকাল পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইদের সঙ্গে বিবাহও। কিন্তু তাদের বাকি স্বামীরা গণ্য হত অন্য সমস্ত নারীর স্বামী হিসেবেও। ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারে এই অগ্রগতিটা ছিল একটা মহান প্রগতির সূচনাবিন্দু। এই পদক্ষেপ-টাই গড়ে তুলেছিল গোত্রীয় সংগঠনের ভিত্তিভূমি। আর গোত্রীয় সংগঠনই সমাজকে জোড়-বাঁধা বিবাহের স্তর অতিক্রম করিয়ে পেঁছে দিয়েছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে।

দলগত বিবাহের আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। আসলে, তুরানীয় ও গ্যানোয়া-নিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা যখন প্রথম গড়ে উঠেছিল, তখন তাদের পক্ষে এই প্রথাটা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণটা নিতান্তই সহজবোধ্য। দলগত বিবাহের সাহায্যেই তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বিভিন্ন সম্পর্কগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় যে-সব সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, সবগুলোই সম্ভবত টিকে থেকেছে পরবর্তীকালেও। কাজেই, এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বশর্ত ছিল দলগত বিবাহ এবং দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার। আজকের সুসভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও অতীতে দলগত বিবাহ চালু ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। গ্রীক, রোমান, জার্মান, কেল্ট, হিব্রু প্রভৃতি যে-সব জাতির মধ্যে গোত্রীয় সংগঠনের দেখা পাওয়া গেছে, তাদের সকলেরই সুপ্রাচীন পূর্ব-পুরুষরা একসময় অভ্যস্ত ছিল দলগত বিবাহে। কারণ যে-সব জাতি গোত্রীয় সংগঠনের ছত্রছায়া থেকে একবিবাহের স্তরে এসে পেঁছেছে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একসময় চালু ছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা আর এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল দলগত বিবাহের ফল হিসেবেই। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এইসব দলগুলোর গড়ে ওঠা থেকে যে অগ্রগতির সূচনা ঘটেছিল, তা মূলত সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল গোত্র গঠনের স্তরে এসে, আর একবিবাহের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত গোত্রের মধ্যে চালু ছিল তুরানীয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা।

ইওরোপীয়, এশিয় এবং আমেরিকান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে দু'একটা ক্ষেত্রে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায় পর্যন্ত দলগত বিবাহের নিদর্শন দেখা গেছে। প্রাচীন আমলের ব্রিটনদের বিবাহপ্রথা সম্বন্ধে সিজার যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটাই এ ব্যাপারে সবথেকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তিনি বলেছেন, "দশজন বা বারোজন স্বামী যৌথভাবে পরস্পরের স্ত্রীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখত। বিশেষত বিভিন্ন ভাইরা যৌথভাবে পরস্পরের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত এবং এরা প্রত্যেকেই তাদের প্রতিটি সন্তানের পিতা-মাতা হিসেবে গণ্য হত।"[১]

এই কথাগুলোর মধ্যে দলগত অন্তর্বিবাহের একটা ছবিই ফুটে উঠেছে। বর্বর পর্যায়ে নারীদের দশ বা বারোটা পুত্র সন্তান হওয়া খুব একটা স্বাভাবিক নয়, বা বড়জোর দু'একটা ক্ষেত্রে তা ঘটতে পারে। কিন্তু তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় (ব্রিটনদের মধ্যে এই ব্যবস্থাই চালু ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়) সর্বদাই ভাইদের বড় বড় দলের কথা জানা

১। "দ্য বেল. গল," V, ১৪.

যায়। আসলে যে-কোন পুরুষের নিকট ও দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিভাইরাও তার ভাই হিসেবেই গণ্য হতো। সিজারের মতে, ব্রিটনদের মধ্যে একদল ভাইয়ের একদল যৌথ স্ত্রী থাকত। এখানে আমরা এক ধরনের দলগত বিবাহেরই ছবি খুঁজে পাই। এর পাশাপাশি কিছু সংখ্যক বোনেরও যে একদল যৌথ স্বামী থাকত, তার কথা সিজার সরাসরিভাবে উল্লেখ করেন নি। তাসত্ত্বেও, প্রথম দলটার পরিপূরক হিসেবে এই এই দ্বিতীয় দলটারও অস্তিত্ব ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়। প্রথম দলটার অস্তিত্ব ছাড়া আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন সিজার। তিনি দেখেছিলেন, কিছু সংখ্যক পুরুষের কয়েকজন যৌথ স্ত্রী থাকে এবং সন্তানরাও বিবেচিত হয় তাদের সকলের সন্তান হিসেবে। এই যৌথ স্ত্রীরা ছিল পরস্পরের বোন—এমনটা হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তবে সিজারের এই মন্তব্য ঐ দ্বিতীয় দলটার ইঙ্গিত দিক আর না-ই দিক, তাঁর কথা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় ব্রিটনদের সমাজে দলগত বহুবিবাহ কত ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত ছিল। আসলে এই ব্যাপারটার জন্যই তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল ব্রিটনদের দিকে। কিছুসংখ্যক ভাইয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই ছিল পরস্পরের স্ত্রীদের স্বামী, আর তাদের স্ত্রীরা প্রত্যেকেই ছিল পরস্পরের স্বামীর স্ত্রী।

বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে থাকা ম্যাসাগেটেদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হেরোডোটাস লিখেছেন—প্রতিটি পুরুষের একজন করে স্ত্রী থাকত, কিন্তু সমস্ত স্ত্রীরাই ছিল সকলের যৌথ স্ত্রী।[১] এই বক্তব্যের মধ্যে দলগত বিবাহের জায়গায় জোড়-বাঁধা পরিবারের অভ্যুদয়ের একটা আভাস ফুটে উঠেছে। প্রতিটি পুরুষ একজন স্ত্রীর সঙ্গে জোড় বাঁধত এবং ঐ স্ত্রী গণ্য হতে তার প্রধান স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু তাসত্ত্বেও দলের মধ্যে যৌথ স্বামী ও যৌথ স্ত্রী প্রথার কোন ব্যত্যয় ঘটে নি। এখানে হেরোডোটাস যদি অবাধ যৌন-সম্পর্কের কথা বলতে চেয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হয় যে ঐ অবস্থাটা তখন চালু ছিল না। লোহার ব্যবহার না জানলেও ম্যাসাগেটেরা গবাদি পশুর পাল পুষতে শিখেছিল, তামার তৈরি কুঠার আর তামার ফলা লাগানো বর্শা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত এবং চাকালাগানো শকট (amaxa) তৈরি ও ব্যবহার শুরু করেছিল। অবাধ যৌনসংসর্গের অবস্থায় থাকা কোন গোষ্ঠীর পক্ষে এতটা উন্নত হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। অ্যাগাথাইর্সিদের (যারাও সম্ভবত একই অবস্থায় ছিল) সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন যে এদের মধ্যে যৌথ স্ত্রী প্রথা চালু ছিল, স্বামীরা ছিল সম্ভবত পরস্পরের ভাই এবং একটা যৌথ পরিবারের সদস্য হওয়ার দরুণ কেউ কাউকে ঈর্ষা বা ঘৃণা করত না।[২] ম্যাসাগেটেদের সম্বন্ধে এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেকার এই একই প্রথা চালু থাকা সম্বন্ধে হেরোডোটাস যা বলেছেন, তার যুক্তিসম্মত ও সন্তোষ-জনক ব্যাখ্যা বহুবিবাহ বা অবাধ যৌনাচারের মধ্যে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় দলগত বিবাহের মধ্যেই। তাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল, তা বোঝার পক্ষে হেরোডোটাসের বক্তব্য নিতান্তই অপ্রতুল।

দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের সবথেকে অনুন্নত কয়েকটা গোষ্ঠীর মধ্যে দলগত

১। লিব., i, পৃঃ ২১৬.

২। লিব., iv, পৃঃ ১০৪.

বিবাহের কিছু কিছু নিদর্শন দেখা গেছে। তবে এ ব্যাপারে কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নি। যে-সব নাবিকরা ভেনিজুয়েলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের গোষ্ঠী-গুলোর সন্ধান প্রথম পেয়েছিল, তারা এমন একটা সমাজের ছবি দেখেছিল যা দলগত বিবাহের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। "তারা বিবাহের কোনরকম রীতিনীতিই মেনে চলে না। যতখুশি স্ত্রী রাখে, মেয়েরা যথেচ্ছাভাবে স্বামী বদলায়। নারী বা পুরুষ কেউই এর মধ্যে কোন অন্যায় দেখে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের মর্জিমাফিক চলে, কেউ কাউকে ঈর্ষা করে না, কেউ কারুর ক্ষতি করে না……। বাড়িগুলো সার্বজনীন। তালপাতায় ছাওয়া ঘণ্টাকৃতি এই বিশাল বাড়িগুলো বেশ মজবুত। এক একটা বাড়িতে একশ যাটজন করে লোক বাস করে।"[১] এইসব গোষ্ঠীর লোকেরা মাটির তৈরি পাত্র ব্যবহার করত, অর্থাৎ এরা তখন বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে ছিল। কিন্তু বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায় বন্য দশাতেই রয়ে গিয়েছিল তারা। এই বিবৃতিটা এবং হেরোডোটাস-প্রদত্ত বিবৃতিগুলোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে নিতান্তই কিছু ভাসাভাসা পর্যবেক্ষণ। তবে এ-থেকে পরিবার এবং বৈবাহিক সম্পর্কের একটা অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থার ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের মধ্যে দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দলগত বিবাহপ্রথার কোন নিদর্শন তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল বলে আমার জানা নেই। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর থেকে তারা তখন পৌঁছে গিয়েছিল জোড়-বাঁধা পরিবারের স্তরে। কিন্তু প্রাচীনযুগের দলগত বিবাহের দাম্পত্য ব্যবস্থার কিছু কিছু ছাপ তাদের মধ্যে রয়েই গিয়েছিল। উত্তর আমেরিকার অন্তত চল্লিশটা ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও এমন একটা প্রথা চালু আছে, যার আদি উৎস নিঃসন্দেহেই দলগত বিবাহের মধ্যে নিহিত ছিল। একজন পুরুষ কোন পরিবারের বড় মেয়েকে বিবাহ করলে, প্রথা অনুসারে সে তার স্ত্রীর বাকি সমস্ত বোনেরা বিবাহযোগ্য হলে তাদেরও স্বামী হিসাবে পরিগণিত হয়। এই অধিকারটা অবশ্য কখনোই কারুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হত না, কারণ অনেকগুলো সংসার প্রতিপালন করতে স্বামীটিকে সমস্যায় পড়তে হত—অবশ্য বহু-বিবাহের সুযোগটা পুরুষরা সর্বত্রই ভোগ করত। এই প্রথাটা তাদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে দলগত বিবাহ চালু থাকারই প্রমাণ দেয়। একসময় নিশ্চয়ই ভগ্নীদের সুবাদে আপন বোনেরাও তাদের স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হত। একজনের স্বামী ছিল

১। হেরেরার-র "হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", ১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২১৬। ব্রাজিলের উপকূলবর্তী অঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোর সম্বন্ধে বলতে গিয়েও হেরেরা লিখেছেন, "এরা বোহিও অর্থাৎ তালপাতায় ছাওয়া কুটিরে বাস করে। প্রতিটি গ্রামে এ-রকম আটটার মত কুটির থাকে। প্রতিটি কুটিরে প্রচুর লোক বাস করে। শোবার জন্য থাকে দোলনা-জাতীয় বিছানা…। এদের জীবনযাত্রা অনেকটা জন্তু-জানোয়ারের মত। ন্যায় কিংবা শালীনতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই।" ঐ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৯৪। পেরুর কয়েকটি সবথেকে অনুন্নত গোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গার্সিলাসো দ্য লা ভেগা-ও প্রায় একই কথা বলেছেন।—"রয়্যাল কম্. অফ পেরু," ১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১০ এবং ১০৬।

অন্য সকলেরও স্বামী, কিন্তু একমাত্র স্বামী নয়। কারণ দলের মধ্যেকার অন্য পুরুষরাও ছিল ঐ-সব নারীদের যৌথ স্বামী। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অবসান ঘটার পর একমাত্র বড়বোনের স্বামীই ইচ্ছে করলে বাকি সব বোনেদেরও স্বামী হিসেবে পরিগণিত হতে পারত। সঙ্গত কারণেই এটাকে প্রাচীন দলগত বিবাহপ্রথার অবশেষ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব থাকার নজির তুলে ধরা যায়, যা থেকে বোঝা যাবে প্রাচীনকালে প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের পরিবার চালু ছিল। তবে তা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়, কেননা যে-সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিব্যবস্থা চালু আছে বা একসময় চালু ছিল, তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে কাজ করে ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটাই।

২। গোত্রীয় সংগঠনের সূচনা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল বন্য যুগে। কারণ, প্রথমত, গোত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে; আর দ্বিতীয়ত, বন্য যুগে গোত্র কেবলমাত্র আংশিকভাবে বিকশিত হতে পেরেছিল। তাছাড়া, গোত্রের বীজ যেমন নিহিত ছিল অস্ট্রেলিয়ানদের শ্রেণীগুলোর মধ্যে, তেমনই নিহিত ছিল হাওয়াইয়ানদের দলগত বিবাহের দলগুলোর মধ্যেও। অস্ট্রেলিয়ানদের ঐ শ্রেণীগুলোর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গোত্রের মধ্যে শ্রেণীগুলোর আপাত গঠন-কাঠামোটার কোন অস্তিত্ব থাকে না। গোত্রের মত এত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান যে একেবারে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েই গড়ে উঠবে কিংবা একেবারে শূন্য থেকে (অর্থাৎ স্বাভাবিক বিকাশের পথে আগে থেকেই গড়ে ওঠা কোন বনিয়াদ ছাড়াই) গড়ে উঠবে—এমনটা হতেই পারে না। আগে থেকেই বিদ্যমান সামাজিক উপাদানগুলোর মধ্যেই খুঁজতে হবে এর সৃষ্টির সূত্র আর ধরে নিতে হবে যে সৃষ্টি হওয়ার পর একটা পরিণত রূপে পৌছোতে দীর্ঘদিন সময় লেগেছে গোত্রের।

অস্ট্রেলিয়ানদের শ্রেণীগুলোর মধ্যে প্রাচীন রূপের গোত্রের দুটি মৌলিক নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এক—ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ; এবং দুই—বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা অনুসরণ করা। গোত্র গঠনের সময় এই শেষোক্ত ব্যাপারটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেননা সন্তানদের তখন মায়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। শ্রেণীগুলোর মধ্যে থেকে একান্ত স্বাভাবিকভাবে গোত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনাটা স্পষ্টতঃই গ্রহণযোগ্য। এই সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করে তোলে আরেকটি বিষয়। সেটা হচ্ছে—এক্ষেত্রে গোত্রের সঙ্গে আরও প্রাচীন একটা সংগঠনের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়, যে সংগঠন তখনও পর্যন্ত সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক ছিল। পরে গোত্রই হয়ে উঠেছিল সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক।

গোত্রের অঙ্কুরবাহী এই উপাদানগুলো হাওয়াইয়ানদের দলগত বিবাহের দলগুলোর মধ্যেও দেখা যায়। তবে সেখানে প্রথাটা শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত কিছু বোনের যৌথ স্বামী থাকে। এইসব বোন এবং তাদের সন্তানাদি ও

স্ত্রী-ধারার বংশধরদের নিয়েই গড়ে ওঠে প্রাচীন ধাঁচের গোত্র। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কারণ সুনিশ্চিতভাবে সন্তানদের পিতৃত্ব নির্ধারণ করা ছিল একান্তই অসম্ভব। দলের মধ্যে এই বিশেষ ধরণের বিবাহ একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছিল গোত্রের বনিয়াদ। এই স্বাভাবিক দলগত বিবাহভিত্তিক দলগুলোকে এইসব মা, তাদের সন্তান আর স্ত্রীধারার বংশধরদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটা সংগঠনে পরিণত করার জন্য দরকার ছিল কিছুটা বুদ্ধিমত্তার অনুশীলন। হাওয়াইয়ানদের মধ্যে এই দলের অস্তিত্ব থাকলেও, গোত্রের ধারণা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। কিন্তু তাসত্ত্বেও বলতে হয় গোত্রের প্রাথমিক উৎস নিহিত ছিল মায়েদের ভগ্নীত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই ধরণের দলগুলোর মধ্যেই অথবা প্রায় একই নিয়মে গড়ে ওঠা অস্ট্রেলিয় দলগুলোর মধ্যে। এইসব দলগুলোর কিছু সদস্য আর তাদের কিছু বংশধরকে নিয়ে জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল গোত্র।
ঠিক কিভাবে গোত্র গড়ে উঠেছিল, তা বলা আজ আর সম্ভব নয়। সেইসব ঘটনা, সেই পরিস্থিতি আজ থেকে বহু বহু যুগ আগের কথা। কিন্তু প্রাচীন সমাজের কোন্ অবস্থায় গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল, তা নির্ণয় করা অসম্ভব কিছু নয়। আর ঠিক এই কাজটাই করার চেষ্টা করেছি আমি। গোত্রের সূচনা হয়েছিল মানুষের বিকাশের খুব নিচু একটা পর্যায়ে এবং সমাজের অত্যন্ত প্রাচীন অবস্থায়। অবশ্য দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার পরে সৃষ্টি হয়েছিল গোত্র। এটা একান্তই স্পষ্ট যে এই পরিবারের মধ্যেই মাথা তুলেছিল গোত্র। এই পরিবারের সদস্যরাই বিবেচিত হত গোত্রের সদস্য হিসেবে।
প্রাচীন সমাজের ওপর গোত্রের প্রভাবটা ছিল উন্নতির পক্ষে সহায়ক। একসময় গোত্র পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠল, ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ওপর পুরোপুরিভাবে বিস্তৃত হল তার প্রভাব। আগে সমাজে স্ত্রী পাওয়া যেত প্রচুর সংখ্যায়, কিন্তু এইসময় থেকে স্ত্রী হয়ে উঠল এক দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কারণ গোত্র ঐ দলগত বিবাহের দলগুলোকে সংকুচিত করে দিয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত সেগুলোকে বিলুপ্তও করে দিয়েছিল। প্রাচীন সমাজের ওপর গোত্রীয় সংগঠনের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল জোড়-বাঁধা পরিবার। এই অগ্রগতির অন্তর্বর্তী স্তরগুলো সম্বন্ধে খুব জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার যে বন্য যুগের ব্যাপার আর জোড়-বাঁধা পরিবার যে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের, এবং প্রথমটা থেকেই যে গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় ধরনটা—তা যথেষ্ট নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। শেষোক্ত ধরনের পরিবার যখন গড়ে উঠতে শুরু করল আর দলগত বিবাহের অবসান সূচিত হল, তখন থেকেই দেখা দিল স্ত্রী ক্রয় করা বা গায়ের জোরে নারীদের বন্দী করে এনে বিবাহ করার রেওয়াজ। হাতের কাছে থাকা প্রমাণগুলোর দ্বারস্থ না হয়েও আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অবসান এবং বন্য যুগের সেই বিস্ময়কর দাম্পত্য ব্যবস্থার ধীরে ধীরে বিলোপ ঘটা—এই দুয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছিল গোত্রীয় সংগঠন। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে থেকে গড়ে উঠলেও এই সংগঠন সমাজকে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছিল ঐ পরিবারের স্তর ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত।

৩। তুরানিয় বা গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা

এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা এবং প্রাচীন ধাঁচের গোত্রীয় সংগঠন—এ দুটোকে সাধারণত একসঙ্গে দেখা যায়। এ দুটো অবশ্য পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়, তবে সমাজের অগ্রগতির ক্রমপর্যায়ে এ দুটো সম্ভবত কাছাকাছি সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা আর বিভিন্ন ধরনের পরিবারের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। পরিবারের মধ্যে সর্বদাই একটা নিয়মের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরিবার কখনোই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবার অগ্রসর হয় নিম্নতর রূপ থেকে উচ্চতর রূপে এবং শেষপর্যন্ত উন্নীত হয় একটা উচ্চতর স্তরে। বিপরীতে, জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা কিন্তু অনেকটাই অনড় একটা ব্যাপার। পরিবারের মধ্যে যে-সব অগ্রগতি ঘটে চলে, তার ছাপ দীর্ঘদিন অন্তর দেখা যায় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে। পরিবারের যখন আমূল পরিবর্তন ঘটে, একমাত্র তখনই আমূল পরিবর্তন ঘটে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার।

সে সময় দলগত বিবাহ ও দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব না থাকলে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারত না। যে সমাজে কয়েকজন বোন দলবদ্ধভাবে বিবাহিত হয় পরস্পরের স্বামীর সঙ্গে আর কয়েকজন ভাই দলবদ্ধভাবে বিবাহিত হয় পরস্পরের স্ত্রীর সঙ্গে, সেই সমাজের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার বীজ। ঐ ধরনের পরিবারের প্রকৃত সম্পর্ককে ব্যক্ত করার জন্য গড়ে ওঠা যে-কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মত হতে বাধ্য ছিল। আর এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে তা গড়ে ওঠার সময় সমাজে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্ব ছিল।

এবার আমরা তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় বর্গের মধ্যে এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারই চালু ছিল, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করব। যে ধরনের বিবাহ-প্রথার মধ্যে এর জন্ম হয়েছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এবং পরিবার তার দলগত বিবাহের স্তর পেরিয়ে জোড়-বাঁধা বিবাহের স্তরে এসে পৌঁছোনোর পরেও দুটো মহাদেশে আজও এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা টিকে আছে।

প্রমাণগুলো যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য গোটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটাকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করা দরকার। আমেরিকার গ্যানোয়ানিয় গোষ্ঠীগুলোর আদর্শ প্রতিনিধি হিসেবে আমরা গ্রহণ করব সেনেকা-ইরোকোয়াদের এবং এশিয়ার তুরানিয় গোষ্ঠীগুলোর আদর্শ প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেব দক্ষিণ ভারতের তামিলদের। এইসব রূপগুলোতে একই ব্যক্তির প্রায় একইরকম দুশোটা করে সম্পর্কের কথা জানা যায়। এই পরিচ্ছেদের শেষে একটা সারনীতে এই সম্পর্কগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে। পূর্বতন একটা রচনায়[১] আমি আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের প্রায় সত্তরটা গোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছি। এশিয়ার দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলুগু ও কানাড়িদের মধ্যেও এই

১। সিস্টেম্স্ অফ কন্স্যাঙ্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি," স্মিথসনিয়ান কন্ট্রিবিউশন্স্ টু নলেজ, খণ্ড ১৭।

ব্যবস্থাই চালু আছে (সারনীতে এদের সম্পর্কের তালিকাও দেওয়া হয়েছে)। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় এ-রকম কিছু বিভিন্নতা থাকলেও, মৌলিক বৈশিষ্ট্য-গুলো কিন্তু একই থেকেছে। সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই জ্ঞাতিত্বসম্পর্ক অনুযায়ী সম্বোধনের রীতি চালু আছে, তবে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটেই গেছে। যেমন, নিজের থেকে বয়সে ছোট কাউকে সম্বোধন করার সময় তামিলরা তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের নির্দিষ্ট রূপটা অবশ্যই উল্লেখ করে; কিন্তু বয়সে বড় কারুর ক্ষেত্রে শুধু জ্ঞাতিত্বটা অথবা তার নামটা ব্যবহার করে থাকে। আবার আমেরিকার আদিবাসীরা সকলকেই সম্বোধন করে থাকে সম্পর্কের নির্দিষ্ট রূপ অনুযায়ী। আসলে গোটা ব্যবস্থাটা জ্ঞাতিত্ব আর আত্মীয়তার ব্যবস্থা বলেই সম্বোধনের ক্ষেত্রেও তারা এই ব্যবস্থাটা অনুসরণ করে চলে। যতদিন না একবিবাহ প্রথা এসে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত প্রাচীন গোত্রগুলোর প্রতিটি সদস্য এই ব্যবস্থার সাহায্যেই নিজের গোত্রের অন্য সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা চিনে নিতো। কোন পুরুষের সঙ্গে অন্যদের যা সম্পর্ক, কোন নারীর সঙ্গে তা নয়—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সেইজন্যেই সম্বোধনের ব্যাপারটাকে আমরা দু'বার করে উল্লেখ করেছি—একবার পুরুষের দিক থেকে, আর একবার নারীর দিক থেকে। কিছু কিছু বিভিন্নতা সত্ত্বেও গোটা ব্যবস্থাটা আদ্যন্ত যুক্তিসম্মত। এই ব্যবস্থার প্রকৃতিটা ফুটিয়ে তোলার জন্য সম্পর্কের কয়েকটা ধারা নিয়ে আলোচনা করা দরকার, যেমনটা করা হয়েছিল মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এখানে আমরা সেনেকা-ইরোকোয়াদেরকেই দৃষ্টান্ত হিসেবে বেছে নিচ্ছি।

ঊর্ধমুখী ও নিম্নমুখী—উভয় ধরণের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বীকৃত দূরতম সম্পর্ক হচ্ছে পিতামহ বা মাতামহ (হোক-সোটে) এবং পিতামহী বা মাতামহী (ওক-সোটে), আর পৌত্র বা দৌহিত্র (হা-ইয়া-ডা) এবং পৌত্রী বা দৌহিত্রী (কা-ইয়া-ডা)। এই সম্পর্কগুলোর আগের বা পরের পূর্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষরা যথাক্রমে ঐ একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

ভাইবোনের সম্পর্কটা মোটেই বিমূর্ত ধরনের নয়। তাদের ক্ষেত্রে দুটো ভাগ থাকে—জ্যেষ্ঠ বা বড় আর কনিষ্ঠ বা ছোট। প্রতিটা সম্পর্কের জন্য এক একটা অভিধাও আছে। যেমন :

বড় ভাই—হ্যা-গে ; বড় বোন—আহ্-জে।

ছোট ভাই—হ্যা-গা ; ছোট বোন—কা-গা।

বড় বা ছোট ভাইবোনদের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারী উভয়েই এই অভিধাগুলো ব্যবহার করে থাকে। তামিলদের মধ্যে এ ব্যাপারে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক পৃথক সম্বো-ধনের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বর্তমানে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলেই এগুলোকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারি : কোন সেনেকা-ইরোকোয়া পুরুষের ভাইয়ের পুত্র-কন্যারা হচ্ছে তারও পুত্র-কন্যা (হা-আহ্-ওয়াক এবং কা-আহ্-ওয়াক) এবং তারা সকলেই ঐ পুরুষ-টিকে পিতা (হা-নিহ্) বলেই সম্বোধন করে। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য। কোন ব্যক্তির নিজের সন্তানরা আর তার ভাইয়ের সন্তানরা একই পর্যায়ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। তারা যেমন তার ভাইয়ের সন্তান, তেমনি তারও সন্তান। ভাইয়ের পৌত্র-

পৌত্রীরা তারও পৌত্র-পৌত্রী (হা-ইয়া-ডা এবং কা-ইয়া-ডা, একবচনে) এবং তারা সকলে ঐ ব্যক্তিকে পিতামহ (হোক-সোটে) বলেই সম্বোধন করে। স্বীকৃত ও প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত সম্পর্কগুলোর কথাই আমরা এখানে উল্লেখ করছি। এদের মধ্যে অন্য আর কোন সম্পর্কের কথা জানা যায় নি।

কয়েকটা সম্পর্ক সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে থাকে। এই সম্পর্কগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সম্পর্কগুলোকে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর, এমনকি বিভিন্ন জাতির (যেমন তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয়দের) জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে যখন এই সম্পর্কগুলোর একইরকম গুরুত্ব দেখা যায়, তখন এই ব্যবস্থাগুলোর মূলগত অভিন্নতার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের সামনে।

এবার স্ত্রী-ধারার দিকটা দেখা যাক। কোন পুরুষের বোনের পুত্র ও কন্যারা হচ্ছে তার ভাগে-ভাগ্নী (হা-ইয়া ওয়ান-ডা এবং কা-ইয়া য়ান-ডা), এবং এরা সকলেই তাকে মামা বলে ডাকে। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থায় দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। ভাগে বা ভাগ্নীর সম্পর্কটা-শুধুমাত্র কোন পুরুষের আপন ও জ্ঞাতিবোনেদের সন্তানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, আর কারও ক্ষেত্রে নয়। এইসব ভাগে-ভাগ্নীদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী এবং তারা তাকে যথাযথ নামেই সম্বোধন করে।

কোন নারীর ক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলোর মধ্যে কয়েকটা বিপরীত রূপ নেয়। কোন নারীর ভাইয়ের পুত্র-কন্যারা হচ্ছে তার ভাইপো-ভাইঝি (হা-সোহ্-নেহ্ এবং কা-সোহ্-নেহ্ এবং এরা সকলেই তাকে পিসীমা বলে সম্বোধন করে। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, পুরুষদের ক্ষেত্রে ভাগে-ভাগ্নীর অভিধা এবং নারীদের ক্ষেত্রে ভাইপো-ভাইঝির অভিধা আলাদা আলাদা। এইসব ভাইপো-ভাইঝির সন্তানরা হচ্ছে ঐ নারীটির নাতি-নাতনী। স্ত্রী-ধারার ক্ষেত্রে ঐ নারীর বোনের পুত্র-কন্যারা হচ্ছে তারও পুত্র-কন্যা, এবং তারা সকলে তাকে মা (নোহ্-ইয়েহ্) বলেই সম্বোধন করে। এদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী এবং তারা তাকে সম্বোধন করে পিতামহী বা মাতামহী (ওক-সোটে) বলে।

এইসব পুত্র ও ভাইপোদের স্ত্রীরা হচ্ছে ঐ নারীর পুত্রবধূ (কা-সা), এবং এইসব কন্যা ও ভাইঝিদের স্বামীরা হচ্ছে তার জামাই (ওক-না-হোসে, প্রতিটি অভিধাই একবচনে)। এরা প্রত্যেকে তাকে যথাযথ নামেই সম্বোধন করে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারি : প্রথমে এই সারির পুরুষ-ধারাটা, অর্থাৎ বাবার দিকটা লক্ষ্য করা যাক। পুত্র বা কন্যা উভয়েই বাবার ভাইকেও বাবাই বলে এবং তারাও এদেরকে পুত্র-কন্যা বলেই ডাকে। এটাই এই ব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। কোন ব্যক্তির বাবার সব ভাইরাই তার বাবা হিসাবে স্বীকৃত হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা হচ্ছে তার বড় বা ছোট ভাই-বোন। আপন ভাইবোনদের সে যে নামে সম্বোধন করে, সেই নামেই সম্বোধন করে ঐ-সব ভাইবোনদেরও। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। এর দরুণ বিভিন্ন ভাইয়ের পুত্র-কন্যারা পরস্পরের ভাইবোন হিসেবে পরিগণিত হয়। কোন পুরুষের ক্ষেত্রে এইসব ভাইদের সন্তানরা তারও সন্তান হিসেবে গণ্য হয় এবং তাদের সন্তানরা স্বীকৃত হয় তার নাতি-নাতনী হিসেবে ; আর এইসব বোনেদের সন্তানরা গণ্য হয় তার ভাগে-ভাগ্নী হিসেবে এবং তাদের সন্তানরা স্বীকৃত হয় তার নাতি-নাতনী হিসেবে। কিন্তু কোন নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়। একজন নারীর এইসব ভাই-

দের সন্তানরা বিবেচিত হয় তার ভাইপো-ভাইঝি হিসেবে আর এইসব বোনেদের সন্তা-নরা গণ্য হয় তার পুত্রকন্যা হিসেবে। এদের সকলকার সন্তানরাই হচ্ছে তার নাতি-নাতনী। অতএব দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারির শ্রেণীবিন্যাসটাই দ্বিতীয় সারির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। তৃতীয় সারির এবং আরও দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতিদের ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীবিন্যাসটাই কার্যকর থাকে।

কোন ব্যক্তির বাবার বোন হচ্ছে তার পিসী এবং সে তাকে ডাকে ভাইপো (পুরুষদের ক্ষেত্রে) বলে। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য। নিজের বাবার বোনেরা এবং আর যারা বাবার মর্যাদা পায় তাদের বোনেরাই শুধু পিসী হিসেবে বিবেচিত হয়— মায়ের বোনেরা এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। পিসীরা সন্তানরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির পিসতুত ভাই-বোন (আহ্-গারে-সেহ্, একবচনে), এবং তারা প্রত্যেকেই তাকে মামাত ভাই বলে ডাকে। কোন পুরুষের পিসতুত ভাইদের সন্তানরা হচ্ছে তার পুত্র-কন্যা এবং পিসতুত বোনেদের সন্তানরা হচ্ছে তার ভাগ্নে-ভাগ্নী। কিন্তু কোন নারীর ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত সম্পর্কগুলো ঠিক বিপরীত চেহারা নেয়। ঐ-সব পুত্রকন্যা আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সন্তানরা বিবেচিত হয় উদ্দীষ্ট ব্যক্তির নাতি-নাতনী হিসেবে।

এবার আসা যাক মায়ের দিকের কথায়। কোন পুরুষের মায়ের ভাই হচ্ছে তার মামা। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার ষষ্ঠ্য বৈশিষ্ট্য। মায়ের আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইরাই শুধু মামা বলে গণ্য হয়, বাবার ভাইরা এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। মামার সন্তানরা পুরুষটির মামাত ভাই বোন ; মামাত ভাইয়ের সন্তানরা হচ্ছে তার পুত্রকন্যা এবং মামাত বোনের সন্তানরা ভাগ্নে-ভাগ্নী। কোন নারীর ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত সম্পর্কগুলো বিপরীত চেহারা নেয়। ঐ-সব পুত্র-কন্যা আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সন্তানরা গণ্য হয় উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাতি-নাতনি হিসেবে।

কোন ব্যক্তির মায়ের বোনেরাও তার মা হিসেবেই স্বীকৃত হয়। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার সপ্তম বৈশিষ্ট্য। সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনেরা পরস্পরের সন্তানদের মা হিসেবে গণ্য হয়। মায়ের বোনের সন্তানরা হল ঐ ব্যক্তির বড় বা ছোট ভাইবোন। এই ব্যবস্থার অষ্টম বৈশিষ্ট্য এটাই। এর ফলে সমস্ত বোনেদের সন্তানরা পরস্পরের ভাইবোন হিসেবে পরিগণিত হয়। এইসব ভাইদের সন্তানরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির পুত্রকন্যা আর এইসব বোনেদের সন্তানরা হল তার ভাগ্নে-ভাগ্নী। এইসব পুত্রকন্যা আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সন্তানরা তার নাতি-নাতনী। কোন নারীর ক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলো বিপরীত চেহারা নেয়।

এইসব ভাই আর এইসব মামাত-পিসতুত ভাইদের স্ত্রীরা প্রত্যেকেই ঐ ব্যক্তির ভাদ্রবধূ (আহ্-গে-আহ্-নে-আহ্), এবং ঐ ভাদ্রবধূরা প্রত্যেকেই তাকে দেবর বা ভাসুর বলে ডাকে (প্রথমোক্ত অভিধাটার সঠিক অর্থ আমার জানা নেই)। আবার ঐ-সব বোন আর মামাত-পিসতুত বোনেদের স্বামীরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ভগ্নীপতি এবং তারাও তাকে যথাযথ নামে ডেকে থাকে। আমেরিকার আদিবাসীদের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে দলগত বিবাহ-প্রথার নানান নির্দশন ছড়িয়ে আছে। যেমন, কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার বিভিন্ন ভাইয়ের স্ত্রীদের এবং বিভিন্ন বোনের স্বামীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। মান্দানদের মধ্যে কোন পুরুষের ভাইদের স্ত্রীরা তারও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হয়। পাওনী এবং অ্যারিকারীদের

মধ্যেও একই নিয়ম চালু আছে। ক্রো-দের মধ্যে কোন নারীর স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী হচ্ছে তার "সাথী" (বট-জে-নো-পা-চে), ক্রীকদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটা হল "সহ-বাসিন্দা"-র (চু-হা-চো-ওগ্না) আর মুনসীদের ক্ষেত্রে "বন্ধু"-র (নেইন-জোসে)। উইনে-ব্যাগো ও অ্যাকাওটিনেদের মধ্যে স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী হচ্ছে নারীদের "বোন"। কোন কোন গোষ্ঠীতে কোন পুরুষের স্ত্রীর বোনের স্বামীরা বিবেচিত হয় তার "ভাই" হিসেবে, আবার কোন কোন গোষ্ঠীতে 'ভায়রাভাই" হিসেবে, এবং ক্রীকদের মধ্যে "ছোট বিভাজক" (কথাটার মানে আমার জানা নেই) হিসেবে।

জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারি: এই সারির সমস্ত শাখার সম্পর্কগুলো ঠিক দ্বিতীয় সারির সম্পর্কগুলোর মতই—শুধু এই তৃতীয় সারিতে একজন পূর্বপুরুষ বেশি থাকে। তাই এখানে আমরা চারটি শাখার মধ্যে কেবলমাত্র একটি শাখা নিয়েই আলোচনা করব। কোন ব্যক্তির বাবার বাবার ভাই তার পিতামহ হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং ঐ পিতামহ তাকে নাতি বলে ডাকেন। এটাই হচ্ছে এই ব্যবস্থার নবম ও সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য। এর ফলে কারুর পিতামহের সব ভাইরাই তার পিতামহের মর্যাদা পায় এবং জ্ঞাতিসম্পর্কিত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বজায় থাকে। নিজের বংশের ধারার সঙ্গে জ্ঞাতি-সম্পর্কিত ধারাগুলোকে মিশিয়ে দেওয়া হয় যে নীতির সাহায্যে, সেই নীতিটা প্রযোজ্য হয় উভয় দিকেই, অর্থাৎ, পূর্বপুরুষদের দিকে এবং উত্তরপুরুষদের দিকে। ঐ পিতামহর (অর্থাৎ পিতামহর ভাইয়ের) পুত্ররা হচ্ছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বাবা, তাদের সন্তানরা তাদের ভাইবোন, এই ভাইদের সন্তানরা তার পুত্রকন্যা, এই বোনেদের সন্তানরা তার ভাগ্নে-ভাগ্নী এবং এইসব পুত্রকন্যা ও ভাগ্নেভাগ্নীদের সন্তানরা হচ্ছে তার নাতি-নাতনী। কোন নারীর ক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলোও আগের মতই বিপরীত চেহারা নেয়। ঐ-সব পিতামহ, পিতা, ভাইবোন, পুত্র-কন্যা, ভাগ্নেভাগ্নী আর নাতি-নাতনীরাও ঐ ব্যক্তিকে যথাযথ সম্বোধনে চিহ্নিত করে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের চতুর্থ সারি: আগের মত একই কারণে এই সারিরও একটিমাত্র শাখা নিয়েই আলোচনা করব আমরা। কোন ব্যক্তির পিতামহর পিতার ভাই হচ্ছে তার পিতামহ। ঐ পিতামহের পুত্রও তার পিতামহ। এই শেষোক্তজনের পুত্র হচ্ছে তার পিতা। ঐ পিতার সন্তানরা তার বড় অথবা ছোট ভাইবোন। এদের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক আগের সারির মতই। জ্ঞাতিত্বের পঞ্চম সারির সম্পর্কগুলোও দ্বিতীয় সারির সম্পর্কগুলোর মতই, বাড়তি হিসেবে শুধু কয়েকজন পূর্বপুরুষের নাম তাতে যুক্ত হয়।

গোটা ব্যবস্থাটার প্রকৃতির দিকে নজর দিলে বোঝা যায়, জ্ঞাতিদের সঠিক শ্রেণীবিন্যাসের জন্য জ্ঞাতিত্বের সংখ্যাগত মাত্রা সংক্রান্ত ধারণা থাকা একান্তই জরুরী। কিন্তু যে আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা এই ব্যবস্থাকে প্রতিদিন ব্যবহার করে থাকে, তাদের কাছে সম্পর্কের এই আপাত অস্পষ্টতাগুলো কোনরকম সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় না।

সেনেকা-ইরোকোয়াদের বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে শ্বশুরের দুটো অভিধা আছে—ওক-না-হোসে অর্থাৎ স্ত্রীর বাবা এবং হা-গা-সা অর্থাৎ স্বামীর বাবা। প্রথম অভিধাটার আরেকটা অর্থ হল জামাতা, অর্থাৎ একই অভিধা পরস্পরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। বিপিতা ও বিমাতার অভিধা হচ্ছে যথাক্রমে হোক-নো-এসে এবং ওক-নো-এসে। সৎ-পুত্র ও

সং-কন্যার অভিধা যথাক্রমে হা-নো এবং কা-নো। কোন কোন গোষ্ঠীতে দুজন শ্বশুরে এবং দুজন শাশুড়ী পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়েথাকে এবং এদের সম্পর্কটা বোঝানোর জন্য উপযুক্ত অভিধাও নির্দিষ্ট করেছে তারা। গোটা ব্যবস্থাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ পৃথকীকরণের দরুণ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠলেও, জ্ঞাতিত্বের এই সুবিশাল তালিকাটা অত্যন্ত লক্ষ্যনীয়। সেনেকা-ইরোকোয়া এবং তামিলদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বিশদ পরিচয় এই পরিচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত সারণীতে পাওয়া যাবে। এই দুটো ব্যবস্থার সাদৃশ্যটা এক নজরেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ থেকে এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দলগত বিবাহ চালু থাকার প্রমাণ তো পাওয়া যায়ই, সেইসঙ্গেই বোঝা যায় ঐ ধরণের বিবাহ প্রাচীন সমাজের ওপর কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমাজব্যবস্থার ওপর আজ পর্যন্ত মানুষ তার যুক্তিসম্মত চিন্তাভাবনার যতগুলো অত্যাশ্চর্য প্রয়োগ ঘটাতে পেরেছে, এটা তার অন্যতম।

মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা বা প্রায় সবদিক থেকে ঐ ধরনের কোন ব্যবস্থার গর্ভ থেকেই যে জন্ম নিয়েছিল তুরানিয় এবং গ্যানেয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা, তা আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি। উল্লিখিত সম্পর্কগুলোর প্রায় অর্ধাংশ উভয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একই। সেনেকা আর তামিলদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সঙ্গে হাওয়াইয়ানদের ব্যবস্থার পার্থক্যগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে পার্থক্যটা গড়ে উঠেছে সেইসব সম্পর্কের ভিত্তিতেই, যেগুলো সৃষ্টি হয় ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ হওয়া অথবা না-হওয়ার ফল হিসেবে। যেমন. সেনেকা আর তামিলদের মধ্যে কোন ব্যক্তির বোনের পুত্র হচ্ছে তার ভাগে, কিন্তু হাওয়াইয়ানদের ক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবেই গণ্য হয়। আসলে ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার আর দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেকার পার্থক্যটাই ফুটে উঠেছে এই সম্পর্ক দুটোর মধ্যে। ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের বদলে দলগত বিবাহ চালু হওয়ার ফলে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলো দেখা দিয়েছিল, তারই ফল হিসেবে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বদলে গড়ে উঠেছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে হাওয়াইয়ানদের মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠা সত্ত্বেও কেন তারা নিজেদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কোনরকম সংস্কার সাধন করে নি? এ প্রশ্নের উত্তর আগেও দেওয়া হয়েছে, এখানে আবার তা উদ্ধৃত করছি। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা পাল্টানোর আগেই পাল্টে যায় পরিবারের রূপ। পলিনেশিয়ায় পরিবার ছিল দলগত বিবাহভিত্তিক, কিন্তু চালু ছিল মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। আমেরিকায় জোড়-বাঁধা বিবাহ-পরিবার চালু থাকার সময় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা ছিল তুরানিয় ধাঁচের। ইওরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় একবিবাহভিত্তিক পরিবার চালু হয়ে যাওয়ার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত টিকে ছিল তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা, কিন্তু অতঃপর এই ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং গড়ে ওঠে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। তাছাড়া, আজ পর্যন্ত মোট পাঁচ ধরনের পরিবার দেখা গেলেও, জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা দেখা গেছে মূলত তিন ধরনের। একটা প্রতিষ্ঠিত জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সমাজের মধ্যে ব্যাপক মাত্রার পরিবর্তন ঘটে যাওয়া একান্ত দরকারী ছিল। আমার ধারণা, মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার মত যথেষ্ট শক্তি ও যথেষ্ট সার্বিকতা গোত্রীয় সংগঠনের ছিল এবং এই তুরানিয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা চালু করার মত

যথেষ্ট শক্তি নিহিত ছিল অগ্রসর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠা একবিবাহ-প্রথার (এ ব্যাপারে সম্পত্তিও একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল)।

যে-সব তুরানিয় সম্পর্ক মালয়ী ব্যবস্থার সম্পর্কের থেকে আলাদা, সেগুলোর উৎস নিয়ে এবার আলোচনা করা দরকার। এই ব্যাখ্যার ভিত্তি হচ্ছে দলগত বিবাহ এবং গোত্রীয় সংগঠন।

১। কোন পুরুষের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইয়ের সন্তানরা তার পুত্র-কন্যা।

হেতু: কোন সেনেকা পুরুষের সমস্ত ভাইয়ের স্ত্রীরা তারও স্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হয়। মানে, জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় এই প্রথাই চালু ছিল। মালয়ী ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম দেখা যায় এবং তার কারণটাও একই।

২। কোন পুরুষের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনের সন্তানরা হচ্ছে তার ভাগ্নে-ভাগ্নী।

হেতু: গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে গোত্রের নিয়মানুসারে এইসব নারীরা ঐ পুরুষটির স্ত্রী হতে পারে না। কাজেই, তাদের সন্তানরাও বিবেচিত হতে পারে না তার সন্তান হিসেবে। তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা দূরতর হয়ে যায়, গড়ে ওঠে ভাগ্নে-ভাগ্নী নামক নতুন সম্পর্ক। এই সম্পর্কটা মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার থেকে আলাদা।

৩। কোন নারীর সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইয়ের সন্তানরা তার ভাইপো-ভাইঝি।

হেতু: ২-নং-এর অনুরূপ। এই সম্পর্কটাও মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার থেকে আলাদা।

৪। কোন নারীর সমস্ত আপন এবং মামাত-পিসতুত বোনের সন্তানরা হচ্ছে তার পুত্র-কন্যা।

হেতু: এই সমস্ত বোনের স্বামীরা ঐ নারীটিরও স্বামী। সঠিক অর্থে বললে এই সমস্ত পুত্র-কন্যারা হচ্ছে তার সৎ-সন্তান। ওজিবোয়া এবং অন্য কয়েকটি অ্যাল্‌গন্‌কিন গোষ্ঠীর মধ্যে এদেরকে সৎ-সন্তানই বলা হয়। কিন্তু সেনেকা এবং তামিলরা প্রাচীন শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী এদেরকে পুত্র-কন্যাই বলে থাকে, যার কারণটা মালয়ী জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার অনুরূপ।

৫। এই সমস্ত পুত্র-কন্যার সন্তানরা ঐ নারীটির নাতি-নাতনী।

হেতু: এরা ঐ নারীটির পুত্র-কন্যার সন্তান।

৬। এই সমস্ত ভাইপো-ভাইঝিদের সন্তানরা হচ্ছে ঐ নারীর নাতি-নাতনী।

হেতু: তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পূর্ববর্তী মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় এদের সঙ্গে এই সম্পর্কটাই চালু ছিল। নতুন কোন সম্পর্কের উদ্ভাবন করা যায় নি বলে পুরনো সম্পর্কটাই চালু রাখা হয়েছে।

৭। কোন ব্যক্তির পিতার সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইরাও তার পিতা।

হেতু: তারা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মায়ের স্বামী। মালয়ী ব্যবস্থাতেও সম্পর্কটা একই।

৮। কোন ব্যক্তির পিতার সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনেরা তার পিসি।

হেতু: গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে এরা কেউই তার পিতার স্ত্রী হতে পারে না, কাজেই আগের মত এরা আর তার মা হিসেবে গণ্য হয় না। তাই দেখা দিয়েছিল নতুন একটা

সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, গড়ে উঠেছিল পিসির সম্পর্কটা।

৯। কোন ব্যক্তির মায়ের আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইরা হচ্ছে তার মামা।

হেতু: এখন আর এরা তার মায়ের স্বামী হতে পারে না, কাজেই তার পিতা হিসেবেও এরা বিবেচ্য নয়। ফলে গড়ে উঠেছিল একটা নতুন সম্পর্ক—মামা।

১০। কোন ব্যক্তির মায়ের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনেরা হচ্ছে তার মা।

হেতু: ৪-নং-এর অনুরূপ।

১১। পিতার সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইয়ের সন্তানরা এবং মায়ের সমস্ত আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত বোনের সন্তানরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ভাইবোন।

হেতু: মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই সম্পর্কটা একই ছিল। ঐ ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনায় কারণগুলো উল্লিখিত হয়েছে।

১২। আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত সমস্ত মামা ও পিসিদের সন্তানরা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মামাত-পিসতুতো ভাইবোন।

হেতু: গোত্রীয় সংগঠনের মধ্যে এইসব মামা আর পিসিদের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির মা এবং বাবার বিবাহ হতে পারে না। কাজেই মালয়ী ব্যবস্থার মত এদের সন্তানরা ঐ ব্যক্তির আপন ভাইবোন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তাই গড়ে ওঠে নতুন সম্পর্ক—মামাত-পিসতুত ভাইবোন।

১৩। কোন তামিল পুরুষের সমস্ত মামাত-পিসতুত ভাইদের সন্তানরা হচ্ছে তার ভাইপো-ভাইঝি এবং সমস্ত মামাত-পিসতুত বোনের সন্তানরা হচ্ছে তার পুত্র-কন্যা। সেনেকা-ইরোকোয়াদের মধ্যে নিয়মটা এর ঠিক বিপরীত। এ থেকে বোঝা যায় যে তামিলদের মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় কোন পুরুষের সমস্ত মামাত-পিসতুত বোনেরা তার স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হত, কিন্তু তার মামাত-পিসতুত ভাইদের স্ত্রীরা তার স্ত্রী হিসেবে গণ্য হত না। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রায় দুশো জনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যেকার এই পার্থক্যটাই হচ্ছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

১৪। পিতামহ এবং পিতামহীর সমস্ত ভাইবোনরাই ঐ ব্যক্তির পিতামহ-পিতামহী।

হেতু: মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই সম্পর্কগুলো একই ছিল এবং এর কারণটাও ঐ ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

এতক্ষণে এটা যথেষ্টই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, একটা আদি মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে সরিয়ে মাথা তুলেছিল তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা (যে দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই), এবং মালয়ের লোকেরা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এশিয়ার প্রায় সর্বত্র মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই চালু ছিল। তাছাড়া এটাও বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে, মালয়ী ধাঁচের এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটাই রক্তের সংমিশ্রণের পথ বেয়ে পৌঁছে গিয়েছিল ঐ তিনটি বর্গের মানুষদের পূর্বপুরুষদের কাছে এবং পরবর্তীকালে তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় বর্গের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষরা এই ব্যবস্থার মধ্যে নানান পরিবর্তন ঘটিয়ে এটাকে বর্তমান রূপে রূপায়িত করেছিল।

তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার প্রধান প্রধান সম্পর্কগুলোর উৎস আমরা ব্যাখ্যা করে দেখলাম। দেখা গেল, সন্তানদের পিতৃত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে যতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায়, তার ভিত্তিতেই

এই সম্পর্কগুলো গড়ে উঠত দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে। গোটা ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল একটা সাংগঠনিক চেহারা নিয়ে। আর যেহেতু পর্যাপ্ত কারণ ছাড়া ব্যবস্থাটা গড়ে উঠতে পারত না, সেহেতু সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারই এই ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। তবে লক্ষ্য করা দরকার যে কয়েক ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থায় সমস্ত ভাইরা হচ্ছে পরস্পরের স্ত্রীর স্বামী, সমস্ত বোনরা হচ্ছে পরস্পরের স্বামীর স্ত্রী, এবং এদের সকলকার বিবাহ হয় দলগতভাবে। ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় কোন পুরুষের যে-কোন আপন বা জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইয়ের (সে সময় এ-রকম অসংখ্য ভাই থাকত প্রত্যেকের) স্ত্রীরা তারও স্ত্রী হিসেবে গণ্য হত। একইভাবে, কোন নারীর যে-কোন আপন বা জ্ঞাতিবোনের (সে সময় এ-রকম অসংখ্য বোনও থাকত প্রত্যেকের) স্বামীরা গণ্য হত তারও স্বামী হিসেবে। স্বামীদের পরস্পর ভ্রাতৃত্ব, আর স্ত্রীদের পরস্পর ভগ্নীত্ব—এটাই ছিল গোটা ব্যবস্থাটার বনিয়াদ। হাওয়াইয়ানদের 'পুনালুয়া'-প্রথার মধ্যেই এর একটা পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। তত্ত্বগতভাবে বিচার করলে মনে হয়, বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ গোটা দলটাকে নিয়েই গড়ে উঠত সে সময়কার পরিবারগুলো। কিন্তু বাস্তবে নিশ্চয়ই বসবাস এবং জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের সুবিধার জন্য ছোট ছোট কয়েকটা পরিবারে বিভক্ত হয়ে যেত ঐ দলগুলো। ব্রিটনদের মধ্যে দশ-বারজন ভাইয়ের বিবাহ হত পরস্পরের স্ত্রীর সঙ্গে। দলগত বিবাহের দলগুলোর সদস্যসংখ্যা মোটামুটি এ-রকমই হত বলে ধরে নেওয়া যায়। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের আমলে প্রয়োজনের খাতিরেই জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সাম্যবাদ দেখা দিয়েছিল। পরে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের আমলে এবং আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে জোড়-বাঁধা পরিবারের আমল পর্যন্ত তা টিকে থেকেছে (আমেরিকার আদিবাসীদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সময় পর্যন্ত এদের মধ্যে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সাম্যবাদ চালু ছিল)। এইসব আদিবাসীদের মধ্যে এখন আর দলগত বিবাহের কোন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ঐ বিবাহের ফলে সৃষ্ট জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ প্রথাগুলো আজও টিকে আছে। বন্য গোষ্ঠীগুলোর পারিবারিক জীবন এবং বসবাসের ধরন নিয়ে আজও খুব গভীর অনুসন্ধান চালানো হয় নি। এ-সব ব্যাপারে তাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে এবং তাদের জীবনধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেলে আলোচ্য প্রশ্নগুলোর ওপর অধিকতর আলোকপাত করা যাবে।

দুটো সমান্তরাল জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সাহায্যে দু'ধরনের পরিবারের উদ্ভব নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এই আলোচনা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলোকে মোটামুটিভাবে সুনিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া যায়। একটা নিম্নতর অবস্থা থেকে উঠে এসে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের দ্বারপ্রান্তে মানবসমাজের পা রাখার যাত্রাবিন্দুটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এ থেকে। এই প্রথম রূপ থেকে দ্বিতীয় রূপে উত্তরণটা ঘটেছিল একান্ত স্বাভাবিকভাবেই—পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে নিম্নতর সামাজিক অবস্থা থেকে উচ্চতর সামাজিক অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল মানুষ। মানবজাতির বেড়ে চলা মানসিক ও নৈতিক গুণাবলীরই অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল এই

উত্তরণ। বন্যতার বেশির ভাগ সময় জুড়ে মানুষ যে অগ্রগতির ইতিহাস রচনা করেছে, তার সারাংশ নিহিত রয়েছে ঐ ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার আর দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের মধ্যেই। দ্বিতীয় ধরনের পরিবারটা প্রথম ধরনের পরিবারের থেকে অনেকটা উন্নত হয়ে উঠলেও, একবিবাহভিত্তিক পরিবার তখনও অনেক দূরের ব্যাপার। বিভিন্ন ধরনের পরিবারের মধ্যে তুলনা করলেও বন্য যুগে প্রগতির মন্থর গতির কথা বিচার করলে (যখন প্রগতির উপকরণ ছিল খুবই কম আর প্রতিবন্ধক ছিল প্রচুর) গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। যুগের পর যুগ কেটে গেছে অনড়-অচল অবস্থায়, মাঝে-মধ্যে ঘটেছে অগ্রগতি, কখনও বা অধঃপতন। এটাই হচ্ছে ঘটনাপ্রবাহের মূল গতিধারা। কিন্তু সমাজের মূল গতিমুখটা সবসময়ই থেকেছে নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হওয়ার দিকে, নাহলে মানুষ আজও রয়ে যেতে বন্য যুগেই। আমাদের কাজ হচ্ছে মানবজাতির এই বিস্ময়কর ~~অগ্রগতির প্রকৃত~~ সূচনাবিন্দুটা খুঁজে বার করা এবং সে সূচনাবিন্দু খুঁজে পাওয়া যায় মানব-ইতিহাসের একেবারে অনুন্নত অবস্থায় ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মত একটা বিচিত্র ধরনের পরিবারের মধ্যেই।

নিউইয়র্কের সেনেকা-ইরোকোয়া ইণ্ডিয়ান এবং দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর তামিলভাষী অধিবাসীদের সম্পর্কব্যবস্থার তুলনামূলক সারণী

(তামিল ভাষায় এন = আমার)

	ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১.	আমার প্রপিতামহের বাবা	হোক-সোটে	আমার পিতামহ	এন মদ্‌পাড্ডান	আমার ৩য় পিতামহ
২.	,, ,, মা	ওক-সোটে	,, পিতামহী	,, মদ্‌পাড্ডি	,, ,, পিতামহী
৩.	,, প্রপিতামহ	হোক-সোটে	,, পিতামহ	,, পদ্‌ডান	,, ২য় পিতামহ
৪.	,, প্রপিতামহী	ওক-সোটে	,, পিতামহী	,, পদ্‌ডি	,, ,, পিতামহী
৫.	,, পিতামহ	হোক-সোটে	,, পিতামহ	,, পাড্ডান	,, পিতামহ
৬.	,, পিতামহী	ওক-সোটে	,, পিতামহী	,, পাড্ডি	,, পিতামহী
৭.	,, পিতা	হদ্‌-নিহ্‌	,, পিতা	,, টাক্কাপ্পান	,, পিতা
৮.	,, মাতা	নো-ইয়েহ্‌	,, মাতা	,, টেই	,, মাতা
৯.	,, পুত্র	হা-আহ্‌-ওয়াক	,, পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
১০.	,, কন্যা	কা-আহ্‌-ওয়াক	,, কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
১১.	,, পৌত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
১২.	,, পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্টি	,, পৌত্রী
১৩.	,, প্রপৌত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, ইরানডাম পেরান	,, ২য় পৌত্র
১৪.	,, প্রপৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, ,, পেরাট্টি	,, ,, পৌত্রী
১৫.	,, প্রপৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, মুনডাম পেরান	,, ৩য় পৌত্র

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	তামিলদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর
১৬. আমার প্রপৌত্রের কন্যা	কা-ইয়া-ডা	আমার পৌত্রী	এন ম্‌নভাম পেরাট্টি	আমার ৩য় পৌত্র
১৭. ,, বড় ভাই	হা-জে	,, বড় ভাই	,, রামালিয়ান, বি আন্নান	,, বড় ভাই
১৮. ,, ,, বোন	আহ্‌-জে	,, ,, বোন	,, আক্কারি, বি রামাকাই	,, ,, বোন
১৯. ,, ছোট ভাই	হ্যা-গা	,, ছোট ভাই	,, এন টাম্বি	আমার ছোট ভাই
২০. ,, ,, বোন	কা-গা	,, ,, বোন	,, টাঙ্গাইচ্চি, বি টাঙ্গে	,, ,, বোন
২১. ,, ভাইরা	ডা-ইয়া-গ্‌য়া-ডান-নো-ডা	,, ভাইরা	,, সাকোথারী	আমার ভাইরা (সংস্কৃত)
২২. ,, বোনেরা	,, ,, ,,	,, বোনেরা	,, সাকোথারিকাল	,, বোনেরা (,,)
২৩. ,, ভাইয়ের পুত্র (পুরুষের ক্ষেত্রে)	হা-আহ্‌-ওয়াক	আমার পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
২৪. ,, ,, পুত্রের স্ত্রী (,, ,,)	কা-সাহ্‌	,, পুত্রবধূ	,, মার্‌মাকাল	,, পুত্রবধূ ও ভাইঝি
২৫. ,, ,, কন্যা (,, ,,)	কা-আহ্‌-ওয়াক	,, কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
২৬. ,, ,, কন্যার স্বামী (,, ,,)	ওয়ে-না-হোসে	,, জামাতা	,, মার্‌মাকান	,, জামাতা ও ভাইপো
২৭. ,, ,, পৌত্র (,, ,,)	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
২৮. ,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্টি	,, পৌত্রী
২৯. ,, ,, প্রপৌত্র (,, ,,)	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, ইরানভাম পেরান	,, ২য় পৌত্র
৩০. ,, ,, প্রপৌত্রী (,, ,,)	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, ,, পেরাট্টি	,, ,, পৌত্রী
৩১. ,, বোনের পুত্র (,, ,,)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নে	,, মার্‌মাকান	,, ভাগ্নে
৩২. ,, ,, পুত্রের স্ত্রী (,, ,,)	কা-সা	,, ভাগ্নে-বৌ	,, মাকাল	,, কন্যা
৩৩. ,, ,, কন্যা (,, ,,)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নী	,, মার্‌মাকাল	,, ভাগ্নী
৩৪. ,, ,, কন্যার স্বামী (,, ,,)	ওক-না-হোসে	,, ভাগ্নীজামাই	,, মাকান	,, পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	তামিলদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর
৩৫. আমার বোনের পৌত্র (পুং ক্ষেত্রে)	হা-ইয়া-ডা	আমার পৌত্র	এন পেয়ন	আমার পৌত্র
৩৬. ,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্টি	,, পৌত্রী
৩৭. ,, ,, পৌত্রের পুত্র (,, ,,)	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, ইরানডাম পেরান	,, ২য় পৌত্র
৩৮. ,, ,, ,, কন্যা (,, ,,)	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, ,, পেরাট্টি	,, ,, পৌত্রী
৩৯. ,, ভাইয়ের পুত্র (নাঃ ক্ষেত্রে)	হা-সোহ্-নেহ্	,, ভাইপো	,, মারুমাকান	,, ভাইপো
৪০. ,, ,, পুত্রের স্ত্রী (,, ,,)	কা-সা	,, ভাইপো-বৌ	,, মাকাল	,, কন্যা
৪১. ,, ,, কন্যা (,, ,,)	কা-সোহ্-নেহ্	,, ভাইঝি	,, মারুমাকাল	,, ভাইঝি
৪২. ,, ,, কন্যার স্বামী (,, ,,)	ওক-না-হোসে	,, জামাতা	,, মাকান	,, পুত্র
৪৩. ,, ,, পৌত্র (,, ,,)	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
৪৪. ,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্টি	,, পৌত্রী
৪৫. ,, ,, পৌত্রের পুত্র (,, ,,)	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, ইরানডাম পেরান	,, ২য় পৌত্র
৪৬. ,, ,, ,, কন্যা (,, ,,)	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, ,, পেরাট্টি	,, ,, পৌত্রী
৪৭. ,, বোনের পুত্র (,, ,,)	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
৪৮. ,, ,, পুত্রের স্ত্রী (,, ,,)	কা-সা	,, পুত্রবধূ	,, মারুমাকাল	আমার পুত্রবধূ ও বোনঝি
৪৯. ,, ,, কন্যা (,, ,,)	কা-আহ্-ওয়াক	,, কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
৫০. ,, ,, কন্যার স্বামী (,, ,,)	ওক-না-হোসে	,, জামাতা	,, মাকান	,, পুত্র
৫১. ,, ,, পৌত্র (,, ,,)	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
৫২. ,, ,, পৌত্রী (,, ,,)	কা-ইয়া-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরাট্টি	,, পৌত্রী
৫৩. ,, ,, পৌত্রের পুত্র (,, ,,)	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, ইরানডাম পেরান	আমার ২য় পৌত্র

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে		তামিলদের ক্ষেত্রে	
	সম্পর্ক	ভাষান্তর	সম্পর্ক	ভাষান্তর
৫৪. আমার বোনের পৌত্রের কন্যা (নাঃ)	কা-ইয়া-ডা	আমার পৌত্রী	এন ইয়ানতাম পেরট্টি	আমার [illegible] পৌত্রী
৫৫. ,, পিতার ভাই	হা-নিহ্	,, পিতা	,, পেরিয়া টাকাপান—	,, বড় পিতা(জ্যাঠা)
			,, সেরিয়া ,,	,, ছোট ,, (কাকা)
৫৬. ,, ,, ভাইয়ের স্ত্রী	উক-নো-এসে	,, বিমাতা	,, চেই	,, মাতা
৫৭. ,, ,, ,, পুত্র (বয়সে বড়)	হা-জে	,, বড় ভাই	,, টামাইয়ান	,, বড় ভাই
৫৮. ,, ,, ,, ,, (,, ছোট)	হ্যা-গা	,, ছোট ,,	,, টাম্বি	,, ছোট ভাই
৫৯. ,, ,, ,, পুত্রের স্ত্রী	আহ্-গে-আহ্-নে-আহ্	,, ভাদ্রবধূ	,, মাইট্টুনি, আন্নি	,, খুঃ বোন, ভাইবৌ
৬০. ,, ,, ,, কন্যা (বয়সে বড়)	আহ্-জে	,, বড় বোন	,, আক্কারি বি, টামাকাই	—আমার বড় বোন
৬১. ,, ,, ,, ,, (,, ছোট)	কা-গা	,, ছোট ,,	,, টাঙ্গাইচ্চি বি, টাঙ্গাই	,, ছোট ,,
৬২. ,, ,, ,, কন্যার স্বামী	হা-ইয়া-ও	,, ভগ্নীপতি	,, মাইট্টুনান	আমার ভগ্নীপতি ও খুঃ ভাই
৬৩. ,, ,, ,, পুত্রের পুত্র (পুঃ)	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
৬৪. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	হা-সোহ্-নেহ্	,, ভাইপো	,, মারুমাকান	,, ভাইপো
৬৫. ,, ,, ,, ,, কন্যা (পুঃ)	কা-আহ্-ওয়াক	,, কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
৬৬. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	কা-সোহ্-নেহ্	,, ভাইঝি	,, মারুমাকাল	,, ভাইঝি
৬৭. ,, ,, ,, কন্যার পুত্র (পুঃ)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নে	,, মারুমাকান	,, ভাগ্নে
৬৮. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	হা-আহ্-ওয়াক	,, পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
৬৯. ,, ,, ,, ,, কন্যা (পুঃ)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	,, ভাগ্নী	,, মারুমাকাল	,, ভাগ্নী
৭০. ,, ,, ,, ,, ,, (নাঃ)	কা-আহ্-ওয়াক	,, কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
৭১. ,, ,, ,, পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	,, পেরান	,, পৌত্র
৭২. ,, ,, ,, ,, কন্যা	কা-ইরা-ডা	,, পৌত্রী	,, পেরট্টি	,, পৌত্রী

* পুঃ—পুরুষের ক্ষেত্রে। নাঃ—নারীদের ক্ষেত্রে। খুঃ—খুড়তুতো।

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	তামিলদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর
৭৩. আমার পিতার বোন	আহ্-গা-হুয়ে	আমার পিসি	এন আট্টাই	আমার পিসি
৭৪. " " বোনের স্বামী	হোক-নো-এসে	" পিসেমশাই	" মামান	" কাকা
৭৫. " " " পুত্র (পুং)	আহ্-গারে-সেহ	" পিসতুতো ভাই	" আট্টান বি, মাইটুনান	" পিসতুতো ভাই
৭৬. " " " " (নাঃ)	" " "	" " "	" মাচ্চান	" " "
৭৭. " " " পুত্রের স্ত্রী	আহ্-গে-আহ্-নে-আহ্"	ভাদ্রবধূ	" টাঙ্গাই	" ছোট বোন
৭৮. " " " কন্যা (পুং)	আহ-গারে-সেহ্	" পিসতুতো বোন	" মাইটুনি	" পিসতুতো বোন
৭৯. " " " " (নাঃ)	" " "	" " "	" মাচ্চি, বি মাচ্চিনি	" " "
৮০. " " " কন্যার স্বামী	হা-ভা-এ	" ভগ্নীপতি	" আন্নান, বি টাম্বি	" বড় বা ছোট ভাই
৮১. " " " পুত্রের পুত্র (পুং)	হা-আহ্-ওয়াক	" পুত্র	" মারুমাকান	" ভাইপো
৮২. " " " " " (নাঃ)	হা-সোহ্-নেহ্	" ভাইপো	" মাকান	" পুত্র
৮৩. " " " " কন্যা (পুং)	কাহ্-আহ্-ওয়াক	" কন্যা	" মারুমাকাল	" ভাইঝি
৮৪. " " " " " (নাঃ)	কা-সোহ্-নেহ্	" ভাইঝি	" মাকাল	" কন্যা
৮৫. " " " কন্যার পুত্র (পুং)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	" ভাগ্নে	" মাকান	" পুত্র
৮৬. " " " " " (নাঃ)	হা-আহ্-ওয়াক	" পুত্র	" মারুমাকান	" বোনপো
৮৭. " " " কন্যা (পুং)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	" ভাগ্নী	" মাকাল	" কন্যা
৮৮. " " " " " (নাঃ)	কা-আহ-ওয়াক	" কন্যা	" মারুমাকাল	" বোনঝি
৮৯. " " " পৌত্রের পুত্র	লা-ইয়া-ডা	" পৌত্র	" পেরান	" পৌত্র
৯০. " " " " কন্যা	কা-ইয়া-ডা	" পৌত্রী	" পেরাট্টি	" পৌত্রী
৯১. " মায়ের ভাই	হোক-নে-সেহ্	" মামা	" মামান	" মামা

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	তামিলদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর
৯২. আমার মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী	আহ্-গা-নে-আহ্	আমার মামী-মা	এন মামে	আমার মামী
৯৩. „ „ „ পুত্র (পুং)	আহ্-গারে-সেহ—	„ মামাত ভাই	„ মাইট্টুনান	„ মামাত ভাই
৯৪. „ „ „ „ (নাঃ)	„ „ „	„ „ „	„ মাচ্চান	„ „ „
৯৫. „ „ „ পুত্রের স্ত্রী	আহ্-গে-আহ্-নে-আহ্	„ ভাদ্রবধূ	„ টাঙ্গাই	„ ছোট্ট বোন
৯৬. „ „ „ কন্যা (পুং)	আহ্-গারে-সেহ্	„ মামাত বোন	„ মাইট্টুনি	„ মামাত বোন
৯৭. „ „ „ „ (নাঃ)	„ „ „	„ „ „	„ মাচ্চারি	„ „ „
৯৮. „ „ „ কন্যার স্বামী	হা-ইয়াও	„ ভগ্নীপতি	„ আম্মান, টাম্বি—আমার বড় বা ছোট ভাই	
৯৯. „ „ „ পুত্রের পুত্র (পুং)	হা-আহ্-ওয়াক	„ পুত্র	„ মারুমাকান	„ ভাইপো
১০০. „ „ „ „ „ (নাঃ)	হা-সোহ্-নেহ্	„ ভাইপো	„ মাকান	„ পুত্র
১০১. „ „ „ „ কন্যা (পুং)	কা-আহ্-ওয়াক	„ কন্যা	„ মারুমাকাল	„ ভাইঝি
১০২. „ „ „ „ „ (নাঃ)	কা-সোহ্ নেহ্	„ ভাইঝি	„ মাকাল	„ কন্যা
১০৩. „ „ „ কন্যার পুত্র (পুং)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	„ ভাগ্নে	„ মাকান	„ পুত্র
১০৪. „ „ „ „ „ (নাঃ)	হা-আহ্-ওয়াক	„ পুত্র	„ মারুমাকান	„ বোনপো
১০৫. „ „ „ „ কন্যা (পুং)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	„ ভাগ্নী	„ মাকাল	„ কন্যা
১০৬. „ „ „ „ „ (নাঃ)	কা-আহ্-ওয়াক	„ কন্যা	„ মারুমাকাল	„ বোনঝি
১০৭. „ „ „ পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	„ পৌত্র	„ পেরান	„ পৌত্র
১০৮. „ „ „ „ কন্যা	কা-ইয়া-ডা	„ পৌত্রী	„ পেরাট্টি	„ পৌত্রী
১০৯. „ „ বোন	নো-ইয়েহ্	„ মা	„ পেরিয়া টেই (বড়)	„ মা (ছোট বা বড়)
১১০. „ „ বোনের স্বামী	হোক-নো-এসে	„ বিপিতা	„ টাক্কাপ্পান	„ পিতা („ „)

	ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১১১.	আমার মায়ের বোনের পুত্র (বড়)	হা-জে	আমার বড় ভাই	এন টামাইয়ান, বি আমান	আমার বড় ভাই
১১২.	” ” ” ” (ছোট)	হা-গা	” ছোট ”	” টাম্বি	” ছোট ”
১১৩.	” ” ” পুত্রের স্ত্রী	আহ্-গে-আহ্-নে আহ্	” ভাদ্রবধূ	” মাইট্রুনি—আমার ভাইবৌ, মাসতুত বোন	
১১৪.	” ” ” কন্যা (বড়)	আহ্-জে	” বড় বোন	” আক্কারি বি, টামাকে	” বড় বোন
১১৫.	” ” ” ” (ছোট)	কা-গা	” ছোট ”	” টাঙ্গাচ্চি, বি টাঙ্গে	” ছোট ”
১১৬.	” ” ” কন্যার স্বামী	হা-ইয়া-ও	” ভগ্নীপতি	” মাইট্রুনান-আমার ভগ্নীপতি, মাসতুতভাই	
১১৭.	” ” ” পুত্রেরপুত্র (পুং)	হা-আহ্-ওয়াক	” পুত্র	” মাকান	” পুত্র
১১৮.	” ” ” ” পুত্র (নাঃ)	হা-সোহ্-নেহ্	” ভাইপো	” মারুমাকান	” ভাইপো
১১৯.	” ” ” ” কন্যা (পুং)	কা-আহ্-ওয়াক	” কন্যা	” মাকাল	” কন্যা
১২০.	” ” ” ” ” (নাঃ)	কা-সোহ্-নেহ্	” ভাইঝি	” মারুমাকাল	” ভাইঝি
১২১.	” ” ”কন্যার পুত্র (পুং)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	” ভাগ্নে	” মারুমাকান	” ভাগ্নে
১২২.	” ” ” ” ” (নাঃ)	হা-আহ-ওয়াক	” পুত্র	” মাকান	” পুত্র
১২৩.	” ” ” ”কন্যা(পুং)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	” ভাগ্নী	” মারুমাকাল	” ভাগ্নী
১২৪.	” ” ” ” ” (নাঃ)	কা-আহ-ওয়াক	” কন্যা	” মাকাল	” কন্যা
১২৫.	” ” ” পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	” পৌত্র	” পেরান	” পৌত্র
১২৬.	” ” ” ” কন্যা	কা-ইয়া-ডা	” পৌত্রী	” পেরাত্তি	” পৌত্রী
১২৭.	” পিতার পিতার ভাই	হোক-সোটে	” পিতামহ	” পাত্তান	” পিতামহ
১২৮.	” ” ” ভাইয়ের পুত্র	হা-নিহ	” পিতা	” টাক্কাপ্পান” ” ”	” পিতা
১২৯.	” ” ” ”পুত্রের পুত্র(বড়)	হা-জে	” বড় ভাই	” আমান, বি, টামাইয়ান	” বড় ভাই

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৩০. " " " " " " " (ছোট)	হ্যা-গা	আমার ছোট ভাই	এন টাম্বি	আমার ছোট ভাই
১৩১. " " " " " " পুত্র (পুং	হা-আহ-ওয়াক	" পুত্র	" মাকান	" পুত্র
১৩২. " " " " " " " (না)	কা-সোহ্-নেহ্	" ভাইপো	" মারুমাকান	" ভাইপো
১৩৩. " " " " " " কন্যা (পুং)	কা-আহ্-ওয়াক	" কন্যা	" মাকাল	" কন্যা
১৩৪. " " " " " " " (না)	কা-সোহ্-নেহ্	" ভাইঝি	" মারুমাকাল	" ভাইঝি
১৩৫. " " " " পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	" পৌত্র	" পেরান	" পৌত্র
১৩৬. " " " " পৌত্রের পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	" পৌত্রী	" পেরাট্টি	" পৌত্রী
১৩৭. " পিতার পিতার বোন	ওক-সোটে	" পিতামহী	" পাট্টি আমার পিতামহী, বড় বা ছোট	
১৩৮. " " " বোনের কন্যা	আহ্-গা-হাক	" পিসি	" টেই " মাতা " বা "	
১৩৯. আমার পি. পি. বো. কন্যার কন্যা (না,	আহ্-গারে-সেহ্	" পিসতুত বোন	" টামাকাই, টাঙ্গাই,	" বড় বা ছোট বোন
১৪০. " " " " " " (পুং)	" " "	" " "	" " " "	" " " "
১৪১. " " " " " " (পুং)	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	" ভাগে	" মারুমাকান ?	আমার ভাগ্নে
১৪২. " " " " " " (না)	হা-আহ্-ওয়াক	" পুত্র	" মাকান ?	" পুত্র
১৪৩. " " " " " " (পুং)	কা-ইয়া-ওয়া-ডা	" ভাগ্নী	" মারুমাকাল ?	" ভাগ্নী
১৪৪. " " " " " " (না)	কা-আহ্-ওয়াক	" কন্যা	" মাকাল ?	" কন্যা
১৪৫. " " " " পৌত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	" পৌত্র	" পেরান	" পৌত্র
১৪৬. " " " " " পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	" পৌত্রী	" পেরাট্টি	" পৌত্রী
১৪৭. " মায়ের মায়ের ভাই	হোক-সোটে	" মাতামহ	" পাট্টান	" মাতামহ, বড় বা ছো
১৪৮. " " " ভাইয়ের পুত্র	হোক-নো-সেহ	" মামা	" মামান	" মামা

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৪৯. আমার মা. মা. ভা. পুত্রের পুত্র (পু)	আহ্-গারে-সেহ্	আমার মামাত ভাই	এন মাইট্রনান	আমার মামাত ভাই
১৫০. ” ” ” ” ” ” (না)	” ” ”	” ” ”	” মাচ্চান	” ” ”
১৫১. ” ” ” ” ” পু. পু. (পু	হা-আহ্-ওয়াক	” পুত্র	” মারুমাকান	” ভাইপো
১৫২. ” ” ” ” ” ” ” (না)	হা-সোহ্-নেহ্	” ভাইপো	” মাকান	” পুত্র
১৫৩. ” ” ” ” ” ” কন্যা (পু)	কা-আহ্-ওয়াক	” কন্যা	” মারুমাকাল	” ভাইঝি
১৫৪. ” ” ” ” ” ” ” (না)	কা-সোহ্-নেহ্	” ভাইঝি	” মাকাল	” কন্যা
১৫৫. ” ” ” ” পৌত্রের পৌত্র	হা-ইয়া-ডা	” পৌত্র	” পেরান	” পৌত্র
১৫৬. ” ” ” ” ” পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	” পৌত্রী	” পেরাট্টি	” পৌত্রী
১৫৭ ” ” ” বোন	ওক-সোটে	” মাতামহী	” পাড্ডি	আমার মাতামহী বড় বা ছোট
১৫৮. ” ” ” বোনের কন্যা	নো-ইয়েহ্	” মা	” টেই	” ” ” মা ” ”
১৫৯. ” ” ” ” কন্যার কন্যা (বড়)	আহ্-জে	” বড় বোন	” টামাকেই	আমার বড় বোন
১৬০. ” ” ” ” ” ” (ছোট)	কা-গা	” ছোট বোন	” টাঙ্গাই	” ছোট ”
১৬১. ” ” ” ” ” কন্যার পুত্র (পু	হা-ইয়া-ওয়ান-ডা	” ভাগ্নে	” মারুমাকান	” ভাগ্নে
১৬২. ” ” ” ” ” ” ” (না)	হা-আহ্-ওয়াক	” পুত্র	” মাকান	” পুত্র
১৬৩. ” ” ” ” ” ” কন্যা (পু	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	” ভাগ্নী	” মারুমাকাল	” ভাগ্নী
১৬৪. ” ” ” ” ” ” ” (না)	কা-আহ্-ওয়ান-ডা	” কন্যা	” মাকাল	” কন্যা
১৬৫. ” ” ” ” পৌত্রের পৌত্র	হা-ইয়া-ডা	” পৌত্র	” পেরান	” পৌত্র
১৬৬. ” ” ” ” ” পৌত্রী	কা-ইয়া-ডা	” পৌত্রী	” পেরাট্টি	” পৌত্রী
১৬৭. ” পিতার পিতার পিতার ভাই	হোক-সোটে	” পিতামহ	” ইরানডাম পাড্ডান	” ২য় পিতামহ

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৬৮. আমার পিতার পিতার পিতার ভাইয়ের	হোক-সোটে	আমার পিতামহ	এন পাড্ডান আমার	পিতামহ (বড় বা ছোট)
১৬৯. ,, ,, ,, ,, ,,	হা-নিহ্	,, পিতা	এন টাক্কাপ্পান ,,	পিতা ,,
পুত্রের পুত্র (বড়) ১৭০. ,, ,, ,, ,, ,,	হা-আহ্-ওয়াক	আমার পুত্র	এন মাকান ,,	পুত্র
পুত্রের পুত্রের পুত্র ১৭১. ,, ,, ,, ,, ,,	হা-ইয়া-ডা	,, পৌত্র	এন পেরান ,,	পৌত্র
পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র ১৭২. ,, ,, ,, ,, ,, স্ত্রী	ওক-সোটে	,, পিতামহী	এন ইরানডাম পাড্ডি ,,	২য় পিতামহী
১৭৩. ,, ,, ,, বোনের কন্যা	ওক-সোটে	,, পিতামহী	এন পাড্ডি	আমার পিতামহী ব.ছ
১৭৪. ,, ,, ,, ,, ,,	নো-ইয়েহ্	,, মাতা	,, টেই	আমার মাতা (বড় বা ছোট)
কন্যার কন্যা ১৭৫. ,, ,, ,, ,, ,,	আহ্-জে	,, বড় বোন	এন টামাকেই টাঙ্গাই	আমার বড় বা ছোট বোন
কন্যার কন্যা (পু) ১৭৬. ,, ,, ,, ,, ,,	হা-সোহ্-নেহ্	,, ভাগ্নী	এন মারুমাকাল	আমার ভাগ্নী
কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা ১৭৭. ,, ,, ,, ,, ,,	হা-ইয়া-ডা	,, দৌহিত্রী	এন পেরট্টি	আমার দৌহিত্রী
কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা ১৭৮. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাই	হোক-সোটে	,, মাতামহ	এন ইরানডাম পাড্ডান	আমার ২য় মাতামহ
১৭৯. ,, ,, ,, ,, ভাইয়ের পুত্র	,, ,,	,, ,,	এন পাড্ডান	আমার মাতা (বড় বা ছোট)

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে		তামিলদের ক্ষেত্রে	
	সম্পর্ক	ভাষান্তর	সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৮০. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্রের পুত্র	হোক-না-সেহ্	আমার মামা	এন মামান	আমার মামা
১৮১. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের পুত্র (পু)	আহ্-গারে-হেহ্	আমার মামাত ভাই	এন মাইট্টুনান	আমার মামাত ভাই
১৮২. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র (না)	হা-আহ্-ওয়াক	আমার পুত্র	এন মারুমাকান	আমার ভাইপো
১৮৩. আমার মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র	হা-ইয়া-ডা	আমার পৌত্র	এন পেরান	আমার পৌত্র
১৮৪. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোন	ওক-সোটে	আমার মাতামহী	এন ইয়ানডাম পাট্টি	আমার ২য় মাতামহী
১৮৫. „ „ „ „ বোনের কন্যা	„ „	„ „	এন পাট্টি (বহুবচন বা একবচন)	আমার মাতামহী (বড় বা ছোট)
১৮৬. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোনের কন্যার কন্যা	নো-ইয়েহ্	আমার মাতা	এন টেই (বহুবচন বা একবচন)	আমার মাতা (বড় বা ছোট)
১৮৭. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোনের কন্যার কন্যার কন্যা (বয়সে বড়)	আহ্-জে	আমার বড় বোন	এন আক্কারি	আমার বড় বোন
১৮৮. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোনের কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা (না)	কা-ইয়া-ওয়ান-ডা	আমার বোনঝি	এন মাকান	আমার কন্যা
১৮৯. আমার মায়ের মায়ের মায়ের বোনের কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা	কা-ইয়া-ডা	আমার দৌহিত্রী	এন পেরাট্টি	আমার দৌহিত্রী

ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৯০. আমার স্বামী	ডা-ইয়াকে-নে	আমার স্বামী	এন কানাভান, বি, পুর্নশান	আমার স্বামী
১৯১. ,, স্ত্রী	,, ,, ,,	,, স্ত্রী	,, মাইনাভি, বি, পেন্‌চাট্টি	,, স্ত্রী
১৯২. ,, স্বামীর পিতা	হ্যা-গা-সা	,, শ্বশুর	,, মামান, বি, মামানার	,, মামা এবং শ্বশুর
১৯৩. ,, ,, মাতা	ওঙ্গ-গা-সা	,, শাশুড়ি	এন মামি, বি, মান্নাই	আমার মামী এবং শাশুড়ি
১৯৪. ,, স্ত্রীর পিতা	ওক-না-হোসে	,, শ্বশুর	এন মামান	আমার মামা এবং পিতা
১৯৫. ,, ,, মাতা	,, ,, ,,	,, শাশুড়ি	,, মামি	,, মামী
১৯৬. ,, জামাতা	,, ,, ,,	,, জামাতা	,, মাপিল্লাই, বি, মারুমাকান	আমার জামাতা ও ভাইপো
১৯৭. ,, পুত্রবধূ	কা-সা	,, পুত্রবধূ	এন মারুমাকাল	আমার পুত্রবধূ ও ভাইঝি (বিধবারা বিবাহ করতে পারে না)
১৯৮. ,, সৎ-পিতা	হোক-না-এসে	,, সৎপিতা		
১৯৯. ,, সৎ-মা	ওক-নো-এসে	,, সৎ মা	এন সেরিয়া টেই	আমার ছোট মা
২০০. ,, সৎ-পুত্র	হা-নো	,, সৎ-পুত্র	,, মাকান	,, পুত্র
২০১. ,, সৎ-কন্যা	কা-নো	,, সৎ কন্যা	,, মাকাল	,, কন্যা
২০২. ,, সৎ-ভাই			,, আন্নান (বড়), টাম্বি (ছোট)	আমার বড় বা ছোট ভাই
২০৩ ,, সৎ-বোন			এন আক্কারি ;" টাঙ্গাই (ছোট)	আমার বড় বা ছোট বোন

	ব্যক্তির বিবরণ	সেনেকা-ইরোকোয়াদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর	তামিলদের ক্ষেত্রে সম্পর্ক	ভাষান্তর
২০৪	আমার দেবর বা ভাসুর (স্বামীর ভাই)	হা-ইয়া-ও	আমার দেবর বা ভাসুর	এন মাইট্রুনান	আমার দেবর বা ভাসুর এবং জ্ঞাতিভাই
২০৫.	„ ভগ্নীপতি (পু)	আহ্-গে-আহ্-নে-ও	আমার শ্যালক	„ „	„ ভগ্নীপতি এবং জ্ঞা ভা.
২০৬.	„ ভগ্নীপতি (না)	হা-ইয়া-ও	আমার ভগ্নীপতি	„ আট্টান (বড়), মাইচ্চান	আমার ভগ্নিপতি ও জ্ঞাতিভাই
২০৭.	„ শ্যালক	আহ্-গে-আহ্-নে-ও	আমার শ্যালক	„ মাইট্রুনান	আমার শ্যালক ও জ্ঞাতিভাই
২০৮.	„ ভাইরাভাই	কোন সম্পর্ক থাকে না		„ মাকালান	„ ভায়রাভাই ও জ্ঞাতিভাই
২০৯.	„ ননদাই (ননদের স্বামী)	„ „ „ „		„ সাকোটারান	„ ননদাই ও „
২১০.	„ শ্যালিকা	কা-ইয়া-ও	আমার শ্যালিকা	„ কারিউন্টে (বড়), মাইট্টিনি	আমার শ্যালিকা ও জ্ঞাতিবোন
২১১.	„ ননদ	আহ্-গে-আহ্-নে-ও	আমার ননদ	এন নাট্টানাম	আমার ননদ ও জ্ঞাতিবোন
২১২.	„ ভাদ্রবধূ (পু)	কা-ইয়া-ও	আমার ভাদ্রবধূ	„ আন্নি (বড়), মাইট্রুনি (ছোট)	আমার ভাদ্রবধূ ও জ্ঞাতিবোন
২১৩.	„ ভাজ (না)	আহ্-গে-আহ্-নে-ও	আমার ভাজ	„ „ „ „ (ছোট)	আমার ভাজ ও জ্ঞাতিবোন
২১৪.	„ জা	কোন সম্পর্ক থাকে না		„ ওরাকাট্টি	আমার জা ও জ্ঞাতিবোন
২১৫.	„ শালাজ	„ „ „ „		„ টামাকাই (বড়), টাঙ্গাই (ছোট)	আমার শালাজ ও জ্ঞাতিবোন
২১৬.	„ বিধবা স্ত্রী	গো-নো-কও-ইয়েস-হা-আহ্	বিধবা স্ত্রী	„ কিয়েম্পুন	আমার বিধবা স্ত্রী
২১৭.	„ বিপত্নীক স্বামী	„ „ „ „ „ „	বিপত্নীক স্বামী		
২১৮.	যমজ সন্তান	টাস-গীক্-হা	যমজ সন্তান	দিথামরাথি	যমজ সন্তান (সংস্কৃত)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জোড়-বাঁধা এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

আমেরিকার আদিবাসীদের অস্তিত্ব যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের মধ্যে যারা বর্বরযুগের নিম্ন পর্যায়ে ছিল, তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল জোড়বাঁধা পরিবার। বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ আগেকার যুগের বড় বড় দলগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তার বদলে চালু হয়েছিল এক এক জোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ, ফলে গড়ে উঠেছিল পৃথক পৃথক (আংশিকভাবে হলেও) পরিবার। এই ধরনের পরিবারের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের বীজ। অবশ্য একবিবাহভিত্তিক পরিবারের থেকে এই ধরনের পরিবার যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নিম্নমানের ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জোড়-বাঁধা পরিবার ছিল এক বিশেষ ও বিচিত্র ধরনের পরিবার। একটা বাড়িতেই বেশ কয়েকটা জোড়-বাঁধা পরিবার বসবাস করত। এই পরিবারগুলো মিলেমিশে জীবনযাপন করত এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মেনে চলত সাম্যবাদী নীতি। এ-রকম কয়েকটা পরিবারের একত্রে বসবাস করার ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে জীবনের সমস্ত কঠোরতাকে একাই মোকাবিলা করার ব্যাপারে এই ধরনের পরিবার ছিল অত্যন্ত দুর্বল একটা সংগঠন। তা সত্ত্বেও, এই ধরনের পরিবার গড়ে উঠত এক জোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহের ভিত্তিতেই এবং একবিবাহভিত্তিক পরিবারের কয়েকটা বৈশিষ্ট্যও এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই পরিবারের নারীরা আর শুধুমাত্র তাদের স্বামীর প্রধান স্ত্রী-ই ছিল না, তারা হয়ে উঠেছিল স্বামীদের সঙ্গিনী, তাদের খাদ্য প্রস্তুতকারিণী এবং সন্তানের মা (এইসময় অনেকটা নিশ্চিতভাবে সন্তানদের পিতৃত্ব নিরূপন করা যেত)। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে সন্তানদের দেখাশোনা করত এবং এই সন্তানদের আকর্ষণেই তাদের বিবাহ বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে উঠত।

কিন্তু পরিবারের মত বিবাহ ব্যাপারটাও ছিল বিচিত্র ধরনের। সভ্য সমাজের মত ভালবাসা বা প্রেমের আকর্ষণ থেকে মানুষ তখন নারীকে স্ত্রী হিসেবে চাইত না। এইসব বোধের জন্য দরকার উন্নত স্তরের মানসিকতা, যে স্তরে তারা তখনও পর্যন্ত উন্নত হতে পারেনি। তাই তাদের বিবাহের ভিত্তি হিসেবে কোনরকম আবেগ কাজ করত না। বিবাহ অনুষ্ঠিত হত সুবিধে আর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতেই। সন্তানদের বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত মায়েদের ওপর। পাত্রপাত্রীকে না জানিয়ে এবং তাদের মতামত না নিয়েই দু'পক্ষের মধ্যে বিবাহ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা চলত। মাঝেমধ্যে একেবারে অপরিচিত দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যেও বিবাহ সম্পাদিত হত। উপযুক্ত সময়ে তাদেরকে জানানো হত কখন বিবাহ অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠিত হবে। ইরোকোয়া এবং আরও অনেক ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে এইরকম রীতিই চালু ছিল। এ ধরনের বৈবাহিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীকে একটা নীরব সম্মতি জানাতে হত। পারতপক্ষে

কোন পক্ষই এ ব্যাপারে অসম্মতি জানাত না। বিবাহের আগে পাত্রীর নিকটতম জ্ঞাতিদের হাতে কিছু উপহার তুলে দিতে হত। তবে স্বামী-স্ত্রী যতদিন পর্যন্ত নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে চাইত, ততদিনই সম্পর্কটা বজায় থাকত। তারা না চাইলে সম্পর্ক ভেঙে যেতে। ঠিক এই কারণেই এই ধরনের পরিবারকে জোড়-বাঁধা পরিবার বলা হয়ে থাকে। যখন খুশি স্ত্রীকে ত্যাগ করে অনায়াসে অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে পারত পুরুষরা। একই অধিকার মেয়েদেরও ছিল। এক স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে পারত তারা এবং তার জন্য গোষ্ঠী বা গোত্রের কোন প্রথাকে লঙ্ঘন করতে হত না। কিন্তু এ-রকম বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে একটা জনমত ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। কোন দম্পতির মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব দেখা দিলে এবং তাদের বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে উঠলে তাদের দু'জনের সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা চেষ্টা করত একটা মিটমাট করে দেওয়ার। এ চেষ্টায় প্রায়শই সফল হত তারা। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বিবাহবিচ্ছেদ মেনে নেওয়া হত। তখন স্ত্রীটি তার স্বামীর বাড়ি থেকে চলে যেতো, সঙ্গে নিত তাদের সন্তানদের (কারণ সন্তানরা একান্তভাবে তারই সন্তান হিসেবে বিবেচিত হত) আর নিজের ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো—যার ওপর তার স্বামীর কোন অধিকার থাকত না। তবে যৌথ বাসগৃহে সাধারণত স্ত্রীর জ্ঞাতিরাই সংখ্যায় বেশি থাকত, তাই সেক্ষেত্রে স্বামীকেই চলে যেতে হত স্ত্রীর বাড়ি থেকে।[১] এককথায়, দাম্পত্য সম্পর্ক কতদিন বজায় থাকবে, তা নির্ভর করত স্বামী-স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর।

১। প্রয়াত রেভারেণ্ড এ. রাইট, যিনি বহু বছর ধরে সেনেকাদের মধ্যে ধর্ম-প্রচারক হিসেবে কাজ করেছিলেন, তিনি ১৮৭৩ সালে এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাকে লিখে জানিয়েছিলেন: "এদের পরিবার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা যায় যে, পুরনো আমলের বড় বড় বাড়িগুলোতে বসবাস করার সময় এক একটা বাড়িতে সম্ভবত এক একটা বংশের লোকই বেশি থাকে। নারীরা অন্য বংশের কোন পুরুষকে বেছে নেয় তাদের স্বামী হিসেবে। এদের ছেলেরা যতদিন পর্যন্ত মায়ের আশ্রয় ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত সাহসী হয়ে না ওঠে, ততদিন পর্যন্ত অনেক সময় বিবাহ করে বৌ নিয়ে আসে ঘরে। ব্যাপারটা বেশ অভিনব। সাধারণত নারীরাই বাড়িতে কর্তৃত্ব করে এবং এই নারীরা নিঃসন্দেহে একই বংশের সদস্যা হয়ে থাকে। খাদ্যভাণ্ডারগুলি সার্বজনীন। কিন্তু হায়, এই ভাণ্ডারের ওপর হতভাগ্য স্বামী বা প্রেমিকের কোন অধিকারই থাকে না! বাড়িতে তার অনেকগুলো সন্তান বা যথেষ্ট জিনিসপত্র থাকলেও, হুকুম পাওয়া মাত্রই তাকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ আমান্য করাটা তার পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। বাড়ির সবাই মিলে তাকে উত্যক্ত করে তোলে। মাসী বা দিদিমা জাতীয় কেউ হস্তক্ষেপ না করলে ঐ বাড়ি ছেড়ে নিজের বংশের লোকেদের কাছে ফিরে যেতে সে বাধ্য হয়। অনেক সময় সে অন্য বংশের কোন মেয়েকে বিবাহ করে তাদের সঙ্গেই বসবাস করতে শুরু করে। সব জায়গার মত এখানেও বংশের মধ্যে মেয়েরা অসীম ক্ষমতার অধিকারিনী হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে কোন প্রধানের 'শিঙ

দাম্পত্য সম্পর্কের আর একটা বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে থাকা আমেরিকান আদিবাসীরা একবিবাহপ্রথার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক বিকাশের স্তরে পেঁছতে পারেনি। বর্বর যুগে থাকা সত্ত্বেও ইরোকোয়ারা অত্যন্ত উন্নত মানসিক গুণাবলীর অধিকারী। এদের এবং একইরকম উন্নত অন্যান্য ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়—মেয়েদের সতীত্বকে এরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং কোন মেয়ে নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিলে তাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হয়; স্বামীরাও শাস্তি দিতে পারে; কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এ-রকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ পুরুষদের চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা না করা হলে নারীদের সতীত্বকেও পাকাপাকিভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, পৃথিবীর সর্বত্রই বহুবিবাহটা ছিল পুরুষদের একটা স্বীকৃত অধিকার, যদিও অনেকগুলো পরিবারের ভরণপোষণ করার অক্ষমতার দরুণ খুব কম সংখ্যক পুরষের পক্ষেই বহুবিবাহ করা সম্ভব হত। আরও কিছু রীতি-প্রথা (যেগুলোর উল্লেখ করার কোন দরকার দেখছি না) থেকেও বোঝা যায় যে একবিবাহ বলতে আমরা যা বুঝি, সে ধারণা এদের মধ্যে তখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম হয়ত ছিলই। আমার ধারনা, অন্যান্য বর্বর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও চিত্রটা এই একই রকমের ছিল। জোড়-বাঁধা পরিবারের সঙ্গে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রধান পার্থক্যটা (বেশ কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য থাকতেই পারে) হচ্ছে—একবিবাহভিত্তিক পরিবারে যৌনমিলন সীমাবদ্ধ থাকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট দুজন নারী-পুরুষের মধ্যে, কিন্তু জোড়-বাঁধা পরিবারের ক্ষেত্রে এ-রকম কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। প্রাচীন দাম্পত্য ব্যবস্থা, যার নিদর্শন তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে আজও রয়ে-গেছে, তা অবশ্যই টিকে ছিল, তবে তার রূপটা একটা সীমাবদ্ধ চেহারা নিতে বাধ্য হয়েছিল।

বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে থাকা ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে, তা থেকে বলা যায় যে তাদের ক্ষেত্রেও চিত্রটা প্রায় একই রকমের ছিল। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমেরিকান আদিবাসীদের বিভিন্ন রীতি-প্রথার মধ্যে তুলনা করলে একটা সুস্পষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে, যা থেকে বোঝা যায় একসময় এদের সকলকার মধ্যে একই প্রথা চালু ছিল। কয়েকটা প্রথার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন ক্যাভিগেরো বলেছেন যে "আজটেকদের মধ্যে মা-বাবাই সন্তানদের বিবাহের ব্যবস্থা করত এবং তাদের সম্মতি ছাড়া কোন বিবাহই সম্পন্ন হতে পারত না"।[১] "একজন

ভেঙে দিতে' (ওরা এভাবেই বলে) তারা এতটুকুও ইতস্তত করে না, এবং অতঃপর ঐ পদচ্যুত প্রধানকে সাধারণ সৈনিকের স্তরে নামিয়ে দেয়। প্রধানদের মনোনয়ন করার ব্যাপারটাও তারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।" বাখোফেন তাঁর "ডাস্ মুটেরেশ্‌ট্" (Das Mutterecht). গ্রন্থে যে নারীতন্ত্রের কথা বলেছেন, তারই সমর্থন পাওয়া যায় এই বক্তব্যের মধ্যে।

১। হিস্টি অফ মেক্সিকো, ফিলাডেলফিয়া সংস্করণ, ১৮১৭, কুলেন্-এর অনুবাদ, ii, ৯৭.

পুরোহিত কনের 'হুয়েপিলি' বা পোশাকের একটা প্রান্তের সঙ্গে বরের 'টিল্‌মাল্‌টি' বা আঙরাখার একটা প্রান্ত বেঁধে দিত, এবং এটাই ছিল দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রধান অনুষ্ঠান"।[১] এই একই অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করার পর হেরেরা লিখেছেন, "কনের সঙ্গে যা যা জিনিসপত্র আসত, তার প্রত্যেকটার কথাই মনে রাখা হত। বিবাহ ভেঙে গেলে—যা এদের মধ্যে প্রায়শই ঘটত—ঐ জিনিসগুলো ফেরৎ নিয়ে যেত স্ত্রী। বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামীরা পেত কন্যাদের আর স্ত্রীরা পেত পুত্রদের। বিবাহবিচ্ছেদের পর দুজনেই আবার বিবাহ করতে পারত"।[২]

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, ইরোকোয়াদের মত আজটেক ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও স্ত্রীর ওপর স্বামীর ব্যক্তিগত অধিকার খুব একটা থাকত না। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারটা যতটা ব্যক্তিগত ছিল, তার থেকে অনেক বেশি ছিল সার্বজনীন বা গোত্রগত। তাই ছেলেমেয়েদের বিবাহের ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবেই নিয়ন্ত্রণ করত মা-বাবারা। অবিবাহিত ইণ্ডিয়ান নারী-পুরুষদের মধ্যে কোনরকম সামাজিক সম্পর্ক থাকত না বললেই চলে। প্রেম-ভালবাসার কোন মূল্য ছিল না, বিবাহের ব্যাপারে কেউ কোন প্রতিবাদ করত না। এইসব বিবাহে ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা বিবেচনা করা হত না এবং তার কোন গুরুত্বও ছিল না। ইরোকোয়াদের মত আজটেকরাও স্ত্রীর নিজস্ব জিনিসপত্রের কথা নিখুঁতভাবে মনে রাখত, যাতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে (যা হরদমই ঘটত) ইণ্ডিয়ান রীতি অনুযায়ী স্ত্রীরা তাদের জিনিসপত্র ফেরৎ পেতে পারে। আর শেষত, ইরোকোয়াদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের পর সমস্ত সন্তানকে স্ত্রীরাই পেত, কিন্তু আজটেকদের ক্ষেত্রে স্বামীরা পেত কন্যাদের আর স্ত্রীরা পেত পুত্রদের। আসলে প্রাচীন আমলে কোন এক সময় ইরোকোয়া ইণ্ডিয়ানদের নিয়ম-কানুনগুলোই বলবৎ ছিল আজটেকদের মধ্যে, পরে আজটেকরা সেইসব প্রাচীন নিয়মের কিছুটা পরিবর্তন ঘটায়।

ইয়ুকাতান-এর অধিবাসীদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হেরেরা লিখেছেন, "আগে এরা বিবাহ করত কুড়ি বছর বয়স নাগাদ। পরে তা কমে বারো-চৌদ্দয় দাঁড়ায়। স্ত্রীদের প্রতি কোনরকম অনুরাগের ব্যাপার এদের মধ্যে থাকত না। যে-কোন তুচ্ছ কারণেই ঘটে যেত বিবাহবিচ্ছেদ।[৩] ইয়ুকাতানের মায়াদের কৃষ্টি ও বিকাশগত মান আজটেকদের চেয়ে উন্নত ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যেও বিবাহটা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করত না, নির্ভর করত প্রয়োজনের ওপর। ফলে দাম্পত্য-সম্পর্কও সুদৃঢ় হত না এবং যে-কোন পক্ষ ইচ্ছে করলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারত। তাছাড়া, ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও বহুবিবাহটা ছিল পুরুষদের একটা স্বীকৃত অধিকার। অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় বহুবিবাহের ঘটনা এদের মধ্যে অনেক বেশি ঘটত বলেই মনে হয়। ইণ্ডিয়ানদের তথা বর্বরদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংক্রান্ত এইসব তথ্য থেকে আদিবাসীদের আপেক্ষিক অগ্রগতির প্রকৃত চিত্রটা একান্ত স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

১। ঐ, ii, ৭০১.

২। "হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", খণ্ড ১, পরিচ্ছেদ ৩, পৃঃ ২১৭.

৩। "হিস্ট্রি অফ আমেরিকা", iv, ১৭১.

বিবাহের মত একান্ত ব্যক্তিগত একটা ব্যাপারে পাত্রপাত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যই ছিল না। এইসব মানুষদের বর্বর দশা বোঝার পক্ষে এই একটি তথ্যই যথেষ্ট।

এবার আমরা দেখব দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার থেকে জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার পেছনে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রভাব কাজ করেছিল। দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে সামাজিক অবস্থার কারণে একজোড়া নারী-পুরুষ কিছুটা বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত। প্রত্যেক পুরুষের বেশ কিছু স্ত্রীর মধ্যে একজন হত প্রধানা স্ত্রী, আর প্রত্যেক নারীর বেশকিছু স্বামীর মধ্যে একজন হত প্রধান স্বামী। অর্থাৎ, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে প্রথম থেকেই জোড়-বাঁধা পরিবারমুখী একটা প্রবণতার অস্তিত্ব ছিল।

এ-কাজ সম্পাদনের প্রধান ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেছিল গোত্রীয় সংগঠন। তবে তা ঘটেছিল এক সুদীর্ঘ ও ক্রমান্বয়ী প্রক্রিয়ার ফল হিসেবেই। প্রথমত, দলের মধ্যে অন্তর্বিবাহের চালু প্রথাকে গোত্র প্রথমেই নিষিদ্ধ করে দেয় নি। তবে গোত্রের মধ্যে আপন ভাইবোনের বিবাহ এবং আপন বোনদের সন্তানদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ এরা সকলেই ছিল একই গোত্রের সদস্য। আপন ভাইদের অবশ্য তখনও যৌথ-স্ত্রী থাকত আর আপন বোনেদের থাকত যৌথ-স্বামী। দেখা যাচ্ছে দলগত বিবাহের গোত্র কখনো সরাসরি হস্তক্ষেপ করে নি, সে শুধু এই বিবাহের আওতা থেকে কয়েকজন সদস্যকে বাদ দিয়েছিল। গোত্রের মধ্যে স্ত্রী-ধারার প্রতিটি নারীর (ancestor) সমস্ত বংশধরদের ওপর বরাবরের মত নিজেদের মধ্যে বিবাহ না করার নীতি চালু করে দিয়েছিল গোত্র। পূর্বতন দলগত বিবাহের দলগুলো যে নীতিতে চলত, তার তুলনায় এটা ছিল এক দারুণ অগ্রগতি। গোত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর তার প্রতিটি শাখাতেই এই নিয়ম দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরী ছিল, যার নজির আমরা দেখেছি ইরোকোয়াদের মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, এই সংগঠনের কাঠামো ও নীতিগুলোর দরুন জ্ঞাতিদের মধ্যে অন্তর্বিবাহের বিরুদ্ধে একটা ঝোঁক গড়ে ওঠে মানুষের মনে, কারণ গোত্রের বাইরে রক্ত সম্বন্ধহীন নারী-পুরুষকে বিবাহ করার সুবিধাগুলো মানুষ ততদিন একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছে। দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিল এই ঝোঁকটা। অবশেষে ব্যাপারটা একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। আমেরিকান আদিবাসীদের অস্তিত্ব যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের প্রায় সবার মধ্যেই এই নিয়মটা চালু ছিল।[১] যেমন, জ্ঞাতিত্বের সারনীতে ইরোকোয়াদের যে সমস্ত রক্তসম্বন্ধ যুক্ত জ্ঞাতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা কেউই পরস্পরকে বিবাহ করতে পারে না। অন্য গোত্র থেকে স্ত্রী সংগ্রহের ব্যাপারটা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠার ফলে তারা আলাপ-আলোচনা করে এবং মূল্যপ্রদান করে স্ত্রী সংগ্রহ করতে শুরু করে। আগে স্ত্রী পাওয়ার কোন অসুবিধেই ছিল না। কিন্তু গোত্রীয়

১। শিয়ানদের অনেক প্রধানের কাছে তাদের একটা ঘটনার কথা শুনেছিলাম। চালু প্রথা না মেনে দুজন মামাত-পিসতুত ভাইবোন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। এ-জন্য তাদেরকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু লোকেরা তাদের এমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করে যে তা সহ্য করতে না পেরে তারা নিজেরাই বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা করে নেয়।

সংগঠনের প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী সংগ্রহ করাটা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে দলগত বিবাহের দলগুলোর সদস্য সংখ্যাও ক্রমশ কমতে থাকে। এই সিদ্ধান্তটা মোটেই অযৌক্তিক নয়, কেননা তুরানীয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বসর্ত হিসাবে এই ধরনের দলগুলোর বিদ্যমান থাকাটা ছিল নিতান্তই স্বাভাবিক। এখন ঐ দলগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলেও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা টিকে আছে আজও। ঐ দলগুলো একটু একটু করে ভাঙছিল, অবশেষে জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার পর দলগুলো পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, তারা শুধু নিজেদের গোষ্ঠী বা মিত্র গোষ্ঠীগুলো থেকেই স্ত্রী সংগ্রহ করত না, সঙ্গেই বৈরি গোষ্ঠীগুলোর ওপর আক্রমণ চালিয়েও নারীদের ধরে নিয়ে এসে জোর করে বিবাহ করত। পুরুষ বন্দীদের হত্যা করা এবং নারী বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখা—ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই রীতি চালু থাকার প্রধান কারণ ছিল এটাই। আর যেখানে স্ত্রী সংগ্রহ করা হচ্ছে মূল্য দিয়ে বা গায়ের জোরে, এবং তার জন্য করতে হচ্ছে মেহনত, স্বীকার করতে হচ্ছে ত্যাগ— সেখানে সেইসব স্ত্রীদের অনেকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে কে-ই বা রাজি হবে! দলের মধ্যে যারা জীবন ধারণের উপকরণ সংগ্রহের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়, তারা অন্তত স্বামীদের তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলই। ফলে পরিবারে আয়তন এবং দাম্পত্য-ব্যবস্থার সীমানা আরও ছোট হয়ে এসেছিল। বস্তুতপক্ষে এক একটা দলের মধ্যে শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল কিছু আপন ভাই যারা পরস্পরের স্ত্রীদের স্বামী, আর কিছু বোন যারা পরস্পরের স্বামীদের স্ত্রী। শেষত, এতদিন পর্যন্ত সমাজকাঠামোর যে রূপটা বিদ্যমান ছিল তার থেকে উন্নত একটা কাঠামো গড়ে উঠেছিল গোত্রের প্রভাবে। সভ্যতার যুগে পা রাখার আগে পর্যন্ত মানুষের যা যা প্রয়োজন হত, তা পূরণ করার পক্ষে গোত্রই ছিল যথেষ্ট। একটা সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে আর বিকাশের প্রক্রিয়াই এ কাজ সমাধা করত। গোত্রের ছত্র ছায়ায় সমাজের যে অগ্রগতিটা ঘটতে পেরেছিল, সেই অগ্রগতিই প্রশস্ত করে দিয়েছিল জোড়বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের অভ্যুদয়ের পথ।

রক্তসম্বন্ধহীন নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহের রীতি চালু হওয়ার এই নতুন ঘটনাটা সমাজকে নিশ্চয়ই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই ধরনের বিবাহের ফলে যে-সব সন্তান জন্ম নিয়ে ছিল, শারীরিক ও মানসিকভাবে তারা ছিল অনেক শক্তিশালী। বিভিন্ন বংশের পরস্পরের মধ্যে সংমিশ্রন মানবজাতির অগ্রগতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্বর জীবনের বিভিন্ন আকস্মিক ঘটনার প্রভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে উন্নত দুটো গোষ্ঠী যখন কাছাকাছি আসত এবং তাদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটত, তখন সেই মিলন থেকে জাত সন্তানদের করোটি ও মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবেই অনেক বড় হত আর তাদের কার্যক্ষমতাও তুলনায় অনেক বেশি হতো। এই নতুন বংশধরদের আগমনের ফলে দুটো গোষ্ঠীই উন্নত হয়ে উঠত, সেই সঙ্গেই উন্নতি ঘটত তাদের বুদ্ধিমত্তার, লোকসংখ্যা ও জীবনযাপনে কৃৎকৌশলের উন্নতি ঘটত এবং বেড়ে চলত দ্রুত গতিতে।

আজকের সুসভ্য জাতিগুলোর জীবনে একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ একটা সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দলবিবাহ প্রথার অবসান সূচিত হওয়ার

আগে পর্যন্ত মানুষের মনে এই প্রবণতাটা দেখা দেয় নি। কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল, নানান রীতি-প্রথার সাহায্যে সেগুলোকে টিকিয়েও রাখা হত। কিন্তু জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের অভ্যুদয় ঘটার আগে পর্যন্ত সেটা কোন সার্বজনীন রীতিতে পরিণত হতে পারে নি। কাজেই এই প্রবণতাটাকে মানবজাতির জীবনে কোন স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। আসলে অন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মানসিক ক্ষমতা ও আবেগের মত এই প্রবণতাটাও মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল অভিজ্ঞতার পথ বেয়েই।

এই ধরনের পরিবারের বিকাশে বাধাদানকারী আর একটা বিষয়ের কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। যুদ্ধবিগ্রহের দরুন বন্যযুগের মানুষদের যত প্রাণহানি ঘটত, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণহানি ঘটত বর্বর যুগের মানুষদের। উন্নত অস্ত্রশস্ত্র এবং বেশি ক্ষমতা লাভের আশায় অধিকতর উদ্দীপনাই ছিল এর প্রধান কারণ। সবযুগে এবং সব ধরনের সমাজব্যবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহের কাজটা পুরুষরাই করে এসেছে। তার ফলে নারী-পুরুষের সংখ্যায় দেখা দিয়েছে ভারসাম্যের অভাব, পুরুষের তুলনায় বেশি হয়ে গেছে নারীদের সংখ্যা (কারণ যুদ্ধে যুবক পুরুষরাই মারা যেত) এই ঘটনার ফল হিসেবে আরও জোরদার হয়ে উঠেছে দলগত-প্রথা। নারী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে এবং নারীদের চরিত্র ও মর্যাদা সম্বন্ধে সমাজে অত্যন্ত নিম্ন স্তরের ধারণা চালু থাকার দরুন জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটাও যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে।

অন্যদিকে, আমেরিকার আদিবাসীরা ভুট্টা ও অন্যান্য ফসলের চাষ শুরু করার পর তাদের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটেছিল, তা-ও এই ধরনের পরিবারের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করেছে। এই চাষবাসের কাজ শুরু হওয়ার পর মানুষ এক একটা জায়গায় স্থিতু হয়ে বসবাস করতে থাকে, আবিষ্কৃত হয় এ কাজের সহায়ক কিছু কৃৎকৌশল, উন্নত হয়ে ওঠে ঘরবাড়ি তৈরির পদ্ধতি এবং জীবনযাপন হয়ে ওঠে সামগ্রিক ভাবেই অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। জোড়-বাঁধা পরিবারের গড়ে ওঠার ফলে জীবনের নিরাপত্তাও বেড়েছিল, আর তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছিল অন্তত কিছুটা বেশী শ্রমশীল ও মিতব্যয়ি। এইসব দিকগুলো বাস্তবায়িত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল জোড়-বাঁধা পরিবার এবং আরও বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার নিজস্ব চরিত্র।

যৌথ বাসগৃহগুলোতে আশ্রয় নেওয়ার পর (দলগত বিবাহভিত্তিক দলগুলোর পর এই নতুন ধরণের পরিবারের সদস্যরাই বসবাস করেছিল ঐ-সব বাড়িগুলোতে) জোড়-বাঁধা পরিবারের প্রধান ভরসা ছিল দুটো—এক ঃ নিজের ওপর ভরসা ; আর দুই ঃ স্বামী এবং স্ত্রী-র নিজ নিজ গোত্রের ওপর ভরসা। সমাজ বন্য যুগ অতিক্রম করে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে এবং এই হওয়ার ছাপ পড়েছিল পরিবারগুলোর ওপরেও। উন্নত হয়ে উঠেছিল পরিবার ব্যবস্থা এবং তার অগ্রগতির গতিমুখটা ছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের দিকে। জোড়-বাঁধা পরিবারের কথা যদি আমাদের জানা নাও থাকত, যদি শুধু জানা থাকত যে ইতিহাসের একদিকে আছে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর অন্যদিকে একবিবাহভিত্তিক পরিবার, তাহলেও আমরা এ-রকম একটা অন্তর্বর্তী স্তরের কথা অনুমান করে নিতে পারতাম। মানুষের অভিজ্ঞতার ইতিহাসে এই

পরিবার অনেকটা জায়গাই দখল করে রেখেছে। বন্য যুগ এবং বর্বর যুগের সন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়ে অনেকটা পথ উজিয়ে, বর্বর যুগের পুরো মধ্য পর্যায়ের অধিকাংশ সময়টা পেরিয়ে এসেছিল এই পরিবার। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের শেষদিকে এই জোড়-বাঁধা পরিবারকে স্থানচ্যুত করে মাথা তোলে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের অংকুর। সে যুগের চালু দাম্পত্যব্যবস্থার ছত্রছায়ায় এই পরিবার প্রথম দিকে ঠিকমতো মেলে ধরতে পারে নি নিজেকে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে এই একবিবাহভিত্তিক পরিবার। পুরুষদের আত্মপরতা নারীদের আত্মপরতার তুলনায় পুরোপুরি একবিবাহ প্রথা চালু হওয়ার প্রক্রিয়াকে অনেকটা বিলম্বিত করেছিল। অবশেষে সভ্যতার আগমন সুপ্রতিষ্ঠিত করে একবিবাহপ্রথাকে।

জোড়-বাঁধা পরিবারের আগে দু'ধরনের পরিবার প্রথা দেখা গেছে পৃথিবীতে এবং এই দু'ধরণের প্রথা জন্ম দিয়েছে দুটো জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থার, বা বলা যায়, একই জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার দুটো পৃথক পৃথক রূপের। কিন্তু এই তৃতীয় ধরনের পরিবার প্রথা কোন নতুন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থারও সৃষ্টি করে নি বা পুরনো ব্যবস্থার তেমন কোন পরিবর্তনও ঘটায় নি। নতুন পরিবারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য কয়েকটা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটানো হলেও, পুরানো ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত রয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে জোড়-বাঁধা পরিবার বেশ কিছুদিন ধরে টিকে থেকেছিল চালু সম্পর্ক-গুলোর সঙ্গে বেমানান একটা জ্ঞাতিব্যবস্থার ভিত্তিতেই। ঐ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা জোড়-বাঁধা পরিবারের ছিল না। কিন্তু উদীয়মান একবিবাহভিত্তিক পরিবারের আমলে এসে আর টিকে থাকতে পারে নি পুরনো জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা। নিজে থেকে কোন নতুন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার জন্ম না দিলেও, পূর্বতন পরিবারগুলোর মত জোড়-বাঁধা পরিবারও ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর ব্যাপক অংশে বিদ্যমান ছিল এবং অসংখ্য বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যে আজও বিদ্যমান আছে।

পরিবারের বিভিন্ন রূপগুলোকে আমরা যে ভাবে ক্রমানুসারে সাজিয়েছি, তাতে একটা ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়ে যেতে পারে। সমাজের একটা বিশেষ অবস্থায় একেবারে পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে উঠেছে কোন এক ধরণের পরিবার, ঐ অবস্থায় থাকা সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সেই ধরণের পরিবার আর তারপর পরবর্তী উচ্চতর রূপের পরিবারের মধ্যে তা ক্রমশ লীন হয়ে গেছে—এমন কথা আমি আদৌ বলতে চাই নি। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেও দেখা যেতে পারে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের কোন ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত, অথবা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এর ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্তও, দলগত বিবাহের মধ্যে খোঁজ মিলতে পারে জোড়-বাঁধা পরিবারের, অথবা দ্বিতীয়টার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে প্রথম ধরনের পরিবারের নজির। আবার জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যে চোখে পড়তে পারে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের নমুনা, অথবা সামনে আসতে পারে এর বিপরীত দৃষ্টান্তও। এমনকি দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরেও দেখা যেতে পারে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের কোন ব্যতিক্রমী নজির, ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগে খোঁজ মিলতে পারে জোড়-বাঁধা পরিবারের কোন একটা ব্যতিক্রমী ঘটনার। তাছাড়া, কোন কোন গোষ্ঠী অন্যান্য উন্নততর গোষ্ঠীর চেয়ে আগেই কোন একটা বিশেষ স্তরে উন্নীত হতে পেরেছে—এমন ঘটনাও বিরল নয়। যেমন,

ইরোকোয়ারা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে থাকার সময়ই তাদের মধ্যে জোড়-বাঁধা পরিবার গড়ে ওঠেছিল, কিন্তু ব্রিটনদের মধ্যে বর্বরযুগের মধ্য পর্যায়েও চালু ছিল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারই। ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগের সমুন্নত সভ্যতা ব্রিটেনে ছড়িয়ে দিয়েছিল এমন সব কৃৎকৌশল ও উদ্ভাবন, যেগুলো সেখানকার কেল্টিক আধিবাসীদের মানসিক বিকাশের থেকে অনেক অগ্রসর মানের ছিল। তাদের মস্তিষ্ক অর্থাৎ চিন্তা-শক্তি ছিল বন্য মানুষের স্তরের, কিন্তু কৃৎকৌশলের ক্ষেত্রে তারা উন্নততর গোষ্ঠীগুলোর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণ ধরে আমি যা বলার চেষ্টা করেছি এবং যে বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট প্রমানও উপস্থিত করা গেছে, তা হল—সেই বন্যতার যুগে ভাইবোনের মধ্যে বিবাহের ফল হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছিল পরিবারের এবং তারপর দুটো সুস্পষ্ট অন্তবর্তী রূপের পথ বেয়ে এগোতে এগোতে পরিবার এসে পৌঁছেছে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে। প্রত্যেক ধরনের পরিবারই প্রথমে অল্প কয়েকটা জায়গায় গড়ে উঠেছে, তারপর ছড়িয়ে পড়েছে আরও কিছু জায়গায় এবং অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই। অতঃপর তার স্থান গ্রহণ করেছে পরবর্তী ধরণের পরিবার, যা-ও ঠিক একই প্রক্রিয়ায় বিস্তৃত হয়েছে পৃথিবীর বুকে। এই পর্যায়ক্রমিক রূপগুলোর বিবর্তনের প্রধান গতিমুখটা ছিল ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার থেকে একবিবাহভিত্তিক পরিবার এর দিকে। অগ্রগতির পথে মূল ধারা থেকে কিছু-না-কিছু বিচ্যুতি মাঝে মাঝে ঘটেছে ঠিকই, তবু বিভাজনটা মোটামুটি এ-রকমই দাঁড়ায়: ভাইবোন বিবাহভিত্তিক এবং দল-গত বিবাহভিত্তিক পরিবার হচ্ছে বন্য যুগের অন্তর্গত, যার মধ্যে প্রথমটা চালু ছিল বন্য যুগের নিম্নতম পর্যায়ে আর দ্বিতীয়টা ঐ যুগের উচ্চতম পর্যায়ে; দলগত বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার বন্য যুগ অতিক্রম করে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল; জোড়-বাঁধা পরিবার হচ্ছে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের ব্যাপার, এবং ঐ যুগের উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত টিকে ছিল এই পরিবার; আর একবিবাহভিত্তিক পরিবার হচ্ছে বর্বর যুগের উচ্চপর্যায়ের অন্তর্গত, এবং সেই যুগ অতিক্রম করে এই সভ্যতার যুগেও টিকে থাকতে পেরেছে এই ধরণের পরিবার।

বিভিন্ন পর্যটক ও পর্যবেক্ষকের আংশিক বিবৃতির ওপর নির্ভর করে বর্বর গোষ্ঠী-গুলোর মধ্যে জোড়-বাঁধা পরিবারের নজির খুঁজে বেড়ানোর কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। যে কথাগুলো এতক্ষণ বলা হয়েছে, সেগুলোকে পাঠকেরা তাঁদের জানা ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখলেই এর সত্যতা বুঝতে পারবেন। আমেরিকান আদিবাসীদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সময় তারা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের ছিল এবং তখন তাদের মধ্যে চালু ছিল জোড়-বাঁধা পরিবারই। ভিলেজ্ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে চালু ছিল এই পরিবারই, যদিও এ ব্যাপারে স্পেনীয় লেখকদের বিবরণগুলো নিতান্তই অস্পষ্ট এবং ভাসাভাসা। তাদের যৌথ বাসগৃহগুলোর সার্বজনীন চরিত্র থেকেই বোঝা যায় যে তখনও তারা জোড়-বাঁধা পরিবারের স্তরেই ছিল। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের মত মানুষদের নিজস্বতা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ঝোঁকটা জোড়-বাঁধা পরিবারের আমলে ছিল না।

পূর্ব গোলার্ধে কিছু কিছু জায়গায় দেশীয় সংস্কৃতি সঙ্গে বিদেশী সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে একটা অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ-সব জায়গায় সভ্য

জীবনের উপকরণগুলোকে বন্য ও বর্বররা প্রয়োজন আর প্রবণতা অনুযায়ী কাজে লাগাত।[১] পুরোপুরি যাযাবর গোষ্ঠীগুলোর কিছু কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো গড়ে উঠেছে তাদের অস্বাভাবিক ধরনের জীবনযাপন প্রণালীর ফল হিসেবেই। এইসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা হয়নি। উন্নততর জাতিগুলোর প্রভাব অনেক গোষ্ঠীরই নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অপমিশ্রণের ফলে অনেক গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতিপথ পাল্টে গেছে। এর ফলস্বরূপ পরিবর্তন এসেছে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর সামাজিক অবস্থার মধ্যেও।

যে-সব জায়গায় মানুষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই ধরণের, সেইসব জায়গায় বন্য ও বর্বর উভয় গোষ্ঠীগুলোরই অবস্থার স্বাভাবিক বিকাশের পর্যালোচনা করাটা জাতিতত্ত্ব নিয়ে প্রণালীবদ্ধ আলোচনার জন্য একান্ত জরুরী। বন্য গোষ্ঠীগুলো সংক্রান্ত পর্যালোচনার ব্যাপারে পলিনেশিয়া আর অস্ট্রেলিয়াই যে শ্রেষ্ঠ এলাকা, তা আগেই বলা হয়েছে। এই দুটো জায়গার মানুষদের প্রতিষ্ঠান, রীতি, প্রথা, উদ্ভাবন আর আবিষ্কারকে পর্যালোচনা করলেই বন্য সমাজজীবনের প্রায় সমগ্র ছবিটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। বর্বর যুগের নিম্ন আর মধ্য পর্যায়ের সামাজিক অবস্থাকে উপলব্ধি করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকায় (এই এলাকাগুলো যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন)। রক্ত এবং বংশগত সূত্রে একই কুলের অন্তর্গত অধিবাসীরা (একমাত্র এস্কিমোরা ছাড়া) এমন একটা মহাদেশে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিল, যে মহাদেশটা একমাত্র গৃহপালনযোগ্য জীবজন্তুর দিক থেকে ছাড়া অন্য সব দিক থেকেই মানুষের বসবাসের পক্ষে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল। ঐ মহাদেশে তারা নিরুপদ্রবে উন্নত হয়ে ওঠার পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছিল। বন্য অবস্থায় থাকার সময়ই তারা ঐ মহাদেশে বসতি স্থাপন করেছিল বটে, কিন্তু গ্রীক ও রোমানদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে অগ্রগতির যে প্রধান প্রধান উপাদানগুলো ছিল, সেগুলো তারা অর্জন করতে পেরেছিল গোত্রভিত্তিক সংগঠন গড়ে ওঠার পরই।[২] এইভাবে একেবারে প্রথম দিকেই অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং মানবপ্রগতির মূল স্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ-

১। আফ্রিকায় কিছু কিছু মানব গোষ্ঠী, যেমন হটেনটটরা, সুপ্রাচীন কালেই আকরিক লোহাকে গলিয়ে লোহা বার করতে শুরু করেছিল আমাদের এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের বহু পূর্ব থেকে। ধাতুটা তৈরি করে বিদেশীদের কাছ থেকে শেখা বিভিন্ন স্থূল প্রক্রিয়ার সাহায্যে তারা নানারকম স্থূল জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বানাত।

২। আমেরিকার আদিবাসীরা এশিয়া থেকেই এসেছিল বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এই সাদৃশ্যের ব্যাপারটা মানবজাতির একইভাবে উদ্ভব এই তত্ত্বের মধ্যে নিহিত মিলেরই ফলাফল। এই শেষোক্ত বক্তব্যটাও একটা অনুমানই, কিন্তু নৃতত্ত্বের যাবতীয় তথ্য এইদিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করে। দুটো বক্তব্যের সমর্থনেই অজস্র জোরদার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কোন সুচিন্তিত দেশান্তরের ফল হিসেবে তাদের আমেরিকায় বসবাস শুরু হয়নি। সামুদ্রিক দুর্ঘটনার ফলস্বরূপ এবং এশিয়া থেকেউত্তর-পশ্চিম উপকূল অভিমুখী প্রবল সামুদ্রিক স্রোতই এদেরকে সম্ভবত আমেরিকায় নিয়ে এসেছিল।

শূন্য হয়ে এবং বন্য মানুষদের অনুন্নত মানসিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে নতুন মহাদেশে জীবনযাত্রা শুরু করেছিল তারা। যে-সব প্রাথমিক ধ্যানধারণা তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, সেগুলোর নিজস্ব বিবর্তন এবার শুরু হল এমন এক অবস্থার মধ্য দিয়ে যা সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত। সরকার, পরিবার, গার্হস্থ্যজীবন, সম্পত্তি ও জীবনধারণের কৌশল—যাবতীয় ধারণার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেই এ কথাটা সত্য ছিল। বন্য যুগ থেকে শুরু করে বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য পর্যায় পর্যন্ত সময়কালে তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারগুলো ছিল একই ধরনের, কিন্তু তাসত্ত্বেও এগুলোর মধ্যে সেই মূল ধ্যানধারণার ক্রমান্বয় বিকাশই চোখে পড়ে।

বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের যে নিখুঁত চিত্র ইরোকোয়া এবং মিসিসিপি নদীর পূর্ব দিকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে, পাওয়া গেছে তেমনটা আজকের পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বিদেশী প্রভাব মুক্ত দেশীয় কলা-কৌশল এবং অবিমিশ্র ও সমরূপ চরিত্রবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাদের এই যুগের সংস্কৃতির চৌহদ্দি, উপাদান আর সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এইসব বিষয়গুলো পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগেই এগুলো নিয়ে প্রণালীবদ্ধ আলোচনা হওয়া দরকার।

উল্লিখিত সমস্ত বিষয়গুলোই আর একটু উচ্চমাত্রায় বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের ক্ষেত্রেও সত্য, যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি নিউ মেক্সিকোর ভিলেজ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে, মেক্সিকোয়, মধ্য আমেরিকায়, গ্রেনাডায়, ইকুয়েডরে আর পেরুতে। উন্নত কলাকৌশল আর উদ্ভাবন, উন্নত স্থাপত্য, নানারকম জিনিসপত্র তৈরির সদ্য-আবিষ্কৃত পদ্ধতি আর বিজ্ঞানের প্রাথমিক অঙ্কুরসহ সমাজের এই পর্যায়ের এত চমৎকার ছবি ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর আর কোথাও লভ্য ছিল না। এই উর্বর ক্ষেত্রটিতে আমেরিকার বিদ্বজ্জনদের গবেষণা কিন্তু নিতান্তই নগণ্য। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল প্রাচীন সমাজের হারানো অবস্থারই একটা ছবি, যা ইওরোপীয় পর্যবেক্ষকদের চোখের সামনে হঠাৎই ফুটে উঠেছিল আমেরিকা আবিষ্কারের পর। কিন্তু এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে বা ঐ সমাজের গঠনকাঠামো নির্ধারণ করতে তাঁরা সক্ষম হননি।

সমাজের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা হচ্ছে বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়। আজকের কোন জাতির মধ্যে সমাজের এই অবস্থাটা আর দেখা যায় না। কিন্তু গ্রীক ও রোমানদের এবং পরবর্তীকালে জার্মান গোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস আর প্রথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের ছবি। এই পর্যায়ের সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পাওয়া গেলেও (বিশেষত হোমারের রচনায়), প্রকৃত অবস্থাটাকে বুঝতে হবে মূলত তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের সাহায্যেই।

সবথেকে উপযুক্ত অঞ্চলে সমাজের এই বিভিন্ন অবস্থাগুলোকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে এবং প্রতিটা পর্যায়কে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলে বন্য যুগ থেকে শুরু করে বর্বর যুগের পথ বেয়ে সভ্যতার যুগে এসে পৌঁছনোর প্রক্রিয়ায় মানুষের বিকাশের সমগ্র গতিপথটা একটা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অবিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে প্রতিভাত হয়। আর সেইসঙ্গেই দেখা যায় যে পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষের অগ্রগতির ধারা প্রায় একই রকম।

সেমিটিক গোষ্ঠীগুলোর পিতৃপ্রধান পরিবার নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন যে নেই, তা আমরা আগেই বলে এসেছি। এখানে আমরা পিতৃপ্রধান পরিবার প্রসঙ্গে দু'একটা কথা উল্লেখ করব মাত্র। এই পরিবার বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার। সভ্য যুগ শুরু হওয়ার পরও কিছুদিন তা টিকে ছিল। প্রধানরা বহুবিবাহ করতই, কিন্তু সেটা পিতৃপ্রধান প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূলক নীতি ছিল না। এই ধরনের পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল একজন পিতা বা কর্তার অধীনে কয়েকজন মুক্ত ও দাস মানুষদের একটা পরিবারে জোটবদ্ধ হওয়া। জমির ওপর অধিকার বজায় রাখা এবং গবাদি পশুর পাল ঠিকমত দেখাশোনা করার জন্যও তারা এইভাবে পরিবারে জোটবদ্ধ হত। বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ ক্রীতদাসরা আর ভৃত্যারা, এবং তাদের প্রধান হিসেবে একজন কর্তা—এদের নিয়েই গড়ে উঠত একটি পিতৃপ্রধান পরিবার। পরিবারের সদস্যদের ওপর এবং পারিবারিক সম্পত্তির ওপর ঐ কর্তারই কর্তৃত্ব ছিল এর মূল ভিত্তি। পিতৃপ্রধান পরিবার একটা মৌলিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পেরেছিল আমাদের অজানা কোন এক সময়ে ক্রীতদাস আর অন্যান্য অধীনস্থ ব্যক্তিদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করার ফলেই, বহুবিবাহের জন্য নয়। সেমিটিক সমাজের যে বিরাট আন্দোলনের ফলে গড়ে উঠেছিল এই পিতৃ-প্রধান পরিবার, সেই আন্দোলনের জন্য দলের ওপর একজন পিতা বা কর্তার সর্বময় ক্ষমতা এবং প্রতিটি ব্যক্তির আরও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যর ব্যবস্থা করা ছিল একান্তই প্রয়োজনীয়।

এই একই কারণে রোমেও গড়ে উঠেছিল পিতার কর্তৃত্বাধীন পরিবার (patria potestas)। নিজের সমস্ত সন্তান, বংশধর, ক্রীতদাস এবং ভৃত্যদের জীবন-মরণের ওপর পূর্ণ অধিকার থাকত ঐ পিতাটির। পিতাই ছিল গোটা পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। তার নাম অনুযায়ীই পরিবারের নামকরণ করা হত। ঐ পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সৃষ্ট যাবতীয় সম্পত্তিরও পূর্ণ মালিকানা থাকত তার হাতে। এই পরিবারে বহুবিবাহ চলত না। পরিবারের কর্তা বা 'প্যাটার ফ্যামিলিয়াস' (Pater familias) কুলপতির মর্যাদা পেত আর তার অধীনস্থ পরিবারটা হত পিতৃপ্রধান পরিবার। প্রাচীন আমলের গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর পরিবারের মধ্যেও এই একই বৈশিষ্ট্য দেখা যেত—অবশ্য অনেকটা কম মাত্রায়। মানবপ্রগতির এই যুগটাতেই মানুষের স্বতন্ত্রতা গোত্রের প্রভাব ছাড়িয়ে (আগে গোত্রের মধ্যেই মিশে থাকত তার স্বতন্ত্রতা) মাথাচাড়া দিতে শুরু করে, গড়ে উঠতে থাকে মানুষের নিজস্ব জীবন আর স্বাধীনভাবে কাজ করার ব্যাপকতর ক্ষেত্র। এরই প্রভাবে দেখা দেয় একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে তোলার প্রবণতা, কারণ তখনকার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে একবিবাহভিত্তিক পরিবার ছিল অপরিহার্য। আগেকার অন্য সমস্ত ধরনের পরিবারের থেকে পিতৃপ্রধান পরিবারের পার্থক্যটা এখানেই, আর এই বৈশিষ্ট্যগুলোই ইতিহাসে একে এক বিশিষ্ট আসন করে দিয়েছে। তবে, হিব্রু এবং রোমানদের মধ্যে চালু থাকা পরিবারের এই রূপটা মানব ইতিহাসে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। ভাইবোন বিবাহভিত্তিক ও দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব চালু থাকা সম্ভব ছিল না এবং চালু ছিলও না। জোড়-বাঁধা পরিবারের যুগে পিতৃপ্রাধান্য কিছুটা মাথা তুলতে পেরেছিল। পরিবার যত বেশি করে স্বাধীন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে শুরু করে, ততই জোরদার হতে থাকে পিতার কর্তৃত্ব। অবশেষে

একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার পর যখন সন্তানদের পিতৃত্ব নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছিল, তখন থেকেই পিতৃপ্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হয় পুরোপুরিভাবে। রোমান ধরনের পিতৃপ্রধান পরিবারে পিতার হাতে অসীম ক্ষমতা থাকত। হিব্রুদের পিতৃপ্রধান পরিবার কোন নতুন জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে নি। এই পরিবারের কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রে তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা দিয়েই কাজ চলে যেত। কিন্তু এই পরিবারের অবসান ঘটিয়ে একবিবাহভিত্তিক পরিবার চালু হওয়ার পর তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বদলে গড়ে উঠে সেমিটিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা, ঠিক যেমন গ্রীক ও রোমান জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার বদলে গড়ে উঠেছিল আর্য জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা। মালয়ী, তুরানিয় এবং আর্য —এই তিনটি জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার প্রত্যেকটিই সমাজের এক একটা পূর্ণাঙ্গ কাঠামোগত পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে এবং প্রতিটিই সুনিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দেয় সেই ধরনের পরিবারের অস্তিত্বের, যে ধরনের পরিবারের অন্তর্গত সম্পর্কগুলো তার মধ্যে বিধৃত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একবিবাহভিত্তিক পরিবার

একবিবাহভিত্তিক পরিবারের সামাজিক ইতিহাস নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। এইসব গবেষণায় বলা হয়েছে যে, একবিবাহভিত্তিক পরিবার তুলনামূলকভাবে যথেষ্টই আধুনিক। সমাজের ইতিহাসকে যাঁরা দার্শনিক দিক থেকে বিচার করেছেন, তাঁরা দেখেছেন সমাজের প্রাথমিক একক যে পরিবার, তাকে বাদ দিয়ে সমাজের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না আর এই শেষ যুগের পরিবারকে একবিবাহভিত্তিক পরিবার ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে ভাবাও সম্ভব নয়। তাঁরা আরও দেখেছিলেন যে একজোড়া বিবাহিত দম্পতিকে একদল মানুষের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেওয়াটা একান্তই প্রয়োজনীয়। এই একদল মানুষের মধ্যে একটা অংশ ছিল ক্রীতদাস এবং দলের সকলেই ছিল একজনের কর্তৃত্বাধীন। এইসব বিষয় লক্ষ করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ সংগঠিত সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল পিতৃপ্রধান পরিবারের আমলেই। এটাই হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনতম রূপ, যার নজির আমরা দেখেছি লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। তাই লাতিন বা হিব্রু ধরনের পিতৃপ্রধান পরিবারকেই প্রাচীন সমাজের একান্ত নিজস্ব পারিবারিক রূপ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, যে পরিবারের মর্মবস্তু ছিল পিতার কর্তৃত্ব।

বর্বর যুগের শেষ পর্যায়ে গোত্রের যে রূপ দেখা গেছে, তা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন অনেকেই। কিন্তু ভ্রান্তি থেকেগেছে এক জায়গায়—অনেকেই ধরে নিয়েছেন যে সময়ের নিরিখে গোত্র হচ্ছে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের পরের ব্যাপার। আমাদের আজকের দিনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ব্যাখ্যা করার উপাদান হিসেবে বর্বর গোষ্ঠী-গুলোর, এমনকি বন্য গোষ্ঠীগুলোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করাটা ক্রমেই আরও বেশি জরুরী হয়ে উঠছে। একবিবাহভিত্তিক পরিবারকে সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক হিসেবে ধরে নিয়ে অনেকে গোত্রকে ধরে নিয়েছেন কিছু পরিবারের সমষ্টি হিসেবে, গোষ্ঠীকে ধরে নিয়েছেন কিছু গোত্রের সমষ্টি হিসেবে এবং জাতিকে ধরে নিয়েছেন কিছু গোষ্ঠীর সমষ্টি হিসেবে। এই ভাবনার গলদ রয়ে গেছে প্রথম প্রতিপাদ্যটার মধ্যেই। আমরা আগেই দেখেছি যে পুরো গোত্রটাই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত, ভ্রাতৃত্ব গোষ্ঠীর অন্তর্গত আর গোষ্ঠী জাতির অন্তর্গত। কিন্তু কোন পরিবার পুরোপুরিভাবে একটা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না, কারণ স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের সদস্য। রোমানদের মধ্যে বর্বর যুগের একেবারে শেষ পর্যায় পর্যন্ত মেয়েরা নিজেকে পিতার গোত্রের সদস্যা বলেই মনে করত এবং পিতার গোত্রের উপাধিই ব্যবহার করত। যেহেতু সমস্ত অংশকে অবশ্যই সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে সেহেতু পরিবার কখনোই গোত্রভিত্তিক সংগঠনের প্রাথমিক একক হতে পারত না। এই প্রাথমিক এককের ভূমিকা পালন করত গোত্রই। তাছাড়া, বন্যযুগের

সমগ্র পর্যায়ে এবং বর্বর যুগের প্রথম পর্যায়ে, সম্ভবত মধ্য পর্যায়ে, এমনকি এই যুগের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্তও রোমান বা হিব্রু কোন ধরনের পিতৃপ্রধান পরিবারের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। গোত্রের আবির্ভাব আর একবিবাহভিত্তিক পরিবারের অভ্যুদয়ের মাঝে কেটে গেছে বহু বহু বছর, যুগের পর যুগ। একমাত্র সভ্য যুগ শুরু হওয়ার পরই সমাজের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে একবিবাহভিত্তিক পরিবার।

লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পরবর্তীকালে যে অনেক পরিবার গড়ে উঠেছিল, তা অনুমান করা যায় 'ফ্যামিলি' (পরিবার) শব্দটা থেকেই। এই ফ্যামিলি (family) শব্দটা এসেছে 'ফ্যামিলিয়া' (familia) থেকে। ফ্যামিলিয়ার সঙ্গে আবার সব থেকে বেশি সাদৃশ্য 'ফ্যামুলাস' (famulus) শব্দটার, যার অর্থ হচ্ছে ভৃত্য। ফ্যামিলিয়া শব্দটা এসেছে সম্ভবত ওস্কানদের 'ফ্যামেল' (famel) শব্দ থেকে, যার অর্থ ক্রীতদাস।[১] আদতে ফ্যামিলি শব্দটার সঙ্গে বিবাহিত দম্পতি অথবা সন্তানসন্ততির কোন সম্পর্ক ছিল না, বরং এই শব্দটা ছিল একদল ক্রীতদাস ও ভৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এইসব দাস ও ভৃত্যরাই ঐ দম্পতি আর তাদের সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য মেহনত করত এবং এরা 'প্যাটার ফ্যামিলিয়াস' (pater familias) বা পরিবারের কর্তার অধীনে থাকত। কোন কোন উইল বা ইচ্ছাপত্রে ফ্যামিলিয়া শব্দটাকে ব্যবহার করা হয়েছে 'প্যাট্রিমনিয়াম' (patrimonium) শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে, যার সাহায্যে উত্তরাধিকারীর হাতে হস্তান্তরিত উত্তরাধিকারকেই বোঝানো হত।[২] লাতিন সমাজে এই শব্দটা এসেছিল একটা নতুন সংগঠনকে চিহ্নিত করার জন্য, যে সংগঠনে কর্তার স্ত্রী এবং সন্তানাদি থাকত আর তার অধীনে থাকত কিছু 'ক্রীতদাস।' ফ্যামিলিয়া শব্দটার লাতিন অর্থ বোঝানোর জন্য মমসেন "একদল ভৃত্য" কথাটা ব্যবহার করেছেন।[৩] কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে এই শব্দটা এবং এই শব্দের মধ্যে নিহিত ধারণাটা লাতিন গোষ্ঠীগুলোর আঁটোসাঁটো পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার থেকে পুরনো নয়, আর লাতিনদের মধ্যে এই ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল চাষাবাদ শুরু হওয়ার ও ক্রীতদাস রাখাটা আইনসম্মত হয়ে ওঠার পর, এবং অবশ্যই গ্রীক আর লাতিন-গোষ্ঠিদের মধ্যে বিভাজনের পর। তার আগের যুগে প্রাচীন পরিবারের কোন নাম থেকে থাকলেও আজ আর তা জানার কোন উপায় নেই।

ভাইবোন বিবাহভিত্তিক ও দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব আদৌ সম্ভব ছিল না। একসময় দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে গড়ে উঠল গোত্র। এক একটা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হল কয়েকজন বোন, তাদের সন্তানরা এবং ঐ বোনেদের স্ত্রী-ধারার সমস্ত বংশধররা। এই গোত্রই হয়ে উঠেছিল সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক একক। এই অবস্থার মধ্যে থেকেই ধাপে ধাপে গড়ে উঠল জোড়-বাঁধা পরিবার, আর এই পরিবারের মধ্যেই নিহিত ছিল পিতৃপ্রাধান্যের বীজ। প্রথম দিকে পিতার ক্ষমতা ছিল নিতান্তই

১। Famuli origo ab Oscis dependet, apud quo servus Famul nominabuntur, unde "familia" vocata.—"Festus", পৃঃ ৮৭,

১। Amico familiam suam, id est patrimonium sunm manoipio dabat.—Gaius "Inst.", ii, ১০২.

২। "হিস্ট্রি অফ রোম", খণ্ড ১, পরিচ্ছেদ ১, পৃঃ ৯৫.

দুর্বল। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন ধরনের পরিবারের মধ্যে যতই বেশি করে ফুটে উঠতে লাগল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের লক্ষণগুলো, ততই বেড়ে উঠতে লাগল পিতার ক্ষমতাও। তারপর যখন সমাজে প্রচুর সম্পত্তি সৃষ্টি হল এবং সেই সম্পত্তিকে নিজের সন্তানদের হাতে তুলে দিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল মানুষের মনে, তখন চালু হল বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারার অনুসরণ। পিতৃপ্রাধান্যের প্রকৃত বনিয়াদ গড়ে দিল এই পদক্ষেপটাই। হিব্রু ও লাতিন গোষ্ঠীগুলোর কথা যখন প্রথম জানা যায়, তখন প্রথমোক্তদের মধ্যে চালু ছিল হিব্রু ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবার আর শেষোক্তদের মধ্যে চালু ছিল রোমান ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবার। উভয় ক্ষেত্রেই পরিবারের ভিত্তি ছিল একদল মানুষের আংশিক বা পূর্ণ দাসত্ব। এই ক্রীতদাসরা এবং সেইসঙ্গে প্রথম ক্ষেত্রে পরিবার-প্রধানের ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিবার-কর্তার স্ত্রী আর সন্তানরা ছিল পিতৃকর্তৃত্বের অধীন। পিতৃপ্রাধান্যের এই ঘটনাটা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা ব্যতিক্রম। বিশেষত রোমানদের মধ্যে এই কর্তৃত্বটা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। এ-রকম পিতৃকর্তৃত্ব কিন্তু উল্লিখিত স্থানসমূহ বাদে পৃথিবীর আর কোথাও চালু ছিল না। গেইয়াস্ (Gaius) বলেছেন, নিজের সন্তানদের ওপর কোন রোমান পিতার যে বতৃর্ত্ব থাকত, তা একান্তই রোমান সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ; অন্য কোন দেশের পিতারা এতটা ক্ষমতার অধিকারী ছিল না।[১]

প্রথম দিকের একবিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রকৃতিটা ঠিক কেমন ধরনের ছিল, তা বোঝানোর জন্য ধ্রুপদী লেখকদের রচনা থেকে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বর্বর যুগের শেষ পর্যায়েই একবিবাহ একটা সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। তার অনেক আগে জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যেও একবিবাহের কিছু কিছু লক্ষণ অবশ্যই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যে একবিবাহের প্রধান উপাদান, অর্থাৎ যৌনসহবাস কেবলমাত্র একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার ব্যাপারটা ছিল না।

এ ব্যাপারে একটা অত্যন্ত প্রাচীন ও চিত্তাকর্ষক নজির খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীন আমলের জার্মানদের পরিবারের মধ্যে। এদের প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল একইরকম চরিত্র-বিশিষ্ট ও দেশজ, এবং এরা তখন এগিয়ে চলেছিল সভ্যতার অভিমুখে। এদের বিবাহ সংক্রান্ত প্রথাকে অল্পকথায় বর্ণনা করেছেন ট্যাসিটাস, তবে পরিবারের কাঠামো কিংবা তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেননি তিনি। এদের বিবাহবিধি খুব কঠোর ছিল এবং তা যথেষ্টই প্রশংসনীয়—এ-কথা বলার পর ট্যাসিটাস বলেছেন যে বর্বরদের মধ্যে বোধহয় শুধুমাত্র এরাই এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকত ; কেউ কেউ যে বহুবিবাহ করত না এমন নয়, তবে তার পিছনে যৌনকামনার প্রভাব কাজ করত না, কাজ

১। Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos justis nuptiis procreauimus, quod jus proprium ciuium Romanorum est ; fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus :—"Inst.", ১,৫৫। অন্যান্য কিছুর সঙ্গে জীবন মরণের ওপরেও তাদের কর্তৃত্ব থাকত—jus vitae necispue.

করত তাদের পদমর্যাদা। তিনি আরও বলেছেন যে স্ত্রীরা স্বামীদের কোন যৌতুক দিত না, স্বামীরাই যৌতুক দিত স্ত্রীদের······দিতে হত একটা সাজসজ্জাবিশিষ্ট ঘোড়া, একটা ঢাল, বর্শা আর তরবারি। এইসব সামগ্রী প্রদান করার পরই কোন নারীকে বিবাহ করা সম্ভব হত।[১] বিবাহের পাত্রী সংগ্রহের জন্য প্রদত্ত এই যৌতুকগুলো আগে সম্ভবত পাত্রীর সগোত্রীয় জ্ঞাতিরাই পেত, কিন্তু পরে স্বয়ং পাত্রীই এগুলোর অধিকারিণী হত। অন্যত্র ট্যাসিটাস আরও দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর মধ্যে একবিবাহের মর্মবস্তু মূর্ত হয়ে উঠেছে।[২] প্রথমত, প্রত্যেক পুরুষ একস্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকত (singulis uxoribus contenti sunt); এবং দ্বিতীয়ত, নারীরা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করত কঠোরভাবে (septoe pudicitia agunt)। বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে পরিবারের অবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে, তা থেকে মনে হয় যে জীবনধারণের যাবতীয় সমস্যাকে একাকী মোকাবিলা করার পক্ষে জার্মানদের এই পরিবারগুলো ছিল নিতান্তই দুর্বল সংগঠন। আর ঠিক সেই কারণেই কয়েকটা পরস্পরসম্পর্কযুক্ত পরিবার এক একটা যৌথ বাসগৃহে বসবাস করত। দাসপ্রথা পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে যাওয়ার পর এই যৌথ-বাসগৃহগুলো আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিল। এই পর্যায়ের জার্মান সমাজ তখনও পর্যন্ত যথেষ্ট উন্নত ধাঁচের একবিবাহভিত্তিক পরিবারের জন্ম দেওয়ার মত অগ্রসর হয়ে ওঠে নি।

হোমারের যুগের গ্রীকদের মধ্যে একবিবাহভিত্তিক পরিবার চালু থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত নিম্ন মানের। স্বামীরা স্ত্রীদের সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে চাইত এবং তার জন্য জোর করে তাদেরকে বাইরের জগৎ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব স্বীকার করতে তারা রাজি ছিল না, অথচ এক-বিবাহের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। হোমারের রচনায় এমন দৃষ্টান্ত বিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায় নারীদের পুরুষরা মর্যাদা দিত খুবই কম। ট্রয়ের পথে পাড়ি দেওয়ার সময় গ্রীক প্রধানরা যে-সব নারী বন্দীকে জাহাজে করে নিয়ে গিয়েছিল, নির্বিচারে তাদের সম্ভোগ করেছিল তারা। মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনাগুলো সত্য বা কাল্পনিক যা-ই হোক না কেন, এগুলোকে তৎকালীন সমাজের একটা নির্ভর-যোগ্য প্রতিচ্ছবি হিসেবে মেনে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। উল্লিখিত ঐ নারীরা বন্দিনী ছিল ঠিকই, কিন্তু এ থেকে নারীদের কতটা হীন চোখে দেখা হত তা বুঝে নেওয়া যায়। নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না এবং তাদের ব্যক্তিগত অধিকারও সুরক্ষিত ছিল না আদৌ। অ্যাকিলিসের অসন্তোষ প্রশমনের জন্য গ্রীক প্রধানদের একটি সভায় অ্যাগামেম্‌নন প্রস্তাব দেন—অন্যান্য জিনিসপত্র ছাড়াও অ্যাকিলিসের হাতে তুলে দেওয়া হোক লেস্‌বিয়া নগরী থেকে নিয়ে আসা সাতজন সুন্দরী রমণীকে। লেস্‌বিয়া নগরী ধ্বংস করার পর এই সাত সুন্দরীকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল অ্যাগামেম্‌ননের জন্যই, যাদের মধ্যে ছিল স্বয়ং ব্রাইসেইস-ও। সেই সঙ্গেই অ্যাগামেম্‌নন আরও বলেন যে ট্রয় বিজিত হলে কুড়িজন ট্রোজান রমণীকে নিজের জন্য বেছে নেওয়ার অধিকার

১ "জার্মা নয়া", পৃঃ ১৮.
১ "জার্মানিয়া", পৃঃ ১৯.

পাবেন অ্যাকিলিস, সৌন্দর্যে যাদের স্থান হেলেনের পরেই।[১] "নারী আর লুণ্ঠিত সামগ্রী"—সেই বীর যুগের গ্রীকদের কাছে এটাই ছিল প্রধান জিগির। নারীবন্দীদের প্রতি তাদের আচরণ থেকেই নারীদের সম্বন্ধে সে সময়কার সাধারণ মনোভাবটা বুঝতে পারা যায়। যে পুরুষরা তাদের শত্রুদের পৈতৃক, দাম্পত্য সম্পর্ক কিংবা ব্যক্তিগত অধিকার, কোন কিছুরই পরোয়া করত না, তারা যে নিজেদের মধ্যেও ঐ সব অধিকার সম্বন্ধেও কোন উচ্চতর ধারণায় পৌঁছতে সক্ষম ছিল না—সেটা স্বতঃসিদ্ধ। অবিবাহিত অ্যাকিলিস আর তাঁর বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের শিবির-জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে, একজন প্রধান হিসেবে অ্যাকিলিসের চরিত্র ও মর্যাদার প্রমাণ দেওয়াটা প্রয়োজনীয় বলে বোধ করেছিলেন হোমার। তিনি লিখেছেন—নিজের সুনির্মিত শিবিরে অবসর যাপন করতেন অ্যাকিলিস, আর তাঁর সঙ্গে শয়ন করত লেসবিয়া থেকে নিয়ে আসা এক উজ্জ্বল-কপোল রমণী—ডায়োমিডে। শিবিরের অন্যদিকে শয়ন করতেন প্যাট্রোক্লাস। তাঁর শয্যাসঙ্গিনী ছিল এক ক্ষীণকটি রমণী—ইফিস। এই ইফিসকে অ্যাকিলিস বন্দিনী করেছিলেন স্কাইরস-এ, এবং তাকে তুলে দিয়েছিলেন প্রিয়তম বন্ধুর হাতে।[২] সে যুগের মহান কবি কর্তৃক বর্ণিত এবং মানুষের সমর্থনপুষ্ট এইসব রীতি ও প্রথা থেকে (অবিবাহিত ও বিবাহিত পুরুষ, উভয়েরই) বোঝা যায়, একবিবাহ বলতে যা চালু ছিল, তা হচ্ছে আসলে স্ত্রীদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া একটা বাধ্য-বাধকতা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্বামীরা আদৌ একপত্নীগামী ছিলনা। এ ধরনের পরিবারের মধ্যে একবিবাহের বৈশিষ্ট্য যতটা থাকে, ঠিক ততটাই থেকে যায় জোড়-বাঁধা বিবাহের বৈশিষ্ট্যগুলোও।

অনেকের ধারণা মহাকাব্যের যুগে নারীদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, এবং সভ্যতার যুগ শুরু হওয়ার সময় ও তার পরে নারীদের অবস্থার বিপুল উন্নতি ঘটার সময়েও পরিবারে তাদের যা মর্যাদা ছিল, তার থেকে অনেক বেশি মর্যাদা তারা পেত সেই মহাকাব্যের যুগে। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারা অনুসরণ চালু হওয়ার অনেক আগে নারীরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী হয়ত ছিল, কিন্তু মহাকাব্যের যুগে ব্যাপারটা আদৌ সে-রকম ছিল না। জীবনধারণের উপকরণ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন, একটা বিপুল অগ্রগতি ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই অগ্রগতি বর্বর যুগের সমগ্র অন্তিম পর্যায়টা জুড়ে নারীদের প্রতি অসম্মানজনক মনোভাবকে আরও বাড়িয়েই তুলেছিল।

আমরা আগেই বলেছি যে বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হওয়ার ফলে স্ত্রী ও মায়েদের ভূমিকা ও অধিকার যথেষ্টই ক্ষুন্ন হয়েছিল। সন্তানরা আর তাদের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত না, তারা বিবেচিত হল পিতার গোত্রের সদস্য হিসেবে। তাছাড়া, বিবাহের পর মেয়েরা নিজেদের গোত্রের অধিকারগুলো হারালো, অথচ তার সমতুল কোন অধিকার স্বামীর গোত্রে এসে পেল না। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঘটার আগে পরিবারের মধ্যে খুব সম্ভবত নারীদের গোত্রের

১। ইলিয়াড, নবম পর্ব, পৃঃ ১২৮.

২। ঐ, পৃঃ ৬৬৩.

লোকদেরই সংখ্যাধিক্য থাকত। ফলে মাতৃত্বের বন্ধনটা সক্রিয় থাকত পুরোপুরিভাবে, এবং পুরুষদের বদলে নারীরাই পরিবারের কর্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হত। বংশধারার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার পর নিজের গোত্রের জ্ঞাতিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বামী-দের সংসারে একা হয়ে পড়ল নারীরা। স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়ল মাতৃত্বের বন্ধন, অবনতি ঘটল নারীর সামাজিক মর্যাদার, অবরুদ্ধ হল তাদের অগ্রগতির পথ। বিত্তবান শ্রেণীগুলোর মধ্যে নারীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হত, আর তার সঙ্গে তাদের ওপর দায়িত্ব থাকত আইনসিদ্ধ বিবাহ মারফৎ সন্তান উৎপাদনের। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পরবর্তী যুগের তুলনায় (যে যুগ সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশি ওয়াকিবহাল হওয়ার সুযোগ পেয়েছি) মহাকাব্যের যুগে নারীদের অবস্থা অনেক হীন ছিল।

গ্রীক পুরুষদের মধ্যে বরাবরই এমন একটা অহংবোধ বা ইচ্ছাকৃত স্বার্থপরতা ছিল, যার দরুন তারা সর্বদাই নারীদের হীন চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। বন্যদের মধ্যে কিন্তু এই ব্যাপারটা প্রায় কখনোই দেখা যায়নি। গ্রীকদের সাংসারিক জীবনে এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেদের স্ত্রীরা একমাত্র স্বামীর সঙ্গে ছাড়া আর কোন পুরুষের সঙ্গে সহবাসের সুযোগ পেত না। অথচ স্বামীরা কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে এ-রকম কোন বাধ্যবাধকতা মেনে চলত না। এ থেকে বোঝা যায় যে আগে তাদের মধ্যে চালু ছিল তুরানিয় ধাঁচের জ্ঞাতি-ব্যবস্থা, আর সেই ব্যবস্থার বিলোপ ঘটানোই ছিল তৎকালীন গ্রীকদের উদ্দেশ্য। শত শত বছরের অভ্যাসে নিজেদের হীন বলে মনে করতে গ্রীক নারীরা এতই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে এমনকি গ্রীকদের চরম উন্নতির একেবারে শেষ পর্যায়েও তারা সেই মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। গ্রীক সমাজকে জোড়-বাঁধা পরিবারের স্তর থেকে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে উন্নীত করার জন্য নারীদের এই ত্যাগ হয়ত প্রয়োজনীয়ই ছিল। যে-জাতিটা নিজেদের চিন্তাভাবনাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিল সারা পৃথিবীর সামনে, তারা যে কি করে সভ্যতার শীর্ষে পৌঁছতে নিজেদের নারীদের প্রতি আচার-আচরণে প্রায় বর্বরসুলভই রয়ে গিয়েছিল, সেটা আজও বুঝে ওঠা দুষ্কর। না, নারীদের প্রতি কোন রকম নিষ্ঠুর আচরণ করা হত না কিংবা তাদের সঙ্গে প্রদত্ত সুযোগগুলোর ক্ষেত্রে অভদ্র ব্যবহারও করা হত না। কিন্তু তারা শিক্ষার সুযোগ প্রায় পেতই না, পেত না পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ। নারীরা যে হীন, এটা ধরেই নেওয়া হত এবং একসময় নারীরাও সেটাকেই সত্য বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গিনী ও সমকক্ষ ছিল না, বরং স্ত্রীকে স্বামীরা অনেকটা কন্যার চোখেই দেখত। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই একবিবাহের মৌলিক নীতি লঙ্ঘিত হত, কারণ যথেষ্ট উন্নত একবিবাহের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা ঘটা অসম্ভব। মর্যাদায়, ব্যক্তিগত অধিকারে এবং সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে স্ত্রী অবশ্যই স্বামীর সমকক্ষ। এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়, আজকের এই একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে তোলার পিছনে কী বিপুল অভিজ্ঞতা আর কত সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হয়েছিল।

ঐতিহাসিক যুগে গ্রীক নারীদের আর গ্রীক পরিবারগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের হাতে প্রচুর সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। বেকার তাঁর বিপুল গবেষণাসমৃদ্ধ রচনা-

গুলোতে প্রধান প্রধান তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন।[১] তাঁর বিবরণের মধ্যে ঐতিহাসিক যুগের পরিবারের কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া না গেলেও, এই বর্ণনা থেকে যথেষ্ট ভাল ভাবেই বোঝা যায় গ্রীকদের পরিবার আর আধুনিক সুসভ্য পরিবারের মধ্যে পার্থক্যটা কত বিশাল। একেবারে প্রথম দিককার একবিবাহভিত্তিক পরিবারের অবস্থাটা কেমন ছিল, সেটাও জানা যায় বেকারের বিবরণ থেকে।

বেকারের উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে দুটো বিষয় বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রথমত, বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক মারফৎ সন্তান উৎপাদন করা ; আর দ্বিতীয়ত, এই উদ্দেশ্যকে সুনিশ্চিত করার জন্য বাইরের জগৎ থেকে নারীদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। এই দুটো ব্যাপার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এবং এগুলো থেকে তাদের পূর্বতন অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। প্রথমত, বর্বর যুগের মানুষদের কাছে প্রেম ছিল একটা অজানা বস্তু। প্রেমের সূক্ষ্ম বোধ তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। প্রেম হচ্ছে সভ্যতার ফসল, সভ্য যুগের সূক্ষ্ম অনুভূতির

১। চ্যারিক্লস্ থেকে গৃহীত ("এক্মকারসাস", xii লংম্যান সংস্করণ, মেট্কাফের অনুবাদ) নিম্নোক্ত সংক্ষেপিত বিবৃতিটির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগের নারীদের থেকে হোমারের যুগের নারীরা সাংসারিক জীবনে অনেক বেশি সম্মানজনক অবস্থায় ছিল—এ কথা বলার পর তিনি গ্রীক সংস্কৃতির উন্নত পর্যায়ে নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে, বিশেষত এথেন্স আর স্পার্টার নারীদের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নারীদের তারা বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী হিসেবে মনে করত (পৃঃ ৪৬৪) ; স্বাধীনতার কোন সুযোগই ছিল না নারীদের, সারা জীবন ধরেই তাদেরকে নিতান্ত নাবালিকা হিসেবে গণ্য করা হত ; মেয়েদের জন্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা ছিল না, যাবতীয় শিক্ষাই তারা পেত নিজেদের মা আর ধাত্রীদের কাছ থেকে, আর সে শিক্ষা বলতে সেলাই বুনন এবং অন্যান্য মেয়েলী কাজকর্মকেই বোঝানো হত (পৃঃ ৪৬৫) ; নারীদের সংস্কৃতি যাদের ছাড়া বিকশিত হতে পারে না তাদের সঙ্গে, অর্থাৎ পুরুষ সমাজের সঙ্গে, মেলামেশার প্রায় কোন-রকম সুযোগই পেত না নারীরা ; বিদেশীদের সঙ্গে এবং নিজেদের নিকটতম আত্মীয়দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও ছিল না তাদের ; এমনকি নিজেদের পিতা বা স্বামীর সঙ্গেও তাদের খুব একটা দেখাসাক্ষাত হত না, কারণ পুরুষরা বেশি সময়টাই কাটাত দেশের বাইরে, আর বাড়িতে থাকলেও তারা বসবাস করত নিজেদের আলাদা মহলে ; বাড়ির অন্তঃপুর বা জেনানাম হলটা ঠিক কারাগার বা বন্ধদুয়ার হারেম না হলেও, ঐ সংরক্ষিত জায়গাটুকুর মধ্যেই বাড়ির মেয়েদের সারাটা জীবন বদ্ধ হয়ে থাকতে হত ; সবথেকে করুণ অবস্থা ছিল কুমারী মেয়েদের, কারণ বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে প্রায় কোথাওই বেরোতে দেওয়া হত না, বলা যায় প্রায় তালাবদ্ধ করে রাখা হত (পৃঃ ৪৬৫)। কোন অল্পবয়সী স্ত্রী তার স্বামীকে না জানিয়ে বাড়ির বাইরে গেলে সেটাকে অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার বলে মনে করা হত, আর বস্তুত তারা বাড়ির বাইরে প্রায় বেরোতই না ; ফলে, নিজের ক্রীতদাসীদের সঙ্গেই তাকে দিন কাটাতে হত ; তার স্বামী ইচ্ছে করলে তাকে বাড়ির মধ্যে কয়েদ করেও রাখতে পারত (পৃঃ ৪৬৬) ;

কতকগুলো উৎসবে শুধু মেয়েরাই যোগ দিতে পারত, পুরুষরা নয় ; সেইসব উৎসবের সময় মেয়েরা পরস্পরকে জানার কিছুটা সুযোগ পেত, তাই এই উৎসগুলো তারা উপভোগ করত প্রাণভরে ; নানান বিধিনিষেধের দরুণ মেয়েদের পক্ষে বাড়ির বাইরে বেরোনোটা ছিল নিতান্তই দুষ্কর ; স্বামীর দ্বারা নিয়োজিত একজন ক্রীতদাসীকে সঙ্গে না নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোনোর কথা কোন অভিজাত মহিলা ভাবতেও পারত না (পৃঃ ৪৬৯) ; এইসব বিধিনিষেধের ফলে মেয়েরা হয়ে উঠত অত্যধিক লাজুক, বেশি-রকম শালীনতার ভান করাটা হয়ে উঠত তাদের মজ্জাগত, এমনকি কোন বিবাহিতা মহিলাকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কোন পুরুষ হঠাৎ দেখে ফেললে মহিলাকে লজ্জায় একেবারে জড়োসড়ো হয়ে যেত (পৃঃ ৪৭১) ; ঈশ্বর, রাষ্ট্র আর পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য পালনের স্বার্থে সন্তান উৎপাদনের জন্যই বিবাহ করাটাকে একটা প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে করত গ্রীকরা ; কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিবাহকে এর থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত না, প্রণয়ঘটিত বিবাহের ঘটনাও ছিল নিতান্তই নগণ্য (পৃঃ ৪০৩) ; অনুরাগের উৎস ছিল যৌনকামনা এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেহজ ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কের স্থান ছিল না (পৃঃ ৪৭৩) ; এথেন্সে এবং সম্ভবত গ্রীসের অন্যান্য রাষ্ট্রেও বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করা হত সন্তান উৎপাদনকেই, পাত্রীর সঙ্গে আগে থেকে জানা পরিচয় থাকার, অন্তত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার কোন প্রয়োজনই হত না ; পাত্রীর নিজস্ব গুণাগুণের থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব পেত তার তার পরিবারের অবস্থা, প্রদত্ত যৌতুকের পরিমাণ ইত্যাদি ; এ-রকম বিবাহে সত্যি-কারের ভালবাসা গড়ে ওঠা খুবই কঠিন, তাই স্বাভাবিকভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিস্পৃহতা, ঔদাসীন্য ও অসন্তোষ জন্ম নিত বহু ক্ষেত্রেই (পৃঃ ৪৭৭) ; গৃহকর্তার সঙ্গে অন্য কোন পুরুষ আহারে না বসলে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে খেতে বসত, কারণ বারাঙ্গনা হিসেবে গণ্য হতে না চাইলে কোন নারী এমনকি তার নিজের বাড়িতেও পুরুষদের পান-ভোজনের সভায় কিংবা কোন বন্ধুর সঙ্গে স্বামীর আহার করার সময় সামনে হাজির থাকার কথা চিন্তাও করতে পারত না (পৃঃ ৪৯০) ; স্ত্রীর কাজ ছিল গৃহস্থালির কাজকর্ম দেখাশোনা করা আর সন্তানদের লালনপালন করা ; কোন একজন শিক্ষকের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত লালনপালন করতে হত পুত্রদের আর বিবাহের আগে পর্যন্ত কন্যাদের ; কোন স্ত্রী তার স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গ করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত ; নারীদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য নারীরা রীতিলঙ্ঘন করার সুযোগ খুব একটা পেত না ঠিকই, কিন্তু তাসত্ত্বেও তারা নানাভাবে স্বামীদের প্রতারিত করার উপায় খুঁজে নিত ; সচ্চরিত্র সংক্রান্ত আইনটা ছিল নিতান্তই একপেশে, কেননা স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীরা চাইত চূড়ান্ত বিশ্বস্ততা এবং স্ত্রী কোনভাবে সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তি দিত, অথচ স্বামীরা কিন্তু যখন খুশি বারাঙ্গনা বা রক্ষিতাদের সঙ্গে মিলিত হত ; পুরুষদের এই ধরনের কাজকে ঠিক সমর্থন করা না হলেও এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না এবং এগুলোর ফলে দাম্পত্য অধিকার ভঙ্গ হয় বলেও মনে করা হত না (পৃঃ ৪২৪)।

সন্তান। গ্রীকদের বিবাহপ্রথা থেকে বোঝা যায় যে সাধারণভাবে তাদের মধ্যে প্রেমের কোন অস্তিত্ব ছিল না—তবে বেশ কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। গ্রীকদের বিচারে নারীদের যাবতীয় যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি ছিল শারীরিক গুণাগুণ। কাজেই তাদের বিবাহের পিছনে আবেগের কোন স্থান ছিল না, প্রয়োজনের তাগিদে এবং কর্তব্যপালনের খাতিরেই তারা বিবাহ করত। ইরোকোয়া এবং আজ্‌টেকরাও বিবাহকে এই চোখেই দেখত। এই দৃষ্টিভঙ্গীটা আসলে বর্বর যুগেরই ফসল এবং এ থেকে গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর পূর্বপুরুষদের বর্বরসুলভ অবস্থাটা ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, গ্রীক সভ্যতা যখন মধ্য গগনে, তখনও তাদের পারিবারিক সম্পর্কের ধারণার পিছনে এই দৃষ্টিভঙ্গীই চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বস্তুতপক্ষে, সম্পত্তির উদ্ভব এবং সেই সম্পত্তি নিজের সন্তানদের হাতে তুলে দিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই জন্ম দেয় একবিবাহের। একবিবাহের ফলে সুনিশ্চিত হত বৈধ উত্তরাধিকার এবং বিবাহিত দম্পতির প্রকৃত সন্তানরাই শুধু বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হত। জোড়-বাঁধা পরিবারের আমলেই সন্তানদের পিতৃত্ব নিরূপণ করা অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল (গ্রীকদের ঐ পারিবারিক ধাঁচটাও গড়ে উঠেছিল জোড়-বাঁধা পরিবার থেকেই), কিন্তু পুরনো আমলের বিবাহপ্রথা তখনও পর্যন্ত আংশিকভাবে চালু থাকার দরুন পিতৃত্ব নিরূপণের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যেত না। তার জন্যই বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে দেখা দিয়েছিল এক নয়া রীতি—বাইরের জগৎ থেকে স্ত্রীদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। আসলে ঐ সময়ে স্ত্রীদের এইভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার একটা প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই ছিল। আর এই প্রয়োজনটা ছিল এতই মারাত্মক ধরনের যার দরুন সভ্য যুগের গ্রীকদের পারিবারিক জীবন মূলত নারীদের প্রায় বন্দিনী করে রাখার আর বিধিনিষেধের বেড়াজালে বেঁধে রাখার একটা ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল। আমাদের উল্লিখিত তথ্যগুলো প্রধানত সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, এই মনোভাবটা ছড়িয়ে পড়েছিল সকলকার মধ্যেই।

এবার একটু রোমান পরিবারগুলোর দিকে নজর দেওয়া যাক। এদের মেয়েরা কিছুটা অনুকূল পরিবেশ পেত ঠিকই, কিন্তু তাদের পরাধীনতা ছিল একই রকম।

এথেন্সের মত রোমেও মেয়েদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করা হত, কিন্তু রোমান পরিবারে মেয়েদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব ছিল অনেক বেশি। পরিবারের কর্ত্রী ছিল মেয়েরাই। তারা অবাধে বাড়ির বাইরে যেতে পারত, স্বামীরা তাতে কোন আপত্তি করত না। নাট্যশালায় এবং বিভিন্ন উৎসবের ভোজসভাতেও তারা যোগ দিত পুরুষদের সঙ্গে। বাড়িতে তাদের কোন বিশেষ মহলের মধ্যে আটকে থাকতে হত না, পুরুষদের আসরেও তারা হাজির থাকতে পারত। গ্রীক নারীদের মত জঘন্য বিধিনিষেধ রোমান নারীদের ওপর না থাকার ফলে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মর্যাদা ও স্বাধীনতাবোধ গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল অনেক বেশি। প্লুটার্ক বলেছেন, স্যাবাইন নারীদের হস্তক্ষেপের ফলে স্যাবাইনদের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর রোমের নারীরা নানারকম সম্মানের অধিকারিণী হয়েছিল। রাস্তায় সামনাসামনি পড়ে গেলে পুরুষরা তাদের পথ ছেড়ে দিত; নারীদের সামনে পুরুষরা কোন অশালীন শব্দ উচ্চারণ করতে কিংবা নগ্ন

অবস্থায় নারীদের সামনে যেতে পারত না।[১] তবে বিবাহের পর নারীরা থাকত স্বামীর অধীনে (in manum viri)। নারীদের স্বামীর অধীনে রাখার ধারণাটা গড়ে উঠেছিল প্রয়োজনের খাতিরেই—বিবাহের পর তারা মুক্তি পেত পিতার কর্তৃত্ব থেকে। স্ত্রীদের সঙ্গে স্বামীরা সমকক্ষের মত আচরণ করত না, আচরণ করত কন্যার সঙ্গে পিতার মত। তাছাড়া, স্ত্রী ব্যভিচার করলে তাকে সংশোধন করার এবং প্রয়োজনে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারও থাকত স্বামীদের। তবে এই শেষ অধিকারটা প্রয়োগ করার জন্য সম্ভবত স্ত্রীর গোত্রের পরিষদের সর্বসম্মত মতামত নিতে হত।

রোমানদের মধ্যে তিন ধরনের বিবাহ চালু ছিল, যেটা অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় নি। এই তিন ধরনের বিবাহেই স্ত্রীকে তুলে দেওয়া হত স্বামীর হাতে এবং বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে মনে করা হত বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক মারফৎ সন্তান উৎপাদনকে liberorum gucrendorum causa)।[২] বিবাহের এই রূপগুলো (covfarreation coemptio এবং usns) রোমান প্রজাতন্ত্রের সমগ্র যুগটা জুড়েই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের যুগে এসে এগুলো আর টিকে থাকতে পারেনি। এই যুগে দেখা দেয় বিবাহের চতুর্থ রূপঃ অবাধ বিবাহ। এই রূপটা সাধারণভাবে গৃহীত হয়, কারণ অবাধ বিবাহে স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্বাধীন করা হত না। স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছে করলে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারত (এই ব্যাপারটা একেবারে প্রথম থেকেই চালু ছিল)। বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানোর এই অধিকার ছিল জোড়-বাঁধা পরিবারের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, এবং সম্ভবত সেখান থেকেই অধিকারটা এসে পৌঁছেছিল পরবর্তী যুগে। তবে গণতন্ত্রের জমানা শেষ হওয়ার কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা প্রায় ঘটতো না বললেই চলে।[৩]

১। "ভিট. রোম," পৃঃ ২০.

২। Quinctilian.

৩। দাম্পত্য জীবনে রোমান নারীদের বিশ্বস্ততা প্রসঙ্গে বেকার মন্তব্য করেছেন, "একেবারে গোড়ার দিকে নারী বা পুরুষ কেউই খুব একটা অনাচার করত না।" যদিও কথাটা নেহাতই অনুমান মাত্র। কিন্তু, "যখন নৈতিকতার অবনতি ঘটতে শুরু করল, ভাঙন ধরল এই বিশ্বস্ততাতেও। নারী-পুরুষ একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে লাগল উচ্ছৃঙ্খলতায়। নারীদের নিজস্ব লজ্জাবোধ কমতে শুরু করল, বেড়ে উঠল বিলাসিতা আর অসংযম। তাঁর নিজের পূজারিনীদের (Bacchis) সম্বন্ধে ক্লিটিফো যে অভিযোগ করেছিলেন (Ter., "Heaut.," ii, ১,১৫), তা অনেক নারীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ছিল: "Mca est petax, pracax, magnifica, sumptuous, nobilis।" স্বামীদের অবহেলার জবাবে অনেক রোমান মহিলাই কোন একজন পুরুষকে নিজের প্রণয়ী হিসেবে গ্রহণ করত। এই প্রণয়ীটি ঐ মহিলার, প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অছিলায় সারাক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। এর ফলস্বরূপ অবিবাহিত পুরুষদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছিল আর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে উঠেছিত নিতান্ত সাধারণ ঘটনা।" —গ্যালাস, "এক্সকার্সাস," i, পৃঃ ১৫৫, লংম্যান সংস্করণ, মেট্‌কাফের অনুবাদ।

সভ্যতার চরম উন্নতির সময় গ্রীস ও রোমের নগরগুলোতে যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকোপ দেখা গিয়েছিল, সেটাকে সাধারণত উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর সদাচার এবং নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতি বলেই মনে করা হয়। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। ব্যাপারটাকে অন্যরকম-ভাবে, অন্তত কিছুটা পরিবর্তিত রূপে, ব্যাখ্যা করাই যায়। প্রকৃতপক্ষে, নারী-পুরুষের মিলনের ব্যাপারে তারা কখনোই কোন বিশুদ্ধ নৈতিকতার স্তরে উন্নীত হতে পারে নি, ফলে বিচ্যুতি বা অবনতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। নানান যুদ্ধবিগ্রহের দরুন জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতাটা সাময়িকভাবে অবদমিত বা কিছুটা প্রশমিত হত ঠিকই, কিন্তু শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা বেড়ে উঠত, কারণ এই উচ্ছৃঙ্খলতার মূলোচ্ছেদ করার মত নৈতিক উপাদান সমাজের মধ্যে তখনও পর্যন্ত গড়েই ওঠেনি। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল সম্ভবত তাদের প্রাচীন দাম্পত্য ব্যবস্থারই স্মারক। এই উচ্ছৃঙ্খলতা তাদের জীবন থেকে কখনোই পুরোপুরি দূর হয়নি। বর্ব্বর যুগ থেকেই একটা সামাজিক কলঙ্ক হিসেবে চালু থেকেছে উচ্ছৃঙ্খলতা, তারপর সভ্যতার যুগে এসে বণিকাগমনের নতুন পথ বেয়ে তা আরও বেড়ে উঠেছে। স্ত্রীদের বাড়ির অন্দরমহলে আটকে না রেখে কিংবা নিজেদের অধীন করে না রেখে গ্রীক ও রোমানরা যদি একবিবাহের অন্তর্নিহিত সমকক্ষতাকে মর্যাদা দিতে শিখত, তাহলে তাদের সমাজব্যবস্থার আদল অনেকটাই বদলে যেত। গ্রীক বা রোমানদের নীতিবোধ আর উন্নত হয়নি বলে জনজীবনে নৈতিকতার কোনরকম স্খলন দেখেই তারা বিচলিত হত না। আসল কথা হল গ্রীস বা রোম কোন জায়গাতেই একবিবাহের নীতি সামগ্রিকভাবে স্বীকৃত হয় নি, অথচ কেবলমাত্র একবিবাহই তাদের নিজ নিজ সমাজকে একটা মজবুত নৈতিক বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলতে পারত। ইতিহাসের এই বিশিষ্ঠ জাতিগুলোর অকাল পতনের একটা বড় কারণ হচ্ছে নারীদের মানসিক, নৈতিক ও সংরক্ষণপ্রবণ ক্ষমতার বিকাশ না ঘটানো এবং তা ব্যবহার না করা। প্রগতির জন্য এবং টিকে থাকার জন্য নারীদের এই ক্ষমতাগুলো কাজে লাগানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুদীর্ঘকাল বর্বরতার-অবস্থায় থাকার পর (এই অবস্থার মধ্যেই তারা সভ্যতার বাকি উপাদানগুলো অর্জন করেছিল), একটা অল্পকাল স্থায়ী উজ্জ্বল অধ্যায় পার হয়ে, রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তারা। নতুন জীবনে পা রাখার অতিরিক্ত উল্লাসই এর কারণ ছিল বলে মনে হয়।

হিব্রুদের মধ্যে প্রথম দিকে পিতৃপ্রধান পরিবারই চালু ছিল। অতঃপর তাঁর বদলে গড়ে ওঠে একাবিবাহভিত্তিক পরিবার এবং মানুষের মধ্যে তা বেশ চালু হয়ে ওঠে। কিন্তু এদের এই পরিবারের গঠনকাঠামো বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের হাতে তথ্য খুবই কম।

দৃষ্টান্ত আর না বাড়িয়েও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় একটা নিম্নতর রূপ থেকেই গড়ে উঠেছিল একবিবাহভিত্তিক বিবাহের নির্দিষ্ট রূপটা। ধ্রুপদী যুগে (elassibal period) এই পরিবার যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠেছিল, তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় নি তখনও। আগের যুগের জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যে থেকেই যে গড়ে উঠেছিল এই পরিবার, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নত হয়ে উঠছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারও। কিন্তু ধ্রুপদী যুগে এসে

নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সরে যায় এই পরিবার। সবথেকে পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠার জন্য একবিবাহভিত্তিক পরিবারকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আধুনিক কাল পর্যন্ত। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে পুরেনো আমলের লেখকরা যা লিখে গেছেন, তা থেকে জানা যায় যে সমাজে তখন একবিবাহ সাধারণভাবে চালু ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার মূল্যায়ন করলে বোঝা যায় যে আসলে বিভিন্ন প্রভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছিল ভবিষ্যতের একবিবাহভিত্তিক পরিবার। এই পরিবারের জীবনীশক্তি, অধিকার এবং নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা ছিল খুবই কম। তাছাড়া, প্রাচীন দাম্পত্য ব্যবস্থার নানান অবশেষ তখনও পর্যন্ত মধ্যে এর বিদ্যমান ছিল।

মালয়ী জ্ঞাতি-ব্যবস্থার মধ্যে যেমন অভিব্যক্ত হত ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্কগুলো, তুরানিয় জ্ঞাতি-ব্যবস্থার মধ্যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্ক-গুলো,—ঠিক তেমনি আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থার মধ্যে অভিব্যক্ত হত একবিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্কগুলো তিনটি আলাদা ধরনের বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে উঠত এই তিন ধরনের পরিবার।

আর্য, সেমিটিক ও উরালিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে আগে তুরানিয় জ্ঞাতি-ব্যবস্থাই চালু ছিল এবং একবিবাহের প্রচলন হওয়ার পর তা বাতিল হয়ে যায়—এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা আমাদের আজকের জ্ঞানে সম্ভব নয়। তবে, আমাদের জানা তথ্যগুলো এই দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। আমাদের প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য-প্রমাণের অভিমুখ সুস্পষ্টভাবেই এই সিদ্ধান্তমুখী, ফলে অন্য কোন সম্ভাবনার কথা অনায়াসেই বাতিল করে দেওয়া যায়। প্রথমত, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেই নিহিত ছিল গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার বনিয়াদ, কারণ সেখানে পরস্পরের স্বামীদের সঙ্গে বিবাহিতা একদল বোন এবং তাদের সন্তান ও স্ত্রী-ধারার বংশধরদের নিয়ে গড়ে উঠত প্রাচীন ধরনের গোত্রের সম্পূর্ণ কাঠামো। আর্যদের প্রধান প্রধান শাখা গুলোর কথা যখন প্রথম জানা যায়, তখন তারা প্রত্যেকেই গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই আরও জোরদার হয়ে ওঠে যে একটা অবিভক্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে থাকার সময় আর্যরা সংগঠিত ছিল গোত্রের ভিত্তিতেই। এ থেকেই আবার অনুমান করা চলে যে এই সংগঠন তারা তাদের বহু আগেকার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল যারা নিজেরাও বসবাস করত দলগত বিবাহের অবস্থাতে। এই দলগত বিবাহই জন্ম দিয়েছিল গোত্রের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ও বহু-বিস্তৃত প্রতিষ্ঠানের। তাছাড়া, আমেরিকার আদিবাসীদের প্রাচীন ধরনের গোত্রের মধ্যে আজও তুরানিয় জ্ঞাতি-ব্যবস্থা চালু আছে। এই অবস্থার অবসান ঘটানোর মত জোরদার কোন সামাজিক অবস্থাগত পরিবর্তন (একবিবাহের মত) না ঘটা পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু থাকবে। দ্বিতীয়ত, আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থার মধ্যেও এমন কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে যা এই একই সিদ্ধান্তের দিকে আঙ্গুলিনির্দেশ করে। এটা সহজেই অনুমেয় যে আর্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আগে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা চালু থেকে থাকলেও একবিবাহ প্রথা শুরু হওয়ার পর সেই জ্ঞাতি-ব্যবস্থার বেশ কিছু সম্বোধনের অস্তিত্ব থাকা আর সম্ভব ছিল না। নতুন ব্যবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের পার্থক্য

দেখাদিল, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে গেল পুরনো ব্যবস্থার সম্বোধনগুলো।
আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থার আদি সম্বোধন-তালিকার হতশ্রী অবস্থাটা ব্যাখ্যা করার এই অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্ত চাপা ছাড়া আর উপায় কী? অন্য কোন উপায় নেই। পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং পুত্র-কন্যার জন্য আর্যদের বিভিন্ন উপভাষায় একই অভিধা চালু ছিল। ভাইপো, নাতি আর খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাইদের জন্যও চালু ছিল একটিই সম্বোধন। (সংস্কৃত—নাপতার; লাতিন—নেপোস: গ্রীক—অ্যানেপ্সিওস)। জ্ঞাতি-দের সম্বোধন করার এই অল্প কয়েকটা অভিধা নিয়ে তারা কখনোই একবিবাহসৃষ্ট উন্নত অবস্থায় পৌঁছতে পারত না। এই হতশ্রী অবস্থাটাকে কেবলমাত্র আগে তুরানিয় ব্যবস্থার সদৃশ কোন জ্ঞাতি-ব্যবস্থা চালু থাকা দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। ভাই ও বোনের সম্বোধনগুলো এইসময় সৃষ্টি হয়েছিল তত্ত্বগতভাবে এবং এটা ছিল একটা নতুন ব্যাপার। কারণ তুরানিয় ব্যবস্থায় ভাইবোনের সম্পর্ককে শুধুমাত্র বয়সে বড় না ছোট—এই দিয়েই বিচার করা হত। বিভিন্ন বর্গের লোকদের ক্ষেত্রে একই অভিধা প্রয়োগ করা হত, এমনকি যারা আপন ভাইবোন নয় তাদের ক্ষেত্রেও। আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থায় এইধরনের বিভাজন আর রাখা হল না এবং এই সম্পর্কগুলোকে এই প্রথম তত্ত্বগতভাবে বিচার করা হল। একবিবাহের আমলে পুরনো সম্বোধনগুলো আর প্রযোজ্য রইল না, কেননা এগুলো কেবলমাত্র সমকক্ষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। তবে, উরালিয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এবং হাঙ্গেরিয়দের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তুরানিয় ব্যবস্থার কিছু ছাপ রয়ে গেছে। এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে ভাই বোনদের বয়সে বড় ও ছোট অনুয়ারী বিশেষ বিশেষ সম্বোধনে ডাকার রীতি চালু আছে। ফরাসীদের মধ্যে ফ্যারে (frere) এবং সউর (soeur)-এর পাশাপাশিই চালু আছে এই (aine) অর্থাৎ বড় ভাই, পুন (Pune) ও কাদেৎ (cadet) অর্থাৎ ছোট ভাই, এবং এইনে (ainee) ও কাদেতে (cadette) অর্থাৎ বড় ও ছোট বোন—এই সম্বোধনগুলো। সংস্কৃত ভাষাতেও এই সম্পর্কগুলোর ক্ষেত্রে চালু আছে অগ্রজর ও অনুজর এবং অগ্রজা ও অনুজা নামক সম্বোধন। তবে এই শেষোক্ত শব্দগুলো সংস্কৃত ভাষার না আদিবাসীদের ভাষার, তা আমি বলতে পারছি না। আর্যরা ভাই ও বোনের একই সম্বোধনগুলোকে ঠিক বিপরীত করে নিয়েছে, গ্রীকরা ফ্র্যাটার (phrater)-এর বদলে চালু করে অ্যাডেল্ফস্ (adelphos) শব্দটা। এইসব ভাষায় যদি কোন সময় বড় ও ছোট ভাইবোনের জন্য কোন সাধারণ সম্বোধন চালু থেকে থাকে, তাহলে, আপন ভাইবোনদের ক্ষেত্রে সেগুলো আর পরবর্তীকালে প্রযোজ্য থাকতে পারে না, কারণ তখন আপন ভাইবোনরা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বর্গ হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেছে। আর্য জ্ঞাতি-ব্যবস্থা থেকে তুরানিয় জ্ঞাতি-ব্যবস্থার এই লক্ষণীয় ও চমৎকার বৈশিষ্ট্যটা বাতিল হয়ে যাওয়ার জন্য একটা জোরদার কারণ দরকার ছিল, যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় আগে তুরানিয় ব্যবস্থা চালু থাকা এবং পরে তা পরিত্যক্ত হওয়ার মধ্যেই। অন্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া মুশ্কিল। সমস্ত বন্য ও বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যেই পিতামহের সম্পর্কটা একটা স্বীকৃত সম্পর্ক। সেখানে আর্য জ্ঞাতি-গুলোর আদি ভাষায় পিতামহের জন্য কোন অভিধা না থাকাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও ঘটনা সেটাই—আর্য উপভাষাগুলোর পিতামহের জন্য কোন

সাধারণ অভিধা নেই। সংস্কৃতে বলা হয় পিতামহ, গ্রীকরা বলে প্যাপ্পোস, লাতিনে আভুস, রুশ ভাষায় দ্জেদ, ওয়েল্শ্-এ বলা হয় হেন্দাদ। শেষোক্ত শব্দটা জার্মান গ্রসভাডার (grossvader) এবং ইংরিজী গ্র্যান্ডফাদার-এর মতই একটা মিশ্র শব্দ। এই অভিধাগুলো একে অপরের থেকে পুরোপুরি আলাদা। কিন্তু পূর্বতন ব্যবস্থায় যেখানে একই সম্বোধনে সম্বোধিত করা হত নিজের পিতামহকে, তার সমস্ত আপন ভাই ও বেশ কিছু খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাইকে, এমনকি পিতামহীর সমস্ত আপন ভাই ও বেশ কিছু খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাইকেও, সেখানে একবিবাহের আমলে ঐ একই সম্বোধনের সাহায্যে নিজের পিতামহ ও পূর্বপুরুষকে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। যথাকালে ওটা পরিত্যক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। আদি ভাষায় এই সম্পর্কটার জন্য কোন অভিধা না থাকার কারণটাকে আমরা এভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি। শেষত, বিভিন্ন আর্য উপভাষায় বাবার দিকে কাকা-পিসি এবং মায়ের দিকে মামা-মাসীর জন্য কোন বিশেষ অভিধা নেই। সংস্কৃত, গ্রীক ও লাতিন ভাষায় কাকা বা জ্যাঠার প্রতিশব্দ যথাক্রমে পিতৃব্য, প্যাট্রস ও প্যাট্রাস ; স্লাভ ভাষায় এই শব্দটা হল স্ট্রিক (stryc) ; অ্যাংলো-স্যাক্সন, বেলজিয়ান এবং জার্মান ভাষায় অভিধাটা প্রায় একই, যথাক্রমে ইম (eam), উম (oom) এবং ওহিম (oheim) ; কেল্টিক ভাষায় কাকা-জ্যাঠা বোঝানোর কোন শব্দই নেই। বর্বর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে সম্পর্কটা অত্যন্ত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল গোত্রের কল্যাণে, সেই কাকা সম্পর্কটার জন্য আদি আর্য ভাষায় কোন অভিধা থাকবে না—এটা ভাবাও যায় না। তাদের আগেকার জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা যদি তুরানিয় ধাঁচের হয়ে থাকে, তাহলে তখন মামার জন্য একটা নির্দিষ্ট সম্বোধন নিশ্চয়ই ছিল। তবে সেই সম্বোধনটা প্রযোজ্য হত শুধু মায়ের আপন ভাই আর কয়েকজন জ্ঞাতি-ভাইয়ের ক্ষেত্রেই। একই সঙ্গে যতজনকে এই সম্বোধনের সাহায্যে সম্বোধিত করা হত, তাদের মধ্যে অনেকেই একবিবাহের আমলে আর মামার পদবাচ্য হতে পারত না। ফলে পরিত্যক্ত হয়েছিল সম্বোধনটা। সব কিছু মিলিয়ে স্পষ্টই বোঝা যায় যে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার আগে কোন-না-কোন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই চালু ছিল।

আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় বর্গের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আগে তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থাই চালু ছিল ধরে নিলে, তা থেকে একটা বর্ণনাত্মক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার রূপান্তরকে নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা বলে বুঝে নিতে মোটেই অসুবিধে হয় না। একবিবাহপ্রথা চালু হওয়ার পর যখন পুরনো জ্ঞাতিত্বব্যবস্হা আর নতুন বংশধারার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছিল না, তখনই ঘটেছিল এই রূপান্তরটা। একবিবাহের আওতায় প্রতিটি সম্পর্কই সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। এই পরিস্হিতিতে গড়ে ওঠা নতুন জ্ঞাতিত্বব্যবস্হার বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হত এক একটা মৌলিক সম্বোধনে কিংবা কয়েকটা মৌলিক সম্বোধনের সমন্বয়ে। যেমন, ভাইয়ের ছেলে ভাইপো, বাবার ভাই কাকা বা জ্যাঠা, বাবার ভাইয়ের ছেলে খুড়তুত বা জ্যাঠতুত ভাই। আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় গোষ্ঠীগুলোর বর্তমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্হার আদি ধাঁচটা এ-রকমই ছিল। এদের বর্তমান ব্যবস্হায় যে সাধারণীকরণগুলো এখন দেখা যায়, সেগুলো সবই পরবর্তীকালের সংযোজন। কোন একজন লোকের সঙ্গে অপর একজনের কী সম্পর্ক—এ প্রশ্নের জবাবে তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব-

ব্যবস্থাবিশিষ্ট সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরা একইভাবে উত্তর দিয়ে থাকে। খুব সম্ভবত আর্য ধাঁচের একটা বর্ণনাত্মক ব্যবস্থার অস্তিত্ব তুরানিয় ও মালয়ী ব্যবস্থার মধ্যে বরাবরই ছিল। না, কোন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা হিসেবে সেটা চালু ছিল না, কারণ একটা স্থায়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা তো সক্রিয়ই ছিল। আসলে ঐ বর্ণনাত্মক ব্যবস্থাটাকে কাজে লাগানো হত সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য। তাদের সম্বোধন-তালিকার হতশ্রী অবস্থাটা থেকে সহজেই বোঝা যায় আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় গোষ্ঠীগুলো পূর্বতন কোন-না-কোন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে অবশ্যই বাতিল করেছিল। কাজেই আমরা সঙ্গত-ভাবেই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, একবিবাহভিত্তিক পরিবার সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই জাতিগুলো তুরানিয় ব্যবস্থার মধ্যে বরাবর বিদ্যমান পুরনো বর্ণনাত্মক ধরনটা গ্রহণ করেছিল এবং নতুন বংশধারার সঙ্গে বেমানান বলে পুরনো জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থাটাকে পরিত্যাগ করেছিল। তুরানিয় ব্যবস্থা থেকে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় রূপান্তরের এটাই ছিল স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী পদ্ধতি। আর এ থেকে আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উৎপত্তি ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোরও একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সঙ্গে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের সম্পর্কের চিত্রায়ণ সম্পূর্ণ করার জন্য আগের দুটো ব্যবস্থার মত এই ব্যবস্থাটা নিয়েও একটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

বিভিন্ন আর্য উপভাষায় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার রূপের তুলনা করলে দেখা যায়—বর্তমান ব্যবস্থার আদি রূপটা ছিল পুরোপুরিই বর্ণনাত্মক।[১] একান্তই আর্য ধাঁচের আর্য ভাষায় (স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম পার্বত্যাঞ্চলে বা আয়ার্ল্যাণ্ডে ব্যবহৃত গেলিক ভাষা) এবং একান্তই উরালিয় ধাঁচের এস্তোনিয়ান ভাষায় এই ব্যবস্থাটা এখনও বর্ণনাত্মকই রয়ে গেছে। আর্য ভাষায় রক্তসম্পর্ক বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র প্রাথমিক কিছু সম্বোধনই, অর্থাৎ বাবা-মা, ভাই-বোন এবং পুত্র-কন্যা, এগুলোই চালু আছে। বাকি সমস্ত জ্ঞাতিদের চিহ্নিত করা হয় এই সম্বোধনগুলোর সাহায্যেই, তবে তা শুরু হয় উল্টো দিক থেকে—ভাই, ভাইয়ের পুত্র, ভাইয়ের পুত্রের পুত্র ইত্যাদি। আর্য জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার মধ্যে একবিবাহের অন্তর্গত প্রকৃত সম্পর্কগুলো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং এই ব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হয় যে সন্তানদের পিতৃপরিচয়টা সঠিকভাবে জানা আছে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেল্টিক পদ্ধতির থেকে পৃথক একটা বর্ণনাপদ্ধতি নতুন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে এই পদ্ধতি ঐ ব্যবস্থার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন পরিবর্তন ঘটায় নি। বংশধারা নির্ণয়ের নিয়মকানুনের কাঠামোটা যথাযথ করে তোলার জন্যই এ কাজটা করেছিলেন রোমের পৌরপিতারা এবং তার জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। যে-সব আর্য গোষ্ঠীর মধ্যে রোমানদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, তারাও এই উন্নত পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিল। স্লাভদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো স্পষ্টতই তুরানিয় ব্যবস্থার লক্ষণ।[২] আমাদের বর্তমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা ঐতিহাসিক ধারণা পেতে হলে রোমিয় সমাজপিতাদের দ্বারা যথাযথ হয়ে

১। সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি, সারণী ১, পৃঃ ৭৯.
২। ঐ, পৃঃ ৪০.

ওঠা রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার দিকেই তাকাতে হবে।[১] সংযোজন করা হয়েছিল খুব অল্পই, কিন্তু সেটুকুই জ্ঞাতিদের বর্ণনা দেওয়ার পদ্ধতিটাকে পাল্টে দিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে যে এই পরিবর্তনগুলো ঘটানো হয়েছিল মূলত বাবার ভাই-বোনের থেকে মায়ের ভাই-বোনদের পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য এবং এই সম্পর্কগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট অভিধাও উদ্ভাবিত হয়েছিল. আর সেই সঙ্গেই পৌত্রের (nepos) বিপরীত অভিধা হিসেবে একটা সম্বোধন উদ্ভাবিত হয়েছিল পিতামহকে চিহ্নিত করার জন্য। এইসব অভিধা এবং প্রাথমিক অভিধাগুলোর সাহায্যে (এবং উপযুক্ত ধাতুরূপ ইত্যাদি সহযোগে) তারা বংশগত এবং জ্ঞাতিত্বের প্রথম পাঁচটি ধারার সম্পর্ককে প্রণালীবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল, যার অন্তর্ভুক্ত হত প্রতিটি ব্যক্তির সমস্ত জ্ঞাতিরাই। একবিবাহের আমলে আজ পর্যন্ত যত ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা দেখা গেছে, তার মধ্যে সবথেকে নিখুঁত এবং সবথেকে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছিল রোমানরাই। দাম্পত্য সম্পর্ককে অভিব্যক্ত করার মত বেশ কিছু অভিধা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য এদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আমাদের নিজেদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে (যা রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বিশেষত্বগুলো গ্রহণ করেছে) বোঝার জন্য অ্যাংলো-স্যাক্সন বা কেল্টিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার থেকে রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা অনেক বেশি সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। আর্য এবং সেমিটিক জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার নমুনা হিসেবে যথাক্রমে লাতিন ও আরবী ব্যবস্থার সম্পর্কগুলোর একটা সারণী এই পরিচ্ছেদের শেষে দেওয়া হল। আরবী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মত একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে এবং তার ফলাফলও হয়েছে একইরকম। তাই এখানে আমরা শুধুমাত্র রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা নিয়েই আলোচনা করছি।

বংশগত ধারায় কোন ব্যক্তির থেকে শুরু করে তার প্রপিতামহ (tritavus) পর্যন্ত ছয়টি ঊর্ধমুখী প্রজন্ম এবং তার থেকে শুরু করে তার প্রপৌত্রের প্রপৌত্র (trinepos) পর্যন্ত ছয়টি নিম্নমুখী প্রজন্ম দেখা যায়। এগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য মাত্র চারটি মূল সম্বোধন ব্যবহার করা হয়। ষষ্ঠ পূর্বপুরুষের থেকেও আগেকার প্রজন্মকে চিহ্নিত করার দরকার হলে ঐ 'ট্রাইটেভাস' অভিধাটাকেই সম্পর্ক চিহ্নিতকরণের সূচনাবিন্দু বলে ধরা হত। যেমন, ট্রাইটেভাসের পিতা হচ্ছেন 'ট্রাইটৌভি প্যাটার।' এইভাবে এগোতে এগোতে বংশগত পুরুষধারায় কোন ব্যক্তির দ্বাদশতম পূর্বপুরুষ চিহ্নিত হতেন 'ট্রাইটৌভি ট্রাইটেভাস' নামে। আমাদের সম্বোধনতালিকা অনুযায়ী ঐ সম্পর্কটা ব্যক্ত করার জন্য বা তাঁর পরিচয় দেওয়ার জন্য পিতামহের পিতামহ কথাটাকে ছয়বার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। একইভাবে, বংশের নিম্নমুখী পুরুষধারায় কোন ব্যক্তির দ্বাদশতম বংশধর চিহ্নিত হয় 'ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস' নামে।

পুরুষধারায় জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারিটা শুরু হয় 'ফ্র্যাটার' (frater) অর্থাৎ ভাই দিয়ে। তারপর সারিটা এগোয় এইভাবে : 'ফ্র্যাট্রিস ফিলিয়াস' অর্থাৎ ভাইয়ের পুত্র, 'ফ্র্যাট্রিস নেপোস' অর্থাৎ ভাইয়ের পৌত্র, 'ফ্র্যাট্রিস প্রোনেপোস' অর্থাৎ ভাইয়ের প্রপৌত্র, এবং এইভাবে গিয়ে পৌঁছয় 'ফ্র্যাট্রিস ট্রাইনেপোস' অর্থাৎ ভাইয়ের প্রপৌত্রের

১। "প্যান্‌ডেক্টস্", lib xxviii, tit. x, এবং জাস্টিনিয়ান-এর 'ইনস্টিটিউটস্", lib iii. tit. vi.,

প্রপৌত্র পর্যন্ত। এই সারিকে দ্বাদশতম বংশধর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হলে ফ্র্যাট্রিস ট্রাইনেপোসকে ধরা হত দ্বিতীয় সূচনাবিন্দু হিসেবে এবং সারির একেবারে শেষে গিয়ে সম্বোধনটা দাঁড়ায় 'ফ্র্যাট্রিস ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস'-এ। এই সহজ-সরল পদ্ধতিতে 'ফ্র্যাটার' অর্থাৎ ভাই-ই হচ্ছে এই সারির বংশধারার উৎসস্থল এবং সারির সমস্ত লোককে তার সঙ্গে সম্পর্কিত করেই চিহ্নিত করা হয়। ফলে এইভাবে বর্ণিত প্রতিটি ব্যক্তিকে জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারির পুরুষধারার সদস্য বলে চিনে নিতে আমাদের কোন অসুবিধেই হয় না। তাই এই পদ্ধতিটিকে আমরা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বলে ধরে নিতে পারি। একইভাবে, জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারির স্ত্রী-ধারাটা শুরু হয় 'সোরোর' (soror) অর্থাৎ বোন থেকে, তারপর সারিটা এগোয় এইভাবেঃ 'সোরোরিস ফিলিয়া' অর্থাৎ বোনের কন্যা, 'সোরোরিস নেপ্‌টিস' অর্থাৎ বোনের দৌহিত্রী, 'সোরোরিস প্রোনেপ্‌টিস' অর্থাৎ বোনের প্রদৌহিত্রী, এবং এইভাবে এগোতে এগোতে 'সোরোরিস ট্রাইনেপ্‌টিস' অর্থাৎ বোনের ষষ্ঠ বংশধর এবং 'সোরোরিস ট্রাইনেপ্‌টিস ট্রাইনেপ্‌টিস' অর্থাৎ বোনের দ্বাদশতম বংশধর পর্যন্ত পৌঁছে যায় সারিটা। জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারির দুটো শাখা সঠিক অর্থে 'প্যাটার' অর্থাৎ পিতার থেকে শুরু হলেও এবং সেটা এই দুটো শাখার মধ্যেকার সংযোগসূত্র হয়ে থাকলেও, বংশধারার ক্ষেত্রে ভাই ও বোনদের বংশের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে শুধু মূল বংশধারাটাই যে আলাদা আলাদা থাকে তা-ই নয়, সেই সঙ্গেই আলাদা আলাদা থাকে তার দুটো শাখাও, এবং যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্কও সুনির্দিষ্ট থাকে। এটা হচ্ছে এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান গুণ, কারণ জ্ঞাতিত্ব নির্ধারণ করার ও জ্ঞাতিদের বর্ণনা দেওয়ার পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে এই নিয়মটা জ্ঞাতিত্বের সমস্ত সারির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারিতে পিতার দিকে পুরুষধারায় সারিটা শুরু হয় 'প্যাট্রুস' অর্থাৎ পিতার ভাইকে দিয়ে এবং এই সারির মধ্যে ঐ ভাই আর তার বংশধররা থাকে। নির্দিষ্ট অভিধার সাহায্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তার সঙ্গে সম্পর্কটাও চিহ্নিত করা হয় সুনির্দিষ্টভাবে। সারিটা এরকমঃ 'প্যাট্রুই ফিলিয়াস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের পুত্র, 'প্যাট্রুই নেপোস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের পৌত্র, 'প্যাট্রুই প্রোনেপোস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের প্রপৌত্র এবং এইভাবে 'প্যাট্রুই ট্রাইনেপোস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের ষষ্ঠ বংশধর পর্যন্ত এগোয়। এই সারিটাকে দ্বাদশতম প্রজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত করতে হলে, অন্তর্বর্তী প্রজন্মগুলো পার হয়ে অভিধটা গিয়ে পৌঁছয় 'প্যাট্রুই ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস' পর্যন্ত, যে হচ্ছে পিতার ভাইয়ের প্রপৌত্রের প্রপৌত্রের প্রপৌত্রের প্রপৌত্র। একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল— 'প্যানডেক্টস'-এ ব্যবহৃত পদ্ধতিতে খুড়তুত-জ্যাঠতুত প্রভৃতি জ্ঞাতিভাইদের জন্য কোন আলাদা অভিধা রাখা হয় নি। তাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে 'প্যাট্রুই ফিলিয়াস' অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের পুত্র হিসেবে। কিন্তু এদেরকে 'ফ্র্যাটার প্যাট্রুয়েলিস' অর্থাৎ খুড়তুত বা জ্যাঠতুত ভাই-ও বলা হত, আর সাধারণ মানুষরা সাধারণত ব্যবহার করত 'কনসোব্রিনাস' (consobrinus) সম্বোধনটা, যা থেকে ইংরিজি 'কাজিন' (cousin) শব্দটা এসেছে।[১] জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারিতে পিতার দিকের স্ত্রী-ধারাটা

শুরু হয় 'অ্যামিতা' অর্থাৎ পিতার বোন বা পিসির থেকে। তাঁর বংশধরদেরও চিহ্নিত করা হয় একইভাবে: 'অ্যামিতে ফিলিয়া' অর্থাৎ পিতার বোনের মেয়ে, 'অ্যামিতে নেপ্‌টিস' অর্থাৎ পিতার দৌহিত্রী। এইভাবে এগোতে এগোতে ষষ্ঠ বংশধর চিহ্নিত হয় 'অ্যামিতে ট্রাইনেপ্‌টিস' নামে এবং দ্বাদশতম বংশধর 'অ্যামিতে ট্রাইনেপ্‌টিস ট্রাইনেপ্‌টিস' নামে। এই শাখাতেও পিসতুত বোনকে বর্ণনাত্মক 'অ্যামিতে ফিলিয়া' নামেই উল্লেখ করা হয়েছে, লোকের মধ্যে চালু 'অ্যামিতিনা' সম্বোধনটি উল্লিখিত হয় নি।

একইভাবে জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারিতে পিতার দিকে পুরুষধারাটা শুরু হয় পিতামহের ভাইকে দিয়ে। এঁকে বলা হয় 'প্যাট্রুস ম্যাগ্‌নাস' (Patruus magnus) বা বড় জ্যাঠা। এই জায়গায় এসে সম্বোধন-তালিকায় নির্দিষ্ট অভিধা আর দেখা যায় না, ব্যবহৃত হয় মিশ্র সম্বোধন—যদিও সম্পর্কটা নির্দিষ্টই থাকে। তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট আধুনিক কাল পর্যন্ত এই সম্পর্কটাকে যে আলাদা করে দেখা হত না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যতদূর জানা গেছে তা থেকে দেখা যায় যে বিদ্যমান কোন ভাষাতেই এই সম্পর্কটাকে চিহ্নিত করার উপযোগী কোন যথাযথ অভিধা নেই, অথচ এই সম্পর্কটাকে চিহ্নিত করতে না পারলে জ্ঞাতিত্বের এই তৃতীয় সারিটাকেও চিহ্নিত করা যায় না (একমাত্র কেল্টিক পদ্ধতি বাদে)। তাঁকে স্রেফ 'পিতামহের ভাই বলা হলে একজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় ঠিকই, কিন্তু সম্পর্কটা তাতে পুরোপুরি ব্যক্ত হয় না, সেটা ধরে নিতে হয়। কিন্তু তাঁকে বড় জ্যাঠা (great uncle) বলা হলে সম্পর্কটা একটা নির্দিষ্ট আদল পায়। এই সারির প্রথম ব্যক্তিটিকে এইভাবে নির্দিষ্ট করার পর তাঁকেই ঐ বংশধারার মূল উৎস ধরে নিয়ে তাঁর বংশধরদের পরিচয় উল্লিখিত হয় তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে। আর তার ফলে প্রতিটি ব্যক্তি কোন্ সারির, কোন্ ধারার, কোন্ বিশেষ শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং তার সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক কী—তা-ও চিহ্নিত হয়ে যায় সুস্পষ্টভাবে। এই সারিটাকেও দ্বাদশতম বংশধর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায়। সারিটা দাঁড়ায় এ-রকম: 'প্যাট্রুই ম্যাগ্‌নি ফিলিয়াস' অর্থাৎ পিতামহের ভাইয়ের পুত্র, তারপর 'প্যাট্রুই ম্যাগ্‌নি নেপোস'; ষষ্ঠ বংশধর 'প্যাট্রুই ম্যাগ্‌নি ট্রাইনেপোস' এবং দ্বাদশতম বংশধর 'প্যাট্রুই ম্যাগ্‌নি ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস'। এই সারির স্ত্রীধারাটা শুরু হয় পিতামহের বোন 'অ্যামিতা ম্যাগনা'-কে দিয়ে, যাঁকে বলা যায় পিতার পিসীমা (great paternal aunt)। তাঁর বংশধরদেরও একইভাবে চিহ্নিত করা হয়।

জ্ঞাতিত্বের চতুর্থ সারিতে পিতার দিকের পুরুষধারাটা শুরু হয় যথাক্রমে প্রপিতামহের ভাই অর্থাৎ 'প্যাট্রুস মেজর' এবং প্রপিতামহের পিতার ভাই অর্থাৎ 'প্যাট্রুস ম্যাক্সি-

১. Item fratres patrueles, sorores patrueles, id est qui quae-ve ex duobus fratribus progenerantur ; item consobrini consobrinaee id est qui quae-veex duobus sororibus nascuntur (quasi consorini) ; item amitini amitinae, id est qui quae-ve ex fratre es sorore propagantur ; sed fere vulgos istos omnes communi appellatione consobrinus vocat.—"pandects", lib. xxx viii, tit. x.

মাস'-কে দিয়ে। চতুর্থ সারি অনুযায়ী আরও এগোলে আমরা গিয়ে পেঁছই 'প্যাট্রুই মেজরিস ফিলিয়াস' হয়ে একেবারে 'প্যাট্রুই মেজরিস ট্রাইনেপোস' পর্যন্ত। আর পঞ্চম সারি অনুযায়ী এগোলে পেঁছনো যায় 'প্যাট্রুই ম্যাক্সিমি ফিলিয়াস' হয়ে 'প্যাট্রুই ম্যাক্সিমি ট্রাইনেপোস' পর্যন্ত। এই দুটো সারির স্ত্রী-ধারাটা শুরু হয় যথাক্রমে 'অ্যামিতা মেজর' অর্থাৎ প্রপিতামহের বোন এবং 'অ্যামিতা ম্যাক্সিমা' অর্থাৎ প্রপিতামহের পিতার বোনকে দিয়ে। এই দুটো ধারার বংশধরদেরও চিহ্নিত করা হয় একইভাবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র বাবার দিকের জ্ঞাতিত্বের সারিগুলোর কথাই বলা হয়েছে। জ্ঞাতিত্ববর্ণনার রোমান পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ করার জন্য মায়ের দিকের মামা-মাসীদের চিহ্নিত করার আলাদা আলাদা অভিধাগুলোর কথা এবার উল্লেখ করা দরকার। মায়ের দিকেও অসংখ্য জ্ঞাতি থাকে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা অভিধা আছে। যেমন, 'আভাঙকুলাস', (avunculus) অর্থাৎ মামা, 'ম্যাটারটেরা' (matertera) অর্থাৎ মাসী। মায়ের দিকের জ্ঞাতিদের বর্ণনা দেওয়ার সময় পুরুষধারার বদলে স্ত্রী-ধারা অনুসরণ করা হলেও, জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারিটা একইরকম থাকে। মায়ের দিকে জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারির পুরুষধারাটা শুরু হয় 'আভাঙকুলাস' অর্থাৎ মামাকে দিয়ে, তারপর একে একে আসে 'আভাঙকুলি ফিলিয়াস,' 'আভাঙকুলি নেপোস', এবং এইভাবে এগোতে এগোতে 'আভাঙকুলি ট্রাইনেপোস' হয়ে 'আভাঙকুলি ট্রাইনেপোটিস ট্রাইনেপোস' পর্যন্ত গিয়ে পেঁছয়। স্ত্রী-ধারার প্রথমে থাকে 'ম্যাটারটেরা' অর্থাৎ মাসী, তারপর 'ম্যাটারটেরা ফিলিয়া' ইত্যাদি। জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারির পুরুষ ও স্ত্রী-ধারাটা শুরু হয় যথাক্রমে 'আভাঙকুলাস ম্যাগ্‌নাস' অর্থাৎ মাতামহের ভাই এবং 'ম্যাটারটেরা ম্যাগ্‌না' অর্থাৎ মাতামহের বোনকে দিয়ে। চতুর্থ সারির প্রথমে থাকে 'আভাঙকুলাস মেজর' ও 'ম্যাটারটেরা মেজর', অর্থাৎ প্রমাতামহের ভাই ও বোন। আর পঞ্চম সারিটা শুরু হয় 'আভাঙকুলাস ম্যাক্সিমাস' ও 'ম্যাটারটেরা ম্যাক্সিমা' অর্থাৎ প্রমাতামহের পিতার ভাই ও বোনকে দিয়ে। এই প্রতিটা সারি ও শাখার সদস্যদের চিহ্নিত করা হয় পূর্বোল্লিখিত নিয়ম অনুসারেই।

পুরো বংশধারার একটা ছক তৈরি করার জন্য যতজন জ্ঞাতিকে বিবেচনার মধ্যে আনা দরকার, তার সবটাই এই পাঁচটা সারির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। তাই এই পাঁচটা সারির বাইরে আর কারুর কথা ভাবার দরকার হয় নি রোমিয় সমাজপিতাদের।

বিবাহসূত্রে গড়া ওঠা সম্পর্কগুলো চিহ্নিত করার ব্যাপারে লাতিন ভাষা খুবই সমৃদ্ধ, কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা ইংরিজী এব্যাপারে অত্যন্ত দরিদ্র। প্রায় গোটা কুড়ি অত্যন্ত সাধারণ ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝানোর জন্য ইংরিজিতে বেশ অশোভন সব শব্দ চালু আছে। যেমন : ফাদার-ইন-ল্য, সন-ইন-ল্য, ব্রাদার-ইন-ল্য, স্টেপ-ফাদার, স্টেপ-সন। লাতিনদের সম্বোধন-তালিকায় এ-রকম প্রত্যেকটা সম্পর্ককে চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ বিশেষ অভিধা আছে।

রোমান জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা নিয়ে আর বিশদ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্যবস্থার প্রধান প্রধান এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা আমরা উল্লেখ করেছি এবং তা থেকে গোটা ব্যাপারটাকে উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধে হয় না। সরল পদ্ধতি, চমৎকার বর্ণনা; সারি এবং শাখা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বিন্যাস আর সম্বোধন-

তালিকার সৌন্দর্য—সবে মিলে এই ব্যবস্থাটা একেবারে অতুলনীয়। আজ পর্যন্ত মানুষ যতরকম জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তার মধ্যে এটা নিঃসন্দেহেই শ্রেষ্ঠ। আর, কোন কিছু গড়ে তোলার সময় রোমানরা যে তাকে বরাবরের জন্য একটা মজবুত বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলত, তারও একটা নজির পাওয়া যায় এই ব্যবস্থার মধ্যে।

আরবী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করছি না। তবে এই পরিচ্ছেদের শেষে প্রদত্ত সারণীতে দু ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং একটা ব্যবস্থার ব্যাখ্যা জানা থাকলে অন্য ব্যবস্থাটাকে বুঝতে অসুবিধে হবে না। একই নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য।

আলাদা আলাদা অভিধা এবং যথাযথ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত জ্ঞাতিরা তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষের সূত্রে এবং বিবাহিত দম্পতি মারফৎ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। একটা বংশগত ধারায় ও কয়েকটা জ্ঞাতিত্বগত সারিতে তারা নিজেদের বিন্যস্ত করে এবং প্রতিটা সারি মূল ধারাটা থেকে ক্রমাগতই দূরবর্তী হতে থাকে। আসলে এগুলো হচ্ছে একবিবাহেরই স্বাভাবিক পরিণতি। কোন ব্যক্তির সঙ্গে অন্য প্রত্যেকের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে এবং একটা বিশেষ অভিধা বা বিবরণের সাহায্যে অন্য সকলের সঙ্গে তার পার্থক্যটাও নির্দিষ্ট করা থাকে (কেবলমাত্র যারা একই সম্পর্কের আওতাভুক্ত, তারা বাদে)। প্রতিটি ব্যক্তির পিতার পরিচয়টাও যে নিশ্চিতভাবে জানা যেত, সেটাও ফুটে ওঠে এই ব্যবস্থার মধ্যে। আর একমাত্র একবিবাহের আমলেই সুনিশ্চিতভাবে পিতৃত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, একবিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্কগুলোও অভিব্যক্ত হয় এই ব্যবস্থার মধ্যে। একবিবাহ চালু হওয়ার ফল হিসেবেই যে গড়ে উঠেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবার এবং এই পরিবার সৃষ্টি হওয়ার ফল হিসেবেই যে গড়ে উঠেছিল এই বিশেষ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা, এটা আর বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। যেখানে একমাত্র বর্ণনাত্মক পদ্ধতিই চালু থাকে, সেখানে এব তিনটি বিষয় একটা গোটা কাঠামোর অপরিহার্য অংশ হিসেবে কাজ করে। একবিবাহভিত্তিক পরিবার, তার বিবাহবিধি এবং তার জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ মারফৎ আমরা যা জানতে পেরেছি, তা যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার, তার বিবাহবিধি ও জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য, সেটা আমরা আগেই দেখিয়েছি। এমনকি ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার, তার বিবাহের ধরন আর জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও এগুলো একইভাবে প্রযোজ্য। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে যে-কোন একটার কথা জানা থাকলে তার সঙ্গে অন্য দুটো বিষয়ের উপস্থিতির কথাও নিশ্চিত-ভাবে ধরে নেওয়া যায়। এই তিনটির মধ্যে যদি কোন একটাকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বেছে নিতে হয়, তাহলে রায়টা যাবে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার স্বপক্ষেই। বিবাহ-বিধি এবং পরিবারের ধরন অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ককে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাই। তাই এর মধ্যে শুধু যে গোটা ব্যাপারটার সবথেকে উজ্জ্বল নিদর্শন বিধৃত রয়েছে তা-ই নয়, সেই সঙ্গেই জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধে যতজন আবদ্ধ থাকত তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিতও করা আছে এই ব্যবস্থায়। তাদের গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠানটা কত উচ্চ স্তরের ছিল, তার প্রমাণও খুঁজে পাওয়া যায় এর মধ্যে। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে মূল সত্যটা বিকৃত হতে পারে না, আর তাই এর

ওপর নির্ভর করা চলে। শেষত, আমাদের হাতে সবথেকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আছে জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধেই।

আলোচনার শুরুতে আমরা পরিবারের যে পাঁচটি ধারাবাহিক রূপের কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেগুলোর ব্যাখ্যা এবার সম্পূর্ণ হল। এই রূপগুলোর অস্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠার কাঠামোগত খুঁটিনাটি সম্বন্ধে যা-কিছু প্রমাণ আমাদের হাতে আছে, তার সবটুকুই উপস্থাপিত করেছি আমরা। পরিবারের প্রতিটা রূপ নিয়ে আমরা সাধারণ-ভাবে আলোচনা করেছি ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও এই রূপগুলো সংক্রান্ত মূল তথ্য এবং এগুলোর গুণাগুণ ফুটে উঠেছে, আর সেইসঙ্গেই প্রমাণিত হয়েছে এই মূল প্রতি-পাদ্যটা যে, পরিবার শুরু হয়েছিল ভাইবোন বিবাহের মধ্যে দিয়ে, তারপর বিভিন্ন ধারাবাহিক স্তরের পথ বেয়ে উন্নত হতে হতে সমাজ এসে পেঁছেছে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে। এই সিদ্ধান্তটার মধ্যে অননুমেয় এমন কিছুই নেই। কিন্তু যে-সব সমস্যা ও বাধা অতিক্রম করে বিভিন্ন স্তরের পথ বেয়ে এগোতে বয়েছে পরিবারকে, তা অনুমান করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। বিভিন্ন যুগের মধ্যে দিয়ে এগোতে এগোতে মানুষের অভিজ্ঞতার যাবতীয় পরিবর্তনের শরিক হয়েছে পরিবার, আর আদিম বন্যতার অতল থেকে বর্বর যুগের পথ বেয়ে মানুষের এই সভ্য যুগে এসে পেঁছনোর বিভিন্ন স্তরগুলো অন্য যে-কোন প্রতিষ্ঠানের থেকে সম্ভবত অনেক বেশি করে ফুটে উঠেছে পরিবারের মধ্যেই। অগ্রগতির বিভিন্ন যুগে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছবিটাও আমরা খুঁজে পাই পরিবারের মধ্যেই, এবং বিভিন্ন যুগের পরিবারের মধ্যে তুলনা করলে আমরা মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সংগ্রাম আর জয়লাভের রূপরেখাটাও আঁচ করতে পারি। আজকের দিনের পরিবারের গুরুত্ব উপলব্ধি করার সময় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটা গড়ে তোলার জন্য কত বিপুল সময় এবং কী প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজন হয়েছিল। সেই সঙ্গেই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে প্রাচীন সমাজের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যা-কিছু লাভ করেছি, তার মধ্যে পরিবারই হচ্ছে সবথেকে মূল্যবান, কারণ প্রাচীন সমাজের বহুমুখী ও সুবিস্তৃত অভিজ্ঞতার সবথেকে গুরুত্ব-পূর্ণ ফসলগুলো মূর্ত হয়ে আছে পরিবারের মধ্যেই।

পরিবার মোট চারটি ধারাবাহিক রূপের পথ বেয়ে অগ্রসর হয়ে এসে এখন এক পঞ্চম রূপে পেঁছেছে—এটা স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে যে এই পঞ্চম রূপটাই কি ভবিষ্যতে পরিবারের স্থায়ী রূপ হয়ে থাকবে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হলঃ সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারেরও অগ্রগতি ঘটবে এবং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারও পরিবর্তন ঘটবে, ঠিক যেমনটা ঘটেছে অতীতে। সমাজ-ব্যবস্থাই পরিবার সৃষ্টি করেছে এবং তাই সমাজব্যবস্থার নিজস্ব সংস্কৃতিও প্রতিফলিত হয় পরিবারের মধ্যে। সভ্য যুগের শুরু থেকে এবং বিশেষত আধুনিক কালে একবিবাহ-ভিত্তিক পরিবার যে রকমভাবে উন্নত হয়ে উঠেছে, তা থেকে এটুকু ধরেই নেওয়া যায় যে নারী-পুরুষের সমতা না-আসা পর্যন্ত এই পরিবার উন্নত হয়েই চলবে। সুদূর ভবিষ্যতে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে একবিবাহভিত্তিক পরিবার ব্যর্থ হলে তার পরবর্তী ধরনের পরিবার ঠিক কেমন চরিত্রের হবে, তা এই মুহূর্তে বলা অসম্ভব।

রোমান এবং আরবী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১. প্রপিতামহের প্রপিতামহ	ট্রাইটেভাস	প্রপিতামহের প্রপিতামহ	জিদ্দ জিদ্দ জিদ্দে	পিতামহের পিতামহের পিতামহ
২. ,, পিতামহ	আটাভাস	,, পিতামহ	,, ,, আবি	পিতামহের পিতামহের পিতা
৩. ,, পিতা	আবাভাস	,, পিতা	,, জিদ্দি	পিতামহের পিতামহ
৪. ,, মাতা	আবাভিয়া	,, মাতা	সিত্ত সিত্তি	পিতামহীর পিতামহী
৫. প্রপিতামহ	প্রোয়াভাস	প্রপিতামহ	জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহ
৬. প্রপিতামহী	প্রোয়াভিয়া	প্রপিতামহী	সিত্ত আবি	,, পিতামহী
৭. পিতামহ	অ্যাভাস	পিতামহ	জিদ্দ	পিতামহ
৮. পিতামহী	অ্যাভিয়া	পিতামহী	সিত্তি	পিতামহী
৯. পিতা	প্যাটার	পিতা	আবি	পিতা
১০. মাতা	ম্যাটার	মাতা	উম্মি	মাতা
১১. পুত্র	ফিলিয়াস	পুত্র	ইব্‌নি	পুত্র
১২. কন্যা	ফিলিয়া	কন্যা	ইব্‌নেতি বি, বিন্‌তি	কন্যা
১৩ পৌত্র	নেপোস	পৌত্র	ইব্‌ন ইব্‌নি	পুত্রের পুত্র
১৪. পৌত্রী	নেপ্‌টিস	পৌত্রী	ইব্‌নেত ইব্‌নি	পুত্রের কন্যা
১৫. প্রপৌত্র	প্রোনেপোস	প্রপৌত্র	ইব্‌ন ইব্‌ন ইব্‌নি	পুত্রের পুত্রের পুত্র
১৬. প্রদৌহিত্রী	প্রোনেপ্‌টিস	প্রদৌহিত্রী	বিন্‌ত বিন্‌ত বিন্‌তি	কন্যার কন্যার কন্যা
১৭. প্রপৌত্রের পুত্র	অ্যাব্‌নেপোস	প্রপৌত্রের পুত্র	ইব্‌ন ইব্‌ন ইব্‌ন ইব্‌নি	পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৮. প্রদৌহিত্রীর কন্যা	অ্যাব্‌নেপ্‌টিস	প্রদৌহিত্রীর কন্যা	বিন্‌ত বিন্‌ত বিন্‌ত বিন্‌তি	কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা
১৯. প্রপৌত্রের পৌত্র	অ্যাট্‌নেপোস	প্রপৌত্রের পৌত্র	ইবন ইবন ইবন ইবন ইবনি	পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র
২০. প্রদৌহিত্রীর দৌহিত্রী	অ্যাট্‌নেপ্‌টিস	প্রদৌহিত্রীর দৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত বিনত বিনতি	কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা
২১ প্রপৌত্রের প্রপৌত্র	ট্রাইনেপোস	প্রপৌত্রের প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন ইবন ইবন ইবনি	পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র
২২. প্রদৌহিত্রীর প্রদৌহিত্রী	ট্রাইনেপ্‌টিস	প্রদৌহিত্রীর প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত বিনত বিনত বিনতি	কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যার কন্যা
২৩. ভাইরা	ফ্র্যাট্রেস	ভাইরা	আহওয়াতি	ভাইরা
২৪. বোনেরা	সোরোরেস	বোনেরা	,,	বোনেরা
২৫. ভাই	ফ্র্যাটার	ভাই	আখি	ভাই
(জ্ঞাতিত্বের প্রথম সারি)				
২৬. ভাইয়ের পুত্র	ফ্র্যাট্রিস ফিলিয়াস	ভাইয়ের পুত্র	ইব্‌ন আখি	ভাইয়ের পুত্র
২৭. ,, পুত্রের স্ত্রী	,, ফিলি উক্সর	,, পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইব্‌ন আখি	,, পুত্রের স্ত্রী
২৮. ,, কন্যা	,, ফিলিয়া	,, কন্যা	বিন্‌ত আখি	,, কন্যা
২৯. ,, কন্যার স্বামী	,, ফিলিয়ে ভির	,, কন্যার স্বামী	জোজ বিন্‌ত আখি	,, কন্যার স্বামী
৩০. ,, পৌত্র	,, নেপোস	,, পৌত্র	ইব্‌ন ইব্‌ন আখি	,, পুত্রের পুত্র
৩১. ,, পৌত্রী	,, নেপ্‌টিস	,, পৌত্রী	বিন্‌ত ইব্‌ন আখি	,, ,, কন্যা
৩২. ,, প্রপৌত্র	,, প্রোনেপোস	,, প্রপৌত্র	ইবন ইবন ,, ,,	,, ,, পুত্রের পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
৩৩. ভাইয়ের প্রদৌহিত্রী	ফ্র্যাট্রিস প্রোনেপ্‌টিস	ভাইয়ের প্রদৌহিত্রী	বিন্‌ত বিন্‌ত বিন্‌ত আখি	ভাইয়ের কন্যার কন্যার কন্যা
৩৪. বোন	সোরোর	বোন	আখ্‌তি	বোন
৩৫. বোনের পুত্র	সোরোরিস ফিলিয়াস	বোনের পুত্র	ইব্‌ন আখ্‌তি	বোনের পুত্র
৩৬ „ পুত্রের স্ত্রী	„ ফিলি উক্সর	বোনের পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইব্‌ন আখ্‌তি	বোনের পুত্রের স্ত্রী
৩৭. „ কন্যা	„ ফিলিয়া	„ কন্যা	বিন্‌ত আখ্‌তি	„ কন্যা
৩৮. „ কন্যার স্বামী	„ ফিলিয়ে ভির	„ কন্যার স্বামী	জোজ বিন্‌ত আখ্‌তি	বোনের কন্যার স্বামী
৩৯. „ পৌত্র	„ নেপোস	„ পৌত্র	ইব্‌ন ইব্‌ন আখতি	বোনের পুত্রের পুত্র
৪০. „ পৌত্রী	„ নেপ্‌টিস	„ পৌত্রী	বিন্‌ত আখতি	„ „ কন্যা
৪১. „ প্রপৌত্র	„ প্রোনেপোস	„ প্রপৌত্র	ইব্‌ন ইব্‌ন ইব্‌ন আখতি	বোনের পুত্রের পুত্রের পুত্র
৪২. „ প্রদৌহিত্রী	„ প্রোনেপ্‌টিস	„ প্রদৌহিত্রী	বিন্‌ত বিন্‌ত বিন্‌ত আখতি	বোনের কন্যার কন্যার কন্যা
(জ্ঞাতিত্বের দ্বিতীয় সারি)				
৪৩. পিতার ভাই	প্যাট্রুস	কাকা বা জ্যাঠা	আম্মি	কাকা বা জ্যাঠা
৪৪. „ ভাইয়ের স্ত্রী	প্যাট্রুই উক্সর	কাকা বা জ্যাঠার স্ত্রী	আমরাত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার স্ত্রী
৪৫. „ „ পুত্র	„ ফিলিয়াস	„ „ “ পুত্র	ইব্‌ন আম্মি	„ „ „ পুত্র
৪৬. „ „ পুত্রের স্ত্রী	„ ফিলিউক্সর	কাকা বা জ্যাঠার পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইব্‌ন আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার পুত্রের স্ত্রী
৪৭. „ „ কন্যা	„ ফিলিয়া	„ „ „ কন্যা	বিনত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার কন্যা

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাবান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাবান্তর
৪৮. পিতার ভাইয়ের কন্যার স্বামী	প্যাট্রুই ফিলিয়ে ভির	কাকা বা জ্যাঠার কন্যার স্বামী	জোজ বিনত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার কন্যার স্বামী
৪৯. ,, ,, পৌত্র	,, নেপোস	কাকা বা জ্যাঠার পৌত্র	ইবন ইবন আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার পুত্রের পুত্র
৫০. ,, ,, দৌহিত্রী	,, নেপ্‌টিস	কাকা বা জ্যাঠার দৌহিত্রী	বিনত বিনত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার কন্যার কন্যা
৫১. ,, ,, প্রপৌত্র	,, প্রোনেপোস	কাকা বা জ্যাঠার প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার পুত্রের পুত্রের পুত্র
৫২. ,, ,, প্রদৌহিত্রী	,, প্রোনেপ্‌টিস	কাকা বা জ্যাঠার প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত আম্মি	কাকা বা জ্যাঠার কন্যার কন্যার কন্যা
৫৩. পিতার বোন	অ্যামিটা	পিসি	আম্মেতি	পিসি
৫৪. ,, বোনের স্বামী	অ্যামিটে ভির	পিসির স্বামী	আরাত আম্মেতি	পিসির স্বামী
৫৫. ,, ,, পুত্র	,, ফিলিয়াস	,, পুত্র	ইবন আম্মেতি	,, পুত্র
৫৬. ,, ,, পুত্রের স্ত্রী	,, ফিলি উক্সর	,, পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইরন আম্মেতি	,, পুত্রের স্ত্রী
৫৭. ,, ,, কন্যা	,, ফিলিয়াস	,, কন্যা	বিনত আম্মেতি	,, কন্যা
৫৮. ,, ,, কন্যার স্বামী	,, ফিলিয়ে ভির	,, কন্যার-স্বামী	জোজ বিনত আম্মেতি	,, কন্যার স্বামী
৫৯. ,, ,, পৌত্র	,, নেপোস	,, পৌত্র	ইবন ইবন আম্মেতি	,, পুত্রের পুত্র
৬০. ,, ,, দৌহিত্রী	,, নেপ্‌টিস	,, দৌহিত্রী	বিনত বিনত ,,	,, কন্যার কন্যা
৬১. ,, ,, প্রপৌত্র	,, প্রোনেপোস	,, প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন আম্মেতি	পিসির পুত্রের পুত্রের পুত্র

	ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
৬২.	পিতায় বোনের প্রদৌহিত্রী	অ্যামিটে প্রোনেপ্‌টিস	পিসির প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত আম্মেতি	পিসির কন্যার কন্যার কন্যা
৬৩.	মায়ের ভাই	আভাঙ্কুলাস	মামা	খালি	মামা
৬৪.	মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী	আভাঙ্কুলি উক্সর	মামার স্ত্রী	আমরাত খালি	মামার স্ত্রী
৬৫.	" " পুত্র	" ফিলিয়াস	" পুত্র	ইবন খালি	" পুত্র
৬৬.	" " পুত্রের স্ত্রী	" ফিলি উক্সর	" পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইবন খালি	" পুত্রের স্ত্রী
৬৭.	" " কন্যা	" ফিলিয়া	" কন্যা	বিনত খালি	" কন্যা
৬৮.	" " কন্যার স্বামী	" ফিলিয়ে ভির	" কন্যার স্বামী	জোজ বিনত খালি	" কন্যার স্বামী
৬৯.	" " পৌত্র	" নেপোস	" পৌত্র	ইবন ইবন "	" পুত্রের পুত্র
৭০.	" " দৌহিত্রী	" নেপ্‌টিস	" দৌহিত্রী	বিনত বিনত "	" কন্যার কন্যা
৭১.	" " প্রপৌত্র	" প্রোনেপোস	" প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন খালি	" পুত্রের পুত্রের পুত্র
৭২.	" " প্রদৌহিত্রী	" প্রোনেপ্‌টিস	" প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত খালি	" কন্যার কন্যার কন্যা
৭৩.	মায়ের বোন	ম্যাটারটেরা	মাসী	খালেতি	মাসী
৭৪.	" বোনের স্বামী	ম্যাটারটেরে ভির	মাসীর স্বামী	জোজ খালেতি	মাসীর স্বামী
৭৫.	" " পুত্র	" ফিলিয়াস	" পুত্র	ইবন খালেতি	" পুত্র
৭৬.	" " পুত্রের স্ত্রী	" ফিলিউক্সর	" পুত্রের স্ত্রী	আমরাত ইবন খালেতি	" পুত্রের স্ত্রী
৭৭.	" " কন্যা	" ফিলিয়া	" কন্যা	বিনত খালেতি	" কন্যা
৭৮.	" " কন্যার স্বামী	" ফিলিয়ে ভির	" কন্যার স্বামী	জোজ বিনত খালেতি	" কন্যার স্বামী
৭৯.	" " পৌত্র	" নেপোস	" পৌত্র	ইবন ইবন "	" পুত্রের পুত্র

	ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
৮০.	মায়ের বোনের দৌহিত্রী	ম্যাটারটেরে নেপ্‌টিস	মাসীর দৌহিত্রী	বিনত বিনত খালেতি	মাসীর কন্যার কন্যা
৮১.	„ „ প্রপৌত্র	„ প্রোনেপোস	„ প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন „	„ পুত্রের পুত্রের পুত্র
৮২.	„ „ প্রদৌহিত্রী	„ প্রোনেপ্‌টিস	„ প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত খালেতি	মাসীর কন্যার কন্যার কন্যা
	(জ্ঞাতিত্বের তৃতীয় সারি)				
৮৩.	পিতার পিতার ভাই	প্যাট্রুস ম্যাগ্‌নাস	বড় কাকা (বা জ্যাঠা)	আম্ম আবি	পিতার কাকা (বা জ্যাঠা)
৮৪.	„ „ ভাইয়ের পুত্র	প্যাট্রুই ম্যাগ্‌নি ফিলিয়াস	বড় কাকার পুত্র	ইবন আম্মি আবি	পিতার কাকার পুত্র
৮৫.	„ „ „ পৌত্র	„ „ নেপোস	বড় কাকার পৌত্র	ইবন ইবন আম্মি আবি „	„ পুত্রের পুত্র
৮৬.	„ „ „ প্রপৌত্র	„ „ প্রোনেপোস	„ „ প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন আম্মি আবি	পিতার কাকার পুত্রের পুত্রের পুত্র
৮৭.	„ „ বোন	অ্যামিটা ম্যাগ্‌না	বড় পিসি	আম্মেত আবি	পিতার পিসি
৮৮	„ „ বোনের কন্যা	অ্যামিটে ম্যাগ্‌নে ফিলিয়া	„ পিসির কন্যা	বিনত আম্মেত আবি	„ পিসির কন্যা
৮৯.	„ „ „ দৌহিত্রী	„ „ নেপ্‌টিস	„ „ দৌহিত্রী	„ বিনত „ „	„ „ কন্যার কন্যা
৯০.	„ „ „ প্রদৌহিত্রী	„ „ প্রোনেপ্‌টিস	„ „ প্রদৌহিত্রী	„ „ বিনত „ „	„ „ „ কন্যার কন্যা
৯১.	মায়ের মায়ের ভাই	আভাংকুলাস ম্যাগ্‌নাস	বড় মামা	খাল উম্মি	মায়ের মামা
৯২.	„ „ ভাইয়ের পুত্র	আভাংকুলি ম্যাগ্‌নি ফিলিয়াস	বড় মামার পুত্র	ইবন খাল উম্মি	„ মামার পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
৯৩. মায়ের মায়ের ভাইয়ের পৌত্র	আভাঙ্কুলি ম্যাগ্‌নি নেপোস	বড় মামার পৌত্র	ইবন ইবন খাল উম্মি	মায়ের মামার পুত্রের পুত্র
৯[illegible]. ,, ,, ,, প্রপৌত্র	,, ,, প্রোনেপোস	,, ,, প্রপৌত্র	,, ,, ইবন খাল উম্মি	,, ,, ,, পুত্রের পুত্র
৯৫. ,, ,, বোন	ম্যাটারটেরা ম্যাগ্‌না	,, মাসী	খালেত উম্মি	,, মাসী
৯৬. ,, ,, বোনের কন্যা	ম্যাটারটেরা ম্যাগ্‌নে ফিলিয়া	বড় মাসীর কন্যা	বিনত খালেত উম্মি	,, মাসীর কন্যা
৯৭. ,, ,, ,, দৌহিত্রী	,, ,, নেপ্‌টিস	বড় মাসীর দৌহিত্রী	,, বিনত ,, ,,	,, ,, কন্যার কন্যা
৯৮. ,, ,, ,, প্রদৌহিত্রী	,, ,, প্রোনেপ্‌টিস	বড় মাসীর প্রদৌহিত্রী	,, ,, বিনত ,, ,,	,, ,, ,, কন্যার কন্যা
(জ্ঞাতিত্বের চতুর্থ সারি)				
৯৯. পিতার পিতার পিতার ভাই	প্যাট্রুস মেজর	মহাপিতামহ	আম্ম জিদ্দি	পিতামহের কাকা বা জ্যাঠা
১০০. ,, ,, ,, ভাইয়ের পুত্র	প্যাট্রুই মেজরিস ফিলিয়াস	মহাপিতামহের পুত্র	ইবন আম্ম জিদ্দি	পিতামহের কাকার পুত্র
১০১. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	,, ,, নেপোস	,, পৌত্র	,, ইবন ,, ,,	,, কাকার পুত্রের পুত্র
১০২. ,, ,, ,, ,, প্রপৌত্র	,, ,, প্রোনেপোস	,, প্রপৌত্র	,, ,, ইবন আম্ম জিদ্দি	পিতামহের কাকার পুত্রের পুত্র
১০৩. ,, ,, ,, বোন	অ্যামিটা মেজর	মহাপিতামহী	আম্মেত জিদ্দি	পিতামহের পিসি
১০৪. ,, ,, ,, বোনের কন্যা	অ্যামিটেমেজরিস ফিলিয়াস	মহাপিতামহীর কন্যা	বিনত আম্মেত জিদ্দি	,, পিসির কন্যা
১০৫. ,, ,, ,, ,, দৌহিত্রী	,, ,, নেপ্‌টিস	,, দৌহিত্রী	,, বিনত ,, ,,	,, ,, কন্যার কন্যা

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১০৬. পিতার পিতার পিতার বোনের প্রদৌহিত্রী	অ্যামিটে মেজরিস প্রোনেপ্‌টিস	মহাপিতামহীর প্রদৌহিত্রী	বিনত বিনত বিনত আম্মেত জিদ্দ	পিতামহের পিসির কন্যার কন্যার কন্যা
১০৭. মায়ের মায়ের মায়ের ভাই	আভাঙ্কুলাস মেজর	মহামাতামহ	খাল সিত্তি	মাতামহীর মামা
১০৮. ,, ,, ,, ভাইয়ের পুত্র	আভাঙ্কুলি মেজরিস ফিলিয়াস	মহামাতামহের পুত্র	ইবন খাল সিত্তি	,, মামার পুত্র
১০৯. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	,, ,, নেপোস	,, পৌত্র	,, ইবন ,, ,,	,, ,, পুত্রের পুত্র
১১০. ,, ,, ,, ,, প্রপৌত্র	,, ,, প্রোনেপোস	,, প্রপৌত্র	,, ,, ইবন খাল ,,	,, ,, ,, পুত্রের পুত্র
১১১. মায়ের মায়ের মায়ের বোন	ম্যাটারটেরা মেজরিস ফিলিয়া	মহামাতামহী	খালেত সিত্তি	মাতামহীর মাসী
১১২. ,, ,, ,, বোনের কন্যা	ম্যাটারটেরে ,, ,,	মহামাতামহীর কন্যা	বিনত ,, ,,	,, মাসীর কন্যা
১১৩. ,, ,, ,, ,, দৌহিত্রী	,, ,, নেপ্‌টিস	,, দৌহিত্রী	বিনত বিনত খালেত সিত্তি	,, ,, কন্যার কন্যা
১১৪. ,, ,, ,, ,, প্রদৌহিত্রী	,, ,, প্রোনেপ্‌টিস	মহামাতামহীর প্রদৌহিত্রী	,, ,, বিনত খালেত সিত্তি	,, ,, ,, কন্যার কন্যা
(জ্ঞাতিত্বের পঞ্চম সারি)				
১১৫. পিতার পিতার পিতার পিতার ভাই	প্যাট্রুস ম্যাক্সিমাস	বৃদ্ধ মহাপিতামহ	আম্ম জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের কাকা (বা জ্যাঠা)
১১৬. ,, ,, ,, ,, ভাইয়ের পুত্র	প্যাট্রুস ম্যাক্সিমি ফিলিয়াস	,, মহাপিতামহের পুত্র	ইবন আম্ম জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের কাকার পুত্র

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১১৭. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	প্যাট্রুই ম্যাক্সিমি নেপোস	বৃদ্ধ মহা-পিতামহের পৌত্র	ইবন ইবন আম্ম জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের কাকার পুত্রের পুত্র
১১৮. ,, ,, ,, ,, প্রপৌত্র	,, ,, প্রোনেপোস	বৃদ্ধ মহা-পিতামহের প্রপৌত্র	ইবন ইবন ইবন আম্ম জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের কাকার পুত্রের পুত্রের পুত্র
১১৯. ,, ,, ,, ,, বোন	অ্যামিটা ম্যাক্সিমি	বৃদ্ধা মহাপিতা-মহী	আম্মেত জিদ্দ আবি	পিতার পিতামহের পিসি
১২০. ,, ,, ,, ,, বোনের কন্যা	অ্যামিটে ম্যাক্সিমে ফিলিয়া	,, মহাপিতা-মহীর কন্যা	বিনত আম্মেত জিদ্দ আবি	,, ,, পিসির কন্যা
১২১. ,, ,, ,, ,, বোনের দৌহিত্রী	,, ,, নেপ্‌টিস	,, মহাপিতা-মহীর দৌহিত্রী	,, বিনত ,, জিদ্দ আবি	,, ,, পিসির কন্যার কন্যা
১২২. ,, ,, ,, ,, বোনের প্রদৌহিত্রী	,, ,, প্রোনেপ্‌টিস	,, মহাপিতা-মহীর প্রদৌহিত্রী	,, ,, বিনত ,, জিদ্দ আবি	,, ,, পিসির কন্যার কন্যার কন্যা
১২৩. মায়ের মায়ের মায়ের মায়ের ভাই	আভাঙ্কুলাস ম্যাক্সিমাস	বৃদ্ধ মহা-মাতামহ	খাল সিত উম্মি	মায়ের মাতামহীর মামা
১২৪. ,, মায়ের মায়ের মায়ের ভাইয়ের পুত্র	আভাঙ্কুলি ম্যাক্সিমি ফিলিয়াস	,, মহামাতা-মহের পুত্র	ইবন ,, ,, ,,	,, ,, মামার পুত্র
১২৫. ,, ,, ,, ,, পৌত্র	,, ,, নেপোস	,, মহামাতা-মহের পৌত্র	,, ইবন ,, ,, ,,	,, ,, ,, পুত্রের পুত্র
১২৬. ,, ,, ,, ,, ,, প্রপৌত্র	,, ,, প্রোনেপোস	,, মহামাতা-মহের প্রপৌত্র	,, ,, ইবন খাল সিত উম্মি	,, ,, মামার পুত্রের পুত্রের পুত্র

	ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১২৭.	মায়ের মায়ের মায়ের মায়ের বোন	ম্যাটারটেরা ম্যাক্সিমা	বৃদ্ধা মহা-মাতামহী	খালেত সিত উম্মি	মায়ের মাতামহীর মাসী
১২৮.	,, ,, ,, ,, বোনের কন্যা	ম্যাটারটেরে ম্যাক্সিমে ফিলিয়া	,, মহামাতা-মহীর কন্যা	বিনত ,, ,, ,,	,, ,, মাসীর কন্যা
১২৯	,, ,, ,, ,, ,, দৌহিত্রী	,, ,, নেপ্‌টিস	,, মহামাতা-মহীর দৌহিত্রী	,, বিনত খালেত সিত উম্মি	,, ,, ,, কন্যার কন্যা
১৩০.	,, ,, ,, ,, ,, প্রদৌহিত্রী	,, ,, প্রোনেপ্‌টিস	,, মহামাতা-মহীর প্রদৌহিত্রী	,, ,, বিনত ,, সিত উম্মি	,, ,, ,, কন্যার কন্যার কন্যা
	(বিবাহজ সম্পর্ক)				
১৩১.	স্বামী	ভির বি, ম্যারিটাস	স্বামী	জোজি	স্বামী
১৩২.	স্বামীর পিতা	সকার	শ্বশুর	আম্মি	কাকা
১৩৩.	,, মা	সক্রাস	শাশুড়ি	আমরাত আম্মি	কাকার স্ত্রী
১৩৪.	,, পিতামহ	সকার ম্যাগ্‌নাস	বড় শ্বশুর	জিদ্দ জোজি	স্বামীর পিতামহ
১৩৫.	,, পিতামহী	সক্রাস ,,	,, শাশুড়ি	সিত্ত ,,	,, পিতামহী
১৩৬.	স্ত্রী	উক্সর বি, ম্যারিটা	স্ত্রী	আমরাতি	স্ত্রী
১৩৭.	স্ত্রী-র পিতা	সকার	শ্বশুর	আম্মি	কাকা
১৩৮.	,, মা	সক্রাস	শাশুড়ি	আমরাত আম্মি	কাকার স্ত্রী
১৩৯.	,, পিতামহ	সকার ম্যাগ্‌নাস	বড় শ্বশুর	জিদ্দ আমরাতি	স্ত্রীর পিতামহ
১৪০.	,, পিতামহী	সক্রাস ,,	,, শাশুড়ি	সিত্ত ,,	,, পিতামহী
১৪১.	সৎ-পিতা	ভিট্রিকাস	সৎ-পিতা	আম্মি	কাকা (uncle)
১৪২.	সৎ-মা	নোভের্কা	সৎ-মা	খালোত	মাসী (aunt)

ব্যক্তির বিবরণ	লাতিন ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর	আরবী ভাষায় সম্পর্ক	ভাষান্তর
১৪৩. সৎ-পুত্র	প্রিভিগ্‌নাস	সৎ-পুত্র	কারুতি	সৎ পুত্র
১৪৪. সৎ-কন্যা	প্রিভিগ্‌না	সৎ-কন্যা	কারুতেতি	সৎ-কন্যা
১৪৫. জামাতা	জেনার	জামাতা	খাতান বি, সাহা	জামাতা
১৪৬. পুত্রবধূ	নুরাস	পুত্রবধূ	কিন্নেত	পুত্রবধূ
১৪৭. দেবর বা ভাশুর	লেভের	দেবর বা ভাশুর	ইবন আম্মি	কাকার পুত্র
১৪৮. ভগ্নীপতি	ম্যারিটাস সোরোরিস	ভগ্নীপতি	জোজ আখ্‌তি	বোনের স্বামী
১৪৯. শ্যালক	উক্সরিস ফ্রাটার	স্ত্রীর ভাই	ইবন আম্মি	কাকার পুত্র
১৫০. শ্যালিকা	,, সোরোর	,, বোন	বিনত ,,	কাকার কন্যা
১৫১. ননদ	গ্লস্‌	ননদ	,, ,,	,, ,,
১৫২. ভাদ্রবধূ	ফ্র্যাট্রিয়া	ভাদ্রবধূ	আমরাত আখি	ভাইয়ের স্ত্রী
১৫৩. বিধবা	ভিডুয়া	বিধবা	আর্মে'লেত	বিধবা
১৫৪. বিপত্নীক	ভিডুয়াস	বিপত্নীক	আর্মে'তি	বিপত্নীক
১৫৫. পিতার দিকের আত্মীয়	অ্যাগ্‌নেটি	পিতৃ-জ্ঞাতি		
১৫৬. মায়ের ,, ,,	কগ্‌নেটি	মাতৃ-জ্ঞাতি		
১৫৭. বিবাহসূত্রে ,,	অ্যাফিনেস্‌	বৈবাহিক-জ্ঞাতি		

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যায়ক্রম

বিভিন্ন ধারাবাহিক রূপের মধ্যে দিয়ে পরিবারের উন্নত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যে-সব প্রথা ও প্রতিষ্ঠান সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, সেগুলোকে এবার যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা দরকার। এগুলোকে পর্যায়ক্রমে সাজানোটা কিছুটা কল্পনাশ্রয়ী ঠিকই, কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ ও সংশয়াতীত সম্পর্ক আছেই।

যে-সব প্রধান প্রধান সামাজিক ও গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিবারকে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তর থেকে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করেছে, সেইসব প্রতিষ্ঠানকেই এই পর্যায়ক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১] মানবজাতির বিভিন্ন শাখায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটি এরকম পর্যায়ক্রমেই গড়ে উঠেছে এবং এক একটা মানবগোষ্ঠী এক একটা নির্দিষ্ট স্তরে থাকার সময় তাদের মধ্যে সেই সেই স্তরের নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোও বিদ্যমান থেকেছে।

পর্যায়ক্রমের প্রথম স্তর :

(১) অবাধ যৌনমিলন ;

(২) আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইবোনদের দলগত অন্তর্বিবাহ : যা থেকে গড়ে ওঠে—

(৩) ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার (পরিবারের প্রথম স্তর) : যা থেকে ওঠে—

(৪) জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার মালয়ী ব্যবস্থা।

পর্যায়ক্রমের দ্বিতীয় স্তর :

(৫) লিঙ্গভিত্তিক সংগঠন এবং দলগত বিবাহপ্রথা, যার ফলে ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ কমতে থাকে : যা থেকে গড়ে ওঠে—

(৬) দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার (পরিবারের দ্বিতীয় স্তর) : যা থেকে গড়ে ওঠে—

(৭) গোত্রভিত্তিক সংগঠন, যা ভাইবোনের মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ করে দেয় ; যা থেকে গড়ে ওঠে—

(৮) জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার তুরানিয় এবং গ্যানোয়ানিয় ব্যবস্থা।

পর্যায়ক্রমের তৃতীয় স্তর :

(৯) গোত্রীয় সংগঠনের ক্রমাগত প্রভাব বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের উপকরণের উন্নতি, যার ফলে মানবজাতির একটা অংশ উন্নীত হয় বর্বর যুগের নিম্ন

১। "সিস্টেমস্ অফ কনস্যাঙ্গুইনিটি"-র ৪৮০ পৃষ্ঠায় পর্যায়ক্রমটা যেভাবে সাজিয়েছিলাম, এখানে তা কিছুটা সংশোধন করেছি।

পর্যায়েঃ যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১০) একজোড়া নারীপুরুষের মধ্যে বিবাহ, কিন্তু যৌন-সহবাস শুধু পরস্পরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার কোন বাধ্যবাধকতা তাদের থাকত না ঃ যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১১) জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার (পরিবারের তৃতীয় স্তর)।

পর্যায়ক্রমের চতুর্থ স্তর ঃ

(১২) কিছু কিছু জায়গায় সমতলভূমিতে পশুপালননির্ভর জীবনযাত্রার সূচনা ; যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১৩) পিতৃপ্রধান পরিবার (পরিবারের চতুর্থ স্তর হলেও এটা একটা ব্যতিক্রমী স্তর, সবজায়গায় দেখা যায় নি)।

পর্যায়ক্রমের পঞ্চম স্তর ঃ

(১৪) সম্পত্তির অভ্যুদয় এবং সম্পত্তির ওপর বংশগত উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ; যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১৫) একবিবাহভিত্তিক পরিবার (পরিবারের পঞ্চম স্তর) ; যা থেকে গড়ে ওঠে—

(১৬) জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয়া ব্যবস্থা, বিলুপ্ত হয় তুরানিয় ব্যবস্থা।

বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের যে পর্যায়ক্রমটা আমরা পাচ্ছি, সেগুলোর মধ্যেকার সংযোগ ও সম্পর্ককে খুঁজে দেখার জন্য সামান্য আলোচনা করে পরিবারের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত এই পর্যালোচনা শেষ করব আমরা।

ভূতাত্ত্বিক কাঠামো যেমন বিভিন্ন ধারাবাহিক স্তরের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকেও তাদের আপেক্ষিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ধারাবাহিক স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। মানবগোষ্ঠীগুলোকে এইভাবে বিন্যস্ত করলে বন্য যুগ থেকে শুরু করে সভ্য যুগ পর্যন্ত মানুষের অগ্রগতির ছবিটা আমাদের সামনে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। প্রতিটা স্তরকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে সেই স্তরের সংস্কৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নির্দিষ্ট লক্ষণগুলো বুঝতে পারা যায়। এ-রকম পর্যালোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি একটা স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরগুলোর পার্থক্য কী কী আর একটা স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরগুলোর সম্পর্কটাই বা কেমন। এর ফলে সমগ্র প্রক্রিয়াটা সম্বন্ধেই একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে আমাদের। এই ধারণাটা গড়ে উঠলে মানুষের অগ্রগতির ধারাবাহিক স্তরগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে আর কোন অসুবিধে হয় না। এই স্তরগুলো গড়ে ওঠার ব্যাপারে সময় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কোন ঐতিহাসিক যুগই স্বল্পস্থায়ী হয় নি। সভ্যতার পূর্ববর্তী প্রতিটা পর্যায় যে বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে টিকে থেকেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অবাধ যৌনমিলন ঃ

এটাই হচ্ছে বন্যতার নিম্নতম স্তর, সমগ্র প্রক্রিয়াটার একেবারে আদি অবস্থা। এই পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে চারপাশের মূক জন্তু-জানোয়ারদের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বিবাহ বলে কোন ব্যাপার তাদের মধ্যে ছিল না। সম্ভবত দলবদ্ধভাবে বসবাস

করত তারা। এই পর্যায়ের মানুষ শুধু যে বন্য ছিল তা-ই নয়, তার বুদ্ধিমত্তা ছিল নিতান্তই দুর্বল এবং নৈতিকবোধ দুর্বলতর। তার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশাটা নিহিত ছিল আবেগের তীব্রতার মধ্যে, (কারণ সমস্ত ব্যাপারেই তখনকার মানুষরা ছিল প্রচণ্ড সাহসী), মুক্ত দুটো হাতের মধ্যে এবং তার গড়ে উঠতে থাকা মানসিক ও নৈতিক ক্ষমতার বিকাশযোগ্য চরিত্রের মধ্যে। এই দৃষ্টিভঙ্গীরই সমর্থন পাওয়া যায় আর একটা ঘটনায়। সভ্য যুগের মানুষদের থেকে শুরু করে পিছোতে পিছোতে ক্রমশঃ বন্য যুগের মানুষদের করোটি পর্যন্ত বিচার করলে দেখা যায় করোটির আয়তন ক্রমশ ছোট হচ্ছে এবং বেড়ে উঠেছে তার পশুসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো। আদিম মানুষদের বুদ্ধিমত্তা যে যথেষ্টই কম ছিল, তার একটা প্রমাণ এখান থেকেই পাওয়া যায়। সেই আদিমতম মানুষদের জগতে গিয়ে পৌঁছতে পারলে দেখা যেত যে আজকের পৃথিবীর সবথেকে নিম্নস্তরের বন্যদের থেকেও অনেক নিম্ন স্তরে ছিল তারা। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যে-সব অমার্জিত ধরনের পাথুরে যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে, সেগুলো আজকের দিনের বন্যরা আর ব্যবহার করে না, সেগুলো থেকেই বোঝা যায় আদিম বাসস্থান থেকে সরে এসে মৎস্যশিকারী হিসেবে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সময় তখনকার বন্যরা কতটা আদিম, অমার্জিত অবস্থায় ছিল। শুধুমাত্র সেই আদিমতম বন্যদের মধ্যেই অবাধ যৌনমিলন চালু ছিল।

এই প্রাচীনতম অবস্থার কোন প্রমাণ আছে কি না, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তরে বলা যায়, ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার ও মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পূর্বশর্ত হিসাবে একটা পূর্বতন অবাধ যৌনমিলনের অবস্থার কথা ধরেই নিতে হয়। মানুষ যখন শুধু ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত এবং নিজের আদিম বাসস্থানেই বসবাস করত, কেবলমাত্র তখনই চালু ছিল এই অবস্থাটা (এবং সেটাই স্বাভাবিক), কারণ তারা মৎস্যশিকারী হয়ে ওঠার পর এবং কৃত্রিমভাবে অর্জিত খাদ্যের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করার পর এই অবস্থাটা চালু থাকা আর সম্ভব ছিল না। এই সময় থেকে দেখা দিচ্ছিল ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ (স্বাভাবিকভাবেই এর রূপটা ছিল দলের মধ্যে অন্তর্বিবাহ) আর তার ফল হিসেবে গড়ে উঠছিল ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার। নানা ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পথ বেয়ে পিছোতে পিছোতে আমরা সবথেকে প্রাচীন যে সমাজব্যবস্থার চিত্র পাই, তা হচ্ছে এই পরিবারেরই চিত্র। যৌথভাবে জীবনধারণ করা আর নিজেদের যৌথ স্ত্রীদের সমাজের অন্য পুরুষদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু পুরুষদের একটা পারস্পরিক চুক্তির মতই ছিল ব্যাপারটা। দ্বিতীয়ত, পূর্বতন অবাধ যৌনমিলনের কিছু কিছু ছাপ ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। নির্দিষ্ট একটা সীমার মধ্যে অবাধ যৌনমিলনকে সে স্বীকৃতি দিয়েছিল, কিন্তু সবথেকে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যৌনমিলন আর স্বীকৃতি পায় নি। এই পরিবারের গঠন কাঠামোটার মধ্যে অতীতের একটা নিকৃষ্টতর অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে সে। অবাধ যৌনমিলনের অবস্থায় থাকা দলগুলো থেকে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারে উন্নীত হওয়াটা একটা দীর্ঘ পদক্ষেপ হলেও এই দুটো অবস্থার মাঝখানে কোন অন্তর্বর্তী স্তরের আবশ্যকতা ছিল না। আর যদি তা থেকেও থাকে, তাহলেও তার

কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণও নয়। আপাতত সেই বন্যতার যুগে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার কর্তৃক সূচিত নির্দিষ্ট সূচনাবিন্দুটার কথা জানা থাকলেই চলে, যা থেকে আমরা একেবারে আদিম যুগে মানবজাতির অবস্থা কেমন ছিল তা-ও জানতে পারি।

গ্রীক ও রোমানদের পরিচিত কিছু কিছু বন্য এবং এমনকি কিছু বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যেও অবাধ যৌনমিলন চালু ছিল বলে উল্লেখ করেছেন অনেকে। যেমন হেরোডোটাস উল্লেখ করেছেন উত্তর আফ্রিকার অসিয়ানদের কথা,[১] প্লিনি উল্লেখ করেছেন ইথিওপিয়ার গ্যারামান্টেদের কথা।[২] এবং স্ট্র্যাবোর লেখায় পাওয়া যায় আয়ারল্যান্ডে কেল্টদের কথা।[৩] আরবদের ব্যাপারে এই একই কথা বলেছেন স্ট্র্যাবো।[৪] লিখিত ইতিহাসের সীমার মধ্যে কোন মানব গোষ্ঠী যূথবদ্ধ পশুদের মত বাছবিচারহীন যৌনমিলনের মধ্যে থাকতে পারে না। মানবজাতির আদিকাল থেকে শুরু করে লিখিত ইতিহাসের যুগ পর্যন্ত কোন গোষ্ঠীর মধ্যে অবাধ যৌনমিলন চালু থাকা অসম্ভব। এইসব লেখকরা যে-সব ঘটনার কথা বলেছেন সেগুলোকে এবং আরও যে-সব ঘটনার কথা এই সঙ্গে বলা যায় সেগুলোকে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারেরই অভিব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ব্যাপারটাকেই ওপর থেকে দেখে বিদেশী লেখকদের অবাধ যৌনমিলন বলে মনে হয়েছে। তত্ত্বগতভাবে বলা যায়, অবাধ যৌনমিলন হচ্ছে ভাই-বোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের আবশ্যিক পূর্বাবস্থা। কিন্তু এই অবস্থাটা সুদূর অতীতের ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে, তাই এ ব্যাপারে আজ আর সঠিক ধারণা অর্জন করা সম্ভব নয়।

২। আপন ও জ্ঞাতিসম্পর্কিত ভাইবোনদের দলগত অন্তর্বিবাহ :

এই ধরনের বিবাহ থেকেই গড়ে উঠেছিল পরিবার, এই বিবাহই হচ্ছে পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির জন্মদাতা। এই ধরনের বিবাহ যে সুপ্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিধৃত রয়েছে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে। প্রাচীন যুগে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হলে বিবাহের বাকি রূপগুলোকে তার পরবর্তী ধারাবাহিক স্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করতে আর কোন অসুবিধে হয় না।

এই ধরনের বিবাহ থেকে গড়ে ওঠে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার ৩। এবং মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা ৪। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমের তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপগুলো। এই ধরনের পরিবার বন্য যুগের নিম্ন পর্যায়ের অন্তর্গত।

৫। দলগত বিবাহ প্রথা :

অস্ট্রেলিয় পুরুষ ও নারী শ্রেণীগুলোর বিবাহবন্ধনের মধ্যে দলগত বিবাহপ্রথার নিদর্শন চোখে পড়ে। হাওয়াইয়ানদের মধ্যেও এই ধরনের বিবাহপ্রথা দেখা যায়।

১। লিব, iv, পৃঃ ১৮০.

২। Garamantes matrimonium exsortes passim cum femines degunt.— "ন্যাচারাল হিস্ট্রি", লিব, v, পৃঃ ৮.

৩। লিব, iv, পৃঃ ৫, অনুচ্ছেদ ৪.

৪। লিব, xvi, পৃঃ ৪, অনুচ্ছেদ ২৫.

যে-সব গোষ্ঠীর মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা চালু আছে বা একসময় চালু ছিল, তাদের প্রত্যেকের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষের মধ্যেই প্রচলিত ছিল দলগত বিবাহপ্রথা, কারণ এই ধরনের বিবাহপ্রথা ছাড়া তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। এই ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উদ্ভবের অন্য কোন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে একটা বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে—দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রবর্তন ভাইবোন বিবাহ ভিত্তিক পরিবারের সমস্ত সদস্যই অন্তর্ভুক্ত হত, বাদ যেতে শুধু আপন ভাইবোনরা। সব ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হতে কি না বলা মুস্কিল, কিন্তু নিয়মটা তা-ই ছিল। সহজেই অনুমান করা চলে যে দলগত বিবাহপ্রথার সুবিধাজনক দিকগুলো উপলব্ধি করার পর প্রায় সব জায়গার মানুষরাই এই প্রথাটা গ্রহণ করেছিল। এই ধরনের বিবাহ থেকে গড়ে ওঠে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার ৬। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমের ষষ্ঠ ধাপটা। খুব সম্ভবত বন্য যুগের মধ্য পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল এই পরিবার।

৭। **গোত্রভিত্তিক সংগঠন ঃ**

গোটা পর্যায়ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাটা কী এখানে আমরা শুধু সেটুকুই দেখার চেষ্টা করব। অস্ট্রেলিয় শ্রেণীগুলোর মধ্যে বেশ ব্যাপক এবং সুবিন্যস্ত দলগত বিবাহ দেখা যায়। এরা গোত্রের ভিত্তিতেও সংগঠিত হতে পেরেছে। এখানে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার গোত্রের থেকে প্রাচীন, কেননা এই পরিবার গড়ে উঠেছে গোত্রের পূর্ববর্তী শ্রেণীগুলোর ভিত্তিতে। অস্টেট্রলিয়দের মধ্যে তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্হাও চালু আছে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ দলগুলো থেকে আপন ভাইবোনদের বাদ দিয়ে ঐ শ্রেণীগুলোই এই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বুনিয়াদ রচনা করেছিল। আপন ভাইবোনরা জন্ম সূত্রেই এমন দুটো শ্রেণীর সদস্য/সদস্যা হিসেবে পরিগণিত হত, যে দুটো শ্রেণীর সদস্য/সদস্যাদের পরস্পরকে বিবাহ করা অনুমোদনযোগ্য ছিল না। হাওয়াইদের ক্ষেত্রে কিন্তু দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে নি। এদের দলগত বিবাহের মধ্যে আপন ভাইবোনরাও প্রায়শঃই অন্তর্ভুক্ত হতো। চলতি প্রথায় এই ধরনের বিবাহের বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না, যদিও সে-রকম একটা চাপা প্রবণতা অবশ্য ছিলই। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দুটো উপাদান প্রয়োজন হয়—দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর গোত্রীয় সংগঠন। গোত্রীয় সংগঠন যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের পরে এবং ঐ পরিবারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বন্য যুগের মধ্য পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল এই সংগঠন।

৮ এবং ৯ ঃ এই দুটো ধাপ নিয়ে আগেই যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

১০ এবং ১১. একজোড়া নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহ এবং জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবার ঃ

বন্য যুগ থেকে অগ্রসর হয়ে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে প্রবেশ করার পর মানবজাতির অবস্হার বিপুল উন্নতি ঘটেছিল। বলা চলে, সভ্যতায় উন্নীত হওয়ার সংগ্রামে তখনই তারা আধআধি জয়লাভ করেছিল। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দলগুলোর সদস্যসংখ্যা কমিয়ে আনার একটা প্রবণতা নিশ্চয়ই দেখা দিতে শুরু করেছিল বন্য যুগ শেষ হওয়ার আগেই, কেননা বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারকে একটা

স্হায়ী ঘটনা হিসেবেই দেখেছি আমরা। যে প্রথার প্রভাবে অধিকতর অগ্রসর বন্য মানুষরা একদল স্ত্রী-র মধ্যে বিশেষ একজনকে নিজের প্রধান স্ত্রী হিসেবে চিনতে শিখেছিল, সেই প্রথমটাই পরবর্তীকালে আরও পরিণত হয়ে উঠে একজোড়া নারী-পুরুষের জোড়-বাঁধার সূচনা করে এবং পরিবারের ভরণপোষণের ব্যাপারে এই স্ত্রীটি হয়ে ওঠে স্বামীর সঙ্গী ও সহযোগী। জোড়-বাঁধার প্রবণতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের পিতৃত্ব নির্ধারণও যথেষ্ট সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। তবে স্বামী স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পারত এবং উভয়েই নিজের নিজের ইচ্ছে মত নতুন কোন সঙ্গী বা সঙ্গিনী জুটিয়ে নিতে পারত। তাছাড়া, বিবাহবন্ধনের বাধ্যবাধকতা বা দায়দায়িত্বকে পুরুষরা স্বীকার করত না, ফলে স্ত্রীদের দিক থেকে এই বাধ্যবাধকতা দাবী করার কোন অধিকারও থাকত না তাদের। দলগত বিবাহপ্রথা ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো দাম্পত্য ব্যবস্হা সংকীর্ণ হয়ে পড়লেও নতুন ধরনের পরিবারের মধ্যে তার ছাপ রয়েই গিয়েছিল এবং একেবারে সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে এসে না পেঁছিনো পর্যন্ত এই ছাপ পুরোপুরি মুছে যায় নি। এই ছাপ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল একবিবাহ চালু হওয়ার ঠিক আগে। পুরনো দাম্পত্য ব্যবস্হার ছায়াটা মুখ লুকিয়েছিল নতুন ধরনের বারাঙ্গনাবৃত্তির মধ্যে, যার অভিশাপ থেকে এই সভ্য যুগের পরিবারগুলোরও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি। জোড়-বাঁধা পরিবারের সঙ্গে একবিবাহভিত্তিক পরিবারের যতটা বৈষম্য, তার চেয়ে অনেক বেশি বৈষম্য ছিল দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের সঙ্গে জোড়-বাঁধা পরিবারের। সময়ের বিচারে জোড়া-বাঁধা পরিবার সৃষ্টি হয়েছে গোত্রের পরে এবং এই পরিবার গড়ে ওঠার পিছনে গোত্রের অবদান মোটেই কম নয়। এই পরিবার যে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর একবিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যবর্তী একটা স্তর, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্হার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে এই পরিবারের অক্ষমতার মধ্যেই। তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্হার অবসান ঘটানোর ক্ষমতা শুধুমাত্র একবিবাহেরই ছিল। কলম্বিয়া নদী থেকে শুরু করে প্যারাগুয়ে পর্যন্ত অঞ্চলের ইণ্ডিয়ান পরিবারগুলো ছিল মূলতঃই জোড়-বাঁধা পরিবার, দু'একটা জায়গায় চোখে পড়ত দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবার আর সম্ভবত একবিবাহভিত্তিক পরিবারের কোন অস্তিত্ব তখন ছিল না।

১২ এবং ১৩। পশুপালননির্ভর জীবনযাত্রা ও পিতৃপ্রধান পরিবার:

আমরা আগেই বলেছি যে বহুবিবাহ এই পরিবারের কোন অবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। আসলে এই ধরনের পরিবার ছিল মানুষের নিজস্বতা অর্জন করার একটা সামাজিক পদক্ষেপ। সেমিটিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এটা ছিল গবাদি পশুর দেখাশোনা করা, জমিতে চাষ করা এবং পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও জীবনধারণের জন্য গড়ে ওঠা ভৃত্য আর ক্রীতদাসদের একটা সংগঠন, যারা কাজ করত একজন পুরুষ-কর্তার অধীনে। বহু-বিবাহের ঘটনা কদাচিৎ ঘটত। একজন মাত্র পুরুষ-কর্তা এবং যৌন-সহবাস কেবলমাত্র দুজন নারী-পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা—এই দুটো কারণে এই পরিবার ছিল জোড়-বাঁধা পরিবারের চেয়ে উন্নত ধরনের সংগঠন, আর তাই এটাকে কোনরকম অবনমন বা অধঃপতন বলা চলে না। মানবজাতির ওপর এই পরিবারের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই তার পূর্ববর্তী যুগের সামাজিক অবস্হার একটা ছবি আর বুঝতে পারি যে

ঐ অবস্থাটাকে প্রতিহত করার জন্যই উদ্ভব ঘটেছিল এই পিতৃপ্রধান পরিবারের।

১৪। সম্পত্তির অভ্যুদয় এবং সম্পত্তির ওপর বংশগত উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ঃ

যে-সব সামাজিক ঘটনার ফল হিসেবে গড়ে উঠেছিল হিব্রু ও লাতিন ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবার, সেগুলোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে সম্পত্তির (নানা ধরনের সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে উঠছিল) ক্রমবর্ধমান প্রভাবও আসন্ন করে তুলছিল একবিবাহের অভ্যুদয়কে। মানবসভ্যতায় সম্পত্তির অবদান অসীম। সম্পত্তির প্রভাবেই আর্য ও সেমিটিক জাতিগুলো বর্বরতার আঁধার পেরিয়ে পা রাখতে পেরেছিল সভ্যতার আঙিনায়। প্রথম দিকে মানুষের মনে সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণাটা ছিল নেহাতই দুর্বল, কিন্তু শেষপর্যন্ত এটাই হয়ে ওঠে তার সবকিছুর নিয়ন্তা। মূলত সম্পত্তি সৃষ্টি, রক্ষা এবং তা ভোগ করার চিন্তা থেকেই গড়ে ওঠে সরকার আর আইন। সম্পত্তির স্বার্থেই শুরু হয় কিছু মানুষকে দাস বানানোর প্রক্রিয়া। তারপর বেশ কয়েক হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় যখন দেখা যায় সম্পত্তি-সৃষ্টির-যন্ত্র হিসেবে একজন ক্রীতদাসের থেকে একজন মুক্ত মানুষ অনেক বেশি কার্যকরী, তখন অবসান ঘটানো হয় দাসপ্রথার। মানুষের মনের সহজাত নিষ্ঠুরতা (সভ্যতা এবং খ্রিস্টধর্মের প্রভাবে কিছুটা কমলেও পুরোপুরি নির্মূল হয় নি) থেকে আজও বোঝা যায় যে মানুষ একসময় বন্য দশায় ছিল, এবং সেটা সবথেকে স্পষ্টভাবে ফুটে ওটে আমাদের লিখিত ইতিহাসের প্রতিটি শতাব্দী জুড়ে মানুষের দাসত্বের এই ইতিবৃত্তের মধ্যেই। কোন সম্পত্তিমালিকের সন্তানরাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে—এই নিয়মটাই পুরোপুরি একবিবাহভিত্তিকে পরিবার গড়ে ওঠার প্রথম সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। ক্রমে ক্রমে (যদিও খুবই ধীরে ধীরে) বিবাহের এই রূপটাই সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়, যেখানে যৌনমিলন সীমাবদ্ধ থাকে শুধুমাত্র একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যেই। তবে সভ্য যুগ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত এই বিবাহপ্রথা পাকাপাকিভাবে কায়েম হতে পারে নি।

১৫। একবিবাহভিত্তিক পরিবার ঃ

এই পরিবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিশ্চিত হয় সন্তানদের পিতৃত্ব, সমস্ত স্থাবর ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর যৌথ মালিকানার বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের বদলে ঐ-সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিগণিত হয় শুধুমাত্র সম্পত্তি-মালিকের নিজের সন্তানরা। একবিবাহভিত্তিক পরিবারের বনিয়াদের ওপরেই গড়ে ওঠে আধুনিক সমাজ। মানবজাতির পূর্বতন যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও অগ্রগতি মূর্ত হয়ে ওঠে এই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে। সুদূর বন্যতার যুগ থেকে শুধু করে খুব ধীরে লয়ে সমাজ অগ্রসর হয়েছে এই লক্ষ্যের দিকে। আসলে পূর্বতন সমস্ত যুগের যাবতীয় অভিজ্ঞতারই অভিমুখ ছিল এই একবিবাহভিত্তিক পরিবার। মূলত আধুনিক যুগের ঘটনা হলেও কার্যত এই পরিবার ছিল এক সুবিস্তৃত ও বহুমুখী অভিজ্ঞতারই ফসল।

১৬। আর্য, সেমিটিক ও উরালিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা ঃ

মূলগতভাবে অভিন্ন এই তিন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবারের প্রভাবেই। এই ধরনের বিবাহ ও এই ধরনের পরিবারের আওতায় যে-সব

সম্পর্ক দেখা যায়, সেগুলোই অভিব্যক্ত হয়েছে ঐ তিন ধরণের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা কোন যথেচ্ছভাবে রচিত বিধান নয়, এটা হচ্ছে স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির ফসল। ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠার সময় জ্ঞাতিত্ব ব্যাপারটাকে মানুষ যেভাবে দেখত, সেটাই মূর্ত হয়ে ওঠে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আর্য জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা থেকে যেমন বোঝা যায় যে ঐ ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবার, ঠিক তেমনি তুরানিয় জ্ঞাতিত্ব ব্যবস্থা থেকে দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের এবং মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা থেকে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিটি জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থার মধ্যে বিধৃত প্রমাণগুলো এতই সুদৃঢ় ধরনের যে এগুলোকে নিঃসংশয়ে সত্য বলে মেনে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। তিন ধরনের বিবাহ, তিন ধরনের পরিবার এবং তিন ধরনের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার ফলে পর্যায়ক্রমের ষোলটি ধাপের নয়টি ধাপ নিয়ে আর সংশয় থাকে না। বাকি ধাপগুলোর অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারেও আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করেছি।

এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত হল, তা যে বেশ কয়েক শতাব্দী জুড়ে সাধারণভাবে স্বীকৃত একটা অনুমানের বিরোধী—তা আমি জানি। ঐ অনুমান অনুযায়ী বর্বর এবং বন্যদের অস্তিত্বের কারণ হিসেবে দেখানো হত মানুষের অধঃপতনকে; কারণ সত্যিকারের মানুষের যে কাল্পনিক মানদণ্ডটার কথা ধরে নেওয়া হয়, তার থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অনেক নিচু অবস্থায় থাকে বর্বর ও বন্যরা। এই অনুমানটা কখনোই তথ্যের দ্বারা সমর্থিত কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হয়ে উঠতে পারে নি। মানুষের ধারাবাহিক নানান আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, সমাজব্যবস্থার প্রগতিমুখী বিকাশ এবং একের পর এক কয়েক ধরনের পরিবারের উদ্ভব এইসব ঘটনাই ঐ অনুমানের সম্ভাব্যতাকে নাকচ করে দেয়। আর্য ও সেমিটিক জাতির পূর্বপুরুষরা বর্বরই ছিল। এইখানেই প্রশ্ন ওঠে—বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে এবং ঐ পর্যায়ের বিভিন্ন কলাকৌশল ও বিকাশ অর্জন না করে তারা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে (এই পর্যায়ে থাকার সময়ই এদের কথা প্রথম জানা যায়) উন্নীত হল কী করে? আবার, বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে তারা ঐ যুগের মধ্য পর্যায়ে বা উন্নীত হল কী করে? এখানে থেকে আর একটু এগিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়—বন্যতার যুগ পার না হয়ে বর্বর যুগে উন্নীত হওয়া কি আদৌ সম্ভব? মানুষের অধঃপতনের ঐ ধারণাকে মেনে নিলে আর একটা বিষয়ও সেই সঙ্গে মেনে নিতেই হয়। সেটা হল এই যে, আর্য ও সেমিটিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত জাতিগুলো ছাড়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতিগুলো হচ্ছে অস্বাভাবিক জাতি, অর্থাৎ এই জাতিগুলো নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়ে নিম্ন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এ-কথা সত্য যে আর্য ও সেমিটিকে জাতিগুলোই মানব-প্রগতির মূল ধারার প্রতিভূ, কেননা এখনও পর্যন্ত অগ্রগতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পেরেছে এরাই। কিন্তু এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে আর্য ও সেমিটিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এরা বর্বরতার পর্যায়েই ছিল। কাজেই যখন দেখা যাচ্ছে যে এই গোষ্ঠীগুলোও একসময় বর্বর গোষ্ঠীই ছিল সেই বর্বর গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষরা ছিল বন্যদশার মানুষ, তখন ঐ

'স্বাভাবিক' ও 'অস্বাভাবিক' গোষ্ঠীর মধ্যে পৃথকীকরণের চেষ্টাটার আর কোন তাৎপর্য থাকে না।

সমাজের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সে-সব বিশিষ্ট পণ্ডিতরা হিব্রু ও লাতিন ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবারকেই পরিবারের সবথেকে প্রাচীন রূপ বলে ধরে নিয়েছেন এবং ঐ পরিবারই প্রথম সংগঠিত সমাজব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল বলে মনে করেছেন—তাঁদের সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করছে আমাদের এই পর্যায়ক্রম। তাঁদের যুক্তি অনুযায়ী একেবারে প্রথম থেকেই পিতৃকর্তৃত্বের অধীনে পরিবার গড়ে তোলার ধারণা মানুষের মধ্যে ছিল। সাম্প্রতিককালের অত্যন্ত বিশিষ্ট পণ্ডিত স্যর হেনরি মেইন এঁদের অন্যতম। প্রাচীন আইনের উৎস এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর মননদীপ্ত গবেষণা থেকে আমরা ঐ-সব আইন আর প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বহুকিছু জানতে পেরেছি। এটা সত্যি যে ধ্রুপদী যুগের ও সেমিটিক লেখকদের বর্ণনা থেকে হিসেব করলে পিতৃপ্রধান পরিবারই সবথেকে প্রাচীন পরিবার বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এইভাবে হিসেবে করতে গেলে বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের পর আর এগোনো যায় না, অর্থাৎ পুরো চারটি ঐতিহাসিক যুগ অনালোচিত থেকে যায় আর সেই যুগগুলোর মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কটা রয়ে যায় অজানা। তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে মানবজাতির প্রথম দিককার অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি খুব বেশিদিন আগে আমাদের হাতে আসে নি, তাই পুরনো মতবাদের বদলে নতুন মতবাদকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বিচক্ষণ গবেষকদের স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে।

ইতিহাসের গতিধারায় মানুষ একটা জিনিস আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে এসেছে, যা অধঃপতনের তত্ত্বকে এককথায় নাকচ করে দেয়। তীর-ধনুক আবিষ্কারের বা বন্দুক আবিষ্কারের আগে আবিষ্কার করতে হয়েছে বারুদ তৈরির প্রণালী, রেল গাড়ী এবং বাষ্পচালিত জাহাজ আবিষ্কারের আগে আবিষ্কার করতে হয়েছে বাষ্পচালিত এনজিন। একইভাবে, জীবনধারণের বিভিন্ন কলাকৌশলও একটার পর একটা আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ কিছুদিন অন্তর অন্তর। পাথুরে যন্ত্রপাতির যুগ অতিক্রম করে মানুষ এসে পেঁছেছে লোহার তৈরী যন্ত্রপাতির যুগে। শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও আদিম যুগ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। সেই আদিম যুগ থেকে শুরু করে আজকের সুসভ্য জাতিগুলোর মধ্যেও যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব দেখা যায়, তার কারণ ঐ-সব প্রতিষ্ঠানের ক্রমবৃদ্ধি, বিকাশ এবং এক যুগ থেকে পরের যুগে উত্তীর্ণ হতে পারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। একইভাবে, অতি প্রাচীন সেই ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবারের স্তর পার হয়ে, দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের পথ বেয়ে জোড়-বাঁধা বিবাহভিত্তিক পরিবারের যুগ অতিক্রম করে এই সামগ্রিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পেরেছিল একবিবাহভিত্তিক পরিবার। কাজেই একবিবাহভিত্তিক পরিবারকে সবথেকে প্রাচীন ধরনের পরিবার বলে মেনে নেওয়ার বোকামি না করলে আমরা এই পরিবারের উদ্ভব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারি। এই ধারণাটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এ থেকে আমরা বুঝতে পারি অনেকের একবিবাহভিত্তিক পরিবারের স্তরে এসে পেঁছানোর জন্য কতটা মূল্য দিতে হয়েছে

মানুষকে।

পৃথিবীর বুকে মানুষ যে বহু প্রাচীনকালের বাসিন্দা, তার স্বপক্ষে আমরা প্রচুর যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছি। সংস্কারমুক্ত মানুষদের বিশ্বাস উৎপাদনে জন্য এই যুক্তি প্রমাণগুলোই যথেষ্ট। ইওরোপের তুষার-যুগের সময়ে তো বটেই, এমনকি তার পূর্ববর্তী যুগেও পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। মানুষ যে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে পৃথিবীর বুকে, তা স্বীকার করতে আমরা এখন বাধ্য। এই সত্যটা উপলব্ধি করার পর বিগত লক্ষাধিক বছরে মানুষের জীবনযাত্রা কেমন থেকেছে তা জানার কৌতূহল জাগা একান্তই স্বাভাবিক। এই বিপুল সময়টা নিশ্চয়ই নিষ্ফলা যায় নি। মানুষের বিরাট বিরাট সাফল্যগুলোই প্রমাণ করে দেয় এই বিপুল সময়টা কত ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পেরেছে, আর সেই সঙ্গেই বোঝা যায় এক একটা সাফল্য অর্জনের জন্য ব্যয় হয়ে গেছে কি বিপুল সময়। মানুষ যে যথেষ্ট সাম্প্রতিককালে সভ্যতার যুগে এসে পৌঁছেছে—এই ঘটনাটা থেকেই বোঝা যায় মানুষের অগ্রগতির পথ কত দূরূহ ছিল, আর সেইসঙ্গেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মানুষের পথচলা শুরু হয়েছিল অনেক নিচের স্তর থেকে।

এতক্ষণ ধরে আমরা যে পর্যায়ক্রমের কথা বললাম, প্রয়োজনে তার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে উঠতে পারে, এমনকি এর কয়েকটি ধাপকেও যে ধারণার কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তা যে মানুষের অভিজ্ঞতা (যতদূর আমাদের জানা আছে) এবং মানুষের অগ্রগতির গতিপথ সম্বন্ধে একটা যথেষ্ট যুক্তিসম্মত ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হাজির করতে সক্ষম হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

টীকা—মিঃ জে. এফ. ম্যাকলেনান এর গ্রন্থ "প্রিসিটিড্ ম্যারেজ"।

এই বইয়ের ছাপার কাজ চলার সময় উপরোক্ত গ্রন্থটির একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ আমার হাতে আসে। এই সংস্করণটি তাঁর মূল গ্রন্থেরই পুনর্মুদ্রণ, শুধু কয়েকটি প্রবন্ধ এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম : "স্টাডিজ ইন এনসিয়েণ্ট হিস্টি: কম্প্রাইজিং এ রিপ্রিণ্ট অফ প্রিমিটিভ ম্যারেজ" (Studies in Ancient History Comprising a reprint of Primitive Marriage)।

নতুনভাবে সংযোজিত "সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করার জন্য পুরো একটা অধ্যায় (৪১ পৃষ্ঠা) ব্যয় করেছেন মিঃ ম্যাক্লেনান। আরেকটি অধ্যায়ে (৩৬ পৃষ্ঠা) রেখেছেন এই ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা। আমার যে ব্যাখ্যাকে তিনি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন, সেই ব্যাখ্যাটা রয়েছে আমার "সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি অ্যাণ্ড অ্যাফিনিটি অফ দ্য হিউম্যান ফ্যামিলি" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ৪৭৯-৪৮৬)। মূলত সেই একই তথ্য এবং ব্যাখ্যাই এই বইয়ের পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে (তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে, আর "সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি" ১৮৭১ সালে।

জ্ঞাতিত্বের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করে বিভিন্ন সারণীর সাহায্যে আমি এই ব্যবস্থার উদ্ভবের ব্যাপারে একটা প্রকল্প উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি। সত্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে প্রকল্প যে একটা প্রয়োজনীয় এবং

প্রায়শঃই অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার পূর্বোক্ত গ্রন্থে যে দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করেছি এবং এই গ্রন্থে যা আবার বলেছি, তার সঠিকতা-বেঠিকতা নির্ভর করছে এ ব্যাপারের যাবতীয় তথ্যকে এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় কি যায় না—তার ওপর। আরও কার্যকরী কোন সমাধান খুঁজে না-পাওয়া পর্যন্ত আমার রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগটা একান্তই সঙ্গত এবং বিজ্ঞান-সম্মত অনুসন্ধান-পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণই থেকে যাবে।

আমার এই প্রকল্পের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান। তাঁর সিদ্ধান্ত হল (স্টাডিজ, পৃঃ ৩৭১): "উল্লিখিত সমাধান নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমি যতটা জায়গা দিয়েছি, ততটা গুরুত্ব হয়ত ঐ সমাধান দাবী করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু মিঃ মর্গ্যানের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে স্মিথ্‌সনিয়ান ইনস্টিটিউশনের ছাপাখানা থেকে এবং রচনার কাজে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সাহায্য করেছেন, সেহেতু প্রায়শঃই এই গ্রন্থটিকে একটি প্রামাণিক রচনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাই এর পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক চরিত্রটা উন্মোচিত করে দেওয়াটা আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছি।" তাঁর এই বক্তব্য শুধু আমার প্রকল্পটাকেই অবৈজ্ঞানিক হিসেবে চিহ্নিত করছে না, গোটা বইটাই এই অভিযোগের আওতায় এসে পড়ছে।

আমার ঐ বইতে ১৮৭ পৃষ্ঠা জুড়ে "জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার সারণী" দেওয়া আছে, যাতে মোট ১৩৯-টা গোষ্ঠী আর জাতির অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির চার-পঞ্চমাংশের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সম্পর্কের মধ্যে থেকে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো (বিশেষত সারণীর আকারে প্রদত্ত হলে) যে কি করে "পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক চরিত্রের" হয়—বোঝা মুশকিল। গোটা বইটা জুড়ে আমি এইসব জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার বিভিন্ন নীরস দিকগুলো নিয়েই আলোচনা করেছি। বইয়ের একেবারে শেষ পরিচ্ছেদে, মোট ৫৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে মাত্র ৪৩ পৃষ্ঠা জুড়ে, বিভিন্ন জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করেছি, আর সেখানেই এসেছে ঐ সমাধান বা প্রকল্পের বিষয়টা। ঐ জায়গাটা ছিল বেশ কিছু নতুন তথ্য নিয়ে প্রথম আলোচনা। মিঃ ম্যাক্‌লেনান যদি তাঁর বক্তব্য শুধু ঐ পরিচ্ছেদটিতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলে তা নিয়ে এখানে আলোচনা করার কোন দরকার হত না। কিন্তু তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল আমার প্রদত্ত সারণীগুলো। এইসব সারণীতে উপস্থাপিত ব্যবস্থাগুলো যে আসলে জ্ঞাতিত্ব বা আত্মীয়তার ব্যবস্থা, আর তাই এগুলোই হচ্ছে বিষয়টির বনিয়াদস্বরূপ[১] এটাই তিনি অস্বীকার করেছেন।

আসলে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের উপরোক্ত মন্তব্য অকারণ নয়। ঐ সব সারণী থেকে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার যে ব্যবস্থাগুলো মূর্ত হয়ে ওঠে, সেগুলো তাঁর "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রধান অভিমত এবং প্রধান প্রধান অভিমত এবং প্রধান প্রধান তত্ত্বের বিরোধী তো বটেই, এমনকি সেগুলো ঐ-সব অভিমত আর তত্ত্বকে ভুল বলেও প্রতিপন্ন

১। "তবে, এই অনুসন্ধানের 'প্রধান ফসল' হচ্ছে 'সারণীগুলো'-ই। এগুলোর মর্মবস্তুকে আজ পর্যন্ত যেটুকু ব্যবহার করা হয়েছে, তার থেকে এগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান।"—"সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি," স্মিথ্‌সনিয়ান কন্‌ট্রিবিউশন্‌স্ টু নলেজ, খণ্ড ১৭, পৃঃ ৮.

করে। এই অবস্থায় "প্রিমিটিভ ম্যারেজ"-এর লেখক যে নিজের পূর্বধারণাকেই সমর্থন করতে চাইবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি!

যেমন, জ্ঞাতিব্যবস্থা হিসেবে এগুলো (১) দেখিয়ে দেয় যে মিঃ ম্যাকলেনান কর্তৃক উদ্ভাবিত "বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ" (Exogamy and Endogamy) নামক নতুন অভিধা দুটির উপযোগিতা মোটেই প্রশ্নাতীত নয় : "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে এই অভিধা দুটিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে এগুলোর অর্থ একেবারে বিপরীত তাৎপর্য পেয়েছে; তাছাড়া, ঐ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে "অন্তর্বিবাহে"-র প্রায় কোন সম্পর্কই নেই আর "বহির্বিবাহ" হচ্ছে গোত্রের একটা রীতি মাত্র এবং ব্যাপারটাকে সেভাবেই বিবৃত করা উচিত। (২) একই গোষ্ঠীর মধ্যে স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের পাশাপাশি পুরুষ-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ও যে বরাবরই চালু ছিল, এটা দেখিয়ে দিয়ে ঐ সারণীগুলো মিঃ ম্যাক্‌লেনান কথিত "শুধুমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুযায়ীই জ্ঞাতিত্ব নির্ণয় করা হত"—এই বক্তব্যকে খণ্ডন করেছে। (৩) ঐ সারণীগুলো থেকে বোঝা যায় যে নায়ার ও তিব্বতীদের মধ্যে নারীদের বহুবিবাহের যে রীতি চালু ছিল, তা পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই চালু ছিল বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। (৪) "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে "স্ত্রী চুরি"-র যে প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতার কথা বলা হয়েছে, ঐ সারণীগুলো তাকেও নাকচ করে দেয়।

যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মিঃ ম্যাক্‌লেনান তাঁর আক্রমণ শানিয়েছেন, সেই ভিত্তিকে পর্যালোচনা করে দেখলে তাঁর সমালোচনা তো খারিজ হয়ে যায়ই, সেই সঙ্গেই যে-সব তত্ত্ব তাঁর সমালোচনার বনিয়াদ হিসাবে কাজ করেছে সেগুলোর অপ্রতুলতাটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে পর্যালোচনা করতে বসলে এমন সব সিদ্ধান্তের মুখোমুখী হই আমরা যা তাঁর গ্রন্থের সামগ্রিক বক্তব্যটাকেই নড়বড়ে করে দেয়। নিম্নলিখিত প্রতিপাদ্য-গুলো নিয়ে আলোচনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই প্রতিপাদ্যগুলো হচ্ছে :

ক) "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে প্রযুক্ত প্রধান প্রধান অভিধা এবং তত্ত্বগুলোর কোন মূল্যই নেই জ্ঞাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে।

খ) সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনান যে প্রকল্পটি হাজির করেছেন, তা দিয়ে ঐ ব্যবস্থার উদ্ভবকে আদৌ ব্যাখ্যা করা যায় না।

গ) "সিস্টেম্‌স অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি" গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রকল্পটির বিরুদ্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের বক্তব্য একেবারের অন্তঃসারশূন্য।

এবার এই প্রতিপাদ্যগুলো নিয়ে একে একে আলোচনা করা যাক।

ক) "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে প্রযুক্ত প্রধান প্রধান অভিধা এবং তত্ত্বগুলোর কোন মূল্যই নেই জ্ঞাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে।

এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর জ্ঞাতিতত্ত্ববিদরা গ্রন্থটির বেশ প্রশংসা করেছিলেন, কেন না এই দূরকল্পী রচনাটিতে এমন কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছিল যেগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন জ্ঞাতিতত্ত্ববিদরা। তবে সতর্কভাবে গ্রন্থটি পড়ার পর এর বিভিন্ন সংজ্ঞার দুর্বলতা, বিভিন্ন অনাবশ্যক অনুমান, কাঁচা দূরকল্পনা এবং

ভ্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিঃ হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর "প্রিন্সিপল্স্ অফ সোশিওলজি" (অ্যাডভান্স শিটস, পপুলার সায়েন্স মান্থলি, জানুয়ারি ১৮৭৭, পৃঃ ২৭২) প্রবন্ধে এ-রকম কিছু দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। সেইসঙ্গেই তিনি "নারী-শিশু হত্যা", "স্ত্রী চুরি" এবং "বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ" সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্লেনানের তত্ত্বের ব্যাপক অংশটাকেই খারিজ করে দিয়েছেন। এর পরেও শুধু কিছু জাতি-তাত্ত্বিক বিষয়ের একত্র সমাবেশ ছাড়া ঐ বইটির আর কোন মূল্য থাকে কি?

এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই যথেষ্ট।

১. মিঃ ম্যাক্লেনান কর্তৃক "বহির্বিবাহ ও অন্তর্বিবাহ" অভিধা দুটির ব্যবহার।

"বহির্বিবাহ" ও "অন্তর্বিবাহ" অভিধা দুটি তিনিই উদ্ভাবন করেছেন। যথাক্রমে এ দুটির অর্থ হল বিশেষ একদল লোকের "বাইরে কাউকে বিবাহ করা"-র বাধ্যবাধকতা এবং বিশেষ একদল লোকের "মধ্যে কাউকে বিবাহ করা"-র বাধ্যবাধকতা।

যে-সব লেখকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন মিঃ ম্যাক্লেনান, তাঁদের লেখার সূত্রে নানা সংগঠিত দলগুলোর ক্ষেত্রে এই অভিধাগুলোকে তিনি এত যথেচ্ছ ও অনির্দিস্টভাবে যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন যে তাঁর অভিধা ও সিদ্ধান্ত—দুই-ই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। একটা সাংগঠনিক ক্রমমালার বিভিন্ন স্তর হিসেবে গোত্র ও গোষ্ঠীর মধ্যে, অথবা এই জাতীয় দলগুলোর মধ্যে, পার্থক্যটা কোথায়—তা চিহ্নিত না করাটা "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থের একটা প্রধান গলদ। এইভাবে চিহ্নিত না করার দরুন কোন্ কোন্ দলগুলোর ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ" বা "অন্তর্বিবাহে"-র কথা বলা হচ্ছে, তা বোঝার কোন উপায় থাকে না। যেমন, কোন গোষ্ঠীর আটটা গোত্রের মধ্যে একটা গোত্র নিজেদের গোত্রের ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ" চালু রেখে অন্য সাতটা গোত্রের সঙ্গে "অন্তর্বিবাহে"-র সম্বন্ধে বজায় রাখতে পারে। তাছাড়া, এরকম ক্ষেত্রে এইসব অভিধাকে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করা হলে তা আমাদের মধ্যে ভুল ধারণারই জন্ম দেয়। মিঃ ম্যাক্লেনান সম্ভবত দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথাই বলতে চেয়েছেন, যে নীতি দুটো মানুষের ইতিহাসের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী দুটো পৃথক পৃথক সামাজিক অবস্থার প্রতিভূ-স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে সমাজের যে অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে "অন্তর্বিবাহে"-র প্রায় কোন সম্পর্কই নেই; আর "বহির্বিবাহ" হচ্ছে গোত্রের অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের বা সমাজ সংগঠনের প্রাথমিক এককের একটা বিশেষ নিয়ম বা আইন। মানুষের ইতিহাসে গোত্রের প্রভাব অসীম আর এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। গোত্রের কার্যকলাপ, গুণাগুণ, গোত্রের সদস্যদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধে এবং বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। কিন্তু এইসব বস্তুগত দিক নিয়ে মিঃ ম্যাক্লেনান কোন আলোচনাই করেন নি। আর গোত্রই যে প্রাচীন সমাজকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করত, সে ব্যাপারেও তাঁর কোন ধারণা আছে বলে মনে হয় না। গোত্রের অন্যতম দুটো নিয়ম ছিল: (১) গোত্রের মধ্যে অন্তর্বিবাহ (intermarriage) নিষিদ্ধ। এই নিয়মটাই হচ্ছে মিঃ ম্যাক্লেনান কথিত সেই "বহির্বিবাহ" (exogamy)—যা সর্বদাই গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, অথচ তিনি গোত্রের কথা আদৌ উল্লেখ না করেই এই নিয়মের কথা বলেছেন। (২) প্রাচীন ধরনের গোত্রে বংশধারা নির্ণীত হয় স্ত্রী-ধারা অনুসারে, যাকে

মিঃ ম্যাক্লেনান বলেছেন "শুধুমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুসারে জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়" এবং এক্ষেত্রেও তিনি গোত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন নি।

বিষয়টাকে আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থার এবং গোষ্ঠীর সাতটি সংজ্ঞা দিয়েছেন মিঃ ম্যাক্লেনান (স্টাডিজ, পৃঃ ১১৩-১১৫)।

"**পুরোপুরি বহির্বিবাহ**—১। গোষ্ঠীগত (অথবা পরিবারগত) ব্যবস্থা—প্রতিটি গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য একই বংশের লোক, অথবা সেভাবেই নিজেদেরকে দেখাতে চায় তারা। একই গোষ্ঠীর নারী-পুরুষরা পরস্পরকে বিবাহ করতে পারে না।

"২। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা—গোষ্ঠী হচ্ছে বেশ কিছু পরিবারের সমষ্টি, যার মধ্যে কুল, গোত্র প্রভৃতি নানান বিভাগ থাকে। একই বিভাগের নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ হয় না, কিন্তু এক বিভাগের সঙ্গে অন্য যে-কোন বিভাগের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।

"৩। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা—গোষ্ঠী হচ্ছে বেশ কিছু পরিবারের সমষ্টি।...একই পদবীবিশিষ্ট অর্থাৎ একই বংশের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না।

"৪। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা—গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ থাকে। একই বিভাগের নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ঃ কয়েকটি বিভাগের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অর্থাৎ একটি বিভাগের সদস্যরা অন্য বিভাগের কারুকে বিবাহ করতে পারে। আবার একটি বিভাগের সঙ্গে অন্য কয়েকটি বিভাগের আংশিক বৈবাহিক সম্পর্ক থাকে।...

"৫। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা—গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ থাকে। একই বংশের সদস্যদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। প্রতিটি বিভাগের পরস্পরের মধ্যে এবং অন্য কয়েকটি বিভাগের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকে। কয়েকটি বিভাগের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা একেবারেই নিষিদ্ধ। জাতিভেদ (caste)।

"**পুরোপুরি অন্তর্বিবাহ**—৬। গোষ্ঠীগত (অথবা পারিবারিক) ব্যবস্থা—প্রতিটি গোষ্ঠী পরস্পরের থেকে পৃথক। প্রতিটি গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য একই বংশের লোক, অথবা সেভাবেই নিজেদেরকে দেখাতে চায় তারা। বিবাহ হয় গোষ্ঠীর মধ্যেই। গোষ্ঠীর বাইরের কারুকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

"৭। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট।"

সাত সাতটা সংজ্ঞা ! এতগুলো সংজ্ঞার সাহায্যে গোষ্ঠী নামক দলটার নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট-ভাবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়া উচিত !

তবে, প্রথম সংজ্ঞাটা নেহাতই একটা ধাঁধা মাত্র। গোষ্ঠীগত ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকে বলা হয়েছে, অথচ এই গোষ্ঠী-সমষ্টির জন্য কোন অভিধা ব্যবহার করা হয় নি। অর্থাৎ এই গোষ্ঠীগুলোর সম্মিলনের ফলে যে একটা ঐক্যবদ্ধ সংস্থা গড়ে ওঠে, এটা তিনি মনে করছেন না। সেক্ষেত্রে, আলাদা গোষ্ঠীগুলো কি করে একটা গোষ্ঠীগত ব্যবস্থার আওতায় আসে বা কিভাবে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে—বোঝা দুষ্কর। গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য একই বংশের লোক অথবা নিজেদেরকে সেইরকমই দেখাতে চায় তারা, এবং সেই জন্য একই গোষ্ঠীর নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এ থেকে হয়ত গোত্রের প্রশ্নটা উঠে আসতে পারে। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত গোত্রের থেকে আলাদা হয়ে

একটা গোত্র টিকে রয়েছে—এমনটা কখনোই দেখা যায় না। বিভিন্ন গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা যে-কোন গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দরুণ বেশ কিছু গোত্র পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু এখানে গোত্রের সমতুল হিসেবে গোষ্ঠী শব্দটা কিংবা বেশ কিছু পরিবারের সমষ্টি কথাটা মিঃ ম্যাক্‌লেনান ব্যবহার করতে পারেন না। একটা গোষ্ঠীগত ব্যবস্থার মধ্যে জ্ঞাতিদের পৃথক পৃথক দলগুলো একসঙ্গে বসবাস করে—বলছেন তিনি (কিন্তু সেই দলগুলোকে চিহ্নিত করছেন না আর ব্যবস্থাটারও কোন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না)। এর ফলে আমরা একেবারে অচেনা একটা বিষয়ের মুখোমুখী হচ্ছি। ৬-নং সংজ্ঞাটাও তথৈবচ। এই দুটো সংজ্ঞার কোন একটার সঙ্গেও মিল আছে—এমন কোন গোষ্ঠী পৃথিবীর কোথাও কোন সময়েই থাকতে পারে না। কারণ এইসব সংজ্ঞায় বর্ণিত কাঠামোটা না কোন গোত্রের, না কিছু গোত্র নিয়ে গঠিত কোন গোষ্ঠীর, আর না বিভিন্ন গোষ্ঠীর একাঙ্গীভবনের ফলে গড়ে ওঠা কোন জাতির।

২, ৩, ৪ এবং ৫-নং সংজ্ঞাগুলো বরং কিছুটা বোধ্য। এগুলোতে কিছু গোত্রের সমন্বয়ে অথবা জ্ঞাতিত্বভিত্তিক কিছু বিভাগের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটাকে গোষ্ঠীগত ব্যবস্থা না বলে গোত্রগত ব্যবস্থাই বলা উচিত। একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত কুল, গোত্র বা বিভাগ-গুলোর মধ্যে বিবাহ হওয়া যেহেতু নিষিদ্ধ নয়, সেহেতু এ-সব ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে "বহির্বিবাহ" চালু আছে বলাটাও যুক্তি-সঙ্গত নয়। একটা কুল, গোত্র বা বিভাগ তার নিজের ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ"-ই অনুসরণ করে, কিন্তু অন্য সমস্ত কুল, গোত্র বা বিভাগের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা "অন্তর্বিবাহ-মূলক।" কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু কিছু বাধানিষেধ থাকে।

মিঃ ম্যাক্‌লেনান যখন কোন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ" কিংবা "অন্তর্বিবাহ" অভিধা-গুলো ব্যবহার করেন, তখন সেই গোষ্ঠীটা একটা গোষ্ঠীগত ব্যবস্থার (এর অর্থ যা-ই হোক না কেন) অন্তর্গত বিভিন্ন পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর অন্যতম, নাকি এমন কোন গোষ্ঠী যাকে তিনি বেশ কিছু পরিবারের সমষ্টি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—তা বোঝা যাবে কী করে? পরের পৃষ্ঠায় (পৃঃ ১১৬) তিনি বলছেন ঃ "বহির্বিবাহ-অনুসারী পৃথক পৃথক গোষ্ঠীও অসংখ্য দেখা যায় এবং কোন কোন ব্যাপারে এরা প্রথমোক্তদের মতই অমার্জিত ধরনের হয়ে থাকে।" এখানে গোষ্ঠী বলতে যদি তিনি কিছু পরিবারের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকেন, যা আসলে কিছু গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীকেই বোঝায়, তাহলে সেই গোষ্ঠীকে কখনোই "বহির্বিবাহ-অনুসারী" বলা যায় না। পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় কিছু গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা কোন গোষ্ঠীর মধ্যে "বহির্বিবাহ" চালু থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই এবং থাকতেও পারে না। যেখানেই গোত্রীয় সংগঠন দেখা গেছে, সেখানেই একই গোত্রের নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। মিঃ ম্যাক্‌লেনান কথিত "বহির্বিবাহে"-র অন্তর্বস্তুটা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু কোন একটা গোত্রের নারী-পুরুষদের সঙ্গে সেই গোষ্ঠীর অন্যান্য গোত্র-গুলোর পুরুষ-নারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না। গোত্র হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" আর গোষ্ঠী অপরিহার্যভাবেই "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।" এ-সব ক্ষেত্রে, এবং সম্ভবত সব ক্ষেত্রেই, প্রথমে জানা দরকার গোষ্ঠী বলতে ঠিক কোন্ দলটার কথা বলা

হচ্ছে। আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক (পৃঃ ৪২); "যদি দেখানো যায়, প্রথমত, যে বহির্বিবাহ-অনুসারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে বা ছিল, এবং দ্বিতীয়ত, প্রাচীন আমলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সবসময়ই বা প্রায় সবসময়ই শত্রুতামূলক সম্পর্ক থাকত, তাহলে আমরা এমন একটা অবস্থার মুখোমুখী হই যেখানে স্ত্রী পাওয়ার জন্য নারীদের বন্দিনী করে নিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।" এটাই হচ্ছে মিঃ ম্যাক্লেনানের স্ত্রী-চুরি সংক্রান্ত তত্ত্বের সূচনাবিন্দু। এখানে যে "অবস্থা"-র (অর্থাৎ, শত্রুভাবাপন্ন এবং সেহেতু পৃথক পৃথক গোষ্ঠী) কথা বলা হচ্ছে, তা গোষ্ঠী বলতে নিশ্চয়ই একটা বৃহত্তর দলকে অর্থাৎ কিছু গোত্র নিয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীকেই বোঝাচ্ছে। কেননা কোন গোষ্ঠীর বিভিন্ন গোত্রের প্রত্যেকটা পরিবার বিবাহ মারফৎ পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং ঐ গোষ্ঠী কর্তৃক অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলটা জুড়েই এই মিশ্রণ ঘটে থাকে। হয় সমস্ত গোত্রগুলোই পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হবে, অথবা কারুর সঙ্গেই কারুর শত্রুতা থাকবে না। কথাটা যদি ক্ষুদ্রতর দল অর্থাৎ গোত্র সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় গোত্র হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" এবং এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সাত-অষ্টমাংশ হচ্ছে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।" তাহলে স্ত্রী-চুরি করার "অবস্থা"-টা আসছে কোথা থেকে?

"বহির্বিবাহ"-এর প্রমাণ দেওয়ার জন্য "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু গোষ্ঠী, যেমন খোন্দ, কল্মাক্, সার্কাসিয়ান, ইয়ুরাক, সাময়েড প্রভৃতি গোষ্ঠীর এবং ইরোকোয়া সহ আমেরিকার কিছু ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর উদাহরণ উল্লিখিত হয়েছে (পৃঃ ৭৫-১০০)। আমেরিকার গোষ্ঠীগুলো সাধারণত কয়েকটা গোত্র নিয়েই গড়ে ওঠে। কোন পুরুষ তার নিজের গোত্রের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না, কিন্তু নিজের গোষ্ঠীর অন্য কোন গোত্রের কোন নারীকে সে বিবাহ করতেই পারে। যেমন, ইরোকোয়াদের সেনেকা গোষ্ঠীর নেকড়ে গোত্রের কোন পুরুষ ঐ গোত্রের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না। ইরোকোয়াদের বাকি পাঁচটা গোষ্ঠীর মধ্যেও একই নিয়ম চালু আছে। এই হচ্ছে মিঃ ম্যাক্লেনান কথিত সেই "বহির্বিবাহ", তবে এই নিয়মটা শুধু নিজের গোত্রের মধ্যেই সীমিত থাকে। নেকড়ে গোত্রের ঐ পুরুষটি সেনেকা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বাকি সাতটা গোত্রের যে-কোন নারীকে বিবাহ করতেই পারে। এই হচ্ছে গোষ্ঠীর মধ্যেকার "অন্তর্বিবাহ", নেকড়ে গোত্রের সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে সেনেকা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বাকি সাতটা গোত্রের। একই গোষ্ঠীর মধ্যে একই সময়ে দুটো প্রথাই চালু থাকে এবং এভাবেই চালু থেকেছে স্মরণাতীত কাল থেকে। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রেও মোটামুটি একই কথা প্রযোজ্য। তাসত্ত্বেও মিঃ ম্যাক্লেনান এদেরকে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোষ্ঠী হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং এটাকেই নিজের তত্ত্বের বুনিয়াদ করে তুলতে চেয়েছেন।

উপরোক্ত ক্ষেত্রটাতে মিঃ ম্যাক্লেনান সম্ভবত "অন্তর্বিবাহ" কথাটা ব্যবহার করতে চাইবেন না। কারণ, প্রথমত, "বহির্বিবাহ" ও "অন্তর্বিবাহ" এখানে তাঁর ধারণা মত দুটো পরস্পরবিরোধী নীতিকে তুলে ধরছে না; এবং দ্বিতীয়ত, এখানে প্রকৃতপক্ষে একটা কথাই শুধু স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে একই গোত্রের নারী ও পুরুষদের মধ্যে বিবাহ

নিষিদ্ধ। সাধারণত আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের গোষ্ঠীর কাউকে অথবা বাইরের কোন গোষ্ঠীর কাউকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু নিজেদের গোত্রের কাউকে বিবাহ করতে পারে না। "অন্তর্বিবাহ"-এর একটা সঠিক উদাহরণ দিতে পেরেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান। এই ঘটনাটা দেখা যায় মাঞ্চু তাতারদের মধ্যে (পৃঃ ১১৬), "যারা ভিন্ন ভিন্ন পদবীবিশিষ্ট নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে।" আজকের দিনের কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যেও এই নিয়ম চালু আছে।

সাইবেরিয়ার ইয়ুরাক সাময়েড (৮২), নেপালের মাগার (৮৩), ভারতবর্ষের মণিপুরী, কুপুয়ী, মো, মুরাম এবং মুরিং (৮৭) প্রভৃতি গোষ্ঠীর সংগঠনকে যদি প্রকৃত তথ্যের আলোয় বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে খুব সম্ভবত দেখা যাবে যে ইরোকোয়া গোষ্ঠী-গুলোর সংগঠনের সঙ্গে এদের সংগঠনের কোন তফাৎ নেই। এদের বিভিন্ন "বিভাগ" আর "শাখা" (thum) আসলে গোত্রই। সাময়েডদের ইয়ুরাক বা কাসোভো বিভাগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ ক্র্যাপ্‌রথকে উদ্ধৃত করে ল্যাথাম্ লিখেছেন ; "জাতিতত্ত্বের এই বিভাগগুলোকে খুব কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। কোন সাময়েড পুরুষ তার নিজের বিভাগের কোন নারীকে বিবাহ করতে পারে না। তাকে স্ত্রী সংগ্রহ করতে হয় অন্য দুটো বিভাগের কোন একটা থেকে।"[১] মাগারদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লাথাম লিখছেন ; "এদের মধ্যে বারোটা শাখা (thum) আছে। একই শাখার অন্তর্গত সমস্ত লোককে একই পূর্বপুরুষের বংশধর বলে ধরে নেওয়া হয়, মায়ের দিক থেকে বংশধারা নির্ণয় করা মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। তাই স্বামী ও স্ত্রীকে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন শাখার সদস্য হতে হয়। একই শাখার নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না। স্ত্রী চাই? তাহলে পাশের শাখায় খোঁজ কর। মোদ্দা কথা, নিজের শাখার বাইরে স্ত্রী খুঁজতে হবে। এই প্রথাটার কথা আমি এই প্রথম উল্লেখ করলাম। কিন্তু এটাই শেষ দৃষ্টান্ত নয়। এই নিয়মটা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চালু আছে।"[২] ভারতবর্ষের মুরিং ও অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগ দেখা যায়, এবং এদের মধ্যেও বিবাহের ব্যাপারে একই নিয়ম কার্যকরী। খুব সম্ভবত এগুলো হচ্ছে গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত বিভিন্ন গোষ্ঠী, যাদের নিয়মে নিজের গোত্রের কাউকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। প্রতিটি গোত্র তার নিজের ক্ষেত্রে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" এবং ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য গোত্রগুলোর ক্ষেত্রে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।" তথাপি মিঃ ম্যাক্‌লেনান এদেরকে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলোও গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত এবং এদের মধ্যেও নিজের গোত্রের কাউকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রেও গোত্র হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" আর গোষ্ঠী হচ্ছে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।"

যেখানে গোত্র তার নিজের ব্যাপারে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" আর গোষ্ঠীর অন্যান্য গোত্রগুলোর ব্যাপারে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী", সেখানে মাত্র একটা বিষয়কে অর্থাৎ একই গোত্রের নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ—এই ব্যাপারটাকে চিহ্নিত করার

১। "ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ এথ্‌নোলজি", লণ্ডন সংস্করণ, ১৮৫৯, i, ৪৭৫.

২। ঐ, i, ৮০.

জন্য একজোড়া অভিধা খাড়া করার দরকারটা কী? অভিধা দুটোকে এমনভাবে হাজির করা হয়েছে যেন এগুলো সমাজের দুটো বিপরীত অবস্থাকেই মূর্ত করে তোলে। কিন্তু সে অর্থে এই "বহির্বিবাহ' আর "অন্তর্বিবাহ" অভিধা দুটোর কোন মূল্যই নেই। আমেরিকার জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে এবং সম্ভবত এশিয়া ও ইওরোপের জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এগুলো নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। "বহির্বিবাহ" অভিধাটা শুধুমাত্র একটা ছোট দল অর্থাৎ গোত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। তাই এই অভিধাটাকে আলাদা করে শুধু গোত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তা মেনে নেওয়া যায়। সারা আমেরিকায় কোন "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোষ্ঠী নেই, কিন্তু "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোত্র আছে অজস্র। গোত্র থাকলে গোত্রের কিছু নিয়ম-কানুনও থাকবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, সেগুলো গোত্রের নিজস্ব নিয়ম। মিঃ ম্যাক্‌লেনানের মতে কুল, শাখা, বিভাগ এগুলো হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী" আর এইসব কুল, শাখা, বিভাগের সমষ্টিটা হচ্ছে "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী।" অথচ "অন্তর্বিবাহ" সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। এমনকি তিনি এ-ও বলেন নি যে ঐ কুল, শাখা, বিভাগ ইত্যাদি "বহির্বিবাহ-অনুসারী", বরং বলেছেন যে গোষ্ঠীই হচ্ছে "বহির্বিবাহ-অনুসারী।" আপাতভাবে মনে হতে পারে যে কুল, শাখা, বিভাগ ইত্যাদির সমতুল হিসেবেই তিনি গোষ্ঠী শব্দটা ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কিন্তু না। তিনি বলছেন, "গোষ্ঠী হচ্ছে কিছু পরিবারের সমষ্টি, যার মধ্যে থাকে নানান বিভাগ, কুল, শাখা ইত্যাদি" (১১৪)। আবার বলছেন (১১৬), "অন্তর্বিবাহ-অনুসারী পৃথক পৃথক গোষ্ঠীগুলো বহির্বিবাহ-অনুসারী পৃথক পৃথক গোষ্ঠীগুলোর মতই সংখ্যায় অজস্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মতই অমার্জিতও বটে।" তাঁর প্রধান প্রধান সংজ্ঞাগুলোকে বিচার করে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে এই গ্রন্থে মিঃ ম্যাক্‌লেনান "বহির্বিবাহ-অনুসারী" গোষ্ঠীর একটা দৃষ্টান্তও হাজির করতে পারেন নি।

এই অভিধা দুটো সম্বন্ধে আরেকটা আপত্তিও উঠতে বাধ্য। দুটো পরস্পর-বিপরীত এবং বিসদৃশ সামাজিক অবস্থাকে চিহ্নিত করার জন্য এই অভিধা দুটো আমদানী করা হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, ঐ দুটো অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা পিছিয়ে থাকা এবং কোন্‌টাই বা অগ্রগতির দ্যোতক? মিঃ ম্যাক্‌লেনান এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। "এগুলো দিয়ে বহির্বিবাহ থেকে অন্তর্বিবাহে উন্নত হওয়া কিংবা অন্তর্বিবাহ থেকে বহির্বিবাহে উন্নত হওয়া—দুটোই বোঝানো যেতে পারে" (১১৫); "দুটোই সমান প্রাচীন হতে পারে" (১১৬); এবং, "কোন কোন ব্যাপারে দুটোই" সমান অমার্জিত (১১৬)। কিন্তু আলোচনার শেষদিকে তিনি "অন্তর্বিবাহ"-কেই উচ্চতর আসন দিয়েছেন বলেছেন, এটাই হচ্ছে সভ্যতামুখী পদক্ষেপ, আর "বহির্বিবাহ" পরিণত হয়েছে বন্যতার লক্ষণে। মিঃ ম্যাক্‌লেনানের ভাবনা অনুযায়ী "বহির্বিবাহ"-কে বিভিন্নধর্মীতার দ্যোতক হিসেবে দেখানো আর তার বিপরীতে "অন্তর্বিবাহ"-কে সমধর্মীতার দ্যোতক হিসেবে দেখানোটাই সুবিধেজনক। তাই শেষ পর্যন্ত "বহির্বিবাহ"-এর তুলনায় "অন্তর্বিবাহ"-কেই অগ্রগতির সহায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি।

এই অভিধা দুটোর অন্তর্বস্তুকে ঠিক উল্টো করে দেখাটা হচ্ছে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের অন্যতম ত্রুটি। যাকে তিনি "অন্তর্বিবাহ" বলেছেন, মানবপ্রগতির পরম্পরায় তা

"বহির্বিবাহ"-এর থেকে আগেকার ব্যাপার এবং বস্তুতপক্ষে এটা ছিল মানবজাতির একেবারে নিম্নতম স্তরের ঘটনা। গোত্র গড়ে ওঠার আগের যে পর্যায়ে মালয়ী জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেই পর্যায়ে আমরা ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ হওয়ার কথা জানতে পারি। ঐ জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা থেকেই এই তথ্যটা জানা যায়, সেইসঙ্গেই বোঝা যায় ভাইবোন বিবাহভিত্তিক দলগুলোর প্রকৃতি কেমন ছিল, আর এর মধ্যেই ফুটে ওঠে "অন্তর্বিবাহ"-এর আদি রূপটা। এর পর "অন্তর্বিবাহ" প্রথম বাধাপ্রাপ্ত হয় দলগত বিবাহের স্তরে এসে। এই স্তরে আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির জ্ঞাতি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ চালু থাকে (এদেরকে তখনও ভাইবোনই বলা হত)। অস্ট্রেলিয়দের লিঙ্গভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা চোখে পড়ে। অগ্রগতির গতিপথে এরপর আবির্ভাব হয় গোত্রের, বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত হতে থাকে স্ত্রী-ধারা এবং একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত নারী-পুরুষদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সূচনা হয় মিঃ ম্যাক্‌লেনান কথিত "বহির্বিবাহ"-এর। এর পর থেকে মানবজাতির জীবনে "অন্তর্বিবাহ" আর তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

মিঃ ম্যাক্‌লেনানের মতে, অগ্রসর জাতিগুলোর মধ্যে "বহির্বিবাহ" কমে যেতে শুরু করেছিল এবং বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারা চালু হওয়ার পর গ্রীক ও রোমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায় (পৃঃ ২২০)। বাস্তবে কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ এ-রকম ঘটেনি। যাকে তিনি "বহির্বিবাহ" বলছেন, তার উদ্ভব হয় বন্যতার যুগে গোত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, বর্বর যুগের সমগ্র পর্যায়টা জুড়ে তা টিকে থাকে এবং এই সভ্যতার যুগেও সেই রীতি চালু আছে। আজকের দিনের ইরোকোয়া গোত্রগুলোর মধ্যে এই রীতিটা যেমন পূর্ণ মাত্রায় চালু আছে, ঠিক তেমনি পূর্ণ মাত্রাতেই তা চালু ছিল সোলোন ও সার্ভিয়াস টিউলিয়াসের আমলের গ্রীক আর রোমানদের মধ্যেও। "বহির্বিবাহ" ও "অন্তর্বিবাহ" অভিধা দুটোকে "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে এগুলোর অর্থ পুরোপুরি বিকৃত হয়ে গেছে। তাই এখানে এগুলোকে অগ্রাহ্য করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

২। মিঃ ম্যাক্‌লেনানের বক্তব্য: "কেবলমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুসারেই জ্ঞাতিত্ব নির্ণয় করা হয়।"

"প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে এই বক্তব্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য হল—যে-সব জায়গায় এই রীতি চালু ছিল, সেইসব জায়গায় এটাই ছিল জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের একমাত্র রীতি। কথাটা কতখানি ভুল, তা এক নজরেই বোঝা যায়। তুরানিয়, গ্যানোয়ানিয় এবং মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা স্পষ্টভাবেই দেখিয়ে দেয় যে স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের পাশাপাশি বরাবরই পুরুষ-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ও চালু ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির ভাই ও বোন, পিতামহ / মাতামহ ও পিতামহী / মাতামহী, পৌত্র / দৌহিত্র ও পৌত্রী / দৌহিত্রী থাকত। অর্থাৎ স্ত্রী-ধারার মত পুরুষ-ধারা অনুসারেও জ্ঞাতিত্ব নির্ধারণ করা হত। সন্তানদের মায়ের পরিচয় নিশ্চিতভাবেই জানা যেত, কিন্তু তাদের বাবার পরিচয় সবসময় নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব ছিল না। এই অনিশ্চয়তার জন্য কিন্তু পুরুষ-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব

নির্ণয়টা বাতিল হয়ে যায় না, বরং এই সুযোগে জ্ঞাতির সংখ্যা কিছু বেড়েই যায় ঃ সম্ভাব্য পিতারা বিবেচিত হয় প্রকৃত পিতা হিসেবে, সম্ভাব্য ভাইরা গণ্য হয় প্রকৃত ভাই হিসেবে এবং সম্ভাব্য পুত্ররা গণ্য হয় প্রকৃত পুত্র হিসেবে।

গোত্র গড়ে ওঠার পর স্ত্রী-ধারা অনুসারী জ্ঞাতিত্বের গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে যায়। কারণ তখন থেকে স্ত্রী-ধারার জ্ঞাতিরা বিবেচিত হতে থাকে সগোত্রীয় জ্ঞাতি হিসেবে, বাকিরা পরিণত হয় ভিনগোত্রীয় জ্ঞাতিতে। মিঃ ম্যাক্‌লেনান যে-সব লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জ্ঞাতিত্বের কথাই বলেছেন। কোন গোত্রের নারী সদস্যাদের সন্তানরা ঐ গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত হত, কিন্তু তার পুরুষ সদস্যদের সন্তানরা ঐ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হত না। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারা চালু থাকার সময় গোত্রের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কেবলমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুসারেই নিজের নিজের বংশপরিচয় নির্ধারণ করত আর পুরুষ-ধারা চালু থাকার সময় সকলেই বংশপরিচয় নির্ধারণ করত পুরুষ-ধারা অনুসারেই। গোত্রের সদস্যদের নিয়ে গড়ে উঠত জ্ঞাতিদের একটা সংগঠন এবং এরা প্রত্যেকে একই পদবী ধারণ করত। রক্তসম্বন্ধের বন্ধনে এবং পারস্পরিক অধিকার, সুযোগসুবিধে ও দায়দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকত এরা। উভয় ক্ষেত্রেই অন্যান্য জ্ঞাতিদের থেকে বেশি গুরুত্ব পেত সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা। অন্য কোন জ্ঞাতিদের স্বীকার করা হত না বলে যে এরা বেশি গুরুত্ব পেত, তা নয়। আসলে সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা ঐ গোত্রের বিভিন্ন অধিকার আর সুযোগসুবিধে এক সঙ্গে ভোগ করত বলেই গুরুত্বটা এরা বেশি পেত। এই পার্থক্যটা আবিষ্কারে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের ব্যর্থতা থেকেই বোঝা যায় নিজের গবেষণার বিষয়টা নিয়ে তিনি মোটেই পর্যাপ্ত অনুসন্ধান চালান নি। স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের নিজের গোত্রের মধ্যে থাকে তার মাতামহ ও মাতামহীরা, মায়েরা, ভাইবোনেরা, মামারা, ভাগ্নে-ভাগ্নীরা এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা। এদের মধ্যে কয়েকজন তার একেবারে আপন, আবার কেউ কেউ জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্পর্কিত। নিজের গোত্রের বাইরেও তার পিতামহ-পিতামহী, ভাইবোন, ভাইপো-ভাইঝি, পৌত্র-পৌত্রী থাকে (শুধু মামা থাকে না)। এছাড়া থাকে তার বাবারা, পিসিরা, পুত্র-কন্যারা, খুড়তুত-জ্যাঠতুত ভাই-বোনরা। একজন নারীরও নিজের গোত্রের মধ্যে একই জ্ঞাতিরা থাকে, সেইসঙ্গে থাকে তার পুত্রকন্যারা। গোত্রের বাইরেও তার একই জ্ঞাতিরা থাকে। নিজের গোত্রের মধ্যেই হোক আর বাইরেই হোক, ভাইকে ভাই হিসেবে, বাবাকে বাবা হিসেবে, পুত্রকে পুত্র হিসেবেই স্বীকৃতি দেওয়া হত, এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই সম্বোধনগুলো ব্যবহার করত। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রী-ধারা অনুসারে বংশধারা নির্ণয়, যাকে মিঃ ম্যাক্‌লেনান "কেবলমাত্র স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়" বলতে চেয়েছেন, তা গোত্রের একটা নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপারটাকে এভাবেই বলা উচিত, কারণ গোত্রই হচ্ছে মুখ্য বিষয় আর সগোত্রীয় জ্ঞাতিত্বটা তার বিভিন্ন লক্ষণের অন্যতম মাত্র।

গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার আগে স্ত্রী-ধারা অনুসারে জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের রীতিটা নিশ্চয়ই পুরুষ-ধারা অনুসারে জ্ঞাতিত্ব নির্ণয়ের থেকে অনেক বেশি জোরদার ছিল এবং মূলত এই ধরনের জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল নিম্নস্তরের গোষ্ঠীজাতীয়

দলগুলো। কিন্তু গোত্রীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে মানবজাতি কোন্ অবস্থায় ছিল, তার সঙ্গে "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে আলোচিত বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই।

৩। নায়ার এবং তিব্বতীদের ধাঁচে ব্যাপকভাবে নারীদের বহুবিবাহ চালু থাকার কোন প্রমাণ নেই।

মিঃ ম্যাক্‌লেনানের মতে এই ধরনের বহুবিবাহ প্রায় সর্বত্রই চালু ছিল। সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নারীদের এই ধরনের বহুবিবাহের সাহায্যে ব্যাখ্যাটা খাড়া করার চেষ্টা করেছেন। নায়ার ধাঁচের বহুবিবাহে বেশ কিছু অনাত্মীয় পুরুষের একজন যৌথ স্ত্রী থাকে (পৃঃ ১৪৬)। এটাকেই নারীদের বহুবিবাহের সবথেকে অমার্জিত রূপ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তিব্বতী ধাঁচের বহুবিবাহে কয়েকজন ভাইয়ের একজন যৌথ স্ত্রী থাকে। অতঃপর তিনি মানবজাতির প্রায় সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই এই দু ধরনের বহুবিবাহের কোন-না-কোনটার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ব্রতী হয়েছেন এবং তা প্রমাণ করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। মিঃ ম্যাক্‌লেনানের একবারও মনে হয়নি যে নারীদের বহুবিবাহের এই রূপগুলো নিতান্তই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত মাত্র। এমনকি খোদ নীলগিরি পর্বত বা তিব্বতেও এগুলো ব্যাপকভাবে চালু থাকতে পারে না। গড়ে যদি তিনজন পুরুষের একজন করে স্ত্রী থাকে (নায়ারদের মধ্যে বারোজন পুরুষেরও একজন স্ত্রী থাকতে পারত, পৃঃ ১৪৭) এবং এটাই যদি কোন গোষ্ঠীর চালু রীতি হয়, তাহলে সেই গোষ্ঠীর বিবাহযোগ্যা নারীদের দুই-তৃতীয়াংশের বরাতে আর স্বামী জোটার কোন আশা থাকে না। যথেষ্ট জোর দিয়েই বলা যায় যে এই ধরনের ঘটনা পৃথিবীর কোন গোষ্ঠীর মধ্যেই ঘটতে পারে না, এবং আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত নীলগিরি পর্বত বা তিব্বতের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই ধরনের বহুবিবাহের কথা মেনে নেওয়া যায় না। নায়ার নারীদের বহুবিবাহ সম্বন্ধে সব তথ্য এখনও জানা যায়নি। "একজন নায়ার পুরুষ বেশ কিছু স্বামী-গোষ্ঠীর মধ্যে থাকতে পারে। অর্থাৎ, তার যত খুশি স্ত্রী থাকতে পারে" (পৃঃ ১৪৮)। এর ফলে কিন্তু অবিবাহিতা মেয়েদের স্বামী পাওয়ার কোন সুবিধে হয় না, তবে একজন স্ত্রী-র স্বামীর সংখ্যা বেড়ে যায়। নারীশিশু হত্যাও এত প্রচুর পরিমাণে ঘটত না যার ফলে এ ধরনের বহুবিবাহ ব্যাপকভাবে চালু হতে পারে। আর এই ধরনের বিবাহ মানুষের ইতিহাসে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিতে পারেনি।

তবে মালয়ী, তুরানিয় এবং গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তাব্যবস্থা থেকে পুরুষ ও নারীদের এমন কিছু বহুবিবাহের কথা জানা যায়, যেগুলো মানুষের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করেছে। কারণ এই ব্যবস্থাগুলো যখন গড়ে ওঠে, তখন এই ব্যবস্থাগুলোর মত বহুবিবাহের ঐ-সব রীতিগুলোও ব্যাপকভাবে চালু ছিল। মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা থেকে আমরা ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দলগুলোর কথা জানতে পারি, কিন্তু জ্ঞাতিভাই আর জ্ঞাতিবোনরাও এই দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত হত। অর্থাৎ পুরুষদের বহু স্ত্রী আর নারীদের বহু স্বামী থাকত। তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা আরও অগ্রসর একটা

দলের সন্ধান পাই। এই দুটো জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা দু ধরনের দলগত বিবাহের সাক্ষ্য দেয়। এক ধরনের দলগত বিবাহের ভিত্তি ছিল স্বামীদের ভ্রাতৃত্ব, অপরটির ভিত্তি ছিল স্ত্রীদের ভগ্নীত্ব। এই স্তরে এসে আপন ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষদের থাকত বহু স্ত্রী আর নারীদের বহু স্বামী। একই দলের মধ্যে দু ধরনের বিবাহই দেখা যায় এবং এই উভয় ধরনের বিবাহরীতি ছাড়া তাদের জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব নয়। গ্যানোয়ানির জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তাব্যবস্থা গড়ে ওঠার পূর্বশর্তই ছিল দলগত বিবাহ। এই ব্যবস্থা আর মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা পুরুষদের বহু স্ত্রী এবং নারীদের বহু স্বামী প্রথার যে রূপগুলো দেখতে পাই, তা জাতিতত্ত্বের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে নারীদের বহু স্বামী প্রথার নায়ার ও তিব্বতী ধাঁচগুলো থেকে তাদের জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থাকে ঠিকমত ব্যাখ্যা তো করা যায়ই না, উপরন্তু এগুলো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণও নয়।

আমার প্রদত্ত সারণীগুলোতে উপস্থাপিত জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার এইসব ব্যবস্থার রূপরেখাটা "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থে অভিব্যক্ত তত্ত্ব ও অভিমতগুলোকে পুরোপুরি খারিজ করে দেয়। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ঠিক সেই কারণেই ঐ-সব ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে আমার উপস্থাপিত প্রকল্পকে আক্রমণ করেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান এবং এগুলোকে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে একটি ভিন্ন প্রকল্প খাড়া করার চেষ্টা করেছেন।

খ। সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনান যে প্রকল্প হাজির করেছেন, তা দিয়ে ঐ ব্যবস্থার উদ্ভবকে আদৌ ব্যাখ্যা করা যায় না।

মিঃ ম্যাক্‌লেনান এই বলে শুরু করেছেন (পৃঃ ৩৭২) যে, "[বর্ণনামূলক ব্যবস্থার] যাবতীয় রূপের মধ্যে যে বিষয়টা ফুটে ওঠে, তা শেষ বিচারে বিবাহরীতির সঙ্গেই যুক্ত। কাজেই এই ব্যবস্থার উদ্ভবও যে বিবাহরীতির সঙ্গেই সম্পর্কিত, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।" এটা আসলে আমার ব্যাখ্যার ভিত্তি। তাঁর ব্যাখ্যায় এটা কেবলমাত্র আংশিক ভিত্তির ভূমিকা পালন করেছে।

যে বিবাহরীতির সাহায্যে তিনি মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তা হল নায়ার নারীদের বহুস্বামী প্রথা, আর যে বিবাহরীতির সাহায্যে তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তা হল তিব্বতী নারীদের বহুস্বামী প্রথা। কিন্তু নায়ার বা তিব্বতীদের জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তাব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলতে পারেন নি, ফলে তাঁর প্রকল্পকে ব্যাখ্যা করার কিংবা পরীক্ষা করে দেখার কোন উপায়ও তাঁর লেখায় অনুপস্থিত। অর্থাৎ নায়ার বা তিব্বতীদের সমাজজীবন থেকে সংগৃহীত কোন উপাদান ছাড়াই তিনি আলোচনার পথে পা বাড়িয়েছেন এবং এমন সব বিবাহরীতিকে সেই আলোচনার ভিত্তি করে তুলতে চেয়েছেন যেগুলো সম্পর্কের শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থাবিশিষ্ট গোষ্ঠী ও জাতিগুলোর মধ্যে কোনদিনই চালু ছিল না। কাজেই একেবারে প্রথম থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর ব্যাখ্যাটি আসলে একটা এলোমেলো অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

সারণীতে (সিস্টেম্‌স্‌ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি, পৃঃ ২৯৮-৩৮২ ; ৫২৩-৫৬৭) প্রদত্ত ব্যবস্থাগুলোকে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান। তাঁর মতে এগুলো হচ্ছে "বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার পদ্ধতি-গত ব্যবস্থা।" খুব দ্ব্যর্থহীনভাবে এগুলোকে তিনি জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা হিসেবে অস্বীকার করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থটা এই অস্বীকৃতির দিকেই অঙ্গুলী-নির্দেশ করে। 'সিস্টেম্‌স্‌ অফ কন্‌স্যাঙ্গুইনিটি' রচনায় আমি বলেছিলাম যে ঘনিষ্ঠ-জনদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত হলে কিংবা আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে সম্ভাষণ জানানোর সময় আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা পরস্পরকে সম্বোধন করে নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক অনুযায়ী, কখনোই কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না। দক্ষিণ ভারত এবং চীনেও একই রীতি চালু আছে। সম্ভাষনের সময় তারা ঐ ব্যবস্থাটাকেই ব্যবহার করে, কারণ এটা হচ্ছে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা। এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আর কি-ই বা হতে পারে! মিঃ ম্যাক্‌লেনান আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে এই সর্বব্যাপী ব্যবস্থাগুলো ছিল নিছকই আনুষ্ঠানিক একটা ব্যাপার এবং লোকেদের পরস্পরকে সম্বোধনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া ছাড়া এর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই ব্যবস্থা-গুলো নিয়ে আলোচনায় ছেদ টানার এবং মানবজাতির প্রথম দিককার অবস্থা সংক্রান্ত বিদ্যমান সবথেকে উল্লেখযোগ্য স্মারকটাকে বাতিল করে দেওয়ার সহজতম উপায় তো এটাই!

সম্বোধনের ব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি পৃথক একটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছেন মিঃ ম্যাক্‌লেনান। তিনি বলছেন (পৃঃ ৩৭৩): "এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে রক্তসম্বন্ধের ব্যবস্থা আর সম্বোধনের ব্যবস্থা একসঙ্গেই গড়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং এই দুটো ব্যবস্থা অল্প কিছুদিন পরস্পর-মিশ্রিতই ছিল।" রক্ত-সম্বন্ধের ব্যবস্থা বলতে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকেই বোঝায়। তাহলে সেই হারানো ব্যবস্থাটার কী হল? সে সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনান কিছু বলেন নি বা তাঁর অস্তিত্বের কোন প্রমাণও দেন নি। কিন্তু সারণীতে প্রদত্ত জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থাগুলো তার প্রকল্পের পক্ষে যতটুকু উপযোগী, ততদূর পর্যন্ত এগুলোকে ব্যবহার করতে তিনি ইতস্তত করেন নি। অথচ তা করতে গিয়ে তাঁর নিজেরই বক্তব্য "এগুলো হচ্ছে নিছকই বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার পদ্ধতিগত ব্যবস্থা"—এই কথাটা সংশোধন করার কষ্টটুকুও স্বীকার করেন নি তিনি।

সারা পৃথিবীর বন্য ও বর্বর গোষ্ঠীগুলো বহু যুগ ধরে বিভিন্ন জ্ঞাতি ও আত্মীয়কে সম্বোধন করার একটা যথাযথ পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য এত ব্যগ্র ছিল যে শুধু সেই উদ্দেশ্যেই তারা যাবতীয় জটিলতা সহ মালয়ী, তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্ব-ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ আকারে গড়ে তুলেছিল; অন্য কোন ব্যবস্থা নয়, ঠিক এই ব্যবস্থা-গুলোই; তাদের ব্যগ্রতাটা এতই তীব্র ছিল যে এশিয়া, আফ্রিকা, পলিনেশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি সমস্ত জায়গাতেই পিতামহর ভাইকে পিতামহ বলে সম্বোধন করতে, বড় ভাইকে দাদা বলতে কিংবা ছোট ভাইকে ভাই বলতে তারা সবাই রাজি হয়ে গিয়েছিল; সবটাই আসলে জ্ঞাতিদের সম্বোধন করার একটা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়—একসঙ্গে একরাশ সমাপতন! কিন্তু এত তুচ্ছ কারণে এতগুলো

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাপতন ঘটছে, এটা মেনে নিতে স্বয়ং লেখকেরও নিশ্চয়ই একটু অসুবিধে হবে।
সম্বোধন পদ্ধতির ব্যবস্থাটা সবসময়ই স্বল্পমেয়াদী হয়, কারণ যাবতীয় আনুষ্ঠানিক রীতিই স্বল্পমেয়াদী হতে বাধ্য। তাছাড়া, প্রতিটা জাতির মধ্যে এইসব সম্বোধন আলাদা আলাদা হওয়াটাও একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপারে। এর সম্পর্কগুলো উদ্ভূত হয় পরিবার আর বিবাহবিধির মধ্যে থেকে। আর পরিবারের থেকে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার স্থায়ীত্বও অনেক বেশি, কারণ পরিবার ক্রমান্বয়ে উন্নত হয়ে চলে কিন্তু জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা অপরিবর্তিতই থেকে যায়। কোন একটা জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময় সামাজিক অবস্থাটা ঠিক কেমন ছিল, তা ঐ ব্যবস্থার অন্তর্গত সম্পর্কগুলোর মধ্যেই ফুটে ওঠে। মানবজাতির প্রাত্যহিক জীবনে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহবিধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফল হিসেবেই পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাগুলো প্রায় একই ধরনের হয়ে উঠেছে এবং বহু যুগ ধরে টিকে থাকতে পেরেছে।
মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর যে-কোন মা বুঝতে পারত যে নিজের পুত্র কন্যাদের সঙ্গে তার একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে আর সেই সম্পর্ককে এক একটা উপযুক্ত সম্বোধনের সাহায্যে প্রকাশও করা যায়; বুঝতে পারত যে নিজের মা এবং মায়ের নিজের মা-র সঙ্গে তার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে; বুঝতে পারত যে নিজের মায়ের অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে তার অন্য সম্পর্ক আছে; আবার নিজের মেয়ের সন্তানদের সঙ্গে তার রয়েছে আলাদা একটা সম্পর্ক—আর এই সমস্ত সম্পর্কগুলোকেই যথাযথ সম্বোধনের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ সুস্পষ্ট রক্তসম্বন্ধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল মালয়ী ব্যবস্থার অন্তর্গত পাঁচ ধরনের সম্পর্কের বনিয়াদ, যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবাহবিধির কথা উল্লেখ করার কোন দরকার হয় না।
দলবদ্ধ বিবাহ এবং ভাইবোন বিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার পর (এই দুটো বিষয়েরই প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার মধ্যে) এইসব ধারণার ভিত্তিতেই জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাটা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দলটার মধ্যে। আপন ও জ্ঞাতি-সম্পর্কিত ভাইবোনদের দলবদ্ধ বিবাহের ফল হিসেবে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার যে ব্যবস্থাটা গড়ে উঠতে পারে, তা হচ্ছে এই মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা। এই বিষয়গুলোকে বিবেচনা না করলে মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার উদ্ভব সংক্রান্ত কোন প্রকল্পই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। এই ধরনের বিবাহ এবং এই ধরনের পরিবারই জন্ম দেয় মালয়ী ব্যবস্থার। এই ব্যবস্থাটা একেবারে প্রথম থেকেই হয়ে ওঠে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার একটা ব্যবস্থা এবং শুধু এইভাবেই ঐ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করা যায়।
উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীটিকে সঠিক বলে মেনে নিলে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার আর প্রয়োজন হয় না। দার্শনিক আলোচনার পক্ষে তাঁর প্রকল্পটি নিতান্তই অস্পষ্ট এবং এইসব ব্যবস্থার উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে একেবারেই অক্ষম।
গ। "সিস্টেম্‌স্ অফ কন্‌স্যাঙ্গুনিটি" গ্রন্থে উপস্থাপিত প্রকল্পটির বিরুদ্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনানের বক্তব্য একেবারেই অন্তঃসারশূন্য।

মিঃ ম্যাক্‌লেনানের আগের প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন ঘটনার যে-সব ভুল মূল্যায়ণ এবং বিভিন্ন ধারণার ব্যাপারে যে-সব বিভ্রান্তি দেখা গেছে, সেগুলো এই প্রবন্ধটিতেও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। জ্ঞাতিত্বসূত্রে সম্পর্ক এবং বৈবাহিকসূত্রে সম্পর্কের মধ্যে কোন পার্থক্যই তিনি দেখান নি, অথচ একই ব্যক্তির জীবনে এই দু ধরনের সম্পর্কই দেখা যায়। জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার সম্পর্কগুলোর ব্যাপারেও ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন তিনি।

আমার উপস্থাপিত প্রকল্পটি সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্‌লেনান যে সমালোচনা করেছেন, তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কয়েকটা বিষয়ে তিনি শব্দার্থ ধরে সমালোচনা করেছেন, কোন কোন জায়গায় আমার বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন, কিন্তু কোথাওই মূল প্রশ্নগুলোর মর্মবস্তুকে স্পর্শ করতে পারেন নি। প্রথম প্রতিপাদ্যটা খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "সম্পর্কের মালয়ী ব্যবস্থাটা হচ্ছে রক্তসম্বন্ধেরই একটা ব্যবস্থা। মিঃ মর্গ্যান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, কিন্তু এই সিদ্ধাতের প্রতিকূল বিষয়গুলো প্রসঙ্গে তিনি কিছুই বলেন নি" (পৃঃ ৩৪২)। এটা যে অংশত রক্তসম্বন্ধের ব্যবস্থা এবং অংশত বৈবাহিক সম্বন্ধের ব্যবস্থা, সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। বাবা-মা, ভাইবোন (বড় বা ছোট), পুত্র-কন্যা, মামা-মাসী, ভাগ্নে-ভাগ্নী, খুড়তুত-জ্যাঠতুত-মামাত-পিসতুত ভাইবোন, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী, পৌত্র/দৌহিত্র, পৌত্রী/দৌহিত্রী এবং দেবর, ভগ্নীপতি, শ্যালক, শ্যালিকা, জামাতা, পুত্রবধূ—এই সমস্ত সম্পর্কের কথাই সারণীতে উল্লিখিত হয়েছে এবং মিঃ ম্যাক্‌লেনান সেগুলো পড়ে দেখার সুযোগও পেয়েছেন। এই ব্যবস্থাগুলো স্বতঃই প্রতীয়মান এবং এগুলো জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। মিঃ ম্যাক্‌লেনান কি মনে করেন যে সারণীতে উপস্থাপিত ব্যবস্থাটা থেকে আলাদা কোন ব্যবস্থা উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চালু ছিল? তা মনে করলে সেই আলাদা ব্যবস্থাটা উপস্থাপিত করার কিংবা তার অস্তিত্বের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব তাঁর ওপরেই বর্তায়। কিন্তু সে দায়িত্ব তিনি পালন করেন নি।

তাঁর উল্লিখিত দু'তিনটি বিশেষ বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা যায়। তিনি বলছেন (পৃঃ ৩৪৬): "কোন পুরুষকে যদি এমন কোন নারী তার পুত্র বলে সম্বোধন করে যে তাকে গর্ভে ধারণ করে নি, তাহলে তা স্বাভাবিক বংশধর সংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যাটির বিরোধিতাই করে। সে ক্ষেত্রে সম্পর্কটা যতটুকু নিশ্চিতভাবে সন্তানদের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব নিরূপন করা যায়, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। কাজেই মিঃ মর্গ্যানের প্রতিপাদ্যটাও প্রমাণিত হয় না।" তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় যে প্রশ্নটা পিতৃত্ব-মাতৃত্ব নিয়ে নয়, প্রশ্নটা বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্কের। মায়ের বোনকে মা-ই বলা হয় এবং সে তাকে নিজের পুত্র বলে সম্বোধন করে—যদিও ঐ নারী তাকে গর্ভে ধারণ করে নি। মালয়ী, তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় এটাই হচ্ছে রীতি। ভাইবোন বিবাহ বা দলগত বিবাহের ক্ষেত্রে মায়ের বোনেরাও বাবার স্ত্রী হিসেবেই বিবেচিত হয়। আমাদের আজকের ব্যবস্থা অনুযায়ী বিচার করলে এদেরকে সৎ-মা বলা যায়। আমাদের ব্যবস্থাতেও সৎ-মাকে মা বলেই ডাকা হয় এবং সে-ও তার সৎ পুত্রকে পুত্র বলেই ডাকে। এটা যে রক্তসম্বন্ধের সম্পর্ক নয় তা সত্যি এবং সে-রকম কোন ইঙ্গিতও এর মধ্যে নেই, কিন্তু এটা অবশ্যই বৈবাহিক সূত্রের

একটা সম্পর্ক এবং তার ইঙ্গিত এর মধ্যে স্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। মিঃ ম্যাক্‌লেনানের যুক্তিগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আপাতভাবে সত্য বলে মনে হলেও আসলে ভুলে-ভরা। মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার পর তুরানিয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখছেন (পৃঃ ৩৫৪): "এ থেকে মনে হয় যে 'গোষ্ঠীগত সংগঠন, গড়ে ওঠার পর কোন ব্যক্তির পুত্র আর তার বোনের কন্যা, যারা ভাইবোন হিসেবেই স্বীকৃত, তারা স্বচ্ছন্দে পরস্পরকে বিবাহ করতে পারত, কেননা বংশধারা অনুযায়ী তারা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্য।" তুরানিয় বা গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থাকে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে মিঃ ম্যাক্‌লেনান দেখতে পেতেন যে "কোন ব্যক্তির পুত্র আর তার বোনের কন্যা" মোটেই "ভাইবোন হিসেবে স্বীকৃত" নয়। এরা হচ্ছে মামাত-পিসতুত ভাইবোন। মালয়ী ও তুরানিয় ব্যবস্থার মধ্যে যে ক'টা সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে, এটা তার অন্যতম। তাছাড়া, মালয়ী জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক পরিবার আর তুরানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থার দলগত বিবাহভিত্তিক পরিবারের মধ্যেকার পার্থক্যটাও মূর্ত হয়ে ওঠে এই ব্যাপারটার মধ্যে।

সাধারণ পাঠক নিশ্চয়ই এইসব ব্যবস্থার সমস্ত অনুপুঙ্খকে আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু সম্পর্কগুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে না পারলে এইসব ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনাকে ঠিকমত উপভোগ করা যায় না, বরং গোটা-ব্যাপারটা আরও বেশি করে জট পাকিয়ে যায়। সম্পর্কসূচক সম্বোধনগুলোকে মিঃ ম্যাক্‌লেনান যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সেগুলোকে সঠিক অর্থে প্রয়োগ করতে পারেন নি।

আর এক জায়গায় (পৃঃ ৩৬০) বিবাহ ও যৌন-সহবাসের মধ্যেকার একটা পৃথকীকরণের দায়ভার তিনি আমার ওপর চাপিযে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, অথচ ও-রকম কোন মন্তব্য আমি করিই নি। অতঃপর প্রচুর গালভরা কথার মালা সাজিয়েছেন তিনি। "প্রিমিটিভ ম্যারেজ" গ্রন্থের এই জায়গাটাতেই সম্ভবত সবথেকে চটকদার কথার খেলা দেখা যায়।

শেষত, মিঃ ম্যাক্‌লেনান আমার দুটো তথাকথিত ভুলের কথা বলেছেন, তাঁর মতে যে-গুলো নাকি শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করে। "শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মিঃ মর্গ্যান দুটো মৌলিক ভুল করে বসেছেন। তাঁর পৃথক ভুলটা হল এই যে, ঐ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারটা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন নি। শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভবের মধ্যেই গোটা ব্যবস্থাটার উদ্ভবকে খুঁজে দেখার কোন চেষ্টাই করেন নি তিনি" (পৃঃ ৩৬০)। এক্ষেত্রে ব্যবস্থা আর শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে পার্থক্যটা কী? এ দুটো তো একই অর্থ প্রকাশ করছে, অন্য কোন অর্থ তো এগুলোর মধ্যে কোনভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় না। একটার উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা করা মানেই অপরটারও উৎস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এগোনো। "দ্বিতীয় ভুল, বা বলা ভাল ভ্রান্তিটা হচ্ছে এত সহজেই ঐ ব্যবস্থাটাকে রক্তসম্বন্ধের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া" (পৃঃ ৩৬১)। এখানে কোন ভুলের অবকাশই নেই, কেননা সারণীতে উল্লিখিত ব্যক্তিরা হয় একই পূর্বপুরুষের বংশধর অথবা তাদের এক বা

একাধিক জনের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কযুক্ত। আর্য, সেমিটিক এবং উরালিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থা সংক্রান্ত সারণীতেও এইসব ব্যক্তির কথাই উল্লিখিত হয়েছে (সিস্টেম্স্ অফ কন্স্যাঙ্গুইনিটি, পৃঃ ৭৯-১২৭)। বস্তুতপক্ষে এই প্রত্যেকটা ব্যবস্থাতেই এরা পরস্পরের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। শেষোক্ত ব্যবস্থায় প্রতিটা সম্পর্কই সুনির্দিষ্ট আর প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় সম্পর্কগুলো বিভিন্ন বর্গে বিন্যস্ত। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থার মূল ভিত্তিটা একই—প্রকৃত জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে দলগত বিবাহ আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে একজোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহের ফল হিসেবেই দুটো ব্যবস্থার মধ্যে ঐ পার্থক্যটা সৃষ্টি হয়েছিল। মালয়ী, তুরানিয় ও গ্যানোয়ানিয় জ্ঞাতিত্বব্যবস্থায় রক্তসম্বন্ধের একটা সুদৃঢ় বনিয়াদ খুঁজে পাওয়া যায় বহু সদস্যের একই পূর্বপুরুষের বংশধর হওয়ার মধ্যে; বৈবাহিক সূত্রের সম্পর্কগুলো উপলব্ধি করার জন্য খোঁজ করতে হবে এইসব ব্যবস্থার নির্দিষ্ট বিবাহরীতির মধ্যে। মালয়ী ও তুরানিয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও তুলনা করলে বোঝা যায় যে এ দুটো ব্যবস্থা হচ্ছে পৃথক পৃথক দুটো বিবাহরীতির ফসল—একটার ভিত্তি ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ, অপরটার দলগত বিবাহ।

কাউকে সম্ভাষণের সময় সম্পর্কসূচক সম্বোধন গুলো সর্বদাই ব্যবহার করা হয় কেন? উত্তরটা সহজ: সম্পর্কসূচক সম্বোধন বলেই এগুলোকে এভাবে ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসেবে দেখানোর জন্য বৃথাই চেষ্টা করেছেন মিঃ ম্যাক্লেনান। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর বিপুল গুরুত্ব দিলেও, এগুলোর উৎস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিন্তু তিনি এগুলোকে "সম্বোধনের পদ্ধতি" হিসেবে আদৌ ব্যবহার করেন নি। এইসব সম্বোধন প্রসঙ্গে তিনি যখনই কথা বলেছেন, তখনই এগুলোকে ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তাসূচক অভিধা হিসেবেই। যে-সব ভাবনাকে সে ফুটিয়ে তোলে, ব্যক্ত করে, সেইসব ভাবনা ব্যতিরেকে যেমন ভাষার উৎপত্তি হতে পারে না, ঠিক তেমনি জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে "বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধনের পদ্ধতিগত ব্যবস্থা"-রও উদ্ভব ঘটা অসম্ভব (পৃঃ ৩৭৩)। বিভিন্ন আত্মীয় বা জ্ঞাতিকে সম্বোধনের ব্যাপারে এইসব অভিধাগুলো কেন এত তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পেরেছিল? কারণ এগুলোর মধ্যে জ্ঞাতি বা আত্মীয়দের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কটা মূর্ত হয়ে উঠত। স্রেফ বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধনের প্রয়োজন থেকে পৃথিবীর একটা বিশাল এলাকা জুড়ে যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারেও প্রায় একইরকম এত প্রকাণ্ড একটা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।

শ্রেণীবিন্যাসমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব সম্বন্ধে মিঃ ম্যাক্লেনানের ব্যাখ্যা আর এই গ্রন্থে উপস্থাপিত আমার ব্যাখ্যার মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যটা, অর্থাৎ এটা বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধনের একটা পদ্ধতিগত ব্যবস্থা নাকি জ্ঞাতিত্ব ও আত্মীয়তার ব্যবস্থা, তা নির্ণয় করার ভার আমি পাঠকদের ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি।

চতুর্থ খণ্ড

সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণার ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উত্তরাধিকারের তিনটি নিয়ম

এবার আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে সম্পত্তির ক্রমবিকাশ নিয়ে, সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মগুলো নিয়ে এবং প্রাচীন সমাজের ওপর সম্পত্তির প্রভাব সম্পর্কে।

সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রাচীনতম ধারণাগুলো মানুষের প্রাথমিক চাহিদা অর্থাৎ জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে। যে-সব জিনিসের ওপর জীবনধারণের উপায় নির্ভর করত, সেগুলো বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা ঐতিহাসিক যুগে মালিকানার বিষয়বস্তুও স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠেছিল। তাই উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়েই ক্রমবিকাশ ঘটেছিল সম্পত্তির। প্রতিটা ঐতিহাসিক যুগই তার আগের যুগের থেকে উন্নত চেহারা নিয়ে আসত। এই উন্নতিটা শুধুমাত্র উদ্ভাবনের সংখ্যার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকত না, সেইসব উদ্ভাবনের ফল হিসেবে উদ্ভূত সম্পত্তির বৈচিত্র্য আর পরিমাণের মধ্যেও তার ছাপ ফুটে উঠত স্পষ্ট-ভাবে। নানা ধরনের সম্পত্তি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার ভোগদখল ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কিছু বিধিনিয়মও তৈরি হয়েছিল। ভোগদখল এবং উত্তরাধিকারের এই নিয়ম-গুলো যে-সব রীতি-প্রথার ওপর নির্ভর করত, সেগুলো সমাজ-সংগঠনের অবস্থা আর অগ্রগতির দ্বারাই নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হত। তাই দেখা যায় উদ্ভাবন আর আবিষ্কার বেড়ে চলার সঙ্গে আর মানবপ্রগতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগের সূচনাকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অগ্রগতির সঙ্গে সম্পত্তির ক্রমবিকাশ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

১। বন্য যুগের সম্পত্তি

বিভিন্ন উদ্ভাবন আর আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতি ও প্রথার মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠা ধারণাগুলোর ক্রমবিকাশ মারফৎ মানুষ যা-কিছু অর্জন করেছিল, সেগুলোকে বাদ দিয়ে এই সুপ্রাচীন যুগটায় মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। একেবারে অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার অবস্থা থেকে মানবসমাজের অগ্রগতি খুব ধীরে ধীরে ঘটলেও সেই অগ্রগতির অনুপাতটা ছিল জ্যামিতিক বা গুণোত্তর। এমন একটা সময় ছিল, যখন মানুষ আগুন জ্বালাতে জানত না, ভাষার ব্যবহার জানত না, জানত না কৃত্রিম হাতিয়ার বানানোর কৌশলও। সেই যুগে অন্যান্য বন্য জীবজন্তুদের মত মানুষকেও খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হত আপনা থেকে জন্মানো নানারকম ফলের ওপরেই। তারপর খুব ধীরে ধীরে, প্রায় চোখে না-পড়ার মত পদক্ষেপে, অগ্রসর হল মানুষ। বন্যতার যুগের পথ বেয়ে এগোল মানুষের ইতিহাস। অঙ্গভঙ্গী আর অর্ধোচ্চারিত কিছু শব্দের বদলে সৃষ্টি হল স্পষ্টোচ্চারিত ভাষা। আদি হাতিয়ার লাঠি থেকে মানুষ পৌঁছে গেল পাথরের ফলা লাগানো বর্শায়

স্তরে এবং অবশেষে তার হাতে উঠে এল তীর-ধনুক। পাথুরে ছুরি আর বাটালির স্তর পেরিয়ে সে পা রাখল পাথুরে কুঠার আর হাতুড়ির স্তরে। বেতের ঝুড়ির বদলে দেখা দিল কাদামাটির প্রলেপ লাগানো ঝুড়ি, ফলে আগুনের তাপে খাদ্য সেদ্ধ করার মত একটা পাত্র পেল মানুষ। আর অবশেষে গড়ে উঠল মৃৎশিল্প, মাটির পাত্র বানাতে শিখল মানুষ, আগুনের তাপ সহ্য করার পাত্র এসে গেল তার হাতে। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতিজ ফলের ওপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকার যুগ পেরিয়ে সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সে আঁশযুক্ত ও খোলাযুক্ত মাছের ওপর নির্ভর করতে শুরু করল, এবং অবশেষে সে ব্যবহার করতে শিখল বিভিন্ন গাছের কন্দ আর সেই সঙ্গেই শিখল খাদ্যের জন্য পশুপাখি শিকার করতে। গাছের ছালের আঁশ থেকে দড়ি ও সুতো তৈরি করা, লতাপাতার মণ্ড দিয়ে এক ধরনের পোশাক বানানো, পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা আর তাঁবুর ছাউনি হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য চামড়া পাকা করা, খুঁটির ওপরে গাছের ছালের ঢাল দেওয়া বাড়ি কিংবা পাথরের গোঁজ দিয়ে গড়া কাঠের তক্তার বাড়ি—এগুলোও বন্য যুগেই দেখা দিয়েছিল। ছোটখাট উদ্ভাবন হিসেবে নাম করা যায় আগুন জ্বালানোর গর্ত (যেখানে কোন একটা জিনিসকে তুরপুনের মত ঘুরিয়ে আগুন জ্বালানো হত), হরিণের চামড়ার জুতো, তুষার-পাদুকা প্রভৃতির।

এই পর্যায়টা শেষ হওয়ার আগেই পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় অনেক বেশি করে মানুষ শিখে নিতে পেরেছিল দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করার রীতিটা। ততদিনে পৃথিবীর অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে সে, বিভিন্ন মহাদেশের মানব-অগ্রগতির সহায়ক সমস্ত সম্ভাবনাগুলোকে শুরু করেছে আয়ত্ত করতে। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ভাইবোন বিবাহভিত্তিক দলের সীমা পেরিয়ে সে পা রেখেছে গোত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত গোষ্ঠীর স্তরে। অর্থাৎ, শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করার প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর বীজ এসে গেছে তার আয়ত্তে। মানুষ এগোতে শুরু করেছে সভ্যতার দিকে। একদিন-না-একদিন মানুষ যে সভ্যতার যুগে পৌঁছবেই, তার সুনিশ্চিত ইঙ্গিত সেই আদিম যুগেই খুঁজে পাওয়া যায়, যখন মানুষ আবিষ্কার করেছে ভাষা, মৃৎশিল্প আর গোত্র।

বন্য যুগই মানুষের অবস্থার বিপুল পরিবর্তনের বীজ রোপন করে গিয়েছিল। মানবজাতির অগ্রসর অংশটা অবশেষে গড়ে তুলতে পেরেছিল গোত্রভিত্তিক সংগঠন, ছোট ছোট গোষ্ঠী আর এখানে-সেখানে কিছু গ্রাম। এতে করে তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা আরও বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। তাদের কর্মক্ষমতা আর বিভিন্ন অমার্জিত কলাকৌশলগুলো প্রধানত জীবনধারণের কাজেই ব্যবহৃত হত। আত্মরক্ষার জন্য গ্রামের চারদিকে বেড়া দেওয়ার ধারণা তখনও গড়ে ওঠে নি তাদের মধ্যে, গম থেকে আটা জাতীয় খাদ্য বানাতেও শেখে নি, এমনকি নরখাদকবৃত্তিটাও তাদের মধ্যে থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। যে-সব কলাকৌশল, উদ্ভাবন আর প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলোই হচ্ছে বন্যতার যুগে মানবজাতির অগ্রগতির সামগ্রিক যোগফল—এর সঙ্গে শুধু যোগ করে নিতে হবে ভাষার ব্যাপারটাকে। আপাতদৃষ্টিতে এই যোগফলটাকে নেহাতই সামান্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যেই লুকিয়েছিল অসীম সম্ভাবনার অঙ্কুর। কেননা এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় ভাষার বীজ, সরকার,

পরিবার, ধর্মের অঙ্কুর, গৃহ নির্মাণ আর সম্পত্তির ভ্রূণরূপ এবং জীবনধারণের কলা-কৌশলগুলোর প্রাথমিক বীজ। বর্বরযুগে তাদের বংশধররা এগুলোকে উন্নত করে তোলে এবং সভ্যতার যুগে তাদের বংশধররা এগুলোকে আরও উন্নত করে চলেছে।

তবে বন্য যুগের মানুষদের সম্পত্তি ছিল নিতান্তই নগণ্য। সম্পত্তির মূল্য, তার কাম্যতা আর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল খুবই দুর্বল। বন্যদের জীবনে সম্পত্তি বলতে ছিল কিছু অমার্জিত হাতিয়ার, পোশাক-আশাক, বাসনপত্র, চকমকি, পাথর আর হাড়ের জিনিস এবং কিছু ব্যক্তিগত অলঙ্কার। সম্পত্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষাও তাদের খুব বেশি ছিল না, কারণ সম্পত্তি বলতেই তো আসলে বিশেষ কিছু ছিল না। সভ্যতার যুগে এসেই মানুষের মধ্যে "লাভের লোভ" টা (studium lucri) বেড়ে উঠেছিল আর এখন তো সেটা একেবারে জাঁকিয়ে বসেছে। বন্যতার যুগে জমিকে ঠিক সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হত না। জমির মালিক ছিল সমগ্র গোষ্ঠী। যৌথ বাস-গৃহগুলি ছিল গোষ্ঠীর সদস্যদের এজমালি সম্পত্তি। বিভিন্ন ছোটখাট উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের সংখ্যাও বেড়ে উঠছিল, আর তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠছিল সম্পত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাও। কেউ মারা গেলে তার সবথেকে মূল্যবান সম্পত্তিগুলো তার কবরের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হত, যাতে করে প্রেতলোকে গিয়েও সে ওগুলো ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির বাকি সম্পত্তির উত্তরাধি-কারের প্রশ্নটা নিশ্চয়ই উঠত। গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার আগে এই সম্পত্তি কিভাবে ভাগ-বাটোয়ারা করা হত, সে ব্যাপারে আমাদের হাতে কোন তথ্য নেই বললেই চলে। গোত্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠার পর দেখা দিল উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা। এই নিয়ম অনুসারে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় জিনিসপত্র তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। কার্যত তার নিকটতম জ্ঞাতিরাই পেত জিনিসপত্রগুলো, কিন্তু নিয়মটা ছিল সার্বজনীন—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার গোত্রের মধ্যেই থাকত এবং গোত্রের সদস্যদের মধ্যে তা ভাগ করে দেওয়া হবে। গ্রীক ও লাতিন গোত্রগুলো সভ্যতার যুগে এসেও এই নিয়মটা মেনে চলত। সন্তানরা তাদের মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত, কিন্তু যাকে তাদের বাবা বলে গণ্য করা হত তার কোন কিছুরই উত্তরাধিকারী হত না তারা।

২। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে সম্পত্তি।

মৃৎশিল্প উদ্ভাবন থেকে শুরু করে পশুদের পোষ মানানো অথবা সেচের সাহায্যে ভুট্টা ও বিভিন্ন লতা-গুল্ম চাষের প্রচলন হওয়া পর্যন্ত সময়টা নিশ্চয়ই বন্যতার সমগ্র যুগের থেকে অনেক কম ছিল। মৃৎশিল্প, হাত দিয়ে বয়ন করা আর কৃষিকাজ (যার ফলে তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য পাওয়া গিয়েছিল) ছাড়া এই ঐতিহাসিক যুগটিতে আমেরিকায় তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন বা আবিষ্কার হয় নি। তবে ঐ যুগে আমেরিকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দারুণ অগ্রগতি ঘটেছিল। টানাপোড়েনের সাহায্যে হাত দিয়ে বয়ন করাটা এই যুগেরই ব্যাপার, এবং এটা অবশ্যই একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন। তবে বন্যতার যুগে মানুষ যে এই কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারেনি, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এই পর্যায়ের ইরোকোয়ারা এবং আমেরিকার অন্যান্য

গোষ্ঠীগুলো চমৎকার টানাপোড়েনের সাহায্যে দারুণ দারুণ কোমরবন্ধ ও বোঝা-বাঁধার দড়ি তৈরি করত। একাজের জন্য তারা ব্যবহার করত দেবদারু ও অন্যান্য গাছের আঁশ থেকে বানানো সুতো।[১] এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের মূল নিয়মটাকে (যা আজ পর্যন্ত মানবজাতির পোশাক যুগিয়ে আসছে) তারা ঠিক ঠিকভাবেই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু এই জ্ঞানকে আরও উন্নত করে তুলে বুনন জাত পোশাক বানানোর ব্যাপারে তারা সক্ষম হতে পারে নি। ছবির সাহায্যে লেখার ব্যাপারটাও সম্ভবত এই যুগেই প্রথম শুরু হয়েছিল। কারণ তার আগে এভাবে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে থাকলে এই যুগে এসে তা নিশ্চয়ই অনেক উন্নত হয়ে উঠত। ধ্বনিগত বর্ণমালা উদ্ভাবনের এটা অন্যতম স্তর। অতঃপর একের পর এক উদ্ভাবনের পথ বেয়ে এগিয়েছে মানুষ। সারিটা মোটামুটি এরকম: ১। অঙ্গভঙ্গীনির্ভর ভাষা অথবা ব্যক্তিগত প্রতীকের ভাষা;

২। ছবির সাহায্যে লেখা বা ভাবনির্দেশক প্রতীক; ৩। চিত্রবর্ণমালা বা প্রচলিত প্রতীক; ৪। ধ্বনিভিত্তিক চিত্রবর্ণমালা বা একটা নির্ঘণ্টের মধ্যে ব্যবহৃত ধ্বনিগত; ৫। ধ্বনিভিত্তিক বর্ণমালা বা বিভিন্ন শব্দের লিখিত রূপ যেহেতু বিভিন্ন শব্দের লিখিত রূপনির্ভর ভাষাটা নানান ধারাবাহিক স্তরের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেহেতু এর পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াগুলোর উদ্ভব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা থেকে অনেক কিছু বোঝাও যায়। কোপান্ (copan) স্মৃতিস্তম্ভগুলোর খোদাই করা ছবিগুলো সম্ভবত প্রচলিত প্রতীক ধরনের চিত্রবর্ণমালা। এগুলো থেকে বোঝা যায় যে আমেরিকার আদিবাসীরা, যারা প্রথম তিন ধরনের ভাষার ব্যবহার জানত, তারা একটা ধ্বনিভিত্তিক বর্ণমালা উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে চলেছিল স্বাধীনভাবেই।

গ্রামের প্রতিরক্ষার জন্য বেড়া উদ্ভাবন, তীরের (যা ততদিনে এক ভয়ঙ্কর ক্ষেপনাস্ত্র হয়ে উঠেছিল) হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পশুচর্মের ঢাল উদ্ভাবন, ঢাকা-দেওয়া পাথর কিংবা হরিণের শিং বসানো নানা ধরনের গদা উদ্ভাবন এগুলোও সম্ভবত এই পর্যায়েরই ঘটনা। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই এই জিনিসগুলোর ব্যবহার চালু ছিল। অরণ্যচর গোষ্ঠীগুলো ফলার পাথর বা হাড় বসানো বর্শা সাধারণত ব্যবহার করত না, যদিও কালে ভদ্রে এর ব্যবহার দেখা যেত।[২] এই হাতিয়ারটা মানুষ তৈরি করেছিল বন্যতার যুগেই, তীর ধনুক উদ্ভাবনের আগেই। পরবর্তীকালে বর্বরযুগের উচ্চ পর্যায়ে এই হাতিয়ারটা নতুন রূপে সামনে আসে। তখন এর মুখে লাগানো হত তামার ফলা। ফলে সেই সময় কাছা-কাছি থেকে লড়াই করাটাই যুদ্ধের প্রধান পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে আমেরিকার আদিবাসীদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক আর গদা। তাদের বড় বড় মাটির পাত্র আর তার গায়ের অলঙ্করণ থেকে বোঝা যায় সে সময় মৃৎশিল্পে

১। "লীগ অফ দ্য ইরোকোয়া", পৃঃ ৩৬৪.

২। যেমন, ওজিবোয়ারা পাথর বা হাড় লাগানো বর্শা ব্যবহার করত, যার নাম ছিল শি-মা-গান।

তারা কিছুটা উন্নত হয়ে উঠেছিল।[1] কিন্তু এই উন্নতি সত্ত্বেও ঐ পর্যায়ের শেষ পর্যন্ত তাদের মৃৎশিল্প ছিল নিতান্তই অমার্জিত ধরনের। বাড়ি বানানোর কলাকৌশলে, বাড়ির আয়তন এবং নির্মাণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল। ছোটখাট উদ্ভাবনের মধ্যে ছিল পাখি শিকারের অস্ত্র (গুলতি জাতীয়), ভুট্টা জাতীয় শস্য গুঁড়ো করার কাঠের হামান দিস্তা, রঙ তৈরি করার পাথুরে হামানদিস্তা, মাটির ও পাথরের হুঁকো (তামাক খাওয়ার জন্য), উন্নত ধরনের বিভিন্ন রকম হাড়ের ও পাথরের যন্ত্রপাতি, পাথরের তৈরি হাতুড়ি ও মুগুর (পাথুরের হাতলটা আর ওপরের দিকটা ঢাকা থাকত পশুর চামড়া দিয়ে) এবং হরিণের চামড়ার পাদুকা ও কোমরবন্ধ, যেগুলোকে তারা সুসজ্জিত করত শজারুর কাঁটা দিয়ে। এই সব উদ্ভাবনের মধ্যে কয়েকটা তারা শিখেছিল বর্বর যুগের পর্যায়ে থাকা গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে। ব্যাপারটা একান্তই স্বাভাবিক, কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে বারবারই দেখা গেছে যে অনুন্নত গোষ্ঠীগুলো অগ্রগতির উপায়গুলোকে উপলব্ধি করা ও আত্মস্থ করার মত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলেই অগ্রসর গোষ্ঠীগুলো তাদের উন্নত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

ভুট্টা এবং লতাগুল্মের চাষ শুরু হওয়ার ফলে টাটকা রুটি, জলে সেদ্ধ ভুট্টাচূর্ণ এবং স্যালাড হিসেবে খাওয়ার মত পাতা ইত্যাদি পেতে শুরু করেছিল মানুষ। আর এ থেকেই দেখা দিয়েছিল এক নতুন ধরনের সম্পত্তি—কর্ষিত ভূমি বা বাগান। জমির মালিকানা গোষ্ঠীর সার্বজনীন হলেও, কর্ষিত জমির ওপর ব্যক্তির বা কোন দলের ভোগদখলের অধিকার এই সময় থেকে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছিল। এই সম্পত্তির ওপর উত্তরাধিকারও স্বীকৃত হয়েছিল। যৌথ বাসগৃহে বসবাসকারী দলগুলো সাধারণত একই গোত্রের সদস্য হত এবং উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুযায়ী সম্পত্তি কখনোই জ্ঞাতিদের বাইরে কারুর হাতে যেত না।

স্বামী ও স্ত্রী-র সম্পত্তি ও বিভিন্ন জিনিসপত্র আলাদা আলাদাভাবে রাখা হত এবং তাদের মৃত্যুর পর সেগুলো তাদের নিজ নিজ গোত্রের হাতে বর্তাত। স্ত্রী এবং সন্তানরা স্বামী এবং বাবার কাছ থেকে কিছুই নিত না, আর স্বামীও তার স্ত্রী-র কাছ থেকে নিত না কিছুই। কোন ইরোকোয়া পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানদের রেখে মারা গেলে তার সম্পত্তি সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হত যাতে তার বোনেরা ও তাদের সন্তানরা এবং তার মামারা ঐ সম্পত্তির বেশির ভাগ অংশটা পেতে পারে। মৃতের ভাইরাও কিছুটা অংশ পেতে পারত। কোন নারী তার স্বামী ও সন্তানদের রেখে মারা গেলে তার যাবতীয় জিনিসপত্র ভাগ করে দেওয়া হত তার সন্তান, বোন, মা এবং মায়ের বোনেদের মধ্যে, তবে বেশির ভাগ অংশটা পেত তার সন্তানরাই। উভয় ক্ষেত্রেই মৃতের সম্পত্তি রয়ে যেত তার গোত্রের মধ্যেই। ওজিবোয়াদের কোন নারী মারা গেলে তার জিনিসপত্র ভাগ করে দেওয়া হত তার সন্তান-

---

১। দুই থেকে দশ গ্যালন পর্যন্ত তরল ধরার মত মাটির পাত্র তৈরি করত ক্রীকরা (অ্যাডেয়ার, "হিস্ট্রি অফ আমেরিকান ইণ্ডিয়ান্‌স," পৃঃ ৪২৪)। ইরোকোয়ারা তাদের মাটির বয়াম আর নলগুলোর গায়ে মানুষের ছোট ছোট মুখ এঁকে দিত। স্মিথ্‌সনিয়ান ইন্‌স্টিটিউশনের মিঃ এফ. এ. কুশিং সম্প্রতি এই আবিষ্কারটি করেছেন।

দের মধ্যে—যদি তারা সেগুলোকে ব্যবহার করার মত বয়স্ক হত। তা না হলে কিংবা ঐ নারীর কোন সন্তান না থাকলে, জিনিসপত্রগুলো ভাগ করে দেওয়া হত তার বোন, মা এবং মায়ের বোনেদের মধ্যে—মৃতার ভাইরা তার কোন জিনিসই পেত না। বংশ-ধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তারা স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুসরণ করতে শুরু করেছিল বটে, কিন্তু উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তারা স্ত্রী-ধারা চালু থাকার সময়কার সেই পুরনো নিয়মটাই অনুসরণ করত।

বন্য যুগের চেয়ে এই যুগে সম্পত্তির বৈচিত্র্য ও পরিমাণ অনেকটা বেড়ে উঠলেও তা এমন কোন মাত্রায় পৌঁছতে পারে নি যাতে করে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে পারে। সম্পত্তি ভাগাভাগির যে পদ্ধতির কথা ওপরে বলা হয়েছে, তার মধ্যেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটার বীজ নিহিত ছিল। এই নিয়ম অনুসারে মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিরা, গোত্রের অন্যান্য সদস্যদের তাতে কোন অধিকার থাকত না। এই সময় থেকে সগোত্রীয় জ্ঞাতিত্ব নির্ধারণ করা হত পুরুষ-ধারা অনুসারে। তবে এই ধারা অনুসারে যে-সব লোক জ্ঞাতি হিসেবে পরিগণিত হত, তারা স্ত্রী-ধারার জ্ঞাতিদের থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞাতিত্ব নির্ধারণের মূল নীতিটা ছিল একই এবং একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সম্বোধন অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা চলত স্বচ্ছন্দে। স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মৃতের সগোত্রীয় জ্ঞাতি বলতে একমাত্র তাদেরকেই মনে করা হত, যারা মৃত ব্যক্তির মূল পূর্বনারী থেকে স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী জাত। পুরুষ-ধারার ক্ষেত্রেও এই নিয়মটাই বলবৎ ছিল, শুধু স্ত্রী-ধারার বদলে জ্ঞাতিত্বটা নিনীত হত পুরুষ-ধারা অনুযায়ী। অর্থাৎ সগোত্রীয় জ্ঞাতিত্বের ভিত্তি ছিল একই আদি পূর্বনারী বা পূর্বপুরুষ থেকে স্ত্রী বা পুরুষ-ধারা অনুসারে প্রত্যক্ষ বংশধারা মাফিক গোত্রের সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকা।

বর্তমানে অগ্রসর ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোত্রীয় উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একটা বিমুখতা লক্ষ করা যাচ্ছে। কোন কোন গোষ্ঠীতে এই নিয়ম রদ করে শুধুমাত্র মৃতের সন্তানদের হাতেই তার সম্পত্তি তুলে দেওয়ার নিয়ম চালু করা হয়েছে। আগের থেকে পরিমাণে অনেক বেড়ে যাওয়া সম্পত্তি যাতে পিতারা তাদের নিজের সন্তানদের হাতে তুলে দিতে পারে তার জন্য নানান বিধিনিয়ম চালু হয়ে গেছে ইরোকোয়া, ক্রীক, চেরোকী, চোক্‌টা, মেনোমিনী, ক্রো এবং ওজিবোয়া গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। এইসব বিধিনিয়ম চালু করার মধ্যে ঐ বিমুখতারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

নরখাদকবৃত্তি ছিল বন্য যুগের এক নিষ্ঠুর অভিশাপ। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ে এই ব্যাপারটা অনেক কমে যায়। সাধারণভাবে এই প্রথাটা পরিত্যক্তই হয়েছিল, তবে বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ে যুদ্ধের সময় নরখাদকবৃত্তিটা স্বীকৃত রীতি হিসেবে রয়ে যেতে পেরেছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এর নিদর্শন দেখা গেছে। তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য ব্যবহার করতে শেখার ফলেই এই নিষ্ঠুর প্রথার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল মানুষ।

এতক্ষণ আমরা এক নজরে দুটো ঐতিহাসিক যুগকে দেখার চেষ্টা করলাম। পৃথিবীতে

মানবজাতির সমগ্র অস্তিত্বের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ জুড়ে রয়েছে এই দুটো যুগই। এর মধ্যে বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়েই মানুষের উন্নততর গুণগুলো ফুটে উঠতে শুরু করে। ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ, বাক্‌পটুতা, ধর্মীয় ভাবপ্রবণতা, ন্যায়পরায়ণতা, শৌর্য ও সাহস তখন মানুষের চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। তবে সেইসঙ্গেই নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্ধ গোঁড়ামি প্রভৃতিও ব্যাপকভাবেই চালু ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পুজা, দেবদেবী ও ভূতপ্রেত সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা, অমার্জিত পদ্য রচনা, যৌথ-বাসগৃহ বানানো এবং ভুট্টাজাতীয় শস্য থেকে রুটি তৈরি করা—এগুলো সবই এই পর্যায়ের অবদান। তাছাড়া এই সময়েই গড়ে উঠেছিল জোড়-বাঁধা পরিবার আর গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সংগঠিত গোষ্ঠীগুলোর মিত্রসংঘ। মানবজাতিকে সুউন্নত করে তোলার কাজে বিপুল অবদান রয়েছে যে কল্পনাশক্তির, তা এই সময় সৃষ্টি করে চলেছিল পুরাণ, রূপকথা আর লোককথার এক অলিখিত সাহিত্য। মানুষের জীবনে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এই অলিখিত সাহিত্যগুলো।

৩. বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে সম্পত্তি।

মানব ইতিহাসের অন্য যে-কোন পর্যায়ের তুলনায় এই পর্যায়টার কথাই আমরা সব-থেকে কম জানতে পেরেছি যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন তারা বর্বর যুগের এই মধ্য পর্যায়েই ছিল। সে সময় চেষ্টা করলে তাদের শাসনবিষয়ক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় মতবাদ, গার্হস্থ্য জীবনের ধাঁচ, বিভিন্ন ব্যবহারিক কলাকৌশল এবং সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলো সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করা যেত। কিন্তু সে সুযোগটা হেলায় হারানো হয়। তাই আমাদের হাতে নানান ভ্রান্ত ধারণা আর অতিরঞ্জিত গল্পকথার মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো কিছু সত্যের টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই।

পূর্ব গোলার্ধে এই পর্যায়টা শুরু হয়েছিল পশুদের পোষ-মানানো দিয়ে আর পশ্চিম গোলার্ধে শুরু হয়েছিল ভিলেজ ইণ্ডিয়ানদের আবির্ভাব দিয়ে। এই ভিলেজ ইণ্ডিয়ানরা বসবাস করত রোদে-পোড়া ইঁট দিয়ে তৈরি যৌথ-বাসগৃহে এবং কোথাও থাক্ দিয়ে সাজানো পাথরের বাড়িতে। সেচের সাহায্যে ভুট্টা ও লতাগুল্ম চাষ চালু হয়েছিল। তার জন্য দরকার ছিল কৃত্রিম খাল আর বাগান। জলটা মাটিতে শুষে না যাওয়া পর্যন্ত সেটাকে ধরে রাখার জন্য জমিতে উঁচু করে আল দেওয়ারও দরকার হত। তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সময় তারা এই মধ্য পর্যায়ের প্রায় শেষ ভাগে এসে গিয়েছিল। তাদের একটা অংশ ততদিনে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখে গেছে। এর ফলে তারা আকরিক লোহাকে গলানোর উন্নততর প্রক্রিয়াটার দিকে অগ্রসর হতে পেরেছিল অনেকটাই। যৌথ-বাসগৃহগুলো ছিল অনেকটা দুর্গ ধরনের বাড়ি। বর্বর যুগের নিম্ন পর্যায়ের বেড়া-ঘেরা গ্রাম আর উচ্চ পর্যায়ের প্রাচীরবেষ্টিত শহরের মধ্যবর্তী অবস্থা ছিল এই যৌথ-বাসগৃহগুলো। আমেরিকা যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন সেখানে সঠিক অর্থে শহর বলে কিছু ছিল না। যুদ্ধ কৌশলের ব্যাপারে তারা খুব একটা উন্নত হয়ে উঠতে পারে নি, তবে আত্মরক্ষার ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি ঘটাতে পেরেছিল। আত্মরক্ষার জন্য তারা বড় বড় বাড়ি বানিয়েছিল, যেগুলোতে ইণ্ডিয়ানরা সহজে আক্রমণ চালাতে পারত না। তবে তারা তুলোয় ভরা একরকম বর্ম (escaupiles) উদ্ভাবন করেছিল যা

তীরের বিরুদ্ধে ঢালের কাজ করত[১], আর উদ্ভাবন করেছিল দুদিকে ধারবিশিষ্ট একরকম তরোয়াল (macuahuitl)[২] যার দুধারেই কাঠের পাতের ওপর এক সারি করে তীক্ষ্ণধার পাথর বসানো থাকত। তখনও তারা তীরধনুক, বর্শা, গদা, পাথরের ছুরি, পাথরের কুঠার এবং পাথরের তৈরি অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করত।[৩] তামার কুঠার ও বাটালি তৈরি করতেও জানত তারা, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে এগুলোকে তারা কখনোই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে নি।

ভুট্টা, শিম, লাউ ও তামাকের পর এইসময় তারা তুলো, গোলমরিচ, টম্যাটো, ক্যাকাও এবং অন্যান্য কিছু ফলের চাষ করতে শিখেছিল। একরকম ফলের রস গাঁজিয়ে এক ধরনের মদ বানানোও শুরু হয়েছিল। মেপ্‌ল্‌ গাছের রসকে গাঁজিয়ে ইরোকোয়ারাও একরকম মদ বানাতো। মৃৎশিল্পের কলাকৌশলেও কিছুটা উন্নতি ঘটেছিল। সুন্দরভাবে তৈরি ও চমৎকার কারুকাজ করা এমন সব মাটির পাত্র বানাতো তারা, যাতে বেশ কিছু গ্যালন তরল রাখা যেত। গামলা, বাটি, জলপাত্র ইত্যাদি বানানো হত প্রচুর পরিমাণে। স্থানীয় বিভিন্ন ধাতু আবিষ্কার এবং প্রথমে অলঙ্কারের জন্য ও পরে নানারকম যন্ত্রপাতি (যেমন তামার কুঠার ও বাটালি) আর বাসনপত্র তৈরির জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করাটাও এই পর্যায়েরই ব্যাপার। এই পর্যায়ে আমেরিকায় আর যে-সব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল, তার মধ্যে আছে—মাটির পাত্র বা মুচিতে করে এই ধাতুগুলোকে গলানো আর গলানোর কাজে খুব সম্ভবত ব্লো-পাইপ বা বাঁকনল ও কাঠকয়লার ব্যবহার, গলানো ধাতুকে ছাঁচে ফেলে জিনিস বানানো, ব্রোঞ্জ তৈরি, পাথর দিয়ে অমার্জিত ধরনের ভাস্কর্যের সূত্রপাত, তুলো দিয়ে বোনা পোশাক,[৪] মসৃণ পাথরের বাড়ি, মৃত প্রধানদের সমাধিফলকের ওপর খোদাই করা চিত্রবর্ণমালার লেখা, সময় পরিমাপের বর্ষপঞ্জী (calendar), ঋতু নির্ণয়ের অয়ন-পাথর, বড় বড় দেওয়াল, লামা (উট জাতীয় পশু), এক ধরনের কুকুর আর টার্কি ও মুরগী জাতীয় অন্যান্য পাখিদের পোষ-মানানো ইত্যাদি। এই সময়েই প্রথম দেখা দেয় একটা যাজকতন্ত্র, তাদের বিশেষ পোশাক, আলাদা আলাদা দেবতা ও তাদের মূর্তি এবং নরবলির প্রথা। গড়ে ওঠে দুটো ইণ্ডিয়ান বসতি—মেক্সিকো ও কাস্কো। এই দুটো বসতি বা গ্রামে বাসিন্দার সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজারেরও বেশি। আগেকার কোন যুগে এক জায়গায় এত লোককে বসবাস করতে দেখা যায় নি। পৌর ও সামরিক প্রধানদের সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল এবং ঘটনাবলী জটিল হয়ে ওঠার ফলে এদের প্রভাবও বেড়ে ওঠে। এইসব প্রধানদের মধ্যে দিয়েই সমাজে অভিজাততন্ত্রের বীজ মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

এবার পূর্ব গোলার্ধের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই পর্যায়ে সেখানকার স্থানীয় গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন পশুকে পোষ মানাতে শুরু করেছিল। এইসব পশুদের থেকে তারা মাংস আর দুধ পেত। তবে বাগান-চাষ বা আটাজাতীয় খাদ্যের ব্যবহার তারা জানত

১। হেরেরা, প্রথম পরিচ্ছেদ, iv, ১৬.

২। ঐ, iii, ১৯ ; iv, ১৬, ১৩৭. ক্ল্যাভিগেরো, ii, ১৬৫.

৩। ক্ল্যাভিগেরো, ii, ২৩৮. হেরেরা, ii, ১৪৫ ; iv, ১৩৩.

১। হাক্লুইট-এর "কল অফ ভয়েজেস্," পরিচ্ছেদ ১, iii, ৩৭৭.

বলে মনে হয় না। বন্য ঘোড়া, গরু, ভেড়া, গাধা, শুয়োর ও ছাগল যে পোষ মানানো যায় এবং তাদেরকে দলবদ্ধভাবে পোষ মানাতে পারলে তা জীবনধারণের একটা স্থায়ী উপায় হয়ে উঠতে পারে—এই আবিষ্কারটা মানুষের অগ্রগতির পথে বিপুল প্রেরণা যুগিয়েছিল। কিন্তু এইসব পশুদের লালনপালন করা এবং তাদের প্রজননের সাহায্যে নতুন নতুন পশুর জন্ম দেওয়ার জন্য দরকার ছিল পশুপালন নির্ভর জীবনযাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এটা না হওয়া পর্যন্ত ঐ প্রেরণাটা সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে নি। ইওরোপ ছিল মূলত অরণ্যময় অঞ্চল, তাই সেখানে পশুপালননির্ভর জীবনযাত্রা শুরু করাটা খুব সুবিধেজনক ছিল না। কিন্তু এশিয়ার সমুদ্রতীর থেকে দূরবর্তী তৃণময় অঞ্চল এবং ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস ও এশিয়ার অন্যান্য নদীর সন্নিহিত অঞ্চলগুলো ছিল পশুপালক গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে আদর্শ জায়গা। স্বাভাবিকভাবেই তারা ঐ-সব জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেছিল। আমাদের সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষরা এইসব অঞ্চলেই বসবাস করতেন। পশুপালক সেমিটিক গোষ্ঠীগুলোর মত সংগ্রাম করে এখানে টিকে থাকতে হত তাদের (তৃণময় অঞ্চল ছেড়ে পশ্চিম এশিয়া ও ইওরোপের অরণ্যময় অঞ্চলে চলে যাওয়ার আগেই নিশ্চয়ই তারা বিভিন্ন শস্য ও লতা-গুল্মের চাষ শুরু করেছিল। বিভিন্ন গৃহপালিত জীবজন্তু তাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে ওঠার ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই তাদের এ-সব চাষ শুরু করতে হয়েছিল। তাই আর্য গোষ্ঠীগুলো পশ্চিমের দিকে চলে যাওয়ার আগেই যে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের চাষ শুরু করেছিল, এ-কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে (সম্ভবত শুধুমাত্র কেল্ট-রা বাদে)। এই সময় থেকেই পূর্ব গোলার্ধে শন ও পশমের পোশাক এবং ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বানানো শুরু হয়।

এগুলোই ছিল বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ের প্রধান প্রধান উদ্ভাবন ও আবিষ্কার। সমাজ এ-সময় আরও সংগঠিত হয়ে উঠেছিল এবং তার ঘটনাবলী হয়ে উঠেছিল জটিলতর। অসম অবস্থার দরুন দুটো গোলার্ধের সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও প্রগতির মূল স্রোতটা এগিয়ে চলেছিল লোহা সংক্রান্ত ধারণা আর তা ব্যবহারের দিকেই। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছনোর জন্য তখন একান্ত দরকার ছিল ধার ও ডগাবিশিষ্ট ধাতব যন্ত্রপাতি। এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা একমাত্র লোহারই ছিল। সবথেকে উন্নত গোষ্ঠীগুলো ঠিক সীমারেখাটায় পৌঁছে থমকে গিয়েছিল। তাদের সামনে তখন আকরিক লোহাকে গলানোর পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ তখন প্রচুর বেড়ে উঠেছিল এবং জমির সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্কের ব্যাপারেও ঘটেছিল কিছু পরিবর্তন। মতবাদের সমগ্র অঞ্চলটার ওপর গোষ্ঠীর সার্বজনীন অধিকার থাকলেও তার একটা অংশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হত সরকারি কার্যকলাপের জন্য, একটা অংশ নির্দিষ্ট থাকত ধর্মীয় কাজকর্মে ব্যবহারের জন্য এবং আর একটা বৃহত্তর অংশ (যেখান থেকেই লোকেরা নিজেদের জীবধারনের উপকরণ সংগ্রহ করত) ভাগ করে দেওয়া হত ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্র বা দলের মধ্যে (সুপ্রা, পৃঃ ২০০)। কোন ব্যক্তি একাই একখণ্ড জমি বা একটা বাড়ির মালিক আর ইচ্ছে করলে যাকে খুশি

সে সেই জমি বা বাড়ি বিক্রী করতে কিংবা দিয়ে দিতে পারে—এই ব্যাপারটা তখনও চালু হয় নি, চালু হওয়া সম্ভবও ছিল না। জমির মালিক ছিল গোত্র বা দল, যৌথ-বাসগৃহগুলোয় পরস্পর জ্ঞাতিত্বসম্পর্কযুক্ত কয়েকটা পরিবার একত্রে বসবাস করত। এই পদ্ধতি চালু থাকার ফলে বাড়ি বা জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা তখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এইসব জমি বা বাড়ি বাইরের লোকদের কাছে বিক্রী বা হস্তান্তর করা হলে তাদের জীবনযাত্রার ধাঁচটাই বদলে যেত।[১] জমি বা বাড়ি ভোগ-দখলের ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের একটা অধিকার ছিলই এবং গোত্রের বাইরের কারুর কাছে তা হস্তান্তর করা চলত না। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার জমি বা বাড়ি ভোগদখলের অধিকার পেত তার সগোত্রীয় উত্তরাধিকারীরাই। যৌথ-বাসগৃহ এবং সার্বজনীন জমি—এই দুটো বিষয় থেকেই বোঝা যায় যে তাদের জীবনযাত্রার ধাঁচটা ছিল ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে প্রতিকূল।

মোকি ভিলেজ্ ইণ্ডিয়ানরা এই সময় তাদের সাতটা গ্রাম আর বাগানগুলো ছাড়াও বেশ কিছু ভেড়ার পাল, ঘোড়া, খচ্চর এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। নানান আয়তনের ও চমৎকার ধরনের মৃৎপাত্র বানাত তারা আর নিজেদের তৈরি সুতো দিয়ে তাঁতের সাহায্যে বানাত পশমী কম্বল। ওরেবি গ্রামের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন মেজর জে. ডব্লিউ. পাওয়েল, যা থেকে বোঝা যায় যে স্ত্রী-র সম্পত্তির ওপর কিংবা সন্তানদের ওপর স্বামীদের কোন অধিকারই থাকে না। জুনি গ্রামের জনৈক পুরুষ ওরেবি-র একজন নারীকে বিবাহ করে। তিনটি সন্তান হয় তাদের। স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে সে ওরেবিতেই বসবাস করত। তার স্ত্রী মারা যায় (মেজর পাওয়েল তখন ঐ গ্রামেই ছিলেন)। মৃতার জ্ঞাতিরাই তার সন্তানদের গ্রহণ করে এবং তার গেরস্থালির জিনিসপত্রগুলো নিয়ে নেয়। স্বামীটি ফেরৎ পায় শুধু নিজের ঘোড়া, পোশাক আর হাতিয়ারগুলো। স্বামীকে তার নিজের কিছু কম্বল নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার স্ত্রী-র কম্বলগুলো রেখে দেওয়া হয়েছিল। স্বামীটি মেজর পাওয়েলের সঙ্গেই যাত্রা করে এবং বলে যে সে সান্তাফে ? যে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যাবে, তারপর ফিরে যাবে তার নিজের গ্রাম জুনিতে। মোকিদের আর

১। রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গর্ম্যান, যিনি লাগুনা পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে মিশনারি হিসেবে কাজ করেছেন, তিনি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ নিউ মেক্সিকো-র এক অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে (পৃঃ ১২) বলেন যে, "সম্পত্তির অধিকার পরিবারের নারীদের হাতে থাকে এবং ঐ ধারা অনুযায়ী মায়ের কাছ থেকে সেই অধিকার বর্তায় মেয়েদের ওপর। তাদের জমিগুলো সার্বজনীন অর্থাৎ গোটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। কিন্তু কোন ব্যক্তি একটা জমিতে চাষ করার পর সেই জমির ওপর তার একটা ব্যক্তিগত অধিকার জন্মায়, 'যা সে ঐ সম্প্রদায়ের অন্য কারুর কাছে বিক্রি করতে পারে।' তাদের শস্যভাণ্ডারের দায়িত্ব থাকে মেয়েদেরই হাতে এবং তাদের স্পেনীয় প্রতিবেশীদের তুলনায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা অনেক বেশি দূরদর্শী। সাধারণত তারা সবসময়ই পুরো এক বছরের খাদ্য মজুত রাখার চেষ্টা করে। একমাত্র পর পর দু'বছর আকাল দেখা দিলে তবেই তাদেরকে অনাহারের মুখোমুখি হতে হয়।

একটা গ্রামেও (পি-পাও-এ-সুড-ইহ্‌) এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এবং সেই ঘটনারও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন আমার সংবাদদাতা। স্বামী, সন্তান এবং কিছু সম্পত্তি রেখে মারা যায় জনৈক নারী। মৃতার জ্ঞাতিরাই তার সন্তানদের গ্রহণ করে এবং মৃতার যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার করে। স্বামীটি শুধু নিজের পোশাকগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার অনুমতি পায়। মেজর পাওয়েল এই স্বামীটিকে দেখেছিলেন। কিন্তু সে মোকি ইণ্ডিয়ান ছিল নাকি অন্য কোন গোষ্ঠীর সদস্য ছিল, তা তিনি জানতে পারেন নি। এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে সন্তানদের ওপর মায়েরই অধিকার থাকত, বাবার নয়। এমনকি মায়ের মৃত্যুর পরও বাবা তাদের সন্তানদের নিয়ে যেতে পারত না। ইরোকোয়া এবং উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও এই রীতিই চালু ছিল। তাছাড়া স্ত্রী-র সম্পত্তিও আলাদা করে রাখা হত এবং তার মৃত্যুর পর সেগুলো পেত তার জ্ঞাতিরা। এ থেকে বোঝা যায় যে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী কিছুই নিত না, কারণ স্ত্রী-র কাছ থেকে স্বামীও নিত না কিছুই। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে মেক্সিকোর ভিলেজ্‌ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও এই রীতিই চালু ছিল।

গ্রামের বাড়িগুলোর যে-সব ঘরে এবং অংশে যে যে নারী ও পুরুষরা বসবাস করত, সেইসব ঘর ও অংশের ওপর তাদের একটা ভোগদখলের অধিকার থাকতই। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই অধিকার তাদের কাছ থেকে বর্তাতো তাদের নিকটতম জ্ঞাতিদের ওপর। প্রতিটি গ্রামের এইসব অংশগুলোর ওপর কীভাবে বিভিন্ন জনের মালিকানা গড়ে উঠত, কীভাবে তা উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হত, বাইরের কোন লোকের কাছে তা বিক্রি ও হস্তান্তর করার অধিকার মালিকের ছিল কি না, এবং তা না থাকলে ভোগদখলের অধিকারের প্রকৃতিটা ঠিক কেমন ছিল এবং এই অধিকারের সীমা ছিল কতটা—এগুলো আমাদের জানা দরকার। সেইসঙ্গেই জানা দরকার পুরুষদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীই বা কারা হত। একটু পরিশ্রম করলেই এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে।

দক্ষিণাঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার জমি ভোগদখলের অধিকার সম্বন্ধে স্পেনীয় লেখকরা প্রচণ্ড বিভ্রান্তিকর সব মন্তব্য করেছেন। যেখানেই তাঁরা দেখেছেন যে একদল লোক যৌথভাবে কিছু জমির মালিক, সেই জমি তারা বাইরের কারুর কাছে হস্তান্তর করতে পারে না এবং কোন একজন ব্যক্তি তাদের প্রধান হিসেবে স্বীকৃত সেখানেই তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে এগুলো হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি, ঐ প্রধানকে বলেছেন সামন্তপ্রভু এবং যৌথভাবে জমির অধিকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেছেন তার প্রজা হিসেবে। তাঁদের এইসব মন্তব্যে প্রকৃত অবস্থাটা বিকৃত হয়ে উঠেছে। একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে একদল লোক যৌথভাবে এইসব জমির মালিক ছিল। কিন্তু একইরকম গুরুত্বপূর্ণ আর একটা বিষয়ের কথা তাঁরা উল্লেখ করেন নি। তা হল—কোন্‌ ঐক্যবন্ধন এইসব লোকদের একত্রে ধরে রাখত। এটা যদি কোন গোত্র, বা গোত্রের অংশ হয়ে থাকে, তাহলে গোটা ব্যাপারটা মুহূর্তে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও স্ত্রী-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের রীতি চালু আছে। কিন্তু অধিকাংশ গোষ্ঠীই স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের রীতি গ্রহণ করেছে। এই পরিবর্তনের পিছনে

সম্পত্তিই প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। অর্থাৎ, সন্তানরা যাতে জ্ঞাতি হিসেবে বাবার সম্পত্তির অংশীদার হতে পারে, তার জন্যই এই পরিবর্তনটা ঘটানো হয়েছে। মায়াদের মধ্যে পুরুষ ধারা অনুযায়ী বংশধারা নির্ণয়ের রীতিই চালু ছিল। আজ্‌টেক, টেজ,কুকান, টুলাকোপান এবং টুলাস্‌কালানদের মধ্যে পুরুষ-ধারা চালু ছিল নাকি স্ত্রী-ধারা, তা বলা মুশ্‌কিল। সম্ভবত ভিলেজ্‌ ইণ্ডিয়ানদের সব গোষ্ঠীর মধ্যেই স্ত্রী-ধারার বদলে পুরুষ-ধারা চালু হয়েছিল, তবে পুরনো রীতির কিছু কিছু ছাপ এখানে-ওখানে রয়েই গিয়েছিল—যার প্রমাণ হিসেবে টিউক্‌টুলি পদটার কথা উল্লেখ করা যায়। এই পরিবর্তনের ফলে গোত্রীয় উত্তরাধিকারের রীতির কোন হেরফের ঘটে নি। কয়েকজন স্পেনীয় লেখক বলেছেন যে মৃত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত সন্তানরা, কোন কোন ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র। এইসব বক্তব্য থেকে তাদের ব্যবস্থার একটা বর্ণনা পাওয়া গেলেও এই জাতীয় বক্তব্যগুলো নিতান্তই গুরুত্বহীন।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম, অর্থাৎ মৃতের সম্পত্তি তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার রীতিটা ভিলেজ্‌ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে চালু ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। বংশধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ-ধারা চালু থাকার দরুণ কোন মৃত ব্যক্তির সন্তানরাই তাঁর নিকটতম জ্ঞাতি হিসেবে গণ্য হত এবং স্বাভাবিক ভাবেই তার সম্পত্তির বৃহত্তম অংশটাও তারাই পেত। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওপর শুধুমাত্র তার সন্তানদেরই অধিকার থাকার রীতিটা তাদের মধ্যে চালু হওয়া মোটেই সম্ভবপর ছিল না। উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে আগেকার যুগের ও পরবর্তী যুগের লেখকরা যে-সব আলোচনা করেছেন, তা মোটেই সন্তোষজনক নয় এবং এগুলোর মধ্যে যথাযথ তথ্যেরও অভাব আছে। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, রীতি ও প্রথাই তখনও পর্যন্ত নির্ণায়ক ভূমিকা নিত এবং শুধুমাত্র এগুলোর সাহায্যেই গোটা ব্যবস্থাটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমাদের হাতে এখনও পর্যন্ত যতটুকু প্রমাণ আছে, তার থেকে আরও ভালো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায় না যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে শুধুমাত্র তার সন্তানরাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তরাধিকারের তিনটি নিয়ম—পূর্বানুবৃত্তি

বর্বর যুগের শেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টায় আমেরিকার আদিবাসীরা কখনোই পারে নি। এই পর্যায়টা শুরু হয়েছিল পূর্ব গোলার্ধে। লোহা তৈরি ও তা ব্যবহার করা দিয়েই সূচনা হয় এই পর্যায়ের।

আমরা আগেই বলেছি যে আকরিক লোহাকে গলানোর পদ্ধতি উদ্ভাবনের পাশে মানুষের অন্য সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কার ম্লান হয়ে যায়। ব্রোঞ্জের ব্যবহার রপ্ত করা করা সত্ত্বেও মজবুত ধাতব যন্ত্রপাতির অভাবে এবং যান্ত্রিক কাজকর্মে প্রয়োগ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তপোক্ত ও কঠিন একটা ধাতুর অভাবে মানুষের অগ্রগতির পথটা ঠিক মসৃণ হয়ে উঠতে পারছিল না। এই সব গুণগুলো প্রথম পাওয়া গেল লোহার মধ্যে। এই উদ্ভাবনের পর থেকেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা বেড়ে উঠতে লাগল দ্রুত গতিতে। মানবজাতির অভিজ্ঞতার সমগ্র ইতিহাসে এই চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক যুগটা নানা দিক থেকে সবথেকে উজ্জ্বল ও সবথেকে উল্লেখযোগ্য যুগ। এই যুগে মানুষের এত বেশি সাফল্যের কথা জানা গেছে যে মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয় এর মধ্যে কয়েকটা হয়ত পূর্বতন যুগেই ঘটে গিয়েছিল।

৪। বর্বর যুগের উচ্চ অবস্থায় সম্পত্তি।

এই পর্যায়ের শেষ দিক নাগাদ নানা ধরনের সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হতে শুরু করে। এক জায়গায় স্থানীয় বাণিজ্য এবং বৈদেশিক ব্যবসা—এইসব ঘটনাই সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। তবে জমি ভোগদখলের যে পুরনো নিয়ম অনুসারে জমির ওপর সার্বজনীন মালিকানা কায়েম ছিল, তা কিন্তু (কোন কোন জায়গা বাদে) জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে তখনও পর্যন্ত পথ ছেড়ে দেয় নি, তাই জমির ওপর সার্বজনীন মালিকানাই বহাল ছিল। এই সময় থেকেই দাসত্বপ্রথা মাথা তুলতে শুরু করে। সম্পত্তি উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরিভাবেই সম্পর্ক যুক্ত ছিল এই দাসত্বপ্রথা। এ থেকেই গড়ে ওঠে হিব্রু ধাঁচের পিতৃপ্রধান পরিবার, এবং গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠে এই ধরনের পরিবারেরই একটা পরিবর্তিত রূপ। এইসব কারণে এবং বিশেষত ক্ষেত্রচাষের ফলে জীবনধারণের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে হাতে আসার দরুণ জাতিগুলো সংখ্যায় বেড়ে উঠতে থাকে। আগে যেখানে মাত্র কয়েক হাজার জাতি ছিল, এখন সেখানে একটা সরকারের অধীনেই বহু হাজার জাতির অভ্যুদয় ঘটে। এক একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে এবং প্রাচীরবেষ্টিত শহরে এক একটা গোষ্ঠী বসবাস করতে শুরু করে, বেড়ে ওঠে লোকসংখ্যা, আর তার ফল হিসেবে সবথেকে ভালো অঞ্চলগুলো দখলের জন্য প্রতিযোগিতাও বেড়ে উঠতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই উন্নত হয়ে ওঠে যুদ্ধকৌশল আর ব্যক্তিগত শৌর্যের জন্য মানুষ আরও বেশি পুরস্কার পেতে থাকে। অবস্থা এবং জীবনযাত্রার এই পরিবর্তন সভ্যতার

আগমনকেই সূচিত করেছিল। গোত্রীয় সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল সভ্যতাই।

পশ্চিম গোলার্ধের বাসিন্দারা এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতার শরিক না হলেও তারা এগিয়ে চলেছিল সেই পথ ধরেই, যে পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিল পূর্ব গোলার্ধের অধিবাসীরা। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায় এবং তারপর সভ্যতার কিছু বছর—এই সময়টুকুতে তারা মানবজাতির অগ্রসর অংশের থেকে পিছিয়ে পড়েছিল।

এখন আমাদের খুঁজে দেখতে হবে অগ্রগতির এই পর্যায়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণা কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল। বিভিন্ন বস্তুর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মগুলোর মধ্যেই তার প্রমাণ বিধৃত আছে।

সভ্যতার যুগ শুরু হওয়ার পর গ্রীক, রোমান ও হিব্রুরা প্রথম যে আইনগুলো রচনা করেছিল, সেগুলো আসলে তাদের পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন রীতি ও প্রথাকে একটা আইনী চেহারা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সর্বশেষ আইনগুলো আর আগেকার নিয়মগুলো জানা থাকলে এ দুয়ের অন্তর্বর্তী পরিবর্তনগুলোর কথা যথাযথভাবে জানা না গেলেও আন্দাজ করে নেওয়া যায় সহজেই।

বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ের শেষ দিকে জমি ভোগদখলের ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল সমাজের বুকে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল দু'ধরনের মালিকানা—রাষ্ট্রীয় আর ব্যক্তিগত। তবে সভ্যতার যুগ শুরু না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারটা পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। আমরা আগেই দেখেছি যে তখন গ্রীকদের মধ্যে কিছু জমি ছিল গোষ্ঠীগুলোর সার্বজনীন, কিছু জমি ধর্মীয় কাজে ব্যবহারের জন্য থাকত ভ্রাতৃত্বের হাতে আর কিছু জমি ছিল গোত্রগুলোর যৌথ সম্পত্তি, কিন্তু জমির বেশির ভাগই চলে গিয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে। সোলোনের আমলে (এথেনীয়দের সমাজ-ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত গোত্রভিত্তিকই ছিল) জমির মালিক ছিল মূলত বিভিন্ন ব্যক্তিই এবং তৎদিনে তারা জমি বাঁধা রাখতেও শিখে গিয়েছিল।[১] তবে ব্যক্তিগত মালিকানা তখন আর কোন নতুন জিনিস ছিল না। রোমান গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একেবারে প্রথম থেকেই একটা সার্বজনীন এলাকা থাকত, যাকে বলা হত 'এজার রোমানাস' (Ager Romunus); আর কিছু জমি ধর্মীয় কাজকর্মের জন্য থাকত কিউরিয়ার হাতে, কিছু জমি থাকত গোত্রের হাতে এবং বাকি কিছু জমি থাকত বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে। এইসব প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হওয়ার পর তাদের সার্বজনীন জমিগুলো ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। আমাদের শুধু এইটুকুই জানা আছে যে বিশেষ কিছু কাজে ব্যবহারের জন্য কিছু জমি এইসব সংগঠনের হাতে থাকত আর দেশের সম্পদ-গুলো ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছিল।

এইসব নানান ধরনের মালিকানা থেকে বোঝা যায় যে সবথেকে আগে জমি ভোগদখলের অধিকার থাকত সমগ্র গোষ্ঠীর হাতে। তারপর জমিতে চাষের কাজ শুরু হওয়ার পর গোষ্ঠীর জমির একটা অংশ ভাগ করে দেওয়া হত গোত্রগুলোর মধ্যে এবং প্রতিটি গোত্রের ভাগের জমিটুকু হয়ে উঠত গোত্রের সার্বজনীন সম্পত্তি। একটা সময়ে এসে

১। প্লুটার্ক, "সোলোন" রচনায়, পরিচ্ছেদ ১৫.

গোত্রের জমি আবার ভাগ করে দেওয়া হয় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এবং এ থেকেই জমির ওপর কায়েম হয় ব্যক্তিগত মালিকানা। অনধিকৃত এবং পতিত জমিগুলোর তখনও পর্যন্ত গোত্র, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রের সার্বজনীন সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচিত হত। জমির মালিকানার ব্যাপারটা মোটামুটি এভাবেই এগিয়েছে। অস্থাবর সম্পত্তির ওপরেও ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয়।

বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়েই গড়ে ওঠে একবিবাহভিত্তিক পরিবার। পূর্বতন জোড়-বাঁধা পরিবারের মধ্যে থেকে এই একবিবাহভিত্তিক পরিবার গড়ে ওঠার সঙ্গে সম্পত্তি বৃদ্ধি এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মগুলোর একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল। বংশ-ধারা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে স্ত্রী-ধারার বদলে চালু হয়েছিল পুরুষ-ধারা। কিন্তু স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বরাবরের মতই গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক রয়ে গিয়েছিল। গ্রীক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এই সময় কোন্ কোন্ ধরনের সম্পত্তি বিদ্যমান ছিল, সে সম্বন্ধে তথ্য বলতে আমাদের হাতে আছে মূলত হোমারের কাব্য এবং সভ্যতার যুগের প্রথম দিকের আইনগুলো (যার মধ্যে প্রাচীন রীতিগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে)। ইলিয়াডে কর্ষিত জমির চারদিকে বেড়া দেওয়ার[১] কথা উল্লেখ করা হয়েছে, উল্লেখ করা হয়েছে, 'পঞ্চাশ একরব্যাপী ঘেরা এলাকা'-র কথা যার অর্ধেকটা ছিল আঙুর-চাষের উপযোগী আর বাকি অর্ধেকটা অন্যান্য চাষের উপযোগী।[২] টাইডেয়ুস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সে প্রচুর সম্পদে ভরা একটা প্রাসাদে বাস করত এবং তার প্রচুর ফলন্ত জমি ছিল।[৩] জমির চারদিকে যে তখন বেড়া দেওয়া হত, জমির মাপজোক করা হত এবং জমির ওপর যে ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণায় ও সম্পত্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। কোন্ ধরনের ঘোড়ার বাচ্চা উৎকৃষ্টতর হয়, তা ততদিনে শিখে নিয়েছিল মানুষ।[৪] ব্যক্তিগত মালিকানার গরু-ভেড়ার পাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "খোঁয়াড়ে এক ধনী ব্যক্তির অসংখ্য ভেড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে।"[৫] মুদ্রার প্রচলন তখনও হয় নি, তাই বাণিজ্য চলত পণ্য-বিনিময় মারফৎ। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "অতঃপর দীর্ঘকেশ-বিশিষ্ট গ্রীকরা তাদের পিতল, চক্চকে লোহা, পশুচর্ম, ষাঁড় এবং ক্রীতদাসের বিনিময়ে সুরা ক্রয় করল।"[৬] তবে কথাপ্রসঙ্গে সোনার বাটের ওজন এবং তার গুণমানের কথাও উল্লিখিত হয়েছে।[৭] সোনা, রুপো, পিতল ও লোহার জিনিসপত্র, ক্ষৌমবস্ত্র বা লিনেন ও পশমের নানারকম জামাকাপড়, বিভিন্ন বাড়ি, প্রাসাদ—এ-সবের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত বাড়ানোর আর প্রয়োজন নেই। প্রদত্ত দৃষ্টান্তগুলো থেকে স্পষ্ট-

১। ইলিয়াড, V, ৯০.

২। ঐ, ix, ৫৭৭.

৩। ঐ, xiv, ১২১.

৪। ঐ, V, ২৬৫.

৫। ঐ, iv, ৪৩৩, বাক্লে-র অনুবাদ।

৬। ঐ, vii, ৪৭২, বাক্লে-র অনুবাদ।

৭। ঐ, xii, ২৭৪.

ভাবেই বোঝা যায় অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় বর্বর যুগের এই উচ্চ পর্যায়ে সমাজ কতটা উন্নত হয়ে উঠেছিল।

বাড়ি, জমি, গবাদি পশু ও বিনিময়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে ওঠার পর এবং সেগুলোর ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হওয়ার পর এইসব সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নটা মানুষের মনে চেপে বসেছিল। গ্রীকদের ক্রমবর্ধমান বুদ্ধিমত্তাকে সন্তুষ্ট করার মত মজবুত একটা বনিয়াদের ওপর এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারা পর্যন্ত ঐ চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় নি মানুষ। পরবর্তীকালের নতুন ধ্যানধারণা অনুসারে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল পুরনো প্রথার। আগেকার যুগের সমস্ত সম্পত্তির থেকে মূল্যবান ছিল গৃহপালিত পশুর দল। এরা মানুষকে খাদ্য যোগাত, বিনিময়যোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেত এদের, কাজে লাগানো যেত যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্য, জরিমানা দেওয়ার জন্য এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলি দেওয়ার ব্যাপারেও। তাছাড়া এই গৃহপালিত পশুদের বংশবৃদ্ধি ঘটত দ্রুত হারে আর এ থেকেই সম্পদের ধারণাটা মানুষের মধ্যে প্রথম গড়ে ওঠে। এর পর জমিতে প্রণালীবদ্ধভাবে চাষ করতে শেখে মানুষ। এর ফলে পরিবারগুলো জমির সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পরিণত হয় এক একটা সম্পত্তি-উৎপাদক সংগঠনে। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠে ক্রীতদাস ও ভৃত্যসহ পিতৃপ্রধান পরিবার। পিতা ও তার সন্তানরা আরও বেশি করে যুক্ত হয়ে পড়ল জমির সঙ্গে, গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের সঙ্গে। এই সব কিছুর ফলে তৎকালীন একবিবাহভিত্তিক পরিবারগুলো একটা নিজস্বতা, একটা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছিল তো বটেই, সেই সঙ্গেই যে সম্পত্তি সৃষ্টিতে সন্তানরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে তার উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তাদের দাবীটাও আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার আগে গবাদি পশুরা স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সদস্যদের যৌথ সম্পত্তি ছিল। সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকারের নিয়ম যে এই অবস্থায় মাথা তুলে দাঁড়াবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। কিন্তু জমি যখন সম্পত্তিতে পরিণত হল এবং বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ জমিগুলো পরিণত হল তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, তখন ঐ সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকারের বদলে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, যে নিয়ম অনুসারে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সন্তানরা। লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু গোষ্ঠী-গুলোর মধ্যে সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকারের নিয়ম কখনও পুরোপুরিভাবে চালু ছিল কি না, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে রোমান, গ্রীক ও হিব্রু আইন থেকে জানা যায় যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের হাতে তুলে দেওয়ার রীতি চালু ছিল তাদের মধ্যে। এ থেকে মনে হয় যে প্রথম দিকে তাদের মধ্যে সগোত্রীয় জ্ঞাতিদের উত্তরাধিকারের নিয়মটা পুরোপুরিভাবেই ক্রিয়াশীল ছিল।

ক্ষেত্রে চাষের ফলে দেখা গেল যে পৃথিবীর সবটুকু অঞ্চলই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পর্যবসিত হতে পারে এবং উঠল, তখন থেকেই সম্পত্তির ব্যাপারে এক নতুন যাত্রা শুরু হল মানব-জাতির। বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায় শেষ হওয়ার আগেই গোটা ব্যাপারটা একটা পূর্ণাঙ্গ চেহারা নিতে পেরেছিল। এই সময় থেকে মানুষের চিন্তাভাবনার ওপর সম্পত্তি কতটা

শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল এবং তার ফলে মানুষের চরিত্রে কতরকম নতুন নতুন উপাদান মাথা তুলতে শুরু করেছিল—তা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে বন্য মানুষদের চিন্তাভাবনায় যে জিনিসটা নিতান্ত দুর্বল একটা রেখাপাত করতে পেরেছিল, সেই জিনিসটাই মহাকাব্যীয় যুগের বর্বরদের মনে দেখা দিয়েছিল এক বিপুল প্রেরণা হিসেবে এই বিকশিত অবস্থার সামনে প্রাচীন প্রথা অথবা পরবর্তী যুগের রীতি নীতি—কারুর পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। তখন সেই সময়টা এসে গিয়েছিল, যখন সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে একবিবাহভিত্তিক পরিবার নিশ্চিতভাবে, নির্ধারণ করা যাচ্ছে সন্তানদের পিতৃত্ব এবং মৃত পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হতে চলেছে তার সন্তানরা।[১]

হিব্রু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে (যাদের বর্বর দশা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় নি) সভ্যতার যুগ শুরু হওয়ার আগে থেকেই জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা চালু ছিল। এফ্রনের কাছ থেকে আব্রাহামের ম্যাক্‌পেলাহ্‌ গুহাটা কেনার ঘটনা এরই একটা দৃষ্টান্ত।[২] তার আগে তারা নিশ্চয়ই ঠিক আর্য গোষ্ঠীগুলোর মত একই অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করে এসেছিল আর তাদেরই মত গৃহপালিত পশু, খাদ্যশস্য, লোহা, পিতল, সোনা, রুপো, মাটির তৈরি জিনিসপত্র এবং পোশাক-পরিচ্ছদের অধিকারী হয়ে পেরিয়ে এসেছিল বর্বর যুগ। কিন্তু আব্রাহামের আমলে ক্ষেত্রচাষ সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুব একটা উন্নত ছিল না। অভিনিষ্ক্রমণের (Exodus) পর ভাইবোন বিবাহ-ভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর (প্যালেস্তাইনে গিয়ে পৌঁছনোর পর যাদের জন্য বিভিন্ন এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল) ভিত্তিতে হিব্রু সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাঠামো থেকে বোঝা যায় সভ্যতার শুরুতে তাদের মধ্যে গোত্রীয় প্রতিষ্ঠান চালু ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার ধারণা তখনও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। মোজেস্‌-এর আইন থেকে মোটামুটি স্পষ্টভাবেই মনে হয় যে সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তাদের ধ্যানধারণার ক্রমোন্নতি অনেকটা গ্রীক আর রোমান গোষ্ঠীগুলোর মত একই পথ ধরে এগিয়েছে। উত্তরাধিকারের ব্যাপারটা পুরোপুরি-

১। জার্মান গোষ্ঠীগুলোর কথা যখন প্রথম জানা যায়, তখন তারা বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে ছিল। তারা লোহা ব্যবহার করত (খুব অল্প পরিমাণে), গরু-ভেড়ার পাল ছিল তাদের, খাদ্যশস্যের চাষ করত তারা, এবং লিনেন ও পশম দিয়ে পোশাক বানাত। কিন্তু জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা তখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। সিজারের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে চাষের উপযোগী জমিগুলো প্রধানরা প্রতি বছর গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন আর পশুচারণভূমিগুলো থাকত গোষ্ঠীর সার্বজনীন এক্তিয়ারে। তাই মনে হয় এশিয়া এবং ইওরোপে বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে মানুষের মধ্যে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার কোন ধারণা ছিল না, এই ধারণাটা গড়ে উঠেছিল বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পর।

২। "জেনেসিস," xxiii, ১৩.

ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল ভ্রাতৃত্বের মধ্যে, বা সম্ভবত শুধু গোত্রের মধ্যেই, অর্থাৎ "পিতার বংশের মধ্যে।" উত্তরাধিকারের ব্যাপারে হিব্রুদের পুরোনো নিয়ম কী ছিল, জানা যায় নি। একমাত্র মৃতের সম্পত্তি প্রত্যর্পনের নিয়ম থেকে যেটুকু আন্দাজ করা যায়। এদের এই সম্পত্তি প্রত্যর্পনের নিয়মটা ছিল হুবহু রোমানদের 'টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌'-এর আইনের মত। সম্পত্তি প্রত্যর্পনের এই নিয়মাবলী ছাড়াও একটা ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে পিতার সম্পত্তির ওপর তার সন্তানদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কোন অপুত্রক পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হত তার কন্যারা। সেক্ষেত্রে, উত্তরাধিকারণীর অধিকারের ওপর কোন বিশেষ বাধানিষেধ না থাকলে, তাদের বিবাহের পর ঐ সম্পত্তি তাদের নিজেদের গোত্র থেকে তাদের স্বামীদের গোত্রের এক্তিয়ারভুক্ত হত। নিজেদের গোত্রের মধ্যে বিবাহ যে নিষিদ্ধ ছিল, সেটা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না। গোত্রীয় উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে শেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা ঠিক এখান থেকেই দেখা দিয়েছিল। ঐ সম্পত্তিকে নিজের সদস্যদের মধ্যেই রাখতে চাইতে গোত্র। মোজেসের সামনে প্রশ্নটা এসেছিল হিব্রুদের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন হিসেবে আর সোলোনের সামনে এসেছিল এথেনীয়দের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন হিসেবে। দুজনে প্রশ্নটার সমাধানও করেছিলেন একই-ভাবে। ধরে নেওয়া যায় রোমান গোত্রগুলোর মধ্যেও এই প্রশ্নটা উঠেছিল। প্রশ্নটার আংশিক সমাধান করা হয় এই নিয়ম চালু করে যে বিবাহের পর মেয়েরা আর নিজেদের গোত্রের কোন অধিকারের দাবীদার থাকবে না। আর একটা প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রশ্নটা হল—নিজেদের গোত্রের মধ্যে বিবাহকে কি পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে নাকি সে-রকম কোন বাধানিষেধ থাকবে না। বিবাহের বাধানিষেধের ব্যাপারে জ্ঞাতিত্বটা কোন্‌ পর্যায়ের সেটাই ছিল বিবেচ্য, মূল জ্ঞাতিত্বটা নয়। এই শেষোক্ত নিয়মটাই হচ্ছে বিবাহের ব্যাপারে মানুষের অভিজ্ঞতার সর্বশেষ ফলাফল। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নিম্নোক্ত ঘটনাটার দিকে তাকালে হিব্রুদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান-গুলোর চেহারাটা বোঝা যায় আর সেইসঙ্গেই গ্রীক ও রোমানদের গোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এগুলোর মূলগত সাদৃশ্যটা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

জেলোফিহাদের কোন পুত্র ছিল না, কন্যাদের রেখে তিনি মারা যান। তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীনী হয় তাঁর কন্যারাই। তারপর একসময় এই কন্যারা তাদের নিজেদের গোষ্ঠী অর্থাৎ জোসেফ গোষ্ঠীর বাইরের পুরুষদের বিবাহ করতে উদ্যোগী হয়। গোষ্ঠীর সম্পত্তি বাইরে চলে যাওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় গোষ্ঠীর সদস্যরা। প্রশ্নটা নিয়ে তারা হাজির হয় মোজেসের সামনে, বলে: "যদি ইজরায়েলের সন্তানদের অন্য কোন গোষ্ঠীর কোন ওরা ছেলেকে বিয়ে করে, তাহলে উত্তরাধিকারটা আমাদের পিতাদের থেকে নিয়ে ওরা যে গোষ্ঠীতে যাবে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এবং এই উত্তরাধিকার বিষয়টা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে।"[১] কথাটা একটা প্রস্তাবিত কাজের বিবৃতির আকারে পেশ করা হলেও আসলে এর মধ্যে একটা ক্ষোভ লুকিয়ে আছে। গোত্র এবং গোষ্ঠীর হাত থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার অন্যত্র চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই এই ক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল। হিব্রু আইনপ্রণেতা তাঁর সিদ্ধান্তে গোত্র ও গোষ্ঠীর এই

১। "নাম্বার্স", xxxvi, ৪.

অধিকারকে সমর্থনই করেছিলেন।" জোসেফের পুত্রদের গোষ্ঠী তাদের বক্তব্য চমৎকার-ভাবে পেশ করেছে। জেলোফিহাদের কন্যাদের সম্বন্ধে প্রভু ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যাদেরকে ওরা সবথেকে ভাল বলে মনে করে, তাদেরকেই বিবাহ করুক, তবে সেই বিবাহটা নিজের পিতার গোষ্ঠীর মধ্যে হওয়া চাই। তাহলে আর ইজরায়েলের সন্তানদের উত্তরাধিকার এক গোষ্ঠীর হাত থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে চলে যাবে না। ইজরায়েলের প্রতিটি সন্তানেরই উচিত তার নিজের পিতার গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখা। যে-সব কন্যারা ইজরায়েলের সন্তানদের কোন গোষ্ঠীতে কোন উত্তরাধিকার লাভ করেছে, তাদের উচিত পিতার গোষ্ঠীর মধ্যে কাউকে বিবাহ করা যাতে করে ইজরায়েলের প্রতিটি সন্তান তার পিতার উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে।"[১] নিজেদের গোত্রের মধ্যেই না হলেও নিজেদের ভ্রাতৃত্বের মধ্যেকার কাউকেই বিবাহ করতে হত তাদের (সুপ্রা, পৃঃ ৩৬৮)। তাই জেলোফিহাদের কন্যাদেরও তাদের পিতার ভাইয়ের পুত্রদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল।[২] এরা শুধু তাদের নিজেদের ভ্রাতৃত্বেরই সদস্য ছিল না, ববং একই গোত্রের সদস্যও ছিল। তাছাড়া এরা তাদের নিকটতম জ্ঞাতিও ছিল।

এর আগের একটি ঘটনায় উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে রায় দিতে গিয়ে মোজেস সুস্পষ্ট ভাষায় নিম্নোক্ত নিয়মটি জারি করেন—"ইজরায়েলের সন্তানদের তোমরা জানিয়ে দেবে যে কোন লোক যদি মারা যায় এবং তার কোন পুত্র না থাকে, তাহলে তার উত্তরাধিকার বর্তাবে তার কন্যাদের ওপর। তার যদি কোন কন্যাও না থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারী হবে তার ভাইরা। কোন ভাইও যদি না থাকে তার, তাহলে ঐ উত্তরাধিকার বর্তাবে তার পিতার ভাইদের ওপর। তার পিতারও যদি কোন ভাই না থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারী হবে তার পরিবারের নিকটতম আত্মীয় এবং সে সেটা ভোগদখল করবে।"[৩]

এখানে তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত, মৃত ব্যক্তির সন্তানরা; দ্বিতীয়ত, সম্পর্কের নিকটত্ব অনুযায়ী জ্ঞাতিরা; এবং তৃতীয়ত, মৃত ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের মধ্যেকার আত্মীয়রা। উত্তরাধিকারীদের প্রথম শ্রেণীতে থাকত মৃত ব্যক্তির সন্তানরা। তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে পিতার সম্পত্তির অধিকারী হত পুত্ররাই, কিন্তু পিতার কন্যাদের অর্থাৎ বোনেদের ভরণাপোষণের দায়িত্বটাও নিতে হত তাদের। আমরা আগেই দেখেছি যে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিগুণ অংশ পেত। পুত্র না থাকলে উত্তরাধিকার বর্তাতো কন্যাদের ওপর।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকত দু ধরনের জ্ঞাতিরা। প্রথমত, মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার ভাইরা। দ্বিতীয়ত, কোন ভাই না থাকলে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার পিতার ভাইরা। তৃতীয় শ্রেণীতে থাকত তার গোত্রের সদস্যরা এবং সেক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার নির্বাচিত হত সম্পর্কের নিকটত্ব অনুযায়ী,

১। "নাম্বার্স", xxxvi, ৫-৯.
২। ঐ, xxxvi, ১১.
৩। ঐ, xxxvi, ৮-১১.

অর্থাৎ, "তার পরিবারের নিকটতম আত্মীয়রা।" "গোষ্ঠী পরিবার" কথাটা যেহেতু ভ্রাতৃত্বেরই সমতুল (স্প্রা, পৃঃ ৩৬৯), তাই মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান ও জ্ঞাতি না থাকলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত ভ্রাতৃত্বের মধ্যে তার নিকটতম ব্যক্তিরা। স্ত্রী-ধারার আত্মীয়রা উত্তরাধিকারের আওতা থেকে পুরোপুরি বাদ পড়ে যেত। তাই মৃত ব্যক্তির বোনের সন্তানরা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না, বরং প্রয়োজন হলে উত্তরাধিকারী হত তার ভ্রাতৃত্বের সদস্যরা—যাদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা পিতার ভাইয়ের থেকেও দূরের। বংশধারা নির্ণীত হত পুরুষ-ধারা অনুসারে এবং সম্পত্তি ছিল গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল, পিতা কখনও পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না কিংবা পিতামহ কখনও পৌত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না। এ ব্যাপারে এবং প্রায় সব ব্যাপারেই টুয়েল্‌ভ্‌ টেব্‌ল্‌স্‌-এর আইনের সঙ্গে মোজেসের আইনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, মানবজাতি যে একইরকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসেছে এবং একই ধ্যানধারণা যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমান্তরাল-ভাবে পুষ্ট হয়ে উঠেছে—তারই একটা উজ্জ্বল নজির খুঁজে পাওয়া যায় এই সাদৃশ্যের মধ্যে।

পরবর্তীকালে বিবাহ সম্বন্ধে লেভি-র আইন প্রচলিত হয়। এই আইন বিবাহকে এক নতুন ভিত্তিতে স্থাপিত করে, যার সঙ্গে গোত্রীয় আইনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই নতুন আইনে নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞাতি ও আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয় এবং ঐ-সব সম্পর্কের বাইরেকার যে-কোন নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই আইন বিবাহের ব্যাপারে হিব্রুদের গোত্রীয় রীতিগুলোর অবসান ঘটায়। আজকের দিনে খ্রিষ্টিয় জাতিগুলোর মধ্যে এই নতুন আইনই প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়েছে।

উত্তরাধিকারের ব্যাপারে সোলোন যে-সব বিধি-বিধান চালু করেছিলেন, তার সঙ্গে মোজেসের আইনের প্রায় কোন পার্থক্য নেই। এ থেকে অনুমান করা যায় যে সম্পত্তির ব্যাপারে এথেনীয় ও হিব্রুদের প্রাচীন রীতি, প্রথা আর প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটা একই-রকম ছিল। সোলোনের আমলে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা এথেনীয়দের মধ্যে পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে গিয়েছিল। মৃত পিতার সম্পত্তি তার পুত্ররা সমানভাবে ভাগ করে নিত। তবে বোনেদের ভরণপোষণ এবং তাদের বিবাহের সময় তাদেরকে ঐ সম্পত্তির উপযুক্ত অংশ দেওয়ার দায়িত্বও তাদের নিতে হত। মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র না থাকলে তার কন্যারা সম্পত্তিটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত সমানভাবে। এর ফলে নারীরাও সম্পত্তির অধিকারিণী হত আর জেলোফিহাদের কন্যাদের মত এদের সম্পত্তিও বিবাহের পর নিজেদের গোত্রের বদলে স্বামীদের গোত্রে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মোজেসের সামনে যে প্রশ্ন এসেছিল, সেই একই প্রশ্ন সোলোনের কাছেও আসে এবং তিনি তার সমাধানও করেন একইভাবে। বিবাহের ফলে এক গোত্রের হাত থেকে সম্পত্তি অন্য গোত্রের হাতে চলে যাওয়া ঠেকানোর জন্য সোলোন এই নিয়ম জারি করেন যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীদের বিবাহ করতে হবে তাদের সগোত্রীয় নিকটতম পুরুষ জ্ঞাতিদের—যদিও তারা একই গোত্রের সদস্য এবং তার আগে পর্যন্ত নিজের গোত্রের কাউকে বিবাহ করা নিষিদ্ধই ছিল।

এথেনীয় আইনে এটা এমন এক অটল বিধিতে পরিণত হয় যার ফলে ফক. দ্য ক্যুলাঁগে তাঁর মৌলিক গ্রন্থটিতে মন্তব্য করেন যে উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করার সুযোগ নিয়ে আসলে সগোত্রীয় জ্ঞাতিরাই মৃতের সম্পত্তির উপর নিজেদের অধিকার কায়েম করত।[১] এমন ঘটনাও দেখা গেছে, যেখানে মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করে সম্পত্তিটা দখল করার জন্য তার সগোত্রীয় নিকটতম জ্ঞাতি নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তাকে বিবাহ করেছে। ডিমস্থিনিসের ইউবুলাইড্স্-এর প্রোটোম্যাকাস্ এর একটা দৃষ্টান্ত।[২] তবে, নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে কোন উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করার জন্য আইন কাউকে বাধ্য করত না কিংবা ঐ উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ না করে কেউ তার সম্পত্তি দাবীও করতে পারত না। মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার জ্ঞাতিরা আর কোন জ্ঞাতিও না থাকলে তার গোত্রের সদস্যারা। হিব্রু ও রোমানদের মত এথেনীয়রাও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিকে যে-কোন মূল্যে তার নিজের গোত্রের মধ্যেই রাখার ব্যবস্থা করেছিল। আগে যা সম্ভবত একটা চালু রীতি ছিল, সেটাকেই সোলোন পর্যবসিত করেছিলেন সুনির্দিষ্ট আইনে।

সম্পত্তি সম্বন্ধে মানুষের ধ্যানধারণার ক্রমোন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায় সোলোনের একটা আইনের মধ্যে। এই আইন অনুসারে লোকেরা উইল্ বা ইচ্ছাপত্র রচনা করে নিজেদের সম্পত্তি বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা করতে পারত। এই অধিকারটা যে একসময় সর্বত্রই স্বীকৃত হবে, তা নিশ্চিতই ছিল। তবে তার জন্য সময় ও অভিজ্ঞতা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। প্লুটার্ক বলেছেন যে ইচ্ছাপত্রের আইন চালু করে সোলোন বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কারণ তার আগে ইচ্ছাপত্র রচনা করে যাওয়ার কোন স্বীকৃতি ছিল না। তবে ইচ্ছাপত্রে সম্পত্তি ও বাস্তুকে অবশ্যই নিজের গোত্রের মধ্যে রাখতে হত। কোন ব্যক্তির সন্তান না থাকলে নিজের সম্পত্তি সে যাকে খুশি দিয়ে যেতে পারে—এই আইন চালু করার সময় সোলোন জ্ঞাতিত্বের থেকেও বেশি মূল্য দিয়েছিলেন বন্ধুত্বকে এবং সম্পত্তিকে তার মালিকের ন্যায্য অধিকারে পরিণত করেছিলেন।[৩] এই আইন অনুযায়ী নিজের সম্পত্তির ওপর জীবিতকালে প্রতিটি ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার থাকত এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিজের কোন সন্তান না থাকলে ঐ সম্পত্তি ইচ্ছেমত যাকে খুশি দিয়ে যাওয়ার অধিকার। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তির সন্তানরা গোত্রের মধ্যে তার ধারাবাহিকতার প্রতিনিধি ছিল, ততদিন পর্যন্ত সম্পত্তির ওপর গোত্রীয় অধিকারটাই ছিল চূড়ান্ত, অর্থাৎ গোত্রের বাইরের কারুর কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করা চলত না। এর প্রমাণ আমরা সর্বত্রই পাই। যে নীতিগুলো আজকের সমাজকে পরিচালিত করছে, সেগুলো গড়ে উঠেছিল ক্রমান্বয়ে এবং এগিয়ে এসেছিল একই লক্ষ্যের দিকে আমাদের উদাহরণগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটাই নেওয়া হয়েছে সভ্যতার যুগের ইতিহাস থেকে। কিন্তু তাই বলে এমনটা ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই যে সোলোনের আইনগুলো একেবারে অভিনব, একেবারে নতুন সৃষ্টি, আগেকার যুগে তার সমতুল্য

১। "দ্য এনসিয়েন্ট সিটি", লী অ্যাণ্ড শেপার্ড-এর সংস্করণ, স্মল্-এর অনুবাদ, পৃঃ ২৯.

২। "ডিমস্থিনিস এগেনস্ট ইউবুলাইড্স্", ৪১.

৩। প্লুটার্ক, "ভিটা সোলোন", পৃঃ ২১.

কোন কিছু ছিলই না। আসলে সম্পত্তি সম্বন্ধে মানুষের যে-সব ধ্যানধারণা অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে পুষ্ট হয়ে উঠছিল, সেগুলোকেই একটা ইতিবাচক পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিল সোলোনের আইন। প্রথাগত আইনের বদলে চালু হয়েছিল সুনির্দিষ্ট আইন।
টুয়েল্‌ভ্ টেব্‌ল্-এর রোমান আইনের (যা প্রথম ঘোষিত হয় ৪৪৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে) ঐ মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তৎকালীন নিয়মগুলো বিধৃত হয়েছে। কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত তার সন্তানরা এবং তার স্ত্রী। মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান এবং পুরুষধারায় কোন বংশধর না থাকলে ঐ সম্পত্তির অধিকারী হত সম্পর্কের নিকটত্ব অনুসারে তার জ্ঞাতিরা এবং কোন জ্ঞাতিও না থাকলে তার গোত্রের সদস্যরা।[২]
এখানে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি যে আইনের মৌলিক ভিত্তিটা হল সম্পত্তি অবশ্যই গোত্রের মধ্যে থাকবে। লাতিন, গ্রীক ও হিব্রু গোষ্ঠীগুলোর সুপ্রাচীন পূর্বপুরুষদের মধ্যে আমাদের আলোচ্য এই উত্তরাধিকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম যথাক্রমে চালু ছিল কি না, তা জানার পিছু হেঁটে হেঁটে ব্যাপারটাকে বিচার করা ছাড়া আমাদের হাতে অন্য কোন উপায় নেই। যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে যে টুয়েল্‌ভ্ টেব্‌ল্‌স্-এর আইনে আমরা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়নের যে কাঠামোটা দেখতে পাই, সেটা অর্জিত হয়েছিল একেবারে উল্টোদিক থেকে অর্থাৎ, জ্ঞাতিরা উত্তরাধিকারী হওয়ার আগের যুগের গোত্রের সদস্যরাই উত্তরাধিকারী হত এবং পিতার সম্পত্তির ওপর শুধু-মাত্র সন্তানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের যুগে জ্ঞাতিরাই অধিকারী হত ঐ সম্পত্তির।
বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে সমাজের বুকে মাথাচাড়া দেয় এক নতুন উপাদান : অভিজাত-তন্ত্র। মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র আর বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পদ ক্রমাগত বেড়ে চলা, এই দুয়ে মিলে ব্যক্তিগত প্রভাবের বনিয়াদটা গড়ে উঠেছিল। জনসাধারণের একটা অংশকে চির-দিনের মত হীনতার অবস্থায় নামিয়ে আনত যে ক্রীতদাসপ্রথা, তা-ও বিভিন্ন মানুষের অবস্থার মধ্যে এমন এক বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল যা পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক যুগগুলোতে একেবারেই দেখা যায় নি। এই ঘটনা, সম্পত্তি আর সরকারি পদ—এইসব উপাদানের মিশ্রণে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল এক অভিজাততান্ত্রিক মনোবৃত্তি (যা আজকের সমাজের বুকে একেবারে দৃঢ়মূল হয়ে চেপে বসেছে), অবহেলিত হচ্ছিল গোত্র কর্তৃক সৃষ্ট ও সযত্নে রক্ষিত গণতান্ত্রিক নীতিগুলো। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, কিছু লোক অন্যদের তুলনায় বেশি সুযোগসুবিধে পাচ্ছে, একই জাতির মধ্যে কিছু লোক অন্যদের তুলনায় বেশি সম্মান পাচ্ছে। নষ্ট হয়ে গেল সমাজের ভারসাম্য, দেখা দিল নানান বিবাদ, শত্রুতা।
বর্বর যুগের উচ্চ পর্যায়ে গ্রীক ও লাতিন গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিভিন্ন স্তরের প্রধানের পদগুলো সাধারণত পিতাদের কাছ থেকে পুত্রদের ওপর বর্তাতে শুরু করে (যা আদতে ছিল গোত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারমূলক এবং তার সদস্যদের মধ্যে মনোনয়ন-ভিত্তিক)। এই পদগুলো যে উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হত, তা আমাদের জানা

১। লিভি, iii, ৫৪,৫৭.
২। গেইয়াস, "ইনস্টিটিউটস", iii, ১, ৯, ১৭.

তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা যাবে না। তবে গ্রীকদের ক্ষেত্রে আর্কন, ফাইলো-ব্যাসিলিয়ুস কিংবা ব্যাসিলিয়ুস পদের যে-কোন একটা আর রোমানদের মধ্যে প্রিন্সেপস্ ও রেক্স পদের যে-কোন একটার যারা অধিকারী হত, তাদের মধ্যে অভিজাততন্ত্রের মনোবৃত্তিটা জোরদার হয়ে উঠত। তবে, এই মনোবৃত্তিটা একটা স্থায়ী চেহারা নিলেও তা এইসব গোষ্ঠীর পুরনো শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কাঠামোটাকে মূলগতভাবে পাল্টে দেওয়ার মত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি। সম্পত্তি আর পদ—এই দুটো জিনিসই ছিল অভিজাততন্ত্রের বনিয়াদ।

পরবর্তী কালে আধুনিক সমাজকে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখমুখী হতে হয়েছে, তার অন্যতম ছিল এই সমস্যাটা, অর্থাৎ, এই নীতিটাকে টিকিয়ে রাখা হবে কি হবে না। প্রশ্নটা যেখানে সকলের সমান অধিকার ও অসম অধিকারের মধ্যে, সকলের জন্য সমান আইন ও অসম অধিকারের মধ্যে, সম্পদ, প্রতিষ্ঠা ও সরকারি পদের অধিকার এবং ন্যায়বিচার ও বুদ্ধিমত্তার মধ্যে—সেখানে এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ফলাফল সম্বন্ধে সন্দেহের তেমন অবকাশ থাকে না। সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলোর উচ্ছেদ না ঘটিয়েই (একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাদে) বেশ কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে স্পষ্টভাবেই বোঝা গেছে যে সমাজের বুকে এরা একটা বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সভ্যতার অভ্যুদয়ের সময় থেকে সম্পত্তির পরিমান এত বেড়ে গেছে, এত বিচিত্র ধরনের সম্পত্তি সৃষ্টি হয়েছে, সম্পত্তি-মালিকদের স্বার্থে তার ব্যবহার এত বেড়ে উঠেছে এবং এত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিচালনা করা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা একটা অসম্ভব চাপে পরিণত হয়েছে। নিজেরই সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ বিহ্বল হয়ে পড়ছে। তবুও, এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে, যখন মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সম্পত্তিকে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হবে, নির্ধারণ করতে পারবে রাষ্ট্রের সঙ্গে তার রক্ষনাধীন সম্পত্তির সম্পর্ককে এবং সম্পত্তিমালিকদের দায়দায়িত্ব ও অধিকারের সীমাকে। ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে সমাজের স্বার্থ অনেক মূল্যবান। এই দুয়ের মধ্যে একটা ন্যায্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। অতীতের মত মানুষের ভবিষ্যতের নিয়মও যদি এগিয়ে চলাই হয়, তাহলে শুধু সম্পত্তি বাড়িয়ে চলাটা মানবসমাজের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। সভ্যতার অভ্যুদয়ের কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে সময়টুকু অতিক্রান্ত হয়েছে, তা মানুষের অস্তিত্বের অতীত ইতিহাসের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। এখনও বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত হতে বাকি। যে যাত্রাপথের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পত্তি, তার পরিণতিতে সমাজের ভাঙন ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। কারণ এই সম্পত্তিমুখী ছুটে চলার মধ্যে নিহিত থাকে আত্মহননের বীজ। মানুষের অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান যে পথে এগিয়ে চলেছে, সে পথে চলতে গিয়ে মানুষ পা রাখবে সমাজের এক উচ্চতর পর্যায়ে, যেখানে শাসনব্যবস্থায় থাকবে গনতন্ত্র, লোকজের মধ্যে ফুটে উঠবে ভ্রাতৃত্ববোধ, সকলে সমান অধিকার ও সমান সুযোগসুবিধা পাবে, সকলের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। প্রাচীন আমলে গোত্রগুলোর মধ্যে যে স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব দেখা যেত, তাই এক উচ্চতর রূপ নিয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

মানুষের চিন্তায় সম্পত্তি সংক্রান্ত ধ্যানধারনার ক্রমোন্নতির কয়েকটা নীতি এবং তার কয়েকটা ফলাফল নিয়ে আমরা এতক্ষন আলোচনা করলাম। আমাদের আলোচনা খুব বিস্তারিত না হলেও মূল বিষয়টার গুরুত্বটুকু অন্তত তুলে ধরা গেছে।

উৎসটা একই হওয়ার দরুন এবং বুদ্ধিমত্তার একই নীতি ও একই ভৌত রূপের ফলে একই ঐতিহাসিক অবস্থায় সব যুগে ও সব জায়গায় মানবজাতির অভিজ্ঞতার ফলাফল মূলত একই পথে বেয়ে অগ্রসর হয়েছে।

বুদ্ধিমত্তার নীতির মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকলেও তা সর্বত্র একই মানের হয়ে উঠতে চায়। তাই মানবপ্রগতির সমস্ত স্তরে এর কার্যকলাপও একই ধরনের হয়ে থাকে। গোটা মানবসমাজ একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে প্রমান করতে পারলে ব্যাপারটাকে আরও সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যেত, কিন্তু সে-রকম কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। বন্য, বর্বর এবং সভ্য যুগের মানুষের মধ্যে আমরা বুদ্ধিমত্তার একই নীতির প্রকাশ দেখতে পাই। ঠিক এই কারণেই বিভিন্ন জায়গার মানুষ একই অবস্থায় থাকায় সময় একই ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, একই উদ্ভাবনের পথ বেয়ে এগোতে পেরেছে এবং একই চিন্তাসূত্র থেকে গড়ে তুলতে পেরেছে একইরকম প্রতিষ্ঠানসমূহ। ছোট্ট জায়গা থেকে শুরু করে কী অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে মানুষের বুদ্ধিমত্তা তাকে পৌঁছে দিয়েছে সভ্যতার আঙিনায়, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একেবারে শুরুর যুগের সেই তীরের ফলার কথা ভাবুন, যার মধ্যে মূর্ত হয়েছে বন্য যুগের মানুষের চিন্তাভাবনা। পরের যুগে আকরিক লোহাকে গলানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বর্বর যুগের মানুষদের উন্নত বুদ্ধিমত্তার ছাপ। আর শেষত আমরা দেখতে পাচ্ছি ছুটন্ত রেলগাড়ি, যাকে চিহ্নিত করা যায় সভ্যতার জয়টীকা হিসেবে। মানবজাতির একটা অংশ প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেই সভ্যতার যুগে পা রাখতে পেরেছিল। এটা একটা বিশাল কৃতিত্ব। সঠিক অর্থে বললে সেমিটিক ও আর্য, এই দুটো জাতির লোকেরাই পুরোপুরি নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সভ্য যুগে উন্নীত হতে পেরেছিল। আর্যরাই হচ্ছে মানবপ্রগতির মূল স্রোত, কেননা আর্যদের মধ্যেই সবথেকে উন্নত ধরনের মানুষ দেখা গেছে এবং একটু একটু করে সমগ্র পৃথিবীর ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার করে আর্যরা নিজেদের শ্রেষ্টত্ব প্রমান করতেও সক্ষম হয়েছে। তবুও, সভ্যতা কিন্তু আসলে নানান পরিস্থিতির বিক্রিয়জাত একটা আকস্মিক ঘটনাই, কোন-না-কোন সময় সভ্যতা যে আসবেই, সেটা নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু যে সময়ে মানুষ সভ্য যুগে এসে পৌঁছেছে, সেই সময়ে এসে পৌঁছোনোটা মোটেই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। বন্য যুগে মানুষের সামনে ছিল বিরাট বিরাট বাধার পাহাড়, বিস্তর পরিশ্রম করে সে-সব বাধা পেরোতে হয়েছিল তাদের। বর্বর যুগের মধ্য পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ যখন বিভিন্ন ধাতু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চলেছে আকরিক লোহাকে গলানোর প্রক্রিয়া আবিষ্কারের দিকে, তখনও সভ্যতার আগমন সম্ভব-অসম্ভবের দোলায় দুলেছে। যতদিন না মানুষ লোহার ব্যবহার শিখতে পেরেছে, ততদিন পর্যন্ত সভ্যতার আবির্ভাবের কোন সম্ভাবনাই মাথা তুলতে পারে নি। মানবজাতি যদি আজ পর্যন্ত এই বাধাটা অতিক্রম করতে না পারত, তাহলেও তাতে বিস্মিত হওয়ার তেমন কোন কারণ থাকত না। পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্বের সুদীর্ঘ

ইতিহাস, বন্য ও বর্বর যুগের অসংখ্য উত্থানপতন আর টিঁকে থাকার জন্য মানুষের উন্নত হয়ে ওঠার কথা মনে রাখলে এটাও মেনে নিতে অসুবিধে হয় না যে সভ্য যুগে পৌঁছতে মানুষের আরও কয়েক হাজার বছর দেরি হতেই পারত, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তা ঘটেনি। গোটা ব্যাপারটার পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে বাধ্য হচ্ছি যে বেশ কিছু আকস্মিক ঘটনার ফল হিসেবেই মানুষ ঐ সময় সভ্য যুগে পা রাখতে পেরেছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে এই যে অবস্থায় আমরা আজ বসবাস করছি, এই যে চারদিকে এতরকম নিরাপত্তা আর সুখের উপকরণের ছড়াছড়ি, এ-সবই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সেই বর্বর এবং আরও আগের যুগের বন্য পূর্বপুরুষদের কঠোর সংগ্রাম, তাদের যন্ত্রণাভোগ, বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা আর ধৈর্যশীল পরিশ্রমের ফলেই। তাদের এই পরিশ্রম, প্রচেষ্টাও সাফল্য—সবই ছিল সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সমগ্র পরিকল্পনাই এক একটা অংশ, যে পরিকল্পনায় গতিপথে তিনি বন্য মানুষকে উন্নত করে তুলেছেন বর্বর মানুষে আর বর্বর মানুষকে পরিণত করেছেন সুসভ্য মানুষে ।।